অর্চ্চনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২১শ বর্ষ

ফাল্গুন ১৩৩০—মাঘ ১৩৩১

সম্পাদক—

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্-এ, বি-এল্

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র

প্রকাশক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায়

অর্চ্চনা-কার্য্যালয়—

পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন, অর্চ্চনা পোষ্ট, কলিকাতা।

সম্পাদকীয় বিভাগ—৪০ নং চাষাধোবাপাড়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ২৷৷০

২১শ বর্ষের সূচী

নিবেদন

শিল্পী শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী

২১শ ভাগ] { ফাল্গুন, ১৩৩০। { [১ম সংখ্যা

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ভারতের তৎকালীন অবস্থা। *

[শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায় এম-এ]

আমাদের দেশে কাহারও কাহারও ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, ভারতবর্ষের একমাত্র সার সত্য ধর্ম্ম। যাহা ধর্ম্ম নয় বা আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ নয়, এমন-ধারা কিছুই আমাদের দেশে চলিবে না। তাই আজকাল আধ্যাত্মিক স্বরাজের প্রতিষ্ঠায় একদল লোক উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন এবং আত্মার বলে পশুশক্তির নিরোধ, অহিংসা এবং সার্ব্বজনীন তথাকথিত বৈষ্ণব প্রেম ইত্যাদির আস্ফালনে আর একদল লোক আসর জয় করিবার চেষ্টায় আছেন। এদিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ত স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভারতবর্ষ মায়াবাদের দেশ, সেখানকার লোক ইহকালের সমস্তটাকেই মিথ্যা বলিয়া চিরকাল উড়াইয়া দিয়া আসিয়াছে। সুতরাং তীব্র কর্ম্মপ্রচেষ্টা এবং পার্থিব ও রাষ্ট্রীয় উন্নতি সেখানে অসম্ভব। এদেশীয় কোনও ঐতিহাসিক ইহার বিরুদ্ধতা প্রতিপাদনে অগ্রসর হইলে তাঁহারা অনেক সময় সে আলোচনা পক্ষপাতদুষ্ট বলিতেও কুণ্ঠিত হন না। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের আবিষ্কারের পর এ সম্বন্ধে সমস্যাগুলি অনেক সহজ হইয়া উঠিয়াছে। এই বিস্তৃত ও সুলিখিত গ্রন্থপাঠে বেশ উপলব্ধি হয় যে, ভারত যখন জীবন্ত ছিল তখন সে ধর্ম্মের নামে পরকালকেই একমাত্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করে নাই; তখন সে নিজের স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তির উপর শ্রদ্ধা রাখিয়া যুক্তিপূর্ব্বক ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিত এবং রাষ্ট্রনীতি লইয়াও মাথা ঘামাইত। তাহার ফলে যে রাষ্ট্র বা State গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার সহিত আধুনিক যে কোনও রাষ্ট্রের বহুবিষয়ে আশ্চর্য্য মিল আছে এবং তাহার প্রধান লক্ষ্যই ছিল পার্থিব উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি।

প্রায় এক প্রকার নিশ্চিত হইয়াছে যে, অর্থশাস্ত্রপ্রণেতা কৌটিল্য মৌর্য্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের গুরুস্থানীয় বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য ছাড়া আর কেহই নহেন। সে হিসাবে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বুদ্ধের জন্মের পরবর্ত্তী এবং অনুমান খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩২১ হইতে ৩০০ অব্দের মধ্যে লিখিত। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, এই গ্রন্থে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। কৌটিল্যের জগৎ খাঁটী হিন্দু জগৎ।

রাজতন্ত্র শাসনপদ্ধতি।

যতদূর অনুমান করা যায় ভারতবর্ষ তখন অনেকগুলি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। অর্থশাস্ত্রে প্রজাতন্ত্রের বিশেষ পরিচয়

* পণ্ডিত সাম শাস্ত্রী কর্ত্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে সংগৃহীত।

পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ রাজতন্ত্র শাসনই প্রচলিত ছিল; তবে রাজারা অধিকাংশ স্থলে সুশাসক ছিলেন। কৌটিল্য বলিয়াছেন, রাজা শিক্ষিত, জ্ঞানী, সংযতেন্দ্রিয় এবং প্রজার হিতকারী হইবেন, কেন না, এক মাত্র প্রজার মঙ্গল বিধান দ্বারাই রাজ্য স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে। রাজারা ক্ষমতা ও যোগ্যতার বিচার করিয়া মন্ত্রী (councillors) ও অমাত্য (ministerial officers) নিয়োগ করিতেন এবং প্রত্যেকের উপর নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের ভার দিতেন। গোপনে ভয়, লোভ ইত্যাদি প্রদর্শন করিয়া রাজকর্ম্মচারিগণের সাধুতা পরীক্ষা করা হইত।

গুপ্তচর বিভাগ।

রাজতন্ত্রে রাজাই ছিলেন সর্ব্বময় কর্ত্তা। সুতরাং সমস্ত রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা, প্রজার মতি গতি ও বিভিন্ন রাজকর্ম্মচারিগণের কার্য্যাবলী ইত্যাদি সকল বিষয়ে সংবাদ রাখা তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য্য বিষয় ছিল। কৌটিল্য বলিয়াছেন, রাজা গৃহী, সন্ন্যাসী, শাস্ত্রব্যবসায়ী, ভিক্ষুণী বণিক ইত্যাদি সকল শ্রেণী হইতেই চর নির্ব্বাচন করিবেন এবং নানাবিধ সম্মান ও পুরস্কার দিয়া তাহাদিগকে গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহে নিযুক্ত রাখিবেন। ইহাদের নিকট হইতে গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া রাজারা শত্রু মিত্র নির্ব্বাচন করিতেন এবং কাহাকেও অর্থ দ্বারা, কাহাকে বা শাস্তি দিয়া স্ববশে রাখিতেন।

রাজার কর্ত্তব্য।

কৌটিল্য বলিয়াছেন, দিন ও রাত্রিকে আট অংশে বিভক্ত করিয়া রাজা নিম্নরূপ কার্য্য করিবেন, যথা—দিবসের প্রথমাংশে রক্ষিনির্ব্বাচন ও রাজ্যের আয় ব্যয় পরিদর্শন; দ্বিতীয়াংশে নগর ও গ্রামের অধিবাসিগণের কার্য্য পরিদর্শন ও অভিযোগাদি শ্রবণ; তৃতীয়াংশে স্নান, আহার ও অধ্যয়ন; চতুর্থাংশে রাজস্বগ্রহণ ও রাজ্যপরিদর্শকগণের নিকট বিবরণ শ্রবণ; পঞ্চমাংশে রাজ্যসংক্রান্ত পত্রাদি লেখন ও গুপ্তচরগণের নিকট সংবাদ সংগ্রহ; ষষ্ঠাংশে রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়া চিত্তবিনোদন; সপ্তমাংশে হস্তী, অশ্ব, সৈন্য ও রথাদি পরিদর্শন, ও অষ্টমাংশে সেনাপতির সহিত যুদ্ধ ও সৈন্যচালনা বিষয়ে আলোচনা রজনীর প্রথমাংশের কার্য্য গুপ্ত দূতের সহিত সাক্ষাৎ দ্বিতীয়াংশে স্নান, আহার ও অধ্যয়ন; তৃতীয়, চতুর্থ পঞ্চমাংশে নিদ্রা; ষষ্ঠাংশে জাগ্রত হইয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট রা কর্ত্তব্য স্মরণ; সপ্তমাংশে দিবসের কর্ত্তব্য নির্ণয় ও গুপ্ত নিয়োগ, এবং অষ্টমাংশে পুরোহিত ও অধ্যাপকগণে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ ও গোবৎসাদি মাঙ্গল্য বস্তু পরিদর্শন করি রাজসভায় প্রবেশ। ইহাই ছিল আদর্শ; তবে নিজে শক্তি ও প্রয়োজন অনুসারে রাজারা এই ব্যবস্থায় অল্পা পরিবর্ত্তন করিয়া লইতেন।

রাজদ্বারে কেহ প্রতিকারার্থী হইয়া আসিলে রা অবিলম্বে তাহার কথা শুনিয়া যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে কৌটিল্য বলিয়াছেন, যে রাজা প্রজার অভিযোগাদি স্ব পরিদর্শন না করিয়া অমাত্যাদির উপর নির্ভর করে তিনি নিশ্চয়ই কার্য্যহানি ও প্রজার অসন্তোষ উৎপা করেন।

দেবতা, ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী, বৃদ্ধ, শিশু, আর্ত্ত ও নিঃস এবং স্ত্রীলোকের কার্য্য রাজা স্বয়ং পরিদর্শন করিতেন।

আত্মরক্ষা।

রাজা সুরক্ষিত, গুপ্তদ্বার সমন্বিত, বহু-গৃহযুক্ত প্রাসা বাস করিতেন, এবং বিশ্বস্ত ও রাজভক্ত পরিচারক দ্বারা সেবিত হইতেন। আহার্য্যগ্রহণ ও যানাদি আরোহ গমনাগমনের সময় রাজাকে বিশেষ সতর্কতা অবল করিতে হইত। অর্থশাস্ত্র পাঠে জানা যায় যে, মা সমাজের ঘোর কলঙ্ক গুপ্তহত্যাদি কার্য্য সে সময়েও অ ছিল না, এবং সাজাহানের ন্যায় কোন কোন রা তখনও নিজের পুত্র বা অন্যান্য নিকট আত্মীয়ের হ বিপন্ন হইতেন।

রাজ্যবিভাগ।

কৌটিল্য গ্রাম, নগর ও বন এই তিন প্রকারে রা বিভাগ করিয়াছেন।

গ্রামে একশত হইতে পাঁচশত ঘর গৃহস্থ বাস করি ইহাই ছিল ব্যবস্থা। নদী, পাহাড়, বন বা কোন

বৃহৎ ও দীর্ঘজীবী বৃক্ষ ইত্যাদি দ্বারা গ্রামের সীমা নির্দ্দেশ করা হইত। সাধারণতঃ কৃষিজীবী লোকই গ্রামে বাস করিত। কোনও গ্রামে লোকসংখ্যা বেশী হইলে সেখান হইতে কতক লোক বাস উঠাইয়া পার্শ্বস্থ জনবিরল গ্রাম নূতন করিয়া বাস সংস্থাপন করিত। জমি চাষ করিবার জন্য প্রজাদের রাজাকে খাজনা দিতে হইত। জমির অপব্যবহার করিলে রাজা অনেক সময় জমি খাস করিয়া লইতেন। রাজা অর্থ, বীজ, হলবাহী পশু ইত্যাদি দিয়া নানা প্রকারে চাষীকে সাহায্য করিতেন, এবং নূতন গ্রাম পত্তন করিতে হইলে বা দুর্ভিক্ষাদি বিপৎপাত হইলে খাজনা কমাইয়া দিতেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে বিনা খাজনায় জমি দেওয়া তখনও রীতি ছিল। গ্রামস্থ অনাথ, শিশু, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, রুগ্ন ও অসহায় লোকদিগের ভরণ-পোষণের ভার রাজা স্বয়ং গ্রহণ করিতেন। কেহ স্ত্রী পুত্র কন্যা বা অন্যান্য অসহায় প্রতিপাল্য ব্যক্তির প্রতিপালনে অবহেলা দেখাইলে অর্থদণ্ড পাইত। গ্রামে কোনও কো-অপারেটিভ ব্যাপার হইলে সকলে সে বিষয়ে সাহায্য করিত এবং সে সম্পত্তি সাধারণের বলিয়া বিবেচিত হইত। কৌটিল্য বলিয়াছেন, রাজা বন্যপশু, হিংস্রজন্তু, ও গো-মড়ক ইত্যাদি নিবারণ করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে কৃষি রক্ষা করিতেন।

সুরক্ষিত দুর্গের মধ্যে নগরের প্রতিষ্ঠা হইত। ঠিক আজকালের ন্যায়ই এইগুলি ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইত। নগরের ভিতর অনেক বড় বড় রাস্তা থাকিত এবং এই নগর হইতেই সে রাস্তাগুলি বাহির হইয়া গ্রাম ও অরণ্যের সহিত সংযোগ সাধন করিত। বড় বড় রাস্তাগুলি সাড়ে সাত ফিট পর্য্যন্ত প্রশস্ত হইত। রাজ্যের এক অংশে রাজপ্রাসাদ ও ধনাগার ইত্যাদি থাকিত। অর্থশালী বণিকেরা সুরক্ষিত নগরেই বাস করিতেন। সর্ব্ববিধ প্রয়োজনীয় ও সৌখিন দ্রব্যের দোকান, হাঁসপাতাল, দেবমন্দির ও ব্যবসায় সঙ্ঘ ইত্যাদি সমস্তই নগরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। চারি বর্ণের লোকই নগরে বাস করিত এবং প্রত্যেক দশ ঘর লোকের জন্য একটি কূপের ব্যবস্থা ছিল। শান্তিভঙ্গকারী ও সাধারণের পক্ষে বিপজ্জনক দুষ্ট লোককে নগরের মধ্যে স্থান দেওয়া হইত না। নগরের মধ্যে মৃত পশু পক্ষীর দেহ নিক্ষেপ করিলে, অথবা রাস্তায় জঞ্জাল ফেলিলে অর্থদণ্ড হইত। নগরে শববহন করিবার জন্য পৃথক রাস্তা নির্দ্দিষ্ট ছিল।

আজকালকার ন্যায় তখনও রাজার অধীনে প্রকাণ্ড বনবিভাগ থাকিত। এইখানেই রাজা ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান করিয়া রাজা তপোবন প্রতিষ্ঠা করাইতেন এবং এইখানেই রাজার মৃগয়াক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট থাকিত। বনবিভাগে একজন প্রধান রাজকর্ম্মচারী থাকিতেন; তিনি অনুচরবর্গ লইয়া বনরক্ষা করিতেন। বনজাত বৃক্ষাদি ও পশু, বিশেষতঃ হস্তী রাজসম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত।

শিল্প বাণিজ্য ও দেশের আর্থিক অবস্থা।

দেশ তখন বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। কৃষি প্রধান অবলম্বন হইলেও দেশে তখন বিস্তৃত অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য ছিল। বস্ত্র, অলঙ্কার, অস্ত্রনির্ম্মাণ, খনিজধাতু, মণিমুক্তা ইত্যাদি বহুবিধ শিল্পের প্রতিষ্ঠা ছিল। হস্তী ও অন্যান্য পশুর দেহাংশ হইতে আজকালকার ন্যায় নানাবিধ দ্রব্য নির্ম্মাণ হইত। সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্যের উপরই রাজার কর্ত্তৃত্ব থাকিত।

বন ও খনিগুলি প্রায় রাজার একচেটিয়া সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। বনবিভাগে একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রধান রাজকর্ম্মচারী থাকিতেন এবং তাঁহার অধীনে বন-রক্ষক অনুচরবর্গ থাকিত। বহুবিধ বৃক্ষ লতা রাজার সম্পত্তি ছিল। বনের মধ্যে অথবা বনের বাহিরে কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়া নানাবিধ শিল্পবস্তু নির্ম্মাণ করা হইত। রাজার তরফ হইতে হাতী ধরা তখন একটা লাভজনক ব্যবসায় ছিল। সাধারণের হাতী মারিবার অধিকার ছিল না। কেহ মৃত হস্তীর দাঁত সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিলে পুরস্কার পাইত।

খনিসমূহের তত্ত্বাবধায়ক একজন রাজপুরুষ থাকিতেন। তাঁহাকে মণিপরীক্ষা ও মিশ্র খনিজধাতু সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা রাখিতে হইত। তাঁহার অধীনে বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারী ও

শ্রমজীবীরা থাকিত। সাধারণতঃ বর্ণ, উৎপত্তিস্থান ইত্যাদি বহির্লক্ষণ দেখিয়া ধাতু নির্ণয় হইত। ধাতুর বিশুদ্ধি সম্পাদনের কয়েকটি সাধারণ উপায় জানা ছিল। খনির খনন ব্যাপারটা খুব সাধারণ রকমেরই ছিল। সমুদ্রজাত শঙ্খ, শুক্তি, প্রবাল ও মুক্তা প্রভৃতি এই খনিবিভাগের অন্তর্ভুক্ত থাকিত। সমুদ্রের জল হইতে লবণ তৈয়ারী করা ব্যবসাও প্রচলিত ছিল এবং লবণের জন্ত রাজাকে ট্যাক্স দিতে হইত। লবণে ভ্যাজাল দিলে বা রাজার লাইসেন্স না লইয়া লবণ তৈয়ারী করিলে লোকে দণ্ড পাইত। তবে বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী ও শ্রমজীবীরা নিজের ব্যবহারের মত লবণ বিনা করে প্রস্তুত করিতে পারিত।

ব্যবসা বাণিজ্যের তত্ত্বাবধায়ক একজন প্রধান কর্ম্মচারী থাকিতেন। তিনি বাজারের 'চাহিদা'র দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমদানী রপ্তানি ও ক্রয় বিক্রয়ের হার নিয়মিত করিতেন। ব্যবসা বাণিজ্যের উপর রাজা শুল্ক লইতেন। নগরের সর্ব্বপ্রধান প্রবেশদ্বারে শুল্কসংগ্রহের জন্ত গৃহ নির্ম্মিত হইত। সেখানে একজন বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী তাঁহার অধীনে অন্তান্ত কর্ম্মচারী লইয়া থাকিতেন। কোনও বণিক ব্যবসায়ার্থ আসিলে সেইখানে তাঁহার দ্রব্যের পরিমাণ নির্ণীত হইত এবং বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের পরিমাণ, উৎকর্ষাপকর্ষ ও উৎপত্তিস্থান হিসাবে শুল্কের পরিমাণ স্থিরীকৃত হইত। সেকালের বণিকরা বাণিজ্যদ্রব্যের উপর স্ব স্ব অভিজ্ঞানচিহ্ন (Seal mark) ব্যবহার করিতেন। বিদেশী জিনিসের কাটতি বাড়াইবার জন্ত অনেক সময় শুল্ক কমাইয়া দেওয়া হইত। অনেক স্থানে অস্ত্রশস্ত্রাদির আমদানী নিষিদ্ধ ছিল। কেহ নিষিদ্ধ দ্রব্যের আমদানী করিলে অথবা শুল্ক না দিয়া ক্রয় বিক্রয়াদি করিলে দণ্ডার্হ হইত।

আবগারী বিভাগ।

আবগারী বিভাগ ঠিক এখনকারের ন্তায় সম্পূর্ণরূপে রাজার কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত মদ চোলাই না হয়, অধিক সংখ্যক মদের দোকান না হয়, এবং লোকে যাহাতে মদ লইয়া স্থানান্তরে যাইতে না পারে, সে বিষয়ে কড়া ব্যবস্থা থাকিত। কৌটিল্য বলিয়াছেন, মদ্যপানাধিক্যে শ্রমজীবীরা কাজ কর্ম্ম নষ্ট করিতে পারে; আর্য্যেরা চরিত্রহীন হইতে পারে এবং দুষ্টস্বভাব লোকেরা প্রকাশ্যে কুৎসিত আচরণ করিতে পারে; অতএব মদ কেবলমাত্র পরিচিত ব্যক্তিকে যথা-নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে বিক্রয় করিবে এবং যাহারা বাস্তবিকই ভাললোক, শুধু তাহা-দিগকেই মদ লইয়া দোকানের বাহিরে আসিতে দিবে। মদের দোকানে কাহারও কোন জিনিষ হারাইলে সেজন্ত দোকানদারকে দায়ী হইতে হইত। মদের দোকানে বসিয়া মদ খাইবার জন্ত পৃথক সুসজ্জিত কক্ষ থাকিত, এবং সেখানে অনেক ঢলাঢলি কাণ্ড ঘটিত। সকল মদের দোকানের উপরই কড়া পাহারার ব্যবস্থা থাকিত। কয়েকটী উৎসব উপলক্ষে বিনা শুল্কে মদ প্রস্তুত করিবার অনুমতি দেওয়া হইত।

সেকালে লোকে খুব মাংস খাইত এবং বহু কসাইয়ের দোকানে মাংস বিক্রয় হইত। দোকানগুলি রাজব্যবস্থায় পরিচালিত হইত। কেহ খারাপ মাংস বিক্রয় করিলে বা ওজনে কম দিলে দণ্ড পাইত।

শান্তিরক্ষা।

নগরে আধুনিক পুলিশ-কমিশনারের ন্তায় একজন রাজ-কর্ম্মচারী থাকিতেন। অর্থশাস্ত্র হিসাবে তাঁহার নাম 'নগরক'। নগরের শান্তিরক্ষার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকিত। নগরে অনেক দাতব্য অনুষ্ঠান ছিল, এবং সেখানে কোনও অপরিচিত বিদেশী লোক উপস্থিত হইলে দাতব্য অনুষ্ঠানের কর্ত্তাকে সে সংবাদ 'নগরক' সমীপে নিবেদন করিতে হইত। কাহারও বাড়ীতে নূতন লোক-জন আসিলে সে সংবাদও পুলিশে জানাইতে হইত। কাহারও স্বভাব চরিত্র ও চাল-চলন সন্দেহজনক হইলে, বিশেষতঃ সে আবার যদি অপরিচিত হইত, তাহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তবে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। খুব সম্ভবতঃ ক্ষতাদিদুষ্ট রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে রাস্তায় অবাধে চলাফেরা করিতে দেওয়া হইত না। পরিত্যক্ত বাড়ী, মদ ও মাংস বিক্রেতার দোকান, জুয়ার আড্ডা ইত্যাদি স্থানে পুলিশের গুপ্তচর ছদ্মবেশে সর্ব্বদাই ঘুরিত। আগুনলাগা

হইতে নগর রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে কর্ম্মকারদিগকে একটি বিশেষ পাড়ায় একত্র বাস করান হইত এবং বড় বড় রাস্তার দু'ধারে এবং বিশেষতঃ চৌরাস্তায় জলপূর্ণ পাত্র রক্ষিত হইত; সেগুলি অগ্নিনির্ব্বাণের সময় ব্যবহার করা হইত। রাত্রের কিয়দংশে লোক চলাচল বন্ধ থাকিত এবং সেই নিষিদ্ধ সময়ের আরম্ভে ও শেষে তূর্য্যধ্বনি করা হইত। সে সময়ে বাহির হওয়া অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইত; তবে নগরকের অনুমতি লইয়া, অথবা চিকিৎসার্থে বা মৃতদেহ লইয়া বাহির হওয়া যাইত। রাত্রে যখন লোক চলাচল নিষিদ্ধ না থাকিত, তখনও সন্দেহ হইলে রাস্তায় পথিককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করা হইত। কতকগুলি দাগী দুষ্ট লোকের রাত্রে বাহির হওয়াই নিষিদ্ধ ছিল। রাজপ্রাসাদ বা দুর্গপ্রাকারাদির নিকটে কাহারও বিনা কারণে ঘুরিয়া বেড়াইবার অধিকার ছিল না। কাহাকেও নগরে প্রবেশ করিতে হইলে, অথবা নগরের বাহির হইতে হইলে, সরকার হইতে অনুমতি-পত্র লইতে হইত।

রাজস্ব ও রাজকার্য্য।

দুর্গ, রাষ্ট্র, খনি, সেতু, বন, ব্রজ ও বণিকপথ, এই সাত নামে রাজস্বের বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

নগরে ব্যবসায় দ্রব্য, মদ্য, মাংস ও স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কার ইত্যাদি হইতে সংগৃহীত শুল্কই ছিল 'দুর্গ' বিভাগের রাজস্ব। রাজার নিজস্ব জমি, বা প্রজার নিকট হইতে আদায় করা শস্যাদি, (ভাগ) তীর্থস্থানাদি হইতে, বা নদীর পারাণি হইতে সংগৃহীত রাজস্ব ছিল 'রাষ্ট্র' বিভাগের অন্তর্গত। খনি ও সমুদ্রজাত দ্রব্যাদির বিক্রয়লব্ধ অর্থ 'খনি' বিভাগে যাইত। রাজকীয় ফুল ফল ও শব্জী বাগানের আয় এবং বন্যপশু ও বৃক্ষাদি হইতে যে আয় হইত, সে সমস্ত যথাক্রমে 'সেতু' ও 'বন' বিভাগে সঞ্চিত হইত। গো, মহিষ, ছাগ, অশ্ব, উষ্ট্র ও অশ্বাদি পশু ছিল 'ব্রজ' বিভাগের অন্তর্গত। 'বণিকপথ' শব্দে স্থলে ও জলে বাণিজ্যের পথগুলিকে বুঝাইত। এই সাতটির একত্র নাম ছিল 'আয়শরীর'।

রাজাদের টাকশালা থাকিত। সেখানে রৌপ্য ও তাম্রের মুদ্রা প্রস্তুত হইত। জাল টাকা সেখানে পৌঁছিবামাত্র টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলা হইত।

রাজস্বের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রাখিবার জন্য নিয়মিত কার্য্যালয় (office) থাকিত। কিপ্রকারে হিসাব রাখিতে হয়; কি প্রকারেই বা হিসাবের পরীক্ষা করিতে হয়; তহবিল তছরূপ কি কি উপায়ে ধরা যাইতে পারে, সে সব সম্বন্ধে কৌটিল্য বিস্তারিত উপদেশ দিয়াছেন। আফিসের চিঠি পত্রাদি কি প্রকারে লেখা উচিত, সে সম্বন্ধেও কৌটিল্য উপদেশ দিয়াছেন। আজকালকার কোনও সেক্রেটেরিয়েট্ আফিস্ হইতে একটা বড় চিঠি (draft) লিখিতে হইলে তাহার ভাষা ও বিষয়বিন্যাস সম্বন্ধে যে যে দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার, তাহার কোন কিছুই কৌটিল্যের আফিসে অজ্ঞাত ছিল না।

বিচারপ্রণালী ও উচ্চাঙ্গের রাজনীতি বিষয়ে কৌটিল্য তাঁহার পুস্তকের অর্দ্ধাংশেরও অধিক নিয়োজিত করিয়াছেন। সে সব কথা এখানে আর আলোচিত হইল না।

অস্ত্রশস্ত্রাদি ও যুদ্ধবিদ্যা।

ধনুর্ব্বাণই ছিল যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র। তাল, চাপ (বংশবিশেষ) দারু ও অস্থি দ্বারা ধনুক নির্ম্মিত হইত। হাতাহাতি যুদ্ধে কয়েক প্রকার তরবারি এবং শক্তি, কুন্ত, প্রাশ, শূল, তোমর ইত্যাদি নিভাজ সংস্কৃত নামধারী অন্যান্য অনেক অস্ত্র ছিল। ইহাদের কোনটিতে কোপ কোনটিতে খোঁচা মারা চলিত। মুদ্গর, গদা প্রভৃতিও বাদ যাইত না। এতদ্ব্যতীত 'সর্ব্বতোভদ্র' ও 'জামদগ্ন্য' নামক দুই প্রকার অস্ত্র ছিল। প্রথমটীর সাহায্যে বড় বড় প্রস্তরখণ্ড মহাবেগে নিক্ষেপ করা যাইত এবং দ্বিতীয় যন্ত্রের সাহায্যে তীর ছোড়া হইত। 'শতঘ্নী' ও 'অগ্নিসংযোগ' নামে দুইটী কথা অস্ত্রের বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়; তবে ইহারা বন্দুক, কামানের মত কোন অস্ত্র কিনা, তাহা ঠিক বলা যায় না। সম্ভবতঃ সে সময়ে বারুদের ব্যবহার জানা ছিল না। কয়েক প্রকার সহজদাহ্য পদার্থের বিষয় জানা ছিল এবং সেগুলি সাধারণতঃ তীরের মাথায় অথবা শকুনাদি

পক্ষীর পায়ে লাগাইয়া শত্রুর দুর্গে অগ্নি সংযোগার্থে ব্যবহার করা হইত।

যুদ্ধে অশ্ব, হস্তী ও রথের ব্যবহার ছিল। কৌটিল্য যুদ্ধের স্থান নির্ণয় ও সৈন্যপরিচালনা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। যুদ্ধের প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল দুর্গ এবং দুর্গজয়ের সঙ্গেই প্রায় লড়াই শেষ হইত। রাজার রাজধানী ত দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত থাকিতই, অধিকন্তু রাজ্যের চতুঃসীমাতেও কতকগুলি দুর্গ থাকিত। কৌটিল্য জল ও পর্ব্বতবেষ্টিত দুর্গেরই বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। স্বভাবতঃ দুর্ভেদ্য স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে একাধিক পরিখা ও প্রাচীর ইত্যাদি বেষ্টিত করিয়া কৃত্রিম উপায়ে আরও সুদৃঢ় করা হইত। প্রাচীরের উপরে নানাস্থানে গম্বুজ থাকিত এবং সেখান হইতে নিম্নস্থ আক্রমণকারী শত্রুদলের প্রতি তীর ও প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করা হইত। দুর্গের বাহিরের ভূমি গর্ত্ত, কাঁটা, ও লৌহশলাকা ইত্যাদি দ্বারা যথাসাধ্য শত্রুপক্ষের দুরধিগম্য করিয়া রাখা হইত। আজকার ন্যায় সেকালের সেনাপতিরাও retreat বা পশ্চাদ্বর্ত্তনের দিকে কড়া নজর রাখিতেন এবং সেই উদ্দেশ্যে দুর্গে নানাপ্রকার গুপ্তদ্বার থাকিত। সেকালের দিনে এই সব দুর্গ জয় করা সহজসাধ্য ছিল না।

উপসংহার।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রাচীন ভারতের এক অত্যুজ্জ্বল গৌরবময় যুগের কথা। ইহা নিশ্চয় যে তখন সত্যযুগ ছিল না। অন্যায়, অত্যাচার, দুর্ব্বলের উপর সবলের পীড়ন তখনও অজ্ঞাত ছিল না। দেশে যুদ্ধ বিগ্রহাদি ঘটিত, এমন কি, দুর্ভিক্ষাদিও কখনও কখনও ঘটিত। তবুও সে ভারতের এক অতীত গৌরবময় যুগ। বিশাল মৌর্য্য সাম্রাজ্যের ছত্রচ্ছায়ায় উত্তর ভারত তখন সুরক্ষিত, ধনৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। রাজতন্ত্র শাসনই প্রচলিত ছিল; কিন্তু রাজারা সুশাসক ছিলেন, প্রজার হিতার্থী ছিলেন। কৃষি ছিল দেশের প্রধান অবলম্বন; আর তাহার উদ্যোগী ও রক্ষাকর্ত্তা ছিলেন স্বয়ং রাজা। শিল্পবাণিজ্যের বহুল প্রচার ছিল; কিন্তু দেশ চিম্‌নির ধোঁয়ায় অন্ধকার হয় নাই; মানুষ পরের অর্থোপার্জ্জনের যন্ত্রে পরিণত হয় নাই। তপোবন ছিল, ঋষি ছিলেন, উচ্চ জ্ঞানের অবাধ চর্চ্চা ছিল; কিন্তু শঙ্করের মায়াবাদ তখনও উঠে নাই; দেশ ইহকালকে অগ্রাহ্য করিতে শিখে নাই; অর্থকে অনর্থ ভাবিয়া নিজের অক্ষমতাকে ঢাকিয়া রাখিতে চাহে নাই; নিজের সবল কার্য্যক্ষম বাহুকে ঊর্দ্ধবাহুর কঙ্কালে পরিণত করিতে চাহে নাই। সেকালের নরনারীর কথা কৌটিল্য প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন মাত্র; কিন্তু তাহাতেই মনে হয় তাহারা এক গৌরব-গর্ব্বিত, আত্মনির্ভরশীল, প্রাণবান জাতি ছিল। সত্য বটে, তাহাদের জীবনে সমস্যা ছিল—কেন না, তথাকথিত একশত বৎসর আগেকার সেকালের মত তাহাদের জীবন কতকগুলি সংস্কারের সমষ্টি ছিল না—কিন্তু জীবন-যুদ্ধে তখন তাহারা ছিল জয়ী। তাহাদের সমাজে শৃঙ্খলা ছিল; পারিবারিক জীবনে সর্ব্ববিধ প্রচুরতা ছিল; সম্মুখে কর্ম্মোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ছিল; আর সকলের উপরে ছিল--যাহা চিরদিনই ভারতের গৌরব—সেই ভারতের আধ্যাত্মিকতা।

বিসর্জ্জন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে সংসারে অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। জমীদার বাবু ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, তুষার এখন জমীদার। তাহার একটী পুত্র, একটি কন্যাও হইয়াছে।

বাড়ীর মধ্যে আর একজন নাই, তিনি কমনীয়ের মাতা। গত বৎসরের ইনফ্লুয়েঞ্জায় তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। বিবাহ করিবার দায় হইতে কমনীয় বাঁচিয়া গিয়াছে।

তুষার ও তাহার মাতা শৈলজা দেবী অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই কমনীয়কে বিবাহ করিতে রাজি করিতে পারেন নাই। ভীষ্মের মতই অটুট ভাবে সে তাহার কৌমার্য্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। তুষারকে সে স্পষ্ট জানাইয়া দিয়াছিল, সে কোন কালেই বিবাহ করিবে না।

কেন যে সে বিবাহ করিবে না তাহা জানিবার জন্য তুষার বেশ পীড়াপিড়ী করিয়াছিল, কিন্তু কমনীয় একটাও উত্তর দেয় নাই। ভ্রাতৃজায়া রেখা যখন আসল কথা জানিবার জন্য বিশেষ করিয়া ধরিয়া বসিল, তখন সে গম্ভীর মুখে বলিল, "সত্যি আমি বিয়ে করব না, আমার মনে একটা ছায়া আছে, সে ছায়া না উঠলে আমি বিয়েতে এগুব না। সে ছায়া এ জন্মে উঠবেও না, বিয়েও হবে না।"

রেখা বেশ জানিয়া লইল সত্যই সে কাহাকেও ভালবাসিয়াছিল এবং এখনও খুব গোপনে সেই ভালবাসার পাত্রীর ছবিখানি হৃদয়ে রাখিয়া পরম ভক্তের মত পূজা করে।

তবুও সে বলিয়াছিল, "তুমি কাকে ভালবাস ঠাকুরপো একবার বল, যেমন করেই হোক তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব।"

কমনীয় একটু হাসিয়া বলিয়াছিল, "তাকে আর পাওয়া অসম্ভব বউদি; সে এলোক ছাড়িয়ে চলে গ্যাছে।"

রেখা হতাশ হইয়া বলিয়াছিল, "তবে আর কি বলব। কিন্তু এটুকু বল ঠাকুরপো কে সে।"

কমনীয় গম্ভীর হইয়া মাথা নাড়িয়া বলিয়াছিল, 'মাপ কর বউদি, জীবন থাকতেও সে কথা বলতে পারব না।"

রেখা আর বেশী জেদ করে নাই।

কমনীয় বিশেষ সুখ্যাতির সহিত ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। তুষার কলিকাতায় তাহার প্র্যাকটিসের সুযোগ দেখিতেছিল, সেই সময় তাহার জনৈক জমীদার বন্ধু কমনীয়কে বৃত্তিভোগী ডাক্তার করিয়া নিজের কাছে রাখিবার প্রস্তাব করিলেন।

তুষার একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল, কিন্তু কমনীয় কথাটা পড়িবা মাত্র রাজি হইয়া গেল। তুষার একটু বিরক্ত হওয়ায় সে তাহাকে বুঝাইয়া বলিল, "তুমি বুঝছ না দাদা, এ বেশ ভালই হ'ল। ডিস্পেনসারী খুলে বসে থাকা মাত্রই সার, এই তো দেখছি অনেক বড় বড় ডাক্তারেরও রীতিমত কল্ নেই, তাদের বাসা খরচই রীতিমত জুটে ওঠে না। অনর্থক ঘরের থেকে টাকা এনে ঘর ভাড়া, চাকরের মাইনে দেওয়ার চেয়ে মাইনে-করা ডাক্তার হওয়া ভাল। মাসে একশ টাকা মাইনে পাব। কিছুদিন বাদে নাম-ডাকটা হয়ে গেলে চাকরী ছেড়ে দিতেই বা কতক্ষণ।"

তুষার আর আপত্তি করিতে পারিল না। কেবল মাত্র বলিল, "নিজের দিকে নজর রাখিস। ওরা সব বয়াটে বড়লোক, নিজের ভাল মন্দ বুঝতে পারে না, ফ্যাসানটাই শ্রেষ্ঠ বলে জেনে নেয়। দেখিস, ওদের সঙ্গে মিশে যেন বয়ে যাস নে।"

কমনীয় হাসিয়া বলিল, "তুমিও যেমন পাগল দাদা। বয়ে যদি যেতুম, এতদিন ক—বে খারাপ হতুম। সে ভয় কোর না, আমি ঠিক আছি। তোমার চেয়েও আমার বুদ্ধি আছে, সাহস আছে, যাতে অন্য লোকের আকর্ষণ আমি ঠেকিয়ে চলতে পারি।"

তাহার গর্ব্বপূর্ণ কথা শুনিয়া তুষার একটু হাসিল, বলিল, "তাই হলেই ভাল।"

একদিন কমনীয় দাদা বৌদির পায়ের ধূলা লইয়া, তাহার বড় আদরের খোকা খুকির ললাটে স্নেহচুম্বন দিয়া কার্য্যস্থলে চলিয়া গেল।

তুষারের মনটা দিন কত বড় ভার হইয়া রহিল, কারণ যথার্থই সে কমনীয়কে বড় ভাল বাসিত।

গ্রামের আর সবাই যেমন ছিল তেমনিই আছে, পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে আর একটী পরিবারের। শ্রীনাথ বাবু আজ ছয় মাস মাত্র হইল ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার যে কষ্ট হইতেছে তাহা বর্ণনীয় নহে।

তাহার পিতার মৃত্যুর পরেই কলিকাতার বন্ধুরা অর্থ সাহায্য করা বন্ধ করিয়াছেন। অর্থাভাবে মাহিনা দেওয়ার জন্য মণি স্কুল হইতে তাড়িত হইয়াছিল, কেবল তুষারের কথায় হেডমাষ্টার মহাশয় আবার তাহাকে স্কুলে গ্রহণ করিয়াছেন।

এই দয়াটুকু লইতে অভিমানিনী ইতির হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু লইতেই হইল, মণির ভবিষ্যৎ অন্ধকার করিলে চলিবে না। আগত বৎসরে সে ম্যাট্রিকুলেশান পাস করিতে পারিলে একটা কোনও ভাল কাজ করিতে পারিবে, তাহার পর তাহাদের দুরবস্থা দূর হইবে।

পার্শ্ববর্ত্তী বড়লোক নামে খ্যাত বসু মহাশয়ের বাড়ীতে সে কাজ লইয়াছিল। দুইবেলা তাহাকে রন্ধন করিয়া দিয়া আসিতে হইত। পরিবেশনের ভার সে কিছুতেই লয় নাই। ইহাতে তাহার দুইবেলার খোরাক বাঁচিয়া যাইত। যে চার টাকা বেতন পাইত তাহাতে এবং নিজের বৈকালিক আহারে সে ভাইটীকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিয়াছিল। নিজের সেই একবেলা আহারই তাহার যথেষ্ট ছিল।

এমনি করিয়াই অতি কষ্টে তাহার দিন কাটিতেছিল। সূচীকর্ম্ম, ক্রুশের কাজ সে খুব সুন্দর জানিত, কিন্তু পল্লী-গ্রামে এ সকলের আদর নাই।

তুষার যখনই বাড়ীতে আসিত, গ্রামের সকলেরই খোঁজ লইত, আবশ্যকমত অনেককে অর্থ সাহায্যও করিত। দুস্থ বালক মণির লেখাপড়ার ভার সম্পূর্ণ সে লইয়াছিল। তাহার পর তাহাদের সাংসারিক অবস্থার কথা, স্ত্রী ও মাতার নিকট অবগত হইয়া করুণার্দ্রচিত্তে সে যখন ইতিকে মাসিক অর্থ সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল, তখন অভি-মানিনী ইতি কিছুতেই সে দান গ্রহণ করিতে রাজি হইল না। সে বলিয়া পাঠাইল—"আমার চেয়েও ঢের বেশী গরীব আছে, তাদের অর্থ সাহায্য করলে তারা বাঁচবে ; এ দানটা তাদের করবেন।"

তুষার চিনিল, এ ভিক্ষাথিনী নহে, পরের দেওয়া জিনিসকে সে ঘৃণা করে। স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া সে তখন বলিয়া পাঠাইল, ইতির হাতে বুনা সূতার যাহা আছে তাহা সে ক্রয় করিবে এবং তাহার কথা মত কয়েকটী জিনিস ইতিকে তৈয়ারী করিয়া দিতে হইবে।

ইতির বুনা দুই একটী জিনিস মাত্র ছিল, সেগুলিও খারাপ হইয়া আসিয়াছিল। তুষার দশ টাকায় সে সব কিনিয়া লইল ও আরও অনেক সূতা আনাইয়া দিল।

তাহার দান করিবার এই অভাবনীয় কৌশলে ইতি একটুও প্রফুল্ল হইতে পারিল না। তাহার হৃদয় গোপনে ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল।

পরের এই অযাচিত অনুগ্রহ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য সে আবার স্বামীর উদ্দেশে পত্র লিখিল। এ পর্য্যন্ত সে কেবল পত্র লিখিয়াই আসিতেছে, কখনও একছত্র উত্তর সে পায় নাই। সে যে সেই তাহার কুমারী নামটা ঘুচাইয়া তাহাকে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে, তাহার আর কোনও খোঁজ খবর নাই। তখন যাহাকে বিদায় দিবার জন্য ইতি বড় ব্যগ্র হইয়া উঠিয়া ছিল, আজ তাহারি কাছে যাইবার জন্য সে তেমনি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। কে জানে সে এ পত্রখানাও পাইবে কিনা, উত্তর দিবে কি না। ইতি ভগবানকে প্রণাম করিয়া পত্রখানা পোষ্ট করিয়া দিল।

(২)

প্রথমটা কমনীয় জ্যোতিশের দলে মিশিতে পারিল না। সে যেন দল-ছাড়া মাছের মত ছটফট করিতে লাগিল। তুষারের নিষেধ বাক্য তাহার মনে পড়িয়া গেল, সে অনুতাপে দগ্ধ হইতেছিল। কিন্তু হায়, এখন যে আর ফিরিবার পথ নাই, কোন্ মুখ লইয়া সে আবার ফিরিয়া যাইবে ? খুব জেদ করিয়াই যে সে বাহির হইয়া আসিয়াছে।

জ্যোতিশ জমিদারের একমাত্র পুত্র। পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সে পড়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। নবীন জমিদারের বন্ধু আসিয়া যুটিয়াছিল বড় কম নহে। দিবারাত্রই জ্যোতিশের মজলিশ গুলজার থাকিত।

কমনীয় জ্যোতিশকে অনেকদিন হইতেই চিনিত। তুষারের বিবাহে এই ছেলেটীও বরযাত্রী গিয়াছিল। ইদানীং সে যে এত বদ, অসচ্চরিত্র হইয়া গিয়াছে তাহা কমনীয় জানিত না জানিলে বোধ হয় এখানে আসিত না।

কমনীয়কে নিজের দলে টানিয়া লইবার জন্য জ্যোতিশও বিশেষ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কল্পনা-জল্পনাও নানারূপ চলিতেছিল। কিন্তু গম্ভীর প্রকৃতি কমনীয়কে যে কি প্রকারে দলভুক্ত করা যায়, তাহা তাহারা ভাবিয়াও ঠিক করিতে পারে নাই।

কমনীয় এখানে শীঘ্রই বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া

ফেলিল। জ্যোতিশ যে সময় গান বাজনা ও মদে ডুবিয়া থাকিত, সে সময়টা কমনীয় গ্রামের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। সে লক্ষ্য করিয়াছিল প্রজাবর্গ সকলেই জমীদারের আচরণে অল্প পরিমাণে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

জ্যোতিশ কমনীয়ের সহিত কোনরূপ নিঃসম্পর্কীয়ের ন্যায় কখনই ব্যবহার করে নাই, বরাবর ইয়ারকী চালাইয়া আসিয়াছে। কমনীয় তাহাকে জমিদার প্রভু বলিয়া জ্ঞান করিত না, বন্ধু বলিয়াই জানিত। জ্যোতিশও তাহার কাছ হইতে বন্ধুবৎ ব্যবহারই প্রার্থনা করিয়াছিল।

সেদিন জ্যোতিশ সকল সঙ্কোচ কাটাইয়া কমনীয়কে টানিতে টানিতে তাহার বৈঠকখানায় লইয়া গেল। সেখানে তখন রীতিমত গানের ও সুরাপানের আখড়া বসিয়াছিল। কমনীয়কে দেখিয়াই সতীশ নামে জ্যোতিশের এক বন্ধু তাড়াতাড়ি বোতলটা লুকাইতে গেল।

জ্যোতিশ বলিল, "আর লুকিয়ে কোনও ফল নেই হে। কমনীয় তো জানছেই আমরা সবাই মদ খাই, তবে আর গোপন করার দরকারটা কি। বস হে কমনীয়, আমার পাশটায় বস।"

কমনীয়কে পার্শ্বে টানিয়া লইয়া সে বসিয়া পড়িল।

সেদিন বোধ হয় কমনীয়কে দেখিয়াই নেশাটা পূর্ণ মাত্রায় ফুটিয়া উঠে নাই, তবে আমোদটা পূর্ণ মাত্রাতেই চলিল।

বাড়ী যাইবার সময়ে কমনীয় জ্যোতিশের পাশে পাশেই চলিতেছিল। জ্যোতিশ জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম দেখলে ?"

কমনীয় বলিল, "মন্দ নয়।"

জ্যোতিশ বলিল, "মদ খাওয়া দেখলে ?"

কমনীয় উত্তর করিল, "দেখেছি।"

এ সংসর্গে মিশিয়া কমনীয় বেশী দিন সৎ ভাবে থাকিতে পারিল না। তুষারের ভয় সত্যই হইল, কমনীয় একদিন বেশ সমারোহের সহিত এ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গেল।

কমনীয়কে দলে টানিতে পারিয়া জ্যোতিশের আনন্দের সীমা রহিল না, সে গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিল।

পিতৃবন্ধু শিবদাস বাবু জ্যোতিশের পিতার সময় হইতে এই ইষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। তাঁহার নিজের সন্তানাদি ছিল না, জ্যোতিশকে তিনি পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতেন। জ্যোতিশের এইরূপ শোচনীয় অধঃপতনে তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, এবং তাহাকে যাহাতে সুপথে ফিরাইয়া আনিতে পারেন সে দিকে তাঁহার অত্যন্ত যত্ন ছিল। জ্যোতিশের অপদার্থ বন্ধুগুলাকে তিনি দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না, এইগুলাকে তাড়াইবার ফিকিরে তিনি দিনরাত ঘুরিতেন, কিন্তু কোনমতেই এই জোঁক-গুলাকে স্থানচ্যুত করিতে পারেন নাই।

কমনীয়ের সহিত আলাপ করিয়া তিনি অত্যন্ত খুসি হইয়াছিলেন। বেশ করিয়া তাহাকে নাড়াচাড়া করিয়া বুঝিয়াছিলেন, এ ছেলেটি মদ খাওয়াকে হৃদয়ের সহিতই ঘৃণা করে। তিনি আশা করিয়াছিলেন যদি ইহার মতে চলে তবে জ্যোতিশ ভাল হইবে।

জ্যোতিশ তাঁহার কথায় অত্যন্ত বিরক্ত ছিল, সে শিবদাস বাবুকে দেখিতে পারিত না। অনেকবার সে তাঁহাকে কাজ হইতে ছাড়াইতে গিয়াছে, কিন্তু শিবদাস বাবু কিছুতেই কাজ ছাড়েন নাই। তিনি জানিতেন, তিনি কাজ ছাড়িয়া দিলেই জ্যোতিশের জমীদারীর চিহ্নমাত্র থাকিবে না! জ্যোতিশ ইহা বুঝিত না।

শিবদাস বাবু যে তাহার কথায় কমনীয়কে দেখাইয়া তাহার আদর্শ হইতে বলিতেন, ইহা যথার্থই জ্যোতিশ ও তাহার বন্ধুবর্গের নিকট অত্যন্ত জ্বালাকর ছিল। কমনীয়কে মদ্যপানে অভ্যস্ত করিয়া তাই জ্যোতিশ যথার্থ বিজয়ীর গর্ব্ব হৃদয়ে অনুভব করিল।

সেদিন সন্ধ্যা বেলায় সে সবে বৈঠকখানার পথে পা বাড়াইয়াছে মাত্র, সেই সময় শিবদাস বাবু আসিয়া তাহাকে পাকড়া করিলেন। আজ দুইদিন তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য তিনি হাঁটিতেছেন, কিন্তু জ্যোতিশ সময় নাই বলিয়া তাঁহাকে হাঁকাইয়া দিয়াছে। প্রবীণ-বৃদ্ধ শিবদাস বাবু ইহাতে অপমান জ্ঞান করিতে পারেন নাই, কারণ সম্মুখে তাঁহার কর্ত্তব্য জ্বলন্ত জাগিয়া ছিল। যেমন করিয়াই হউক, জ্যোতিশের সহিত দেখা তাঁহাকে করিতেই হইবে।

বৃদ্ধকে দেখিয়াই জ্যোতিশ ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিল।

সে বেশ বুঝিল এবার তিনি আবার কতকগুলা উপদেশ ছড়াইয়া দিবার জন্যই তাহাকে ধরিয়াছেন। সে উপদেশগুলি যে উলুবনে মুক্তা ছড়ানোর মতই হইবে তাহা ভাবিয়া তাহার একটু হাসি আসিল।

শিবদাস বাবু বলিলেন, "কাল হ'তে তোমার কাছে আসছি জ্যোতিশ,কিন্তু তোমার কাজের জন্যে সময় নিতান্ত অল্প হয়েছে জেনে আজ আর আসি নি। এইখান দিয়েই তুমি তোমার বৈঠকখানায় যাবে জেনে দাঁড়িয়ে আছি। একটা কথা তোমায় অবশ্য শুনতে হবে, অত্যন্ত দরকারী কথা এটা।"

জ্যোতিশ যথাসাধ্য শান্ত ভাব দেখাইয়া বলিল "বলুন।"

শিবদাস বাবু বলিলেন, "তোমার একটা বন্ধু একটী মেয়েকে যা' পত্র লিখেছে—"

ত্রস্ত ভাবে জ্যোতিশ বলিয়া উঠিল, "ও সব কথা আমায় বলছেন কেন ?"

দৃঢ় কণ্ঠে শিবদাস বাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, তোমায় বলাই আমার দরকার। তোমার বন্ধু, তুমি যতটা তার সম্বন্ধে জানো, আমরা ততটা জানি নে। সে কে ? বিদেশী একটা যুবক তোমার বিশ্বপাত্র; সে তোমার বন্ধু বলে তোমার কাছে রেহাই পেতে পারে, অন্যের কাছে তা' পেতে পারে না, তা জানো ?"

জ্যোতিশ কঠিন স্বরে বলিল, "আপনি মিথ্যা কথা বলছেন।"

"আমি মিথ্যা কথা বলছি ?"

শিবদাস বাবুর চোখ লাল হইয়া উঠিল। এত বড় কথা কেহ কোন দিন তাঁহাকে বলিতে সাহস করে নাই।

জ্যোতিশ নিজের কথা সামলাইয়া বলিল, "না না, আপনিই যে বলছেন এমন কথা আমি বলছিনে। আমি বলছি আপনি মিথ্যা অভিযোগ শুনেছেন। আমার বন্ধু কেউ যে এমন কাজ করতে পারে, কোন ভদ্র কুলমহিলাকে এমন ভাবে পত্র দিতে পারে তা' আমি বিশ্বাস করি নে। আমার বন্ধুরা মাতাল, চরিত্রহীন, কিন্তু কুলমহিলার পানে তারা চাইতে পারে না।"

তাহার বন্ধুপ্রীতি শিবদাস বাবুর গায়ে আগুন ঢালিয়া দিল; তিনি একটু কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাঁ, তোমার বন্ধুরা যে প্রকৃতির লোক, তা আমি বেশ জানি। তোমার বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র কমনীয় ছাড়া আর সব বদমায়েস, সব খারাপ।"

"কমনীয় ?" জ্যোতিশ হাসিল। "তাকে আপনি খুব ভাল দেখেছেন ? দেখুন গিয়ে, বৈঠকে সেই বসেছে আগে ডিকাণ্টার হাতে নিয়ে।"

দমিয়া গিয়া শিবদাস বাবু বলিলেন, "কমনীয়" ?

বিদ্রূপের স্বরে জ্যোতিশ বলিল, "হ্যাঁ, ডাক্তার কমনীয়।"

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া শিবদাস বাবু সরিয়া গেলেন। "যাও জ্যোতিশ, তোমায় আর কিছু বলতে আসব না। তুমি নিজে নষ্ট হবে হও, পরকে নষ্ট করবে কর, দৃষ্টি রেখো যেন কুলমহিলা তোমাদের দ্বারা লাঞ্ছিত না হন। মাতৃশক্তিকে মায়ের পবিত্র আসনই দিয়ো, নরকে টেনে এনো না।"

জ্যোতিশ যখন বৈঠকখানায় আসিয়া পৌঁছাইল, তখন গৃহখানি আলোকে উজ্জ্বল। মেঝেয় ঢালা বিছানা, তাহারি উপর বন্ধুবর্গ কেহ শুইয়া কেহ বসিয়া। কমনীয় একপাশে হার্মোনিয়াম লইয়া বসিয়াছে, তাহার চোখ বেশ লাল হইয়া উঠিয়াছে, প্রাণে আনন্দের ফোয়ারা উঠিয়াছে। একটী বন্ধু বাঁয়া তবলা লইয়া বসিয়াছে, একজন ফ্লুটে সুর দিয়াছে। আসরটা তখন সরগরমই হইয়া উঠিয়াছে।

জ্যোতিশকে দেখিয়া সকলেই সাদরে অভ্যর্থনা করিল। জ্যোতিশ বসিয়া বলিল, "আসতে কি পারা যায় ? ম্যানেজার বুড়ো পথে পাকড়া করে' ধরেছে। কে নাকি কোন্ মেয়েকে পত্র লিখেছে তার নালিশ হ'ল আমার কাছে। আমি স্পষ্ট উড়িয়ে দিলুম। তারপর বুড়ো বলে কি, কমনীয় কিছু খায় না, খুব ভাল ছেলে—"

কমনীয় নিজ মনে হার্মোনিয়াম বাজাইয়া যাইতেছিল, একটু হাসিয়া বলিল, বটে ?

জ্যোতিশ বলিল, "আমিও খুব কতক গুলো কথা শুনিয়ে দিয়েছি।

কমনীয় চুপ করিয়া গেল। একবার ঝাঁ করিয়া

সংজ্ঞাটা তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু মুহূর্ত্তেই তাহা যে কোন্ খানে আবার ডুবিয়া গেল, তাহার ঠিক পাওয়া দুষ্কর।

পরদিন গ্রাম্য নদী যমুনাতে জ্যোতিশ বন্ধুগুলিকে লইয়া স্নানে গিয়াছিল। এ সময়টায় ঘাটে কেহ থাকিত না, গ্রাম্য বালারা এই নব্য জমীদারের ভয়ে সকাল সকাল ঘাটের কাজ সারিয়া লইত।

সে দিন ঘাটে একটী মেয়ে ছিল। একরাশি বিছানা লইয়া সে ঘাটে কাচিতে নামিয়াছিল। জ্যোতিশের প্রজা জনৈক দরিদ্র স্বর্ণকারের স্ত্রী। স্বামী রোগাক্রান্ত, সকাল হইতে তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতে তাহার এত বেলা হইয়া গিয়াছে।

গরীবের ঘরের মেয়ে সে, দরিদ্র স্বামীর স্ত্রী, কোনও দিন অর্দ্ধাশনে কোনও দিন অনশনে তাহার দিন কাটিয়া যায়, তথাপি তাহার যেমন সৌন্দর্য্য, সে রূপ বড় লোকের ঘরেও প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

তাহার পরণে শত তালিযুক্ত বস্ত্র, তৈলাভাবে তাহার মাথার চুল রুক্ষ, সধবার চিহ্ন হাতে দুটি লাল শাঁখা।

অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া জ্যোতিশ প্রথমটা থতমত খাইয়া দাঁড়াইল। তাহার সহচরগণ যুবতীর পাশ ঘেঁসিয়া জলে গিয়া পড়িল।

যুবতী কাহারও পানে চাহিল না, নিজের মনে বিছানা গুলি কাচিতে লাগিল।

নিতাই নামক একটী বন্ধু জ্যোতিশের গা ঠেলিয়া বলিল, "রত্নটীকে চেনো না কি?"

জ্যোতিশ বলিল, "চিনি। যখন এর বিয়ে হয়েছিল তখন দেখেছিলুম আমাদের রামদুলালের স্ত্রী সতী। রামদুলাল আগে আমার খানসামা ছিল। শুনেছি বেচারা রোগে পড়েছে। একদিন দেখতে যাব ভাবি, তা আর হয়েই ওঠে না।"

মতি চোখ টিপিয়া বলিল, "যখন সে তোমার খানসামা ছিল একদিন, আজ যখন রোগে পড়েছে, তখন অবশ্য তোমার দুবেলা সে খবরটা নেওয়া উচিত। তুমি আমায় একটিন দিও হে, আমি সারা দিন রাত তার বাড়ী থাক্‌ব।"

কমনীয় এ সব বদ ইয়ারকি মোটেই পছন্দ করে নাই। সে বিরক্ত ভাবে সরিয়া গিয়া একপাশে বসিয়া দাঁত মাজিতে লাগিল। কাল রাত্রে নেশা হইয়াছিল প্রচুর, আজ এখনও তাহার মাথা ঝিম ঝিম করিতেছিল। কোন মতে গোটাকত ডুব দিয়া গিয়া আহার শেষে খানিকটা ঘুমাইতে পারিলে সে এখন বাঁচিয়া যায়।

হঠাৎ একটা আর্ত্ত কণ্ঠ শুনিতে পাইয়া সে মুখ ফিরাইয়া দেখিল যুবতী ত্রস্তভাবে পলায়ন করিতে চায়, জ্যোতিশের নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু নিতাই তাহার সামনে দাঁড়াইয়া প্রলাবিত করে কি রসিকতা করিয়া হাসিয়া কুটি কুটি হইতেছে।

কি বীভৎস দৃশ্য! কমনীয়ের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল, সে চাহিয়া দেখিল সকলেরই মুখে হাসির রেখা। এই সতী নারীর ব্যাকুল বাণী কাহারও কর্ণগোচর হইতেছে না।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে সতী বলিতেছিল, "আমায় মাপ করুন, আমার পথ ছেড়ে দিন; আপনারা আমার বাপ, আমার ছেলে। মনে করুন আমি আপনাদের মা, আপনাদের মেয়ে। পথ ছেড়ে দিন, আমার রুগ্ন স্বামী মরে পড়ে আছে, তার মুখে জল দিতে আমি বই আর কেউ নেই। সে এখনও কিছু খেতে পায় নি। সরুন, আমার পথ ছাড়ুন।"

হেম পশ্চাৎ হইতে বিদ্রূপের সুরে বলিল, "সে রুগ্ন স্বামীকে আর দরকার কি? এই তো ভিক্ষে করে বেড়াও, পরণে কাপড় নেই, মাথায় তেল নেই, পেটে খেতে পাও না। জ্যোতিশ বাবুর নেকনজরে পড়েছ, সরাসর বৈঠকখানায় চল, রাণীর মত সুখে থাকবে। বিছানা গুলো বরং আমি নিয়ে ফেলে আসছি তোমাদের বাড়ী, তুমি যাও।"

সতী কাঁদিয়া উঠিল, "কেন আপনারা ও সব কথা আমায় বলছেন? আমি ভিক্ষে করে যা আনি তার সমান আর কিছু নেই তা জানেন? আমার পরণের এই ছেঁড়া কাপড়ই আমার প্রার্থনায়, আমার রুগ্ন স্বামীর সেবায় আমি জীবন কাটিয়ে দেব, সরুন, আমি যাই।"

জ্যোতিশ এবার কথা কহিল, বলিল, "তোমার স্বামী মরে গেলে তুমি কি করবে সতী?"

সতী চোখের জল মুছিয়া দাপ্ত কণ্ঠে বলিল, "তাঁর স্মৃতি মনে রেখে তাঁর পূজো করে জীবন কাটাব।"

নিতাই তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিবা মাত্র সে আর্ত্তনাদ করিয়া তাহাকে দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া নিচে লাফাইয়া পড়িল

কি সুন্দর স্বামীভক্তি! কমনীয়ের হৃদয় এ দৃশ্যে আর্দ্র হইয়া গেল, তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। হায় নারীকুল-কলঙ্কিনী শুভ্রা, কি কুরাপনের কালিমায় কমনীয়ের হৃদয়খানা ভরাইয়া দিয়া গিয়াছিলে তুমি; কমনীয় ভাবে নাই কখনও সে নারীকে আবার মহান্ উন্নত হৃদয়া দেখিতে পাইবে। যে কঠোরতা দিয়া সে হৃদয়কে নির্ম্মম করিয়া গড়িয়াছিল, সে কঠোরতা এই নারীর পতিভক্তি দেখিয়া গলিয়া গেল। কমনীয় জানিল সব রমণীই শুভ্রা নহে।

এবার জ্যোতিশ নিজে অগ্রসর হইতেছিল, সতী নিজেকে চারিদিক হইতে আক্রান্ত দেখিয়া আর্ত্ত কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল। কমনীয়ের রক্ত গরম হইয়া উঠিল, সে এক লম্ফে সকলের মাঝখানে গিয়া পড়িয়া কঠোর তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "দাঁড়াও, এগিয়ো না বলছি।"

তাহার আরক্ত চোখ দেখিয়া জ্যোতিশ পিছাইয়া পড়িল। সতী আনন্দে কাঁদিয়া নির্ভরশীলা কন্যা যেমন পিতার হাত চাপিয়া ধরে, তেমনি করিয়া তাহার বলিষ্ঠ বাহুখানা চাপিয়া ধরিল।

কমনীয় জ্যোতিশের পানে চাহিয়া তীব্র কণ্ঠে বলিল, "জ্যোতিশ বাবু, সকল সময়ে এক ধারা চলে না। তুমি জমিদার, তোমার আশ্রয়ে যারা বাস করে তাদের দিকে চাওয়া তোমার উচিত। অসতী যে, তাকে তুমি প্রলুব্ধ করতে পার, কিন্তু সতীকে পার না। ভবিষ্যতে বুঝে চলো। মায়ের জাতকে বাঁচিয়ে তোমরা যা' খুসী তাই করিতে পার, তাতে কারও আপত্তি নেই।"

সতীর পানে চাহিয়া বলিল, "তুমি আমার সঙ্গে এস মা, চল তোমায় তোমার স্বামীর কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

পতিত বিছানা গুলা সযত্নে কুড়াইয়া লইয়া সতী চলিল। রুদ্ধকণ্ঠে সজল নয়নে বলিল, "তুমি কে বাবা?"

কমনীয় উত্তর করিল, "তুমি যখন আমার মা, তখন আমায় তোমার ছেলে বলেই জেনে নাও।"

(ক্রমশঃ)

কর্ম্মকার জাতি সম্বন্ধে কিম্বদন্তী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস, এম-এ, বি-এল]

জনার্দ্দন কর্ম্মকার।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী কর্ম্মকারগণ যে কেবল ঢাকায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা নহে। মুর্শিদাবাদ ও অন্যান্য কয়েকটি জেলার কর্ম্মকারগণের মধ্যে শ্রেণীবিভাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে তাঁহারা বঙ্গদেশের একাধিক জেলায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তত্রত্য সুপ্রাচীন কর্ম্মকার শ্রেণীর সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে যে, বাঙ্গালার বাহিরে যাহারা লৌহ শিল্প দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে, তাহারা সকলেই অনার্য্য লোহার জাতি। রিজলী সাহেব কিন্তু একথা বলেন না "In Bengal they rank among the Navasakhas and in Behar they belong to the group of castes from whose hands Brahmins can take water. Except in Singbhum and Sonthal Perganas where fowls are deemed lawful food they observe the same rule regarding diet as higher castes." "Hindu Castes and Sects" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থেও জাতিতত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য রিজলী সাহেবের এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ কামান জাঁহাকোষা নির্ম্মাতা জনার্দ্দন কর্ম্মকার বঙ্গদেশের সুপ্রাচীন কর্ম্মকার শ্রেণীর বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া আমার মনে হয়, কারণ তাঁহার পদবী "কর্ম্মকার"। এত বড় শিল্পী যদি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী কর্ম্মকার হইতেন তাহা হইলে তিনি সম্রাটের নামযুক্ত যে ভারতবিখ্যাত কামান প্রস্তুত করিয়াছিলেন তজ্জন্য "রায়" কিম্বা অন্য কোনও উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি প্রণীত "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে" লিখিত হইয়াছে,—"শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত পাঁচগাঁর কর্ম্মকারগণ বহু পূর্ব্ব হইতেই লৌহশিল্পে বঙ্গবিখ্যাত হইয়াছিল, প্রসিদ্ধ জাঁহাকোষা তোপ ইহাঁদের কীর্ত্তি। কাঠরার দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে এক অশ্বত্থ তরুর সংলগ্ন কাণ্ড মধ্যে এই প্রসিদ্ধ তোপ অদ্যাপি অবস্থিত রহিয়াছে। * * এই কামান নির্ম্মাণ কথায় জনার্দ্দনের বংশ প্রসিদ্ধি লাভ করে, এবং কুলে জন্মকারী জনার্দ্দনের নামে তাঁহার বংশ "জনাইর গোষ্ঠী" নামে খ্যাত হয় আজ পর্য্যন্ত "জনাইর গোষ্ঠী"র লোকেরা জাহান কোষার উল্লেখে গৌরব করিয়া থাকে।" 'জনাইর গোষ্ঠী" ও ঢাকার রায় বংশ ছাড়া অস্ত্র শস্ত্রাদি নির্ম্মাণের জন্য বর্দ্ধমানের রায় বংশও বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ। বর্দ্ধমানের রায় বংশের প্রতিষ্ঠাতা রায় উপাধি ও জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন।

পুরাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত বহু সহস্র বৎসর যাবত কর্ম্মকারগণ হিন্দুসমাজের বিরাট ইতিহাসে এই জাতির মধ্যে যে কত শ্রেণী, কত সমাজ, কত মেল, কত বংশের অভ্যুদয় ও বিলোপ দেখিয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? বঙ্গদেশে ইংরাজ রাজত্বের প্রথমাবস্থায় যখন বারমিংহাম ও সেফিল্ডের ধাতুশিল্পিরা এদেশে বিদেশী লৌহজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করিতে আরম্ভ করে নাই, সে সময়ে কর্ম্মকার জাতির মধ্যে যত বিভিন্ন নামধারী শ্রেণী ছিল তাহার এক-চতুর্থাংশও এক্ষণে নাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার লৌহজাত দ্রব্যাদির নামে সে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড শ্রেণী গঠিত হইত। কোদাল-গড়া, ছুঁচগড়া, নিক্তি-গড়া, শিকল-গড়া, এই প্রকার কত বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্প-সঙ্ঘ (trade guilds) যে সে সময়ে স্বাধীন ব্যবসা অবলম্বন করিয়া সুখে কালযাপন করিতেন তাহার সংখ্যা হয় না। বর্ত্তমান সময় তাঁহাদের কথা কিম্বদন্তীর সামিল হইয়া গিয়াছে। ঐ সকল শিল্প ক্রমে ক্রমে লোপ পাইল বটে, কিন্তু তাহাদের স্মৃতি শ্রেণীবিভাগের তালিকায় কিছু দিনের জন্য রহিয়া গেল। আমরা শিল্পজাত দ্রব্যের সহিত আমাদের শিল্পবিদ্যা ও বংশগত শিল্পনৈপুণ্য হারাইয়া নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বসিয়া কর্ম্মকার সমাজে কে ছোট, কে বড়, এই তর্কে মত্ত হইয়া পড়িলাম। বিদেশী ধাতুশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় লুপ্ত কর্ম্মকার শিল্পের কিরূপে পুনরুন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিবার অবসর পাইলাম না। জাতীয় শিল্পকে আশ্রয় করিয়াই যে আমরা এক সময়ে বঙ্গীয় সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলাম, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। রাষ্ট্রবিপ্লব, সামাজিক বিপ্লব ও শিল্প-জগতের পরিবর্ত্তিত অবস্থা যে কর্ম্মকার জাতির মধ্যে শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে একাধিক কিম্বদন্তীর সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমি এস্থলে উল্লেখ করিব।

মঘে কর্ম্মকার।

ষোড়শ শতাব্দীতে মগ ও পর্ত্তুগীজদিগের অত্যাচারে পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছিল। আনন্দনাথ রায় প্রণীত "ফরিদপুরের ইতিহাসে" লিখিত হইয়াছে,—"তৎসময়ে মগদিগকে এরূপ নরপিশাচ বলিয়া সাধারণের ধারণা হইয়াছিল যে, তাহারা কোন পল্লীতে প্রবেশ করিলেই তত্রত্য অধিবাসীরা অন্ত্যস্থানীয় লোকদিগের চক্ষে জাতিভ্রষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। এই কারণে সন্দীপ ও দক্ষিণ সাহাবাজপুরবাসী শূদ্র ও নরশুন্দরেরা, ভিন্নদেশের হিন্দুর জল স্পর্শ করিতে পারে না। পূর্ব্ববঙ্গে এইরূপ মঘে-তিলি, মঘে-কর্ম্মকার, মঘে-কুমার প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে, যাহারা অন্য সম্প্রদায়ের সহিত কোনওরূপে মিশিতে পারে না।" সামাজিক অবিচার ও কুসংস্কার কিরূপে কিম্বদন্তীকে জাগাইয়া রাখিয়া জাতিবিশেষের দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন নিরপরাধ কতকগুলি লোককে পাতিত করিয়া রাখিতে পারে, উল্লিখিত ঐতিহাসিক ব্যাপারটি তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত।

সপ্তগ্রাম।

এক্ষণে আমি বঙ্গদেশে প্রাচীনতম কর্ম্মকার সমাজ

সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব। অম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রণীত "হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ়" নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে,—"শাস্ত্রে আছে, প্রিয়ব্রত রাজার সাত পুত্র—অগ্নিধ্র, মেধাতিথি, বপুষ্মান, জ্যোতিষ্মান, দ্যুতিমান, সবল ও ভব্য। পুরাণবিশেষে এই সাতটীর কোন কোন নামে প্রকারান্তর আছে। তাঁহারা গৃহাশ্রমী না হইয়া নিভৃত নির্জ্জন গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে তপঃ সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। * * অনুমান হয় যখন বলিরাজ পুত্র সুহ্ম অসভ্য রাঢ় জাতীয়ের দেশে সুহ্ম নামে রাজ্য সংস্থাপন করেন, সেই সময়ে তিনি এই সপ্তর্ষি সন্নিবিষ্ট পুণ্যভূমিকে আপনার রাজধানীর উপযুক্ত বোধে ইহাতেই আপনি অবস্থিত করেন, এবং সপ্তর্ষির সম্মানার্থে ইহার সপ্তগ্রাম নাম রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রবোধ চন্দ্রোদয়ের দম্ভবাক্যে রাঢ়পুরীকে অত্যাশ্চর্য্যশালিনী বলা হইয়াছে, তাহা সপ্তগ্রাম বই অন্য কোন নগরকে বুঝায় না। * * খৃষ্টীয় শকের প্রথম শতাব্দীতে প্লীনি লিখিয়া গিয়াছেন – That the ships near the Godaveri sailed from thence to Cape Palemerus, thence to Tentigale opposite Falta, thence to Tribeni –Dr. Crafford's Hugli. * * সেকালে যেখানে সপ্তর্ষি তপস্যা করিতেন, সেখানে এখন বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়িয়া, পামারপাড়া, কৃষ্ণপুর, শিবপুর, দেবানন্দপুর, ত্রিশবিঘা প্রভৃতি গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। রেভঃ লং সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন—Many years ago Satgaon the Royal Emporium of Bengal from the time of Pliny down to the arrival of the Portuguese in this country, has now scarcely a memorial of its greatness left. অন্যতম পাশ্চাত্য প্রত্নতাত্ত্বিক উইলফোর্ড লিখিয়াছেন—It is a famous place of worship and was formerly the residence of the Kings of the country and said to have been a city of immense size so as to have swallowed one hundred villages. * * মুসলমান রাজত্বেও সপ্তগ্রামের সুখ সমৃদ্ধি ছিল। কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন—

সপ্তগ্রামের বণিক্ কোথায় না যায়।
ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়॥
তীর্থ মধ্যে পুণ্যতীর্থ ক্ষিতি অনুপাম।
সপ্তর্ষির শাসনে বলায় সপ্তগ্রাম॥

"কবি বিপ্রদাস পিপলাই ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে রচিত মনসামঙ্গলে সপ্তগ্রামের পরিচয় দিয়াছেন—

ছত্রিশ আশ্রমে লোক, নাহি কোন দুঃখ শোক,
আনন্দে বঞ্চয়ে নিরন্তর।
বৈসে যত দ্বিজগণ, সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ,
তেজোময় যেন দিবাকর॥
সর্ব্বতত্ত্ব জানে মর্ম্মে, বিশারদ গুরু ধর্ম্মে,
জ্ঞান গুরু বেদের শোধব।
পুরুষ মদন যেন, রমণী সাবিত্রী হেন,
আভরণ সব স্বর্ণময়।
তার রূপ গুণ যত, তাহা বা বর্ণিব কত,
হেরিতে নিমিষ বিস্ময়॥
অভিনব সুরপুরী, দেখি সব সারি সারি
প্রতি ঘরে কনকের ঝারা।
নানা রত্ন অবিশাল, জ্যোতির্ম্ময় কাচ চাল,
রঙ্গে মুক্তা প্রলম্বিত ঝারা॥
মসিদ মোকাম ঘরে, সেলাম রাজার করে,
ফয়তা করয়ে নিত্য লোকে।
বন্দিয়া মনসাদেবী, দ্বিজ বিপ্রদাস কবি,
উদ্ধারিয়া ভকত সেবকে॥

"কবি কৃষ্ণরামের ষষ্ঠীমঙ্গলে সপ্তগ্রামের পরিচয়—

সপ্তগ্রামে যে ধরণী তার নাহি তুল।
চালে চালে বৈসে লোক ভাগীরথী কূল॥
নিরবধি যজ্ঞ দান পুণ্যবান লোক।
অকাল মরণ নাহি, নাহি দুঃখ শোক॥
শক্রজিৎ রাজার নাম, তার অধিকারী।
বিচরিয়ে যত গুণ বলিবারে নারি॥
বিমল যশের শশী প্রতাপে তপন।
জিনিয়া অমরা পুরী তাহার ভবন॥"

বৈষ্ণব কাব্য-সাহিত্যেও সপ্তগ্রামের উল্লেখ আছে।

"প্রাচীন রোমকেরা সপ্তগ্রামকে গাঙ্গেস রেজিয়া বলিতেন।" * * * "মুকুন্দরামের সময়ে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কালেও সপ্তগ্রাম সমৃদ্ধ স্থান ছিল। ইহার পর কিঞ্চিদূর্দ্ধ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে সরস্বতীর স্রোত মন্দীভূত হওয়াতে বঙ্গদেশের প্রধান বন্দর সপ্তগ্রাম হইতে পর্ত্তুগীজগণ কর্ত্তৃক হুগলীতে স্থানান্তরিত হয়।" খানাকুল কৃষ্ণনগর প্রভৃতি সমাজের ন্যায় সপ্তগ্রামে সমাজ ছিল। সেই সমাজের নামে বঙ্গদেশের অনেকগুলি জাতির সমাজ আজ পর্য্যন্ত পরিচিত। মোগল রাজত্বে তুমার জমা নামক রাজস্বের হিসাবে বঙ্গদেশকে যখন সাতগাঁ, সোনারগাঁ প্রভৃতি সরকারে বিভক্ত করা হয়, তখন প্রাচীন সপ্তগ্রামের নামে-ই সাতগাঁ সরকারের নামকরণ হইয়াছিল। এই সাতগাঁ সরকারের অধীন স্থানগুলি বর্ত্তমান হুগলী, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলার অনেক গ্রামের কর্ম্মকারগণ নিজেদেরকে সপ্তগ্রাম সমাজের কর্ম্মকার বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ত্রিবেণীর সন্নিকট প্রাচীন সপ্তগ্রাম ধ্বংস হওয়াতে তত্রত্য সমাজের কর্ম্মকারগণ হুগলী, ও ২৪-পরগণা জেলা এবং কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। এক্ষণে হুগলী, ২৪-পরগণা ও বর্দ্ধমান জেলার কর্ম্মকারগণ এমন মিশিয়া গিয়াছেন যে, সপ্তগ্রাম সমাজ বলিতে বর্ত্তমান সময়ে উক্ত রূপে নূতন গঠিত সপ্তগ্রাম সমাজ বুঝায়।

হালিসহর।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাসের সহিত কর্ম্মকার জাতির সামাজিক ইতিহাস মিলাইয়া পাঠ করিলে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি কোন্ যুগে, কি কারণে ও কি প্রকার ঘটনাচক্রে পড়িয়া কর্ম্মকার জাতি একতা হারাইয়া অনেকতার বশীভূত হইয়াছে, আবার অনেকতা কিরূপে নৈকট্যের ফলে একতায় পরিণত হইয়াছে। কিম্বদন্তী যেখানে আমাদিগকে কর্ম্মকার জাতিরূপ মহীরুহের মূলে পৌঁছিবার রাস্তায় পথ-প্রদর্শকের ন্যায় সহায়তা করে না, সেখানে ইতিহাস আমাদিগকে যথার্থ বন্ধুর ন্যায় সোজা রাস্তা দেখাইয়া দেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি এস্থলে হালিসহর সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিব। হালিসহর যে পূর্ব্বে গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্ত্তী প্রদেশে প্রাচীন সপ্তগ্রামের উপকণ্ঠে অবস্থিত ছিল ও পরে গঙ্গার স্রোতোপথ পরিবর্ত্তনের ফলে পূর্ব্ব পারে অবস্থিত হইয়াছিল, সে কথা হুগলীর গেজেটিয়ারে স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "The greater part of the suburbs (of Saptagram), which had been cut off from the remainder by the river channel shifting and now lay on the east bank were formed into a separate *mahal* called Haveli Shahr (now corrupted into Halisahar of the 24-Perganas)" গঙ্গার গতিপথের পরিবর্ত্তনে অনেক স্থান ইহার পূর্ব্ব তীর হইতে পশ্চিম তীরে ও পশ্চিম তীর হইতে পূর্ব্ব তীরে সরিয়া গিয়াছে। ইতিহাসের প্রমাণ হইতে তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি যে, হালিসহরের ও সপ্তগ্রামের কর্ম্মকারগণ মূলে এক। অজ্ঞতা ও কুসংস্কার স্বজনগণের মধ্যে যে বিরোধ ঘটাইয়া রাখিয়াছে তাহা হইতে একাধিক কিম্বদন্তীর সৃষ্টি হইয়াছে। প্রবাদ এই যে, পূর্ব্বে হালিসহর সপ্তগ্রাম হইতে প্রাকৃতিক উৎপাতে বিচ্ছিন্ন হইলেও এই দুইটী স্থানের কর্ম্মকারগণ বহুকাল ধরিয়া একটি সমাজভুক্ত ছিলেন। কোনও অজ্ঞাত কারণে তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ হওয়াতে দুইটী দল সৃষ্ট হইয়াছিল। সুখের বিষয়, বর্ত্তমান সময়ে এই দুইটী সম্প্রদায় আবার ধীরে ধীরে মিশিয়া যাইতেছে।

কর্ম্মকার যাতক।

কিম্বদন্তী, কর্ম্মকার জাতির বংশবিশেষের মধ্যে প্রচলিত নৃশংস প্রথা লুপ্ত করিয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে, এমন কথাও শুনা যায়। অম্বিকাচরণ গুপ্ত-প্রণীত উল্লিখিত "হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ়" নামক গ্রন্থে হরিপাল গ্রামের বিশালাক্ষী বা রুক্মিণী নামক দেবী মূর্ত্তির পরিচয়ে লিখিত হইয়াছে,—"পূর্ব্বে তাঁহার নিকট নরবলি হইত। তাহা বন্ধ হইবার সম্বন্ধেও চিরাগত কিম্বদন্তী আছে। বর্ত্তমান পুরোহিতের প্রপিতামহ মহাদেব চক্রবর্ত্তী একদিন দেবীর পূজা করিতে যাইতে ছিলেন, এমন সময় তাঁহার শিশুপুত্র তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিলে তিনি তাহাকে

নিষেধ করিয়া চলিয়া যান। শিশু পুত্র যে তাঁহাকে অনুসরণ করিল তাহা তিনি জানিলেন না। মহাদেব দেবীর পূজা করিলেন, নিত্য যেমন একটি করিয়া শিশু পুত্র বলির জন্য আসে, সেদিনও তেমনি আসিল, ঘাতক কর্ম্মকার প্রতিদিনের ন্যায় এদিনও শিশুকে স্নান করাইয়া আনিয়া পুরোহিতকে দিলে তিনি উৎসর্গ করিয়া দিলেন এবং কর্ম্মকার খড়্গাঘাতে তাহার মস্তক ছেদন করিল। পুরোহিত ব্রাহ্মণ বাড়ী আসিয়া পত্নীর নিকট পুত্রের অনুসন্ধান করায় জানিলেন, পুত্র তাঁহার সঙ্গেই গিয়াছিল। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী প্রমাদ গণিলেন, উভয়েই দেবীর নিকট গিয়া কাঁদিতে লাগিলেন,—"মা আমাদের পুত্র আনিয়া দাও।" পুত্র কর্ম্মকার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ-দম্পতির কাতর ক্রন্দনে দেবী প্রসন্ন হইয়া দৈববাণীতে বলিলেন,—"বালক হাটচালায় খেলা করিতেছে, সেখানে খুঁজিলেই পাইবে। অতঃপর আর এখানে নরবলি হইবে না।" ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী হাটে আসিয়া তাঁহাদের পুত্রকে দেখিতে পাইয়া কোলে লইলেন, সেই অবধি নরবলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহা শত বর্ষের অধিক কালের কথা নহে।"

ঢাকেশ্বরী।

বাঙ্গলার ইতিহাসে কর্ম্মকারগণের শিল্পকীর্ত্তি সম্বন্ধে যদি একটি অধ্যায় লিখিত হয় তাহা হইলে সৎ শিল্পের বিষয়ে কিম্বদন্তীমূলক কয়েকটি ঘটনার কথাও তাহাতে স্থান পাইবে। মেদিনীপুর জেলায় বগড়ী নামক গ্রামে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণজীউর ধাতুময় যুগলমূর্ত্তি কৃষ্ণদাস কর্ম্মকার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হওয়ার সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে তদ্বিষয়ে আমি ইতিপূর্ব্বে "কর্ম্মকার-বন্ধু" নামক মাসিক পত্রিকায় বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। এস্থলে আমি তাহার পুনরুক্তি না করিয়া ঢাকেশ্বরী সম্বন্ধে জনশ্রুতির কথা উল্লেখ করিব। "বারভূঞা" নামক গ্রন্থে আনন্দনাথ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন, ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ দেবী ঢাকেশ্বরী সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, মানসিংহ কেদার রায়কে পরাজিত করিয়া তাঁহার গৃহদেবী শিলাময়ীকে লইয়া ঢাকায় প্রত্যাগমন করেন। "পরে তত্রত্য কর্ম্মকারগণকে ঠিক ঐ মূর্ত্তির অনুরূপ হিরন্ময় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ জন্য নিয়োগ করিয়া তাহারা পাছে কোনরূপে দ্রব্যের অসদ্ব্যবহার বা অপহরণ করে এই জন্য সর্ব্বদা রক্ষিগণকে তত্ত্বতালাস লইতে নিযুক্ত করা হয়। কর্ম্মকারেরা নিয়ত শিলাময়ীর নিকট থাকিয়া অন্য প্রতিমা নির্ম্মাণ করে। যে দিবস কার্য্য শেষ হয়, সে দিবস তাহারা রাজসদনে উপস্থিত হইয়া বলে, "মহারাজ আমরা একবার এই নবনির্ম্মিত দেবীমূর্ত্তিকে পুষ্করিণী হইতে স্নান করাইয়া আনিতে ইচ্ছা করি।" রাজা তাহাদের কথায় স্বীকৃত হইলে, নির্ম্মাতারা অলক্ষিতে তাহাদের নির্ম্মিত মূর্ত্তিটীকে দেবীর আসনোপরি রাখিয়া যথার্থ দেবীমূর্ত্তিকে মাজিয়া ঘষিয়া স্নান করাইয়া লইয়া আইসে, পরে উভয় মূর্ত্তি একত্র হইলে কোন্‌টি বা পূর্ব্ব নির্ম্মিত এবং কোন্‌টি বা নবনির্ম্মিত কেহ তাহা নির্ব্বাচন করিতে পারিলেন না। পরে কারিকরের এই রহস্যজনক ব্যাপার প্রকাশ করিয়া দিলে মানসিংহ তাহাদিগকে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান করিয়া চাঁদরায়ের দেবীকে জয়পুরে লইয়া যান এবং অপর মূর্ত্তিটী ঢাকাতে সংস্থাপিত করেন। উহাই ঢাকেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ উভয় মূর্ত্তিই অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।"

ধর্ম্মরাজ ও কর্ম্মকার পূজারী।

কর্ম্মকার পূজারীর কথা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। বাঁকুড়া অঞ্চলে ধর্ম্মরাজ নামে একাধিক বিগ্রহের পূজা বহুকালাবধি প্রচলিত আছে। বাঁকুড়ার প্রাচীন রাজধানী বিষ্ণুপুরের শাঁখারিপাড়ার বৃদ্ধাক্ষ নামে ধর্ম্মরাজ ঠাকুর যে কতকাল আছেন তাহা বলা যায় না। চলিত ভাষায় বৃদ্ধাক্ষ বিগ্রহের নাম "বুড়ো ধর্ম্ম।" সিন্দুরলিপ্ত একখানি প্রস্তরে দুইটী ধাতুময় চক্ষু এই "বুড়ো ধর্ম্মে"র প্রতিকৃতি। ধর্ম্ম পণ্ডিত নামে এক কর্ম্মকার বংশ এই দেবতার পূজারী। চাউল ও চিনিতে ঠাকুরের নৈবেদ্য প্রস্তুত হয়। ব্রাহ্মণগণও এই প্রকার উপকরণ লইয়া গিয়া ঠাকুরের পূজার জন্য ধর্ম্মপণ্ডিতকে অর্পন করেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে অর্থাৎ প্রায় এগার শত বৎসরেরও পূর্ব্বে বিষ্ণুপুর রাজ বংশের যখন স্থাপনা হয় নাই, তখন হইতে ধর্ম্মরাজের পূজা প্রচলিত আছে। মানভূমের সুপ্রাচীন রাজবংশ ধর্ম্ম ঠাকুরকে যে সকল ভূসম্পত্তি দান করিয়া

ছিলেন তাহার মধ্যে কতক এখন পর্য্যন্ত উক্ত কর্ম্মকার পূজারীগণ ভোগদখল করিতেছেন। বাঁকুড়া জেলার ইঁদাস থানার অন্তর্গত বলশী মোকামে নবজীবন নামক যে বিগ্রহ একজন কর্ম্মকারের বাটীতে আছেন উক্ত কর্ম্মকারই তাঁহার পূজারী। এই বিগ্রহও প্রস্তরময় কিন্তু বিষ্ণুর প্রতিকৃতি। ধর্ম্মরাজ-পূজা সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কয়েকজন পণ্ডিত বলেন যে, ইহার নাম হইতে অনুমান করা যায় যে, বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের স্মৃতি এখনও জাগিয়া রহিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম শঙ্করাচার্য্যের যুগে ভারতের অপর সকল প্রদেশ হইতে লোপ পাইলেও বঙ্গদেশে ইহার প্রাধান্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময় পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। বর্ত্তমান সময়ে প্রত্নতত্ত্ব ক্ষেত্রে গবেষণার ফলে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, পাল ও সেন বংশীয় রাজাদের সময়েও বৌদ্ধধর্ম্মের যথেষ্ট প্রভাব বাঙ্গালায় ছিল। এখন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের আশ পাশে অর্থাৎ তিব্বত ও ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব মন্দীভূত হয় নাই। আদিশূরের সময়ে বৈদিক ধর্ম্মের পুনরুত্থান যখন বাঙ্গালা দেশে সূচিত হয় সে সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী বাঙ্গালীদের মধ্যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব দেখিয়া তিনি কণৌজ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ এদেশে আনয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আদিশূরের পূর্ব্বে বহু শতাব্দী যাবৎ বঙ্গদেশে বর্ণধর্ম্ম বলিয়া জিনিষটি সম্পূর্ণ না হউক প্রায় লোপ পাইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সেই জন্য বোধ হয় "শুদ্ধি তত্ত্বে" লিখিত হইয়াছিল,—"অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষু চ। তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥" তীর্থযাত্রা ব্যতিরেকে তখন বঙ্গদেশে গমন করিলে পাতিত্য জন্মিত। অনেকে সেই জন্য মনে করেন যে, বঙ্গদেশে অনার্য্যের বাস ছিল। আমার কিন্তু বোধ হয় যে বৌদ্ধধর্ম্ম বঙ্গদেশে বর্ণ ধর্ম্মকে দাবিয়া রাখিলে বৌদ্ধযুগে পৌরাণিক হিন্দু-ধর্ম্মের প্রাধান্য ভারতের যে সকল প্রদেশে ছিল, সেখানকার অধিবাসীরা বঙ্গদেশবাসীকে ঘৃণা করিত আর সেই কারণে "শুদ্ধি তত্ত্বে" উক্ত অনুশাসন লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণগণ সকলেই যে উপবীত ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন ইতিহাস একথা বলে না। বাঁকুড়া জেলায় চণ্ডীদাস যে বিশালাক্ষীর পূজা করিতেন সেই দেবীমূর্ত্তি ও অন্যান্য নবাবিষ্কৃত অনেক দেবীমূর্ত্তিতে ভাস্কর্য্যের যে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা হইতে পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে ঐ সকল বিগ্রহ বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ যুগে বাঙ্গালায় তান্ত্রিক শক্তি পূজার জন্ম সূচিত করিতেছে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব যখন বঙ্গদেশে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল, সেই সময়ে শিব ও শক্তি পূজার অধিকারী পূজারীগণের আবির্ভাব হয়। ধর্ম্মরাজের কর্ম্মকার পূজারী-দের পূর্ব্ব পুরুষগণ দ্বিজ শ্রেণীভুক্ত ছিলেন কি না তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন, কারণ বাঁকুড়া জেলায় এই শ্রেণীর বিগ্রহের পূজারীদের মধ্যে ধীবর ও অন্যান্য দ্বিজেতর জাতির নাম পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ব যদি কোনও সময়ে বৌদ্ধ বঙ্গে জাতিতত্ত্বের একটা মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারে তাহা হইলে এদেশের কর্ম্মকারগণ পৌরাণিক যুগে উপনীত হইতেন কি না তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্তের কথা উঠিতে পারে। বৌদ্ধ জাতকে কর্ম্মকারগণের জাতীয় ব্যবসার উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর মধ্যেও একজন কর্ম্মকার মহিলার নাম পাওয়া যায়। বর্ণ ধর্ম্মহীন বৌদ্ধ-বঙ্গে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ যে যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ক্ষীণালোকে কোন রকমে কালাতিপাত করিতেন তাহা সুনিশ্চিত। শিল্পাদি সমাজের কল্যাণকর কার্য্যে সেই সময়ে যাহারা ব্যাপৃত থাকিত তাহা-দের মধ্যে অনেকেই যে পূর্ব্ব পুরুষগণের বৃত্তি অবলম্বনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, এবং উপনীত-ভ্রষ্ট দ্বিজগণের কেহ কেহ যে শিল্পবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই অনুমান অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। সেই কারণে অদ্য হইতে কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে আবার যখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম মাথা তুলিয়া উঠিল সেই সময়ে বিভিন্ন বৃত্তির উপর স্থাপিত সমাজের বিভাগগুলি লইয়া এক একটি নূতন বর্ণের যে সৃষ্টি হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। তারপর আদিশূর বাঙ্গালার বহিঃপ্রদেশ হইতে আনীত বিদেশী হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণগণকে সমাজে প্রাধান্য প্রদান করেন। বঙ্গদেশের সুপ্রাচীন সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণকে রাজানুশাসন দ্বারা নবাগত শ্রেণীর নিম্নে বসান হয় নাই কি না। বাস্তবিক, বঙ্গদেশের রাজশক্তি যখনই বিদেশী লোকের সাহায্য লইয়াছে, তখনই

তাহাকে সমাজের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছে। কালের অপ্রতিহত গতি, কিন্তু রাজার শাসন, সমাজের বাঁধন মানে না। কণৌজী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আজ ষোল আনা বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছেন। কণৌজবাসী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিবে না; তাঁহাদিগের সহিত পুত্র কন্যার আদান-প্রদান করিবে না, এমন কি তাঁহাদিগকে নিজেদের তুলনায় সকল বিষয়ে হীন মনে করিয়া অবজ্ঞার সহিত "বাঙ্গালী" বলিয়া সম্বোধন করিবেন। বাঙ্গালী জাতির অপূর্ব্ব ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের অধিবাসীরা যুগে যুগে এদেশে আগমন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। কর্ম্মকার জাতির উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে কিম্বদন্তীর ভিতর এই জাতির পূর্ব্বাবস্থার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইতেও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাঁহারা বিভিন্ন যুগে দলে দলে বঙ্গদেশে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ বিশেষতঃ উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা রাষ্ট্রবিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব, সমাজবিপ্লব ও শিল্প বিপ্লবের পরিবর্ত্তিত অবস্থার মাঝে পড়িয়া কখন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া খণ্ড খণ্ড শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন, আবার কখন বা স্বভাবের নিয়মে, একটি অখণ্ড জাতিতে পরিণত হইবার চেষ্টা করিয়াছেন। শিব হইতে গঙ্গার ন্যায় কর্ম্মকারদের উৎপত্তি হইয়াছে। উৎপত্তির পর গঙ্গা যেমন বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ করিয়া বহু নদ নদীর জলে পরিপুষ্ট হইয়া, ভারতের বহুস্থানকে সিক্ত, উর্ব্বর পূত করিতে করিতে বঙ্গোপসাগরে মিশিয়া গিয়াছেন, কর্ম্মকার জাতিও সেইরূপ আর্য্যভূমির নানাদেশে নিজেদের শিল্প বিদ্যার নিদর্শন বহু সমাজের ইতিহাসে অঙ্কিত করিতে করিতে শেষে বঙ্গদেশে আসিয়া চিরকালের তরে বাঙ্গালী জাতিরূপ মহাসমুদ্রে মিশিয়া গিয়াছেন। নদী সকল যেমন এখন গঙ্গার স্রোতোপথে উজান বহিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের কলেবরে বিলীন হইতে পারে না, বঙ্গীয় সমাজের ব্রাহ্মণাদি জাতি সকলও সেইরূপ প্রত্নতত্ত্বের রাস্তায় পিছু হাঁটিয়া পুনরায় আর্য্যত্বে মিশিয়া যাওয়া অসম্ভব। প্রাকৃতিক নিয়মে জল সকলের পরিণতি যেমন সমুদ্রে, জাতি সকলের পরিণতি সেইরূপ মানবতায়। কিম্বদন্তীর আলোচনায় আমরা কর্ম্মকার জাতিকে এক হইতে বহু ও বহু হইতে এক, ভাঙ্গন-গড়নের এই অনন্ত লীলা যুগের পর যুগ ব্যাপৃত দেখিতে পাই। কিম্বদন্তী আমাদিগকে যুগ যুগান্তরের মিলিত কণ্ঠে কহিতেছে, "কর্ম্মকারগণ, তোমাদের আদি মধ্য অন্ত একটি অখণ্ড জাতীয়তাকে আশ্রয় করিয়াই পূর্ণ মানবতার আদর্শ সৃষ্টি করিতে পারে।" কিম্বদন্তীর যে ক্ষুদ্র প্রদীপটী জ্বালিয়া আজ আমি আপনাদের আরতি করিলাম তাহার আলোকে আকৃষ্ট হইয়া আমাদের জাতীয়-জীবনের পথে কোনও প্রতিভাশালী ঐতিহাসিক একদিন অগ্রসর হইতে পারেন, এই আশায় এক্ষণে আমি আপনাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

অশ্বিনীকুমার দত্ত।

[অধ্যাপক শ্রীহরিহর শাস্ত্রী]

বরিশালের দুই রত্ন ছিলেন—অশ্বিনীকুমার দত্ত, আর মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা। দুই জনই বৈষ্ণবতা, দেশপ্রাণতা ও সাহিত্যসেবার জন্য বিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। দুই জনের মধ্যে বড় অন্তরঙ্গতাও ছিল। মনোরঞ্জন পূর্ব্বেই দেশমাতৃকার অঙ্ক শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, এইবার অশ্বিনীকুমারও মহাপ্রস্থান করিলেন।

দুই জনের সঙ্গে এই কাশীতেই কিয়ৎ কালের জন্য আমার পরিচয় লাভের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। আমার পরমপূজনীয় অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়, ১৩২১ বঙ্গাব্দের ৩০শে কার্ত্তিক কাশীলাভ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে কাশীর বিশ্বেশ্বর হলে যে বিরাট শোক-সভার অনুষ্ঠান হয়, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা সেই সভায় বক্তৃতা

করিয়াছিলেন। সেই সূত্রে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয়। মনোরঞ্জন, তাঁহার সম্পাদিত "বিজয়া" পত্রিকায় আমাকে লিখিবার জন্য অনুরোধ করিলে ১৩২১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাস হইতে যত কাল "বিজয়া" জীবিত ছিল, প্রায়ই কিছু কিছু লিখিয়াছি। তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল, বঙ্গভাষায় ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের বিস্তৃত পরিচয় প্রকাশ করা হয়। আমাকে দিয়া তিনি "বৈশেষিক দর্শন" আরম্ভ করাইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, "বিজয়া"র ভূমিকামাত্রই বাহির হইয়াছিল; নানা পারিবারিক দুর্ঘটনার জন্য তিনি জীবিত থাকিতে আর লিখিতে পারি নাই—ইদানীং "ভারতবর্ষে" আবার আরম্ভ করিয়াছি। একটা আশার কথা এই যে, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম-এ, বি-এল মহাশয়ের পরামর্শানুসারে "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে"র নিকট বাঙ্গালা ভাষায় ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র প্রচারের প্রস্তাব করিয়াছি। প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সম্ভবতঃ অতএব বিভিন্ন দর্শনে অভিজ্ঞ লেখকগণের দ্বারা প্রত্যেক দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় ও ঐতিহাসিক তথ্য পরিষদের নেতৃত্বে প্রকাশিত হইবে।

শ্রদ্ধাস্পদ অশ্বিনীকুমারের সহিত আমার পরিচয় হয়,—১৩২৩ বঙ্গাব্দের শেষ ভাগে। তখন "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে তাঁহার 'কর্ম্মযোগ' বাহির হইতেছিল। রাণামহলে ঠিক গঙ্গার উপরে তিনি বাড়ী লইয়াছিলেন। তিনি কাশীতে আসিয়াছেন শুনিয়া আমি ও পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য মহাশয়, দেখা করিতে যাই। শীত কাল, তিনি তে-তলায় ছোট ঘরটীতে বসিয়াছিলেন। আমরা যাইতেই তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নম্রতার সহিত অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন ও পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিলেন। অমন একজন বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ সূতের ন্যায় ধর্ম্মবক্তাকে পায়ের ধুলা দিতে সঙ্কোচ হইত; কিন্তু তাঁহার নিকট নিস্তার ছিল না। একবার আমার সহিত পূজনীয় অধ্যাপক ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দৌহিত্র শ্রীমান্ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল (সম্প্রতি চুঁচুড়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট) অশ্বিনীবাবুকে দেখিতে গিয়াছিলেন। পরিচয়ের পর অশ্বিনীবাবু পায়ে হাত দিতে আসিলে শ্রীমান্ বিষ্ণুপদ সসঙ্কোচে পিছু হটিয়া গেলেন, এবং কিছুতেই পায়ের ধূলা লইতে দিলেন না। ইহাতে অশ্বিনীবাবু হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—"যদি পায়ের ধুলো দিতে এত ভয়, তবে ব্রাহ্মণ হ'য়েছিলে কেন?" বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতি এমনই তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল।

অভিমান, তাঁহার একেবারেই ছিল না। তিনি প্রায়ই বলিতেন,—"অভিমানং সুরাপানং গৌরবং রৌরবস্তথা। প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা ত্রীণি ত্যক্ত্বা সুখী ভবেৎ॥" কিন্তু যাহা সর্ব্বপ্রকার কালুষ্য হইতে সর্ব্বদা প্রহরীর ন্যায় আত্মাকে রক্ষা করে, উচ্চাশয়তার নামান্তর সেই সদভিমান, তাঁহার চরিত্রকে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিল। এই জন্যই কখনও কোনও ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্য তাঁহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই। আজ কাল অনেক লেখক, সমস্ত না জানিয়াও অপরের, নিরুক্ত, সংহিতা প্রভৃতির 'সমালোচনা' করিতে যে যে প্রকারের বক্তৃতা সম্পাদন করেন, 'সমালোচনা' নাম করিতে গিয়া 'কাব্যদর্শন' লেখেন, ইহাতে [illegible] দার্শনিক সিদ্ধান্তের আলোচনা করিতে সাহসী হন। অশ্বিনীকুমার কাশীতে আদ্যন্ত মহাভারত পাঠ করিতেন। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন,—"আমার 'কর্ম্মযোগে' মহাভারত হইতে কয়েকটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে হইবে। সেই স্থানটী দেখিয়া বচন গুলি বাহির করিয়া লইলে শ্রম লাঘব হয় সত্য, কিন্তু সেরূপ করা আমি উচিত মনে করি না। পাঠকেরা মনে করিবেন, মহাভারত সম্পূর্ণ আমার পড়া আছে, অথচ মহাভারত ত আদ্যন্ত আমার পড়া নাই।" যে যুগে পরের সংগৃহীত উপকরণ আত্মসাৎ করিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লেখা হয়, পুরাতন সাময়িক পত্র বা দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন পুস্তক হইতে বিষয় সংগ্রহ করিয়া নূতনত্বের দাবীতে যশস্বী হওয়া চলে, সে যুগে এইরূপ চরিত্র-মহত্ত্ব, চিন্তারও অতীত বলিয়া মনে হয়। অশ্বিনীকুমার, এই মহাভারত পাঠের সময়ে তাহার এক বিস্তৃত সূচীও রচনা করিতেছিলেন। তাঁহার যোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্রেরা এই সূচীর অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রকাশের ব্যবস্থা করিলে বঙ্গভাষার এক নূতন সমৃদ্ধি লাভ হইবে।

অশ্বিনীকুমার স্বদেশহিতৈষী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার এই হিতৈষণার ভিতরে কোনও জাতিবৈর বা হিংসার ভাব অনুস্যূত ছিল না। একবার তিনি বলিয়াছিলেন, "ইংরেজদিগের মধ্যে এমন কতকগুলি গুণ আছে, যাহা আমাদের মধ্যে দুর্লভ। নরওয়েতে একটা অনাথ স্ত্রীলোক ডিমের ব্যবসায় করিত। কিন্তু সংসারের কাজকর্ম্মের জন্য নিয়মিত ভাবে বসিয়া ডিম বিক্রয়ের তাহার সময় ছিল না। সে করিত কি, রাস্তার ধারে একটা ঝুড়িতে ডিমগুলি ও স্বতন্ত্র একখানি কাগজে কয়টী ডিম ও তাহার মূল্য কত লিখিয়া রাখিত। পথিকেরা সেই কাগজ দেখিয়া ডিম লইত ও মূল্য রাখিয়া যাইত—কেহ একটা ডিম বেশী লইত না বা একটা পয়সা কম দিত না। এরূপ সাধুতা আমাদের দেশে সম্ভবপর কি? তাহার পর দেখুন, ইংরেজেরা কাজ করে কত! আপনি যে কোনও ভাষা শিখিতে যান, ইংরেজীতে তাহার ডিক্সনারী আছে। কবীর, নানক, তুলসীদাস, তুকারাম প্রভৃতির বিস্তৃত পরিচয়, ইংরাজী সাহিত্যেই পাইবেন। কই, আমাদের বাঙ্গলা ভাষায় ত এ সকল বিষয়ে ভাল বই দেখিতে পাই না! হিন্দী-বাঙ্গালা বা মারহাট্টী-বাঙ্গালা অভিধান এ পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে কি?" অশ্বিনীকুমার রাজনীতি-ক্ষেত্রে তিলকের খুব প্রশংসা করিতেন।

বর্ত্তমান অসহযোগিতার যুগে অনেকে ওকালতী, ব্যারিষ্টারী ছাড়িতেছেন, কেহ বা একবার ছাড়িয়া আবার ধরিতেছেন। অশ্বিনীকুমার কিন্তু যখন সহযোগিতা-বর্জ্জনের কোনও নাম গন্ধও ছিল না, সেই অতীত কালে ওকালতী আরম্ভ করিয়াই ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই বলিতেন, "হাইকোর্টে ব্যবসায় করা বরং ভাল—সেখানে মিথ্যা সাক্ষ্য শিখাইতে হয় না; কিন্তু নিম্ন আদালতে নিজেকে খাঁটী রাখিয়া কখনই ব্যবসায় করা চলে না।"

একদিন অশ্বিনীকুমারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—"আচ্ছা, আপনি নাকি ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন?" তিনি উত্তরে বলিলেন, "হ্যাঁ, আমার ব্রাহ্ম হওয়ার মানে একবৎসর পর্য্যন্ত কোনও দেবালয়ে প্রণাম করি নাই।"

অশ্বিনীকুমারের ধর্ম্ম-জীবন এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। তাহাতে আড়ম্বর নাই, অভিমান নাই, বড় বড় বক্তৃতা করিয়া লোকের চিত্তকে চমৎকৃত করিয়া দিবার চেষ্টা নাই; অথচ তাঁহার সহিত কিছুকাল আলাপ করিলেই হৃদয় এক অনাবিল আনন্দে ভরিয়া উঠিত। হৃদয়ে যত কিছু শোক দুঃখ থাকুক না কেন, তাঁহার কাছে গেলেই সকল ভুলিয়া চিত্ত এক পরম আনন্দ-লোকে চলিয়া যাইত। একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আচ্ছা, আপনি কখনও কিছু অনুভব করিয়াছেন কি?" তিনি বলিলেন, "একবার নৌকায় যাইতেছিলাম, হঠাৎ মনে হইল, 'আমি' যেন এ শরীর হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছি, সেই অবস্থায় এমন একটা আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম, তেমন আনন্দের আস্বাদ জীবনে আর কখনও পাই নাই।" আমরা কিন্তু যখনই তাঁহাকে দেখিয়াছি, আনন্দ-ঘন মাধুর্য্যের নির্ঝর বলিয়াই তাঁহাকে মনে হইয়াছে। সেই অনির্ব্বাচ্য রসবস্তুর কথঞ্চিৎ আস্বাদ না পাইলে মানুষ এমন আনন্দময়—মাধুর্য্যময় রূপে প্রতিভাত হইতে পারে না। অশ্বিনীকুমারের রচিত একটি কীর্ত্তন-গানে তাঁহার মর্ম্মবাণী মূর্ত্তিমতী হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। গানটী এই:—

তুমি মধু, তুমি মধু, তুমি মধু।
মধুর নিঝর, মধুর সায়র, আমার পরাণবঁধু।
(আমার সকল তুমি, বঁধু হে,
আমি যা' কিছু চাই এ সংসারে,
আমার সাধন ভজন তুমি,
আমার তন্ত্র তুমি, মন্ত্র তুমি,
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, বঁধু হে,
আমার সকল তুমি,
যেন ঐ রূপের ধ্যানে ডুবে থাকি)
মধুর মূরতি,
মধুর কারতি, মধুর মধুর ভাষ।
মধুর চলনি,
মধুর দোলনি, মধুর মধুর হাস।
(রূপের কি মাধুরী!
বালাই ল'য়ে মরি! মরি!)
মধুর চাহনি,

মধুর সাজনি, মধুর রূপের লেখা।
মধুর মধুর,
মধুর মধুর, মাহেন্দ্র ক্ষণের দেখা ;
(আর কি ভুলিতে পারি ?
সেই ক্ষণের দেখা,
কি ক্ষণে দেখা হ'য়েছিল !
আর ভুলবো না হে,
ইহ কালে পরকালে,
সেই ক্ষণের কথা,
আর ভুলবো না হে।)
ও মধুর রূপের মধুর কাহিনী মধুর কণ্ঠে গায়।
শুনিতে শুনিতে, গলিতে গলিতে, প্রাণ মধু হ'য়ে যায়।
(বিশ্ব হয় মধুময়,
রূপে নয়ন দিলে,
বিশ্ব হয় মধুময়,
সকলই মধুর,
বিশ্বে যা' দেখি তাই সকলই মধুর,
বাক্য মধুর, দৃষ্টি মধুর, শ্রুতি মধুর,
বিশ্বে যা' দেখি তাই সকলই মধুর,
তখন আমিও মধুর, তুমিও মধুর,
বিশ্বে যা' দেখি তাই সকলই মধুর।)
(তখন) অনলে অনিলে জলে,
মধু প্রবাহিনী চলে,
মেদিনী হয় মধুময় ;
মধু বাতা ঋতায়তে,
মধু বায়ু যে বহে গো',
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ,
মধু সিন্ধু উথলে যে,
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ,
মধুকণা ধূলি রেণু)।
(তখন) প্রকৃতি মোহিনী সাজে
হৃদয়ে মৃদঙ্গ বাজে,
মধুর মধুর ধ্বনি হয়।
বলে 'সত্যং শিব সুন্দরং'
বলে 'মঙ্গলং মঙ্গলং')।
(তখন) যেরূপ ভাবে যেখানে,
যে কথা পশে গো কানে,
স্তুতি নিন্দা সকলই মধুর ;
(তখন ভাল মন্দ থাকে না যে,
তখন গালিও যে মধু ঢালে,
কটু কথাও মিঠা লাগে)
(তখন) বজ্রনাদ কুহুধ্বনি,
গুরু, সোম, রাহু, শনি,
মধুরসে সকলই ভরপুর।
(বিশ্ব মধুময় হ'য়ে যায়,
ও রূপে নয়ন দিলে)।

আমার সৌভাগ্য, এই কীর্ত্তনটি অশ্বিনীকুমার তাঁহার ছায়ার ন্যায় অনুচর গণেশের দ্বারা গান করাইয়া আমাকে শুনাইয়াছিলেন। মনে পড়ে, তাঁহার বাগানমহলের গঙ্গার উপরের বাড়ীর ছাদে সন্ধ্যাকালে এই গান শুনিতে শুনিতে কিরূপ তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলাম। এই গণেশের দ্বারা তিনি আমাকে প্রসিদ্ধ স্বদেশী কবি মুকুন্দদাসেরও অনেক গান শুনাইয়াছিলেন।

মনে বড় আশা ছিল, অন্ততঃ আর একবার তাঁহার সাহচর্য্য করিয়া জীবন কৃতার্থ করিব ; কিন্তু—

"যচ্চিন্তিতং তদিহ দূরতরং প্রয়াতম্।"

ফাগুনে।

[শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায় এম-এ]

বনে বনে বহে আজ ফাগুন হাওয়া ;
তোমার বীণায় হবে কি গান গাওয়া ;
তটিনীর কূলে কূলে,
অশোকের ফুলে ফুলে
গোপন সরম রাগ উঠিছে ফুটি' ;
শীতের বাঁধন আজ যেতেছে টুটি'।

বল সখি কার তরে আজি এ শোভা ;
মেঘে মেঘে ফুটে উঠে কনক প্রভা ;
কার তরে এত ফুল,
এত গাহে বুলবুল,
যূথিকা চামেলী বেলী কানন ভরি' ;
পরাণ শিহরি' উঠে কারে সে স্মরি'।

এত গান কারে দিব শুধাব কারে—
ফাগুন এসেছে আজ হৃদয় দ্বারে ;
বকুলের মালাখানি
কার শিরে দিব টানি' ;
পরাব শিরিষ ফুল শ্রবণ মূলে—
চাঁদের কিরণ দিব দুকূল কূলে।

এখনও জীবন ভরা মধু টলমল ;
এখনও আঁখির কোণে অফুরান জল ;
এখনও পরাণ হায়
দু'হাতে বিলাতে চায় ;
এখনও হিয়ার পাখী গাহিছে কেবল —
এখনও প্রভাত বুঝি হয়নি সকল।

ফাগুন জেগেছে আজ—আপনা ভুলে
শিহরে কামনা নব অশোক ফুলে—
আজি এ মধুর সুরে
কি বাঁশী বাজিছে দূরে ;
নয়নে নূতন আজ নিরখি রবি —
আকাশে বাতাসে আজ নূতন ছবি।

(আজি) সব কাজ ভেসে যাক অতল জলে ;
গোপন ক'রো না কথা বিফল ছলে ;
আজি ভাঙ ঘুম ঘোর
সব বাঁধনের ডোর
জীবন জাগায়ে তোল মাধবী মূলে—
জেগেছে ফাগুন আজ নব মুকুলে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

[শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ]

অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, মাইকেল মধুসূদন লিখিয়াছিলেন,—

"লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে
বালিতে, রে কাল, তোর সাগরের তীরে ?
ফেণ-চূড় জল-রাশি আসি কি রে ফিরে,
মুছিবে তুচ্ছেতে ত্বরা এ মোর লিখনে ?
অথবা খোদিনু তারে যশোগিরি-শিরে,
গুণ-রূপ যন্ত্রে কাটি অক্ষর সুক্ষণে,—
নারিবে উঠাতে যাহে ধুয়ে নিজ নীরে,
বিস্মৃতি, বা মলিনিতে মলের মিলনে ?"

আজি মধুসূদনের শত বার্ষিক জন্মোৎসবে তাঁহার সহস্র সহস্র দেশবাসী সম্মিলিত হইয়া তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা-

পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন,—সদম্ভরে বলিয়াছেন,—

"তরুবর বৃক্ষের রূপে তব নাম রবে
তব জন্ম-দেশ-বনে, কহিনু তোমারে।"

দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য মাইকেলের কাব্যের আদর বাড়িতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু মাইকেলের জীবিতাবস্থাতেও, যখন তাঁহার রচনাবলী সমালোচকগণের নির্ম্মম কশাঘাত হইতে নিস্তার পায় নাই, তখনও তিনি সামান্য সমাদর লাভ করেন নাই, এবং তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার অবদান চিরদিন

"যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের মন্দিরে
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে।"

তিনি কাব্যামোদী পাঠকগণের হৃদয়ের উপর কতদূর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় পুরাতন সংবাদ পত্রাদি পাঠে প্রতীত হয়। আমরা ৫০ বৎসর পূর্ব্বের 'হালিসহর পত্রিকা' হইতে একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১২৮০ সালের প্রারম্ভেই মাইকেল অত্যন্ত উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হন, কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে সে যাত্রা তিনি আরোগ্যলাভ করেন। তদুপলক্ষে একজন লেখক ১১ই জ্যৈষ্ঠ 'হালিসহর পত্রিকা'য় লিখিয়াছিলেন ;—

ভীষণ শেলের সম বাজিল হৃদয়ে,
শুনিলাম যবে, ওহে বঙ্গ কবিরাজ ;
প্রাণহন্তা রোগ আজি ঘেরেছে তোমায়
চারিদিক অন্ধকার করিনু দর্শন ;
তিতাইনু ধরণীরে নয়ন সলিলে ;
ভাবিনু মনেতে, বুঝি এতদিন পরে,
অভাগিনী বঙ্গভাষা গেলা ছারখারে ;
কবিতা-কানন হতে তুলি নানা ফুল,
কে আর সাজাবে তারে মোহনিয়া সাজে ;
সাজায় প্রতিমা যথা পটু সজ্জাকর,
বিধির কৃপায় আজি, সে আশঙ্কা মম
হইল বিলয়, যথা সলিল বুদ্বুদ।
দীর্ঘজীবী হয়ে এবে, হে কবিতিলক !
রচ কাব্য মধুচক্র, এ প্রার্থনা করি।

কিন্তু এই ঘটনার অনতিকাল মধ্যেই মাইকেল পুনরায় সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত হন এবং কয়েক মাসের মধ্যেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত কবিতার রচয়িতা ১১ই শ্রাবণের 'হালিসহর পত্রিকা'য় মাইকেলের মৃত্যু উপলক্ষে লিখিয়াছিলেন—

(১)

কেন ওরে বীণা তুই করিয়া ঝঙ্কার,
বাজিতে উদ্যম বল্ করিস্ আবার।
যে জন বীণার স্বরে, মোহিল কামিনী নরে,
তার বীণা চিরতরে হয়েছে নীরব।
কি সাধেতে তুই তবে করিস রে রব॥

(২)

অই শুন বঙ্গবাসী করিছে রোদন,
বলি, "কোথা কবিরাজ শ্রীমধুসূদন।
আঁধারিয়া বঙ্গভূমি, কোথায় যাইবে তুমি,
কোথা কবি চূড়ামণি শ্রীমধুসূদন।

(৩)

কে আর গাইবে ওহে এ বঙ্গ ভিতরে,
ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা, সুমধুর স্বরে।
কে বা আর ভীমনাদে, ভেরী সম মেঘনাদে,
বাজাইবে বল ওহে গভীর গর্জ্জনে।
নাচাইবে বীর হিয়া রক্ষ নাশী রণে॥

(৪)

কে আর তুষিবে ওহে গোড়জন মন,
কাব্য 'মধুচক্র' সুধা করাইয়া পান।"
তাই বলি রে বাঁশরী, ওরূপ ঝঙ্কার করি,
বেজনা বেজনা তুমি বেজনা এখন
কাঁদ শুধু বলি "কোথা শ্রীমধুসূদন"॥

(৫)

কবিও তোমার সনে করুক রোদন,
বলি "কোথা কবিচূড়া শ্রীমধুসূদন"।
ভাসাক নয়ন নীরে, বঙ্গভাষা, অবনীরে ;
দীরঘ নিশ্বাস আর ফেলি ক্ষণে ক্ষণ,
বলুক, "কোথায় গেলে শ্রীমধুসূদন"।

(৬)

তরু শাখে বসি যত বিহঙ্গমগণ,
কাঁদুক বলিয়া, "কোথা শ্রীমধুসূদন"।
যমুনা জাহ্নবী নদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা আদি,
কল কল কল রবে করুক ক্রন্দন,
বলি, "কোথা কবিরাজ শ্রীমধুসূদন"।

(৭)

ভূধর কন্দরে হায়! হোক প্রতিষ্ঠান,
"কোথা মধু বঙ্গ কবিকুল চূড়ামণি"।
জীব জন্তুগণ সবে, যে যেখানে আছে হবে,
পূরাক মেদিনী আজ করিয়া ক্রন্দন,
বলি, "কোথা কবিরত্ন শ্রীমধুসূদন"।

(৮)

তা সহ মিশিয়া তুমি রে মম বাঁশরী।
বল, "মধু কোথা গেলে বঙ্গ শূন্য করি।
আজি এই বঙ্গদেশ, ধরেছে দুঃখিনী বেশ,
না হেরি তোমার সেই প্রফুল্ল আনন।
কোথা কবি চূড়ামণি শ্রীমধুসূদন।"

পৌষ পার্ব্বণ।

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম-এ, বি-এল]

কি ভয়ানক কুসংস্কার! স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের আদ্য শ্রাদ্ধ আর কাহাকে বলে? এবারকার পৌষ পার্ব্বণ মুলতবি রাখবার জন্যে পিসিমাকে অনেক লেকচার দিয়েছিলাম। মেয়েটার ব্লড্ ডিসেণ্ট্রি, ছেলেটার শরীর ঘ্যাত-ঘেঁতে, নিজের দেহ পড়বার মত। আমাদের ক্ষুদ্র সংসারে দৈহিক সুখে বঞ্চিত ছিলেন না আমার পিসিমা আর আমার গৃহিণী। বাড়ীর একমাত্র রাত-দিনের ঝি পরাণের মা, নিজের বাড়ীর পৌষ লাগাবার জন্যে তার দেশে একটা বাহানা ক'রে পালিয়ে গিয়েছিল। আমি সকালে ঘুম থেকে উঠে হাট বাজার করি, আর তারপর আটটা বাজতে না বাজতে নাকে মুখে দুটো ভাত গুঁজে আপিসে যাই। সন্ধ্যার সময় আপিস থেকে বাড়ী ফিরে এসে আমাদের ড্রামাটিক্ ক্লাবে হাজিরা দিতাম, তা-ও পৌষ মাসের মাঝখান থেকে পারিবারিক কর্ত্তব্যের খাতিরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কবিরাজের বাড়ী আনাগোনা করতে, পথ্য অনুপান ঔষধের বন্দোবস্তের হিড়িকে রাত্রি ন-টা বেজে যায়। সুখ, সোয়াস্তি, সময়, এই তিনটে 'স'য়ের একটাও আমার ভাগ্যে জুটছিল না। আমার এই অবস্থা জেনে শুনেও পিসিমা বল্লেন, "তা-ও কি হয়, পিটে পার্ব্বণ বন্ধ হ'তে পারে না, সংসারের অকল্যাণ হবে।" আমি আয়ুর্ব্বেদের দোহাই দিয়ে বল্লেম, "পিষ্টকং ইষ্টকং বা" পিটা আর ইটের টুকরা কবিরাজদের মতে বর্জ্জনীয়। অট্টালিকা চূর্ণের কথা পিসিমা শুনেন নাই। তিনি আয়ুর্ব্বেদের বচন শুনে একটু যেন থমকে গেলেন। আমি মনে করিলাম বুঝি এইবার পিসিমা'র প্রাচীন অস্থিতে শাস্ত্রের ভোজটা ধরল। ও মা! গৃহিণী রন্ধনশালা থেকে দ্রুত বেরিয়ে এসে বল্লেন কি না, "না গো পিসিমা, আয়ুর্ব্বেদে ও কথা নাই, ওটা ওঁর বানান কথা।" আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। মাথার ভেতর দিয়ে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলো সমস্যা তাড়া-তাড়ি জমাট বেঁধে আসতে লাগল। আমার মুখ দিয়ে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে চোকা চোকা বুলেট্ বেরবার আগেই পিসিমা'র গর্জ্জনে বুলেট্ গুলি তেতে উঠবার অবসর পেলে না। "দ্যাখ্ নিমে, তোর যত বয়েস হচ্চে, বুদ্ধি-শুদ্ধি সব লোপ পেয়ে যাচ্চে। পিটে পার্ব্বণ বন্ধ করবার জন্যে ইংরিজি মত চালাচ্চিস্ আর মেয়ের রক্ত আমাশয় বন্ধ করবার জন্যে বাংলা মতে চিকিৎসে করাচ্চিস্।" আঁতে ঘা দেওয়া কথা! এর দু' চারদিন পূর্ব্বে পিসিমা ও আমার গৃহিণী বেবিকে ডাক্তারি মতে চিকিৎসা করানর জন্যে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন। আমি তাঁদের পরামর্শ শুনতে রাজি হইনি।

পিসিমা তুঁহি এখন ঝগড়ার মুখে আমাকে বেশ এক ঘা কষিয়ে দিলেন। বাক্‌যুদ্ধে হেরে গিয়েও আমি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবার পূর্ব্বে একটা বাণ ছাড়তে ভুলে যাইনি। "আচ্ছা, ডাক্তারি চিকিৎসা-ই হবে, কিন্তু পিটে পার্ব্বণ এবারে কিছুতেই হবে না। পাঁচালিওয়ালা আধো কামার যা' বলেছে তা' লাখ কথার এক কথা।

বাঙ্গালীকে ভূতে ধরে।
চাল কুটে পিটে গড়ে॥"

আমার কথা শুনে পিসিমা ও আমার গৃহিণী আদ্যনাথের চৌদ্দ পুরুষের আদ্যকৃত্যের মন্ত্র আবৃত্তি করতে আরম্ভ ক'রে দিলেন। আমি বুদ্ধিমানের মত তৎক্ষণাৎ বাড়ী হইতে সরিয়া পড়িলাম।

(২)

দু'তিন দিন এমিটিন্‌ ইনজেক্‌শনের পর মেয়েটা সেরে উঠবার মত হ'ল। আমি সুরুচি ড্রামাটিক্‌ ক্লাবে হাজিরা দিতে আরম্ভ করিলাম। নাট্য-সমিতির অবৈতনিক সম্পাদকের যে কি রকম দায়িত্ব তা' আমি এই কয়দিন পরে আখড়ায় গিয়ে বেশ বুঝতে পারলেম। নৌকায় মাঝি না থাকলে নৌকাখানা যেমন দাঁড়িদের হাতে কেবল ঘুরতে থাকে, আমার অনুপস্থিতিতে ক্লাবেরও ঠিক সেই রকম অবস্থা হয়েছিল। সম্মুখবর্তী পূজায় "বিজয়" নাটকখানি অভিনয় ক'রতেই হবে। আমি হাজির থাকলে এতদিন এর একটা চূড়ান্ত বন্দোবস্ত হ'ত। আমার পেছনে ক্লাবের অন্যান্য মেম্বরগণ ঠিক করেছিলেন যে, নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে স্ত্রীগণের পার্ট পুরুষের দ্বারা অভিনীত হবে। কি সর্ব্বনাশ! আর্ট ব'লে জিনিষটা যে কি, এদেশের লোক কিছুতেই বুঝবে না, বুঝবার চেষ্টাও করবে না। ফিমেলের পার্ট মেল কখনও ভাল ক'রে অভিনয় করতে পারে? আমি সভ্যগণকে ড্রামাটিক্‌ আর্টের ইতিহাস শুনিয়ে দিয়ে বল্লেম, বিলাতেও যখন দ্বিতীয় চার্লসের সময় থেকে মেয়েদের পার্ট মেয়েদের দ্বারাই অভিনীত হয়ে আসছে তখন আর্টের মর্য্যাদা রক্ষা করতে হ'লে এদেশেও রঙ্গমঞ্চকে স্বাভাবিক নিয়ম মেনে চলা উচিত। আমার বক্তৃতা শুনে যদিও মেম্বরগণ আমার মতে সায় দিল কিন্তু তারা যে মনে মনে আমার উপর অত্যন্ত চ'টে গিয়েছিল তা' আমি বুঝতে পারলেম। তাদের মতে আমাদের ক্লাবের নরেশ একট্রেসদের কাণ কেটে দিতে পারে। শুষ্ক তর্কে যে কতটা সময় অপব্যয় হয়েছিল তা' আমার মনে নাই। আমার জিদ বজায় হ'ল, গোলমাল থেমে গেল, মনটাও ভের আনন্দের ফোয়ারা ছুটতে লাগল। আর্টের প্রভাব তখন আমি অনুভব করেছিলেম। একা ত্রিশ জনকে যুক্তি তর্কে হারিয়ে দেওয়াতে পাছে কাহারও মনে পরাজয়ের অঙ্কুশ বিদ্ধ হ'য়ে থাকে সেইজন্য হারমনিয়মটা টেনে নিয়ে গান ধরলেম—

বল সবে আজি প্রেমের বারতা,
ভুলে যাও যত বিবাদের কথা।

আমাদের ক্লাবের প্রত্যেক মেম্বর গান বাজনা অভিনয়ে পাকা। সাহিত্যের নামে যে সকল সভা সমিতি এদেশে আছে, তার অধিকাংশ সভ্যই আমার মত শ্রোতা। সাহিত্যের কড়া-ক্রান্তিরও তাঁহারা অধিকারী নহেন। একজন নামজাদা সাহিত্যিক তাঁদের ও আমাদের গুণের তুলনা ক'রে সুরুচি ড্রামাটিক্‌ ক্লাবকে একখানা সার্টিফিকেট্‌ দিয়েছেন। আমাদের ক্লাবের নামটা সেইজন্য চারিদিকে জাহির হয়েছে। আমরা পাবলিক্‌ ষ্টেজে সখের অভিনয় যতবার ক'রেছি, ততবারই রঙ্গালয় লোকারণ্যে পরিণত হয়েছে। সাহিত্য-সংক্রান্ত সভা সমিতিগুলির অধিবেশনে কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে, অবৈতনিক কর্ম্মচারিগণ ছাড়া বাহিরের লোক খুব কম জমা হয়। বাংলা দেশটা যে অভিনয়ের দেশ, এখানে 'কলা'-বিদ্যার যতটা আদর, যথার্থ সাহিত্যের ততটা আদর নাই। তবে, একটা বিষয়ে নাট্য ও সাহিত্য সভাগুলির মধ্যে ঐক্য আছে। পারস্পরিক শ্রদ্ধার অভাবে অনেক সময়ে একটা দল ভেঙ্গে দশটা দলের সৃষ্টি করে। আমার গান শেষ হ'তে না হ'তে ক্লাবের জুনিয়র মেম্বর সভ্য সেই নরেশ ছোঁড়াটা গান ধরিল—

হৃদয় রাস-মন্দিরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে—

ক্লাবের ঘরের চারিদিক থেকে খুব বাহবা বর্ষণ হ'তে লাগল। আমি বুঝলেম যে এই গানটা গাইবার উদ্দেশ্য আর্টের দিক থেকে আমি যে বক্তৃতা ক'রেছি সেটাকে ছাতু ক'রে

দেওয়া। গান চল্‌তে লাগল, আমি ফ্রেঞ্চ লিভ্‌ গ্রহণ করে বাড়ী ফিরলেম।

(৩)

"কারো পৌষ মাস কারো সর্ব্বনাশ।" এই কথাটা যে রচনা করেছিল সে বোধ হয় দার্শনিক, আর না হয় ভবিষ্যদ্বক্তা। আগামী কল্য পৌষ সংক্রান্তি। আজ রবিবার। সকাল থেকে সাত হাটের কাণা কড়ির মত আমি এ-দোকান সে-দোকান ঘুরে সস্তা দরে ভাল এক নাগরি গুড়, গোটা চারেক নারিকেল, সের ছয় চাল ইত্যাদি ইত্যাদি কিনে মুটের মাথায় বোঝা চাপিয়ে বেলা সাড়ে দশটার সময় বাড়ী ফিরলেম। সদর দরজা থেকে ছেলে মেয়েদের নাম ধ'রে হাঁকা-হাঁকি, ডাকা-ডাকি করতে করতে মায়ের দরজা পেরিয়ে ভিতর বাড়ীর উঠানে পা দিয়েছি এমন সময় কোথায় দেখব পিসিমা ও আমার গৃহিণী মুখভরা হাসি নিয়ে বাজারের ঝাঁকার দিকে এগিয়ে আসবেন, তা' না হয়ে তাঁরা দূরে মুখ ভার ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ছেলে মেয়েগুলোও যেন কাঠের পুতুলের মত রোয়াকের ধারে সাজান রয়েছে। ব্যাপারটা কি বুঝবার চেষ্টা কর্‌ছি ও সেই অবসরে মুটের মাথাথেকে মোট নামাচ্ছি। জিনিষগুলি ঝাঁকা থেকে নামান হ'ল, অথচ কেহ উচ্চ-বাচ্য করছেন না। এ কি ভূতের বাড়ী? মুটেকে ভাড়া দিয়ে বিদায় ক'রেই আমার ভেতরকার বোঝা হাল্কা করবার জন্য একটু উঁচু গলায় বল্লেম, "এই নাও তোমাদের পিটে পার্ব্বণের রসদ।" এই কথা বলবার পর পূর্ব্ববঙ্গের অকস্মাৎ বাত্যার মত একটা কি হয়ে গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার গৃহিণী খেজুরে গুড়ের নাগারির ঘাড় ধ'রে ড্রেণের ঝাঁঝারির উপর আছাড় দিলেন, পিসিমা চাল, নারকেল দু'হাতে ছড়িয়ে ফেল্লেন, আর সেই সঙ্গে দু'জনেই অজস্র অশ্রু বর্ষণের মাঝে কান্নার সুরে চীৎকার ক'রে উঠলেন— "যেখানে পিটে পার্ব্বণ হচ্চে সেইখানেই হ'ক, দু'জায়গায় আর কেন?" আমার মাথায় যেন আকাশটা ভেঙ্গে পড়ল। এদিকে পিসিমা কাঁদছেন আর বলছেন, "আমার বুড়ো বয়েসে অদেষ্টে এই ছিল! নিমে, তুই সর্ব্বনাশ করতে ব'সেছিস্?" ওদিকে আমার গৃহিণী কপালে খুব জোরে থাবড়া মারতে মারতে বলছেন, "আমার মরণ হয় ত বাঁচি, এ জীবন থাকলেই কি আর গেলেই কি।" ইত্যাদি।

আমি এই সব দেখে শুনে কূল কিনারাহীন সমুদ্রে যেন ডুবে যাচ্ছি। কি হ'ল! একবার মনে হয়েছিল, হয়ত কোনও দুষ্ট লোক স্ত্রীলোক নিয়ে আমি সখের থিয়েটার করতে চাই এই কথা আমার বাড়ীতে রটনা ক'রে পিসিমা ও আমার গৃহিণীর অন্তরে বিষ ঢেলে দিয়েছে। আমি জানি আর আমার মন জানে, স্ত্রীলোকের দ্বারা আমাদের ড্রামাটিক্ ক্লাবের অভিনয়ের পক্ষপাতী হ'লেও আমি নিজে তাদের সংস্রবে কখনও আসি নাই। দু'তিন মিনিট এই রূপে সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার মাঝে পড়িয়া আমার হৃদয়ের তারগুলি ছিঁড়ে যাবার মত হ'ল। আমি আর সেখানে তিষ্টিতে না পেরে দৌড়ে বাড়ীর বাহিরে আসিলাম। তার পর কোথায় যে আমার পা দুটো আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তা' আমি জানি না। অভ্যাস বশতঃই বোধ হয় আমার দেহটা ক্লাবের দিকে চল্‌ছিল। খানিকটা দূর থেকে শুনিলাম আখড়াঘরের ভিতর হ'তে হারমোনিয়ম ও বেহালার সুরের সঙ্গে মিলে গিয়ে কাহার কণ্ঠস্বর পথের দু'ধারে জনস্রোতকে উপেক্ষা ক'রে যেন আমারই দিকে আসছে। রিহার্সাল্ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে বুঝি!—কি সুন্দর গলা! আমি এগিয়ে চলেছি। অভিনেত্রী রূপসী বটে!—তা হ'ক, আর না, স্ত্রীলোক নিয়ে অভিনয় বন্ধ করতেই হবে, নহিলে শেষে বাড়ীতে কি একটা আত্মহত্যা হয়ে যাবে? আমার মনের ভাবগুলি আমার মুখের সর্ব্বত্র ফুটে উঠেছিল। আমি আখড়া-ঘরে ঢুকলেই আমার চেহারা দেখে নাচ গান বাজনা সব হরতাল হয়ে গেল। আমি চীৎকার ক'রে হুকুম দেবার মত হাত নাড়িয়া বলিলাম, "স্ত্রীলোক নিয়ে এক্‌টিং আমাদের ক্লাবে চলবে না।" আমার 'না' শেষ হ'তে না হ'তে কোরাসে একটা বিকট উচ্চ হাস্যের তরঙ্গে আমি ডুবে গেলাম। তরঙ্গের পর তরঙ্গ— শেষ আর হয় না। আমি এইবার বুঝিলাম এত হাসির কারণ কি। আমিই যে গত রাত্রে সকলকে বুঝিয়েছি, আর্টের মর্য্যাদা রক্ষা করতে হ'লে স্ত্রীলোকের পার্ট এক্‌ট্রেস্ অভিনয় করবে।

(৪)

হাসি থামলে ক্লাবের মেম্বরগণ বল্লে, "বেশ, তবে এর আজকের মুজরা দিয়ে দাও।" আমি জিজ্ঞাসা করলেম, "কত?" একজন বল্লে, "পাঁচ টাকা।" আমি রাজি হ'লেম, কিন্তু সেই পেশাদার অভিনেত্রী বল্লে, "সে কি! আমার সঙ্গে প্লে-নাইটের জন্যে এগ্রিমেণ্ট হয়েছে ত্রিশ টাকায়, আমি পাঁচ টাকা নেব না। যদি একটিং পসন্দ না হয় তা হ'লে আমি পাঁচ টাকাও চাই না।" সকলে বল্লে, "ঠিক কথা।" আমি বল্লেম, "মেয়েমানুষে মেয়েমানুষের পার্ট একটিং করছ, এতে আর ভাল মন্দ, পসন্দ অপসন্দর কি আছে?" "আচ্ছা মশাই, আপনি ভদ্রলোক, ডাকিয়ে এনেছেন, দয়া ক'রে যা' দেবেন আমি তাই নেব। টাকা পাঁচটা আর গাড়ীভাড়া দিন, আমি চলে যাই।" আমি দ্বিরুক্তি না ক'রে একখানা পাঁচ টাকার নোট আর গাড়ীভাড়ার দু'টাকা তাকে দিলেম। সে নমস্কার ক'রে বল্লে, "কিন্তু মশাই, এর পর যদি আমাকে আবার ডাকেন, তা হ'লে পঞ্চাশ টাকা লাগবে জানবেন।" আমি বল্লেম, "তোমাকে ডাকবার দরকার হবে না। আমাদের নরেশ অনেক একট্রেসের নাক কাণ কাটতে পারে।" "হ—ই—স্।"

আবার এত হাসির কারণ কি? ক্লাবের মেম্বরগণ কি পাগল হয়েছে? হাসি যে আর থামতে চাইছে না। আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছেল। তবে, একট্রেসটাকে ক্লাব থেকে তাড়ান গেছে, এই কথা মনে জেগেছিল আর এখনি বাড়ীতে এই খবর দিলে পিসিমা ও আমার গৃহিণী ঠাণ্ডা হবেন, এই আশায় আমার মাথাটার ভেতর বুদ্ধির পিণ্ডিটা প্রকৃতিস্থ হবার জন্যে চেষ্টা করছিল। অভিনেত্রী দরজার নিকট গাড়ীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি এখন তার দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখতে সাহস পেয়েছিলেম। হাসি যে আর থামে না! হরি! হরি! কি ভ্রম!! এ যে আমাদের নরেশ!!!

বাকিটা আমার বুঝতে আর বুঝাতে দেরী হ'ল না। আমি সকালে বাড়ী থেকে বাজারে বেরিয়ে গেলে নরেশ সেই মোহিনী মূর্ত্তিতে গাড়ী ক'রে আমাদের বাড়ীর সামনে গিয়ে গাড়ী থেকে নেমে মাঝের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আড়ঘোমটা টেনে, "বাবু বাড়ী আছেন কি?" এই খবরটা জানতে চায়। পিসিমা জিজ্ঞাসা করেন "তুমি কে গা?" "আমি যে-ই হই দিদি এলে ব'লো, আজ পৌষ পার্ব্বণ, তিন দিন থেকে দেখা নাই, বাজার হাট ক'রে নিয়ে যেন যান।"

রাত্রে ক্লাবের মেম্বরগণকে পিসিমা নিজের হাতে নানান রকম পিটে খাইয়েছিলেন। এবারকার পৌষ পার্ব্বণের ঘটনাগুলি আমি জীবনে ভুলতে পারব না।

হাসি।

[শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল]

হাসি যখন আছে বুকে
হেসে নে ভাই হেসে নে।
আঁধার দিনের অভাব তো নাই
আলোক বানে ভেসে নে!
অশ্রু-ভরা শ্যামল ধরা
আজ সে কথা বলিস্ নে
হোক্ সে সত্য—হউক মিথ্যা
হাসিতে আজ ভুলিস্ নে।

দুঃখ সে তো আছেই সাথী
(তবু) আজকে নয় সে আজকে নয়
আজকে যে তো হাস্য সখা
বন্ধু সুহৃৎ সব সময়!
বসন্ত কাল আসে যখন
তরু ফোটায় কুসুমচয়
আজকে সে তোর বসন্ত দিন
আজ কি প্রাণে দুঃখ সয়?

কাশ্মীর-কাহিনী

উদ্যোগ-পর্ব্ব।

[শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র]

অনেক দিনের সুপ্ত বাসনাটুকু জাগ্রত হয়ে উঠ্‌লো যখন বয়স ৪০ বৎসর অতিক্রম করিল। জীবনে ত অনেক পাপ ও মানুষের অকার্য্য করেছি, শাস্ত্রীয় স্বর্গটুকু যে ভাগ্যে লাভ হইবে এ কল্পনামাত্রও পরিহার করিতে হইয়াছে, তাই শেষ দিনে পৌঁছিবার পূর্ব্বে ভূ-স্বর্গটা দেখিব, এই আশা কুলকুণ্ডলিনী জাগাইয়া তুলিল। যাইবই, কিন্তু বন্ধুবর হৃষীকেশ বলিল—"ভো ভো বন্ধুবর্গ! জম্বুকস্য যুক্তি পরিহর।" কিন্তু মানুষ হৃষীকেশের ভবিষ্যদ্বাণীটা বিফল হইয়া গেল যখন ভগবান হৃষীকেশ আমাদের বাসনায় সহায় হইলেন!

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরে যাইবার বাসনানল চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সোদর-প্রতিম প্রিয়বন্ধু, সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত দাশরথি মুখোপাধ্যায়, অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত নামজাদা আইন-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অর্থ-নীতিজ্ঞ শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ দে ও সরল-প্রাণ অনুজপ্রতিম শ্রীমান্ ইন্দ্রকুমার দাস এবং এই দীন লেখককে লইয়া পাঁচজন একত্র যাত্রা করিবার কথা পাকা হইয়া গেল। কথা রহিল, অর্চ্চনা-সম্পাদক পুলিশকোর্টের শ্রেষ্ঠ উকীল ও নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় সপরিবারে এক সপ্তাহ পরে যাত্রা করিবেন এবং আমরা ৫ই অক্টোবর হৈ হৈ করিতে করিতে বন্ধনমুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় একযোগে স্বাধীন ভাবে ছুটিব, সংসারের মায়াজাল একেবারে না কাটিয়া হোক, অন্ততঃ অস্থায়ীভাবে স্থগিত রাখিয়া। মনে পড়িল, ৺বড়াল-কবির—

> "দেরে দেরে ছেড়ে দেরে ছুটে গিয়ে কেঁদে আসি
> সহিতে পারি না আর এ মায়া মমতারাশি।"

বন্ধুবর হৃষীকেশ-কথিত আমাদের "জম্বুকের যুক্তি" যখন Morley's settled factএ দাঁড়াইল, তখন, ৬৫ বৎসরের বৃদ্ধ, ভ্রমণে কেশরীর ন্যায় তেজোদীপ্ত আমাদের পরম পূজনীয় মাতুল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যাত্রা করিবার স্থির সঙ্কল্প করিলেন। প্রায় মাসাধিক কাল 'যাব কি যাব না'-ভাবনা, ভূ-স্বর্গের চিন্তা, আহার-নিদ্রা সর্ব্বকর্ম্মে আমাদের ছায়ার ন্যায় আঁকড়িয়া ধরিল। পাশ ফিরিবার যো নাই! বন্ধুদের মধ্যে যাঁহারা যাইবেন না তাঁহারা আমাদের যাওয়া নিয়া কত রঙ্গরহস্য, ব্যঙ্গবিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মূঢ়েরা নাস্তিক! অদৃষ্টবাদ মানে না, ভগবানে নির্ভরশীল নহে। নহিলে, যাওয়া-না-যাওয়া, যেটা ভগবানের লেখার উপর নির্ভর করে তাহা লইয়া তাহারা নাড়াচাড়া, আলোচনা-সমালোচনা করে কেন!

কাশ্মীর যাওয়ার কথা একটা বিবাহ-ব্যাপারের পাঁচ গুণ। কথা আছে, হাজার কথা না হ'লে একটা বিবাহ হয় না, কিন্তু পাঁচ হাজার কথা বা ততোধিক না হ'লে কাশ্মীর যাওয়া হয় না। অতিরিক্ত অর্থব্যয়, কাজের অবসর, বন্ধু-সংযোগ না হ'লে এত দূর ও দুর্গম পথে যাওয়া যায় না। এবং কেহ একাকী যাইলেও সম্মিলিত যাত্রার আনন্দও তিনি উপভোগ করিতে পারিবেন না, ইহা সুনিশ্চিত।

যদিও আমরা সকলে একযোগে স্থির-প্রতিজ্ঞ, অচল, অটল, কিন্তু আমাদের জ্ঞান দা' তাল সাম্‌লাইতে পারিতেছিলেন না। যতই যাত্রার দিন ঘনাইয়া আসিতেছিল, ততই 'যাব' আর 'যাব না' কথা দুটার সরস ও বিরস সুর ক্রমান্বয়ে আমাদের কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছিল। প্রত্যহই নূতন বুলেটিন্ বাহির হইতেছিল, কিন্তু ৫ই অক্টোবরের —আমাদের ধার্য্য যাত্রা করিবার দিনের—কেলেঙ্কারীটা চিরস্মরণীয়। মাতুল মহাশয়কে সঙ্গে নিয়া আমাদের যাইবার কথা, কিন্তু যাইবার দিনও তিনি রেলওয়ের পাশ পাইলেন না। ৬ই, ৭ই অশ্লেষা, মঘা প্রভৃতি। ছেলে-পুলে নিয়ে যাত্রা নিষিদ্ধ। সুতরাং শেষে স্থির হইল, জ্ঞান সস্ত্রীক ও কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয় নিয়া ৫ই যাত্রা করুন, মাতুল

মহাশয় পাশ পাইলে ৬ই বা ৭ই যাইবেন। সেই মত টিকিট খরিদ ও Berth Reserve হইল। Punjab Mail ধরিবার জন্য যাত্রার শুভক্ষণ সন্ধ্যা ৬টা। কিন্তু সন্ধ্যা ৫।৩০ মিনিটে ম্লানমুখে জ্ঞান দা' খবর দিলেন, তাঁহার যাওয়া হইবে না, কারণ তাঁহার নাতিনীর অসুখ। আমরা কয়জন যাইবার জন্য বাড়ী হইতে পা বাড়াইয়াছি; আর ত ফেরা যায় না। জয় দুর্গা বলিয়া বাটীর বাহির হইয়া পড়িলাম, অবশ্য খুব আনন্দে নয়, পরন্তু জ্ঞান দা'র বিরহজনিত দারুণ ম্লানমুখে। পথে গাড়ীতে উঠিতেছি, তখন ৫-৪৫ মিনিট। জ্ঞান দা'র যাত্রা পুনরায় ঠিক হইল। ডাক্তারের প্রাণখোলা অভয় বাণীতে আশ্বস্ত হইয়া, জয় দুর্গা বলে' আমরা আবার নূতন উদ্যম ও আনন্দে যাত্রা করিলাম। শুভান্তে সন্তু পন্থানঃ, পুরোহিত আশীর্ব্বচন দিলেন।

ট্রেণযোগে রাওয়ালপিণ্ডি।

পথ-পর্ব্ব।

৫ই অক্টোবর হাবড়ায় আসিয়া পাঞ্জাব মেল ধরিলাম। পথে এমন কিছু ঘটনা ঘটে নাই যাহা অভিনব এবং পাঠকের চিত্তাকর্ষণ করিবে। তবে যাঁহারা দূর পথের নবীন যাত্রী, তাঁহারা জানিয়া রাখিতে পারেন, মোগলসরাই ষ্টেশনে এবং ঐরূপ বড় বড় ষ্টেশনে স্নানের সময় পানি পাঁড়েরা জল লইয়া হাজির থাকে এবং দু'চার পয়সা দিলেই প্লাটফরমে স্নানের সুবিধা করিয়া দেয়। ট্রেণ-ভ্রমণে স্নান স্নিগ্ধকর, স্ফূর্ত্তিকর এবং আহারের মত প্রয়োজনীয়। আহার্য্য প্রচুর পরিমাণে সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। এ সমস্ত মামুলী সংবাদ, ইহা লইয়া মাথা ঘামাইয়া পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতে চাহি না।

পাঞ্জাব মেল যখন ফতেপুর, এটোয়া প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিতে লাগিল তখন নানারঙ্গের পাখী, ময়ূর, হাঁস প্রভৃতি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও তৎসহ আমাদের নয়নের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিল। এইরূপ সুখে, ও ট্রেণ-ভ্রমণজনিত কষ্টে আমরা ৭ই অক্টোবর ভোর বেলায় অম্বালা ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। আমাদের দলের দাশু, ইন্দু এবং সপরিবারে জ্ঞানেন দা' অম্বালায় স্নানাহার সারিয়া দ্বিপ্রহরের ট্রেণে রাওয়ালপিণ্ডি যাত্রা করিবেন স্থির হইল এবং আমি ও বন্ধু হৃষীকেশ তখনই লক্ষৌ মেলে লাহোর যাত্রা করিলাম। কথা রহিল, তাঁহারা দ্বিপ্রহরে যে পাসেঞ্জার ট্রেণটিতে রাওয়ালপিণ্ডি যাইবার জন্য উঠিবেন, আমরা লাহোর ষ্টেশনে সেই ট্রেণে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইব।

লাহোরে বেলা ১২॥০ টার সময় আমরা এক আত্মীয়ের বাটীতে উঠিলাম এবং সেখানে নানাবিধ আতিথ্যে ও আদর-আপ্যায়নে Home comforts পাইয়া বিশেষ সুখবোধ করিলাম। আহারান্তে একঘণ্টা বিশ্রামলাভ করিয়া আমরা গৃহস্বামীর মোটরে সহর-পরিভ্রমণে বাহির হইলাম। সহরটি সুশ্রী। অনেক সৌধ সহরের প্রাচীন সমৃদ্ধির সাক্ষ্য-স্বরূপ এখনও স্ফীতবক্ষে ধরণীর উপর দণ্ডায়মান। আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের পথগুলি সাধারণতঃ যেরূপ ধান্যক্ষেত্র হইতে অনেকটা উচ্চে থাকে, এখানেও সেইরূপ পথগুলি উচ্চ এবং পার্শ্বে নিম্নভূমিতে অনেক লোকের আবাস। আমাদের মনে হইল, একটা প্রবল বর্ষাপাতে বুঝি পথের পার্শ্ববর্ত্তী ঘরগুলি জলমগ্ন হয়। তখন প্রতীকারের কি ব্যবস্থা হয়, এই প্রশ্ন আমাদিগকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে, আমাদের আত্মীয়টি বলিলেন, এখানে সেরূপ প্রবল বর্ষা একেবারেই হয় না, অন্ততঃ ইহা তাঁহার দশ বৎসরের অভিজ্ঞতা। আমরা পাঞ্জাবের পঞ্চনদের অন্যতম রাভির সেতু অতিক্রম করিয়া সুন্দর বৃক্ষশোভিত পথে, বাদসাহ জাহাঙ্গীরের সমাধি-ক্ষেত্র দেখিতে চলিলাম। বিরাট ব্যাপার! একটা অতীতের মহান্ কীর্ত্তি, ইতিহাস বুকে নিয়া উহা এখনও দণ্ডায়মান। প্রকাণ্ড উদ্যান। বোধ হয় কলিকাতার ২।৩টী কলেজ স্কোয়ার তাহার মধ্যে অবলীলাক্রমে স্থান পাইতে পারে। সমাধি-গৃহের দেওয়াল, মেঝে, ছাত প্রভৃতি ছোট ছোট পাথরের টুকরায় গ্রথিত নানা ফুলে, নানা নক্সায় প্রাচীন স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিতেছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তাহাতেও পাথরের যথেষ্ট সমাবেশ করা হইয়াছে, কিন্তু মনে হয় সে পাথরগুলি উপযুক্ত সংলগ্ন হয় নাই। ফলে, ঘোড়ের মুখ দেখিতে বিসদৃশ। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে তাজমহল, কুতবমিনার, প্রভৃতির

নিকট অধুনাতন স্থাপত্য শিল্প কত হীন। সমাধি-সৌধের চতুর্দ্দিকে চারিটা স্তম্ভ। উপরে উঠিবার ঘোরান সিঁড়ি আছে। আমরা উপরে উঠিলাম, চতুর্দ্দিকের দৃশ্য দেখিয়া মোহিত হইলাম এবং মৃত সম্রাটের সমাধি-বক্ষে নিজেদের অলক্ষ্যে কয় ফোঁটা অশ্রু-অর্ঘ্য দিয়া এবং রণজিৎ সিংহের শীসমহাল, ছাউনি প্রভৃতি দেখিয়া বেদনা ভরা বুকে ফিরিলাম।

সন্ধ্যার পরে নির্দ্দিষ্ট সময়ে, আমরা পুনরায় ট্রেণে বন্ধুদের সহিত মিলিত হইলাম এবং রওয়ালপিণ্ডি অভিমুখে একত্র রওনা হইলাম। নর্থ ওয়েষ্টারন্ রেলওয়ের সাধারণ যাত্রী গাড়ীতে অত্যধিক ভিড় হয়। বলা বাহুল্য, লাহোরে রাত্রি ৯টার সময় গাড়ীতে উঠিয়া পরদিন বেলা ১০টার সময় রওয়ালপিণ্ডিতে পৌঁছান অবধি আমরা বিনিদ্র অবস্থায় ছিলাম, কোনও রকমে মাত্র বসিবার স্থান সঙ্কুলান হইয়াছিল।

পথে ৪।৫টা টানেল অতিক্রম করিয়া বাঙ্কা পাহাড় ভেদ করিয়া ছোট বড় নদী অতিক্রম করিয়া ভগবানের হাতে তৈয়ারী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া ছুটিতে লাগিলাম। এমন সৌন্দর্য্যও ত কখন দেখি নাই! সুতরাং পূর্ব্ব হইতে কাশ্মীরের সৌন্দর্য্যের বিন্দুমাত্রও ধারণাতে আনিতে পারিলাম না।

রওয়ালপিণ্ডি হইতে শ্রীনগর।

পার্ব্বত্য পর্ব্ব।

৮ই অক্টোবর প্রাতে রওয়ালপিণ্ডিতে ট্রেণ হইতে অবতরণ করিতেই প্রায় এক ডজন মোটরকার স্বামী আমাদের বেষ্টন করিল। এ সময়টা কাশ্মীরে ঠাণ্ডা পড়িতেছে বলিয়া অনেক লোকে কাশ্মীর হইতে ফিরিতেছে। বাধ্য হইয়া যাত্রী আনিবার জন্য খালি গাড়ী শ্রীনগরে যায়, সেইজন্য যা' তা' ভাড়ায় এ সময়টা মোটরগাড়ী পাওয়া যায়। আমরা কালীবাড়ীতে উঠিলাম। জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধ পুরোহিত ব্রাহ্মণ আমাদের যথেষ্ট যত্ন করিতে লাগিলেন এবং স্বহস্তে পাক করিয়া আমাদের খাওয়াইলেন। কালীবাড়ী-পরিচালকবর্গের অধ্যক্ষ ডাক্তার শ্রীযুক্ত—দত্ত মহাশয় আমাদের সহিত কয় ঘণ্টায় এমন মিশিলেন, যেন আমাদের আবাল্য বন্ধু তিনি। সন্ধ্যার সময় কালীমন্দিরের দালানে আমাদের সুকণ্ঠ বন্ধু দাশুবাবু দুই একখানি শ্যামাসঙ্গীত গাহিলেন, সকলেই মুগ্ধ! এমন বাস্তব (Realistic) গীতি তাহার মুখে আমরাই কচিৎ শুনিয়াছি!

পরদিন প্রাতে আমাদের পূজনীয় মাতুল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সস্ত্রীক বেলা ৮টায় আসিয়া পৌঁছিলেন। রওয়ালপিণ্ডি সহরে প্লেগ দেখা দিয়াছে, এই ভয়ে আমরা তাঁহাকে বিশ্রামের অবসর দিতে পারিলাম না। তাঁহার মত লইয়া আমরা একযোগে ঠিক করিলাম, সেই দিনই অর্থাৎ ৯ই অক্টোবর মঙ্গলবার দিনই শ্রীনগর যাত্রা করিব।

আহারান্তে আমরা যখন যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম তখন ডাক্তার দত্ত মহাশয় রওয়ালপিণ্ডিতে একদিন থাকিয়া যাইতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। কাশ্মীরে শীত পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে এবং অন্যান্য কারণে আমরা তাঁহার অনুরোধ-রক্ষা করিতে পারি নাই বলিয়া আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছিলাম। কয় ঘণ্টা একত্র অবস্থানের ফলে ডাক্তার দত্ত মহাশয় আমাদের বিশেষ অন্তরঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, মোটরগাড়ী ও ড্রাইভার ভাল না হইলে পথে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। গাড়ীর ব্রেক একটু বিগড়াইলেই খড়ে পড়িয়া প্রাণান্ত হইতে হইবে। আমরা তাঁহার পরামর্শের সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহাকেই তিনখানি মোটরগাড়ী ঠিক করিয়া দিতে অনুরোধ করিলাম। বলা বাহুল্য, তিনি যথেষ্ট যত্নে তিনখানি গাড়ী স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া আমাদের জন্য ঠিক করিয়া দিলেন। গাড়ীর ভাড়া দিলাম প্রত্যেক গাড়ী ৩০৲ টাকা হিসাবে। আমরা কলিকাতা হইতে ঠিক করিয়া বাহির হইয়াছিলাম যে প্রতি মোটরের ভাড়া অন্ততঃ ১৫০৲ টাকা হইবে। তৎপরিবর্ত্তে আমাদের স্বপ্নের অগোচর মোটর গাড়ী সুবিধা ভাড়ায় পাইয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম।

৯ই অক্টোবর বেলা ১-৩৫ মিঃ সময় আমরা যাত্রা করিলাম। গাড়ী ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল্। রেলপথ ভেদ করিয়া পাহাড়ের পথে উঠিতে লাগিল। মোটর গাড়ী পর্ব্বতের

উপর আমাদিগকে লইয়া আমাদের চিরবাঞ্ছিত হিমালয়-পথে আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ছুটিতে লাগিল। দুর্জ্জয়লিঙ্গ বা শিমলা পাহাড়ে উঠিবার পথ যেমন আঁকিয়া বাঁকিয়া কখনও উর্দ্ধে উঠিতেছে, কখনও মধ্যে চলিতেছে কখনও বা অধে নামিতেছে, এ পথও তাই, বরঞ্চ তার চেয়েও কঠিন। পথের পরিসর ১০ ফুট হইতে ১৫ ফুট পর্য্যন্ত। কোনও কোনও স্থানে বিশেষতঃ ডাকবাংলার নিকট পথটি অধিক প্রশস্ত। পাশাপাশি তিনখানা মোটর থাকিবার মত। সাধারণতঃ দুইখানি মোটর যাইবার পথের দুবস্থই অধিক। কিন্তু কোনও কোনও স্থানে দুইখানি যাইবার পথও সঙ্কীর্ণ।

এখানে ত প্রস্তরের কোনও মূল্যই নাই। কাটিয়া লইতে পারিলেই হইল। অর্থাৎ মজুরীর অর্থ ব্যয় করিয়া পথের যে পার্শ্বে অতল গহ্বর সে পার্শ্বে ২ ফুট আন্দাজ উচ্চ পাথর সিমেণ্ট মাটিতে গাঁথিয়া রেলীং দিলে যাত্রীদের অনেক বিপদ কমিয়া যায়। অনেক লোক অকালমৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। কাশ্মীর ভূ-স্বর্গ। স্বর্গে যাইবার সিঁড়ি রাবণ রাজা তৈয়ারী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ভূ-স্বর্গে যাইবার পথ অপেক্ষাকৃত সুগম করিবারও চেষ্টা কর্ত্তৃপক্ষের নাই কেন তাহা স্বল্পবুদ্ধিতে বুঝিতে পারিলাম না। বৎসরে ১৫ মাইল রেলীং গাঁথিতে পারিলেও, ৮।১০ বৎসরে আবশ্যক স্থানগুলি নিরাপদ হইতে পারে।

এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত রচনায় বিশেষ ক্ষমতা লইয়া আমরা লিখিতে বসি নাই। আমরা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি শুধু ভবিষ্যৎ যাত্রীর পথ-প্রদর্শনের জন্য। সুতরাং পাঠকের নিকট বিনীত প্রার্থনা, তিনি যেন অক্ষমের নিকট কবির বর্ণনা আশা না করেন। তবে এককথায় সাধারণ অ-কবির মত বলিব,সজীব গালিচা দেখা আমাদের দেশে কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। কোথাও লাল রঙের গালিচা মধ্যে শ্বেত, পীত, কৃষ্ণবর্ণের ফুল; কোথাও শ্বেত বর্ণের কোথাও বা পীত বর্ণের গালিচা এমনই বিবিধ ফুলে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর কৃতিত্ব দেখাইতেছে।

বেলা ৩॥ টা আন্দাজ সময়ে আমরা মারীতে উপনীত হইলাম। রাওয়ালপিণ্ডি হইতে মারীর দূরত্ব প্রায় ৪০ মাইল এবং মারী পাহাড়ের উচ্চতা সমুদ্র সমতল হইতে ৭৫৫৭ ফুট। মারী, পাহাড়ের উপর ক্ষুদ্র সহর। সাহেবী দোকান, দেশীয় দোকান, মদের কারখানা, সাহেবদের টেনিস্ খেলিবার স্থান, হোটেল প্রভৃতি সবই আছে। মনে হইল, সাহেবরাই থাকিতে জানে, স্ফূর্ত্তি করিতে জানে, কেমন করিয়া বাঁচিতে হয় জানে। নহিলে, বিগত ভীষণ যুদ্ধে যে যোদ্ধাকে ১ ঘণ্টা পরে দেশের কাজে প্রাণ উৎসর্গ করিতে হইবে, সেও আপনা ভুলিয়া অবসর সময়ে ফুটবল খেলিয়াছে, মাছ ধরিয়াছে, আনন্দে কাটাইয়াছে। আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির জীবন, এ কথা ইউরোপীয়েরা যে ভাবে উপলব্ধি করিয়াছে, আমরা তাহা পারি না। এর এক কথায় উত্তর এবং নিশ্চয়ই সদুত্তর—আমাদের উদরান্নের চিন্তা।

রাওয়ালপিণ্ডি হইতে মারী আসিবার পথটী তত খারাপ নহে। মধ্যে মধ্যে চড়াই-উৎরাই আছে তাহাতে সাময়িক আতঙ্ক আনিয়া দেয়, কিন্তু মারী অতিক্রম করিয়া কোহালা যাইবার পথটী অত্যন্ত ভীষণ! অদ্রির উপর অদ্রি। গতিশীল মোটরে ছুটিতে ছুটিতে দেখিলাম, ছোট বড় পাহাড়গুলি সবই বিপরীত দিকে ছুটিতেছে! মহাসমুদ্রে তরঙ্গের পর তরঙ্গ যেমন অনন্তে মিশাইয়াছে, এও যে তাই! সীমাহীন, অন্তহীন ভগবানের স্বপ্রকাশ। কখনও আমরা পাহাড়ের শীর্ষস্থানে কখনও মধ্যস্থলে কখনও পাদমূলে। যখন পাদমূলে তখন ভাবিলাম, এবার হয়ত প্রাণে প্রাণে বাঁচিলাম। যখন শীর্ষদেশে তখন অতল 'খড' অর্থাৎ গহ্বরের দিকে চাহিয়া আতঙ্কে শিহরিতে লাগিলাম। আবার সৌন্দর্য্য হিসাবে অতুল দৃশ্য বায়স্কোপের চিত্রাবলীর মত নয়ন-সমক্ষে অনবরত পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। লাল, সবুজ, পীত, শ্বেত প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের শস্যক্ষেত্র, কৃষকদের ছোট ছোট কুটীর স্তরে স্তরে পর্ব্বতগাত্রে উপর হইতে নীচে নামিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে নানা জাতীয় বনফুল নয়নের ক্ষুধা মিটাইতে দাঁড়াইয়া আছে। নীচের দিকে চাহিলে মাথা ঘুরিয়া যায়, প্রতিপলে মৃত্যুর সম্ভাবনা ভগবানকে মনে পড়াইয়া দেয়। তখনই আবার তাঁহার স্মিতমূর্ত্তি যেন অভয় দিবার জন্য অতুল ও ভীষণ সৌন্দর্য্যের মাঝে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠে। এমনই মানসিক ঘাত-প্রতিঘাত প্রতিমুহূর্ত্তে চলিতে লাগিল। জ্ঞান দা'র গাড়ী অগ্রে, আমাদের গাড়ী

মধ্যে এবং মাতুল মহাশয়ের গাড়ী পশ্চাতে, এই ক্রমে চলিতে চলিতে আমরা বৃটিশ সীমানার শেষ "কোহালা" নামক ডাকবাংলায় সন্ধ্যা ৭ টার সময় পৌঁছিলাম। কোহালা পাহাড়টা সমুদ্র সমতল হইতে ২০০০ ফিট উচ্চে এবং রওয়ালপিণ্ডি হইতে ৬৪॥ মাইল দূরে। এখানকার পার্ব্বত্যপথের নিয়ম সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত মোটর প্রভৃতি দ্রুত গতিশীল গাড়ী চলিবে এবং সন্ধ্যা হইতে সারারাত্রি গো-যান চলিবে। সুতরাং বাধ্য হইয়া কোহালা ডাকবাংলায় আমাদের রাত্রিবাস করিতে হইল। মাল-পত্র সমুদয় নামাইয়া আমরা অর্দ্ধঘণ্টারও অধিক কাল বিশ্রাম করিতেছি তবু আমাদের মাতুল মহাশয়ের গাড়ী আসিল না দেখিয়া সকলে বিশেষ চিন্তান্বিত হইলাম। মনে হইল ১৫ মাইল পশ্চাতে তাঁহার মোটর আমরা দেখিয়াছি কিন্তু তাঁহার সংবাদ পাওয়া যায় কিরূপে! তার-আফিসে যাইলে তাঁহারা বলিলেন, কোথায় তার প্রেরিত হইবে? সত্যই ত। পুলিশ out-postএ গিয়া একজন লোক পাঠাইবার চেষ্টা করিতেও কোনও ফল হইল না। অমা-বশ্যার অন্ধকার রাত্রিতে কে আমাদের জন্য স্বীয় জীবন বিপন্ন করিবে? আমরা যদি তিনখানি গাড়ী একত্র চালাইতাম তাহা হইলে কত সুবিধা হইত। মাতুল মহা-শয়ের গাড়ী বিগড়াইলেও আমরা ত সাহায্য করিতে পারিতাম। অতি অসময়ে বুদ্ধির উদয় হইল বটে! ভগবানের উপর একান্ত নির্ভর না করিলে উপায়ান্তর নাই। কারণ এই অন্ধকারে আমাদের গাড়ী ফিরিয়া গিয়া যে তাহাদের অনুসন্ধান করিবে সে নিয়ম বা উপায় নাই। আমাদের ড্রাইভার দুইজন দেখিলাম একান্ত নিশ্চিন্ত। আমাদের বিপদের গুরুত্বটুকু উপলব্ধি করিবার মত জ্ঞান ও বুদ্ধি বুঝি ভগবান তাহাদিগকে দেন নাই। ভাবনার অকূল সমুদ্রে আমরা যখন ভাসমান তখন দূরবর্ত্তী মোটর-গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ এবং আলোক পথের অন্ধকারের সহিত আমাদের আকুল উৎকণ্ঠা বিদূরিত করিল। আমরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। মাতুল মহাশয়ের গাড়ী পৌঁছিল। আমাদের গাড়ী আগে আসিয়াছিল, একসঙ্গে আসে নাই কেন, এই সব কথা বলিয়া তিনি অত্যন্ত ক্রোধপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমাদের মামীও প্রায় সংজ্ঞাহীন হইয়াছিলেন। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমরা যথাসাধ্যমত বুঝাইলাম। পথে তাঁহার গাড়ী খারাপ হইয়া যাইতে পারে এ ধারণা আমরা পূর্ব্বে করিতে পারি নাই। বস্তুতঃ মাতুল মহাশয়ের উপদেশে আমরা একটা অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম। এই অভিজ্ঞতার সুফল কিন্তু পরদিন হাতে হাতে পাইয়াছিলাম। নবীন কাশ্মীর-পন্থীদের অনু-রোধ তাঁহারাও এই পথে যাইতে হইলে অন্য যাত্রীবাহী ২।১ খানি মোটরের সহিত একযোগে যাত্রা করিবেন।

কোহালায় রাত্রিবাসের দুই রকম ব্যবস্থা আছে। স্থানীয় ডাকবাংলায় এবং ছোট চালা ঘর। আমরা ডাকবাংলাটিকে নিরাপদ স্থান মনে করিয়া সেই খানেই রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করিলাম। ডাকবাংলায় রাত্রিবাসের ভাড়া প্রত্যেক লোকের ১৲ টাকা হিসাবে। মোটর রাখিবার Garageএর ভাড়া প্রতি মোটর প্রতি ॥০ আট আনা। স্থানীয় হিন্দু খাবারের দোকানে অর্ডার দিয়া মাতুল মহাশয় ও মেয়েদের জন্য জলখাবার আনাইবার ব্যবস্থা হইল এবং ডাকবাংলায় আমরা চারজন পুরুষ খাইবার অর্ডার দিলাম। প্রত্যেকের জন্য তাহারা ২।০ টাকা হিসাবে লইল, কিন্তু আহার্য্য দিল অতি কদর্য্য ও অতি অল্প পরিমাণে। এইখানে বলি। রাগ ভাল, আমরা প্রত্যেকেই অল্পভোজী। আমাদেরই যখন অর্দ্ধভুক্ত থাকিতে হইল তখন জানিনা যাঁহারা অতিভোজী তাঁহাদের অবস্থা কিরূপ হয়। মনে হইল, গালে চড় মারিয়া আমাদের নিকট উহারা টাকা লইল। একান্ত নিরুপায়ে আক্কেল সেলামী দিবার পর শুনিলাম, এই ডাকবাংলায় আহার্য্য ও বন্দোবস্তের ভার কোনও কন্‌ট্রাক্টর মহোদয়ের হস্তে ন্যস্ত। আমাদের যদি একটু পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা থাকিত তাহা হইলে আমরা আরও ২ ঘণ্টা পূর্ব্বে রওয়ালপিণ্ডি হইতে যাত্রা করিয়া ডোমেল বা উরি ডাকবাংলায় অবস্থান করিয়া রাজসুখে অতিবাহিত করিতে পারিতাম।

পরদিন বেলা ৮টার সময় কোহালা ডাকবাংলা হইতে আমরা যাত্রা করিলাম। এইস্থানে ঝিলাম নদীর উপর একটী সেতু আছে, উহা ব্রিটিশরাজ ও কাশ্মীররাজের

সীমানাকে সংযোগ করিয়া রাখিয়াছে। এই সেতু অতিক্রম করিয়াই হিন্দু মিত্র-রাজ্যে আমরা পদার্পণ করিলাম। এখানে ঝিলাম নদীর ও উপনদীর বেগ অতিপ্রবল। উপলখণ্ডের উপর উহার গতি প্রতিরোধ হওয়ায় ঠিক যেন রেলগাড়ী যাইবার মত ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে খুব ঔৎসুক্যের সহিত চলিলাম, দেশীয় রাজার রাজ্য-পরিচালন পদ্ধতি। কোহালা হইতে ডোমেলের দূরত্ব ১১ মাইল। বলা বাহুল্য, এখন হইতে আমরা মোটর তিন খানি মাতুল মহাশয়ের উপদেশানুযায়ী একত্র চালাইতে লাগিলাম। পথটিও অভয়প্রদ নহে। সেইজন্য কাশ্মীর ষ্টেট যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন মনে হইল। পথের পার্শ্বে 'খড্' বা অতল গহ্বরের দিকে আন্দাজ ১ বা ½ ফুট পাথরের নুড়ি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে তাহা হইতে অশ্ব বা গোযান কতকটা নিরাপদ হইতে পারে মনে হয়, কিন্তু বেগবান মোটরের গতি তাহা রোধ করিতে সমর্থ কি না তাহা বিশেষজ্ঞের আলোচ্য। 'নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল' কিন্তু প্রায় পথের প্রতি বাঁকের নিকট মোটর চালকের দৃষ্টি-আকর্ষণ করিবার জন্য যে চিহ্নগুলি আছে তাহা সকলকে সাবধান করিয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ করে।

মারী হইতে কোহালার পথে ৪।৫টা এমনি সতর্কীকরণ চিহ্ন দেখিয়াছিলাম মনে হয়। ঐ পথের P. W. D. এইরূপ আরও কতকগুলি চিহ্ন দেন নাই কেন, বুঝিতে পারিলাম না।

Danger, Beware of the quarry এবং ⊃, O, S, Z, প্রভৃতি অক্ষরগুলির আমরা এক একটা অর্থ করিয়া লইয়াছিলাম। ⊃ অর্থে পথটি ঐ চিহ্নের মত ঘুরিয়া গিয়াছে, O অর্থে চক্রের মত, S ও Z অর্থে ঐ অক্ষরদ্বয়ের মত serpentine এবং zigzag। ড্রাইভারেরা ঐ চিহ্নগুলি দ্বারা গাড়ীর গতির হ্রাস বৃদ্ধি করে। এটা অবশ্য আমাদের অভিজ্ঞতার ফল এবং প্রত্যেক বারে মিলাইয়া আমাদের ধারণাটিক প্রামাণিক হইতে দেখিয়াছি। প্রত্যেক বাঁকের মুখে চিহ্ন দেখিয়া মাতুল মহাশয় মোটর-চালককে মোটরের গতির হ্রাস করিতে বাধ্য করিতেছিলেন।

পথে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। দূরে পাহাড়ের উপর কতকটা শ্বেত স্তূপের মত শুভ্র মেঘ দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইলাম। শুনিলাম উহা নাকি বরফ! সুরসিক বন্ধুবর হৃষীকেশ বলিল, "শুভ্র তুষার কিরীটিনী।" বাস্তবিকই এও তাই! অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য! জীবনটা যেন সার্থক হইয়া গেল। আত্মহারা হইলাম! ইন্দুবাবুর চক্ষু ও পানভরা মুখখানি অচল হইয়া গেল। নির্নিমেষ নয়নে খানিকটা সৌন্দর্য্য উপভোগ করে বলে উঠলেন—'না পারিনে আর এত সৌন্দর্য্য একলা উপভোগ করতে!'

ডোমেল ডাকবাংলায় পৌঁছিলাম বেলা ৯॥০টার সময়। রাওয়ালপিণ্ডি হইতে ডোমেল ৮৩॥০ মাইল দূরে। পাহাড়ের উপর এই স্থানটী একটী ছোট-খাট সহর বিশেষ। কাশ্মীরের বাহির হইতে কেহ যাহাতে সংক্রামক ব্যাধি লইয়া কাশ্মীর রাজ্যে যাইতে না পারে তাহার প্রতিরোধের জন্য এখানে স্বাস্থ্য-পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। আমরা যখন যাইতেছিলাম, তখন রাওয়ালপিণ্ডিতে প্লেগ হইতেছিল; সুতরাং আমাদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষাটা একটু ভাল করিয়াই দিতে হইয়াছিল। কাশ্মীরে কোনো শুল্কদেয় সামগ্রী লইয়া যাইবার নিয়ম নাই। মহারাজা ভদ্রতার খাতিরে নিয়ম করিয়াছেন যে যাত্রীদের মোট, লগেজ প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে না এবং যাত্রীও যাহাতে এই ভদ্রতার সদ্ব্যবহার করিয়া শুল্কদেয় সামগ্রী গোপনে কাশ্মীরে লইয়া না যান, সে বিষয়ে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন।

Personal Luggage এর অর্থ স্বীয় ব্যবহার্য্য দ্রব্য নিচয়। ইহার উপর শুল্ক দিতে হয় না। নিম্নলিখিত দ্রব্য গুলিও personal luggage এর অন্তর্ভুক্ত।

2 Guns, 2 Rifles, 500 Cartridges, one Pistol or Revolver। মদ্যাদি ও আহার্য্য যাহা শ্রীনগরে পাওয়া যায় তাহা Personal luggage অন্তর্ভুক্ত নহে। পথে ব্যবহারের মত এক খোলা বোতল মদ্য, অর্দ্ধ বোতল স্পিরিট, সামান্য মাত্রায় সৌগন্ধ এসেন্সের উপর শুল্ক দিতে হয় না। গোমাংস বা গোমাংসে প্রস্তুত কোন দ্রব্য কাশ্মীরে লইয়া যাইতে দেওয়া হয় না।

ডোমেলে প্রত্যেক মোটর গাড়ীর জন্য ৫৲ টাকা টোল

চার্জ্জ দিতে হয় এবং যাত্রীদিগকে তাহাদের নাম, ঠিকানা, উদ্দেশ্য প্রভৃতি খাতায় লিখিয়া নাম সহি করিয়া দিতে হয়। বিশেষ ক্ষুধা না থাকিলেও আহারাদির ঝঞ্ঝাটটুকু এই ডাক-বাংলায় সারিয়া লইব ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম,কিন্তু আমাদের দাশু দা' বলিলেন, এখানে নয়, আমরা ত এইমাত্র পেটভরা টিফিন্ খাইয়া আসিতেছি, উরী ডাকবাংলায় আহার করিব। তাহাই স্থির হইল। তুচ্ছ বা উচ্চ তাহার কোনও কথাই আমরা ঠেলিতে সাহস করিতাম না। কারণ ইতিপূর্ব্বে সিমলা পাহাড়ে বার কয়েক গিয়া তিনি পাহাড়ী অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে লাভ করিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি আমাদের এই দুর্গম পথের কাণ্ডারী, পাহাড়ী-পাণ্ডা এবং আবশ্যক-অনাবশ্যক প্রশ্নের সদুত্তরদাতা, পরামর্শ-দাতা প্রভৃতি সবই। এই কারণেই আমরা তাঁহার কাশ্মীরি নাম রাখিয়াছিলাম, 'গুলবিহারী'।

ক্রমশঃ।

চাঁদপ্রতাপের ব্রত-কথা।

(১২) কুলাই ব্রত।

[শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

অগ্রহায়ণ মাসের রবি কিংবা বৃহস্পতিবার দিবাভাগে এই ব্রত করা হয়। পূর্ব্বাহ্নেই মহিলারা 'পিঠালি' (জল-সিক্ত তণ্ডুলচূর্ণ) দিয়া উঠানে এক খানা 'কুলা' (বাঁশ নির্ম্মিত শস্যাদি আবর্জ্জনা শূন্য করিবার পাত্র বিশেষ), একটি বাহক সমেত পাল্কী ও এক খানা মাঝিসহ নৌকার চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন। চাউল ভাজার ছাতু (চূর্ণ) দিয়া 'কুলা'তে একটি পুত্তলিও আঁকিয়া দেওয়া হয়। খৈ, মুড়ি, মোয়া, ছাতু, দধি, দুগ্ধ, কমলা, কলা, তিলা, কদমা, (গুড়ের দ্বারা প্রস্তুত মিষ্ট দ্রব্য) বাতাসা ইত্যাদি উপকরণ চিত্রাদির নিকট সাজাইয়া দেওয়া হয়। চিত্রাদির সম্মুখে পল্লবাদি সহ জলপূর্ণ ঘট ও পুষ্পপত্রাদি স্থাপন করা হয়।

যথাসময়ে পুরোহিত শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে কুল দেবতার পূজা করিয়া থাকেন। দেবতার মূর্ত্তি গঠিত হয় না। ঘটেই পূজা করা হইয়া থাকে।

ভক্তিসহকারে কুলদেবতার অর্চ্চনা করিলে শ্বশুর ও পিতৃকুলের কেহই কোনরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় না, ইহাই ললনাগণের দৃঢ় বিশ্বাস। তাই তাহারা যথাসময়ে যথানিয়মে ভক্তিপ্লুত মনে এই ব্রত করিয়া থাকেন। আত্মীয় স্বজনগণ চিরসুখে কাল যাপন করুক, এই ইচ্ছা মহিলামাত্রেই হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন। তাই নিজেদের সুখ-সুবিধাদির প্রতি ক্ষণেকের জন্যও দৃক্‌পাত না করিয়া, তাহাদের কুশলের নিমিত্তই রমণীগণ ভগবানের চরণে নিয়ত প্রার্থনা করিয়া থাকেন হিন্দু মহিলাগণের মাসে মাসে নানা ব্রত করিবার ইহাও যে একটি প্রধান কারণ, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

পূজা হয় কুলদেবতার, কিন্তু ব্রতের নাম 'কুলাই' যে কি করিয়া হইল, তাহা জানিতে পারা যায় না। কুল দেবতাকেই হয়ত রমণীগণ চলতি ভাষায় 'কুলাই' বলিয়া থাকেন।

এই ব্রতের 'কথা' বলিতে শুনা যায় না। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু-ললনাদিগকে এই ব্রত করিতে দেখা যায় না। কোন কোন অঞ্চলে বাস্তুপূজার দিবসেই একই সময়ে এক স্থানেই এই ব্রত করা হয়।

বহুপত্নীক।

[শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার]

আদালতে লোকারণ্য। কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া আসামী জবানবন্দী দিতেছিল। অদূরে একটি বেঞ্চের উপর তার চারিজন "অর্দ্ধাঙ্গিনী" পাশাপাশি বসিয়াছিল; প্রত্যেকের মুখে উৎকণ্ঠার ভাব—কিসে আসামী মুক্তি পায়!

তাহাদের কাহারও কুঞ্চিত অলকদাম লীলাভরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কাহারও বিম্বাধরে কুন্দদন্তপাতি ফুটিয়া উঠিয়াছে, কাহারও সুনীল আয়ত নেত্রদ্বয় সুর্ম্মারঞ্জিত পক্ষ-শোভায় সুন্দরতর হইয়া উঠিয়াছে। শুধু একজন তাহাদের মধ্যে কুরূপা—রূপের ভাণও তার ছিল না। চারিজনেই সাগ্রহে আসামীর প্রতি চাহিয়াছিল। প্রত্যেকেই ভাবিতেছিল 'সে' নহিলে বুঝি জীবনই বৃথা!

আসামী বলিতেছিল—"জীবনে মাত্র একটি স্ত্রীলোককে আমি ভালবাসিয়াছি।"

স্ত্রীলোক চারিজনে পরস্পরের প্রতি গর্ব্বভরে চাহিয়া সোজা হইয়া বসিল।

"রূপে গুণে তার তুলনা ছিল না। কি সে কুঞ্চিত নিবিড় কেশদাম, সুনীল আয়ত নেত্রে কি সে স্বর্গের মাধুরী, বিম্বাধরের কি সে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য!"

আত্মপ্রশংসাকুণ্ঠিতভাবে তাহাদের চারিজনের চক্ষু নমিত হইয়া আসিল।

"সে আমার প্রাণের অধিক প্রিয় ছিল। দেবীর ন্যায় আমি তাহাকে পূজা করিতাম। যখন সে মারা গেল—"

চারিজন স্ত্রীলোকই সহসা যুগপৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর ধীরে ধীরে পুনরায় বসিয়া পড়িল।

"যখন সে মারা যায়, বিশ্বজগৎ আমার কাছে শূন্য হইয়া গেল। শোকে আমি উন্মাদ হইয়া গেলাম। কত দীর্ঘ দিন, কত বিনিদ্র রজনী পথে পথে ঘুরিলাম—'তার' মত, তার ছায়ার মত, যদি কাহাকেও এ জগতে আর দেখিতে পাই! এমন অবস্থায় একদিন আমার দ্বিতীয়া স্ত্রীকে দেখি। এর চুলগুলি আমার সে দেবী-প্রতিমার কুঞ্চিত কেশদামের—"

নং ২ অর্দ্ধাঙ্গিনী সশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ঘৃণা-ভরে আদালত-গৃহ ত্যাগ করিলেন।

"কিন্তু, বিশ্বজগৎ-ভোলা তার সে সপ্রেম দৃষ্টি!—এ বিশাল সৃষ্টির মাঝে দেশদেশান্তর খুঁজিয়া তেমনটি ত আর দেখিলাম না! পথে ঘাটে, সহরে পল্লীতে যেখানেই স্ত্রীলোক দেখিয়াছি তাহার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়াছি। শেষে একদিন আমার তৃতীয়া স্ত্রীর চোখে সে স্বপ্ন-সুষমার ছায়া যেন দেখিলাম।"

নং ৩ অর্দ্ধাঙ্গিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আসামীর প্রতি তীব্র দৃষ্টি হানিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

"তার পর কতদিন ধরিয়া তার সে কুন্দদন্তপাতির ভুবনভোলান হাসিটির জন্য উন্মুখ হইয়া শেষে এই চতুর্থী স্ত্রীকে পাই।"

নং ৪ অর্দ্ধাঙ্গিনী অপূর্ব্ব মুখভঙ্গীতে তার দন্তপাতি বিকাশিত করিয়া প্রস্থান করিলেন।

"কিন্তু, হায়, আশা ত পূরিল না, চিত্তের ক্ষুধা ত গেল না। 'তার' যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ—অন্তরের সৌন্দর্য্য—এদের কাহারও মধ্যে ত তাহা পাইলাম না। বিক্ষুব্ধ চিত্তে কত দেশদেশান্তর ঘুরিলাম। অবশেষে আমার পঞ্চমা স্ত্রীর সহিত একদিন পরিচয় হইল। কিছুদিন আলাপেই বুঝিলাম তার কুশ্রী কুরূপ দেহের অন্তরালে—"

অর্দ্ধাঙ্গিনী নং ৫ ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন। *

---

* ইংরাজী গল্প হইতে।

কাগজের ঠোঙায় খাবার বিক্রয়।

মুদি, ফিরিওয়ালা, চানাচুরওয়ালা এবং সরকারী বাজারের ফলবিক্রেতারা তাহাদিগের বিক্রয়ের জিনিসগুলি, হয় শাল-পাতার ঠোঙায় নতুবা কাগজের ঠোঙায় বিক্রয় করে। কচি ছেলেদের খেলনার বাঁশীগুলিরও মুখ কাগজ দিয়া ঢাকা থাকে। শালপাতাগুলি বনে জঙ্গলে পড়িয়া থাকে; সেখানে লোকের বা পশুপক্ষীর যাতায়াত তেমন নাই; কাজেই যদিও দু'চারখানি শালপাতায় পশুপক্ষীর বিষ্ঠা লাগিয়া থাকিতে পারে, অধিকাংশ শালপাতায় ধূলা ছাড়া অপর কিছুই না লাগিবার কথা। আর সে ধূলা—খোলা যায়গার ধূলা; তাহাতে মানুষ, পশু বা পক্ষীর বিষ্ঠা, থুথু, গয়ার, পুঁয কিছুই থাকে না; কাজেই সে ধূলা তাদৃশ মারাত্মক নহে। কিন্তু শালপাতাকে রেল বা জল পথে আমদানি করিতে হয়; শালপাতা দোকান-ঘরের অনেকটা জায়গা জুড়িয়া থাকে, শালপাতা ফাটিয়া যায় প্রভৃতি নানা কারণে কতকটা অসুবিধার জিনিষ। অথচ আজকাল কাগজ অত্যন্ত সুলভ। কাগজের ঠোঙা তৈয়ারী করিয়া গরীব মুসলমানের অন্তঃপুরচারিণী মেয়েরা পয়সা রোজগার করিতে পারেন; কাগজের ঠোঙা অল্প যায়গা জুড়িয়া থাকে। কাগজে মুড়িয়া বিষ্ঠা লইয়া যাওয়া যায়—কেন না সেটা বিলাতী সভ্যতার অনুবর্ত্তী; কিন্তু শাল-পাতায় মুড়িয়া সোনাও লইয়া যাওয়া "ছোটলোক" বা অসভ্য বা গরীব লোকের কাজ! এই সকল কারণে, শাল-পাতা একরকম উঠিয়াই যাইতেছে—তাহার স্থানে কাগজের ঠোঙার বাহুল্যই দেখা যাইতেছে।

এই ঠোঙার কাগজ কোথা হইতে আসে, কাহারা প্রস্তুত করে—প্রভৃতি জানিবার বিষয়। সওদাগরী বা সরকারী আপিসের ও আদালতের পুরাতন কাগজপত্র, স্কুল কলেজের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন কাগজ পত্র; গৃহস্থের পড়া পুরাতন খবরের কাগজ, রাস্তায় ফেলিয়া দেওয়া কাগজ, এই সমস্তই সহরে দপ্তরী-পাড়ায় বা অপরাপর আড্ডায় জমা হয়। যে সব ঘরে কাগজগুলি জমা থাকে প্রায়ই সে সব ঘর কাঁচা ঘর, অন্ধকার ঘর এবং নোংরা ঘর। সেই কাগজ মাড়াইয়াও লোকে চলে, তাহার উপরে শয়নও করে, তাহার উপরে থুথু গয়ারও ফেলে। সুস্থ ও অসুস্থ সকল রকম লোকের হাতে ঘাঁটাঘাঁটি হইয়া, গায়ের ঘাম ও থুথু গয়ার লিপ্ত হইয়া, ইঁদুর, আরসুলা, মাকড়সা, টিকটিকি ও বিছা প্রভৃতির ময়লা লিপ্ত হইয়া ড্রেণের পাঁক, কাণচুলকাণির ময়লা, মুরগী, হাঁস, পায়রা প্রভৃতির মলদুষ্ট হইয়া, এই সকল কাগজ ঠোঙা প্রস্তুত কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। আর সেই সব কাগজের ঠোঙা খুলিবার সময়ে দোকানীরা ফুঁ দিয়া খোলে, তাহার সঙ্গে কত থুথু পড়ে! আর ব্যস্ত থাকিলে, উড়িয়ারা পায়ে করিয়া চাপিয়া ধরিয়া শালপাতা ছেঁড়ে।

তাহার পরে, যাহারা এই কাগজের ঠোঙা প্রস্তুত করেন, তাঁহারা অধিকাংশই অত্যন্ত গরীব গৃহস্থের মেয়ে। আর গরীবের ঘরেই প্লেগ, কলেরা, টাইফয়েড, যক্ষ্মাকাশ প্রভৃতির ছড়াছড়ি। হয়ত বা যে গরীবের বৌ-ঝি ঠোঙা প্রস্তুত করে, জ্বরগায়ে, কাশিতে কাশিতে অথবা নাকের সিকনি মুছিতে মুছিতে সে ঠোঙা তৈয়ারী করে। অনেক গরীবের বাড়ীতে, নাকের সিকনি, কচিছেলেদের মলদ্বার প্রভৃতি কাগজেই মোছা হয়। আবার সেই সকল কাগজও পুরাতন কাগজের গাদায় জমা হয় এবং তাহা হইতে ঠোঙা তৈয়ারি হয়!!!

কাগজে নূতন ও পুরাতন জুতা মোড়া হয়; হাতের তেল-কালি, পায়ের কাদা, এসবও মোছা হয়; প্লেগে মৃত ইন্দুরও কাগজে মুড়িয়া উঠাইয়া ফেলা হয়; আবার, বসন্ত রোগীর ঘায়ের মামড়ীও কাগজে জড় করা হয়; দাড়ি কামাইয়া লোকে কাগজে মোছে এবং ঘাযুক্ত মাথা কামাইয়া কাগজে চুল জড় করে; কাজেই, কাগজে লাগে

না, এমন ময়লাই দেখি না। লোকে পুরাতন কাগজ বিক্রয় করিবার সময়ে টুক্‌রা, ময়লা কিছুই বাদ দেয় না— সমস্তই বিক্রয় করে। পুরাতন কাগজ বিক্রেতাওয়ালারাও দাগী, ময়লা—কোনও রকম কাগজ বাদ দেয় না। তাহার উপরে, রাস্তায় যে সব টুক্‌রা বা আস্ত কাগজ পড়িয়া থাকে, সে সবও সযত্নে সংগৃহীত হয়। আর সেই ময়লা কাগজ, ময়লা ঘরে বদ্ধ থাকিয়া, সাধারণতঃ বেশীর ভাগ ময়লা লোকেদের দ্বারা ঠোঙায় পরিবর্ত্তিত হয়। আর আমরা সেই সব ঠোঙায় অবিচারিত চিত্তে খাবার লইয়া আসি। আর সেই জাতীয় কাগজে রং করিয়া ছেলেদের খেলার বাঁশী প্রভৃতির গায়ে জড়ান হয়!

যে দেশে "অন্নের বিচার" সক্‌ড়ী তত্ত্ব, স্বপাক ভোজন বিধি এতই কড়াকড়ি ভাবে ছিল, আজ সেখানকার ব্যবহার শ্রীক্ষেত্রেরও অনেক উপরে উঠিয়াছে! আর আজ তাই ব্যারাম, জরা ও অকালমৃত্যু ঘরে ঘরে !!!

অবান্তর হইলেও, এই প্রসঙ্গে আরো দু'একটি সমান মারাত্মক জিনিষের উল্লেখ করিয়া রাখি—যদি কাহারো চোখ ফুটে :—

(১) বিড়ির দোকানের শালপাতাগুলি সরকারী ময়লা জলের "কলের" গর্ত্তে ভিজাইয়া রাখা হয়—আর সেই জলে কুষ্ঠরোগী যা ধোয়, গরীবের ছেলেরা জলশৌচও করে।

(২) চায়ের দোকানে এক বাল্‌তি ময়লা জলে, সারাদিন ধরিয়া চায়ের বাটি ডোবাইয়া "ধোয়া" হয়।

(৩) বরফের জন্ম "করাতের গুঁড়া" রাস্তায় শুকাইতে দেওয়া হয়, আর কত লোক সেই গুঁড়াগুলিকে মাড়ায়, কত লোকে তাহার উপরে থুথু গয়ার ফেলে।

(৪) "হেয়ার কাটারের" বাড়ী যে "পাউডারের পাফ" চিরুণী, বুরুশ, তোয়ালে, "লুঙ্গী" প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়, তাহাতে কত সহস্র বৎসরের কত জাতীয় কত লোকের ঘাম ও ময়লা জমাট হইয়া থাকে, তাহা কেহ দেখিয়াছেন কি?

(৫) ময়রার দোকানে খোস, দাদ প্রভৃতি চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে খাবার তৈয়ারি করা; ঘাম টস্‌ টস্‌ করিয়া পড়িতেছে এমন গায়ে খাবার তৈয়ারি করা; "ডাষ্ট্‌বিন্‌" ও রাস্তা ঝাঁট দেওয়া, ধূলা খাবারের উপর পড়া—এ সবও দেখিবার জিনিষ।

(৬) চাকরেরা নিজেদের মুখের কসের পান বা থুথু মুছিয়া সেই হাতেই খাবার লইয়া, তাহাদের কুৎসিত রোগ ও ময়লা-দুষ্ট কাপড়ে ঢাকিয়া খাবার আনে, আর আমরা তাহাই খাই !!

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়।

সূর্য্যের দ্বারা যন্ত্র চালনা।

বর্ত্তমান সময়ে যাবতীয় শিল্প, বড় কারখানা প্রভৃতির যন্ত্রসকল কয়লার সাহায্যে পরিচালিত হইয়া থাকে, কিন্তু এই কয়লা কি চিরকাল থাকিবে? একদিন না একদিন ইহা শেষ হইবেই। তখন এই সকল কারখানা, এত জাহাজ, রেল, প্রভৃতি কি প্রকারে চলিবে? এই সকলগুলি না চলিলে মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিষাদি প্রস্তুত হইবে না এবং জিনিষ সকল এক স্থান হইতে অপর স্থানে পাঠান যাইবে না, তাহা হইলে ব্যবসায় বাণিজ্য সকলই বন্ধ হইয়া যাইবে। সহরবাসী লোকসকল কলে জল পাইবে না, গৃহে বিদ্যুতালোক ও গ্যাস পাইবে না, সহরে ট্রাম চলিবে না, রেল, ষ্টিমার বন্ধ থাকিবে, সেজন্য লোক পরিধেয় বস্ত্র ও আহার্য্য দ্রব্যাদি পাইবে না। এই সকল ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বৈজ্ঞানিকগণ এত কাল ধরিয়া কয়লার পরিবর্ত্তে কোন্‌ জিনিষ ব্যবহার করা যাইতে পারে, তাহার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন।

ইতিমধ্যেই অনেক কার্য্যে কয়লার পরিবর্ত্তে কেরসিন তৈল ব্যবহার করা হইতেছে। অনেক যুদ্ধ জাহাজে কয়লার পরিবর্ত্তে তৈল ব্যবহার করা হইতেছে এবং ঐ তৈলের চুল্লী দ্বারা বাষ্প হইতেছে, তাহারই জন্য জাহাজ চলিতেছে। অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানায় তৈল-চালিত যন্ত্রের দ্বারা কার্য্য হইতেছে। পৃথিবীর মাত্র কয়েকটি স্থানে তৈল পাওয়া যায় এবং এই তৈলও চিরদিন পাওয়া যাইবে না, একদিন ইহা নিঃশেষ হইবেই। তখন কি উপায় হইবে ইহা ভাবিয়া একজন জার্ম্মাণ ইঞ্জিনিয়ার এক প্রকার এঞ্জিন

নির্ম্মাণ করিলেন যাহা কেরোসিন বা তাহা অপেক্ষা গাঢ় খনিজ তৈল দ্বারা যেমন চলে তেমনি উদ্ভিজ্জ তৈল যথা সরিষা প্রভৃতিতে চলিয়া থাকে। এই এঞ্জিন প্রস্তুত হওয়ায় সমগ্র সভ্য জগতে একটা নূতন জিনিষ আবিষ্কার হওয়ার একটা সাড়া পড়িয়া গেল। কিন্তু এই এঞ্জিনেও কতকগুলা অসুবিধা আছে। যদি বৃষ্টি অভাবে সেই সকল ফসল যাহা হইতে বীজ উৎপন্ন হয়, তাহার চারা শুষ্ক হইয়া যায় তখন কি হইবে? তখন এই এঞ্জিন দ্বারা কোন কার্য্য করা যাইবে না।

উপরোক্ত তিন প্রকার উপায়ে আমরা যন্ত্র হইতে শক্তি পাইতে পারি কিন্তু তাহা ছাড়া বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা কার্য্য করান যাইতে পারে। বৈদ্যুতিক শক্তি পাইতে হইলে উহার যন্ত্র পরিচালনের জন্য কয়লার প্রয়োজন, কয়লা না থাকিলে বিদ্যুতের যন্ত্র চলিবে না। অনেক স্থানে নদীর জল, পাহাড়ীয়া নদী, ঝরণা প্রভৃতির দ্বারা বৈদ্যুতিক যন্ত্র চালাইয়া তাহা হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া গিয়া থাকে। এই উপায়ে কয়লা, তৈল প্রভৃতির প্রয়োজন নাই, নদীর প্রবাহের জন্যই ঐ সকল যন্ত্র চলিতে থাকে। অনাবৃষ্টি হইলে ঐ বৈদ্যুতিক যন্ত্র চলিবে কিরূপে? তাহা ছাড়া পৃথিবীর সকল নদীতে যে শক্তি আছে তাহার দ্বারাও আমাদিগের যাহা প্রয়োজন তাহা পূর্ণ হইবে না। যন্ত্র চালাইবার অন্যরূপ শক্তি পাইবার চেষ্টা চলিতেছে।

কত শত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীস দেশীয় বৈজ্ঞানিক সূর্য্যালোক হইতে উত্তাপ পাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং সূর্য্যালোক কেন্দ্রীভূত করিয়া শত্রুর যুদ্ধ জাহাজ ভস্মীভূত করিয়াছেন। এই সকল কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়, কিন্তু সহস্র বৎসর গত হইল বিনামূল্যে যে সূর্য্যালোক পাওয়া যায় তাহা হইতে শক্তি সংগ্রহ করিবার বিশেষ কোন চেষ্টা মানুষ জাতির মধ্যে হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে কয়লা, তৈল প্রভৃতি পাওয়া ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে এবং যুদ্ধ বিগ্রহের সময়ে তাহা পাওয়াও দুষ্কর হইয়াছে। তাহা ছাড়া ঐ সকল দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় শিল্পজাত দ্রব্যেরও মূল্য বেশী হইয়াছে, সেই জন্য যে সকল জাতির অনেক কয়লার খনি আছে কিম্বা তৈলের খনি আছে তাহারা যত সুলভে শিল্পজাত দ্রব্য তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করিতে পারিবে, অন্য জাতি তত সুলভে শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবে না এবং সেজন্য উহার ক্রেতা থাকিবে না। বর্ত্তমান সময়ে জার্ম্মাণীতে কি প্রকারে এত সুলভে নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছে। রুঢ় প্রদেশ ফরাসিগণ অধিকার করিয়া তথাকার কয়লা নিজ দেশে লইয়া যাওয়ায় জর্ম্মণীতে কয়লার অত্যন্ত অভাব হইয়াছে। এই অভাব দূর করিবার জন্য তীক্ষ্ণবুদ্ধি জর্ম্মণগণ তাহাদিগের দেশস্থ সকল নদী, স্রোতস্বতী, ঝরণা প্রভৃতি যন্ত্র লাগাইয়া বৈদ্যুতিক শক্তি সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারা কারখানা চালাইতে আরম্ভ করায়, জর্ম্মণ শিল্পজাত দ্রব্য সকল অত্যন্ত সুলভ হইয়াছে। তাহাদের আর মূল্য দিয়া কয়লা ক্রয় করিতে হয় না, সেজন্য তাহারা অন্যান্য দেশের অপেক্ষা সুলভে জিনিষ বিক্রয় করিতে পারিতেছে। রুঢ় প্রদেশ ফরাসিগণ অধিকার করায় অনেক জর্ম্মাণ কারখানার মালিকগণের শাপে বর হইয়াছে।

ভবিষ্যতে যে সূর্য্যালোক দ্বারা অনেক কল ও কারখানা চলিবে তাহার পূর্ব্বাভাব বুঝিতে পারা যাইতেছে। সূর্য্যালোক কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য সিকি মাইল লম্বা ও সিকি মাইল চওড়া বৃহৎ আয়না ও লেন্স কাচের প্রয়োজন। ইহাতে সূর্য্য কিরণের উত্তাপ শত শতগুণ বাড়িয়া যায় এবং শক্তিও অধিক উৎপন্ন হয়। বিদ্যুৎকে বাঁধিয়া মানুষ যেমন এত কাল কার্য্য করাইয়াছে, সূর্য্য রশ্মিকেও তেমনি করিয়া বাঁধিয়া মানুষ তাহার আপন কার্য্য করাইয়া লইবে। গ্রীক সভ্যতার সময় হইতে মানব জাতি সূর্য্য কিরণ হইতে কোন কোন শতাব্দীতে শক্তি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কোন বৃহৎ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পূর্ব্বে মানুষ অনিশ্চিত ভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী নানাদিকে অনুসন্ধান করিয়াছে কিন্তু তাহারা প্রাপ্তব্য বিষয়ের নিকটেও অগ্রসর হইতে পারে নাই। বাষ্প আবিষ্কারের সময়ে, বিদ্যুৎ আবিষ্কারের সময়ে, ব্যোমযান আবিষ্কারের সময়ে এইরূপই ঘটিয়াছে। হঠাৎ একদিন জিনিষটি আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে এবং মানুষের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। একই সময়ে তিন বা চারিজন একই জিনিষ আবিষ্কার করিয়াছে দেখা যায়। উদা-

স্বরূপ স্বরূপ বিনা তারে টেলিগ্রাফের কথা বলা যাইতে পারে। একই সময়ে ভারতে সার জগদীশচন্দ্র বসু ও ইটালিতে মার্কনি বিনা তারে টেলিগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

সম্ভবতঃ পুনর্ব্বার একই সময়ে সূর্য্যকিরণ হইতে শক্তি উৎপন্ন করার আবিষ্কার হইবে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র আবিষ্কারকগণ এইজন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে ব্যস্ত হইয়া আছেন। আমেরিকার রাজধানী নিউইয়র্কের বিখ্যাত আবিষ্কারক নিকোলা টেসলা এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়াছেন, ইটালির অন্তর্গত বোলোনা সহরের আবিষ্কারক সিয়ামিসিয়ান বলেন যে, কয়েক বৎসর পরে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বৃহৎ কাচের গম্বুজ প্রভৃতি ও বৃহৎ নল ছড়াইয়া থাকিবে এবং তাহা দ্বারাই সূর্য্য হইতে শক্তি সংগৃহীত হইবে। আমেরিকার স্মিথ্‌সোনিয়ান ইনষ্টিটিউট নামক শিক্ষালয়ে সূর্য্য কিরণ হইতে তাড়িত উৎপন্ন করিবার এক উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং শীঘ্রই উহা কার্য্যে পরিণত করা হইবে। বার্ণার্ড গ্রসম্যান্ নামে এক ২৪ বৎসর বয়স্ক আবিষ্কারক দুইটি যন্ত্রদ্বারা সূর্য্য কিরণ প্রতিফলিত করিয়া ও সূর্য্য কিরণ কেন্দ্রীভূত করিয়া একস্থানে আলোক ফেলিয়া তদ্দ্বারা বাষ্প উৎপন্ন করিয়া এক এঞ্জিন চালাইতেছেন।

বিজ্ঞানবিদ্‌গণ মনে করেন যে সূর্য্যের তেজ কমিয়া আসিয়াছে, যাহাতে ইহা সঞ্চয় করিয়া রাখা যায় তাহারও উপায় বাহির করার প্রয়োজন হইয়াছে। ষ্টিনমিজ নামক এক অদ্ভুত ও জ্ঞানী আবিষ্কারক বলিয়াছেন যে যদি ভবিষ্যতে সূর্য্য কিরণ হইতে শক্তি সঞ্চয় করিবার উপায় বাহির না হয় এবং তাহাতে যদি মানবজাতি খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন করিবার উপায়ও না করিতে পারে তবে কয়েক শত বৎসরের মধ্যে খাদ্য অভাবে মানব জাতি ধ্বংস হইয়া যাইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সূর্য্যালোক হইতে যে শক্তি পাওয়া যাইবে তাহা সমগ্র পৃথিবীর কয়লা ও নদীর স্রোত হইতে প্রাপ্ত শক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে। পৃথিবীতে যতটা জমীতে চাষ হয় তাহাতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার মানুষের আহার্য্য সংগ্রহ হইতে পারে, কিন্তু মানব জাতির সংখ্যা দিন দিনই বাড়িয়া যাইতেছে, তখন কি উপায় হইবে? তখনকার জন্য পূর্ব্ব হইতেই সূর্য্য কিরণ দ্বারা অধিক খাদ্য দ্রব্য উৎপন্নের ব্যবস্থা করা উচিত।

১৯০০ সালে কলিকাতার বিডন উদ্যানে যখন কংগ্রেস হয়, তখন যে শিল্পপ্রদর্শনী তথায় হইয়াছিল তাহাতে ভারতীয় কোন এক আবিষ্কারক আয়না দ্বারা সূর্য্যালোক প্রতিফলিত করিয়া লুচি, তরকারী তৈয়ারী করিয়া দর্শকগণকে প্রীত করিয়াছিলেন। সম্প্রতি মর্ডেন্ট উইলসন ল্যাবরেটরীর ডাঃ এবট্ এইরূপে সূর্য্য হইতে উত্তাপ সংগ্রহ করিয়া রন্ধনের কার্য্য করিতেছেন। দশ ফুট লম্বা ও সাত ফুট চওড়া আয়নার দ্বারা তিনি সূর্য্য কিরণ সংগ্রহ করিতেছেন। তাহা ছাড়া একটা যন্ত্র ঐ আয়না ক্রমাগত সরিয়া যাইয়া সূর্য্য কিরণকে ঠিক একই স্থানে রাখিতেছে তাহাতে আকাশে সূর্য্য যখন যে স্থানেই থাকুক না কেন, কিরণ ঠিক একই স্থানে প্রতিফলিত হইয়া পড়িতে থাকে।

সূর্য্যের উত্তাপ ১০৮০০ ডিগ্রী, ইহার শতকরা ৭০ ভাগ পৃথিবীতে পৌঁছায় অর্থাৎ বিষুব রেখার প্রতি তিন বিঘা জমীতে যে উত্তাপ পৌঁছায় তাহাতে ৫০০০ সহস্র অশ্ব-শক্তি পাওয়া যাইতে পারে। মানবজাতি বিনামূল্যে পাওয়া এত শক্তির অপব্যয় করিতেছে। —সঞ্জীবনী।

আমি ত করিনি কিছু।

[শ্রী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ]

আমি ত করিনি কিছু, তুমি সবি কর নাথ,
আমার খাটনিটুকু, তোমারই প্রাণপাত!
যা' করি করাও তুমি, তব অভিনয় ভূমি
আমার হৃদয়খানি—সকলি তোমার হাত,
আমি ত করিনি কিছু—তুমি সবি কর নাথ!

আমি যবে হাসি সুখে, তুমি তবে হাস নাথ,
আমি যবে কাঁদি দুখে, তুমি কর অশ্রুপাত।
যবে থাকি উপবাসে, কাটে দিন হা হুতাশে
তুমি থাক উপবাসে—আছ তুমি দিবারাত
সখা মোর সঙ্গী মোর—আছ তুমি সাথে সাথ!

মান অপমান মোর সকলি তোমার নাথ,
সকলি তোমার দান—এত ঘাত প্রতিঘাত!
তুমি আমি ভিন্ন নই—পাপী আমি বুঝি কই?
তাহ'লে মিটিয়া যায় যত বাদ বিসম্বাদ,
তাহ'লে কাটিয়া যায় এ বিষাদ অবসাদ!

আমি ত করিনি কিছু, তুমি সবি কর নাথ,
লহ লহ প্রভু মোর এ দীনের প্রণিপাত।
যা' করি করাও তুমি, তব অভিনয় ভূমি
আমার হৃদয়খানি—সকলি তোমার হাত,
আমি ত করিনি কিছু—তুমি সবি কর নাথ।

সাহিত্য-সমাচার।

সবিতা—মাসিকপত্র—২য় সংখ্যা মাঘ, ১৩৩০। শ্রীযুক্ত ননীলাল দে বি-এল্ সম্পাদিত। আমরা এই নব প্রকাশিত ক্ষুদ্রকায় মাসিকপত্রের ১ম ও ২য় সংখ্যা পাইয়াছি।

আলোচ্য সংখ্যার 'শ্রীবাসলীলা' ও 'সক্রেটিস্' নূতনত্বহীন প্রবন্ধ এবং সম্পাদকের 'অপরাধী' সমাজতত্ত্ববিষয়ক ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধ।

"কালীসুন্দরী দেবীর পত্র"—লিখনভঙ্গীর দোষে সুপাঠ্য হয় নাই। গুছাইয়া বলিবার অক্ষমতায় বক্তব্যটুকু অস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। 'বর্ষা' কবিতা, মন্দ নহে।

"চিত্র" শীর্ষক ছোট গল্পটী সুপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ। আশা আছে, একনিষ্ঠ সাধনা থাকিলে, লেখক কালে সুলেখক হইতে পারিবেন।

আমরা সত্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, ক্ষুদ্রকায় মাসিক যদি জন্মগ্রহণের প্রারম্ভেই প্রবন্ধ-দৈন্যের সূচনা করে, তাহা হইলে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একান্ত নিরাশ হইতে হয়।

সত্যনারায়ণ ব্রতকথা—কাশীরাজ সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন-প্রণীত। মূল্য ৵৹ দুই আনা। ৪৮ নং সোনারপুর, কাশীধাম হইতে প্রকাশিত।

বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে সত্যনারায়ণ পূজা ও ব্রতকথা হয়। বাঙ্গালায় এইরূপ আরও ২।১খানি ব্রতকথা আছে, কিন্তু সেগুলি নির্ভুল নহে। সেইজন্য লেখক স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ড হইতে কবিতায় এই ব্রতকথা রচনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, রচনা মূলানুগত হইয়াছে। গৃহপল্লীর ন্যায় এই ব্রতকথা বাঙ্গালীর ঘরে বিরাজ করিলে সকলেই সত্যনারায়ণের পূজার পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধন্য হইবেন।

প্রাপ্তি-স্বীকার

৪০-১ ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের সৌগন্ধ দ্রব্যের ব্যবসায়ী মল্লিক ব্রাদার্সের নিকট হইতে বর্ত্তমান ইংরাজী বৎসরের একখানি দেওয়াল-পঞ্জী উপহার পাইয়াছি। তারিখের অক্ষরগুলি বেশ বড়, ছাপা ও কালী অতি পরিপাটী "নাগ আর্ট প্রেসে"র উপযুক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক মাসের পৃষ্ঠা বিভিন্ন বর্ণে মুদ্রিত। ব্যবসায়ে মল্লিক ব্রাদার্স শ্রীসম্পন্ন হউন ইহা আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

—•—

ডাক্তার এস্. কে, বর্ম্মণ কলিকাতার একজন বিখ্যাত পেটেণ্ট ঔষধ আবিষ্কারক। আমরা তাঁহার একটী ছোট ঔষধের বাক্স (Sample Box) উপহার পাইয়াছি, উহাতে নিম্নলিখিত ঔষধ ছয়টী আছে :—

Camphor—(কলেরা বা উদরাময়ের ঔষধ); Cure for Asthma (হাঁপানিতে আশুফলপ্রদ); Kola Tonic (দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রান্ত ব্যক্তির টনিক); Nervine Tonic Pills (স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের ঔষধ); Purgative Pills (রেচক বটিকা); এবং Green Essence of Mint (পাকাশয়ের গোলমাল ও উদরের শূল বেদনায় ফলপ্রদ)।

উক্ত সমুদায় ঔষধ আমাদের ব্যবহার করিবার আবশ্যক হয় নাই। দুইটী মাত্র ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, উহা আশ্চর্য্য আশুফলপ্রদ। তাই মনে হয়, বাকী ৪টী ঔষধও সেইরূপ ফলপ্রসূ হইবে। সামান্য জ্বর এবং সর্দ্দিকাশীর ২টী ঔষধ উক্ত বাক্সে থাকিলে, গৃহ-চিকিৎসা সম্পূর্ণ হইত। ঔষধগুলির গুণ হিসাবে ধার্য্য মূল্য ২৲ টাকা, অতি সুলভ বলিতে হইবে।

প্রতীক্ষা

ডি, সি, বাবাজীর চিত্রশালা ১৯২০

২১শ ভাগ] { চৈত্র, ১৩৩০। } ২য় সংখ্যা।

ওঙ্কারের মন্দির নির্ম্মাতা। (১)

[শ্রীগুরুদাস সরকার এম-এ]

ফরাসী ইন্দো-চীনের অন্তর্গত প্রাচীন কম্বোজ রাজ্যে যে সকল হিন্দুকীর্ত্তি অদ্যাপিও বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া প্রতীচ্য দেশীয় পণ্ডিতগণ স্বতঃই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া থাকেন। এই সুদূর প্রদেশের সভ্যতা যে ভারতীয় সভ্যতার দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়াছিল সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নাই। ওঙ্কার থম্ বা যশোধারাপুর, ওঙ্কার ভট্ ও বেয়ন প্রভৃতি স্থানের মন্দিরাদি যে কোন্ স্থপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে সুষ্ঠু প্রমাণ বোধ হয় অদ্যাপিও আবিষ্কৃত হয় নাই। আচার্য্য অবনীন্দ্র নাথ যথার্থই বলিয়াছেন, "প্রাচীন মন্দিরের শিল্পীদের নাম শিলা-লিপিতেও নাই তাম্রশাসনেও নাই। যারা গড়্‌লে তাদের নাম পর্য্যন্ত রইল না, রইলো কেবল তাদের যারা মন্দির গড়ালে এবং ভাংলেও।" উড়িষ্যার বিখ্যাত কোণার্ক মন্দিরের দ্বাদশ শত শিল্পী ও প্রধান স্থপতি শিবাই মউতুরা বিষয়ক জনপ্রবাদ (২) অদ্যাপিও তদ্দেশীয়গণের স্মরণ-পথের বহির্ভূত হয় নাই, কিন্তু যে একখানি মাত্র শিলালিপি কোণার্কে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা অনুসন্ধান করিলে কোথাও শিবাই-এর নাম দেখা যায় না। আঙ্কোর অথবা ওঙ্কার ধামের প্রতিষ্ঠা বিষয়ক যে জনপ্রবাদ অদ্যাপি প্রচলিত, তাহা মঁসিয়ে মনো উহা (G. H. Monod) তদ্রচিত কম্বোজদেশীয় উপকথা নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন (Legendes Cambodgienucs, Editions Bossard, Paris, P. 129) এই চিত্তাকর্ষক কাহিনীর সার মর্ম্ম পাঠক পাঠিকাগণকে নিবেদন করিলাম। ইহা কোনও ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা বলা দুরূহ, তবে ইহা হইতে অনুমান হয় যে, ওঙ্কার ধাম প্রতিষ্ঠার্থ ভারতীয়দিগের ন্যায় কোন কলাকুশলী চৈনিক শিল্পীও স্থপতিরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ছয় শত বৌদ্ধাব্দে চায়াং প্রদেশে লিম সেং নামক কোনও চৈনিক বাস করিত। তাহার বয়ঃক্রম তখন পঞ্চাশ বৎসর। লোকটির কষ্টের অবধি ছিল না। সে কোনও ব্যবহারজীবীর নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল। সেই ঋণ পরিশোধ করিতে না পারায় তাহাকে উত্তমর্ণের অধীনে দাসরূপে কার্য্য করিতে হইত। প্রভুর আদেশক্রমে লিম সেং নদীতীরবর্ত্তী একটি স্থানে পুষ্পোদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এই উদ্যানে প্রতিদিন যথেষ্ট পুষ্প প্রস্ফুটিত হইত। লিম সে প্রতিদিন পুষ্প আহরণ করিয়া তাহার উত্তমর্ণের গৃহে লইয়া যাইত।

---

(১) মঁসিয়ে মোনো (M. Monod) প্রণীত "La Fondation d' Angkor" নামক নিবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

(২) মন্দিরের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড (Butterworth) পৃঃ ৪৮।

একদিন পাঁচটি দেবকন্যা ইন্দ্রপুর' হইতে ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। তাঁহারা কুসুম সুষমায় আকৃষ্ট হইয়া লিম সেং-এর পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়াছিলেন। একজনের নাম ছিল দিবসোদাচন্। তিনি সৌগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া এই উদ্যান হইতে ছয়টি কুসুম আহরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গিনীরা কিন্তু কোনও পুষ্প স্পর্শ করেন নাই। উদ্যান পরিক্রমণ করিয়া সুরলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর দিবসোদাচনের সঙ্গিনীরা ইন্দ্রের নিকট এই চৌর্য্যের কথা প্রকাশ করেন। দিবসোদাচনকে জিজ্ঞাসা করিয়া সকল কথা অবগত হইয়া দেবরাজ আদেশ করিলেন যে অপরাধিনীকে ছয় বৎসরকাল লিম সেং-এর পত্নীরূপে মর্ত্ত্য-ভূমে অতিবাহিত করিতে হইবে

দিবসোদাচন লজ্জা ও হতাশায় অভিভূত হইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা হইলেন, এবং লিম সেং-এর নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করিলেন এবং দেবরাজের আদেশ জ্ঞাপন করিলেন।

লিম সেং বলিল, "আমি বড়ই মন্দভাগ্য, আমি কি করিয়া আপনাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিব? আমার মনিব বড়ই কঠোর হৃদয়। আমাকেই পেট ভরিয়া খাইতে দেয় না, আর যে আহার্য্য সামগ্রী দেয় তাহার কথাও আর বলিবার নহে।"

দিবসোদাচন বলিল, "তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমি তোমাকে এরূপ শিল্প শিখাইব যাহার কথা এ দেশে কেহই অবগত নহে।"

লিম সেং আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। দিবসোদাচন দেবকন্যা—কোনও মানবী সৌন্দর্য্যে তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। লিম সেং-এর হৃদয় সম্ভবতঃ পত্নী প্রেমে অভিভূত হইয়া পড়িল। কয়েক মাস একত্র বসবাসের পরই লিম সেং যে কিরূপ সৎ স্বভাব ও ধর্ম্মভীরু লোক, তাহা দিবসোদাচন ভালরূপই বুঝিতে পারিলেন। স্বামীর দুঃখ কষ্ট দেখিয়া তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তিনি দয়াপরবশ হইয়া একদিন লিম সেংকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কত টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলে"? লিম সেং বলিল "ছয়টি রৌপ্য খণ্ড মাত্র"। দিবসোদাচন বলিলেন, "তখন তুমি একাকী ছিলে, বিবাহ কর নাই, এক্ষণে তুমি তোমার প্রভুর নিকট যাইয়া আরও চারিখণ্ড রৌপ্য ঋণস্বরূপ প্রার্থনা কর, আমিও তোমার সহিত দাস্যবৃত্তি গ্রহণ করিব। তুমি যে রৌপ্য খণ্ড কয়টি আনিবে তাহা যাহাতে ফলপ্রসূ হয়, সে ব্যবস্থা আমি নিশ্চয়ই করিতে পারিব।"

লিম সেং সেই ব্যবহারজীবী উত্তমর্ণের নিকট গমন করিয়া আরও চারিখণ্ড রৌপ্য কর্জ্জ গ্রহণ করিল ও দিবসোদাচনকে আনিয়া দিল। পত্নীর নির্দ্দেশক্রমে লিম সেং সেই অর্থ দিয়া রেশমের কোয়া কিনিয়া আনিল। দিবসোদাচন স্বয়ং সূতা কাটিয়া সেই রেশম হইতে বহুবিধ কারুকার্য্যখচিত বস্ত্র নির্ম্মাণ করিল। কোন বস্ত্রখণ্ডে লতা পাতার কাজ, কোনটিতে বা জীব জন্তুর মূর্ত্তি আঁকা, কত রকমের যে নক্সা তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বস্ত্র-গুলিও এরূপ সুন্দরভাবে বয়ন করা যে পূর্ব্বে মানব সমাজে কেহই এরূপ সুন্দর ও অপূর্ব্ব বস্ত্র দর্শন করে নাই। পত্নীর কথা মত লিম সেং সমস্ত বস্ত্রখণ্ডগুলিই তাহার প্রভুর নিকট লইয়া গেল। একবার নাড়িয়া চাড়িয়া হস্তদ্বারা পরীক্ষা করিতেই ব্যবহারজীবী মহাশয় বিস্ময়ে আপ্লুত হইলেন। ইতোপূর্ব্বে যে আর কেহ বয়নকার্য্যে এরূপ পারদর্শিতা দেখাইতে সমর্থ হয় নাই, সে সম্বন্ধে আর তাঁহার সন্দেহ রহিল না। তিনি লিম সেংকে যথেষ্ট প্রশংসাবাদ করিয়া তাহাকে পঞ্চাশৎ রৌপ্যখণ্ড পুরস্কার দিলেন এবং পূর্ব্ব গৃহীত ঋণ সংক্রান্ত যাহা কিছু পাওনা ছিল তাহা সমস্তই মাফ করিয়া দিলেন। তিনি এই অত্যাশ্চর্য্য বয়ন বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য দিবসোদাচনের নিকট বহু সংখ্যক ছাত্রও পাঠাইয়া দিলেন। এখন দিবসোদাচনের আর অল্প করিয়া রেশম কোয়া কিনিলে চলে না, 'পিকুল' হিসাবে কিনিতে হয় (এক পিকুলের পরিমাণ আন্দাজ ৬০ কিলো-গ্রাম); প্রতিদিনই তাঁহাকে শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষা দিতে হয়। দেবকুলসম্ভূতা পত্নীর কল্যাণে লিম সেং অতি সত্বর ধনশালী হইয়া পড়িলেন, তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তির অবধি রহিল না। এক বৎসর পরে দিবসোদাচন একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। শিশুটি জন্মাবধিই অস্থির। যখন কেবল হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতে পারে তখন হইতেই

প্রাকারাদির অনুকরণ করিয়া মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। যখন কেবল দাঁড়াইতে শিখিয়াছে, তখন হইতেই সে ভূতলে মানব ও বহুবিধ ইতর জীবের প্রতিকৃতি অঙ্কণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এক মুহূর্ত্তও সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিত না, সর্ব্বদাই কোন না কোন কাজে ব্যস্ত থাকিত, কোন না কোন মূর্ত্তি অঙ্কণ করিত। তাহার জননী এইজন্য তাহাকে পোপুসনোকার বলিয়া ডাকিতেন (৩)। বালকের পঞ্চ বর্ষ সম্পূর্ণ হইতেই দিবসোদাচনের মর্ত্ত্যভূমে ছয় বৎসরকাল নির্ব্বাসন-দণ্ডের পরিসমাপ্তি হইল। তিনি ছয়টি পুষ্প সংগ্রহ করিয়া তাঁহার উপাধানের উপর রাখিয়া দিয়া দিব্যলোক অভিমুখে উড্ডীয়মান হইলেন।

আহারের সময় পত্নীকে উপস্থিত না দেখিয়া লিম সেং তাঁহাকে তাঁহার শয়ন ঘরে অন্বেষণ করিতে গেলেন। ছয়টি পুষ্প দেখিবামাত্র তাঁহার এ অভিজ্ঞানের অর্থ অচিরে স্মরণ-পথে উদিত হইল। প্রিয়তমা তাঁহাকে চিরতরে ছাড়িয়া গিয়াছেন, একথা বুঝিতে পারিয়া তিনি শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, তাঁহার অশ্রুধারায় ধরাতল প্লাবিত হইয়া গেল। তাহার দুঃখে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিবার জন্য প্রতিবেশীবর্গ সকলেই একত্র সমবেত হইলেন। লিম সেং-এর অবিশ্রান্ত ক্রন্দনে তাহাদিগের হৃদয়ও দ্রবীভূত হইল। পোপুসনোকার চারিদিকে মাতার অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিল, 'মা' 'মা' বলিয়া হৃদয়বিদারক স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল এবং পিতার সহিত সেও ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

[২]

সেই সময়ে কম্বোজ-রাজ্যের অধীশ্বর পুদেশ রাজা নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকে গমন করিলেন। রাজবংশে ক্রং হত ও ক্রেহত নামক দুইজন ব্যতীত অপর কেহই ছিল না। কে রাজা হইবে তাহা স্থির না হওয়ায় সিংহাসন শূন্য পড়িয়া রহিল। এক দরিদ্র ব্যক্তি অরণ্যে কাষ্ঠ আহরণ করিতে গিয়াছিল। হঠাৎ বেগে বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় সে দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত একটি কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। দেবরাজ ইন্দ্র একটি শ্বেত ও একটি কৃষ্ণবর্ণ মোরগের রূপ ধারণ করিয়া সেই কুটীরে আবির্ভূত হইলেন। কুক্কুটদ্বয় পরস্পরের সহিত মনুষ্যের ভাষায় কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়া স্ব স্ব গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল। কাল মোরগটি বলিল, "যে আমার মস্তক ভক্ষণ করিবে সে শ্রমণদিগের অধিপতি হইবে; যে স্ত্রীলোক আমার জানুদ্বয় ভক্ষণ করিবে, সে রাণী হইবে; আর যে আমার বক্ষঃস্থলের মাংস ভক্ষণ করিবে, সে রাজা হইবে।" শ্বেত মোরগটি উড়িয়া গেল কিন্তু কৃষ্ণ মোরগটি আড়ার উপরেই বসিয়া রহিল। সেই দরিদ্র ব্যক্তি সকল কথাই শ্রবণ করিয়াছিল। সে নিঃশব্দে অগ্রসর হইয়া মোরগটিকে ধরিয়া মারিয়া ফেলিল এবং তৎক্ষণাৎ গৃহে ফিরিয়া চলিল। বাড়ী গিয়া স্ত্রীকে সে সকল কথা চুপি চুপি জানাইল। সকল কথা শুনিয়া তাহার পত্নী উহা অবিলম্বে রন্ধন করিয়া স্বামীর সহিত একত্র আহার করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। তাহার স্বামী কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই কুক্কুট মাংস ভোজনে সম্মত হইল না। সে বলিল, আমরা রাজমুকুট ধারণ করিতে যাইতেছি, চল এ মাংস পাত্রে করিয়া নদীতীরে লইয়া যাই, স্নানান্তে উপযুক্ত বস্ত্রাদি ধারণ করিয়া সেইখানেই উহা ভক্ষণ করিব। স্ত্রীলোকটি ইহাতে সম্মত হইল। একেবারে নদীর কিনারায় মাংস সমেত পাত্রটি রাখিয়া তাহারা জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল ইতোমধ্যে নদীর তরঙ্গবেগ বর্দ্ধিত হইয়া কখন যে পাত্রটিকে স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া গেল, তাহা তাহারা দেখিতেও পাইল না। স্নান শেষে নদীতীরে ফিরিয়া আসিয়া তাহারা পাত্রটি আর খুঁজিয়া পাইল না। কে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে মনে করিয়া তাহারা স্ত্রী পুরুষে পরস্পরের বুদ্ধির দোষ দিয়া কটু ভাষায় গালাগালি আরম্ভ করিল।

তার নামক একজন হস্তীপক সেদিন তাহার হস্তীগুলিকে লইয়া নদীতে স্নান করাইতে আসিয়াছিল। সে পূর্ব্বোক্ত কুক্কুট মাংসের পাত্রটি জলে ভাসিয়া যাইতেছে

(৩) কোনও কোনও গ্রন্থে এই নামটি "প্রা-পুস্-নো-কর" রূপেও লিখিত হইয়া থাকে। ফরাসী অনুবাদক এই নামটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিতে পারেন নাই। তিনি উজ্জ্বলতাজ্ঞাপক "প্রাত" বা "প্রা" শব্দ হইতে "পা" এবং "নগর" ও "নোকর" অভিন্ন বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

দেখিয়া উহা শ্রমণদিগের আশ্রমের প্রধান অধ্যক্ষের নিকট লইয়া গেল। ব্যাপারটির গূঢ় রহস্য অধ্যক্ষ মহাশয় দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন। তিনি স্বয়ং মস্তকটি ভক্ষণ করিয়া তারকে উহার বক্ষোদেশের অংশ এবং তারের পত্নী ভংকে উহার জানুদ্বয় খাইতে দিলেন, কিন্তু তাহাদিগের নিকট কোন কথাই প্রকাশ করিলেন না। এদিকে রাজ্যের সভাসদ ও মন্ত্রীবর্গ মিলিত হইয়া পরামর্শ করিলেন যে, সিংহাসন আর এরূপ অধিক দিন শূন্য রাখা সঙ্গত নহে। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল দেবতাদিগের যথারীতি আরাধনা করিয়া রাজহস্তীগুলিকে সজ্জিত করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হউক, তাহারা যাঁহার সম্মুখে যাইয়া প্রণত হইয়া শিরোদেশে উপবেশন করাইয়া আনিবে, তিনিই সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবেন স্থির হইল। ইতোমধ্যে অভিষেকের সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত করিয়া ফেলিতে হইবে।

রাজহস্তীগুলিকে বহুমূল্য আভরণে সজ্জিত করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল, তাহারা তার ও ভংকেই মস্তকে তুলিয়া রাজপ্রাসাদে আনয়ন করিল। যথারীতি অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তার দেবুনাগসর (৪) নাম গ্রহণ করিলেন। ভং রাণী হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বন্ধ্যাত্ব ঘুচিল না। ইন্দ্র রাণীকে নিঃসন্তান দেখিয়া বলিলেন, "আমি নিজবংশ-জাত একটি সন্তান ভংকে প্রদান করিব। সেই পুত্র হইতে কম্বোজের রাজবংশ অক্ষয় হইয়া থাকিবে।"

একদিন রাণী প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলে পর ইন্দ্র ব্যোমপথে অবতরণ করিলেন। সাধারণ লোকে শুধু দেখিল একটা উজ্জ্বল নীল আলোক আকাশ হইতে নামিয়া আসিতেছে। "আলো নামিতেছে" "আলো নামিতেছে" বলিয়া তাহারা চীৎকার করিতে লাগিল। ইন্দ্র রাণীর দেহের উপর কতকগুলি মাল্যাকারে গ্রথিত কুসুম বর্ষণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন (৫)। রাণী গর্ভবতী হইলেন এবং যথাকালে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন—তাহার নাম রাখিলেন "প্রা কেয়ৎ মেয়ালেয়া" অথবা পুষ্পিত আলোক (৬)। এদিকে পোপুসনোকার চারিদিক খুঁজিয়াও তাহার জননী কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহা ঠিক করিতে পারিল না। দুঃসহ দুঃখে তাহার হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া রহিল।

দশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত পোপুসনোকার পাঠাভ্যাসে যাপন করিল। একদিন সে হঠাৎ তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবা, কে আমার মা ছিলেন?" লিম সেং বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "বাবা, তোমার জননী স্বর্গের দেবী ছিলেন। মাত্র ছয় বৎসরের জন্য তিনি এ জগতে আসিয়াছিলেন, তাহার পর দেবলোকে ফিরিয়া গিয়াছেন। তাহার বাস-স্থান এখান হইতে বহুদূরে। সেখানে তিনি যে কোথায় আছেন তাহা আমি বলিতে পারি না।"

বালক এ কথা শুনিয়া নীরব হইয়া রহিল বটে, কিন্তু জননীর চিন্তা কোন ক্রমেই ত্যাগ করিতে পারিল না। সে স্থির করিল, পথিশ্রমে দেহপাত হয় সেও ভাল তথাপি সে তাহার মাতাকে একবার অন্বেষণ করিয়া দেখিবে। তাহার পিতা বুঝাইয়া কোনরূপেই তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না।

পোপুসনোকার তাহার জননীর অনুসন্ধানে বাহির হইল। কত বন কত প্রান্তর অতিক্রম করিল, তাহার পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, বনের ফল খাইয়া কোন প্রকারে জীবনধারণ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল না।

একদিন কানন সমাকীর্ণ গিরিশীর্ষে কতকগুলি দেব-কন্যা বিহারার্থ আগমন করিলেন। দিবসোদাচনও ইঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি বনপুষ্প চয়ন করিয়া একটি গুচ্ছ বন্ধন করিতেছিলেন।

(৪) মঁসি মনো (Monod) বলিয়াছেন, এ নামটী ঐতিহাসিক নহে, কাল্পনিক।

(৫) ইহা গ্রীক পুরাণে বর্ণিত রাজকুমারী দানাইর (Danae) কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। দেবরাজ স্বর্ণবৃষ্টিরূপে তাঁহাকে অন্তর্বত্নী করিয়াছিলেন।

(৬) মঁসিয়ে এমনিয়ে এই কাল্পনিক উপাখ্যানের "প্রা কেয়ৎ মেয়ালেয়া" আর রাজা দ্বিতীয় জয়বর্ম্মণ অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। ইঁহার রাজত্বকাল খ্রীঃ অঃ ৮০২ হইতে ৮৬৯ পর্য্যন্ত। এই সুদীর্ঘকাল তিনি কম্বোজের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি কিন্তু আসিয়াছিলেন যবদ্বীপ হইতে, কম্বোজে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

পোপুসনোকার অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যসম্পন্না দেববালাদিগকে দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, বহু বৎসর হইল লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, ইহার মধ্যে একদিনও মানবের মুখ দর্শন করি নাই। আমার পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন হইয়া দেহ হইতে স্খলিত হইয়াছে, কোন প্রকারে একত্র গ্রথিত বৃক্ষপত্র পরিধান করিয়া লজ্জা নিবারণ করিয়া আছি, নববস্ত্র যে সংগৃহীত হইবে সে ভরসা আর নাই। এরূপ জনসমাগমশূন্য পার্ব্বত্য প্রদেশে বহুসংখ্যক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালিনী রমণী আসিলেন কোথা হইতে? ইঁহারা দেবী নহেন তো?

পোপুসনোকার লুকাইয়া রহিল। রমণীগণ তাহার সন্নিধানে উপস্থিত হইলে পর সে মনে মনে সঙ্কল্প করিল "এই সকল স্ত্রীগণ যদি দেবী হয়েন এবং আমার জননী যদি ইঁহাদিগের মধ্যে না থাকেন তাহা হইলে তাঁহারা স্বর্গাভিমুখে উড্ডীয়মান হউন, আর যদি আমার মাতা উহাদিগের সঙ্গেই আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার ইহাই প্রার্থনা যে, তিনি যেন তাঁহার সখীগণের সহিত চলিয়া যাইতে না পারেন।"

পোপুসনোকার লুক্কায়িত স্থান হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেই দেববালাগণ মানবের এই অতর্কিত আবির্ভাবে বিস্ময়াভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বর্গাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন, উড়িয়া যাইতে পারিলেন না শুধু দিবসোদাচান। পোপুসনোকারের আকুল প্রার্থনা ব্যর্থ হইল না। সে দৌড়িয়া গিয়া তাহার মাতাকে সবেগে জড়াইয়া ধরিল। দিবসোদাচান তরুণ বয়স্ক পুত্রকে চিনিতে পারেন নাই, তিনি দুঃখ ও শোকে অধীর হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এ আবার কি নূতন বিপদ ঘটিল? মর্ত্ত্যবাস হইতে মুক্তি পাইতে না পাইতেই কে এ ব্যক্তি আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে চাহে?" তাঁহার এ চিন্তা স্রোতে বাধা দিয়া পুত্র আকুলকণ্ঠে মাতৃ সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "মা, আমিই তোমার পুত্র; তোমার দর্শন-লাভ সম্বন্ধে আমি হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম। সর্ব্বত্র তোমাকেই অন্বেষণ করিয়াছি, কিন্তু কোথাও তোমার অনুসন্ধান পাই নাই। পিতা তোমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া তোমার উপাধানের উপর ছয়টি পুষ্প দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে, তুমি দিব্যধামে ফিরিয়া গিয়াছ। তাঁহার সে গভীর শোক বাক্যে প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। প্রতিবাসিগণও সকলেই আমাদের সহিত এই শোকাবহ ঘটনায় একত্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছে। তোমার যে পুনরায় সাক্ষাৎ লাভ করিব, এ ভরসা আমি কিন্তু কোন দিনই পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। দেহে শক্তি ও সামর্থ্য থাকিতে থাকিতে আমি পিতার নিকট বিদায় লইয়া তোমার সন্ধানে বাহির হইয়াছিলাম; পথে বাহির হইয়া কতবার মনে হইয়াছে বুঝি বা ক্ষুৎপিপাসায় প্রাণত্যাগ করিব। মা, যখন তোমার আবার দেখা পাইয়াছি, এখন আর কিছুই বলিবার নাই, কেবল এইমাত্র প্রার্থনা, তুমি আমার সঙ্গে ফিরিয়া চল।" *

ক্রমশঃ।

---

* গল্পটী নিম্নলিখিত ফরাসী পুস্তক হইতে লেখক ও প্রকাশকের অনুমতিক্রমে অনূদিত—G. H. Monod. Legendes cambodgienues que m'a contees le gouverneur Khien: Orne de secaux cambodgiens et de bandeaux et culs-de-lampe d' Andree Karpeles, Tirage en deux encres, Prix 6 Frs. Editions Bossard 43 Rue Aca Madame, Paris, 6 e.

বিসর্জ্জন।

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(৩)

সতীর দুরবস্থা দেখিয়া কমনীয় অশ্রু সাম্‌লাইতে পারিল না। তাহার স্বামী রামদুলাল যক্ষ্মাকাশে ভুগিতেছে। যতদিন তাহার সামর্থ্য ছিল সে কাজ করিয়াছে, স্ত্রীকে বাড়ীর বাহির হইতে দেয় নাই। এখন নিজেই সে শয্যাগত, তাহার উঠিবার সামর্থ্য নাই। পুরাণের সতী বেদবতী

যেমন করিয়া স্বামীর পরিচর্য্যা ক'রয়াছিলেন, সাধ্বী সতীও তাহা অপেক্ষা কম করে নাই। সকালবেলা স্বামীকে উঠাইয়া মুখ ধোওয়াইয়া দিয়া কিছু খাবার খাওয়াইয়া সে ভিক্ষায় বাহির হইত। দশটার সময় ফিরিয়া আবার আহার্য্য তৈয়ার করিয়া স্বামীকে খাওয়াইয়া দিত। রামদুলালের হাত পা অবশ হইয়া গিয়াছিল, সেজন্য সে হাঁটিতে পারিত না, হাতও নাড়িতে পারিত না।

যেরূপ অটুট ধৈর্য্যের সহিত সতী স্বামীর সেবা করিতেছিল, তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কিন্তু সে ইহাতেও পরম সুখী সে আর কিছু চায় না. স্বামীর মলিন মুখে একটু হাসি ফুটাইয়া তুলিবার জন্য সে হাসিতে হাসিতে জীবন দান করিতেও প্রস্তুত।

কমনীয় দেখিল তাহার গৃহ পতনোন্মুখ, চালে খড় নাই। গৃহে মাটির আসবাব ছাড়া কাঁসা পিতল একটিও নাই।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, "তোমার এত কষ্ট মা, তবুও তুমি অবিচল! তোমার জয় যথার্থ হবে মা, কারণ তুমি সত্যই সতী।"

সতী তাড়াতাড়ি একখানি পিঁড়ি আনিয়া কমনীয়কে বসিতে দিল, একটু হাসিয়া বলিল, "আমার তো কিছু কষ্ট নেই বাবা। আমি যেমন সুখে আছি, এমন সুখ কারও নেই। আমার বাইরে দারিদ্র্য, কিন্তু আমার বুক পর্য্যন্ত তা' পৌঁছাতে পারে নি। আমার বুকে লক্ষ্মীর আসন পাতা, আমি সেখানে ভিখারিণী নই, সেখানে রাজরাজেশ্বরী।"

কমনীয় বলিল, "সত্যই সেখানে তুমি রাজেশ্বরী রাণী, সেখানে তোমার অফুরন্ত ভাণ্ডার। যে কোনও মেয়ে তোমার ভাণ্ডারের একটু রত্ন পাবার প্রত্যাশা করতে পারে। কিন্তু মা, তোমার বাইরেরও যে কিছু আসবাব দরকার। এই ঘরখানি পড়ে গেলে এই অবশ রোগাক্রান্ত স্বামীকে নিয়ে তুমি দাঁড়াবে কোথায়? তোমার স্বামীকে কোথায় রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে তুমি ভিক্ষায় বেরুবে?"

সতী নীরবে আকাশ পানে চাহিল, খানিক পরে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তা ভেবে আর কি করব বাবা? মাথার উপরে একজন যে আছে, যে আজ তোমায় উপলক্ষ্য করে আমায় রক্ষা করলে, সেই সব দেখবে। গাছতলা আছে বাবা, আমি আমার স্বামীকে নিয়ে সেখানে থাকব।"

কমনীয় বলিল, "এ গ্রামে যে থাকতে পারবে তারই বা ঠিক কি?"

সতী বিষণ্ণ হইয়া বলিল, "সে কথা ঠিক। জমীদার উৎপীড়ন করতে ছাড়বে না। অগত্যা আমার এই স্বামীকে বহন করে ভিন্ন জায়গায় যেতে হবে। অন্য জায়গার লোকও কি এমনি হবে বাবা, কেউ কি দয়া করবে না?"

তাহার আর্দ্র কণ্ঠ কমনীয়ের বক্ষ স্পর্শ করিল, সে সবেগে বলিল, "না মা, সবাই দেখবে তোমায়। সতীর মর্য্যাদা সকল দেশে সকল জাতির মধ্যে। ভগবান সতীর আজ্ঞাধীন। তোমার ভাবনা কি মা, তুমি যে অজেয়, তোমায় কেউ জয় করতে পারবে না। তুমি এগিয়েই চলবে, তোমার পথে কেউ দাঁড়াতে পারবে না।"

সতী কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া কমনীয় বলিল "একটা কথা বলব কি মা? তুমি যখন আমার মা হয়েছ, তখন আমার একটা কথা রাখবে কি?"

সতী তাহার মুখের উপর সরল দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, "কি কথা বাবা?"

কথাটা বলিতে কমনীয়ের মুখে বাধিতেছিল, এ জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর কাছে সে কথা উচ্চারণ করিতেও যে বুক অবশ হইয়া আসে। কমনীয় একটু থামিয়া বলিল, "আমি তোমার ছেলে, তোমার এ কষ্ট আমি ছেলে হয়ে দেখতে পারছি নে। তোমার সন্তান কর্ম্মঠ, সে উপার্জ্জন করছে, তুমি কেন দারিদ্র্যে থাকবে মা? আমি আমার মাকে সুখে রাখতে চাই, আমার মাকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে দিতে পারব না। বল মা, আমার প্রার্থনা রাখবে তুমি?"

সতীর চোখে জল আসিল, অনেক কষ্টে সে উদ্বেলিত অশ্রু চাপিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "তোমার মাকে তুমি সুখী করতে চাও বাবা, কিন্তু আমি যে নিতে অক্ষম।"

কমনীয় বলিল, "কেন, সে কথা বলতে পার কি ?"

সতী নত মুখে বসিয়া রহিল, উত্তর দিল না।

কমনীয় বলিল, "তোমার স্বামীর জন্যে বলছ মা, আমি তোমার স্বামীকে রাজি করে যাচ্ছি। তোমার স্বামী যদি মত দেন, তা'হলে তোমার অমতের কারণ থাকবে না তো ?"

সতী অস্ফুট স্বরে বলিল, "না"।

বলা বাহুল্য, রামদুলালের কাছে প্রস্তাবটা করা মাত্র সে অত্যন্ত আনন্দের সহিত রাজি হইয়া গেল। কমনীয় তখন বিদায় লইল।

বেলা তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে। জ্যোতিশ সে সময়ে ঘুমাইয়াছে, সহচরগুলিও কে কোথায় পড়িয়া আছে তাহার ঠিক নাই। পাচক কমনীয়ের গৃহে আহার্য্য রাখিয়া গিয়াছিল। কমনীয় তাড়াতাড়ি খাইয়া লইল এবং বাক্স খুলিয়া কিছু টাকা বাহির করিয়া জ্যোতিশ জাগিবার আগেই সতীকে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল।

নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িয়া সে যে কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিল তাহার ঠিক নাই, জ্যোতিশের বিকট চীৎকারে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া সে চাহিয়া দেখিল প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।

জ্যোতিশ তাহার বিছানার পাশে দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে উঠিতে দেখিয়া বলিল, "খাসা লোক ত তুমি। এমন চেঁচিয়েও মানুষ ঘুমোয় ? বোধ হয় পঞ্চাশ ডাক দেছি তোমায়, তবু যদি ঘুম ভাঙ্গে। আজ ঘুমটা কোথা হ'তে ধার করে এনেছ শুনি ?"

কমনীয় একটু হাসিল, উত্তর না দিয়া সে উঠিয়া পড়িয়া আয়নার কাছে দাঁড়াইয়া চুলটা ফিরাইয়া লইয়া বলিল, "চল,—যাওয়া যাক।"

জ্যোতিশ বলিল, "বাঃ, চা খাবার কিছু খেলে না, অমনই বলছ চল যাওয়া যাক। আজ যে ভারি স্বার্থত্যাগী হয়ে পড়েছ দেখছি।"

কমনীয় গম্ভীর মুখে বলিল, "না, আজ শরীরটা তত ভাল লাগছে না, বড্ড ভার মত লাগছে।"

জ্যোতিশ বলিল, "শরীরের আর অপরাধ কি ! সমস্ত দিন যা' ঘুমটা দিলে। এক ডোজ ওষুধ পেটে পড়লেই সব অসুখ সেরে যাবে'খন। নিতান্তই যদি চা খাবার না খাও, চল তবে।"

বৈঠকখানার আসর তেমনিই জমকিয়া উঠিল। কমনীয় দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল কেহ দুপুরের কথা একটা মুখে আনিল না। যেমন অন্য দিন নির্ব্বিবাদে গান বাজনা চলে তেমনি আজও চলিল। আজ যেন কিছুই হয় নাই, সকলে এমনি ভাবই দেখাইল।

কমনীয় চুপচাপ একপাশে বসিয়া দেখিতেছিল। মদের উপর আজ তাহার বিসদৃশ ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছিল। যে মদ মানুষকে এমন অপদার্থ, হেয় করিয়া তোলে, তাহা যে মানুষে জানিয়া শুনিয়াও খায় কেন ইহাই আশ্চর্য্যের কথা ! মাতাল সতীর মর্য্যাদা জানে না, লোকের পানে চায় না, ভাল মন্দ জ্ঞান করিবার শক্তি সে হারাইয়া ফেলে। ইহারা যদি মদ না খাইত, ইহারা যদি নিজেকে চিনিতে পারিত, ইহারাই যে আদর্শরূপে দাঁড়াইতে পারিত। জ্যোতিশ শিক্ষিত, কতিপয় বন্ধুও বেশ শিক্ষিত। দেশ ইহাদের কাছে ভাল ব্যবহার পাইবারই আশা করিয়াছিল, দেশ উন্নত হইবার আশাই করিয়াছিল, কিন্তু পাইল কেবল অসৎ ব্যবহার।

জ্যোতিশ গ্লাসটা তাহার হাতে দিয়া বলিল, "নাও।"

কমনীয় তাহা ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "মাপ কর, আজ শরীর বড্ড খারাপ করেছে আমার।"

জ্যোতিশ আর অনুরোধ না করিয়া নিজেই গ্লাস খালি করিয়া ফেলিয়া বলিল, "জানো কমনীয়, আমরা বিখ্যাত বাইজি বানুকে আনবার ইচ্ছে করেছি। মজুরী অনেক পড়বে, কিন্তু সে নাকি স্বর্গের অপ্সরা, দেখতে যেমন, গায়ও তেমনি। আজ কাল বড় বড় মজলিসে তার বড্ড মান। আমি বায়না দিয়ে পাঠিয়েছি, পরশু দিনে বাইজি এসে পৌঁছাবে।"

বাইজি বানুর নাম কমনীয়ও শুনিয়াছিল, কখনও সে তাহাকে দেখিবার অথবা তাহার গান শুনিবার অবকাশ পায় নাই। ভুবার পুত্রের অন্নপ্রাশনের দিন গান গাহিবার জন্য তাহাকে বায়না দিয়া পাঠাইয়াছিল, কিন্তু বানু ধন্যবাদ দিয়া বায়না ফেরৎ দিয়াছিল।

হেম গদগদ কণ্ঠে বলিল, "আঃ, কি গলা তার, যেন বাঁশী বাজে। এমন চমৎকার গান গায়, যে শোনে সেই আবার শুন্‌তে চায়। কিন্তু এক রাতেই সে দুশো পাঁচশোর কমে আসরে নামবে না; তার একটা গানের দামই দশ কুড়ি টাকা। তারপর তার রূপ..."

নিতাই বলিল, "মনে হয় পরী এসে চোখের সামনে ঘুরছে। আর তেমনি হাত দুখানা, যেন মোমে গড়া।"

সেদিন সব অতিরিক্ত মাতাল হইয়া পড়িয়াছিল, কেহ আর ঘরে ফিরিতে পারিল না, সেইখানেই পড়িয়া রহিল।

যদি মদ খাইত তাহার অবস্থাও যে ইহাদের সমানই হইত, ইহা ভাবিয়াই কমনীয়ের মন ভারি খারাপ হইয়া গেল। সে যে কয়দিন মদ খাইয়াছে, এমনি বীভৎস ভাবেই তো পড়িয়াছিল সে। এমনি মুখের প্রান্তদ্বয় বাহিয়া লালা গড়াইয়াছিল, হাত পা এমনিই অলস নীথর পড়িয়াছিল, এমনি ভাবে জ্ঞান থাকিতে সেও জ্ঞানহারা হইয়াছিল। ভগবান, রক্ষা কর, সামান্য আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য সে যেন এই অবর্ণনীয় পৈশাচিক যন্ত্রণা বক্ষে তুলিয়া না লয়।

ঘৃণায় সে সঙ্কুচিত হইয়া সত্বরপদে বৈঠকখানা ত্যাগ করিল।

পরদিন প্রভাতে সে যখন একশিশি ঔষধ পকেটে লুকাইয়া লইয়া বাহির হইতেছিল, সেই সময় জ্যোতিশ ফিরিয়া আসিতেছিল। তাহার সযত্ন কুঞ্চিত চুল বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে, চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে, মুখ শুখাইয়া গিয়াছে। তখনও তাহার পা টলিতেছিল, সে পড়িতে পড়িতে কতবার উঠিল। কমনীয়ের কাছে আসিয়া শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "বাঃ, বেশ আক্কেল তো তোমার কমনীয়, আমাদের ফেলে দিব্য চলে আসতে পারলে তুমি; কিন্তু আমরা যদি হতুম, বন্ধুকে ও রকম অবস্থায় ফেলে কখনও আসতুম না।"

কমনীয়ও তেমনি শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "কি করব ভাই! আমি তো জ্ঞান থাকতে ওইখানে পড়ে গড়াগড়ি দিতে পারিনে, কাজেই চলে আসলুম। দেখ, আমার কাজে যদি দোষ বিবেচনা কর আমায় বিদায় দিতে পার এখনি।"

শশব্যস্ত হইয়া জ্যোতিশ বলিল, "সে কি কথা? বিদায় দেবার কথা তো আমি কিছু বলছি নে। আমি তোমায় ভাইয়ের মত দেখি, তোমায় কখনও ছাড়তে পারব না। তুমি ও সব কথা মনে এন না, মুখেও বলো না। তুমি বেশ করেছ এসে। কাল আমরা সবাই বড্ড মাতাল হয়ে পড়েছিলুম, আর অত করে মদ খেলে হবে না, তা হলে স্বাস্থ্যটা একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে। যাক, এত সকালে এখন যাচ্ছ কোথায়?"

কমনীয় উত্তর করিল, "কোন কাজকর্ম্ম নেই, একটু বেড়িয়ে আসা যাক।"

জ্যোতিশ তাহার পকেটের পানে দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, "শিশিটা কিসের?"

কমনীয় ইচ্ছা করিয়াই মিথ্যা কথা বলিল, "নিজের ওষুধ। ফিরতে বেলা হয়ে যেতে পারে, দু' দাগ ততক্ষণ খাওয়া হয়ে যাবে'খন।"

জ্যোতিশ বলিল, "যাও, একটু তাড়াতাড়ি করে ফিরে এসো।"

কমনীয় চলিয়া গেল।

সতী আজ আর ভিক্ষায় যায় নাই। কমনীয়-দত্ত টাকা হইতে সে আবশ্যকীয় জিনিস আনাইয়া ফেলিয়াছে। ক্ষুধার্ত্ত স্বামীকে ইহার মধ্যে সুয়া বাঁধিয়া খাওয়াইয়া এখন সে গৃহকর্ম্মে মন দিয়াছে।

কমনীয় বারাণ্ডার উপর ঔষধের শিশিটা রাখিয়া বলিল, "এই নাও মা, তোমার স্বামীর জন্যে একটা ওষুধ এনেছি। নিয়ম মত করে দিনে দুবার তোমার স্বামীকে এটা খাইয়ো, এতে অনেকের প্যারালিসিস সেরে গ্যাছে শুনেছি।"

সতী ঔষধের শিশিটা তুলিয়া লইল; অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিল, "যদি সেরে উঠতে পারেন, তবে সে জানব তোমারই দয়ায় বাবা। তুমি যে গত জন্মে আমার কে ছিলে—"

বাধা দিয়া একটু হাসিয়া কমনীয় বলিল, "গত জন্মে কেউ ছিলুম কি না ছিলুম তা বলতে পারি নে, তবে এ জন্মে যে আমি তোমার ছেলে, তুমি আমার মা, এটা ঠিক কথা।"

সতী বলিল, "আমি একটা কথা কাল কেবলই ভেবেছি বাবা, তুমি যা মনে করো কর, আমি সে কথা তোমায় বলবই। তুমি এমন দেবতার মত লোক, এমন মহান্ হৃদয় তোমার, তুমি কেন ওই অসৎ সঙ্গীদের সঙ্গে মেশো? তোমার চাকরীর ভাবনা কি বাবা, লাখ চাকরী যে মিলবে তোমার। অসৎ সঙ্গে মিশলে সাধুও অসাধু হয়ে যায়। তুমি যে ওদের মত লোকের সঙ্গে থাকো এই আশ্চর্য্য। তুমি ভাল হলেও অসৎ সঙ্গে থাকার দরুণ লোকে তোমায় অসৎ বলে নিন্দে করে যে। না বাবা, তুমি ও সঙ্গ ছেড়ে দাও, অন্য জায়গায় কাজ কর গিয়ে।"

অন্যমনস্ক ভাবে কমনীয় বলিল, "তুমি ঠিক কথা বলেছ মা, এ সঙ্গে না থাকাই উচিত। দশ বার টাকার কাজ করে সৎ সঙ্গে থাকাও বাঞ্ছনীয়। আমি এই মাসের শেষ দিনটা পর্য্যন্ত এখানে থাকব, তারপর দেশে চলে যাব।"

খুব অন্যমনস্ক ভাবেই সে ফিরিয়া আসিল। তাহার মনের মধ্যে সতীর কথাগুলা কেবল বাজিতেছিল। বাস্তবিকই অসৎ সঙ্গে রাজার মত থাকার চেয়ে সৎ সঙ্গে থাকিয়া ভিক্ষা করিয়া খাওয়া ভাল।

(৪)

বৈকাল বেলায় কমনীয় তখনো নিজের ঘরে বসিয়া রবিবাবুর 'ঘরে বাইরে' বইখানা নিবিষ্টচিত্তে পড়িতেছিল, জ্যোতিশ ত্রস্তপদে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "বাঃ, এখনও বসে আছ তুমি?"

চোখ তুলিয়া কমনীয় শান্ত ভাবে বলিল, "কি করতে হবে?"

"কি করতে হবে, শোন একবার কথা। বাইজি এসেছে যে।"

কমনীয় বলিল, "তা শুনেছি আমি। আমায় কি করতে হবে তাই জিজ্ঞাসা করছি। বাইজির কোন ব্যারাম-ট্যারাম হয়েছে না কি?"

জ্যোতিশ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "ব্যারাম হবে কেন?"

কমনীয় একটু হাসিয়া বলিল, "ব্যারাম হলেই তো আমায় দরকার পড়ে, কারণ আমি ডাক্তার।"

জ্যোতিশ বিরক্ত হইয়া বলিল, "সে এখানে চিকিৎসা করাতে আসেনি, এসেছে নাচ গান করতে, সেটা তো জানো?"

কমনীয় বলিল, "তা হ'লে যখন নাচ গান আরম্ভ হবে, তখন তোমার বৈঠকখানায় যাব'খন। এখন বইখানা শেষ করে ফেলি।"

সে আবার নিবিষ্টচিত্তে বই পড়িতে লাগিল, রাগত ভাবে খানিক দাঁড়াইয়া থাকিয়া জ্যোতিশ শেষে বাহির হইয়া গেল।

এই যুবকটীকে সে কিছুতেই আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারিতেছিল না। যতই সে ইহাকে আঁকড়াইয়া ধরিতে যায়, এ ততই বাহির হইয়া পড়ে। অনেক কষ্টে সে তাহাকে কয়েকদিন মাত্র মদ খাওয়াইতে পারিয়াছিল, এইটাতে জয়লাভ করিলেও জ্যোতিশ সর্ব্বতোভাবে জয়লাভ করিতে পারে নাই। সে বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিত, তাহারা যাহাতে আমোদ অনুভব করে, তাহা ইহার বিরক্তিই উৎপাদন করে মাত্র। তাহার মুখে বিরক্তির রেখা ফুটিয়া উঠে, কিন্তু তবু সে ইহাদের কাছে থাকে, দূরে যায় না।

এখন তাহারা সেই বাইজির সম্বর্দ্ধনায় ব্যস্ত, কত কদর্য্য আলাপ ইয়ারকি চলিবে ঠিক নাই। কমনীয় আর সব আনন্দে যোগ দিতে পারে, স্ত্রীলোক যেখানে সেখানে কমনীয় নীরব নিস্পন্দ।

কিন্তু সেদিন তাহার প্রতিজ্ঞা অটুট রাখিতে পারিল না। জ্যোতিশ তাহাকে মদ খাওয়াইয়া বেশ মাতাল করিয়া তুলিল।

আসরে অনেক লোকই জুটিয়াছিল। গ্রামের লোকও এই বিখ্যাত বাইজির গান শুনিতে আসিয়াছিল। বাইজি আসরে নামিয়াছিল, গানও চলিতেছিল, কিন্তু কমনীয় তখনও আসিয়া পৌঁছাইতে পারে নাই। নেশায় সে ভারী মাতাল হইয়া পড়িয়াছিল, টলিতে টলিতে দু' তিনবার আছাড় খাইয়া সে আসিতেছিল।

আসরের কাছাকাছি আসিয়া সে থামিয়া গেল। বাইজির সুস্পষ্ট মধুর কণ্ঠের গান তখন চারিদিক পূর্ণ করিয়া গাহিতেছিল, সে গাহিয়াছিল—"পুরানো সে দিনের কথা ভুলবি কিরে হায়—"

এ গান যে সুপরিচিত। কমনীয়ের ঝাঁ করিয়া মনে পড়িয়া গেল, একদিন এই গানটা সে একজনকে শিখাইয়াছিল। সে বালিকার কণ্ঠ এমনি উচ্চ, এমনি সুমিষ্ট ছিল, একবার শুনিয়াই সে এ গানটা আয়ত্তে আনিয়া ফেলিয়াছিল।

কমনীয়ের বক্ষ ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। গান তো সকলেই গায়, হয় তো খুব ভালও গায়, কিন্তু তাহার কণ্ঠে এই গানটী কি চমৎকারই উচ্চারিত হইত! হায়, এই বড় সাধের গানটা সে ইচ্ছা করিয়াই ভুলিয়া গিয়াছে, বাইজি তাহা আজ আবার মনে করাইয়া দিল। তাহার হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশ হইতে কে যেন হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, হায় হায়, সব গিয়াছে গো, সব গিয়াছে! সেই ভোরের বেলা ফুল কুড়ানো, বকুলতলায় বসিয়া ফুল কুড়াইয়া মালা গাঁথা, দোলায় বাঁশী বাজানো— সে সবই এখন অতীত স্বপ্নের কথা। কিছু নাই রে কিছু নাই। সে কমনীয় কোথায় গিয়াছে? এ যে সেই কমনীয়ের ছায়া মাত্র। এ যে মদ্যপ কমনীয়। কিন্তু সব যাক—প্রাণের শুভ্রা, সব বিসর্জ্জন দিয়াও সে প্রকৃত প্রণয়ীর ন্যায় তোমার সেই ছবিখানা হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিয়াছে। সে তোমায় কখনও হারাইবে না। তুমি কলঙ্কিনী হও, তুমি পতিতা স্খলিতা হও, কমনীয় তবু তোমার সেই মূর্ত্তিখানিকে পূজা করিবে, কারণ সে মূর্ত্তি অকলঙ্কিত, পবিত্র।

সে জড়ের মত সেখানে বসিয়া রহিল। যখন চমক ভাঙ্গিল, তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। বাইজি তখন অন্য গান গাহিতেছে। প্রণয়ীর আকুল মর্ম্মোচ্ছ্বাসেই ভরা সে সুর, সে সুর কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিতেছে—

"এসো ফিরে এসো, এসো প্রিয়তম
শেষ এ মিনতি, এসো হে ফিরে।"

কাহাকে কে ডাকে? জগৎ জগৎকে ডাকিতেছে, মানব মানবকে ডাকিতেছে মর্ত্ত্য স্বর্গকে ডাকিতেছে। হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশ আলোড়িত করিয়া কথা জাগিতেছে —এসো ওগো এসো। কে আসিবে—কোথায় আসিবে? যে গিয়াছে সে কি আর ফিরিয়া আসে? সে ফিরে না, ফিরে না বলিয়াই এত দীর্ঘশ্বাস, এত অশ্রুজল, এত হাহাকার।

অবশ অলস পা দুখানা কোনও মতে অলস দেহখানাকে আসরে টানিয়া আনিল। জ্যোতিশের অবস্থা আজ পঞ্চমেই ছিল, সে উঠিয়া কমনীয়কে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল।

বাইজির তাল হঠাৎ কাটিয়া গেল, সে ফিরিয়া দাঁড়াইল, তখনি লজ্জিত হইয়া ভঙ্গ তাল সামলাইয়া গান গাহিল।

নেশায় স্তিমিত নেত্রে কমনীয় দেখিতেছিল স্বর্গ হইতে অপ্সরা নামিয়া তাহার সম্মুখে গান গাহিতেছে। সে কণ্ঠ বাঁশীর চেয়েও মিষ্ট, উচ্চ। কি তাহার দেহের বর্ণ, একি গোলাপ ফুলের রঙ? এমন চোখ, এমন মুখ, এমন হাত দুখানি একি মানুষের সম্ভব? তাহার পর মনে হইল এ যেন শুভ্রা। তাহারও যেন এমনি মুখ, এমনি কণ্ঠস্বর, এমনি নবনীততুল্য নিটোল নধর হাত দুখানি ছিল। কমনীয় প্রাণপণে চাহিল—কিন্তু না, চক্ষু যে মুদিয়া আসে, ভাল দেখা যায় না, চিনিতে পারা গেল না।

বানু নিকটে তাহারি পানে চাহিয়া গাহিতেছিল,

জনম জনম আমি এমনিই আসি যাই,
কখনও না পাইলাম দরশন তার,
তাহারে পাবার তরে, কলঙ্কে দিলাম ঝাঁপ,
তবু হায় তার দেখা পাওয়া হ'ল ভার।

কমনীয় মুগ্ধনেত্রে চাহিয়াছিল, চাহিতে চাহিতে কখন সে জ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া গেল, তাহা সে জানে না।

যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন সে বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া দেখিল, আলোকোজ্জ্বল কক্ষে সে বিছানার উপর শায়িত। মুখ ফিরাইতেই চোখে পড়িল, টেবিলের ধারে চেয়ারে উপবিষ্টা বাইজি বানু। সে একখানা বই পড়িতেছিল। তাহার নাচের সাজ এখন নাই, সামান্য একখানা কালা ফিতা শাড়ি ও একটী সাদা সেমিজ তাহার পরণে।

সে জাগিয়াছে দেখিয়া বানু বই রাখিয়া উঠিয়া পড়িল। নিকটে আসিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "এখন কিছু খাবে কি?"

কমনীয় বিস্মিত নেত্রে তাহার পানে খানিক চাহিয়া রহিল। এ যে সেই মুখ, সেই চোখ, সেই কথা।

কমনীয় ঠেলিয়া উঠিতে গেল, কিন্তু মাথা বড় ঘুরিতে ছিল, সে উঠিতে পারিল না। তিরস্কারের সুরে বানু বলিল, "এখনি উঠছ কেন? খানিক শুয়ে থাক। দুধ আনতে বলে দেই, দুধটুকু খেয়ে বাকি রাতটা ঘুমোও। আর ঘণ্টাখানেক মাত্র রাত আছে, এখন উঠতে যেয়োনা।"

ধীরপদে সে চলিয়া গেল, খানিক পরে নিজের হাতে এক বাটী গরম দুধ লইয়া ফিরিল, "এই নাও, খাও।"

কমনীয় নীরবে তাহার হাত হইতে বাটী লইয়া দুধটা খাইয়া ফেলিল। বানু আলোটা কমাইয়া দিয়া দরজা ভেজাইয়া দিয়া যাইবার সময় বলিল, "নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও, এখন জেগে থেকোনা আর। আমি পাশের ঘরেই থাকছি, বারাণ্ডায় আমার চাকর শুয়ে আছে। যদি কোনও দরকার পড়ে তাকে ডেকো।"

এ কি শুভ্রা নয়? হাঁ, সেই তো। কমনীয় উঠিয়া বসিল, রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল "শুভ্রা—শুভ্রা।"

কিন্তু সে তখন চলিয়া গিয়াছে।

কমনীয় শ্রান্তভাবে বিছানায় পড়িয়া গেল, "রাক্ষসী শুভ্রা, সর্ব্বনাশী!"

কিন্তু সে সর্ব্বনাশী হোক, সে রাক্ষসী হোক, সে যেন তাহাকে চিনিয়াছে। মাতাল, জ্ঞানশূন্য কমনীয়কে দেখিয়া তাহার হৃদয়ে লুপ্ত স্নেহ আবার জাগিয়া উঠিয়াছে, তাই সে তাহার উপস্থিতকার মনিব জ্যোতিশ ও বন্ধুবর্গকে মত্তাবস্থায় সেখানে ফেলিয়া ভৃত্যদের সাহায্যে তাহাকে একেবারে নিজের কক্ষে নিজের বিছানায় আনিয়া শোয়াইয়া তাহার সেবা করিয়াছে। সে যে সেই শুভ্রা, কমনীয়ের কাছে সে অসীম রূপশালিনী গাইয়ে বানুবিবি নয়; সেই—সেই পল্লীগ্রামের চপলা মুখরা বালিকা শুভ্রা।

কমনীয় আবার ঘুমাইয়া পড়িল। সকালে যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন খোলা জানালার ফাঁক দিয়া সূর্য্যকিরণ বিছানার উপরে আসিয়া পড়িয়াছে, বাতাস ঝির ঝির করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। বাইজির ভৃত্য কেশব দরজার কাছে তাহার ঘুম ভাঙ্গবার প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়াছিল। কমনীয়কে উঠিতে দেখিয়া সে সসম্ভ্রমে বলিল, "আপনার মুখ ধোবার জল দেছি, বারাণ্ডায় আসুন।"

কমনীয় মুখ হাত ধুইয়া মুছিয়া কক্ষমধ্যে আসিয়া বসিল, তাহার একটু পরেই বানু এক হাতে চা'য়ের কাপ প্লেট, আর একটা ডিসে নানা প্রকার খাবার আনিয়া টেবিলে রাখিয়া বলিল, "চা'টা খেয়ে নাও, তার পরে স্নান করে ফেল। বিশ্রী চেহারা হয়ে গ্যাছে দেখছি।"

কমনীয় হাঁ করিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল, তখনই তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, সে গর্জ্জিয়া ডাকিল, "শুভ্রা।"

শুভ্রা হাসিয়া ফেলিল, "হাঁ, শুভ্রাই তো। মারবে না কি, হাত মুঠো করছ যে? তা মারবে মার, আমি পিঠ পেতে দিচ্ছি।"

তাহার মুখের পানে চাহিয়া কমনীয় স্তম্ভিত হইয়া গেল। একটু পরে ধীরভাবে বলিল, "তোমায় মেরে ফেলাই উচিত শুভ্রা, কিন্তু নারীহত্যা মহাপাপ বলেই আমি পিছিয়ে যাচ্ছি। তোমার অবস্থা একবার ভেবে দেখছ কি?"

শুভ্রা চোখ ফিরাইল, "খুব ভেবে দেখেছি। ভেব না যে আমি নিশ্চিন্ত আছি। কিন্তু কি করব, আমার কপালে যা' লেখা ছিল তাতো খণ্ডাতে পারলুম না। আমার যা' হয়েছে, তুমি কি ভাব তা' আমি বিবেচনা করে দেখছিনে?"

তাহার কণ্ঠস্বর হঠাৎ রোদনের স্বরে পরিণত হইয়া গেল, কমনীয়কে লুকাইয়া সে ক্ষিপ্রহস্তে চোখ মুছিয়া ফেলিল। হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "তা আর ভেবেই বা কি হবে বল?"

কমনীয় বলিল, "ফিরবার চেষ্টা করতে পারতে।"

শুভ্রা মাথা নাড়িয়া বলিল, "ফিরেই বা কি হবে? কি আশায় আমি ফিরে যাব বল? আর আমার এ ব্যবসা না চালালেই বা খাব কি? এই সব ঝি চাকর পুষব কি দিয়ে?"

কমনীয় তীব্র কণ্ঠে বলিল, "এ সবে তোমার দরকার কি? পল্লীগ্রামে যখন ছিলে ততদিন কি তোমায় ভিক্ষে করে খেতে হয়েছিল, না দশটা ঝি চাকর তোমার কাজ করত?"

শুভ্রা ধীরকণ্ঠে বলিল, "আমায় অনর্থক দোষ দিয়োনা। আমায় যদি ঠিক চিনতে—না যাক, আমি আর সেখানে

যাব না। যতদিন সামনে আশা ছিল, আমি পড়েছিলুম, যখন দেখলুম আশা ফুরিয়ে গেল, যখন আমি মাটিতে পড়ে আছড়ে কেঁদে উঠলুম, তখনি কোন্ সয়তানে আমায় বশ করে নিলে জানি নে। দেখ, আমি তখন জেগে ছিলুম না, যখন জাগলুম, দেখলুম আমি একেবারে পাঁকের মধ্যে পড়ে, আর সেখান হ'তে উঠবার যো নেই আমার। বিশ্বাস করবে কি, তখন আমি কি রকম আছড়ে পড়ে কেঁদেছিলুম? সে কথা কেউ বিশ্বাস করবে না, তুমিও করবে না তা আমি জানি। কিন্তু বিশ্বাস না করলেও আমি জোর করে বিশ্বাস করাতে চাই নে। আমি যা, তাই তোমরা আমায় জেনে রাখো। মাটি যে—সে চিরকালই মাটি, তাকে রং দিয়ে, তাকে রাংতার সাজ দিয়ে সাজাতে বলিনে। সে পায়ের তলাতেই থাক, সে ভক্তি কুড়াতে চায় না। মাটির আবার মানটা কি?"

কথার শেষ দিকটায় তাহার স্বরটা বেশ তীব্র হইয়াই উঠিয়াছিল, কমনীয় চুপ করিয়া রহিল।

শুভ্রা বলিল, "চা খাও, জুড়িয়ে গেল যে।"

কমনীয় শুধু মাথা নাড়িল।

শুভ্রা বলিল, "খাবে না?"

কমনীয় বলিল, "খেতে ইচ্ছে নেই।"

শুভ্রা চায়ের প্লেট কাপ্ ও খাবারের প্লেটখানা টেবিল হইতে নীচে ফেলিয়া দিল, কাঁচের প্লেট দুখানি ও কাপটা শতখণ্ডে চুরমার হইয়া গেল, খাবারগুলি ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িল। কমনীয় বিস্মিত নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

শুভ্রা তীব্রকণ্ঠে বলিল, "আমারই বুঝতে ভুল হয়েছিল। আমি বাইজি, আমার হাতের ছোঁয়া কি তুমি খেতে পার? কত বড় নিষ্ঠাবান হিন্দু তুমি, আমার ছোঁয়া খেলে তোমার যে জাত যাবে, তুমি যে সমাজে ঠাঁই পাবে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সে সমাজটা কি, যে তিন চার বছরের মেয়ের বিয়ে দেয়, তার পর তার স্বামী মরে গেলে সেই মেয়েটাকে—যে সংসার চেনে না, বিয়ে কি জানে না, তাকে বিধবা বলে চালাতে চেষ্টা করে? তাতে যে তাকে কুপথেই তুলে দেওয়া হয়, সে কথা ভাবতে সে চির উদাসীন। তারও তো আশা থাকে, সাধ থাকে, আনন্দ থাকে—"

কমনীয় জিজ্ঞাসা করিল, "কি আশা তাঁর থাকে শুভ্রা?"

শুভ্রা উত্তর করিল না।

কমনীয় বলিল, "সেটা আমি স্বীকার করি, অতটুকু বয়সে বিয়ে দেওয়া ভারী অন্যায়, কিন্তু সে দোষটা তো সমাজের নয় শুভ্রা, সে দোষ অভিভাবকের। সমাজ তো বলছে না তোমরা তিন চার বছরের মেয়ের বিয়ে দাও। সমাজে যে সতের আঠারো বছরের কুমারী মেয়েও আছে।"

শুভ্রা বলিল, "সে যাদের টাকা আছে তাদের ঘরে। সামান্য গৃহস্থ যারা—তাদের ঘরে মেয়ে বড় থাকতে পায় না। সমাজ তাদের পীড়ন করে, তাদের দলন করে। সামান্য গৃহস্থ নিয়েই আমাদের দেশ, বড়লোক গরীবের সংখ্যার তুলনায় কম। ইতির কথা বলতে পারো, সে খবর আমি পেয়েছি, দেশের সব খবরই আমি রাখি। তার বাপ যে নিজের ব্যারামের জন্যে, টাকার জন্যে তার বিয়ে দিতে পারছিল না, তাতে লোকে কি তাকে সমাজচ্যুত করতে উদ্যত হয় নি? তারপর কোথা হ'তে এক জুয়াচোর এসে তাকে বিয়ে করে তার কুমারী নামটা ঘুচিয়ে গেল। তুমি তো ছিলে, তুমি তাকে বিয়ে করে তাদের কৃতজ্ঞতা আর ভগবানের আশীর্ব্বাদটা কুড়াতে পারলে না, এত বড় হৃদয়হীন লোক তুমি!"

উল্টা চাপ পাইয়া কমনীয় বিব্রত হইয়া পড়িল, "আমি —আমি শুভ্রা?"

শুভ্রা দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, তুমি। অবাক হোয়ো না, অবাক হ'বার কথা এটা নয়। কিসে সে তোমার অনুপযুক্ত ছিল? রূপ তার অতুলনীয়, গুণ তার অশেষ, ধৈর্য্য তার অসীম, তবে কেন তাকে গ্রহণ করলে না? দয়ালু তুমি, কিন্তু কোথায় রইল তোমার দয়া? সে তোমায় কতদূর ভালবাসিত তা জানো কি?"

কমনীয় বিহ্বল ভাবে বলিল, "আমায়?"

শুভ্রা বলিল, "হ্যাঁ, তোমায়। আমি তাকে এগুতে দেইনি, আমি তার পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়েছিলুম বলে তুমি তা' জানতে পারনি। সে প্রেম, সে ভালবাসা যদি পেতে তুমি, তোমাকে তুমি ধন্য বলেই মনে করতে। তোমার

অদৃষ্ট মন্দ, তাই তুমি হেলায় অমন রত্ন হারালে। যাকে একটী কথায় পেতে পারতে, তাকে মাথা খুঁড়ে মরলেও আর পাবে না।"

কমনীয় হাসিয়া বলিল, "সে জন্যে আমি দুঃখিত নই শুভ্রা। তার জন্যে কোনও দিন আমার প্রাণ কাঁদেনি, কিম্বা কাঁদবেও না। আমি কোনও দিন তার দিকে চাইনি, চাইবও না, তবে আমার কষ্ট করবারও কোনও কারণ দেখছি নে।"

শুভ্রা গম্ভীর হইয়া বলিল, "তাতো বলবেই। পুরুষ মানুষ কি না, লোকের দুঃখ কষ্ট তোমরা বুঝবে কি? নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যটা যতদূর বোঝ, অপরের বেলায় যদি ততদূর বুঝবার ক্ষমতা থাকত—"

বাধা দিয়া কমনীয় পরিহাসের সুরে বলিল, "কিন্তু তোমায় তো কষ্ট দেইনি শুভ্রা?"

"আমায়" শুভ্রার মুখ শুভ্র হইয়া গেল, মুখ ফিরাইয়া সে সব কথা চাপা দিয়া বলিল, "তা হ'লে বামন ঠাকুরকে বলি আবার চা খাবার এনে দিতে। আমি বাইরে থাকব, তোমার খাবার সময় তো ঘরে আসব না।"

ব্যস্ত ভাবে কমনীয় বলিল, "না না, আমার খাবার আনতে হবে না, আমি এখন ওখানে যাব।"

"তা যাও"—রাগ করিয়া শুভ্রা চলিয়া গেল।

ক্রমশঃ।

কাশ্মীর-কাহিনী

[শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ডোমেল হইতে যাত্রা করিলাম বেলা ১০টা ১৫ মিনিটের সময়। আমরা ৪৮ মাইল যাইলে তবে উরী ডাকবাংলায় পৌঁছিব। প্রথম গাড়ীতে বন্ধুবর জ্ঞানেন দা'—বৌদিদি, শিশুপুত্র গোপাল ও পাচক ব্রাহ্মণ, ২য় গাড়ীতে মাতুল মহাশয়, মাতুলানী এবং জ্ঞান দা'র ৪র্থ পুত্র টুকু ও শেষ গাড়ীতে আমরা বন্ধু চতুষ্টয় মৃত্যু-বিভীষিকাময় পথে গাহি ডাকবাংলা অতিক্রম করিয়া আনন্দ করিতে করিতে ছুটিতে লাগিলাম। ডোমেল হইতে প্রায় ৪০ মাইল গিয়াছি, এমন সময় প্রায় ১৫০ হাত দূরে একটা বাঁকের মুখে দেখিলাম, জ্ঞানদা'র গাড়ীখানি দণ্ডায়মান, তাহার চারিদিকে লোক বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পিছনে মাতুল মহাশয়ের গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমাদের গাড়ীও থামিল। আমাদের driver ও আমরা নামিয়া ব্যাপারটা কি দেখিবার জন্য ছুটিয়া গেলাম। দেখিলাম, জ্ঞান দা' ও তাঁহার পত্নীর—আমাদের সদাহাস্যময়ী বৌদির—মুখ বিশুষ্ক, এবং পাচক ব্রাহ্মণ যে ড্রাইভারের পার্শ্বে বসিয়াছিল তাহার পা কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে! সম্মুখে একখানি 'লরি' (Lorry) দোষী আসামীর মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! ব্যাপারটা বুঝিতে বিলম্ব না হইলেও বর্ণনায় যাহা শুনিলাম, তাহাতে ভয়ে বুক দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল! উক্ত 'লরি'র সহিত জ্ঞান দা'র গাড়ীর সংঘর্ষ! গাড়ীর চাকা রাস্তা হইতে পাঁচ ইঞ্চি মাত্র সরিলেই সর্ব্বসমেত সুগভীর 'খড়ে' পড়িতে হইত! অতিকষ্টে ছিটকাইয়া পড়িবার বেগ সামলাইয়া জ্ঞান দা' প্রাণে বাঁচিয়াছে!

এই রাস্তায় সব গাড়ীর ড্রাইভারেরা প্রাণপণে পরস্পরের বেগড়ান গাড়ীর সাহায্য করে। তাহার উপর আমাদের গাড়ী তিনখানি একই কোম্পানীর ছিল বলিয়া একজন mechanic মিস্ত্রিও আমাদের সঙ্গে ছিল। তিন জন ড্রাইভার ও এই মিস্ত্রী লইয়া চারজন এবং 'লরি'র দুই জন, ছয়জনে মিলিয়া গাড়ী মেরামতে প্রবৃত্ত হইল। ইত্যবসরে জ্ঞানদা'কে অনেক বলিয়া বুঝাইয়া আমাদের গাড়ীতে উঠাইয়া দিলাম। আমরা চার জন তাহার পরিত্যক্ত ধাক্কা-খাওয়া বেগড়ান গাড়ীখানি দখল করিলাম। মাল-

পত্র যে গাড়ীতে যেমন ছিল ঠিক তেমনই রহিল। গাড়ীখানি একটু চলনসই হইলে আমরা ১ম গাড়ী ছাড়িলাম, ২য় গাড়ীতে মাতুল মহাশয় ও ৩য় গাড়ীতে সপরিবারে জ্ঞান দা' এই ক্রমে যাত্রা করিলাম। বলা বাহুল্য ২০০।৩০০ হাত যাইতে না যাইতে একটা বাঁকের মুখে আমাদের গাড়ীখানি বিগড়াইল, ব্রেক মানিতে এবং মোড় বেঁকিতে চাহিল না। সর্ব্বনাশ!

হঠাৎ মনে পড়িল, বিপদে মধুসূদন। মনে পড়িল, এক মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন গীত-প্রয়োগে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে আমাদের এক আত্মীয়কে বাঁচাইতে পারা গিয়াছিল। নিজেদের জীবনরক্ষার বর্ম্মরূপে—কবচরূপে—আজ গুলরাজ ভগবানের নিকট সেই প্রাণস্পর্শী গীতটী এই বন্ধুর পার্ব্বত্য-পথে গাহিলেন:—

"কোথা হরি, ব্যথাহারী, শ্রীমধুসূদন!
দয়া কর, দয়াময়, আকুল জীবন।
পাথারে পড়িয়া ডাকি, ঘেরেছে ঘোর আঁধার,
হুতাশে পরাণ কাঁপে ঝরে ঝরে আঁখিধার—
রাখ রাখ রাঙা পায়ে, লয়েছি শরণ।"

ভগবানের দরবারে 'আপিল' করা হইল বটে, কিন্তু মনের দৃঢ়তা কোথায়? ফলে আমরা সভয়ে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। পথ ছিল অত্যন্ত ঢালু। মোড় ফিরিবার সময় যদি ড্রাইভার ভুলক্রমে চক্ষের পলক ফেলিতে যে সময় লাগে তাহাও নষ্ট করে, তাহা হইলে গাড়ী সমান গিয়া ২০০।৫০০ বা ৭০০ ফিট নীচে পড়িয়া চুরমার হইয়া যাইবেই! আমাদের অন্য গাড়ী দুইখানিও ইত্যবসরে আসিয়া পড়িল। আমরা ৪ জন তখন বাধ্য হইয়া বিকল গাড়ীখানি ছাড়িয়া অন্য গাড়ী দুই খানিতে উঠিলাম এবং তাহা হইতে কতকগুলি মোট এই গাড়ীতে দিয়া পুনরায় যাত্রা করিলাম। উক্ত গাড়ীর চালক এবং mechanic মিস্ত্রি গাড়ীখানি পুনরায় মেরামত করিবার জন্য রহিয়া গেল।

আমরা 'উরি' ডাকবাংলায় উঠিলাম বেলা ২টায়। এখান হইতে শ্রীনগর ৬৩ মাইল দূরে। দৃশ্য এখানকার মনোরম। এখানে পোষ্টাফিস্ তার আফিস্, ডাক বাংলা প্রভৃতি সবই আছে। ইহাও একটী ছোটখাট সহর বিশেষ, তবে মারীর মত নহে। মনে হয় এই পার্ব্বত্য পথের মারীই রাজধানী। 'উরি'তে ২।১টী মাত্র দোকান আছে। আমরা হিন্দু বিভাগে গিয়া পাচককে আহার্য্য প্রস্তুত করিতে বলিলাম। ইত্যবসরে জ্ঞান দা' ও আমাদের পাহাড়ী পাণ্ডা গুলবিহারী বলিল, দেখ যে রকম মৃত্যুর মুখ হ'তে আমরা বেঁচে এসেছি তা'তে সাহস হয় না, আমাদের আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুবান্ধব কেহ এ পথে আসে। আমাদের কেশব সপরিবারে ৩।৪ দিন পরে কলিকাতা হইতে রওনা হইবে। টেলিগ্রাফ করিয়া তাহাকে সমস্ত ব্যাপারটা জানাইয়া রাখা উচিত। তাহার পর সে যেমন বুঝিবে সেইমত কার্য্য করিবে। বলা বাহুল্য, তাহাকে স্পষ্ট করিয়া আসিতে নিষেধ করিতে কাহারও প্রাণ চাহিতেছিল না। কারণ আমাদের বন্ধুবান্ধবের মধ্যে সৌন্দর্য্য-উপভোগ করিবার, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার এবং বুঝাইবার ক্ষমতা কেশবচন্দ্রের অদ্বিতীয়। উপরন্তু তাঁহার মেজাজ খুস্ অর্থাৎ formএ থাকিলে তার চেয়ে স্ফূর্ত্তিবাজ বন্ধুও আমাদের নাই। যদি তাঁহাকে সঙ্গীরূপে পাইতাম তাহা হইলে ইহা নিঃসন্দেহ যে আমাদের কাশ্মীর-সম্বন্ধীয় জ্ঞান চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইত। বন্ধুদের যুক্তিমত আমি টেলিগ্রাম করিতে সম্মুখের তার-আফিসে গমন করিলাম। টেলিগ্রাম-ফর্ম্মে লিখিতেছি, এমন সময় বন্ধুবর হৃষীকেশকে জ্ঞান দা' ও গুলবিহারী ভগ্নদূত রূপে আমার নিকট পাঠাইল। হৃষীকেশ আমার নিকট এই বারতা বহন করিয়া আনিল—'ছেলেপুলে নিয়ে এ রাস্তায় একাকী আসা অসঙ্গত। সেইরূপ টেলিগ্রাম্ করিয়া দাও। জ্ঞান দা' ও গুলরাজেরও সেই মত।' সকলের মতের প্রতিবাদ করিতে আমি সাহস করিলাম না। অতঃপর পথ সংঘর্ষপ্রতুল ও বিপদসঙ্কুল বলিয়া তাঁহার কাশ্মীর যাত্রা বন্ধ রাখিবার জন্য তার-বার্ত্তা প্রেরিত হইল। টেলিগ্রামের ভাষা লিখিতে সুদক্ষ হৃষীকেশ বলিয়া গেল, আমি ফর্ম্মে লিখিয়া দিলাম।

বেলা ৩৷৹ টার সময় আমাদের হারাধন মোটারখানি হেলিতে দুলিতে আসিয়া পৌঁছিল। নিঃসন্দেহ, আমরা বিশেষ স্বস্তি বোধ করিলাম। এই দেড় ঘণ্টার আমাদের

আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছিল। আমরা সকলে তৃপ্তি সহকারে ভাত, রুটী, ডাল, ভাজা ইত্যাদি আহার করিলাম। দেখিলাম, আমাদের মধ্যে অনেকেই ভাতের পরিবর্ত্তে রুটীই অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিলেন। প্রত্যেককে থাকিবার ভাড়া ৵০ আনা এবং আহারের মূল্য ৷৵০ আনা একুনে ৸০ আনা দিতে হইল। এই বিজন ও বিরাট পাহাড়ের উপর হুকুম দেওয়া মাত্র ১৷০ ঘণ্টার মধ্যে আহার্য্য পাওয়ার হিসাবে বার আনা ব্যয় একান্ত অকিঞ্চিৎকর। এখানে এবং এইরূপ ডাকবাংলায় সাহেবী খানার মূল্য ২৷০ টাকা এবং প্রত্যেকের থাকিবার ব্যয় ১৲ টাকা। ডাকবাংলায় ২৪ ঘণ্টার অধিক কাহারও থাকিবার অধিকার নাই।

বেলা ৪ ঘটিকার সময় আমরা 'উরি' ডাকবাংলা হইতে যাত্রা করিলাম। শুনিলাম, আমরা সন্ধ্যা সাতটায় শ্রীনগরে পৌছিব। এবার আমরা বিকল গাড়ীখানিতে শুধু মাল ঠাসিয়া দিলাম এবং পূর্ব্বের মত দুইখানি গাড়ীতে আমরা সকলে বসিলাম। জ্ঞানদা'র পাশে অনুজপ্রতিম ইন্দু এবং ড্রাইভারের পাশে আমি বসিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম। বৌদি' আমাদের সেকেলে ধরণের লোক, সেইজন্য আমি গাড়ীতে থাকার দরুণ তিনি একান্ত জড়-সড় হইয়া বসিয়াছিলেন! এই বিজন 'পান'হীন পথেতে তিনি মধ্যে মধ্যে জ্ঞান দা' মারফৎ গোলাপজলে ভিজানো পান আমাকে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু এ বিষয়ে অধিক সৌভাগ্যশালী ছিল ইন্দু। একান্ত নির্দ্দয়ভাবে জরদার সাহায্যে অধিকাংশ পান সেই খাইয়া ফেলিতেছিল!

উরি ডাকবাংলা হইতে সামান্য দূর অগ্রসর হইতেই দেখিলাম কাশ্মীর-রাজের একখানি বিশ্রাম-আবাস ঝিলাম নদীর উপর পথের পাশে শোভা পাইতেছে। উরির নিকটে একটী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিলাম। ড্রাইভারের মুখে শুনিলাম, পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসের সময় এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া কিছুকাল এখানে অবস্থান করিয়াছিলেন।

উরি হইতে বারামুলা যাইবার পথে, ১৩½ মাইল দূরে রামপুর, এবং রামপুর হইতে ১৫½ মাইল দূরে বারামুলা। অর্থাৎ উরি হইতে বারামুলার দূরত্ব প্রায় ২৯ মাইল। এই পথটি স্থানে স্থানে উচ্চ এবং স্থানে স্থানে প্রায় সমতল। রামপুর ডাকবাংলার নিকটই কাশ্মীর রাজ্যের ইলেকৃট্রিক পাওয়ার হাউস (Electric power house) আছে। এখানে জলপ্রপাতের শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করিয়া এই Power house চলিতেছে। সেইজন্য এখানে ইলেকৃট্রিক Power houseএর পরিচালন-ব্যয় কম এবং কাশ্মীর রাজ্যে ইলেকট্রিক সরবরাহ নামমাত্র মূল্যে হইয়া থাকে। শ্রীনগরে প্রতি ১৬টি বাতির মত উজ্জ্বল (অর্থাৎ 16 C. P.) আলোর জন্য মাসিক ৷৴০ নয় আনা দিতে হয়। ২৪, ৩২, ৫০, ১০০ বা ততোধিক ক্যাণ্ডল পাওয়ার হইলে উক্ত ১৬ বাতির মূল্য অনুপাতে মাসিক মূল্য দিতে হয়। পরিমাপ-যন্ত্রের (meter) ব্যবহার না থাকায় একঘণ্টা, সারারাত্রি কিংবা ব্যবহার না করিলেও দেয় মূল্যের তারতম্য নাই।

পথে উল্লেখযোগ্য কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই, তবে আমরা বারামুলার যত নিকটে পৌছিতে লাগিলাম ততই আমাদের বিস্ময় ও আনন্দের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বেলা প্রায় ৫টা বাজিয়া গিয়াছে। ক্লান্ত রবি পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িতেছে। তাহার আলোকচ্ছটা দূরে বহুদূরে, মধ্যে নিকটে তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতের উপর পড়িয়া নানাবর্ণের সৃষ্টি করিতেছে। দূরে পাহাড়গুলি কোথাও শ্বেত, কোথাও পীত, কোথাও রক্তিমাভ এবং কোথাও কৃষ্ণ বর্ণে সজ্জিত হইয়া যেন পথিককে সম্মান-প্রদর্শন করিবার জন্য দণ্ডায়মান। এই স্থানে ঝিলাম-উপত্যকার দৃশ্যও সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম। সন্ধ্যায় সূর্য্যালোকে অপূর্ব্ব-শ্রী ধারণ করিয়াছে। নানাবর্ণের সজীব গালিচাগুলি পাতা রহিয়াছে। সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছি, আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছি! নয়নের ক্ষুধা মিটিয়াও মিটিতেছে না। এ যে কাঙালের কাছে উন্মুক্ত রাজৈশ্বর্য্য-ভাণ্ডার! ভাবিতে লাগিলাম, এত অতি-ভোজনে নয়নের Dyspepsia হইবে না কি!

প্রায় পৌনে ছটায় বারামুলার বাজারে পৌছিলাম। উপত্যকায় এই প্রথম সহর দেখিলাম। সমুদ্র সমতল হইতে বারামুলার উচ্চতা ৫১৭০ ফিট্ এবং শ্রীনগরের উচ্চতা ৫২৫০ ফিট্। এই ৩৪ মাইলে আমাদিগকে আরও ৮০ ফিট্ (অর্থাৎ কলিকাতার সাধারণ বাটীর ৮

তলা) উপরে উঠিতে হইবে। সুতরাং বাকী ৩৪ মাইল পথটীর পাশে আর অচল 'খড' পাইব না ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। বারামুলাতেই এক প্রকার পার্ব্বত্য পথের অধিকার হইতে অব্যাহতি-লাভ করিলাম। কি ভীষণ পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া আমরা আসিলাম! একটী পর্ব্বতের শীর্ষদেশ হইতে ঘুরিয়া ফিরিয়া পাদমূলে প্রায় সমতল ভূমিতে নামিয়া পরবর্ত্তী পাহাড়ের পাদমূল হইতে আবার ছুটিতে লাগিলাম কখনও মধ্যে, কখনও শীর্ষে আবার কখনও পাদমূলে। এমন পাহাড় আছে যাহার নীচে নামিয়া পরবর্ত্তী পাহাড়ে যাওয়া অসুবিধা। হয়ত, ৩।৪ মাইল ঘুরিতে হয়, পাহাড় ভেদ করিতে হয় এইরূপ। সেস্থলে ছোট ছোট সেতু দুইটী পর্ব্বতকে সংলগ্ন রাখিয়াছে। এরূপ সেতুর সংখ্যাও কম নহে।

পার্ব্বত্য-পথে ঝিলাম নদীর শাখা-প্রশাখার গতি ও প্রবাহ, শ্রেষ্ঠ শিল্পী ভগবানের স্বাভাবিক চিত্র। চিত্রকরের তুলিতে তাহা ফুটিতে পারে না। সেই শাখা-প্রশাখা গুলিকে নদীর রূপে দেখিলাম বারামুলায়। এখানকার ঝিলাম নদীর রূপে মোহিত হইলাম এবং এইখানে আমরা প্রথম House boat দেখিলাম।

হাউস্‌বোট কি তাহা বোধ হয় পাঠকের মধ্যে অনেকে অবগত নহেন। এককথায়, ভাসমান্ নৌকার উপরে নির্ম্মিত কাঠের বাড়ীকে হাউস্‌বোট বলে। হাউসবোটগুলি সাধারণতঃ একতলা। কিন্তু অনেক সম্পত্তিপন্ন সৌখিন্ লোকের ও অনেক সাহেবের দ্বিতল হাউস্‌বোট আছে যেমন সাহেবী বাড়ীর জানালা দরজা, হাউস্‌-বোটগুলিরও তাই। ছাদে উঠিবার সিঁড়ি, দরজা, এবং খড়খড়ি, সার্সি, ঝালর প্রভৃতি সবই আছে। পরিষ্কার রঙ্ দেওয়া, যেন এক একখানি ছবি। প্রত্যেক শয়ন-কক্ষে এক একখানি খাট, আল্‌না, আলমারী হ্যাট্‌র্যাক ও মেঝেতে গালিচা বিস্তৃত। ভোজনাগারে গোল টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি। বসিবার ঘরে মেঝেতে গালিচা, গদিপাতা ও "সুযনী" মোড়া চেয়ার (সুযনী = নানা বর্ণে মুদ্রিত কাশ্মীরে প্রস্তুত মোটা কাপড়) লিখিবার ছোট টেবিল ইত্যাদি। ছাদ নানা ফুলগাছের টবে সজ্জিত। প্রত্যেক ঘর বৈদ্যুতিক আলোকে ভূষিত। ব্যবহারের বাসন ও আসবাব প্রচুর। পথে ও কাশ্মীরে ব্যবহারের মত শুধু একটী ছোট বিছানা লইয়া যাইলেই চলিতে পারে।

বহুকাল হইতে মাঝিরা এইরূপ হাউসবোটে বসবাস করিয়া আসিতেছে। তাহাদের ঘর-বাড়ী, মৃত্যু-বিবাহ কার্য্যকলাপ সবই এই হাউসবোটে। এক একখান হাউস-বোট নির্ম্মাণে ২,০০০৲ হাজার হইতে ৫০,০০০৲ টাকা ব্যয় হয়।

অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লোকে "ডোঙ্গা"য় বসবাস করে। সেগুলির ছাদ খড় দিয়া ছাওয়া। জানালায় পর্দ্দা। দরজা ছোট, প্রত্যেক বারে সাবধানে প্রবেশ করিতে হয়। এই শ্রেণীর ডোঙ্গাও ভাড়া পাওয়া যায় এবং ভাড়াও হাউস্‌বোটের তুলনায় অত্যন্ত সুলভ।

বারামুলা সহরে প্রবেশ করিয়া আপেল, ফ্রেঞ্চ পিয়ার, প্রভৃতি কতকগুলি ফল কিনিলাম। খুব বড় বড় ফল, দর ১টীর ১ পয়সা। আমরা নূতন যাত্রী বলিয়া মূল্য কিছু অধিক দিতে হইল অনুমান করিলাম। নহিলে, হয়ত ফলগুলির ন্যায্য মূল্য পয়সায় ২টী বা ৩টী। কয় খিলি তৈয়ারী পান কিনিলাম। ১ খিলির মূল্য দুই পয়সা। এলাহাবাদের পর ষ্টেশন হইতে সর্ব্বত্রই ১ পয়সায় ১ খিলি পান; বারামুলায় দুই পয়সা। শ্রীনগরে কিন্তু ১ খিলি তৈয়ারী পানের মূল্য ১ পয়সা, এবং গোটা পান ১ পয়সায় ২টা।

ঠিক ৬টার সময় আমরা বারামুলা হইতে যাত্রা করিলাম। তখনও সূর্য্যের যথেষ্ট আলোক ছিল। পথের দুই পার্শ্বে সফেদা বৃক্ষের সারি। ৩৩ মাইল শ্রীনগর অবধি গিয়াছে। প্রত্যেক গাছের ব্যবধান ১ হাত বা ১½ হাত। এই গাছের কাণ্ড সরল এবং উর্দ্ধে ৫০।৬০ ফিট উঠিয়াছে। ইহাই প্রকৃত Avenue। কলিকাতা হইতে বালিগঞ্জে যাইবার পথের দুই পার্শ্বে নানা জাতীয় বৃক্ষের সারিতে একটা avenue (বৃক্ষ-সারি) হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার তুলনায় তাহা avenue নামের অযোগ্য। শ্রীনগর অভিমুখে যাইতে যাইতে পথের পাশে সাইনবোর্ডে লেখা Way to Sopur, Way to Sadipur, Way to Gulmarg

প্রভৃতি দেখিলাম। এই পথটী অতি পরিষ্কার, মোটর পড়িয়া যাইবার বা অপঘাত মৃত্যুর সহজে সম্ভাবনা নাই। মোটর গাড়ীগুলি এই অবসরে ঘণ্টায় ৩০।৩৫ মাইল হিসাবে ছুটতে লাগিল, যাহাতে আমরা সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই শ্রীনগরে পৌঁছিতে পারি। কিন্তু তাহা হইল না। যখন প্রতিপদের অন্ধকার পথটী আচ্ছন্ন করিল, তখনও আমাদের কুড়ি মাইল যাইতে বাকী। এই পথের প্রায় প্রত্যেক ড্রাইভারই ওস্তাদ। কে বেশী কে কম, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। সেই অন্ধকারেই তাহারা সবেগে মোটর চালাইল। গাড়ীর আলো কাহারও জ্বলিল না। মনে হইল, রাত্রিতে মোটর চালানো নিষেধ বলিয়া সম্ভবতঃ গাড়ীতে আলো জ্বালাইবার সরঞ্জাম রাখা সম্বন্ধে তাহারা বিশেষ মনোযোগী নহে।

পথে অন্য লোকের একখানি মোটর হারিকেন আলোকের সাহায্যে চালিত হইতেছিল। আমাদের ড্রাইভার এই মহাসুযোগ অবহেলায় ত্যাগ না করিয়া তাহার পশ্চাদানুবর্ত্তী হইল। আমাদের অন্য মোটর দুইখানি পথে আমাদের হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল এবং আমাদের হারিকেন আলো সেই দুইখানির একখানিতে ছিল। অনেক কষ্টে আমাদের চিরবাঞ্ছিত ভূ-স্বর্গ শ্রীনগরে পৌঁছিলাম ১০ই অক্টোবর ১৯২৩, রাত্রি ৮টায়। আমাদের গাড়ীখানি অন্য গাড়ী দুইখানির অপেক্ষায় ধর্ম্মশালার নিকট দাঁড় করাইলাম। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের অন্য ২খানি গাড়ীও পৌঁছিল।

রাত্রে শ্রীনগরটী বিজলীর আলোকমালায় বিভূষিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তখন সান্ধ্য-বসনে আত্মগোপন করিয়াছিল—দেখিবার উপায় ছিল না।

শ্রীনগরের অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপর আমাদের সুপারিশ পত্র ছিল। তাঁহাদের মধ্যে তথাকার ইলেকট্রিক্ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বসু মহাশয় অন্যতম। রাত্রি ৮॥ টা হইতেই রাস্তায় জনসমাগম কম হইতেছে, দোকানপাট বন্ধ হইতেছে দেখিলাম। এত রাত্রিতে কোনও ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়া উৎপাত করা অলৌকিক মনে করিয়া আমরা ধর্ম্মশালাতেই রাত্রি-যাপনের ব্যবস্থা করিলাম। ধর্ম্মশালাটী রাজপথের উপর প্রকাণ্ড ত্রিতল বাটী। বাটী রক্ষক তখন স্থানান্তরে গিয়াছিলেন, সেইজন্য আমরা প্রায় ১ ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিয়া রাত্রি ৯॥ টার সময় গৃহে প্রবেশ লাভ করিলাম। বলা বাহুল্য, এখানকার দারুণ শীতেও আমরা একেবারেই অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি নাই, পরন্তু ভ্রমণজনিত দারুণ অবসাদ একেবারে দূরীভূত হইয়াছিল। বেলা ৩॥৪ টার সময় আমরা উরি ডাকবাংলায় আহার করিয়াও রাত্রিতে যথেষ্ট ক্ষুধাবোধ করিয়াছিলাম, কলিকাতায় এমন ক্ষুধার পরিতৃপ্তিতে আমরা অনভ্যস্ত। সুতরাং বিদেশে সাহস করিয়া কিছু খাইলাম না। মুখ হাত ধুইয়া গল্প করিতে করিতে আমরা ঘুমাইয়া পড়িলাম। ধর্ম্মশালায় আমরা সারা রাত্রি বৈদ্যুতিক আলোক ব্যবহার করিয়াছিলাম।

পরদিন অতি প্রত্যুষে দাশুদা'র স্বাভাবিক তাড়না' তাহাকে আমাদের বহুপূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। শীতে কিরূপ সে নাকাল হয়, তাহা দেখিবার জন্যও যে আমরা উদ্‌গ্রীব ছিলাম না, এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করিতে হয়। বেলা ৮টা বাজিয়াছে আমাদের জ্ঞান দা' ত্রিতলের একটী কক্ষের মধ্যে গরম জামা ও কম্বলের বস্তা ঘাড়ে চাপাইয়া দ্রুত পদসঞ্চালন করিতেছিল এবং বৌদি' ষ্টোভে চায়ের সরঞ্জাম লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। দ্বিতলের কক্ষে আমরা ছিলাম। আমি লেপ ঢাকা দিয়া বিছানার উপর বসিয়া তাম্রকূট-সেবনে দেহকে একটু গরম করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম; ইন্দু পূর্ব্ব রাত্রের গাল-ভরা পানটীর অণুগুলিকে জিহ্বার সাহায্যে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া রোমন্থন করিতেছিল! এবং হৃষীকেশ প্রসিদ্ধ বেহালা-বাদক ঘনশ্যাম বাবুর সাক্ষী বুলি কপচাইতেছিল—*Late livenghars ghugnitude plus bonkadified of the boondis.* এমন সময় শ্রদ্ধাস্পদ দাশু দা' আসিয়া আমায় বলিল—'ছকু, এখানে এসেও বসে বসে তামাক ফুকবি? একবার Orange William এর মত racing pace দিয়ে বেরিয়ে পড় দেখি!' এবং উত্তরের অপেক্ষা না করে বেগে ঘরের বাহির হইয়া বারান্দায় চলিয়া গেল। আমি লেপ ছাড়িয়া হুঁকা হস্তেই পশ্চাদ্ধাবন করিলাম এবং হৃষী ও ইন্দু কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া বিবক্তিভাবটুকুকে প্রস্ফুট হইবার

অবসর না দিয়া আমার সঙ্গ লইল! বারান্দায় আমরা সকলে সমবেত হইলাম ও বিস্ময়বিহ্বল নয়নে দেখিলাম! আমাদের কাহারও মুখে বাক্য ফুটিল না! চতুর্দ্দিকে স্তরে স্তরে শ্বেতশুভ্র পর্ব্বতমালা বেষ্টিত উপত্যকায় আমরা! একটীর উপরে একটী অদ্রি, একটীর পশ্চাতে অন্যটী, এমনই কত যোজন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পিছাইয়া গিয়াছে। সূর্য্যরশ্মি তুষার-কিরীটিনীতে প্রতিফলিত হইয়া শত রামধনু সৃজন করিতেছে! নবনীত-কায় তুষার তাহা সহ্য করিতে পারিতেছে না, তাই গলিয়া গলিয়া পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া অধোমুখে ছুটিতেছে! মরি মরি, মুগ্ধ হইলাম, বিভোর হইলাম! আমার একান্ত বেসুর কণ্ঠে বাহির হইল—

"মরি রে কি দেখিলাম!
জীবন-জনম সফল হইল,
দেখনু শিবের ধাম!

হৃষীকেশ হটিবার পাত্র নহে, সে সংযোগ করিল—

ধনি এ কপাল-লেখা!
সারাটা বরষ, আন্ধারে গোঙায়নু—
আজ, আন্ধারে আলোক-রেখা!

দাশু দা' তাহার সুমিষ্ট সুরেলা কণ্ঠে গাহিল—

লক্ষই লাখ রামধনু—
রূপ নিঙারি—সায়র-সাঁতারি—
বুঝিবা ডুবিয়া গেনু!

ইন্দু বলিল—

কি দেখিলাম!
স্বপন-তীরথ সফল সকল,
নিরীখনু ভগবান!"

আমরা এততেও স্বস্তিবোধ করিতে পারিতেছিলাম না। "এত হাসি ফুলরাণী, তবু আঁখিজলে ভাসি—কত মনে হয়"। আমাদেরও তাহাই হইতেছিল। বড় প্রাণের সহিত ডাকিলাম, এস চিরবাঞ্ছিত মূর্ত্তিমান আনন্দ দেবা দা' তোমার ছিন্নকন্থা—মলিন রোগশয্যা—ছেড়ে পারত একবার ছুটে এস! কোথায় প্রিয়বন্ধু হরিদাস উমা, উপেন, ভুটি, আমার ফটো-চিত্রের চিরসহচর পুলিনবিহারী আর প্রবাসপ্রিয় স্ফূর্ত্তিপ্রাণ যতীন সোম, আর এস বায়ু-সেবন-প্রিয় কেশব, এস প্রভাস, এস নিদ্রাপ্রিয় সরলপ্রাণ সুরেশ সকলে একবার ছুটে এস, জীবনটা সার্থক করে যাও। পারেন ত, আসুন অধরবাবু—ছাপাখানার ভূতনাথ—একবার দেখে যান, আসল ভূতনাথের আবাসটুকু! তোমাদের মানস-পটে অঙ্কিত, ভূ-স্বর্গের কল্পনা-চিত্র বাস্তব হইতে কত ভিন্ন তাহা উপলব্ধি করে যাও।

ধর্ম্মশালার স্নানাগার প্রভৃতি ব্যবহারের একান্ত অযোগ্য সেইজন্য আমাদের গুলরাজ পণ করিলেন, House-boat ভাড়া করিয়া তবে জলগ্রহণ করিবেন। তদনুযায়ী তিনি ললিতবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দুইখানা House-boat ভাড়া করিতে বাহির হইলেন। বিধাতা বোধ হয় আমাদের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছিলেন, তাই আমরা ভাগ্যক্রমে দুইখানিই নূতন বোট পাইয়াছিলাম। মাসিক ১২৫৲ ও ৯০৲ টাকা ভাড়া ঠিক হইল। Season এ অর্থাৎ কাশ্মীরে অধিক জনসমাগমের সময়ে এই বোট দুইখানিরই ভাড়া যথাক্রমে ১৭৫৲ টাকা ও ১২৫৲ টাকা। এসময়ে আমরা হয়ত অপেক্ষাকৃত কম দামের এমন কি উহার অর্দ্ধেক ভাড়াতেও Housc-boat পাইতে পারিতাম। কিন্তু তাহাতে নিশ্চয়ই এমন ছারপোকা ও পিসুর উপদ্রব থাকিত যে আমাদের হয়ত সেখানে বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে হইত। আনন্দ ভ্রমণে গিয়া, পয়সা লুটাইতে বসিয়া, স্বেচ্ছায় অস্বাচ্ছন্দ্যের স্কন্ধে চড়া আমরা যুক্তিযুক্ত বোধ করিতে পারি নাই।

আমাদের হাউস্-বোটটীর নাম 'এল্‌ফিনকুইন্' (Elphin Queen)। ইহাতে ছিল তিনটী শুইবার ঘর, একটী দাঁড়ার ঘর, একটী বৃহৎ ভোজনাগার, একটী বসিবার ঘর এবং একটী বাহিরের লোকের অপেক্ষা করিবার ঘর। ইহা ছাড়া স্বতন্ত্র রন্ধন করিবার বোট একখানি এবং চারজনের বেড়াইবার 'শিকারা' একখানি। জ্ঞান দা'র হাউস্‌বোটে একখানি ঘর কম ছিল, এবং সব ঘরগুলিই আমাদের ঘরের চেয়ে ছোট ছিল বলিয়া তাঁহারা মনে মনে গুলরাজের উপর একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। চির-সপ্রতিভ গুলরাজও তখন একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল।

কাশ্মীরে আমাদের দৈনন্দিন ভ্রমণের তালিকা দিবার

পূর্ব্বে কাশ্মীরের ভূ-বৃত্তান্ত ও ইতিহাস সম্বন্ধে সামান্য কিছু না বলিলে, বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

কাশ্মীরের ভূ-বৃত্তান্ত।*

বর্ত্তমান কাশ্মীর উপত্যকার সীমানা :—পূর্ব্বদিকে তিব্বত—উত্তরে ইয়ারকন্দ্‌ এবং পামির—দক্ষিণে পাঞ্জাব এবং পশ্চিমে য়াগিস্থান। কাশ্মীর ও জম্মু প্রায় ৮৪,৪৩২ বর্গ মাইল বিস্তৃত।

বর্ত্তমান কাশ্মীর উপত্যকাটী পূর্ব্বে একটী প্রকাণ্ড হ্রদ ছিল এবং উহা সতিসার হ্রদ নামে অভিহিত হইত, এইরূপ একটী জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। ভূ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও ১৫০০।২০০০ ফুট্‌ উচ্চে পর্ব্বত-গর্ভে মৃত মৎস্যের কঙ্কাল, ঝিনুক, শামুক, পানিফল প্রভৃতির নিদর্শন পাইয়া প্রবাদটী অমূলক নহে পরন্তু প্রামাণিক, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। সমুদ্র তটে বেলাভূমির মত, পর্ব্বত-গাত্রে বেলা-ভূমির নিদর্শনও অনেকস্থলে পাওয়া গিয়াছে।

সংস্কৃতে "কাশ্মীর" অর্থে জল প্রস্তর (পর্ব্বত) হইয়া উত্থিত এইরূপ হয়। (কং (জলং) + অশ্ম (পাথর) = কাশ্মন + জাতো অর্থে ঈরচ্‌ প্রত্যয় = কাশ্মীর)

প্রবাদ, কাশ্যপ নামক এক ঋষি গণ্ডূষে হ্রদের জল শোষণ করিয়া স্থলে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহার নামে সেই স্থলের নামকরণ হইয়াছিল, কাশ্যপপুর, কাশ্যপমার এবং পরিশেষে "কাশ্মীর"। সংস্কৃত পুরাণে কাশ্মীরকে গেরেক (সম্ভবতঃ গৃ + কি ক) বলা হইয়াছে, কারণ কাশ্মীর পর্ব্বত গাত্রে অবস্থিত। গ্রীকেরা এই দেশকে কাশপিরিয়া বলিত; ঐ দেশের প্রাচীন গ্রন্থে হেরোডোটাস (Herodotus) কাশপটাইরস এবং হেকোটেয়েস (Hekataios) কাশপালিরাশ্‌ ও কাশপপিরাস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ৫৭৮ পূঃ খৃঃ চায়না দেশের পরিব্রাজক টো ইয়েং এবং সাং ইয়েন কাশ্মীরকে সাই-মি (shie-mi) এবং ৬৩১ খৃষ্টাব্দে হুয়েন সিয়ঙ্‌ "কাইয়-সি-মি-লো" (Kia-shi-mi-lo) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

তিব্বত দেশীয়েরা কাশ্মীরকে "কাচাল" (বরফ মণ্ডিত পর্ব্বত) এবং দর্দ্দিরা (গুরস্‌ দেশের অধিবাসী) 'কাশরাৎ' বলে। কাশ্মীর দেশের লোক কাশ্মীরকে "কাশির" বলে।

এশিয়ায়, পেশোয়ার, বাগদাদ, দামাস্কাস্‌—আফ্রিকায়, ফেষ (মরোক্কোতে স্থিত) এবং আমেরিকায়, দক্ষিণ কেরোলিনার সহিত ইহার Latitude এক।

কাশ্মীরের আদিম অধিবাসী হিন্দু ব্রাহ্মণ। ১৩২২ খৃঃ অব্দে ডালচু নামক এক মুসলমান নৃপতি ৬০,০০০ সৈন্য লইয়া কাশ্মীর আক্রমণ করেন এবং অনেক অধিবাসীকে ইসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ১৩২৩ খৃঃ অব্দে তিব্বত দেশের নৃপতি রেনচন্‌ সাহ কাশ্মীরের শাসন-ভার গ্রহণ করেন এবং হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষালাভ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন দেবস্বামী প্রমুখ কাশ্মীরের ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে দলভুক্ত করিতে অস্বীকার করিলে, তিনি একদিন প্রতিজ্ঞা করেন, পরদিবস প্রাতে প্রথমেই যে ধর্ম্মাবলম্বীকে দেখিতে পাইবেন তাহার ধর্ম্মেই দীক্ষা-গ্রহণ করিবেন। পরদিন প্রাতে বুলবুল সাহ নামক ফকিরকেই তিনি প্রথম দেখেন এবং নিজ প্রতিশ্রুত মত মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে দলভুক্ত করিতে অস্বীকৃত ছিল বলিয়া তিনি বিষম আক্রোশের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে প্রথমে ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তাহার পর সিকন্দার, আজাদ খাঁ, মাদাদ খাঁ প্রভৃতি শাসকেরা ভীষণ বেগে ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারের কার্য্য চালাইয়াছিলেন। ফলে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত কাশ্মীর মুসলমান-প্রধান দেশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানকার মুসলমানদের মধ্যে "পণ্ডিত" "বৌন" প্রভৃতি উপাধি এখনও পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই উপাধিগুলি ব্রাহ্মণদের নিজস্ব ছিল। এমনও দেখা গিয়াছে, কোনও কোনও পরিবারের একটী শাখা এখন ব্রাহ্মণ, অন্যটী মুসলমান। ইহাদের মধ্যে আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব, জাতিত্বাভিমান প্রভৃতি সবই সম্যক্‌ ভাবে এখনও বর্ত্তমান আছে। নিম্নে জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাধিক্যই দৃষ্ট হইবে :—

* পণ্ডিত আনন্দ কৌলের Geography of the Jammu and Kashmir State নামক গ্রন্থ হইতে ভূ-বৃত্তান্ত রচনায় অনেক সাহায্য পাইয়াছি।—লেখক।

	কাশ্মীর উপত্যকা ও মজাফারবাদ ডিষ্ট্রীক্ট লইয়া	সমগ্র কাশ্মীর প্রদেশে
মুসলমানের সংখ্যা	১,২১৭,৭৬৮	২,৩৯৮,৩২০
হিন্দুর ,,	৬২,৪১৩	৬৯০,৩৮৯
বৌদ্ধের ,,	৩	৩৬,৫১২
শিখের ,,	১৪,৭৭২	৩১,৫৫৩
অন্যান্য জাতির সংখ্যা	২৪৫	১,৯৫২
মোট জনসংখ্যা	১,২৯৫,২০১	৩১,৫৮,১২৬

ইহার মধ্যে পুরুষ ৬,৯১,৭৮০ এবং স্ত্রীলোক ৬,০৩,৪২১।

ভাষা—কাশ্মীরী ভাষা সংস্কৃত ও পারসী ভাষার মিশ্রণ। কাশ্মীর উপত্যকায় এই ভাষায় কথাবার্ত্তা চলে। কাশ্মীরীরা নিজের ভাষায় পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিলে হিন্দী বা উর্দ্দ জানা লোক তাহার একটী বর্ণও বুঝিতে পারিবে না। কাশ্মীরীরা কিন্তু হিন্দী বলিতে ও বুঝিতে পারে।

জম্মুতে দোগ্রা ও পঞ্জাবী ভাষার প্রচলন আছে।

শিক্ষা—রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রাথমিক শিক্ষা-প্রদানের অবাধ প্রচলন আছে। দ্রুতগতিতে ইংরাজি শিক্ষার প্রসার সর্ব্বত্র হইতেছে। বড় বড় সহরে উচ্চ ও মধ্য বিদ্যালয় আছে। জম্মুতে ও শ্রীনগরে ইংরাজি কালেজ ও বালিকা-বিদ্যালয় আছে। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত কালেজ গুলির সংযোগ (affiliation) আছে এবং পরীক্ষার্থীদের পঞ্জাবে গিয়া পরীক্ষা দিতে হয়।

শাসন বিভাগ—কাশ্মীরের মহারাজা জম্মু ও কাশ্মীরের অধীশ্বর। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী দুইজন অধস্তন মন্ত্রীর সাহায্যে রাজকার্য্য পরিচালনা করেন। মন্ত্রীরাই বিভিন্ন বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা।

কাশ্মীর রাজ্যটি চারভাগে বিভক্ত (১) জম্মু (২) কাশ্মীর (৩) লাদাক্ (৪) গিলগিট্।

জম্মু ও কাশ্মীর প্রদেশ শাসনের জন্য দুইজন গভর্ণর নিযুক্ত আছেন এবং দুইজন উজীর ওয়াজরৎ রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রীর কর্ত্তৃত্বাধীনে লাদাক্ ও গিলগিট্ শাসন করেন।

গভর্ণরের অধীনে উজীর ও ওয়াজরৎ এবং উজীর ওয়াজরতের অধীনে তহশীলদার এবং নায়েব তহশীলদার।

কাশ্মীর উপত্যকা নিম্নলিখিত তিনভাগে বিভক্ত। (১) দক্ষিণ বিভাগ (২) উত্তর বিভাগ (৩) মজাফারাবাদ। প্রত্যেক ভাগকে ওয়াজারাৎ বলে এবং এক এক ভাগ একজন উজীর ওয়াজরাৎ কর্ত্তৃক শাসিত হয়।

দক্ষিণ বিভাগ চারটী তহশীলে বিভক্ত হইয়াছে। (ক) শ্রীনগর খাস (খ) অনন্তনাগ (গ) কুলগম (ঘ) অবন্তীপুর।

উত্তর বিভাগ তিনটি তহশীলে বিভক্ত হইয়াছে—(ক) প্রতাপ সিংপুর (খ) বরামুল্লা (গ) উত্তর মচ্ছিপুরা।

মজাফারাবাদ তিনটি তহশীলে বিভক্ত—

(ক) মজাফারাবাদ, কর্ণা এবং উরী।

জম্মু প্রদেশ ৫ ভাগে বিভক্ত—(১) জম্মু খাস (২) উদমপুর (৩) কাথুয়া (৪) রায়াসি (৫) মিরপুর।

উক্ত বিভাগগুলির অধীনে নিম্নলিখিত তহশীল আছে—

জম্মু খাস—(ক) জম্মু (খ) রণবীর সিংপুর (গ) সম্বা।

উদমপুর—(ক) উদমপুপর (খ) রামবাণ (গ) কিষ্টোয়ার (ঘ) রামনগর।

কাথুয়া—(ক) কাথুয়া (খ) বসোলি (গ) জসমের-গদ।

রায়াসি—(ক) রায়াসি (খ) আখনুর (গ) রামপুর রাজোরি।

মিরপুর—(ক) মিরপুর (খ) কোটলি (গ) ভিম্বর

উক্ত তহশীল কয়টি এক একজন তহশীলদারের অধীনে শাসিত হয়।

লাদাগ বিভাগ নিম্নলিখিত তিনটী তহশীলে বিভক্ত—(১) লে (২) কারগিল্ (৩) স্কার্দু।

গিলগিট্ বিভাগে শুধু গিলগিট্ নামক একটি তহশীল আছে।

উক্ত দশটি তহশীল এক একজন তহশীলদার কর্ত্তৃক শাসিত হয়। ওয়াজারৎ, তহশীলদার ও নায়েব তহশীলদার যথাক্রমে আমাদের দেশের বিভাগীয় কমিশনর, কালেক্টর এবং ডেপুটী কালেক্টরের তুল্য পদ।

বিচার বিভাগ—বিচার বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা

হাইকোর্টের বিচারপতি। তাঁহার অধীনে ২ জন চিফ্ জজ্ আছেন। একজন কাশ্মীর এবং অন্য জম্মু প্রদেশের জজ। এই চিফ্ জজের অধীনে সব্ জজ্, মুন্সেফ্ প্রভৃতি নিযুক্ত আছেন।

ইহা ভিন্ন রাজকার্য্য পরিচালনার সুবিধার জন্য নানা বিভাগ আছে। অনুষ্ঠানের আদৌ ত্রুটী নাই। বিশেষত্বের মধ্যে এখানকার মোতামিদ দরবার। এই দরবারে পত্র লিখিলে আবশ্যক সমুদায় সংবাদ পাওয়া যায় এবং পূর্ব্বাহ্নে টাকা পাঠাইলে সমুদয় ব্যবস্থাও হইয়া থাকে। যাত্রীরা কাশ্মীরে গিয়া যদি কোন অসুবিধায় পড়েন কিম্বা কোনও বিষয়ে কাহারও দ্বারা প্রতারিত হন, তাহা হইলে এই দরবারে অনুযোগ করিলে তাহার প্রতীকার হয়। এক কথায় কাশ্মীর-পান্থের অর্থাৎ কাশ্মীর ভ্রমণেচ্ছু ব্যক্তির বাসস্থান, সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য ইহার অস্তিত্ব।

ক্রমশঃ।

সময়ের গতি।

[শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম-এ]

(১)

'বল্ সখি, বল্ মোরে কেন,
সময় কখন যায় আসে,
অনুভূত নাহি হয় যেন,
সে যখন থাকে মোর পাশে ?'

(২)

'বিস্ময়ের কিবা ইথে আর ?
প্রেম লয়ে সে আসে হেথায়,
প্রেমের সে সোণার পাথার
ভরে, কাল অতি দ্রুত ধায় !'

(৩)

'বল্ সখি, বিরহ-ব্যথায়
একা যবে পড়ে থাকি, কেন
কাল যেন যেতে নাহি চায়,
অলস, মন্থর-গতি হেন ?'

(৪)

'কি আশ্চর্য্য ইথে, সখি, আর ?
সময় কি দ্রুত যেতে পারে ?
বিরহের দীর্ঘ-শ্বাস-ভার
বহি, সে যে চলিবারে নারে !'

দারিদ্র্য কি নৈসর্গিক নিয়ম ?

[শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু]

গত মহাযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অর্থশাস্ত্রের প্রতি সাধারণ লোকের মতের অনেক পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইতেছে। "নীচতা শিক্ষার নীতি" কিম্বা "ঐহিক সর্ব্বস্ব ব্যক্তির মূলমন্ত্র" বলিয়া ইহার যে দুর্নাম ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে মানবের কতকগুলি দৈনন্দিন কার্য্যকলাপের পর্য্যালোচনাই যে অর্থশাস্ত্রের মুখ্য কর্ত্তব্য, একথা অনেকেই স্বীকার করিতেছেন, এমন কি অতি প্রতিকূল সমালোচকেরাও আজকাল মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন যে, নীচ স্বার্থপরতা শিক্ষা দেওয়া অর্থশাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। ঐহিক সুখ ছাড়া নৈতিক উন্নতির সহিত যে এই শাস্ত্রের বিশেষ সম্বন্ধ একথা আর কেহ অস্বীকার করিতে সাহস করেন না।

অর্থ-শাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতগণের নিকট তাঁহাদের শাস্ত্রের প্রতি সাধারণের এই নূতন শ্রদ্ধা বিশেষ আনন্দজনক হইলেও সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁহাদের নিজ নিজ মত প্রকাশ করা সম্বন্ধে একটা নূতন গুরুতর দায়িত্ব আসিয়াছে এবং বিশেষ ধৈর্য্য সহকারে ও সাবধানে অগ্রসর হইবার প্রয়োজন হইয়াছে পাছে অবিমৃষ্যকারিতার ফলে তাঁহারা এই শ্রদ্ধাটুকু হারাইয়া ফেলেন।

সমাজের উপর যেরূপ ফলই হউক না কেন, তাহা না বিচার করিয়া অল্পতম অর্থব্যয়ে অধিকতম ধনোৎপাদন করা অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় নহে। মানব স্বভাবতঃ স্বার্থপর জীব এবং সে কেবল ধনোপার্জ্জনের জন্যই কার্য্য করে, এরূপ বিবেচনা করা যে মানব জাতির উপর একটা কলঙ্কের কালিমা লেপন করা, তাহা অর্থশাস্ত্রবিদ্ সকলেই স্বীকার করেন। মানব যন্ত্রচালিত পুত্তলিকা নহে যে সে কেবল ধনোৎপাদনের জন্যই জীবিত থাকিবে। ধনোৎপাদন মানবের সুখের জন্য, মানব ধনোৎপাদনের জন্য নহে, একথা অর্থশাস্ত্র পৃথিবীতে স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করিতেছে।

এযাবৎ কদাচিৎ এক জন ছাড়া প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন যে, অর্থশাস্ত্রের অনতুনেয় নিয়মের ফলে প্রতি সমাজে প্রতি জাতির মধ্যে বর্ত্তমান সভ্যতার বিদ্রূপব্যঞ্জক অর্দ্ধভুক্ত ও অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় কতকগুলি লোককে আবর্জ্জনা স্বরূপ হইয়া জীবিত থাকিতেই হইবে।

বর্ত্তমান যুগে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা যে সমস্ত বিভিন্ন জটিল সমস্যার মীমাংসার চেষ্টা করিতেছেন তন্মধ্যে দরিদ্রতার অবশ্যম্ভাবিত্বের পুরাতন সিদ্ধান্তকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টাই বিশেষ প্রশংসনীয়। অর্থশাস্ত্রবেত্তারা এখন একটী প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন—সভ্যতার জন্য সমাজে তথাকথিত নীচ সম্প্রদায়ের আবশ্যক কি না? সভ্য সমাজে সৌভাগ্যবান ব্যক্তির জীবনের পারিপাট্যের পুষ্টিসাধনের জন্য কি কতকগুলি হতভাগ্য ব্যক্তিকে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া দিনরাত কঠোর পরিশ্রমের সহিত সভ্যতার নানা উপাদান যোগাইতে হইবে অথচ তাহারা দারিদ্র্যবশতঃ শর্করবাহী বলদের ন্যায় নিজেদের শ্রমফল হইতে বঞ্চিত থাকিবে?

দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শায়িত হইয়া প্রভাতে নিদ্রালস দেহের সজীবতা সম্পাদনের জন্য ধনীর যে এক পিয়ালা চা'র আবশ্যক, তাহার জন্য কি শত শত নরনারীকে চা বাগানে ক্রীতদাসের ন্যায় হেয় জীবনযাপন করিতে হইবে? বিলাসপরায়ণ নরনারীর সুকুমার দেহের লাবণ্য বৃদ্ধির জন্য বিবিধ অলঙ্কারের উপাদান সংগ্রহের নিমিত্ত সহস্র সহস্র মনুষ্যকে "গভীর ধরণীগর্ভে গাঢ় তমোময়" গহ্বর মধ্যে প্রকৃতি-প্রদত্ত স্বাভাবিক অধিকার সূর্য্যের আলো ও উন্মুক্ত বাতাস হইতে বঞ্চিত হওয়া কি অবশ্যম্ভাবী? সভ্যতার জন্য দারিদ্র্য কি নৈসর্গিক নিয়ম?

এখনও অনেকে বিশ্বাস করেন মানব সমাজে ধনী ও দরিদ্রের প্রভেদ থাকিবেই থাকিবে ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। বিভিন্ন জাতির ধর্ম্মগ্রন্থেও দারিদ্র্যের অবশ্যম্ভাবিত্ব সম্বন্ধে আমরা অনেক আভাস পাই।

দারিদ্র্য প্রকৃতির নিয়ম কি না এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে অর্থশাস্ত্রবিদ্‌কে কিছুক্ষণের জন্য স্থির হইয়া ভাবিতে হইবে এবং একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে অর্থশাস্ত্র এই সমস্যার সম্পূর্ণ মীমাংসা করিতে পারে না, কেবলমাত্র দারিদ্র্যের দূরীকরণের সম্ভাবনা দেখাইতে পারে। অর্থনীতির বিখ্যাত অধ্যাপক মার্শেল সাহেব ঠিকই লিখিয়াছেন "দারিদ্র্য অবশ্যম্ভাবী কি না এই জটিল প্রশ্নের উত্তর মানবের নৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি বিকাশের উপর নির্ভর করিতেছে, এ সম্বন্ধে অর্থনীতির বিশেষ কিছু বলিবার নাই বটে তথাপি এই শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়ের নানান তথ্য হইতে এই প্রশ্নের সমাধানের সাহায্য পাইতে পারি। এইজন্যই অর্থনীতির এত প্রয়োজনীয়তা।"

শিক্ষায় শোরগোল।

[শ্রীমনীন্দ্রনাথ রায় এম-এ]

মুখবন্ধ।

বর্ত্তমান সময়ে দেশে নানাপ্রকার উত্তেজনার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এই সকল উত্তেজনার মধ্যে দেশের শিক্ষা যে বিশেষ ভাবে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, তাহার প্রথম কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের তথা কথিত সংস্কার চেষ্টা। দ্বিতীয় কারণ, দেশের শিক্ষা বিভাগের উপর বাংলার ব্যয় সংক্ষেপ সমিতির কুঠারাঘাত। এবং তৃতীয় কারণ, শিক্ষণ বিদ্যাবিশারদ শ্রীযুক্ত ইভান্‌বিসের জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় শেষ প্রস্তাব। এই তিনটি কারণের প্রত্যেকটির সম্বন্ধে এরূপ কথা উঠিয়াছে, যাহার সহিত বঙ্গদেশবাসীর ভবিষ্যৎ মরণ বাঁচন ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। এই নিমিত্ত এই শিক্ষা বিষয়ক উত্তেজনা দেশের অপর সকল সমস্যাকে যে চাপাইয়া উঠিয়াছে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। এই তিনটী বিষয়ের আলোচনা অসাময়িক হইবে না। আলোচনাটী পাঁচটী অংশে বিভক্ত হইবে; (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার, (২) শিক্ষার ব্যয় সংক্ষেপ, (৩) প্রাথমিক শিক্ষা, (৪) প্রাথমিক শিক্ষার নূতন বাহন, এবং (৫) বাহন পরিবর্ত্তনের ফলশ্রুতি।

(১) বিশ্ববিদ্যালয়-সংস্কার।

প্রথমেই বিশ্ববিদ্যার কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থাভাব-বশতঃ দেশীয় শিক্ষার উচ্চতম স্তরে, যে সকল ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদিগেরও সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন, সেখানে এক সবজান্তার দল কখনও তাণ্ডব নৃত্য, আর কখনও এই-যে-কি-বলে তাহার কীর্ত্তন সুরু করিয়া দিয়াছে; এবং কখনও বার লাইব্রেরির খাস কামরা, আর কখনও সরকারী দপ্তরখানা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গলায় কয়েদীর শিকল ঝুলাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই গণ্ডগোলে দেশের উচ্চতম শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দেশময় যখন একটী ভীতি, একটী তীব্র চাঞ্চল্যের ভাব সুপরিলক্ষিত, ঠিক সেই সময় বুঝা গেল, যে এই অনটনের দিনে অনেকখানি ব্যক্তিগত কারণে চির অপরাধীর সাজে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের বানপ্রস্থের ব্যবস্থা হইতেছে। সার্ আশুতোষ শ্রীযুক্ত প্রভাস মিত্রের নব-সংস্কার আপিসের খাস কামরায় না সেলাম বাজাইলে তাঁহারও নিস্তার নাই, বিশ্ববিদ্যালয়েরও পরিত্রাণের গত্যন্তর অভাব! এই দৃশ্য কেবল এই দুর্ভাগ্য বাংলা দেশেই সম্ভব! ইহাই কি আমাদের দেশের শাসন-সংস্কারের প্রথম পরিপক্ক ফল? অপরাপর ছোটখাট বিষয়ে এই নব সংস্কারের কুফল সহ্য করিয়া চলা আবশ্যক হইলেও, দেশের মধ্যে যেটা সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর বিধান, তাহার মূলোচ্ছেদ হইতে দেখিলে, এই গরীব দেশ এই সংস্কারের এত অধিক মূল্য দিতে স্বীকার করিবে কি? সার আশুতোষকে যদি সংযত করাই আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাঁহার ক্ষেত্রে, বিশ্ববিদ্যার বিরাট বিশ্বব্যাপী মণ্ডপে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে, এবং এই সার্ব্বভৌমিক জ্ঞানের সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার চেষ্টায় তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে অবতীর্ণ হইতে হইবে। দেশে বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা আপনাদিগকে সাধারণের প্রতিনিধি বলিয়া উচ্চকণ্ঠে চীৎকার আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের এই দেশ-মিত্রের সভায়, এরূপ প্রতিদ্বন্দ্বীর স্থান গ্রহণ করিবার কেহ আছেন কি? যদি না থাকেন কেবল উর্ব্বর মস্তিষ্কের সাহায্যে আইন প্রণয়ন করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের, তথা দেশের উচ্চতম শিক্ষার কোনই উপকার হইবে না। এরূপ অসঙ্গত চেষ্টার ফলে এই পরাধীন দেশের শিক্ষা নূতন নূতন শৃঙ্খলের ভারে মরণ বিষে পূতিগন্ধময় হইয়া উঠিবে। শ্রীআশুতোষের দক্ষতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র-কারীদের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে, ইহা খুবই সুখের বিষয়।

(২) শিক্ষার ব্যয় সংক্ষেপ। *

তারপর রাজেন্দ্রিক কুঠারের কথা। শিক্ষা সম্বন্ধে কুঠারের কাটাছাঁটা একটু ভাল করিয়া দেখিলেই মনে হয়, অন্ততঃ ঐ কয়দিন বিশেষ পরিশ্রমের সহিত কুঠারটার ধার দেওয়া হইয়াছিল। শিক্ষা বিভাগ হইতেই প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা খরচ কমান যাইতে পারে। দেশের সরকারী তহবিলে অনেকটা ঘাটতি হইতেছে;—সরকারী ব্যয় নাকি আয়ের অপেক্ষা দুই ক্রোর টাকা অধিক। এরূপ অবস্থায় আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য স্থাপনের নিমিত্ত, এই টাকা এখন সরকারী নানা বিভাগের ব্যয়সঙ্কোচ দ্বারা বাঁচাইতে হইবে। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই নীতি এইরূপ ভাবে অনুসৃত হইবে বলিয়াই যদি শিক্ষা বিভাগের উপর এই কুঠার চালনার ব্যবস্থা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা দেশীয় শিক্ষার বানপ্রস্থ কেন—একেবারে শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা। কেন এরূপ কথা বলিতেছি, ব্যয় সংক্ষেপ সমিতির প্রস্তাবগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে তাহা বেশ বিশদ হইতে পারে।

(ক) শিক্ষণ-শিক্ষা।

ব্যয় সংক্ষেপের প্রথম কথা—ট্রেনিং স্কুল ও কলেজগুলি উঠাইয়া দিতে হইবে। কেন দেওয়া হইবে তাহারও একটু আভাস দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা শিক্ষণ-শিক্ষা লাভ করেন নাই, তাঁহাদের মধ্যেও না কি অনেক ভাল শিক্ষক আছেন। একথাটা বোধ হয় অনেকেই অস্বীকার করিবেন না। তার পর যাঁহারা শিক্ষণ-শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ, অনেকে কি না জানি না, ভাল শিক্ষা দিতে পারেন না। শিক্ষণ-শিক্ষা লাভ করিলেই একেবারে আদর্শ শিক্ষক হইয়া উঠা যায়, একেবারে আর্ণল্ড বা মণ্টেগরী, বা আরো কিছু হওয়া যায়, একথা অভিজ্ঞতার কোন্ বেদ বা কোরাণে লেখে? এমন অসঙ্গত দাবী ত কেহই করেন না। তবে যাঁরা শিক্ষণ-শিক্ষা পান নাই, আর যাঁহারা পাইয়াছেন, ইঁহাদের মধ্যে তুলনা করিতে হইলে, যাঁহারা শিক্ষণ সম্বন্ধে একেবারে অর্ব্বাচীন তাঁহারা ব্যতীত, সকলেই বলিবেন যে, শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকদের অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট শিক্ষক হওয়ার সম্ভাবনা খুব অধিক। আর এবিষয়ে কি কেবল ব্যবহারিক সহজ জ্ঞানের দোহাই দিয়াই চলিতে হইবে? জার্ম্মেণীর অবস্থা কিরূপ? সেখানে সকল শিক্ষকই রীতিমত শিক্ষণ-শিক্ষা প্রাপ্ত; আর কোন দেশেই এরূপ শিক্ষণ-শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। ফল কি হইয়াছে? জার্ম্মেণীর শিক্ষা জগতের অনুকরণীয়। এমন কি যুদ্ধের পরই বিলাতের শ্রমিকদিগের এক দল শিক্ষিত লোক, জার্ম্মেণীতে গিয়া, সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা ভাল করিয়া দেখিয়া আসিয়া, নিজেদের দেশে শিক্ষার প্রভূত পরিবর্ত্তনের আন্দোলন সুরু করিয়া দিয়াছেন। ইংলণ্ডে অনেক শিক্ষকই শিক্ষিত। আমেরিকার প্রাইমারি ও এলিমেণ্টারি স্কুলের শিক্ষকেরা সকলেই শিক্ষিত। জাপানে শিক্ষণ-শিক্ষার বিশেষ প্রচলন না থাকিলেও, দেশের শিক্ষা বিস্তার সার্থক করিয়া, শিক্ষণ-শিক্ষার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। এখানে প্রতিপক্ষ এমনই বলিবেন, আমাদের দেশ ত আর জার্ম্মেণী ইত্যাদি নয়, তবে এরূপ দিবাস্বপ্নের প্রয়োজন কি? কথাটা বেশ বুঝি। ইহাও বুঝি যে, কেবল সরকারী বিদ্যালয় ব্যতীত অন্যত্র শিক্ষকদিগের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। গুরুদিগের ত কথাই নাই! যখন দেশে শিক্ষকদিগকে উপযুক্ত বেতন দিবার অর্থ নাই, তখন শিক্ষণ-শিক্ষার জন্য সরকারী তহবিল হইতে এত অধিক ব্যয়ের প্রয়োজন কি? কিন্তু ইহা দ্বারা ইহাই কি প্রমাণিত হয় যে, শিক্ষণ-শিক্ষার জন্য যে খরচ, তাহা বাজে খরচ? এরূপ কথার তীব্র প্রতিবাদ হওয়া উচিত; এবং ইহাও খুব স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা উচিত যে, উপযুক্ত শিক্ষণ-শিক্ষার ব্যবস্থা না হইলে, শিক্ষার প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব। এখন যাঁহারা শিক্ষণ-শিক্ষা লাভ না করিয়াও ভাল শিক্ষক, তাঁহারা উৎকৃষ্ট স্বাভাবিক শক্তিসম্পন্ন, এবং সমাজ তাঁহাদের জীবন ধারণোপযোগী বেতনের ব্যবস্থা না করিয়া, তাঁহাদিগকে নিজের স্বার্থে খাটাইয়া লইয়া (exploit) নীচতার পরিচয় দিতেছে। অনেক বিভাগে সরকারী খরচের ত অভাব দেখি না! বিভাগগুলির আর নাম করিব না। সেখানে অর্থ মিলিবে, আর খরচ কমাইবার নিমিত্ত শিক্ষোন্নতির এই অতি প্রয়োজনীয়

* Report of the Bengal Retrenchment Committee —Ch. XII.

অনুষ্ঠানগুলি উঠাইয়া দিতে হইবে। শিক্ষার উন্নতির জন্য শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি সর্ব্বাগ্রেই বাঞ্ছনীয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষণ-শিক্ষার প্রয়োজনও অত্যন্ত অধিক।

এই শিক্ষণ-বিদ্যালয়গুলি সম্বন্ধে আর একটী কথা আছে। গুরু ট্রেনিং বিদ্যালয়গুলির, বর্ত্তমান অবস্থায়, কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। ছাত্রবৃত্তি অথবা প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকদিগকে শিক্ষণ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা বাতুলতার নামান্তর—একেবারে বাজে খরচ। প্রাথমিক শিক্ষকদিগকে যখন অধিক বেতন দেওয়া অসম্ভব এবং শ্রীযুক্ত বিশ সাহেবও খুব উৎকৃষ্ট অবস্থাতেও মাসিক ৩০৲ ৪০৲ মুদ্রার বেশী ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই, তখন গুরু ট্রেনিং স্কুলগুলির পরিবর্ত্তে তাঁহারি মতানুসরণ করিয়া প্রত্যেক জেলায় এক একটী শিক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপিত হওয়া উচিত। এখানকার শিক্ষার্থীদের ম্যাট্রিকিউলেশন্ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক। ইহার কম শিক্ষায় কোন স্থলেই যথার্থ শিক্ষণ-শিক্ষার সম্ভাবনা নাই বলিয়াই মনে হয়। এরূপ কেন্দ্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে নর্ম্মাল স্কুলগুলিও আবশ্যক হইবে না। কিন্তু জেলার শিক্ষণ-শিক্ষার কেন্দ্র বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে, এই নর্ম্মাল স্কুলগুলিকে উঠাইয়া দেওয়া শিক্ষার অনুকূল ব্যবস্থা হইবে না। বর্ত্তমান অবস্থায় এই বিদ্যালয়গুলির স্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত শিক্ষাবিধান নাই, এবং যাঁহারাই এই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকদিগের সম্পর্কে আসিয়াছেন, তাঁহারাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, শিক্ষায় ইঁহাদের প্রয়োজন আছে।

অপরদিকে শিক্ষণ-শিক্ষার উচ্চতর স্তরে শিক্ষণ বিদ্যাপীঠগুলি সম্পূর্ণরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটী পৃথক শিক্ষণ বিভাগের (University Department of Education) অন্তর্গত থাকা বাঞ্ছনীয়। এবং এখানকার অধ্যক্ষদিগকে জার্ম্মেণী, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য নির্দ্দিষ্ট চুক্তি অনুসারে আনয়নের চেষ্টা করা উচিত। স্যাড্লার্ কমিশন কর্ত্তৃক এরূপ কথাই বলিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের স্থলবিশেষের "অন্ধেন নীয়মানাঃ যথান্ধাঃ"র অনুরূপ ব্যবস্থা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়! দেশের অত্যুৎকৃষ্টবুদ্ধি উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদিগকে এই সকল দেশে শিক্ষণ-শিক্ষা দিয়া, এই সকল বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেই এবং এরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত অধ্যাপকের ভবিষ্যতে অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে, এই সকল শিক্ষণ বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলে, দেশে শিক্ষণ শিক্ষার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হইবে।

এই আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে, গুরু-ট্রেনিং স্কুল, নর্ম্মাল স্কুল, ও ট্রেনিং কলেজ উঠাইয়া দেওয়ার মূলে ব্যয় সংক্ষেপের যে নীতি বিদ্যমান, তাহা শিক্ষার ঘোরতর পরিপন্থী। এই শিক্ষণ-শিক্ষা-শালাগুলিকে নূতন আকার দিতে হইবে, এবং তবেই দেশীয় আদ্য ও মধ্য শিক্ষার প্রকৃত উন্নতি সম্ভব হইবে। এই শিক্ষণ-শিক্ষার যথার্থ উন্নতির জন্য ইহার উচ্চতম বিজ্ঞানের দিকে মনোযোগ দেওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। এবং এই কর্ম্ম সুচারুরূপ সম্পাদন করিবার একমাত্র উপযুক্ত লোক আমাদের স্যার আশুতোষ! তিনি বিলাতী ছাপওয়ালা নিকৃষ্টবুদ্ধি বর্ত্তমান শতাব্দীর নূতন ব্রাহ্মণদের পক্ষপাতী নন,—ইহাই তাঁহার সব চেয়ে বড় দোষ! হায় হতভাগা দেশ! দেশের প্রকৃত হিতৈষী কে, এবং দেশের ও দশের প্রকৃত হিত কোনখানে,—সে সম্বন্ধে কতদিন অন্ধ থাকিবে? শিক্ষণ-শিক্ষার উন্নতির জন্য, তথা শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য, চাই আশুতোষের নীতি। বর্ত্তমানের অর্থকৃচ্ছ্র বশতঃ যদি এই নীতির অনুসরণ কিছুদিনের জন্য অসম্ভব হয়, আশুতোষকে অস্বীকার করিয়া নীতিটীকেও অস্বীকার করিলে চলিবে না, এবং যতদিন এই নীতি অনুসৃত হওয়ার সুযোগ না ঘটে, অন্ততঃ ততদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আকারেও নর্ম্মাল স্কুলগুলি ও ট্রেনিং কলেজ দুইটীর প্রয়োজন আছে। বর্ত্তমান সময়ে ইহাদের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা শিক্ষার প্রভূত অমঙ্গলের কারণ হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শিক্ষার দুইটী সর্ব্বপ্রধান অভাব,—শিক্ষকদিগের অবস্থার উন্নতি এবং শিক্ষণ-শিক্ষার উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা। একই সঙ্গে দুইটী অভাব পূরণ করিতে হইবে। একটী বাদ দিয়া অপরটীর দিকে লক্ষ্য দিলে, কোনটীরই উন্নতি হইবে না।

(খ) সরকারী পরিদর্শন ও পরিচালন

ব্যয়সঙ্কোচের দ্বিতীয় প্রস্তাব, অনেকগুলি পরিদর্শক

কর্ম্মচারীর পদ তুলিয়া দেওয়া। এই প্রস্তাবটী বেশ সুন্দর হইয়াছে। আমাদের দেশে একটী প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে; ছেলের চেয়ে ছেলের কোন একটী জিনিষ ভারি! সুরুচির খাতিরে বাক্যটী সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল না। এই "কোন একটী জিনিষ" স্বাস্থ্যের যতই অনুকূল হোক না কেন, অত্যন্ত অধিক মাত্রায় ইহাই আবার গুরুতর স্বাস্থ্য-হীনতার পরিচায়ক। আমাদের সরকারী শিক্ষা নীতির সহিত এই প্রবাদ বাক্যের অনেক সাদৃশ্য আছে। যাঁহারা শিক্ষা দিবেন, ছাত্রছাত্রীরা যাঁহাদের সম্পর্কে আসিয়া নিজ নিজ শরীর মন ও চরিত্র সতেজ করিয়া তুলিবে, তাঁহারা নিজেরা পঙ্গু হইলে কি হয়, তাঁহাদের তত্ত্বাবধায়ক যাঁহারা, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত বেশ পুষ্ট, বেশ একটু গুরু রকমের। সমাজে লাঠী ঘুরাইয়া কাজ আদায় করা মনুষ্য জাতির প্রাগৈতিহাসিক বর্ব্বরতার বেশ বড় একটা নজির, এবং বহুদিনের দাসপ্রথার নূতন মার্জ্জিত সংস্করণ। যেখানে মস্তিষ্ক ও চরিত্রের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন, সেই শিক্ষার ক্ষেত্রে ইহা একটী অনাবশ্যক পদের সৃষ্টি। পরিদর্শক কর্ম্মচারীর সংখ্যা অসঙ্গত ভাবে বৃদ্ধি না করিয়া, সর্ব্ব-প্রযত্নেই শিক্ষকদিগের দিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। এই পরিদর্শকদের পদ তুলিয়া দিয়া যে টাকা লাভ হইবে, তাহা কিন্তু লাভরূপে গণনা করিলে শিক্ষার প্রভূত অমঙ্গল হইবে। এই অর্থে শিক্ষকদের অবস্থা ও শিক্ষার উন্নতি করিতে হইবে। দেশে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রাথমিক অথবা নিম্নবিদ্যালয় নাই। আবশ্যক ক্ষেত্রে এই সকল পরিদর্শক কর্ম্মচারী-দিগকে এইরূপ নূতন ও পুরাতন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকদের পদে নিযুক্ত করিলে, প্রাথমিক ও নিম্ন শিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইবে। প্রত্যেক মহকুমাতেই এরূপ বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া উচিত। প্রয়োজন হইলেই—এবং এরূপ প্রয়োজন সর্ব্বদাই থাকিবে,—এই সকল উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রধান ও সহকারী শিক্ষকদের দ্বারা সময় সময় এক বৎসর কি ছয় মাস ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম্য বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিচালনের ব্যবস্থা হইলে, এই সকল দুর্ব্বল বিদ্যালয়গুলিও বিশেষ উন্নতি লাভ করিবে। জেলার ও মহকুমার ইন্স্‌পেক্‌-টারেরা এই সকল শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা হইতে প্রাথমিক ও নিম্ন শিক্ষার পরিচালনে বিশেষ সাহায্য পাইবেন। পরি-দর্শকেরা যেমন বালকদিগের বিদ্যালয়ে শিক্ষাকর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন, পরিদর্শকেরা সেইরূপ অনুরূপ বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিবেন। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় কেবল জেলার কেন্দ্রেই এরূপ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব হইতে পারে। অনুরূপ নীতি অনুসরণ করিয়া স্কুলবিশেষে এডিশনাল্ ইন্সপেক্টারদিগকে উচ্চ বিদ্যালয়ে সদৃশ কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেই, মধ্য শিক্ষারও প্রভূত মঙ্গল হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এখানেও ব্যয় সংক্ষেপের প্রস্তাবে সরকারী ধনভাণ্ডারের বিশেষ কোন লাভ হইবে না। অনেকগুলি পরিদর্শক কর্ম্মচারীর পদ তুলিয়া দিয়া, প্রাথমিক ও মধ্য শিক্ষার উন্নতির উপর উক্ত উৎকৃষ্টতর উপায়গুলি অবলম্বিত না হইলে, এই উভয় প্রকার শিক্ষারই সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক। শিক্ষকেরা যখন অনেক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ উপযুক্ত অবস্থায় নাই, তখন বর্ত্তমানের দাওয়া ঘুচাইবার সম্ভাবনাও তিরোহিত হইলে, শিক্ষায় আলোকের পরিবর্ত্তে অন্ধকারেরই একাধিপত্য বিস্তারের সম্ভাবনাই অধিক হইয়া দাঁড়াইবে। বর্ত্তমান অবস্থা মন্দের ভাল। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অবস্থা সম্ভব হয়, তাহাই অধিকতর শ্রেয়, সম্ভব না হয় ইহাকেই মানিয়া লইতে হইবে। জাতীয় সমাজ বিধানে শিক্ষায় ব্যবসায় বুদ্ধি প্রণোদিত ব্যয় সংক্ষেপের যথার্থ অবসর নাই। এখানে জাতীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য উপযুক্ত নীতি অনুসরণ করিয়া, উত্তরোত্তর ব্যয় বৃদ্ধির প্রয়োজনই অত্যন্ত অধিক।

একটী বাংলাদেশে দুইটী শিক্ষা পরিচালন কেন্দ্রের যে প্রয়োজন নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। বঙ্গ বিভাগের এই শেষ স্মৃতি যত শীঘ্র লোপ পায়, ততই দেশের মঙ্গল। এই কারণেই মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীদিগের শিক্ষা পরিচালনের নিমিত্ত ভিন্ন একজন সহকারী ডিরেক্টার অনাবশ্যক হইলেও, ইঁহাদের শিক্ষার তত্ত্বাবধানের জন্য একজন পরি-দর্শক আবশ্যক হইতে পারে। এইরূপ ব্যবস্থাই, বোধ হয়, এই সমাজের প্রীতিকর হইবে, এবং মুসলমান বালকদের শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থায় উক্ত ধর্ম্মাবলম্বী একজন পরিদর্শকের

পরামর্শ বালিকদের শিক্ষা বিস্তারের সহায় হইবে বলিয়াই মনে হয়। স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থাই বাঞ্ছনীয়। ব্যয় সংক্ষেপ সমিতি সাধারণ ভাবে বিশেষ মুসলমান পরিদর্শকদিগের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা খুব সমীচীন বলিয়াই মনে হয়। বিশেষ পরিদর্শনের নিমিত্ত অর্থব্যয় সঙ্কুচিত করিয়া মুসলমান বালকদের শিক্ষার উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা বালকদের ও সমাজের অশেষ কল্যাণের কারণ হইবে।

ব্যয় সংক্ষেপের বিবরণে শিক্ষামণ্ডল প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত বিভাগীয় পরিদর্শকদিগের পদ বজায় রাখিবার প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষামণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হইলেও মধ্য শিক্ষার সুচারু পরিচালনের নিমিত্ত মণ্ডলের অধীনে দুই একজন বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারীর বিশেষ প্রয়োজন থাকিবে। কিন্তু তখনও এতগুলি পরিদর্শক আবশ্যক হইবে না। শিক্ষক-বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদিগের ন্যায় ইঁহাদিগকেও বিশেষ চুক্তিতে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য য়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে এ দেশের শিক্ষা বিভাগে আনয়ন করিলে, দেশীয় শিক্ষার বিশেষ উপকার হইতে পারে। দেশীয় শিক্ষকদের ভিতর বর্ত্তমান অবস্থাতেও এই শ্রেণীর লোক পাওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। ভবিষ্যতে দেশের লোকের উপর এই ভার সমর্পিত হইলেই জাতীয় শিক্ষার প্রকৃত কল্যাণ হইবে।

(গ) স্থানীয় পরিচালন।

ব্যয় সংক্ষেপের তৃতীয় প্রস্তাব সরকারী হাই স্কুলগুলিকে স্থানীয় জনসমাজের অধীন রাখিয়া বে-সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত করা। স্যাড্‌লার কমিশন মধ্যশিক্ষাকে একটি শিক্ষামণ্ডলের অধীন রাখার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রস্তাব অনুসারে সরকারী বিদ্যালয়গুলি শিক্ষামণ্ডলের নিজস্ব বিদ্যালয়ে পরিণত হইতে পারে। এরূপ মণ্ডল স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে সরকারী বিদ্যালয়গুলিকে স্থানীয় সংঘশাসনের অধীন করা সুব্যবস্থা হইবে না। স্থানীয় জন-সমাজের অর্থের অভাব বিশেষভাবেই সুপরিচিত। সরকারী বিদ্যালয়গুলিকে বর্ত্তমান আকারে প্রতিপালন করা এই সকল সমাজের পক্ষে অসম্ভব। সেই কারণে প্রথমেই ব্যয়-সঙ্কোচের দিকেই দৃষ্টি পড়িবে, এবং শিক্ষকেরা সর্ব্বাগ্রেই বে-সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের অবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকিবেন। ফলে দেশের মধ্যে যে এক উৎকৃষ্ট শ্রেণীর উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে, সেইগুলি ক্রমে ক্রমে অবনত হইতে থাকিবে। সরকারী অর্থে মাত্র কয়েকটী উচ্চ বিদ্যালয়কে উৎকৃষ্ট অবস্থায় রক্ষা করার স্বপক্ষে যথেষ্ট সুযুক্তি না থাকিতে পারে। অনেক বে-সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত অনেক হীন হইলেও, শিক্ষার অবস্থা এখানে কোন অংশেই সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষার অপেক্ষা হীন নয়। যদি নূতন পরিবর্ত্তনে দেশের সকল শ্রেণীর উচ্চ বিদ্যালয়ের যথোপযুক্ত উন্নতির সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলেই বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় হইবে। কিন্তু যদি বে-সরকারী বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার ও শিক্ষকদের উন্নতির কোন প্রকার ব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে কতকগুলি উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ের অবনতির পথ সুবিস্তৃত করিয়া দেওয়া, দেশীয় শিক্ষার পক্ষে কল্যাণকর বিধান হইতে পারে না। যখন দেশে মধ্যশিক্ষা পরিচালনের উপযোগী একটী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর শিক্ষামণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখনই সরকারী বিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষা সম্বন্ধে ইহার অধীন রাখিয়া, ইহাদের বাহ্য পরিচালনার ভার স্থানীয় শাসন-সঙ্ঘের উপর স্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু তখনও এই বিদ্যালয়-গুলিকে ইহাদের বর্ত্তমানের উন্নত অবস্থায় রাখিবার নিমিত্ত প্রচুর সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন হইবে। এই সাহায্যের ভার শিক্ষামণ্ডলের উপর ন্যস্ত থাকিলে, সরকারী অর্থ-ভাণ্ডার হইতে শিক্ষামণ্ডলকে প্রতি বৎসর প্রচুর অর্থ প্রদান করিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের বিভিন্ন স্থানের জন-সমাজ মধ্য-শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিতে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ। সেই কারণে মধ্যশিক্ষার উন্নতির জন্য সরকারী অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন কোন সময়েই তিরোহিত হইবে না। সরকার যদি এই প্রয়োজন এবং এই দায়িত্ব অস্বীকার করেন, মধ্য-শিক্ষার অবনতি অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য ন্যায়ের খাতিরে ইহাও

অস্বীকার করিবার উপায় নাই, যে সরকারী বিদ্যালয়-গুলির সরকারের পোষ্যপুত্রের স্থান অধিকার করিবার সময় আর নাই। ইহারাই এখন আদর্শ মধ্যবিদ্যালয় নয়। সরকারী ও বে-সরকারী সমস্ত বিদ্যালয়েরই দেশীয় রাজস্বের উপর অনেকটা সমান দাবী করিবার অধিকার আছে। কেবল জেলার কেন্দ্রের বালক বালিকারাই দেশের ও দেশের সন্তান সন্ততি নয়। সুবিশাল বাংলা-দেশের যেখানে যে বালক বালিকারা আছে, সকলেই দেশের সন্তান, সকলেরই সরকারী রাজস্বে সমান অধিকার, কিন্তু ইহার অর্থও আবার এরূপ নয় যে সরকারী বিদ্যালয়-গুলির বর্ত্তমান অবস্থা হীন করিয়া, বে-সরকারী বিদ্যালয়-গুলির উন্নত করিতে হইবে। জাতীয় জীবন যদি সতেজ করিতে হয়, জাতীয় মধ্য শিক্ষাকে সমগ্র ভাবে উন্নত করিতে হইবে; গ্রাম ও মহকুমার দুর্ব্বল বিদ্যালয়গুলিকে অনেকটা জেলার সরকারী বিদ্যালয়গুলির আদর্শে গড়িয়া তুলিতে হইবে, এবং সর্ব্বত্রই ছাত্র সংখ্যাই মধ্য বিদ্যালয়ের শ্রেণী বিভাগের সর্ব্ব প্রধান নিয়ামক হইবে। কিন্তু মধ্যশিক্ষা পরিচালনের পরিবর্ত্তনে ব্যয় বৃদ্ধির পন্থা প্রসারিত না করিয়া, যদি ব্যয় সংক্ষেপই একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে মধ্যশিক্ষার প্রভূত অমঙ্গল সাধিত হইবে। এই উপায়ে মধ্যশিক্ষার ব্যয় সঙ্কোচের চেষ্টা প্রকারান্তরে দেশীয় জীবনকে পঙ্গু ও চিররুগ্ন রাখিবার নামান্তর মাত্র।

ব্যয় সংক্ষেপের অনুরূপ আর একটা ব্যবস্থা—কলিকাতার বাহিরের সরকারী কলেজগুলি এবং কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসাকে বে-সরকারী কলেজে পরিণত করা, কিন্তু কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজটিকে কেন দেশীয় শাসনতন্ত্রের অধীন রাখা হইবে, তাহার কারণগুলি যথেষ্ট বলিয়া মনে হইল না। পাশ্চাত্যের শিক্ষাদর্শের সহিত যোগ রক্ষাই যদি একমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর উচ্চতম শিক্ষার এই অনুষ্ঠানটির ভার কেন দেওয়া হইবে না, তাহা বেশ বোধ-গম্য হইতেছে না। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা শিক্ষার উচ্চ আদর্শ রক্ষিত হইতেছে না,—ইহাই যদি সত্য হয়, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন একটা উৎকৃষ্ট কলেজের দ্বারাও এরূপ অবনতির গতিরোধ হইবে না। বাংলাদেশে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। ঢাকার বিশ্ব-বিদ্যালয়টা প্রচুর সরকারী সাহায্য পাইবে, কিন্তু প্রাচীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যথেষ্ট অর্থ সাহায্যের কথা লইয়া দেশে একটা ঘোরতর উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে। যে আকারেই হোক, দেশীয় শাসনতন্ত্রের ধন-ভাণ্ডার হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেও প্রচুর অর্থ প্রদান করিতে হইবে। এই অর্থের উপায় হইলে, এবং স্যাড্‌লার কমিশনের নির্দ্ধারণ অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার হইলেও যদি শিক্ষার উচ্চ আদর্শের অবনতি ঘটে, একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ দ্বারাও এই অবনতি প্রতিরুদ্ধ হইবে না। কিন্তু অবনতি যে হই-য়াছে বা হইতেছে বা হইবে এরূপ অনুমানের কোন কারণ নাই। 'পাশে'র সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেই শিক্ষার অবনতি ঘটে,—বিশ্ববিদ্যালয় যখন 'ফেল' করার যন্ত্রস্বরূপ ছিল, তখনই ছিল ইহার উন্নত শিক্ষাদর্শ; এরূপ অনুমান কেবল এই বাংলাদেশেই সম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয় পাশ ফেলের যন্ত্র নয়। ইহার শ্রেষ্ঠতম ফলের ভিতর দিয়াই ইহাকে বিচার করিতে হইবে; এবং এইরূপে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদর্শের অবনতি ঘটে নাই,—যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। দেশের বর্ত্তমান ও ভাবী অবস্থার সহিত ও দেশীয় বিদগ্ধতার শাশ্বত স্বরূপের সহিত ঐক্য রক্ষা করিয়া পাশ্চাত্যের সভ্যতম দেশগুলির শিক্ষা আদর্শ বরণ করিয়া লওয়া ও অটুট রাখা, এই বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা যেরূপ সম্ভব হইবে, দেশের শাসনতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত একটা বিদ্যালয়ের সহায়তায় এই উদ্দেশ্য ততটা সুসিদ্ধ হইবে না।

কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজটিকে বে-সরকারী কলেজ অথবা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্ব প্রধান কলেজে পরিণত করা যত সহজ হইবে, কলিকাতার বাহিরের সরকারী কলেজগুলিকে বেসরকারী কলেজে পরিবর্ত্তিত করিয়া, উহাদের বর্ত্তমান উন্নতি অক্ষুণ্ণ রাখা ততটা সহজ হইবে না। দেশীয় জীবনের প্রায় সকল স্তরেই যখন একটা বিদেশীয় জাতির একাধিপত্য বিরাজ করিতেছে ও করিবে, তখন দেশবাসী দ্বারা দেশের শিক্ষার

ও জাতির শিক্ষার সকল স্তরের পরিচালনের ব্যবস্থা, জাতীয়-মঙ্গলের কারণ হইবে। কিন্তু কলেজ পরিচালন অন্ততঃ আরও কিছুকালের জন্য, যথার্থ ভাবে স্থানীয় ব্যাপার হইতে পারে নাই। কলিকাতা ও ঢাকা ভিন্ন অপরাপর স্থানে কেবল স্থানীয় বা জেলার ছাত্রদের জন্যই এক একটী প্রথম শ্রেণীর কলেজ আবশ্যক হয় না। স্থানীয় জনসমাজও নিজেদের অভাব অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে পূরণ করিয়া উচ্চতম শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিতে অপারক। উচ্চ বিদ্যালয়গুলির পরিবর্ত্তনের আলোচনায় এই সমস্যাটি পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। পূর্ব্বে একবার স্বায়ত্ত শাসনের প্রথম প্রচলনের সময় কয়েকটি জেলা স্কুল এবং একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ স্থানীয় শাসন অনুষ্ঠানের অন্তর্গত হইয়াছিল। কিন্তু এই পরীক্ষায় ভাল ফল লাভ হয় নাই। এরূপ দুইটি উচ্চ বিদ্যালয় এখন আবার সরকারী শাসনতন্ত্রের অধীন। দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজটি প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত হইলেও ইহা এখন ইহার পূর্ব্বকার গৌরবের স্থান হইতে বিচ্যুত। কিন্তু এরূপ পরীক্ষার সহিত ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত হইয়া আমি যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলাম, তাহাতে মনে হয়, একটু বিশেষ সাবধান হইয়া চলিলে শিক্ষাসম্বন্ধে এরূপ বেসরকারী চেষ্টায় জাতীয় জীবন উন্নতি লাভ করিবে। বাংলাদেশের বর্ত্তমান উন্নতি বাংলাদেশের বেসরকারী শিক্ষা চেষ্টার ফল। ইহা সহজেই প্রমাণ করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, শিক্ষার এবং বিশেষতঃ শিক্ষকদের হীন অবস্থার কারণও এই বেসরকারী শিক্ষা প্রচেষ্টা। নূতন অধিকারের প্রথম মত্ততায় শিক্ষা বিষয়ে অনেক অনিষ্টের কারণ হইলেও, মানুষ ভুল করিয়াই যাহা শিখে, তাহা ভাল করিয়াই শিখে। বর্ত্তমান সময়ের বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শিক্ষা সম্বন্ধে এই মত্ততার অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষা জাতীয় জীবনের উন্নতির প্রধান অবলম্বন বলিয়া, এখানে বেশী ভুলের অবসর থাকাও উচিত নয়। সেইজন্য নূতন পরিবর্ত্তনে সরকারী বিদ্যালয়-গুলির শিক্ষার ও শিক্ষকের অবস্থা অটুট রাখিবার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট আইন কানুন আবশ্যক হইবে, এবং যাহাতে শিক্ষার আভ্যন্তরীণ পরিচালনা বিশেষজ্ঞ শিক্ষক ও অধ্যাপকদিগের হস্তেই থাকে, তাহার বিধি-ব্যবস্থার প্রয়োজন হইতে পারে। স্থানীয় জন-সমাজ শিক্ষার কেবল বাহ্য পরিচালনের ভার পাইলেই সকল স্তরের শিক্ষার উন্নতি হইবে। পরের দেওয়া খাদ্যে আমাদের কঠিন অজীর্ণ রোগ প্রায় ধাতুগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থায় শিক্ষা সম্বন্ধে স্থানীয় জনসমাজের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় জীবনের উন্নতির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইতে পারে; সংযত স্বাধীনতাই পরিবর্ত্তিত ব্যবস্থার উপযোগী হইবে। এই বিষয়টীর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পথ চিনিয়া চলিলে, শিক্ষা সম্বন্ধে বেসরকারী চেষ্টায় অনেক সুফল ফলিবার কথা। কিন্তু স্থানীয় জনসমাজ মধ্যশিক্ষার ন্যায় উচ্চ শিক্ষার ব্যয় ভার বহন করিতে অসমর্থ বলিয়া নূতন পরিবর্ত্তন দ্বারা শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যয় সঙ্কোচের চেষ্টায় শিক্ষার ঊর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়ার আয়োজন চলিতে থাকিবে। এখনেও সরকারী ব্যয় সঙ্কোচের [illegible] অবসর নাই।

(ঘ) বিদ্যালয়ের ঘর বাড়ী।

ব্যয় সংক্ষেপের চতুর্থ প্রস্তাব বিদ্যালয়ের বাড়ী ঘর সম্বন্ধে। এইটীই ব্যয়সঙ্কোচ সমিতির অত্যুৎকৃষ্ট প্রস্তাব। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বিশ মহোদয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্যও ইট পাথরের ফর্দ্দ দিয়াছিলেন। এরূপ ব্যয়ে নাকি মোটের উপর খরচ কম হইবে। কিন্তু ইহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে দেশের সমস্ত গৃহই সরকারী ব্যয়ে পাকা করিয়া তোলার বন্দোবস্ত হউক না কেন! মোটের উপর যদি খরচ কম হয়, ধার করিয়াও এই কর্ম্ম সম্পন্ন করিলে কয়েক বৎসর পরই ত সরকার লাভবান হইয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিবেন! বিদেশীয়দিগের দ্বারা যতদিন আমাদের নিজেদের কাজ করান চলিতে থাকিবে, ততদিন এইরূপ খেয়ালের "সুপরামর্শ" আমাদের ভাগ্যে অনেক ঘটিতে থাকিবে। এই শিক্ষাতত্ত্ববিদ্ মহা পণ্ডিতগণ একটি ছোট কথা প্রায়ই ভুলিয়া যান। তাঁহারাই শিক্ষণ বিদ্যালয়ে শিক্ষাকে জাতীয় জীবনের সহিত সংযুক্ত রাখিতে পরামর্শ দেন, কিন্তু মোটা মোটা খরচের ফর্দ্দ করিবা

সময় তাঁহারাই সর্ব্বাগ্রে এই ঐক্যের কথাটাই ভুলিয়া যাওয়া সব চেয়ে সুবিধাজনক মনে করেন। যাহাদিগকে পর্ণ কুটীর, না হয় টীনের ছাদ, না হয় মাটীর দেওয়ালের ভিতরই জীবন কাটাইয়া দিতে বাধ্য হইতে হইবে, সেই কৃষক পুত্র ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তানসন্ততিদের শিক্ষার জন্য ছোট ছোট প্রাসাদ বা বিলাসভবনের অনুরূপ গৃহের আবশ্যকতা কোথায়? স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য, মাটীর দেওয়াল, খড়ের চাল ও টীনের ছাদেও অসম্ভব কি? যদি কাহারো সন্দেহ থাকে, বাংলাদেশের পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ একবার ভাল করিয়া ঘুরিয়া আসিলেই সন্দেহ দূর হইবে। যে দেশে সম্বলহীন মৌলবী ও ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের গৃহাঙ্গণই দেশীয় উচ্চতম শিক্ষা ও বিদগ্ধতার একমাত্র কেন্দ্র ছিল, এবং এখনও আছে,—সে দেশের শিক্ষার জন্য ইষ্টক প্রস্তরের 'আড়ম্বর' আবশ্যক নাই। এরূপ গৃহ নির্ম্মাণে যে প্রভূত অর্থের অপব্যয় হয়, তাহাকে শিক্ষার মূলধনে পরিণত করিলে, দেশে শিক্ষার উন্নতির জন্য, বোধ হয় অর্থাভাব হয় না এবং কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসার ন্যায় শিক্ষার অত্যাবশ্যক অনুষ্ঠানগুলিকে বেসরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত করার মত অত্যন্ত অকল্যাণকর প্রস্তাব দেশের লোকের দ্বারা লিপিবদ্ধ হইবার প্রয়োজন থাকে না।

এই সকল আলোচনা হইতে বেশ বুঝা যাইবে যে, দেশে যদি শিক্ষা বিস্তারের এবং উত্তরোত্তর শিক্ষার উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থার প্রয়োজন থাকে, অর্থাৎ জাতীয় জীবনকে যদি পঙ্গু করার বাসনা না থাকে,—তাহা হইলে শিক্ষা ব্যয় সংক্ষেপের ক্ষেত্র হইতে পারে না। দেশের শাসন ব্যবস্থার ব্যয়সঙ্কোচের যে দাবী আসিয়াছে, তাহা দেশের শিক্ষার ও স্বাস্থ্যের উৎকৃষ্টতর উন্নতির জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন আছে বলিয়া;—ব্যয়সঙ্কোচের নামে শিক্ষার ক্ষীণ প্রাণটুকু ক্ষীণতর করিয়া তোলা এই দাবীর প্রকৃত অর্থ নয়।

গান।

[শ্রীপ্রাণ চট্টোপাধ্যায়]

সেই আগের মত তেমনি সুরে
বাজাও তোমার বাঁশী,
উছল-নদীর চপল ঢেউ-এ
দেখাও অমল হাসি।
মিলন মাখা জোছনা-রাতে
বকুল-মালা জড়িয়ে মাথে
কদম-তলার আব্ছা-আলোয়
বসিও গো আসি'।
ফুলের কোলের পুলক-হাওয়া
নাচ্‌বে কানন ঘিরে,
ভুলিয়ে-দেওয়া বুকের গানে
ডেকো মোরে ধীরে,
ওই বাঁশরীর মধুর সাড়া
কর্‌বে আমায় আপন-হারা,
আকুল-ছুটার সরু-পথের
আঁধার দিও নাশি'।

সেকাল-একাল।

[শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ]

স্বদেশে রাজার পূজা, বিদ্বানের পূজা সর্ব্ব ঠাঁই—
সে কথা খাটে না আর, সেদিন এখন আর নাই।
বিদ্যার নাহি সে মান, বিদ্বানের নাহি সে গৌরব,
অর্থের নিকটে বিদ্যা পদে পদে মানে পরাভব।
দেশকাল পাত্রভেদে সনাতন প্রাচীন পদ্ধতি
উল্টাইয়া গেছে আজি উত্তমের নাহি অভ্যুন্নতি।
দিনে দিনে বাড়িতেছে অধমের অখণ্ড প্রতাপ,
পাপের উৎসব নিত্য, পুণ্যের সহস্র মনস্তাপ।
অনশনে অর্দ্ধাশনে জ্ঞানীর কাটিয়া যায় দিন—
পরিধানে ছিন্ন বস্ত্র—অধোমুখ চিন্তায় মলিন।
কেহ না সম্ভাষে তারে, কেহ তার না লয় সংবাদ
তার যে সম্পদ নাই—নাই তার বিপুল প্রাসাদ।
গণ্ডমূর্খ—হীনবর্ণ হয় যদি ধনীর সন্তান—
তবু সে সমাজনেতা—লোকে তারে দেয় উচ্চ মান।

খোকার মা।

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম-এ, বি-এল]

"মা আমায় একখানা বাসাতা দা—আ—ও।"

"একটু ব'স মাণিক আমার, চারখানা বাতাসা তোমায় দেব।"

কলিকাতার বড় রাস্তার ধারে একখানি পুরাতন একতলা বাড়ী। বাড়ীর ছাদের চারিধার প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। মাটির একটি টবে তুলসী বৃক্ষের সামনে শালপাতার ঠোঙায় বাতাসা। খোকার মা ছেলেকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া সাড়ীর অঞ্চলে গলদেশ বেষ্টন পূর্ব্বক নারায়ণকে সেই বাতাসার নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া দিলেন।

ছবিখানিতে চিত্রকরের বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণের আভা আলোক-ছায়ার চঞ্চল রেখাগুলিকে কোথাও তুলিকা-প্রসূত শিল্প-সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করে নাই। মাথার উপরে শরতের নীল আকাশ কবির কল্পনাকে বিদ্রূপ করিবার জন্য দিগন্তব্যাপী প্রকৃতির প্রাতঃকালিন উৎসব-আসরের কোথাও শুভ্র মেঘের কণামাত্র ছিটাইয়া দেয় নাই। বাহিরের জগতটিকে কে যেন অন্তহান শান্তির হ্রদে ডুবাইয়া রাখিয়াছে। খোকার মা'র অন্তর্জগতেও আজ শান্তিদেবী নির্ব্বাক আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছেন। উৎসের মুখে দুইটি স্ফটিক পদ্মের ঈষৎ উন্মীলিত পাপড়ির ভিতর দিয়া উষ্ণ অশ্রুবিন্দু সেই তুলসী বৃক্ষের মূলে ঝরিয়া পড়িল। মানুষের অন্তর যখন কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠে তখন তাহার উচ্ছ্বাস মাত্র আমরা দেখিতে পাই। আজ এক মাসের পর প্রবাসী স্বামীর পত্র প্রাপ্ত হইয়া খোকার মা নারায়ণকে হৃদয়ের অশ্রুত ভাষায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া বাতাসার ভোগ দিলেন।

গৃহস্থের ঘরের এই বধূর নাম আমরা জানি না। চটুল-রসনা উপন্যাসের নায়িকার মত এই শান্তস্বভাব বঙ্গনারীকে অনর্গল স্ফূর্ত্তিতে কথা কহিতে অভ্যস্ত করে নাই। বয়স্থা প্রতিবেশিনীগণ কখনও মধ্যাহ্নকালে খোকার মা'র বাটীতে সমাগত হইয়া যখন পরস্পরের সংসারের দৈনন্দিন সুখ দুঃখের হিসাব মিলাইয়া দেখিতেন তখন তিনি তাঁহাদের কথায় প্রতিবাদ করিয়া নিজের মতামত সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা করিতেন না। নারীমহল সেইজন্য খোকার মা'র সুখ্যাতি শতমুখে প্রচারিত করিত। সকলেই তাঁহার দুঃখে মনের মধ্যে বেদনা, সুখে আনন্দ অনুভব করিতেন। খোকার মা'র সুখ দুঃখ অপরের তুলনায় কম ছিল না। উচ্চাভিলাষশূন্য হিন্দু রমণীর স্বামী ও পুত্র জীবিত থাকিলে সংসারাশ্রম তাঁহার পক্ষে কি যে সুখের আনন্দের শান্তির নিকেতন, তাহা খোকার মা'র অবস্থার ভদ্রমহিলাকে বুঝাইয়া বলিতে হয় না। খোকার মা'র স্বামী পুত্র ও শ্বশুর বর্ত্তমান থাকিলেও বিধাতা তাঁহার কপালে চিরসুখ লিখিয়া রাখেন নাই। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙ্গালীর ঘরের পুরুষদেরকে যদি জীবন-সংগ্রামে মত্ত হইয়া ঘর বাড়ী, পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র ত্যাগ করিয়া বিদেশে বাস করিতে না হয় তাহা হইলে যাহারা তাহাদের জীবনের সাথী তাহাদিগকে বিরহের অশান্তি ভোগ করিতে হয় না। নিরন্তর স্বামী-সেবা রূপ ব্রতের সুফল লাভে বঞ্চিত হইলেও খোকার মা বৃদ্ধ রুগ্ন শ্বশুরের সেবায় কোন ত্রুটি করিতেন না। খোকার বয়স যখন দুই বৎসর তার বাপ তখন তিন বৎসরের চুক্তিতে এক সওদাগরের আপিসে কর্ম্ম করিবার জন্য ব্রহ্মদেশে গমন করিয়াছিলেন। খোকার বয়স এখন পাঁচ বৎসর। তিনটি মাস কাটিয়া গেলেই তাহার পিতা প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসিবেন।

এই সুদীর্ঘ তিন বৎসরের মধ্যে খোকার বাবা প্রতি মাসে পঞ্চাশ টাকা করিয়া বাটীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং অন্ন বস্ত্রের অভাব খোকার মা'র সংসারে ছিল না। তাহা হইলেও একজনের অভাবে সংসারের প্রত্যেকেই

বিষাদিত উদ্বিগ্ন কাতর। খোকার সুকুমার দেহ দাদুর আদরে, মায়ের স্নেহে এই তিন বৎসরে উদ্ভিদ-শিশুর ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার মাতার হৃদয়ের ভার তাহার সরল মনকে সবস করিতে পারে নাই। মা যখন তাহাকে হৃদয়ে চাপিয়া লইয়া মাতৃস্নেহের পীযূষ পান করাইতেন, তখন সে বুঝিতে পারিত যে, কোথা হইতে একটা হাহাকার উত্থিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাসের ক্ষীণ তরঙ্গের সহিত তাহার কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিতেছে। পিতৃদেবতা যে কি বস্তু তাহা বালক জানিত না। অথচ, জ্ঞানের ক্রমবিকাশের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক চিন্তারাজ্যের দুঃখভারাক্রান্ত আবহাওয়ার উত্তেজনায় তাহার শিশু-কল্পনা অলক্ষিতে সেই দেবতার মূর্ত্তি অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইত। বৃদ্ধ দিন গণিতেছিলেন পুত্র কবে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। প্রবাসীর পত্র পাইয়া সেইজন্য এই ক্ষুদ্র সংসারের প্রত্যেকেই যেন অসাড়-প্রায় হৃদয়ে নূতন শক্তি অনুভব করিলেন। অবস্থাবিশেষিত মানুষকে আশা অন্যের ভাষায় কি যে সম্মোহন বার্ত্তা শুনাইয়া দেয় তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহ স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই।

(২)

এ শুধু ক্ষীণের আশা নয়। মনের গোপনের উৎকট লালসা এ আশাকে প্রবুদ্ধ করে নাই। বেহালার তিন গাছি তারের ন্যায় খোকার দাদু, খোকার বাবা ও খোকার জীবনের তিনটী বিভিন্ন সুরগ্রাহী তার হইতে একটি অবিচ্ছিন্ন সঙ্গীত বাহির করিবার জন্য খোকার মা তাঁহার নিজের হৃদয়ের অতি সূক্ষ্ম কোমল তাঁতগুলিতে প্রস্তুত ছড়িখানিকে অপূর্ব্ব কৌশলে এতদিন সঞ্চালন করিয়াও বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন। এইবার তাহাদের পারিবারিক জীবনে অবিরাম সঙ্গীত বর্ষিত হইয়া তৃষাতুর হৃদয়কে সরস করিবার সময় আসিয়াছে। মাসাবধি অবিশ্রান্ত বারিধারা বর্ষণের পর মেঘমুক্ত আকাশ হইতে সূর্য্য যখন বিষাদমসীমাখা পৃথিবীর উপর শত সহস্র বার জাল বিস্তার করিয়া রৌদ্রালোক বর্ষণ করিতে থাকেন, মানব-জগত তখন যে কারণে উৎফুল্ল হয়, ঠিক সেই কারণে খোকার মা'র সংসারে শোক-মলিন দেহগুলিতে যেন অকস্মাৎ স্ফূর্ত্তির পুলক দেখা দিল।

আজ আবার প্রবাসীর পত্র আসিয়াছে। আর দুই মাস পরে গার্হস্থ্য-সম্মিলন তিন বৎসরের সুপ্ত স্মৃতিকে মধুময় করিয়া তুলিবে। "আয় মা, আয়, তোর চুলগুলান আঁচড়ে দি।" এই কথা বলিয়া বৃদ্ধা দাসী শ্যামাসুন্দরী খোকার মা'র হাত ধরিয়া ঘরের ভিতর টানিয়া লইয়া গেল। খোকার মা ভালবাসার অত্যাচার নীরবে সহ্য করিলেন। শ্যামা খোকার বাপকে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছে। খোকার ঠাকুর মা স্বর্গত হইলে শ্যামাই গৃহের কর্ত্রীরূপে সংসারটি বজায় রাখিয়াছিল। সে বলিত, "আমিই খোকার বাপের বিয়ে দিয়ে এই বৌ এনেচি।" সুখে দুঃখে আপদে বিপদে সম্পদে এই দাসী ছায়ার মত তাহাদের বাটীতে ত্রিশ বৎসর কাটাইয়া দিয়াছে। পাড়ার গৃহিণীরা শ্যামাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "তুই পূর্ব্বজন্মে ঘোষেদের কে ছিলি?" শ্যামা নিরক্ষর, বোকা, সেকালের ঝি। কলিকাতার নূতন দাসী-সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাহার অনেক বিষয়ে ঐক্য ছিল না। রাজধানীর জমিদারগণ যেমন বৎসর বৎসর প্রজাদের বাড়ী-ভাড়া বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, শ্যামা সেরূপ প্রতি বৎসর তাহার পারিশ্রমিকের হার বৃদ্ধি করিতে শিখে নাই। হাল ফ্যাসনের কোনও গল্প-লেখক তাহাকে দেখিলে বন জঙ্গলের অপকৃষ্ট জীব মনে করিতেন। শ্যামার অঙ্গের অনেক স্থানে কাচের গহনার পরিবর্ত্তে উল্কির ছাপ ছিল। তাহার মাথার চুল পুরুষ মানুষের মত ছোট করিয়া কাটা, পরিধানে আধ-ময়লা মোটা থান কাপড়। সৌখিন সাহিত্যিকের কল্পনা শ্যামা যে পল্লীতে বাস করিত, তাহার ত্রিসীমায় দেখা দিতে লজ্জা বোধ করিবে। শ্যামা গৃহিণীদের প্রশ্নের উত্তরে বলিত, "দেখ মা, আকালের বছরে এই খোকার মত বয়েস আমার ছিষ্টিধরকে নিয়ে দেশ থেকে এসে বাবুদের বাড়ীতে কাজ করছি। ছিষ্টিধরের বিয়ে দিয়ে দেশের কুঁড়ে ঘরে তাকে থিতু করেছি। মায়ায় পড়ে' এদেরকে আমি ছাড়তে পারছি না। আহা, নরু আমার দুমাস পরে বাড়ী আসবে, ছেলে-বৌকে নিয়ে ঘরকন্না করবে, আমি দেখে একবার

দেশে যাব। এই তিন বছর দেশে যাইনি মা, বৌ-বেটার মুখ দেখিনি, মায়া এমনি জিনিষ মা।"

মানব-হৃদয়ের যতগুলি কোমল ভাব আছে, শ্যামা তাহার নিজের অভিধানের ঐ একটি শব্দে বুঝাইয়া দিল। শ্যামার মতে সমবেদনা, সহানুভূতি, দয়া, বাৎসল্য প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের হৃদয়-ধর্ম্মের একটি মাত্র নাম "মায়া"। দার্শনিকেরা বিশ্লেষণের আলোকে বিভিন্ন বর্ণের চিত্তবৃত্তিগুলিকে শ্রেণীবিভাগ করিয়া লইয়া তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়াছেন। প্রেম-ভালবাসার গল্প লেখকেরা দার্শনিকের পদ অনুসরণ করিয়া চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়া থাকেন। মানব-হৃদয়ের প্রত্যক্ষভাবগুলিকে গভীর, মধুর, উৎকট প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া অনেকে আবার সুপরিচিত মনোভাব বিশেষকে নূতন নামে চালাইতে চেষ্টা করেন। আসল কথা, গদ্য ও পদ্য লেখকেরা পাঠকের মনে রসজ্ঞানের উদ্রেক করিবার জন্য একই জিনিষকে বিভিন্ন বর্ণে চিত্রিত করিয়া শিল্প-কলায় বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়া থাকেন। শ্যামার পাঠশালায় কিন্তু যাঁহারা মানব-হৃদয়ের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অনন্ত-ভাবময় হৃদয়রাজ্যে মায়ার প্রাধান্য স্বীকার করিবেন। বাস্তব জগতে দুঃখ দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট মানব ভাবলীলার অভিনয় দেখিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তাহার বৈশিষ্ট্য ভাব-বহুল জগতে মূল শক্তির অনুভূতি। যুগ যুগান্তরের জীবন-মরণের সমস্যার ভিতর দিয়া অসংখ্য বিচ্ছিন্ন ভাব একটি মাত্র শক্তির প্রভাবে জমাট বাঁধিয়া শত সহস্র ব্যক্তির জীবন্ত ভাষার বাহনে ব্যক্ত। মায়ার মায়ায় আমরা এমনি মুগ্ধ যে, শ্যামার ভাষা আমরা বুঝিতে পারি না। সে যে ভাব-জগতের মূলে পৌছিতে পারিয়াছে ইহা আমরা স্বীকার করিতে চাহি না। আমরা পাঠাগারের দরজা বন্ধ করিয়া কল্পনার সাহায্যে ঔপন্যাসিক প্রেম-ভালবাসার বিচার করিতে শিখিয়াছি। বিশ্লেষণ আমাদিগকে বহুলতার দিকে, নিতুই নূতনের পশ্চাতে ছুটিতে পরামর্শ দেয়। শ্যামা বলে, ঐ একটা কথার অর্থ বুঝিয়া রাখ, তাহা হইলে ভাব-তত্ত্বের গূঢ়তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে।

(৩)

আর এক মাস কাটিয়া গেল। প্রবাসীর পত্র আসিয়াছে। আশার বৃক্ষটি পল্লবিত হইয়া উঠিল। এই মনোহর বৃক্ষটি অচিরে যে মুকুলিত হইবে তাহাতে কাহারও সন্দেহ রহিল না। খোকার মা শ্যামাকে বলিলেন, "দেখ, বাজারটা ক'রে এনে, কেটে কাপড়খানা প'রে এক পয়সা বাতাসা কিনে আনবে। আমি তুলসীতলায় নারায়ণকে দিয়ে তবে রান্নাঘরে ঢুকব।" শ্যামা বাজার করিতে বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলে, খোকার মা তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া লইলেন। ঘড়ীর দিকে চাহিয়া তিনি বুঝিলেন শ্যামা ফিরিয়া আসিতে এখনও অন্ততঃ পনেরো মিনিট দেরী। তিনি খোকাকে একখানি ছোট লাল রঙের চেলী পরাইয়া দিলেন। মল্লগণের মত কাপড়খানিকে তিনি খোকার কোমরে জড়াইয়া দিবার পর তাহার হাতে একটি পয়সা দিয়া প্রাণ ভরিয়া মুখ চুম্বন করিলেন, আর বলিলেন, "বাবা, রাস্তার ওদিকে সেই যে মুদীর দোকান আছে জান, সেখানে গিয়ে এক পয়সার বাতাসা কিনে আন ত মাণিক আমার, তোমাকে চারখানা বাতাসা দেব।" খোকা বীর পুরুষের ন্যায় মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিবার জন্য ছুটিয়া চলিল। "দেখো, গাড়ী ঘোড়া দেখে যেও।" খোকা সদর দরজার বাহিরে গিয়াছে। তার মা দ্রুতপদে ছাদের উপর গমন করিলেন। প্রাচীরের গায়ে ঠেস দিয়া তিনি রাস্তার পরপারে মুদীর দোকানের দিকে চাহিলেন। তাঁহার খোকা ছোট হাতখানি প্রসারিত করিয়া মুদীকে পয়সা দিল। মুদী অপর সকল খরিদ্দারকে উপেক্ষা করিয়া খোকার বাতাসা গণিতে আরম্ভ করিল। খোকার মা'র মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

ঠিক সেই সময়ে আকাশে একখানা মেঘ মন্থর গতিতে কোন্ অজ্ঞাত দেশে চলিয়াছিল। কি ভাবিয়া সেই মেঘখানি সেই রাস্তার উপরে আসিয়া ক্ষণকালের জন্য যেন পটে আঁকা বর্ণরাশির মত অকস্মাৎ চলৎশক্তিহীন হইয়া পড়িল। ব্যথা-ভরা হৃদয়ে খোকার মা আকাশে মেঘের দিকে চাহিলেন। পরক্ষণেই মুদীর দোকানের দিকে তাঁহার দৃষ্টি ফিরাইলেন। মুদী বাতাসার ঠোঙা খোকার হাতে দিল। দুই হাতে ঠোঙাখানি ধরিয়া খোকা এইবার বাড়ী ফিরিতেছে। এ কি এ!! কোথা হইতে একখানি

ট্রামগাড়ী মোড় ঘুরিয়া দ্রুত আসিতেছে যে! খোকার মা'র বুকের ভিতর হৃদ্‌পিণ্ডটা সজোরে নড়িয়া উঠিল। না, খোকা ট্রাম গাড়ীর লাইনের পাশে থমকিয়ে দাঁড়িয়ে প'ড়েছে। হরি রক্ষা করিলেন! ট্রাম গাড়ী উত্তর হইতে দক্ষিণে চলিয়া গেল। আঃ! এ আবার কি আপদ গো!! আর একখানি ট্রাম গাড়ী দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে ঘণ্টা বাজিয়ে অতি দ্রুত আসছে যে! খোকা পূর্ব্বের ট্রাম গাড়ীর লাইনে আসিয়া থমকিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। শেষের ট্রাম গাড়ীখানি নিমেষের মধ্যে চলিয়া গেলে খোকা যেমন বাড়ীর দিকে দৌড়িল অমনি একখানি মোটর গাড়ী পাশ হইতে বিদ্যুদ্বেগে আসিয়া তাহাকে পিষিয়া দিয়া মোড় ঘুরিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

রাস্তার লোক চারিদিক হইতে হায় হায় শব্দে দৌড়িয়া আসিয়া খোকার রক্তাক্ত মৃতদেহকে ঘিরিয়া ফেলিল। মাথার ও পেটের উপর দিয়া মোটর গাড়ীর সামনের ও পিছনের দুইখানি চাকা চলিয়া গিয়াছে। মোটর গাড়ীর আরোহী বিলাসপ্রিয়, নিষ্ঠুর-হৃদয় বাঙ্গালী বাবু রাস্তার লোকের চীৎকারে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, বালক বাঁচিয়া আছে কি মৃত হইয়াছে তাহার সন্ধানও করিলেন না। মোটর-রাক্ষসীর স্কন্ধে চাপিয়া বাবু উধাও হইয়া গেলেন। জনতা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একজন বলিল, "আহা, এমন সুন্দর ছেলে, পেটের নাড়ী সব বেরিয়ে প'ড়েছে, মাথার আধখানা চুরমার হয়ে গেছে, যেন ননীর পুতুল আছড়ে ভেঙ্গে দিয়েছে।" আর একজন বলিল, "যে এমন করলে তার কি ঘরে ছেলে নাই! ভগবান তার সর্ব্বনাশ করুন, যেন এই রকম ক'রে রক্ত গঙ্গা হয়ে তার ছেলে মরে।" তৃতীয় এক ব্যক্তি বলিল, "হারা—দা বাবুটা এমন পা—গো, মুখ বাড়িয়ে দেখলে ছেলেটা চাপা প'ড়েছে, গাড়ীখানা থামালে না!" দুই তিনজন চীৎকার করিয়া বলিল, "হাঁ, গাড়ী থামাবে? থামালে ত হ'ত, লাথিয়ে লাথিয়ে বে—র মাথার খুলি ভেঙ্গে দিতুম।" জনতার মধ্যে অনেক লোক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই মোটর গাড়ীর বাঙ্গালী বাবুর উদ্দেশে তাহারা গালাগালি করিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে একজন পাহারাওয়ালা সশব্দ পদবিক্ষেপে সেইখানে দেখা দিলে লোকের ভিড় হঠাৎ কমিতে আরম্ভ হইল। "কেড়কা কিস্‌কা হুয়া?" নিকটের লোকগুলি কেহ ঠিক উত্তর দিতে পারিল না।

শ্যামা বাজারের ধামা লইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। সে দূর হইতে ভিড়ের ফাঁক দিয়া মৃতদেহ দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল, আর বলিতেছিল, "আহা, কোন্ অভাগীর কপাল ভেঙ্গেচে গো!" মুদী শ্যামাকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "শ্যামা, শীগ্‌গির বাড়ী যাও, তোমাদের খোকা মোটর গাড়ী চাপা প'ড়ে মারা গিয়েছে!" মুদীর কথা শুনিবামাত্র শ্যামার দেহ অবশ হইয়া পড়িল, তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, হাত হইতে বাজারের ধামা রাস্তায় পড়িয়া গেল। শ্যামা মাতালের মত টলিতে টলিতে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া আর্ত্তস্বরে ডাকিল, "বৌ মা!" কোনও উত্তর নাই। আবার ডাকিল, "বৌ মা!" কোনও উত্তর নাই। কম্পিত পদে, দেওয়াল ধরিয়া, সিঁড়ি দিয়া ছাদে উঠিয়া শ্যামা দেখিল, রাস্তার দিকের প্রাচীরের ধারে ছাদের উপর খোকার মা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শুইয়া রহিয়াছেন। এক ঘণ্টা পরে ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "মাথার ভিতরের শির ছিঁড়িয়া গিয়াছে, মগজের মধ্যে রক্তস্রাব হইতেছে, বাঁচিবার কোনও আশা নাই। বোধ হয় কিছুদিন হইতে হৃদ্‌রোগ আরম্ভ হইয়াছিল, চোখের সামনে আজ ছেলের ঐ রকম মৃত্যু দেখিয়া এঁর দুর্ব্বল স্নায়ুকেন্দ্রে মারাত্মক আঘাত লাগিয়াছে। আজ রাত্তিরটা কাটে কি না সন্দেহ।" পরদিন রাজধানীর শ্মশান-বক্ষে খোকার মা যখন খোকার দেহাবশেষ কোলে করিয়া চিতা-শয্যায় শয়ন করিলেন, পশ্চিম দিগ্বধূ তখন আরক্ত নয়নে পাশ্চাত্য বিলাসিতায় মত্ত হৃদয়হীন বাঙ্গালাদেশকে ধিক্কার দিতে দিতে ঘনান্ধকারে ধীরে ধীরে মিলিয়া গেলেন।

চাঁদপ্রতাপের ব্রত কথা।

(১৩) গার্শী ব্রত।

[শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি দিবস এই ব্রত করা হয়। সধবা মহিলাগণই ব্রত করিয়া থাকেন। ব্রতের পূর্ব্ব দিন ব্রতিনীগণ হরিদ্রা, সরিষা, মাসকলাই, মেথী, মুথা, আম ও কুলের কুশি (কচি পাতা) গিলা (বাদামের ন্যায় শক্ত আবরণযুক্ত গোলাকার ফলবিশেষ) বাটিয়া একখানি কলার 'মাইজ' পাতায় পৃথক পৃথক সাজাইয়া, একখণ্ড কলার 'ডাইগে' (কলাপাতার মধ্যস্থলের কঠিন অংশে) প্রদীপের শিখা দ্বারা 'কাজল' পাড়িয়া ও একখানা পাত্রে কয়েকটী পাটপাতা ও কয়েকখানা পোড়া কাঁচা তেঁতুল রাখিয়া দেন। তাঁহারা শেষ রাত্রে শয্যা ত্যাগ করিয়া পুকুরঘাটে গমন করেন এবং একজনে এক ঘটী জল ভরিয়া লইবার পর সকলে 'জোকার' (হুলুধ্বনি) দিতে দিতে বাড়ী ফিরিয়া থাকেন। উক্ত ঘটীর জলে কিঞ্চিৎ তৈল মিশ্রিত করা হয়। এই সমস্ত দ্রব্য উঠানে রাখিয়া সকলে মিলিয়া পুনরায় 'জোকার' দিয়া বাড়ার ছেলে মেয়েদিগকে ডাকিয়া উঠাইয়া থাকেন। মহিলাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া বালক বালিকাদের কেহ কেহ পাট-খড়ির দ্বারা চুরুটের ন্যায় ধূম-পান করে। গৃহিণীর উপদেশে ছেলেদের কেহ দা' কিংবা ছুরি হাতে লইয়া যে গাছে ফল জন্মে না, সেই গাছে উক্ত অস্ত্র দ্বারা ঘা মারিতে থাকে। তখন গৃহিণী বলেন,—"এগাছ কাটিতেছিস কেন?" বালক উত্তর দেয়,—"এগাছে যখন ফল জন্মে না, তখন ইহা কাটিয়া ফেলাই ভাল।" তদুত্তরে গৃহিণী বলেন,—"গাছটী কাটিস না; এবার ইহাতে প্রচুর ফল জন্মিবে।" ইহা শুনিয়া বালক কর্ত্তনকার্য্যে নিবৃত্ত হয়। তৎপর বালক-বালিকারা "এবার যেন মশা-মাছি থাকে না" বলিতে বলিতে ঘরের বেড়ায় আঘাত করিয়া থাকে। ইহার পর জল-পূর্ণ ঘটী ও অন্যান্য দ্রব্য ঢাকিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়।

ভোর বেলায় ব্রতিনীরা ও ছেলে-মেয়েরা উক্ত ঘটীর উপরিভাগস্থ তৈল ও কাঁচা তেঁতুল অধর-ওষ্ঠে মাখিয়া হাত মুখ ধুইয়া থাকেন। বালক-বালিকাগণের মুখমণ্ডলে উক্ত হরিদ্রা ও চক্ষে কাজল দেওয়া হয়। তৎপর রমণীগণ মৃত্তিকা নির্ম্মিত রন্ধন-পাত্র ফেলিয়া দেন ও অন্যান্য পাত্রাদি মাজিয়া-ধুইয়া, ঘর দুয়ার ঝাঁটা দিয়া ও লেপিয়া সারা বাড়ীখানা অতি পবিত্র স্থানে পরিণত করিয়া থাকেন। তখন সেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ীর দিকে চাহিতেই ললনাবৃন্দের প্রতি স্বতঃই ভক্তি জন্মিয়া থাকে।

দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই ব্রতিনীরা উক্ত দ্রব্যগুলি ও অন্যান্য উপকরণাদি লইয়া, পুকুরঘাটে যাইয়া, হলুদ ইত্যাদি অঙ্গে মাখিয়া স্নান করিয়া থাকেন। কাপড় না ছাড়িয়া জনৈকা ব্রতিনী গোবর দ্বারা একটি ছোট স্তম্ভ (স্তূপ) প্রস্তুত করেন। শালিধানের চাউল ও কলা অভাবে গুড় দিয়া একখানি নৈবেদ্য উক্ত স্তূপের সম্মুখে সাজাইয়া দেওয়া হয়। তৎপর সাপলা (কুমুদজাতীয়) ফুল দিয়া গৃহিণী যথাজ্ঞানে যথানিয়মে লক্ষ্মীর পূজা করিয়া থাকেন। উক্ত ফুল সংগ্রহ করিতে না পারিলে অন্য পুষ্প দ্বারা পূজা করিতে হয়। অপর ব্রতিনীগণ সিক্ত বসনে পূজা স্থানে থাকেন ও পূজা শেষে 'কথা' শ্রবণ করেন। যিনি পূজা করেন, তিনি 'কথা' না জানিলে অপর এক ব্রতিনী তাহা বলিয়া থাকেন। 'কথা' শেষে 'জোকার' দিয়া উক্ত গোময়-স্তূপ তিন ভাগ করিয়া, প্রত্যেকেই একটু একটু করিয়া গোবর লইয়া পায়ের ফাঁক দিয়া উহা তিনবার ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেন। তৎপর হাত পা ধুইয়া, শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া সকলে বাড়ী ফিরিয়া থাকেন।

এই দিন বাড়ীর সকলকেই নিরামিষ ভোজন করিতে হয়। ব্রতিনীগণ শালি চাউলের অন্ন ও আট আনাজের (তরকারীর) ঝোল ভিন্ন ব্রতের দিন আর কিছুই খাইতে পারেন না। সন্ধ্যাবেলা বাড়ীর প্রতি ঘরের চারিদিকে ঘৃতের প্রদীপ দেওয়া হয়। তখনকার সেই প্রজ্বলিত প্রদীপ-শ্রেণীর দৃশ্য অতি মনোরম।

'কথা'।—এক ছিলেন রাজা। একদা আশ্বিনের সংক্রান্তি দিবস তাঁহার পুত্রবধূ উঠান, ঘর ইত্যাদি গোময়-

লিপ্ত করাইতেছেন দেখিতে পাইয়া ও ঐ দিন মৎস্যাদি রন্ধন করা হইবে না শুনিয়া তিনি রাগভরে বলিলেন,—"এসব কি অনাচার হইতেছে আমার বাড়ী? কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে যে, আজ মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ? এসব অশাস্ত্রীয় ব্যাপার আমার বাড়ী হইতে দিব না। আমি এখনই মাছ আনাইতেছি।" এই বলিয়া রাজা বাহির মহলে চলিয়া গেলেন। কিছুকাল পরই বড় বড় অনেক মাছ বাহকেরা আনিয়া রন্ধনশালার নিকট রাখিল। ইহা দেখিয়া রাজপুত্রবধূর মনে শঙ্কা জন্মিল। তিনি শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাড়ীতে মাছ আনা হইল, এখন কি উপায় হইবে?" ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন,—"মাছ রাঁধিতে বলা হউক, রাজা ও আর সকলে উহা আহার করুক, শুধু আমি ও তুমি উহা আহার করিব না। তাহা হইলেই কোন অনিষ্ট হইবে না।"

যথাসময়ে রাজা ও আর সকলেই মৎস্যাদি আহার করিলেন। শাশুড়ী ও পুত্রবধূ নিয়ম পালনপূর্ব্বক ব্রত করিলেন। সন্ধ্যার সময় রাজবাড়ী ঘিয়ের প্রদীপে আলোকিত করা হইল। রাত্রে শাশুড়ী ও বধূ উভয়ের কেশের অগ্রভাগে ও বস্ত্রাঞ্চলে গাঁইট বাঁধিয়া এক শয্যায় শয়ন করিলেন। ভোরের বেলায় গ্রন্থিমুক্ত হইয়া, বধূ অন্দর মহলের পশ্চাতে যাইয়া একটা মৃত দাঁড়কাক দেখিতে পাইলেন। তখনই তিনি রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বিনীত ভাবে বলিলেন,—"আপনি কাল বাড়ীতে মাছ আনাইয়াছিলেন এবং আপনারা সকলেই তাহা খাইয়াছিলেন। কিন্তু আমি ও শ্বশ্রূ মাতা তাহা খাই নাই। গত কল্য সমস্ত ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করাইয়াছি বলিয়া ও আমরা উভয়ে নিয়মপালনপূর্ব্বক গার্শী ব্রত করিয়াছি বলিয়া বাড়ীতে অলক্ষ্মী প্রবেশ করিতে পারে নাই। আমাদের দুইজনের কেহ যদি রাত্রিতে একাকী বাহির হইতাম, তাহা হইলে মহা অনিষ্ট ঘটিত। তাই আমরা চুলে ও আঁচলে গাঁইট বাঁধিয়া এক শয্যায় শুইয়াছিলাম। আমাদের উভয়ের কেহ রাত্রিতে ঘরের বাহির হইলেই একটা দাঁড়কাক বাড়ীতে প্রবেশ করিত, সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষ্মীও প্রবেশ করিয়া বাড়ীখানায় অবস্থান করিত। আপনি আমার সঙ্গে যাইয়া একটা মৃত দাঁড়কাক দেখিলেই আমার কথায় আপনার বিশ্বাস হইবে।"

শ্বশুর পুত্রবধূর সঙ্গে যাইয়া সেই কাকটা দেখিলেন ও আহ্লাদের সহিত বলিলেন,—'মা! তুমিই আমার রাজ্যের রাজলক্ষ্মী স্বরূপা। তোমার ন্যায় পুত্রবধূ যাহার ঘরে আছে, তাহার রাজ্যে অলক্ষ্মী কিছুতেই প্রবেশ করিতে পারে না। তুমি নিয়মমত বৎসর বৎসর ব্রত করিও। ব্রতের দিন তুমি যাহা করিতে নিষেধ করিবে, তাহা কেহই করিবে না।

সেই হইতে রাজবাটীতে ও অন্যত্র নির্ব্বিঘ্নে বৎসর বৎসর গার্শী ব্রত হইতে লাগিল।

পূজা হয় অলক্ষ্মীর, কিন্তু ব্রতের নাম গার্শী কি করিয়া হইল, তাহা বুঝা যায় না। এই ব্রত প্রায় সকল গৃহস্থ বাটীতেই করা হইয়া থাকে।

আলোর আবাহন।

[শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্]

ওগো আলো ওগো আলো
জগৎ মাঝে তুমিই ভালো
শুভ্র তোমার কিরণ ঝরি
ঘুচাক্ হৃদয় মনের কালো!
তোমায় হৃদে বরণ করি
গানে গানে ভুবন ভরি
তিমির-হরণ কিরণ তোমার
প্লাবন করে ঢালো ঢালো!

অন্তরে যে পরম আলো
মেঘের মাঝেই আছে ঢাকা
তা'রেও তুমি প্রকাশ কর
জ্বালিয়ে তব দীপ্ত শিখা।
আলো! তোমায় প্রণাম করি
নিখিল কালো লও গো হরি
তোমার মাঝে সিনান্ করি'
জগতখানি বাসি ভাল।

ভিখারী।

[শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার]

রাজপথের একপাশে ভীড় জমিয়াছিল। ট্রামের শব্দ, গাড়ীর ঘর্ঘর জনতার কলরবের মাঝে তাহাদের দুজনার মধুর সঙ্গীতালাপ বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। ভিখারীর মুখে আনন্দের দীপ্তি, ভিখারিণীর চোখে স্বপ্ন কুহেলিকা। মাঝে মাঝে উভয়ে উভয়ের মুখের পানে চাহিতেছিল, তাহাদের জীবনের সকল অকথিত ইতিহাস যেন সে সঙ্গীতের মধ্য দিয়া গলিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় জনতা সে সঙ্গীত-সুধা পান করিতেছিল।

সঙ্গীত থামিয়া গেল। ভিক্ষাপাত্র হস্তে ভিখারীকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া চকিতে জনতা ক্রমশঃ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। একটি প্রৌঢ়া রমণী তখনও দাঁড়াইয়া ছিলেন। ভিখারিণীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার বোন্ বুঝি?"

"হাঁ, মা" বলিয়া ভিখারী ভিখারিণীর প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিল। প্রৌঢ়া করুণার্দ্রনয়নে উভয়ের প্রতি চাহিয়া একটি আধুলি উপহার দিলেন।

(২)

সে অপূর্ব্ব সঙ্গীত এবং ভ্রাতা-ভগ্নির সে পরস্পর স্নেহ-প্রীতির দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া আমি তাহাদের অনুসরণ করিলাম। বহুদূর আসিয়া অন্য এক রাজপথে তাহারা বাঁশী ও এসরাজের সঙ্গত ধরিল। পর্দ্দায় পর্দ্দায় সে সুর উঠিতে লাগিল; সন্ধ্যার আকাশে বাতাসে সে স্বরমূর্চ্ছনা ধীরে ধীরে কাঁপিতে লাগিল।

অদূরে একটি যুবতী চিত্রার্পিতের ন্যায় তাহাদের প্রতি চাহিয়াছিলেন। সঙ্গীত শেষে ভীড় সরিয়া গেলে, ধীরে ধীরে ভিখারীর দিকে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে ওটি? তোমার প্রণয়িনী?"

ভিখারীর চোখ দু'টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তার মুখখানি অপূর্ব্ব মাধুরীতে ভরিয়া উঠিল; অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বের সে "ভগিনীর" প্রতি গাঢ় প্রণয় দৃষ্টিতে চাহিয়া সে উত্তর দিল—'আপনার অনুমান ঠিক।'"

যুবতী বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে কারুকার্য্যখচিত থলিটি বাহির করিয়া তাহা হইতে একটি টাকা লইয়া তাহাকে দিয়া চলিয়া গেলেন,—মুখে তাঁর আনন্দ-লেখা, চোখে তাঁর স্বপ্ন-মাধুরী!

(৩)

আমি আর থাকিতে পারিলাম না। ভিখারীকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি তোমার দুইবারেরই উত্তর শুনিলাম। সত্য বল, ভিখারিণী তোমার কে—ভগ্নী না প্রণয়িনী?"

ভিখারী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল—"দেখুন, আমাদের ত বাঁচ্‌তে হবে! সংসারে সাধারণ শিল্পীর কোন আদর নেই। তাই একটু নূতনত্বের অসাধারণত্বের ভাণ করতেই হয়। আসল কথা, এ আমার স্ত্রী।"

আমি ভিখারিণীর হাতের প্রতি চাহিলাম। সে আমার মনোভাব অনুমান করিয়া গলার নীচে জামার ভিতর হইতে একটি রেশমের হার বাহির করিল, দেখিলাম বিবাহের আংটিটি তাহাতে গাঁথা রহিয়াছে।

আমি দুইজনার হাতে দুইটি টাকা দিলাম। "হায়, সবাই যদি এমন সত্যের আদর কর্‌ত!" বলিয়া স্ত্রীলোকটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আংটিটি ধীরে ধীরে যথাস্থানে রাখিয়া দিল। *

---

* ইংরাজী হইতে।

বৈজ্ঞানিক কথা।

[শ্রীহরিপদ দাস বি-এ]

পরিবর্ত্তনশীল উত্তাপ ও কীটের জীবন।

প্রজাপতি ও গুটিপোকার জীবনকাল বাড়ান যায় কি না, এ সম্বন্ধে ফ্রান্সে কিছুদিন হইতে পরীক্ষা চলিয়া আসিতেছিল। যে গুটিপোকা লইয়া পরীক্ষা হইতেছিল তাহার সম্পূর্ণ পরিণতি কাল ৩৭° ডিগ্রি তাপে প্রায় চৌদ্দ দিন। কিন্তু তাপ হ্রাস করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই পরিণতির কাল দীর্ঘ হইয়াছে। ৩৪° ডিগ্রি তাপে সম্পূর্ণ পরিণতি হইতে ১৫ দিন আর ২৭° ডিগ্রি তাপে ২৫ দিন লাগিয়াছে। ১০° ডিগ্রি তাপের নীচে গুটিপোকা প্রজাপতিতে পরিণত হইতে পারে না, কিন্তু ইহার জীবনকাল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ও দুই তিন মাস পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। ১০° ডিগ্রি ও ৪° ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডের মাপের মধ্যে ইহাদের জীবনীশক্তি এতই দুর্বল হইয়া পড়ে যে ইহা খাইতে, কিংবা নড়িতে পারে না ও এক মাস মধ্যেই মরিয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ৭° ডিগ্রি ও ১° ডিগ্রি তাপের মধ্যে তাহাদের জীবনী-ক্রিয়া অত্যন্ত কমিয়া যায় এবং তাহারা ছয় মাস পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে। বৈজ্ঞানিক ডেস্টুসে (Destouches) গুটিপোকাকে পর্য্যায়ক্রমে ২৪ ঘণ্টা করিয়া বিভিন্ন উত্তাপে (১° ডিগ্রি ও ৩৭° ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড) রাখিয়া দেখিয়াছেন যে, ইহাদের পরিণতি হইতে ২৫ দিন সময় লাগিয়াছে। কিন্তু এই বর্দ্ধিত পরিণতি কালের দরুণ তাহাদের আয়ু কিংবা জীবনীশক্তির কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। আরও দেখা গিয়াছে যে, পরিবর্ত্তনশীল উত্তাপে প্রজাপতিদের কর্ম্মজীবনকাল অতিশয় বাড়িয়া থাকে এবং তাহাদের বংশ বিস্তারের ক্ষমতাও খুব বৃদ্ধি পায়। এইরূপ অবস্থায় তাহারা ছয় সাত দিন পরে মরিয়া না যাইয়া ত্রিশ পঁয়ত্রিশ দিন বাঁচিয়া থাকে ও দশটী কি পনরটি ডিম পাড়ার পরিবর্ত্তে পঁচিশ ত্রিশটী ডিম পাড়িয়া থাকে।

অণুর প্রত্যক্ষীকরণ।

জড়জগতের মূল উপাদান অণু। আমাদের দেশে বহুকাল হইতে এই অণু-বাদ চলিয়া আসিতেছে। ইউরোপীয় দার্শনিকগণও এই অণু বাদ প্রচার করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে ইউরোপীয় দার্শনিকগণ এই মত অবলম্বন করেন ও ইহার সাহায্যে বৈজ্ঞানিক জগতে, বিশেষ করিয়া রসায়ন শাস্ত্রে, বহু তত্ত্বের আবিষ্কার করেন। ইহা সত্ত্বেও কেহ কেহ মনে করিতেন যে, এই অণু-বাদ একটা হাইপথেসিস্ (hypothesis) মাত্র; বাস্তবিক অণু বলিয়া কোন জিনিষ নাই।

এই সন্দেহের মূলীভূত কারণ ছিল অণুদিগের অতীন্দ্রিয়তা। হিন্দু দার্শনিকগণ বলিতেন যে, অণু অতীন্দ্রিয় পদার্থ, কোনও রূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহাকে গ্রহণ করা যায় না। ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের মতেও ইহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর। কেবল বুদ্ধির সাহায্যেই এগুলির কিছু ধারণা করা যাইতে পারে। তাঁহারা জড়জগতের এই মূল উপাদান-গুলির নাম দিয়াছিলেন এটম্ (atom) অর্থাৎ যাহাকে চিন্তার সাহায্যেও আর দ্বিখণ্ড করা যায় না। এই রকম বস্তু যে কেবলমাত্র কল্পনা বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু বিজ্ঞানের সাহায্যে এই অতীন্দ্রিয় বস্তুও ইন্দ্রিয়গোচর হইয়াছে। এখন আর অণুকে একটা কল্পনামাত্র বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলিতেছে না। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রমন একটী বক্তৃতায় এই অণুকে শ্রোতাদিগের দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন। একটী ক্ষুদ্র রেডিয়ামের কণা হইতে যে হেলিয়ম ধাতুর অণু বিচ্ছুরিত হয়, তিনি তাহা আলোকচিত্রের সাহায্যে প্রতিফলিত করিয়া দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে প্রদর্শন করেন। ইনি স্বচ্ছ পদার্থের আনবিক সংগঠন সকলের প্রত্যক্ষ গোচর করান। বাতাস প্রভৃতি বর্ণহীন স্বচ্ছ 'গ্যাস' বাষ্প

(gas) গুলি অদৃশ্য অণু দ্বারা গঠিত বলিয়া বিবেচিত হয়। বাস্তবিক কিন্তু যদি কোন বর্ণহীন বাষ্পীয় পদার্থের (gas) মধ্য দিয়া খুব উজ্জ্বল আলোকরশ্মি প্রেরণ করা যায় তাহা হইলে এই আলোকোদ্ভাসিত (বাষ্পরাশি ' গ্যাস (gas) কোন কাল দৃশ্যপটের সম্মুখে ধরিলে দৃষ্টিগোচর হয়। ঠিক একই রকমে তরল পদার্থের আনবিক গঠন দেখান যাইতে পারে। এই পরীক্ষা হইতে একটী নূতন তথ্য প্রকাশ হইয়াছে। এতদিন ধরিয়া বৈজ্ঞানিকগণ মনে করিতেন যে আকাশটী প্রতিফলিত হওয়াতে গভীর সমুদ্রের জল নীল দেখায়, কিংবা জলে ভাসমান কণিকাসমূহের দ্বারা আলোক-রশ্মি শোষিত হওয়ায় গভীর সমুদ্রের জল নীল দেখায়। কিন্তু অধ্যাপক রমন প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই উভয় ধারণাই ভুল। তিনি দেখাইয়াছেন যে, নির্ম্মল জলে আলোকরশ্মির আনবিক বিক্ষিপ্তির জন্যই গভীর সমুদ্রের রং নীল দেখায়। এবং ঠিক একই রকমে ধূলিকণাশূন্য বায়ুরাশির মধ্যে আলোকরশ্মির বিক্ষিপ্তির জন্য আকাশের রং নীল।

অধ্যাপক রমন স্ফটিক প্রভৃতি স্বচ্ছ প্রস্তরসমূহের অণু ও তাহার গতির অস্তিত্ব দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি এমন কি আলোক ও তড়িৎশক্তির ও অণুর অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। অধ্যাপক রমনের এই নূতন পরীক্ষা আলোক সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদিগের মতের আবার পরিবর্ত্তন করিবে। এতদিন তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ছিল যে, আলোক ইথারের (ether) অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গরাশি। কিন্তু এই নূতন প্রমাণের ফলে বোধ হয় তাঁহাদিগকে আবার নিউটন প্রভৃতি পুরাকালের বৈজ্ঞানিকদিগের মত স্বীকার করিতে হইবে যে, আলো অণু দ্বারা গঠিত পদার্থ। অধ্যাপক রমনের পরীক্ষাগুলি একটা নূতন জগতের ইতিহাস আমাদের চোখের সামে আনিয়া ধরিয়াছে।

প্রেম।

[শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ]

কোথা হ'তে আসি কোথা যায় মিশি
কে জানিত হেন ঘটিবে,
ভূধর ছাড়িয়া সাগরে তটিনী
তাহারে হৃদয় দানিবে।
কে জানিত হায় কাহার কথায়
সাগরে শুক্তি রতন,
সেথায় গোপনে রহিবে কেমনে
পাইবে কাহার যতন।
হায় কি উপায় লয়েছে বরিয়া
তাহার মোহন পাশ,
কারে কেবা আনি কাহাতে মিলায়
বাঁধিয়া কুসুম পাশ।
একটী বলিয়া থাকে না কিছু
জগৎ দুইটী ময়,
দুটিতে মিলিয়া সৃজন জগৎ
দুটি বিনা সব লয়।
যেই এক হ'তে আইল সে দুটি
একেরই অঙ্গভূত,
চিন্তার অতীত নমহ তাঁহারে
নমিত ভক্তিপূত।

শোক সংবাদ।

আমরা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলাম যে, 'অর্চ্চনা'র পরম হিতৈষী, আগ্রা ও অযোধ্যার যুক্তপ্রদেশের একাউণ্টেণ্ট জেনারেল, বঙ্গজননীর কৃতী সন্তান, 'রাজমন্ত্রপ্রবীণ' দেওয়ান বাহাদুর জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী, এম্-এ, পি-আর-এস্, পি, এইচ্, ডি, আর ইহলোকে নাই। বহুদিন হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল, এবং গত জানুয়ারি মাসে তিনি ছুটী লইতে বাধ্য হন। এলাহাবাদ হইতে কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার রোগের কিছুমাত্র উপশম হয় নাই,

এবং তাঁহার অসংখ্য আত্মীয় ও বন্ধু উপায়ান্তর না দেখিয়া কাতরহৃদয়ে তাঁহার অমূল্য জীবন রক্ষা করিবার জন্য অগতির গতি ভগবানের নিকট আন্তরিক প্রার্থনা করিতেছিলেন, কিন্তু

"অশ্রু-বারিধারা
হায় রে, দ্রবে কি কভু কৃতান্তের হিয়া কঠিন ?"

গত ৫ই জানুয়ারি রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় নিষ্ঠুর শমন তাঁহাকে অকালে হরণ করিয়া লইয়া গেল!

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ১২ই জানুয়ারি দিবসে চন্দননগরে জ্ঞানশরণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রায় বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী বাহাদুর শিক্ষাবিভাগে উচ্চকর্ম্ম করিতেন এবং ইংরাজী, বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। বীরেশ্বর ইংরাজী পদ্যে গীতার যে অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা সত্য সত্যই প্রশংসার যোগ্য। রাঁচী জিলা এবং হুগলী কলিজিয়েট স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া জ্ঞানশরণ উচ্চশিক্ষার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। জ্ঞানশরণের ছাত্রজীবন অপূর্ব্ব সাফল্য গৌরবে গৌরবান্বিত। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া অনেক ছাত্রবৃত্তি ও পদক লাভ করিয়াছিলেন। বি-এ পরীক্ষায় তিনি গণিত ও বিজ্ঞান, এই দুইটী দুরূহ শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে উচ্চ স্থান অধিকার করেন। এম-এ পরীক্ষাতেও গণিতে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। অতঃপর তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি প্রাপ্ত হন এবং বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণার জন্য এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে এলিয়ট স্বর্ণ-পদক লাভ করেন। তিনি আজীবন জ্ঞানচর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। তিন চারি বৎসর মাত্র পূর্ব্বে তাঁহার কোনও মৌলিক প্রবন্ধের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে পি-এইচ্-ডি উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন।

কিছুদিন অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে জ্ঞানশরণ রাজস্ব বিভাগে উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত হন এবং স্বীয় প্রতিভাবলে অল্পদিনের মধ্যেই সুনাম অর্জ্জন করেন। কয়েক বৎসর হইল তিনি একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের কার্য্য করিতেছিলেন। রাজস্ব বিভাগে কার্য্যকালে মধ্যে তিনি কয়েক বৎসর মহীশূর রাজ্যে রাজস্ব সচিবের পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে তিনি মহীশূরের নানাবিধ উন্নতিসাধন করেন এবং মহীশূরাধিপতি তাঁহাকে 'রাজমন্ত্র-প্রবীণ' এই গৌরবসূচক উপাধি প্রদান করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন। গবর্ণমেণ্টও তাঁহাকে 'দেওয়ান বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

জ্ঞানশরণ মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ ও নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। ১৩১৭ সালে ফাল্গুনের 'অর্চ্চনা'য় জ্ঞানশরণের সাহিত্যসেবার যৎসামান্য পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছিল। বাণীসেবায় তাঁহার এরূপ উৎসাহ ছিল যে, সম্প্রতি এলাহাবাদে যে সাহিত্য সম্মেলন হইয়াছিল, তাহাতে তিনি অসুস্থ শরীরেও যোগদান করিয়াছিলেন।

তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, তাঁহার মধুর চরিত্র, তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, ও তাঁহার সৌজন্যের স্মৃতি তাঁহার বন্ধুগণের হৃদয়ে চিরদিন দেদীপ্যমান থাকিবে। তাঁহার অকালবিয়োগে আমরা এতদূর শোকসন্তপ্ত হইয়াছি যে, বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদিগের পক্ষে তাঁহার স্মৃতিপূজার যথোচিত অর্ঘ্য প্রদান করা সম্ভব নহে। আমরা তাঁহার শোকাকুল পরিবারবর্গকে আমাদিগের আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছি।

গ্রন্থ সমালোচনা।

"বঙ্গদেশে শিশু-প্রতিপালন" শীর্ষক একখানি পুস্তিকা আমরা উপহার পাইয়াছি। শিশু জন্মগ্রহণের পর হইতেই কি উপায় অবলম্বন করিলে তাহাকে সুস্থ ও সবলকায় করিয়া মানুষ করা যাইতে পারে, ইহাতে তাহার উপায় নির্দ্দেশিত হইয়াছে। শিশুর আহার, পথ্য, পোষাক প্রভৃতি বিশেষজ্ঞের দ্বারা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। আমাদের জরাজীর্ণ বাঙ্গালা দেশে শতকরা ৫০টী শিশু তিন বছর বয়সের মধ্যে মৃত্যুমুখে যায়। সুতরাং এই শ্রেণীর একখানি পুস্তিকার যে বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য।

পুস্তিকাখানির ছাপা ও কাগজ পরিপাটী। মেসার্স মেকেঞ্জি লায়েল এণ্ড কোং নং মিশন রো, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে একখানি বই বিনামূল্যে পাওয়া যায়। এ সুযোগ না হারাইয়া সকলেই ঘরে ঘরে ইহা গৃহ-পঞ্জীর ন্যায় রাখুন, ইহা আমাদের অনুরোধ।

আদর

২১শ ভাগ] বৈশাখ, ১৩৩১। [৩য় সংখ্যা

ওঙ্কারের মন্দির নির্ম্মাতা।

[শ্রীগুরুদাস সরকার এম-এ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দিবসোদাচানএর আর সন্দেহ রহিল না যে, যে তরুণ বালক তাঁহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়াছে সে তাঁহারই পুত্র ব্যতীত আর কেহই নহে। স্নেহবশে কাতর হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে তিনি বলিতে লাগিলেন, 'পুত্র, তুমি ভুল বুঝিয়াছ। তোমার পিতার প্রতি আমার কোনও রূপ বিরাগ জন্মে নাই, তাঁহার এবং তোমার কথা এখনও আমি সদাসর্ব্বদা চিন্তা করিয়া থাকি। মনুষ্য-সমাজে যাহাদের সহিত একত্র বসবাস করিয়াছি তাহাদের কাহারও কথা আমি বিস্মৃত হই নাই, কিন্তু কি করিব, আমি দেবকন্যা, মনুষ্য সমাজে চিরকাল বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। প্রত্যহ আমাকে কিছুক্ষণের জন্য দেবরাজ ইন্দ্রের সন্নিধানে উপস্থিত থাকিয়া আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হয়, সে সময় আমি তোমার এবং তোমার পিতার জন্য তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া থাকি। চল, তোমাকে দেবলোকে লইয়া যাই। ইন্দ্রের উদ্যানে সুবৃহৎ জলাশয়ে যে সুগন্ধি জল রক্ষিত আছে, সেই জলে তোমায় স্নান করাইব, তাহা হইলে তোমার দেহ হইতে নরদেহের স্বাভাবিক গন্ধ বিলুপ্ত হইবে। তখন তোমাকে দেবরাজের প্রাসাদে লইয়া গিয়া তাঁহার নিকট তোমার পরিচয় জ্ঞাপন করিব।" দিবসোদাচান বস্ত্রহীন পুত্রের দেহ হইতে বৃক্ষপত্র খুলিয়া লইয়া তাহাকে নিজের ওড়নাখানি পরাইয়া দিলেন এবং তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া অনায়াসেই ব্যোম পথ অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রপুরে লইয়া আসিলেন। তারপর ইন্দ্রের উদ্যানের সেই সুগন্ধি জলে পুত্রকে স্নান করাইয়া তাহাকে নিজ আবাসে লইয়া গেলেন এবং সেখানে তাহাকে দেবভোগ্য আহার্য্য সামগ্রী পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া এবং উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া দেবরাজের আবাসে লইয়া গেলেন। পোপুসনোকারের চিত্তে আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছিল। দেবরাজের সভাগৃহে প্রবেশ করিয়া সেখানকার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও রহস্যময় পারিপার্শ্বিক দৃশ্যে সে এরূপ অভিভূত হইয়া পড়িল যে, সে আর দাঁড়াইতে অসমর্থ হইয়া সংজ্ঞাহীন প্রায় কক্ষতলে পতিত হইল। ইন্দ্র সেই সময় প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইতেছিলেন। তিনি পোপুসনোকারকে দেখিয়া দিবসোদাচান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে এই মানবসন্তানটিকে প্রাসাদের মধ্যে

আনিতেছ—এ কে ?” দিবসোদাচান বলিলেন, “এ আমারই পুত্র, যখন আমি লিম্‌সেং-এর পত্নীরূপে মর্ত্তভূমে বাস করিতেছিলাম, সেই সময়েই আমি ইহাকে গর্ভে ধারণ করি।”

ইন্দ্র আদেশ করিলেন, “তরুণ যুবক, তুমি উঠিয়া দাঁড়াও”। পোপুস্‌নোকারের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, সে দেবরাজের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত হইল। ইন্দ্র তাহাকে প্রাসাদ মধ্যে লইয়া গেলেন এবং পৃথিবীর যে প্রদেশে সে বাস করে তৎসম্বন্ধে শত সহস্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পোপুস্‌নোকার তাঁহার প্রশ্নাবলীর যে সকল উত্তর দিতেছিল, ইন্দ্র তাহাতে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন।

দিবসোদাচানও ইন্দ্রকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, “আমার এ পুত্রটি নক্সা অঙ্কন করিতে, মূর্ত্তি তক্ষণ করিতে এবং দেবমন্দির ও দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিতে বড়ই তৎপর। সকলেই তাহার কার্য্যকুশলতা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু বলিতে কি, এ কখনও কাহারও নিকট এসকল বিদ্যা শিক্ষালাভ করে নাই, নিজেই বুদ্ধি করিয়া এইসকল কাজ করিয়া থাকে।”

ইন্দ্র বলিলেন, “শিক্ষকের নিকট উপদেশ না পাইয়া যে ব্যক্তি শিক্ষা লাভ করে, সে অন্ধের সমতুল্য, কার্য্যক্ষেত্রে তাহাকে নিতান্ত একাকীই অগ্রসর হইতে হয়, কাহারও নিকট পরামর্শ লইবারও সুবিধা ঘটে না। তোমার পুত্র যদি কেবল অশিক্ষিত পটুত্বমাত্রেরই অধিকারী হয়, তাহা হইলে তাহাকে আমার শিল্পশালায় দেবপুত্রদিগের নিকট পাঠাইয়া দাও। তাহাদের অধীনে কর্ম্ম করিয়া এবং তাহাদের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ শিল্পে অধিকার লাভ করিবে এবং শিক্ষা সমাপ্তির পর মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া যাইবে, কারণ মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া কাহারও দেবলোকে বাস করিবার অধিকার নাই।”

যে সকল দেবপুত্রগণ নির্ম্মাণ-কুশলী ও শিল্প বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, পোপুস্‌নোকার তাহাদিগেরই সন্নিধানে শিক্ষালাভার্থ গমন করিল। এবং তথায় তক্ষণ, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, বাদ্য, জলস্থলচারী অপূর্ব্ব নৌ-যানাদি নির্ম্মাণ, লৌহ ঢালাই এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের উপর খোদাই কার্য্য প্রভৃতি বিবিধ শিল্প সে সমগ্র রূপে আয়ত্ত করিয়াছিল। বাস্তু শিল্প প্রয়োজ্য “লেপ” প্রভৃতি সে এরূপ সুন্দর ভাবে প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিল যে, তাহা শুধু মৃত্তিকার উপর মাখাইয়া দিলেই উহা প্রস্তরে পরিণত হইত (১)। দেবকর্ম্মীগণ প্রশংসা বচনে পোপুস্‌নোকারকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, “তুমি এক্ষণে যাহা কিছু নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছ তাহা সহস্রবর্ষ বিদ্যমান থাকিবে আর আমরা যাহা নির্ম্মাণ করি তাহা একজন নরপতির রাজত্বকাল অতিক্রম করিবে না। যদি কোন রাজা এক্ষণে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আমাদিগকে একটি দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিতে আহ্বান করেন, আমরা তাহা এক মুহূর্ত্তে নির্ম্মাণ করিয়া দিব বটে, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সেই নৃপতি দেহত্যাগ করিবেন মন্দিরটিও সেই মুহূর্ত্তেই লোকলোচন হইতে অন্তর্হিত হইবে। তাহা হইলেই বুঝিয়া দেখ যে, তোমার নির্ম্মাণ-শক্তি ও কারু-কৌশল আমাদিগের অপেক্ষা কত শ্রেষ্ঠতর।” দেবরাজ্যের শিল্পশালাধ্যক্ষ দেবপুত্র ইন্দ্রকে জানাইলেন যে, পোপুস্‌নোকারের শিল্প শিক্ষা আশ্চর্য্যরূপে ফলবতী হইয়াছে। ইন্দ্র শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং স্থির করিলেন যে, এখন হইতে পোপুস্‌নোকারই বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের শিল্প-শিক্ষকের স্থান অধিকার করিবেন। দেবরাজ আদেশ করিলেন যে, মানবদিগের মধ্যে প্রত্যেক কারুশিল্পী ও বাস্তু-নির্ম্মাতাকেই একখানি থালায় করিয়া এক বোতল মদ্য, একখণ্ড রৌপ্য, এবং চারিখণ্ড কদলীপত্রে যথাক্রমে পান, সুপারী, পাঁচ হাত পরিমিত শ্বেত বস্ত্র, অন্নপাত্র ও বর্ত্তিকা পোপুস্‌নোকারকে অর্ঘ্য বা উপহারস্বরূপ প্রদান করিতে হইবে। যদি কেহ কোন প্রয়োজনীয় (important) কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে পোপুস্‌নোকারকে অর্ঘ্য নিবেদন না করে, তাহা হইলে তাহার চক্ষুতে ছানি পড়িয়া যাইবে, সূর্য্যের আলোক আর সে দেখিতে পাইবে না।

(১) বৃহৎ সংহিতায় (Brihat Samhita, Dr. H. Kern's Translation, Chap. LVII, page 44. Verspreide Geschriften II. 1914) এই প্রকার একটি লেপ বজ্রলেপ নামে অভিহিত হইয়াছে, এবং ঐ গ্রন্থে উহার নির্ম্মাণ প্রণালীও বিবৃত হইয়াছে।

এই সকল কথা বলিতে বলিতে দেবরাজের প্রাঃ কেৎ মেয়ালেয়ার কথা মনে পড়িল। মনে পড়িবেই তিনি তৎক্ষণাৎ ব্যোমপথে কম্বোজরাজ্যে উপস্থিত হইলেন। মর্ত্তালোকে তখন অন্ধকার রাত্রি। দেবরাজের দেহ-নিঃসৃত প্রভামণ্ডলের উজ্জ্বলতায় মানবদিগের চক্ষু ধাঁধিয়া গেল, সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কিসের এ উজ্জ্বল আলোক এইরূপে হঠাৎ আকাশ উদ্ভাসিত করিয়া ফেলিয়া ইন্দ্র রাজার দেবমন্দিরে আবির্ভূত হইলেন? মন্দিররক্ষক-গণ দৌড়াইয়া রাজা দেবুনগাস্কারকে খবর দিতে গেল। তাহারা রাজ-সন্নিধানে গিয়া জানাইল যে, কে এক অজ্ঞাত পুরুষ নভোমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাকে দেখিতে মানুষের ন্যায় বটে কিন্তু তাঁহার দেহের বর্ণ নীলাভ ও অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল। তিনি এক্ষণে রাজার দেবালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন।

দেবুনগাস্কার দ্রুতপদে মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন এবং ইন্দ্রকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন।

ইন্দ্র দেবুনগাস্কারকে দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন, "রাজন্; তুমি কি আমার পুত্রকে জান?"

দেবুনগাস্কার বলিলেন, "না,আমি তো তাঁহাকে চিনি না।"

ইন্দ্র। প্রাঃ কেৎ মেয়ালেয়ার জন্ম কি প্রকারে ঘটিয়াছিল?

রাজা। এক প্রকার নীলবর্ণ আলোকে আকাশ প্রপূরিত হয়, তখনই রাণীর দেহে কতকগুলি পুষ্পমাল্য বর্ষিত হইয়াছিল। ইহার পরই রাণীর গর্ভ সঞ্চার ঘটে।

ইন্দ্র। সে গর্ভের পুত্র আমারই পুত্র।

দেবুনগাস্কার প্রাঃ কেৎ মেয়ালেয়াকে ডাকাইলেন। ইন্দ্র তাহাকে জানুর উপর উপবেশন করাইয়া বলিতে লাগিলেন, "পূর্ব্বে আমি "মথ্ মাণুভ" (মঘমানুষ?) নামে আহূত হইতাম (২)। আমি কত রথ্যা, কত জাঙ্গাল, কত বাঁধ, কত সেতু ও কত শালা নির্ম্মাণ করিয়াছি; আমার সমস্ত বিত্ত (ধনসম্পত্তি) আমি দরিদ্রকে বিলাইয়া দিয়াছিলাম, তাহারই পুরস্কারস্বরূপ ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছি। কম্বোজ-রাজ্যের উপর আমার দয়ার উদ্রেক হয়। উহা অল্পদিনই সংস্থাপিত হইয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত কোন বীর্য্যবান্ ব্যক্তি এ দেশে জন্মগ্রহণ করে নাই। যাহাতে তুমি সুদীর্ঘকাল সুখে জীবন অতিবাহিত করিতে পার সেইজন্যই আমি তোমাকে জন্ম দিয়াছিলাম। কিন্তু মানবেরা আধুনিক কালে অতি অল্পদিনই জীবিত থাকে, খুব অল্প লোকই শতায়ু হইতে পারে। আমি তোমাকে স্বর্গলোকে আমার রাজপুরীতে লইয়া যাইতেছি সেখানে গিয়া তোমাকে তত্রস্থ জলাধারের জলে স্নান করাইব, তাহা হইলে তুমি দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারিবে।"

ইন্দ্র প্রাঃ কেৎ মেয়ালেয়াকে উরুর উপর বসাইয়া স্বর্গ-রাজ্যে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার উদ্যানের সেই জলাধারে তাহাকে সাতদিন সাতবার করিয়া স্নান করাইলেন; তাহার পর তাহাকে তাঁহার প্রাসাদে লইয়া গেলেন। যাহাতে প্রাঃ কেৎ মেয়ালিয়া চারিশত বৎসর পরমায়ু লাভ করে সেই উদ্দেশ্যে মন্ত্র পাঠ ও দেহে পবিত্র বারি অভি-সিঞ্চিত করাইবার জন্য দেবরাজ তথায় সপ্ত ব্রহ্মকে আমন্ত্রণ করিলেন।

এই অনুষ্ঠানটি যথারীতি সুসম্পন্ন হইলে পর ইন্দ্রের আদেশক্রমে দেবরথে অশ্ব সংযোজিত হইল। প্রাঃ কেৎ মেয়ালিয়া সারথীদিগের হস্তে ন্যস্ত হইলেন এবং দেবরাজের রাজপুরীর চতুর্দ্দিকস্থ সৌন্দর্য্য দেখাইবার উদ্দেশ্যে তাহাকে তাহারা সেই উড্ডীয়মান রথে লইয়া পুর-পরিক্রমণ করিতে বহির্গত হইল। তাঁহার ইচ্ছামত তাঁহাকে সমস্ত স্থান দেখাইয়া সারথীগণ অবশেষে রথ দেবলোকের অশ্বশালায় ঘুরাইয়া আনিল।

ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি দেখিয়া শুনিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছ তো?"

বালক উত্তর দিল, "সন্তোষের কথা আর কি বলিব, আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছি।"

ইন্দ্র বলিলেন, "কম্বোজরাজ্য আমি তোমাকেই দান করিলাম। যদি এখানে এমন কোনও স্থাপত্য কীর্ত্তি লক্ষ্য

(২) "মথ্ মানুভ" শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত "মঘবন্" শব্দ হইতেই হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। 'মঘ' শব্দ যজ্ঞ জ্ঞাপক।

করিয়া থাক, যাহার অনুরূপ তুমি স্বীয় রাজ্যে নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমার মনের অভিপ্রায় আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল। আমি একজন স্থপতি পাঠাইব, সে অনায়াসেই উহা তোমার রাজ্যে নির্ম্মাণ করিয়া দিবে।"

প্রাঃ কেৎ মেয়ালিয়া তখন মাত্র দ্বাদশবর্ষীয় বালক। দেবরাজের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া সে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। সে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল 'আমার ক্ষুদ্র রাজ্যে আমি এমন কিছুই নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইব না যাহা দেবরাজের রাজপুরীর ন্যায় সুন্দর হইবে; বরং তাঁহার সমকক্ষতার চেষ্টা করিলে তিনি বিরক্ত হইবারই সম্ভাবনা'। তাই সে প্রকাশ্যে বলিল, "আপনার গোশালার ন্যায় একটি সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা আমার মনে উদিত হইতেছিল।"

ইন্দ্র শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমার গোশালাই তোমার চক্ষে ভাল লাগিয়াছে?"

অতঃপর পোপুসনোকারকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দেখ, তোমার মানব ঔরসে জন্ম, স্বর্গরাজ্যে তুমি বাস করিবে কি করিয়া? আমি তোমাকে কম্বোজরাজ্যে পাঠাইতেছি, সেখানে যাইয়া তুমি আমার পুত্রের জন্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ কর; আমার গোশালার ন্যায় যেন উহা দেখিতে সুন্দর হয়। যখন তোমার এই বাস্তু-নির্ম্মাণ শেষ হইবে তখন আমার পুত্রের অভিষেক সুসম্পন্ন করাইবার জন্য আমি ভূতলে অবতীর্ণ হইব এবং তাহাকে সিংহাসনে আরোহণ করাইয়া যশোরাশিতে মণ্ডিত করিয়া দিব।"

পোপুসনোকার দেবরাজের গোশালাটি উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লইল। তাহার এই কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর ইন্দ্র রথ প্রস্তুত করিবার জন্য সারথীকে আদেশ দিলেন এবং প্রাঃ কেৎ মেয়ালেয়া ও পোপুসনোকারকে রথে আরোহণ করাইয়া কম্বোজ দেশে প্রেরণ করিলেন।

পোপুসনোকার বিলম্ব না করিয়া রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিল। ইহা ৬২০ বৌদ্ধাব্দের কথা। ভিত্তি খনন করাইয়া যে সকল মৃত্তিকা সঞ্চিত হইল তাহা ছাঁচে গেলিয়া খোদাই কার্য্যের ন্যায় উপরিভাগে নানারূপ কারুকার্য্য সম্পন্ন করা হইল। জনৈক গ্রাম্য প্রধানের সোভান নামে একটি পুত্র পোপুসনোকারের অধীনস্থ কর্ম্মচারী রূপে নিযুক্ত ছিল। সোভান নির্ম্মাণ কার্য্য চালাইতে সক্ষম হইলে পর পোপুসনোকার চূণ প্রস্তুত করিবে বলিয়া সমুদ্রের ঝিনুক প্রভৃতি সংগ্রহ করার জন্য অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিল। ফিরিয়া আসিবার পথে কম্পং লেং প্রদেশের সমরেন স্যান্ নামক স্থানে পৌঁছিলে পর জাহাজের তলদেশ দিয়া জল প্রবেশ করিতে লাগিল। পোপুসনোকার জাহাজখানি বাঁচাইতে পারিল বটে, কিন্তু তাহাকে সংগৃহীত শম্বুক ও শুক্তিগুলি সমস্তই পরিত্যাগ করিতে হইল। সমরেন্ সেনের মৃত্তিকা-ভ্যন্তরে যে আজ পর্য্যন্তও এরূপ বহুল পরিমাণে সামুদ্রিক শম্বুকাদির দেহাবরণ পাওয়া যায়, তাহার কারণ ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

পোপুসনোকার পুনরায় অনেকগুলি অর্ণবযান সঙ্গে লইয়া সমুদ্রাভিমুখে ফিরিয়া গেল এবং প্রভূত পরিমাণে ঝিনুক প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাহা হইতে যথেষ্ট পরিমাণ চূণ প্রস্তুত করিল। তাহার পর আর তিনখানি জলযান সজ্জিত করিয়া তিলের অনুসন্ধানে বহির্গত হইল। দক্ষিণের পূর্ব্বদিকে কোয়গানপম্ নামক স্থানে ঝড় উঠিয়া একখানি জাহাজ উল্টাইয়া গেল। পোপুসনোকার জাহাজে বোঝাই সমস্ত দ্রব্য ফেলাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার কৌশলে তিলের স্তূপ জমাট বাঁধিয়া প্রস্তরে পরিণত হইয়া তথায় একটি দ্বীপের সৃষ্টি করিল। সেইজন্যই এখন পর্য্যন্ত কোয়হান দ্বীপের মৃত্তিকা কৃষ্ণ তিলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, যদিও ইহাতে অপর কোনও প্রকার মৃত্তিকা মিশ্রিত নাই (৩)। অপর দুইখানি পোতে যে পরিমাণ তিল আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, পোপুসনোকার তাহার সাহায্যে এক প্রকার প্রলেপ দ্রব্য প্রস্তুত করিল। সে মৃত্তিকা দিয়া যে সকল হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহার উপরিভাগে সেই লেপ প্রয়োগ করিতেই উহা সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তরে পরিণত হইয়া গেল। আমরা এখন যেরূপ ভারা বাঁধিয়া একটি একটি করিয়া স্তম্ভ

(৩) তিল না হউক, তিসি (মসিনা) যে বজ্রলেপের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইত, তাহা বৃহৎ সংহিতা হইতে জানা যায়।

নির্ম্মাণ করিয়া গৃহাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকি, পোপুস-নোকার নির্ম্মাণকালে সে প্রথা অবলম্বন করিত না। সে শুধু মৃত্তিকা সাহায্যেই পঞ্চ শিখরযুক্ত রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল এবং তাহাতে সেই লেপ প্রয়োগ করিতেই উহা প্রস্তরে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। সেইজন্যই ছাদের খিলানগুলিতেও কোথাও কড়ি বরগার চিহ্ন দেখা যায় না।

প্রাসাদ নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইলে সে যথাস্থানে উপযুক্ত বর্ণ প্রয়োগ করিয়া উহা সুন্দররূপে রঞ্জিত করিয়াছিল। তাহার এই স্থাপত্য কীর্ত্তি দেখিতে প্রত্যেকাংশে ইন্দ্রের গোশালারই অনুরূপ এবং উহা যে বিশেষ নয়নাভিরাম হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। প্রাঃ কেৎ মেয়ালেয়া এই অপূর্ব্ব রাজ-আবাস দর্শন করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পোপুস-নোকারের যথেষ্ট সাধুবাদ দিয়াছিল এবং এই প্রকার সুন্দর কারুকার্য্যভূষিত বহু হর্ম্ম্য মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিবার জন্য তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিল।

ইন্দ্র বহুসংখ্যক দেবতা সমভিব্যহারে মর্ত্ত্যলোকে আসিয়াছিলেন, এবং অভিষেক কালে পুত্রের মস্তকে অভিষেক বারি স্বয়ং সিঞ্চিত করিয়াছিলেন। তিনি নূতন রাজার নাম দিয়াছিলেন "অরণপুল পিয়ারসো প্রাঃ কেৎ মেয়ালেয়া" এবং কম্বোজরাজ্যেরও এই উপলক্ষ্যে প্রকৃত নামকরণ ঘটে। অভিষেক-সম্পর্কীয় উৎসবাদি শেষ হইলে পর ইন্দ্র সঙ্গী দেবগণের সহিত স্বর্গরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ইহার পরে প্রাঃ কেৎ মেয়ালেয়া একদিন লক্ষ্য করিলেন প্রাসাদের একটি চূড়া ঠিক সোজা হইয়া নাই। তিনি পোপুসনোকারকে ডাকাইয়া প্রাসাদের এই শিখরটি যাহাতে ঋজু ভাবে অবস্থিত থাকে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। পোপুসনোকার বলিল, "মহারাজ, একজন স্ত্রীলোককে একটি পাকা কুমড়া সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়া দিন। সে উহা দ্বারা আঘাত করিলেই প্রাসাদ শিখর পূর্ব্বের ন্যায় ঋজু ভাবে অবস্থিত থাকিবে।" তাহার কথা শুনিয়া প্রাঃ কেৎ মেয়ালেয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব কি অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকিতেছ? শিখরটি তো পাথরে তৈয়ারী। কুমড়া দিয়া আঘাত করিলে উহা সোজা হইবে কি করিয়া?"

পোপুসনোকারও এই কথায় বিরক্ত হইয়া উত্তর দিলেন, "মহারাজ যদি আমার কথায় বিশ্বাস না করেন তাহা হইলে শিখরটি যেরূপ হেলিয়া পড়িয়াছে তেমনিই থাক্, পরে এইটির ন্যায় অঙ্কোরের অন্যান্য শিখরগুলিও হেলিয়া পড়িবে দেখিবেন। আমার কথা মিথ্যা হইবে না।"

ইহার কিছুদিন পরে প্রাঃ কেৎ মেয়ালেয়া পোপুস-নোকারকে তিন পিকুল পরিমাণ লৌহ দিয়া আদেশ করিলেন যে, তাঁহার শক্তিমত্তার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহাকে যেন একখানি তরবারী নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হয়।

পোপুসনোকার লোহা গলাইয়া তাহার মধ্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও দৃঢ়তম অংশটুকু মাত্র গ্রহণ করিলেন। তিন পিকুল লৌহ হইতে তিনি যেটুকু সার ভাগ বাহির করিয়া লইলেন তাহার দ্বারা ধান্যপত্রের ন্যায় অতি ক্ষুদ্র ও অপ্রশস্ত ফলকযুক্ত একটি মাত্র তরবারী নির্ম্মিত হইল, কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও উহা এরূপ তীক্ষ্ণধার যে, সেই তরবারী দিয়া কোন ব্যক্তিকে দুই খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেও তাহার দেহ যে দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারিবে না, পূর্ব্বেরই মত কথাবার্ত্তা কহিতে থাকিবে, তাহার মনে হইবে আঘাত বুঝি এখনও করা হয় নাই। কেবল তাহাকে কেহ ধাক্কা দিলে সে দুইখণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িয়া যাইবে। সেই তরবারীর দ্বারা মৃত্তিকার একটি জলপূর্ণ কলসী দ্বিধা বিভক্ত করিয়া কাটিয়া ফেলিলেও যতক্ষণ না কেহ উহা স্পর্শ করিবে ততক্ষণ সেই কলসী হইতে এক ফোঁটা জলও পড়িবে না। কেহ সেই কলসীটি স্পর্শ করিলে পর তবে উহার দুইখণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া যাইবে, সমস্ত জলও সঙ্গে সঙ্গে গড়াইয়া পড়িবে। পোপুসনোকার অতি যত্নের সহিত এই অপূর্ব্ব অসিখানিতে ধার দিয়া রাজাকে উপহার দিবার জন্য আনয়ন করিল।

রাজা এই ক্ষুদ্রাকৃতি শস্ত্র দেখিবামাত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং পারিষদদিগের সম্মুখেই পোপুসনোকারের প্রতি বিষদিগ্ধ তিরস্কার বর্ষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"তুই নিজের ব্যবহারে লাগাইবার জন্য, আমি যে সব লোহা দিয়াছিলাম, তাহা চুরি করিয়াছিস্, তা' না হইলে এ তরবারী এত ছোট হইবে কেন?"

পোপুসনোকার ক্রোধান্বিত হইয়া বলিল, "আমি আর এ কম্বোজরাজ্যে থাকিব না, আমি চীন দেশে ফিরিয়া চলিলাম।" এই কথা বলিয়া সে তখনই রাজসভা ত্যাগ করিয়া গেল। তরবারীর ধারের দিক কাষ্ঠাচ্ছাদিত গৃহ কুটিমের উপরেই ন্যস্ত ছিল, সে উহা ঐ ভাবেই টানিয়া লইয়া চলিল। পোপুসনোকার চলিয়া গেলে পর সকলে লক্ষ্য করিল যে, যে সকল তক্তাগুলির উপর দিয়া সে উহা টানিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহা সমস্তই খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে।

প্রাঃ কেৎ মেয়ালেয়া তখনই পোপুসনোকারকে ডাকিবার জন্য এবং তাহার নিকট হইতে তরবারীখানি ফিরিয়া আনার জন্য একজন দূত প্রেরণ করিলেন, সে কিন্তু আর রাজার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইল না। তাহার সেই সযত্ন-গঠিত তরবারী এক বৃহৎ হ্রদে ফেলিয়া দিল, তাহার পর সে একখানি (চীনা) পোতে আরোহণ করিয়া পাইল তুলিয়া দিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিল। তাহার জন্মস্থান চীন দেশে পঁহুছিলে পর সে সেখানেই বসবাস করিতে লাগিল এবং তদ্দেশীয় লোকদিগকে শিল্প শিক্ষা দিতে লাগিল।

পোপুসনোকারের প্রকৃত ইতিহাস ইহাই। খুব অল্প লোকেই এ সকল কথা জানে, এবং জানে না বলিয়াই নানারূপ জল্পনার প্রশ্রয় দিয়া মিথ্যা করিয়া বলে যে, স্বয়ং দেবতারা আসিয়া আঙ্কর অথবা ওঙ্কারধাম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। (৪)

---

(৪) ফরাসীরাজ্যের অন্তর্গত সুদূর প্রাচ্যের স্থাপত্য সম্বন্ধে যদি কাহারও কৌতূহল জন্মিয়া থাকে, তাঁহাকে গত অক্টোবর সংখ্যার "রূপম" (Rupam) পত্রে প্রকাশিত 'Some general observations on the temple of Angkor' প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

উপকথা হইতে ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিষ্কাশন গালিভারের ভ্রমণ বৃত্তান্তে বর্ণিত শশা হইতে সূর্য্য রশ্মি নিষ্কাশনের চেষ্টার ন্যায়। এই সকল মন্দিরাদির নক্সা প্রভৃতি যে দেবভূমি ভারতের আদর্শে গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ওঙ্কারস্থ মন্দিরের বাস্তু-বিন্যাস ইন্দ্রের গোলামী না হউক, দক্ষিণ দেশীয় প্রাকার যুক্ত মন্দিরাদির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। চীন প্রাচ্য ভূখণ্ডে হেকমতের জন্য বহুদিন হইতে বিখ্যাত। হয় তো রাজাদেশে মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যে কোনও সুদক্ষ চীনা স্থপতি বা কারিকর নিযুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু স্বল্পবুদ্ধি রাজার মূল আদর্শ বিষয়ে গোঁড়ামি কিম্বা তাঁহার শিল্পবিষয়ে রসগ্রাহিতার অভাবে বিরক্ত হইয়া আত্মসম্মান ও আত্মমর্য্যাদা রক্ষা সম্বন্ধে তৎপর স্বাধীনচেতা শিল্পী তাঁহার রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যায়। রেশম বস্ত্র বয়ন শিল্পটি চীনে যে কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, শকুন্তলায় ব্যবহৃত চীনাংশুক শব্দ অদ্যাপি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

বিসর্জ্জন।

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(৫)

গম্ভীর মুখে জ্যোতিশ বলিল, "কাল রাত্রে ছিলে কোথায় ?"

কমনীয় তাহার মুখ পানে চাহিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল। সোজা সত্য কথাই সে বলিল—"বাইজির ঘরে"।

পিছন হইতে মতি একটা টিপনি কাটিল, "সোজা বাইজির ঘরে। এ যে—যার ধন তার ধন নয় নেপো মারে দই।"

নিতাই বলিল, "তাই বটে।"

জ্যোতিশ চুপ করিয়া রহিল, একটা কথাও কহিল না। ব্যাপারটা কিছু সাংঘাতিক গোছের হইয়া গিয়াছে দেখিয়া কমনীয় সরিয়া গেল।

হেম চিন্তাপূর্ণ মুখে বলিল, "ডাক্তার লোকটা ভারি পাজি হে, দেখলে না, সতীটাকে কি ক'রে হাতিয়ে নিলে। আমি প্রত্যেক দিন খোঁজ নেই, ডাক্তার দিনে তিন বার চার বার তার বাড়ী যাওয়া আসা করে। আর সে মাগীটা কি বজ্জাত! অন্নদাতা জমীদার, তাঁর একটা কথা

রাখতে পারলে না, ডাক্তারের কথা রাখলে? সুন্দর চেহারাটা দেখছি সব জায়গাতেই মান পায়। পয়সাও হার মেনে যায়।"

নিতাই বলিল, "আর এই বেটী বাইজির আক্কেলখানা দেখ। একটা কথা বলে না, যেটুকু নাচ গান সেইটুকু মাত্র। একটা ইয়ারকি ক'রে কাছে গেছি, আর মাগি ফস ক'রে কোমর হ'তে একটা ছোরা বার ক'রে চোখ রাঙ্গিয়ে বললে—'দেখ, পয়সার সঙ্গে গানের সম্পর্ক, পয়সা পাব, গান শুনাব; কথা বলো না, কাছে এস না।' বাবা, তার সেই রাঙ্গা চোখ আর ছোরার বহর দেখেই শর্ম্মা তিন লাফে সেখান হ'তে প'ড়ে আকার দিলে। বাইজির আবার অত লম্বা কথা কেন? ও মাগী খুনে তা আমি বলছি।"

জ্যোতিশ বিমর্ষ মুখে বলিল, "যাক, ও সব কথায় আর কাজ নেই। ডাক্তারের কোন কাজ কর্ম্ম নেই, অনর্থক কেবল একশ টাকা ক'রে মাসে মাইনে গুণছি। আমি ওকে বিদায় দেব ভাবছি। কাল মাসের শেষ তারিখ। মাইনেটা কাল চুকিয়ে দিয়ে বলব চলে যেতে।"

সেদিন সতীর বাড়ী গিয়া কমনীয় দেখিল তাহার স্বামীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। সে কেবল হিক্কা তুলিতেছে, ও হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে।

সতী স্বামীর মাথা কোলে লইয়া বসিয়াছিল। কমনীয় ঔষধ ও দুইটা বেদানা আনিয়া দাঁড়াইতেই সে আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল—"বাবা, আর কাকে ওষুধ দিতে এসেছ, কাকে বেদানা দিতে এসেছ? সবই যে ফুরিয়ে যায়, আর যে আটক ক'রে রাখতে পারছি নে।"

কমনীয় ঔষধ বেদানা ফেলিয়া সতীর স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া পড়িল, পরীক্ষা করিয়া বিমর্ষ ভাবে সে সতীর পানে চাহিল।

বেলা তখন বারটা বাজিয়া গিয়াছে। সে স্নানাহার সারিয়া আসিয়াছে। সতী তখনও গৃহকর্ম্মে হাত দেয় নাই। বাসী কাজ তাহার অমনিই পড়িয়া আছে।

সতী কাঁদিয়া বলিল, "কি হবে বাবা?"

আর তখন প্রবোধ দানের চেষ্টা বৃথা। কমনীয় একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল, চোখ দুইটা সজল হইয়া আসিয়াছিল, তাড়াতাড়ি সামলাইয়া লইয়া রুদ্ধ কণ্ঠে পরিষ্কার করিয়া বলিল, "এখন কেবল ভগবানকে ডাক মা, তিনি ভিন্ন মানুষের আর হাত নেই।"

সতী চোখ মুছিতে মুছিতে রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "ভগবানকে দিনরাতই তো ডাকছি, বাবা, আমার এ প্রার্থনা ছাড়া জগতে তো আর কোনই প্রার্থনা নেই। এত যে ডাকলুম, এত যে মাথা খুঁড়লুম, সে সবই কি ব্যর্থ হ'ল বাবা, ভগবান আমার প্রার্থনা কানে নিলেন না?"

কাঁদিয়া সে স্বামীর বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল। কমনীয় আর অশ্রু সামলাইতে পারিল না, তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছিল। সে অনেকের মৃত্যুকাল দেখিয়াছে, কিন্তু এমন দুঃসময়যুক্ত মৃত্যুকাল কাহারও দেখে নাই। এই স্ত্রী দিবারাত্রি বিপদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল, স্বামীর পানে চাহিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছে। স্বামী যে ভাল হইবেন—সতীর মনে সেই আশাই ছিল, আজ সে একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; আজ তাহার নিকট জগৎ একেবারেই শ্মশান সমান বোধ হইতেছে। আদর্শ ভালবাসা, আদর্শ আত্মত্যাগ আর কাহাকে বলে? কে বলে জগতে সতী নাই? সতীর প্রকৃষ্ট আদর্শ আছে বলিয়াই জগতে যে আজও দিন আসে, নচেৎ জগৎ যে চির অন্ধকারেই ঢাকা থাকিয়া যাইত।

কমনীয় সতীর হাত ধরিয়া টানিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "ওঠ মা—অমন ক'রে এখনই কেঁদ না। কাঁদবার সময় তো যথেষ্ট পাবে মা, আজীবন কাল আছে, কেঁদো—কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু মা, এখন না। তোমার স্বামী তোমার দিকে কি ক'রে তাকিয়ে আছেন দেখ, চোখ দিয়ে জল পড়ছে। কথা বন্ধ হয়ে গ্যাছে, চোখে ব্যথা ফুটছে। ওঠ মা সতী রাণী, এখন কেঁদে এঁর শেষ সময়ে সেবা করার আক্ষেপটা মনে পুষে রেখ না। মনের আশা মিটিয়ে সেবা ক'রে নাও।"

সতী একটু শান্ত হইয়া উঠিয়া বসিল। সযত্নে স্বামীর চোখের জল মুছাইয়া দিয়া, সেই মৃত্যু-মলিন মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "কাঁদছ কেন তুমি? ভয়

কি, সেরে উঠবে'খন। ডাক্তার বাবু এসেছেন, এখনি ভাল ওষুধ এনে দেবেন। আবার কাঁদছ? না:—তুমি দেখছি—"

নিজেই সে কাঁদিয়া উঠিয়া তখনি স্থির হইয়া গেল, আবার স্বামীর চোখ মুছাইয়া দিল।

কমনীয় রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "কিছু খাইয়েছ?"

সতী বলিল, "সকালে সুর্যী করে খাওয়াতে গেলুম, গিলতে পারলেন না। একটু সাবু ক'রে খাইয়েছি মাত্র।"

ব্যস্ত হইয়া কমনীয় বলিল, "দুধ দেওয়া হয় নি?"

সতী বলিল, "কে দুধ আনতে যাবে বাবা? আমি এঁকে নিয়ে বসে আছি। জমীদারের বন্ধুরা সকলকে ভয় দেখিয়েছে, যে সাহায্য করবে তাকে ভিটেচ্যুত করবে। রোজ বাজার হ'তে দুধ কিনে এনে খাওয়াই। আজ তো যেতে পারি নি।"

সতী আবার কাঁদিতে লাগিল।

কমনীয় বলিল, "কেঁদনা মা, আমি এক্ষুনি দুধ কিনে আনছি।" তাড়াতাড়ি একটা পাত্র খুঁজিয়া লইয়া সে বাজারে চলিয়া গেল। এই পরার্থপর যুবকের যে কতদূর তাহার জন্য ত্যাগ স্বীকার, তাহা কল্পনা করিয়া সতীর হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তাহার চোখ দিয়া আবার জল গড়াইয়া পড়িল।

শীঘ্রই দুধ লইয়া কমনীয় ফিরিয়া আসিল। সতীকে উঠাইয়া দিয়া রোগীকে লইয়া সে বসিয়া রহিল।

সেইরূপ মূক অবস্থায় সে দিন রাত কাটাইয়া পরদিন ঠিক দুপুর বেলায় সতীর স্বামী ইহলোক ত্যাগ করিল।

মৃত স্বামীর বক্ষের উপর সতী মুখ রাখিয়া পড়িয়া রহিল। কমনীয় হঠাৎ তাহার এ নীরব ধ্যান ভাঙ্গাইতে সাহস করিল না। অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ডাকিল, "মা—"

সতী নড়িল না।

কমনীয় বার বার ডাকিল, কিন্তু সতী সম্পূর্ণ নীরব, নিস্পন্দ।

কমনীয় খানিক নীরব থাকিয়া আবার ডাকিল, "মা, ওঠো, অমন ক'রে আর পড়ে থাকা অনর্থক। ও দেহ আঁকড়ে পড়ে থাকলে আর কি হবে মা, ওতে কি আর জীবন আছে?"

সতী মুখ তুলিল, তাহার চোখ তখন লাল হইয়া গিয়াছে, চোখ মুছিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "তা' জানি বাবা, কিন্তু এই শেষ যে, আর তো এ বুকে মুখ রাখতে পারব না বাবা এখনি যে এ দেহ চিতায় তুলে দিতে হবে!"

কমনীয়ের চোখ ভরিয়া খানিকটা জল আসিয়া দাঁড়াইল, গলা ঝাড়িয়া বলিল, "তা জানি মা যে এই শেষ, কিন্তু আর কতক্ষণ এ দেহ আটক ক'রে রাখবে মা? ছেড়ে দাও, সৎকার ক'রে আসা যাক।"

সতী একবার প্রাণপণ আবেগে সেই মৃত দেহখানা চাপিয়া ধরিয়া ছাড়িয়া দিল—"নিয়ে যাও বাবা, আর আমার দরকার নেই, আমার সকল আশা মিটিয়ে নিলুম, সকল সাধ পুরিয়ে নিলুম, একবার এই দেহখানা ছুঁয়ে নিয়ে।"

দুই হাতে মুখ চাপিয়া ধরিয়া সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কমনীয় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া লোক যোগাড় করিতে গেল।

জমিদারের ভয়ে প্রথমতঃ কেহ আসিতে চাহিল না। কমনীয় অনেক করিয়া বলার পর কয়েকজন প্রতিবাসী আসিয়া জুটিল। সতীর নিকট একটী বৃদ্ধা রমণীকে রাখিয়া কমনীয় মৃতদেহ লইয়া শ্মশানে চলিল।

সন্ধ্যার একটু পরে সে যখন ফিরিল, স্নানান্তে সতী বারাণ্ডায় চুপ করিয়া বসিয়া আছে, বৃদ্ধা প্রতিবেশিনী নিকটে বসিয়া ঝিমাইতেছিল। বারাণ্ডার এক পাশে প্রচুর ধুমোদ্গীরণ করিয়া একটী কেরোসিন ল্যাম্প টিপ টিপ করিয়া জ্বলিতেছিল। বাড়ীটায় শোকের গভীর হাহাকার বহিয়া যাইতেছিল। সতী আর কাঁদিতেছে না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া আর কাঁদিবার শক্তি তাহাতে ছিল না। থাকিয়া থাকিয়া এক একটা দীর্ঘশ্বাস তাহার সমস্ত দেহটা আলোড়িত করিয়া বহিয়া যাইতেছিল।

কমনীয় শান্তভাবে বারাণ্ডার ধারে বসিয়া পড়িল। সতী একবার তাহার পানে চাহিয়া মুখ ফিরাইল।

কতক্ষণ এইরূপ নীরব ভাবে কাটিয়া গেল। সতী

একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সব শেষ হয়ে গেল বাবা ?"

কমনীয় রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, মা, সব শেষ হয়ে গেল !"

সতী তেমনি করুণ সুরে বলিল, "এমনি করেই সব ফুরায় বাবা !"

কমনীয় উত্তর করিল, "তাই তো হয় মা। এমনি করেই সব ফুরিয়ে যায়। অসংখ্য বিন্দু সংসার-বুকে ফুটে উঠছে, চোখ ফেলতে না ফেলতে আবার কোথায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে কে জানে ? সবাই জেগে থাকে, একজন তার মধ্যে কখন ঘুমিয়ে পড়ে। এই তো জগতের গতি মা, তুমি আমিও কি বেঁচে থাকব না, একদিন সবাই তো মরব !"

সতী নক্ষত্র খচিত সামনের কালো আকাশটার পানে চাহিল, সুদীর্ঘ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "কবে সেদিন আসবে বাবা, আমি যে এক মুহূর্ত্তও আর এখানে থাকতে পারছিনে, আমার যে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, আমার প্রাণ যে বড় কেমন করচে বাবা, আমি—"

বলিতে বলিতে সে উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অনেক কষ্টে তাহাকে শান্ত করিয়া কমনীয় তাহাকে গৃহমধ্যে লইয়া যাইতে লাগিল। বৃদ্ধাকে পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া সে রাত তথায় থাকিবার বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিয়া কমনীয় দুদিন পরে বাসস্থানাভিমুখে অগ্রসর হইল।

তখন পথে ঘাটে অন্ধকার বেশ বেশী রকমই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, গাছের পাতার ঘন অন্ধকারের মধ্যে অসংখ্য জোনাকি ঝিকমিক করিয়া জ্বলিতেছিল। পথ নীরব, পথিক পরিত্যক্ত। গৃহস্থের বাড়ীর মঙ্গল শঙ্খ অনেকক্ষণ বাজিয়া নীরব হইয়া গেছে, দুই একটা দেবালয়ে মঙ্গলারতির বাজনা এখনও বাজিতেছে। পথে একটা কুকুর শুইয়াছিল, নিস্তব্ধতা ভঙ্গকারী পথিকের পদশব্দে জাগিয়া ডাকিতে লাগিল।

কপালের ঘাম মুছিয়া শ্রান্তভাবে কমনীয় নিস্তব্ধ সুন্দর আকাশের পানে চাহিল। কাল সেই সে আহার করিয়া বাহির হইয়াছিল, কাল সমস্ত দিন কাটিয়াছে, আজ কয়েকখানা বাতাসা ও পাকা কলা খাইয়া রহিয়াছে। এ কষ্ট তাহার গায়ে বাজে নাই, সারাদিনের সারা রাতের পরিশ্রমে সে বড় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কাল সারারাত যে কোথায় দিয়া কাটিয়া গিয়াছে, তাহার ঠিক নাই।

থাকিয়া থাকিয়া তাহার কাণে বাজিতেছিল সতীর কাতর করুণ কণ্ঠ—"বাবা, আমার কি হ'ল ?" চোখের সামনে ভাসিতেছিল সতীর সেই শোক-কাতর মুখখানা। ভীষণ ঝড় একটা গাছের উপর দিয়া বহিয়া গেলে সে গাছটার অবস্থা যেরূপ হয়, আজ সতীর অবস্থাও তেমনি।

কোনও মতে সে যখন বাড়ী আসিয়া পৌছাইল তখন তাহার জন্য নিযুক্ত ভৃত্য শঙ্কর গেটের কাছে বসিয়া খইনি টিপিতে টিপিতে ভজন গাহিতেছিল। বাবুকে দেখিয়া খইনিটা মুখে ফেলিয়া দিয়া হাঁ করিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল। কমনীয়ের রুক্ষ বিশৃঙ্খল চুল, রক্তিম চোখ, শুষ্ক মুখ দেখিয়া সে কি ভাবিয়াছিল জানি না।

কমনীয় চলিয়া যাইতেছিল, কি মনে করিয়া ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুরা কোথা ?"

শঙ্কর উত্তর করিল, "তাঁরা বৈঠকখানা বাড়ী গেছেন।"

কমনীয় অন্যমনা হইয়া বলিল, "বাইজি আছে ?"

শঙ্কর বলিল, "আছে। সে কাল হ'তে আপনাকে খোঁজ করছে। আজও খানিক আগে তার চাকর জানতে এসেছিল আপনি এসেছেন কি না ? আপনি কোথা গেছ্‌লেন ডাক্তার বাবু ?"

কমনীয় খুব সংক্ষেপে বলিল, "দরকারে। তুমি শিগ্‌গীর আমায় এক কাপ চা আর খানকত বিস্কুট দিয়ে যাও তো।"

গৃহমধ্যে গিয়া সে ইজি-চেয়ারে আড় হইয়া পড়িল।

ক্ষিপ্রহস্ত শঙ্কর একটু পরেই এক কাপ্‌ চা, খানিকটা হালুয়া, কয়েকখানা বিস্কুট আনিয়া হাজির করিল। সে বেশ বুঝিয়াছিল ডাক্তারবাবুর আজ সারাদিন আহার হয় নাই।

সেগুলা টেবিলে সাজাইয়া দিতে দিতে সে বলিল, "গানের মজলিসে যাবেন না আপনি ?"

কমনীয় চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলিল, "না শঙ্কর, আর ও সব দিক মাড়াব না বলে প্রতিজ্ঞা করেছি।"

শঙ্কর ভারি খুসি হইয়া উঠিল। যথার্থ কথা বলতে কি, বৃদ্ধ শঙ্কর এই দীর্ঘকায় সুপুরুষ যুবক মনিবকে বড় ভালবাসিত। এ যে জমিদারের সঙ্গে পড়িয়া বদ হইয়া যায় ইহা সে মোটেই পছন্দ করিত না। সে মুখ ফুটিয়া কমনীয়কে কোন কথা বলিতে পারিত না, কিন্তু কমনীয় যেদিন মাতাল হইয়া বাড়ী ফিরিত, সেদিন তাহার মুখখানা অতিরিক্ত রকম গম্ভীর হইয়া উঠিত, সে মনে মনে জমীদার ও তাহার বন্ধুবর্গকে যে কত গালি দিত তাহার ঠিক নাই।

কমনীয় একবার মুখ তুলিয়া শঙ্করেব আনন্দপূর্ণ মুখখানার পানে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল, তখনই গম্ভীর হইয়া বলিল, "বাইজির লোক যদি ফের ডাকতে আসে, তাকে হাঁকিয়ে দিয়ো শঙ্কর। আমি কোথা গেছলুম জানো? রামদুলালের বাড়ী গিয়ে আর ফিরতে পারলুম না, বেচারা আজ আমারই কোলের 'পরে মাথা রেখে তার শেষ নিশ্বাসটা ফেলে গেল শঙ্কর! আহা! তার স্ত্রী—যাকে আমি মা বলেছি—"

সে থামিয়া গেল। শঙ্কর আর খানিক দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

(৬)

পরদিন ঘুম হইতে উঠিবামাত্র শঙ্কর প্রফুল্ল মুখে আসিয়া খবর দিল, বাইজি হঠাৎ চলিয়া যাইতেছে। সে নাকি মজুরার টাকা সব ফিরাইয়া দিয়াছে।

কমনীয় গম্ভীর ভাবে বলিল, "যাক্, বাঁচা গেল।"

কিন্তু বাঁচা গেল বলা সহজ, কাজে তেমন নয়। হৃদয়ের মধ্যে কেমন একটা খোঁচা বিঁধিতে লাগিল, কেন সে মজুরা ফিরাইয়া দিল, সাত দিনের অঙ্গীকারে আসিয়া সে তিন দিন গান গাহিয়াই চলিয়া যাইতেছে কেন?

ডিস্পেন্‌সারিতে যাইতে পথে বাহির হইবামাত্র বাইজির ভৃত্য মতিলাল আসিয়া তাহাকে ধরিল "চলুন—বাইজি হুকুম দেছেন আপনাকে যেমন অবস্থায় পাব তেমনি অবস্থায় নিয়ে যেতে। পরশু হ'তে এসে ঘুরে যাচ্ছি, আজ আর ফিরব না।"

বাইজি কেন চলিয়া যাইতেছে, জানিবার ইচ্ছা কমনীয়ের হৃদয়ে বলবতী ছিল, কাজেই সে দুই একবার মাত্র আপত্তি করিয়া অগ্রসর হইয়া পড়িল।

শুভ্রা ক্ষিপ্রহস্তে বাক্সে কাপড় জামা গুছাইয়া তুলিতেছিল। কমনীয়কে দেখিবা মাত্র ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা মানুষ তো তুমি, খুব আক্কেল তোমার যা হোক। মানুষ তুমি—না মানুষের আবরণে আর কিছু?"

কমনীয় গম্ভীর ভাবে বলিল, "শেষেরটা বটে।"

মুখভঙ্গী করিয়া শুভ্রা বলিল, "খুব কথা শিখেছ। কথাটি আছে বলেই বেঁচে আছ, নইলে সত্যপীর হয়ে যেতে। মতি, বাবুকে একখানা আসন দিয়ে বাইরে যা।"

মতি আসন দিয়া চলিয়া গেল।

কমনীয় বসিলে শুভ্রা বলিল, "তারপর, পরশু হঠাৎ গেছলে কোথা?"

কমনীয় উত্তর করিল "সে খবরটা নেওয়ার দরকার?"

শুভ্রা বলিল, "দরকার কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে।"

উদাস ভাব দেখাইয়া কমনীয় বলিল, "অধিকার যার আছে দরকার তারই। তোমার কি অধিকার আছে আমার উপর যাতে তুমি জিজ্ঞাসা করতে পার শুভ্রা? আমার বিবেচনায় সে সব কথা তোমার না জানাই ভাল।"

শুভ্রা শূন্যনয়নে খানিক কমনীয়ের মুখপানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর চোখ নামাইয়া একখানা কাপড় ভাঁজ করিতে করিতে অস্ফুট স্বরে শুধু বলিল, "সে তো ভাল কথাই।"

খানিক উভয়েই নীরব। শুভ্রাই সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, "তুমি এখন দেশে যাবে না?"

কমনীয় উত্তর দিল "যাব।"

শুভ্রা বলিল, "যাও যদি, ইতির একটা উপায় কোরো। আমিই তাকে আমার কাছে আনতে পারতুম—"

কমনীয় মাথা নাড়িয়া বলিল, "অসম্ভব।"

হঠাৎ দীপ্ত হইয়া উঠিয়া শুভ্রা বলিল, "অসম্ভব কিসে?"

কমনীয় বলিল, "তুমি বারাঙ্গনা মাত্র, সতী রমণীর জায়গা তোমার কাছে নয়। ইতি যদি যথার্থ ভাল হয়, তোমার কাছে আসবার কথা সে মনেও আনবে না।

তোমার কাছে আশ্রয় যাচ্ঞা করার চেয়ে সে মৃত্যুকেই প্রার্থনা করবে, আদর করে মৃত্যুকেই বরণ করবে।"

শুভ্রার মুখ পাঙাস হইয়া গেল, তাহার চোখ যেন হঠাৎ জলে ভরিয়া আসিল। অশ্রু সামলাইবার জন্যই সে ত্রস্ত পদে অন্য গৃহে চলিয়া গেল।

খানিক বাদে সে যখন ফিরিয়া আসিল তখন তাহার মুখ চোখ তেমনিই উজ্জ্বল, শান্ত মুখে তেমনিই মৃদু হাসি খেলিতেছে।

বাক্সর কাছে বসিয়া আবার কাপড় জামা তুলিতে তুলিতে সে হাসিয়া বলিল, "ঠিক কথাই বলেছ তুমি। আমি ভেবেছিলুম বটে, কিন্তু পিছিয়েও গেছি। যাই হোক, তুমি দেখো ইতিকে; আহা, তার জন্যে আমার বড্ড মন কেমন করে। বড় অভাগিনী সে! তার স্বামীর পরিচয় তোমরা কেউ পাওনি, আমি পেয়েছি। সেদিন তোমায় বলব ভেবেছিলুম, কিন্তু ভুলে গেছলুম।"

কমনীয় ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "কে তার স্বামী?"

শুভ্রা বলিল, "সে জাতে তেলি। চুরিই নাকি তার ব্যবসা। সে যে বলেছিল সিঙ্গাপুরে কাজ করে, সে সব মিছে কথা। বিয়ের পরদিনই সে পালিয়ে যায়, তার কারণ তার নামে ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে তার আগের দিন। খবর পেয়েও সে যে বিয়ে করতে সাহস করেছিল এই আশ্চর্য্য। একজনের জাতি—"

অসহিষ্ণু ভাবে কমনীয় বলিয়া উঠিল, "জাত চুলোয় যাক। ইতির জীবনটা যে একেবারে মাটি হয়ে গেল, আমি তাই ভাবছি। দেখছি, জগতে যে ভাল হয় মন্দ হয় তারই। মন্দ হলেই লাভ বেশী হয়।"

শুভ্রা করুণ হাসিয়া বলিল, "তা হয় না। জ্বালাটা বেশী হয় কিসে সেটা ভুক্তভোগী যারা তারাই বোঝে, আর কেউ বোঝে না।"

কমনীয় একটু নীরব থাকিয়া বলিল, "তারপর সেই জুয়াচোরটার কি পরিণাম হয়েছে জানতে পেরেছ তা? দয়া করে সে কথাটাও জানাবে কি?"

তাহার কথায় দারুণ মর্ম্মপীড়িতা হইয়াও শুভ্রা বলিল, "যখন বলব বলেছি তখন সব কথাই বলব। সে পালিয়ে গেছল কটকে, সেখান হ'তে পুলিশ তাকে ধরে এনেছে। আমি খবর নিয়েছি অনেকগুলো চুরি-ডাকাতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে সে যাবজ্জীবনের জন্যে আণ্ডামানে হাওয়া খেতে গ্যাছে।"

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কমনীয় বলিল, "যাক্, ইতিরও সব শেষ হ'ল তা' হলে!"

একটুখানি নীরব থাকার পর সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বুঝি আজই কলকাতায় ফিরে যাচ্ছো?"

শুভ্রা বলিল, "এখনই যাব।"

কমনীয় বলিল, "জিজ্ঞাসা করতে পারি, কেন?"

শুভ্রা বলিল, "নিশ্চয়ই পারো। তুমি আমায় কোনও অধিকার না দিলেও আমি তোমায় জিজ্ঞাসার অধিকার দিচ্ছি। আমি যাচ্ছি এই অপদার্থ লোকগুলোর জ্বালায়। কাল এরা যে ব্যবহার করেছে তাতে আমার আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকবার ইচ্ছে নেই। আমি ওদের সব টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছি, এক পয়সাও নেই। তোমাকেও বল্‌ছি, যদি ভাল চাও, নিজের মঙ্গল কামনা কর, এখনও ও সঙ্গ ত্যাগ কর। তুমি মাতাল তা' আমি সেদিন জানতে পেরেছি। ছি ছি, এত অধঃপতন যে হবে তোমার তা' আমি স্বপ্নেও ভাবি নি! আমি তোমায় যে ভাবে গড়ে রেখেছিলুম, তুমি সেটা ভেঙ্গে দিলে দেখছি। অমন তেজস্বী তুমি, সব প্রত্যাখ্যান করতে পারলে, আর এই বিষের মতন মদটাকে ত্যাগ করতে পারলে না?"

কমনীয় শান্তভাবে বলিল, "তাতে তোমার কি ক্ষতি বৃদ্ধি শুভ্রা? আমি অধঃপাতে যাই, আমি ভাল হই, তাতে তোমার কি?"

"আমার কি?" একরাশি বাষ্প শুভ্রার কণ্ঠের মধ্যে তাল পাকাইয়া উঠিয়াছিল, সেটাকে গিলিয়া ফেলিয়া সে বলিল, "আমার আবার কি? আমার ছাই হবে তাতে। লোক ভাল হয়, সৎ হয়, আমি তাই চাই। আমি নিজে বদ হয়েছি বলে সবাই যে বদ হবে এমন প্রার্থনা আমি কোন দিনই করি নি। যাক, তুমি চলে যেয়ো তাড়াতাড়ি, বেশী দেরী করো না যেন।"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া কমনীয় বলিল, "আমি আসি তা' হলে।"

"থাও" বলিয়া শুভ্রা মুখ ফিরাইয়া নিবিষ্টচিত্তে বাক্সটা একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল।

কমনীয় বাহির হইয়া গেল, আর ফিরিয়াও চাহিল না। যদি ফিরিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত দুর্ভাগিনী শুভ্রা তাহার পরিত্যক্ত আসনখানার উপর লুটাইয়া পড়িয়া মুখখানা গুঁজিয়া মনের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করিয়া ফেলিয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছে।

বরাবর ডিস্পেনসারির সাম্নে দাঁড়াইয়া আশ্চর্য্যনেত্রে চাহিয়া দেখিল দরজায় নূতন তালা লাগান। দারোয়ানের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল জ্যোতিশ পরশু বিকালে দরজায় নূতন তালা দিয়া গিয়াছে।

কমনীয় খানিক হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে মোটে বুঝিতে পারিল না তাহার কি অপরাধ পাইয়া জ্যোতিশ তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিল। সে নিজেই যে কাজে জবাব দিবে ঠিক করিয়াছিল, তাহাতে একটা পৌরুষ ছিল, বিপরীত দিক্‌কার হঠাৎ ধাক্কা খাইয়া সে প্রথমটা তাহা সাম্‌লাইতে পারিল না।

ধীরে ধীরে সে সেখান হইতে সরিয়া পড়িল। জ্যোতিশের বাড়ী পৌঁছিয়া দেখিল জ্যোতিশ বারাণ্ডায় বেড়াইতেছে, মতি সাম্নের ফুলবাগানে দাঁড়াইয়া নিবিষ্টচিত্তে গোলাপ ফুলের সৌন্দর্য্য দেখিতেছে।

কমনীয়কে না দেখিতে পাইয়াই সে আপন মনে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তা' যাই বল জ্যোতিশ, ঠিক এম্‌নি গোলাপের মতই রং তার, তার মুখখানা—"

হঠাৎ ফিরিয়া কমনীয়ের পানে চোখ পড়িতেই সে চমকাইয়া উঠিয়া হাসিল; "এই যে, আমাদের ডাক্তারবাবু এসেছেন। এস হে এস, ওহে জ্যোতিশ বাবু, একটু তাকিয়েই দেখ, আদর-অভ্যর্থনা কর।"

জ্যোতিশের মুখ বড় গম্ভীর, কমনীয়ের নাম শুনিয়া সে মুখ আরও কঠোর হইয়া উঠিল, সে উত্তর করিল না।

অপমানিত কমনীয় আর নীরবে থাকিতে না পারিয়া দীপ্ত ভাবে বলিল, "আমার মাইনেটা চুকিয়ে দেবে জ্যোতিশ?"

জ্যোতিশ তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল—"মাইনে?"

কমনীয় নরম হইয়া বলিল, "হ্যাঁ, আমার গত মাসের মাইনে।"

মতি একটা গোলাপ ছিঁড়িয়া পকেটে পুরিয়া নিকটে আসিল, বলিল, "আজই যাবে নাকি?"

কমনীয় শান্তমুখে বলিল, "অগত্যা।"

মতি বলিল, "কেন?"

কমনীয় বলিল, "এ রকম হাত পা গুটিয়ে কারও অন্ন ধ্বংস করা আমার জন্ম-পত্রিকায় লেখেনি। কাজ কর্ম্ম যেখানে কিছু নেই, সেখানে বেকার হয়ে ব'সে থাকার চেয়ে বেরিয়ে পড়ে অন্যত্র কাজের চেষ্টা করা ভাল। এ রকম বসে থেকে অপমান সহ্য করা দুরূহ।

মতি এতখানি হাঁ করিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিল, "অপমান, বল কি ডাক্তার, তোমায় অপমান করেছে কে?"

এই অত্যন্ত ফাজিল প্রকৃতির যুবকের কথায় কমনীয়ের গা জ্বলিয়া যাইতেছিল, সে তাহার দিকে না চাহিয়া জ্যোতিশের পানে চাহিয়া বলিল, "মাইনে দেবে জ্যোতিশ না অমনি—"

নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে জ্যোতিশ বলিল, "মাইনে এখনি দিচ্ছি, কিন্তু তুমি চলে যাবে কি রকম?"

কমনীয় গম্ভীর হইয়া বলিল, "তোমরা আমার কাজটা বন্ধ করে আবার যে জিজ্ঞাসা করছ, এতে আমি ভারি বিস্মিত হচ্ছি। ডাক্তারখানার দরজায় তালা দেছ, আর বাকিটা কি আছে?"

জ্যোতিশ কমনীয়ের দ্বারা কাজ পাইত অনেক। লাভের আশায়, সে ডিস্পেন্‌সারী খুলিয়াছিল, মাঝে মাঝে তাহাতে ডাক্তার আনিয়া বসাইত, কিন্তু কাহারও দ্বারা সে পূর্ণ কাজ করাইতে পারে নাই। কমনীয় রোগীদের প্রাণ দিয়া দেখিত, রোগ সারাইয়াও তুলিত, শুধু তাহার জন্য জ্যোতিশের অনেক টাকার ঔষধ বিক্রয় হইয়া যাইত। কমনীয় চলিয়া গেলে তাহার ডিস্পেন্‌সারীর এক পয়সার ঔষধও বিক্রয় হইবে না, এ কথাটা সে ভালরূপেই জানিত। প্রথমটা সে কমনীয়ের উপর অত্যন্ত রাগ করিয়াছিল। দুইবার তাহার মুখের গ্রাস তাহার বেতনভোগী কর্ম্মচারী হইয়া কমনীয় কাড়িয়া লইল, উদ্ধত প্রকৃতি

জ্যোতিশ ইহা সহ্য করিতে পারে নাই। রাগ করিয়া সে নিজেই ডিস্পেন্সারীর দরজায় আর একটা তালা লাগাইয়া দিয়া আসিয়াছিল। ইহাতে জ্যোতিশ ভাবিয়াছিল কমনীয় তাহাকেই খোসামোদ করিতে আসিবে, কারণ চাকুরীর মায়া সহসা কেহ ত্যাগ করিতে পারে না, আর সেই সময়ে সেও খুব কথা শুনাইয়া দিবে, তাহার পর যেন নিতান্ত অনুগ্রহ করিয়াই তাহার দরজার চাবি খুলিয়া দিবে।

কমনীয়ের কথা শুনিয়া জ্যোতিশ বলিল, "আমি এখনি তোমার ঘরের তালা খুলে দিচ্ছি চল।"

কমনীয় মাথা নাড়িয়া গম্ভীর মুখে বলিল, "আর না জ্যোতিশ, আমার যথেষ্ট চেতনা হয়েছে। আমি এখন ঘরের ছেলে ঘরে যেতে চাই। আমার মাইনেটা মিটিয়ে দাও, আমি চলে যাই।"

জ্যোতিশ অনেক ওজর আপত্তি করিয়াও কমনীয়কে আর কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইতে পারিল না। কমনীয় নিজের মাহিনা পাইয়া চলিয়া যাইতেছিল, সেই সময় নিতাই বিদ্রূপের সুরে বলিয়া উঠিল, "এখন বাইজির নেক্-নজরে পড়েছে বাবা, একশ টাকা মাইনেতে কি আর কুলোয়?"

কমনীয় ফিরিয়া ভীষণ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিবামাত্র সে মুখ ফিরাইয়া লইল। কমনীয় চলিয়া গেল।

জ্যোতিশ একটু নিশ্বাস ফেলিয়া বিছানার উপর আড় হইয়া পড়িল—"বাইজি বেটী চলে গেছে নাকি হে?"

হেম উত্তর করিল, "সে রওনা হয়ে গেছে।"

জ্যোতিশ আর কথা কহিল না।

ক্রমশঃ।

তন্ত্রে বীরাচার বা পঞ্চ-মকার সাধন।

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাহিত্য-বিশারদ]

তন্ত্রোক্ত বীরাচার বা পঞ্চ-মকার সাধনের কথা বলিবার পূর্ব্বে আচার কি, তৎ সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা আবশ্যক।

আচার সাধন-পথের একটি অঙ্গ। তন্ত্রশাস্ত্রে সাধকের প্রকৃতি ও অবস্থানুসারে আচারকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; যথা—পশ্বাচার, বীরাচার ও দিব্যাচার। এই ত্রিবিধ আচারের অপর নাম পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব।

পশ্বাচারী ও বীরাচারী অনেক সময় নিজ নিজ আচারকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরস্পর বিবাদ করিয়া থাকেন। বুঝিবার ভ্রমেই ঐ সকল বিবাদ উপস্থিত হয়। কোন আচারই নিন্দনীয় নহে। জ্ঞানের তারতম্যই পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাবের কারণ। যেমন আমাদের বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য একের পর এক আসিয়া উপস্থিত হয়; যেমন ফুল হইতে ফল এবং ফল হইতে বীজ; যেমন দুগ্ধ হইতে নবনীত এবং নবনীত হইতে ঘৃত; পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাবও সেইরূপ। তাই শিব বলিয়াছেন—

"আদৌ পশুস্ততোবীরশ্চরমো দিব্য উচ্যতে।"

প্রথমতঃ পশুভাব; এই পশুভাব সমাপ্ত হইলেই বীরভাব আরব্ধ হয়। বীরভাবের সমাপ্তিতে আবার দিব্যভাবের উদয় হইয়া থাকে। তন্ত্রে এ বিষয়ের আরও একটি সুন্দর উদাহরণ দেখান হইয়াছে। যেমন প্রথমে সঙ্কল্প, তৎপরে কার্য্য এবং সর্ব্বশেষে দক্ষিণান্ত; পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাবও ঠিক সেইরূপ।

পশ্বাচারই সাধকের প্রথম পালনীয়। এই আচারকেই আমরা চলিত কথায় শুদ্ধাচার বলিয়া থাকি। এই আচারিগণ ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিবে, হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে, গন্ধ-মাল্য ও মূল্যবান বস্ত্রাদি ব্যবহার করিবে না, মৎস্য মাংসাদি পরিত্যাগ করিবে, কখন তাম্বুল স্পর্শ করিবে না, সর্ব্বদা শুচি থাকিবে ও দেবালয়ে যাইবে। ইহারা কদাপি ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষা করিবে না, ধন থাকিলে দান করিবে এবং কৃপণতা ও অহঙ্কারাদি পরিত্যাগ করিবে। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের প্রথম উল্লাসে উক্ত আছে—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং স্বয়মেবাহরেৎ পশুঃ।
ন শূদ্র দর্শনং কুর্য্যাৎ মনসা ন স্ত্রিয়ং স্মরেৎ॥"

পশ্বাচারই চিত্তশুদ্ধির প্রধান উপায়। বিধিপূর্ব্বক এই আচার আচরিত হইলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তি সকল দূর হয় এবং ক্রমশঃ ভোগবাসনা তিরোহিত হইয়া অন্তঃকরণে শান্তি সংস্থাপিত হয়। বাসনাক্ষয় নিবন্ধন মনের চঞ্চলতা অনেক পরিমাণে নিবৃত্ত হয়; হিংসা কমিয়া যায়; ক্ষমা বৃদ্ধি হয় এবং সর্ব্বভূতে দয়া উপস্থিত হয়। হবিষ্যান্ন গ্রহণ ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে দেহের রজস্তমঃ উভয়বিধ গুণ ক্ষুন্ন হইয়া সত্ত্বগুণ উন্মেষিত হইয়া পড়ে; সুতরাং মন স্বতঃই তখন ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়। তন্ত্রশাস্ত্রে এই জন্যই সর্ব্বাগ্রে পশ্বাচার আচরণ করিবার বিধি আছে।

পশ্বাচারে আমি জীব, দেবতার পূজা করিতেছি—দেবতার ভোগ দিতেছি—দেবতার প্রসাদ ভোজনে আত্মাকে চরিতার্থ করিতেছি—ইত্যাদি দ্বৈতভাবে উপাসনা হইয়া থাকে; কিন্তু বীরাচারের শিক্ষা অন্যরূপ। দেহস্থ কুণ্ডলিনী শক্তিই জীব-চৈতন্যের মূল কারণ; আমার কর্ত্তৃত্ব ভ্রম মাত্র; আমি খাই না—যাই না—দেখি না—ইত্যাদি রূপ অহঙ্কার ত্যাগই বীরাচারের শিক্ষা। পঞ্চ-মকার ঐ শিক্ষার বলবান সহায়। তন্ত্রে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পাঁচটিকে পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চ-মকার বলে। এই পঞ্চ-মকার সহযোগে উপাসনার নাম বীরাচার বা কুলাচার এবং বীরাচারেরই পরিপক্কাবস্থার নাম দিব্যাচার।

আমাদের দেশের অনেকেই বীরাচারে মদ্য-মাংসাদি ব্যবহারের কথা শুনিয়া তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, মদ্য-মাংসাদি পাঁচটি সামগ্রীই অত্যন্ত প্রলোভনের বস্তু। ঐগুলি লইয়া আবার সাধন কি? মদ্যের নাম শুনিলেই ত আমাদের ঘৃণা হয়। শাস্ত্রে "মদ্যমদেয়মপেয়মগ্রাহ্যম্" বলা হইয়াছে। তবে ঐ মদ্য পান করিয়া আবার কি প্রকারে উপাসনা হইতে পারে?

ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন, তন্ত্রশাস্ত্রে যে মদ্যাদির উল্লেখ আছে তাহা বাহ্য প্রচলিত মদ্যাদি নহে; উহার অর্থ স্বতন্ত্র। তাঁহারা ইহার প্রমাণ স্বরূপ "আগমসারোক্ত" নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি দেখাইয়া থাকেন।

মদ্য—"সোমধারা ক্ষরেদ্ যা তু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্বরাননে।
পীত্বানন্দময়স্তাং যঃ স এব মদ্য সাধকঃ॥"

ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ক্ষরিত অমৃতধারা পানকারী সাধকই প্রকৃত মদ্য সাধক।

মাংস—"মাশব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনপ্রিয়ে।
যদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংস সাধকঃ॥"

মা শব্দের অর্থ রসনা অর্থাৎ জিহ্বা। ঐ জিহ্বা তালু বিবরে প্রবেশ করাইলে উহাতে অমৃত তুল্য একরূপ রসের সংযোগ হয়। যিনি ঐ অমৃতরস সর্ব্বদা পান করেন তিনিই মাংস সাধক।

মৎস্য—"গঙ্গা যমুনয়োর্মধ্যে দ্বৌ মৎস্যৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স এব মৎস্য সাধকঃ॥"

ইড়া নাড়ীকে গঙ্গা এবং পিঙ্গলা নাড়ীকে যমুনা বলে। এই দুই নাড়ীর দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হয়। এই শ্বাস প্রশ্বাসের নাম মৎস্য। যে ব্যক্তি প্রাণায়াম যোগে শ্বাস প্রশ্বাসকে নিরোধ করিতে পারেন, তিনিই মৎস্য সাধক।

মুদ্রা—"সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতা চরেৎ।
আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমঃ॥
সূর্য্য কোটি প্রতিকাশং চন্দ্র কোটি সুশীতলং।
অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনী যুতং।
যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রা সাধক উচ্যতে॥"

সহস্রদল পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে পারদ সদৃশ আত্মার অবস্থিতি। ঐ আত্মা কোটি সূর্য্যের প্রভাযুক্ত এবং কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল। ঐ আত্মা অতিশয় মনোহর এবং সতত কুণ্ডলিনী শক্তি সমন্বিত। তাঁহাকে যিনি জানিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত মুদ্রা সাধক।

মৈথুন—"মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণং।
মৈথুনাৎ জায়তে সিদ্ধি ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভং॥
কুলকুণ্ডলিনী শক্তি দেহিনাং দেহধারিণী।
তয়া শিবস্য সংযোগো মৈথুনং পরিকীর্ত্তিতং॥"

মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনী শক্তিকে সুষুম্না পথে উত্তোলন করতঃ সহস্রদল পদ্মস্থ পরব্রহ্মে সংমিলন করাকেই মৈথুন সাধন বলে।

এই গেল এক সম্প্রদায়ের কথা। আবার কেহ কেহ বলেন, উপরে যে সকল শ্লোক দর্শিত হইল, তাহাতে বাহ্য প্রচলিত মদ্যাদির সত্যতা পক্ষে সন্দেহ হইতে পারে বটে, কিন্তু নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি পাঠ করিলে বাহ্য প্রচলিত মদ্য যে একেবারে মিথ্যা তাহা কোন ক্রমেই বলা যায় না।

"গৌড়ী পৈষ্টী তথা মাধ্বী ত্রিবিধা চোত্তমা সুরা।
সৈব নানাবিধা প্রোক্তা তাল খর্জ্জুর সম্ভবা॥
তথা দেশ বিভেদেন নানা দ্রব্য বিভেদতঃ।
বহু ধেয়ং সমাখ্যাতা প্রশস্তা দেবতার্চ্চনে॥"

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)

এখন কথা হইতেছে, একই শাস্ত্রে এরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তির কারণ কি? তন্ত্রের অনেক স্থানে মদ্য মাংসাদির ভূরি ভূরি নিন্দাবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। মদ্য পান করিলেই বীর হওয়া যায় না, একথাও তন্ত্রকার মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন।

"সিদ্ধ মন্ত্রী ভবেদ্বীরো ন বীরো মদ্যপানতঃ"।

আবার অন্য স্থানে বলিতেছেন—

"গৌড়ী পৈষ্টী তথা মাধ্বী ত্রিবিধা চোত্তমা সুরা।"

এই রহস্য জাল ভেদ করিতে পারিলেই তন্ত্রের প্রকৃত সূক্ষ্মতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। তন্ত্রের সকল কথাই সত্য। দেশ কাল পাত্র ভেদে একই সামগ্রী অমৃত বা বিষ হইয়া থাকে। সুতরাং অবস্থা বা অধিকারী ভেদে তন্ত্রকার কখন স্থূল মকার এবং কখন বা সূক্ষ্ম মকার ব্যবহারের কথা বলিয়াছেন। মদ্য মাংসাদি তোমার আমার প্রলোভনের বস্তু হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত বীরাচারীর পক্ষে উহারা কোনই ক্ষতি করিতে পারে না। তন্ত্রে প্রকৃত বীরাচারীর লক্ষণ এইরূপ ;—

"সর্ব্বহিংসাবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্ব প্রাণিহিতে রতঃ।
সোঽস্মিন্ শাস্ত্রেঽধিকারী স্যাদন্যথা ভ্রষ্ট সাধকঃ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য বর্জ্জিতঃ।
মানাপমান সন্তুষ্টোহ্যাধিকারী স এ বহি॥"

(যোগিনী হৃদয়)

উৎপত্তি তন্ত্রে বীর প্রশংসায় মহাদেব বলিতেছেন—

"যো বীরঃ স শিবঃ সাক্ষাদ্দেব এব ন সংশয়ঃ।
যত্র বীরো বসেদ্দেবি তত্র কস্য ভয়ং ভবেৎ॥"

আবার অধিকারী না হইয়া যিনি বীরাচার আচরণ করিতে যান, তাঁহার সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, দেখুন—

"অপ্রাপ্য বীরভাবস্তু যদি বৈর্গাং সমাশ্রয়েৎ।
ইতঃভ্রষ্টস্ত্ততোনষ্টশ্ছিন্নো ভবতি তৎক্ষণাৎ॥"

(ভৈরব সংহিতা)

যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে শত শত যোদ্ধাকে পরাভূত করিতে পারেন, তিনি যেমন লোকসমাজে বীর বলিয়া পরিগণিত হন, সেইরূপ যিনি দুর্দ্দমনীয় মনকে জয় করিতে সমর্থ, সাধনক্ষেত্রে তিনিই বীর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বীরাচার সাধারণের আচরণীয় নহে। পশ্বাচার আচরণের দ্বারা যাঁহার অন্তঃকরণ শান্ত ও নিরুপদ্রব হইয়াছে— সংসারের অনিত্যতা বুঝিয়া যাঁহার মনে বৈরাগ্যোদয় হইয়াছে—কাম-ক্রোধাদি মানসিক বিকার সকল যাঁহার ক্ষোভ উৎপাদন করিতে পারে না—তিনিই বীরাচারের অধিকারী। সুতরাং এরূপ যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ মদ্য-মাংসাদি ব্যবহার করিয়া সাধন করিলে দোষ কি? যিনি প্রকৃত বীরাচারী তাঁহার কখন মদ্যপানে ভ্রান্তি বা বিকার জন্মিবে না। সদ্গুরুর অভাবে অনেক ব্যবসায়ী গুরু কর্ত্তৃক অনধিকারীকে উচ্চ অধিকার প্রদত্ত হয়। তাহার ফলে গুরু শিষ্য উভয়েই এই শ্রেষ্ঠ আচারকে অযথা কলঙ্কিত করিয়া বসেন। এজন্য কলিকালের সাধকদিগের পক্ষে স্থূল-মকারের অনুকল্প ব্যবহারেরই উপদেশ আছে।

"কলৌ ন পশুভাবোঽস্তি দিব্য ভাবঃ কুতো ভবেৎ।"

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)

কলিকালে প্রকৃত পশ্বাচারী সাধকই দেখিতে পাওয়া যায় না ; বীরাচারী বা দিব্যাচারীর ত কথাই নাই।

আবার বলিতেছেন—

"কলিজা মানবা লুব্ধা শিশ্নোদরপরায়ণাঃ।
লোভাত্তত্র পতিষ্যন্তি ন করিষ্যন্তি সাধনম্॥
ইন্দ্রিয়াণাং সুখার্থায় পীত্বা চ বহুলং মধু।
ভবিষ্যন্তি মদোন্মত্তা হিতাহিত বিবর্জ্জিতাঃ॥"

(ঐ তন্ত্র)

সুতরাং একালের কাম-বিভ্রান্ত চিত্ত সাধকদিগের পক্ষে বাহ্য প্রচলিত মদ্যাদি কখনই ব্যবহার্য্য নহে। তাঁহারা এইরূপ তত্ত্ব-প্রতিনিধি অবলম্বন করিবেন, ইহাই শাস্ত্রোপদেশ।

"গৃহ কার্য্যৈক চিত্তানাং গৃহিণাং প্রবলে কলৌ।
আদ্যতত্ত্ব প্রতিনিধৌ বিধেয়ং মধুরত্রয়ং॥
দুগ্ধং সিতা মাক্ষিকঞ্চ বিজ্ঞেয়ং মধুরত্রয়ং।
বলিরূপ মিদং মত্বা দেবতায়ৈ নিবেদয়েৎ॥"
(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)

উক্ত তন্ত্রে শেষতত্ত্ব (মৈথুন) সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"স্বভাবাৎ কলি জন্মানঃ কাম বিভ্রান্ত চেতসঃ।
তদ্রূপেণ ন জানন্তি শক্তিং সামান্য বুদ্ধয়ঃ॥
অতস্তেষাং প্রতিনিধৌ শেষ তত্ত্বস্য পার্ব্বতি।
ধ্যানং দেব্যাঃ পদাম্ভোজে স্বেষ্টমন্ত্রজপস্তথা॥"

এই কলিকালে চিত্ত চাঞ্চল্য নিবন্ধন সাধক যতদিন মানসিক তত্ত্বাভ্যাসে অসমর্থ থাকিবেন ততদিন স্থূল মকারের অনুকল্পই তাঁহার পক্ষে অবলম্বনীয়। যাঁহারা সাধন মার্গের সর্ব্বোচ্চ সোপানে উঠিয়াছেন, তাঁহাদের জন্যই আধ্যাত্মিক পঞ্চ-মকার বা মানসিক তত্ত্বাভ্যাসের ব্যবস্থা।

তন্ত্রশাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনেক পরস্পর-বিরুদ্ধ উক্তির অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহাতে দোষারোপ করিবার কোন কারণ নাই। প্রশ্নোত্তর ছলে যখন যে অধিকারের প্রশ্ন হইয়াছে, করুণাময় মহাদেব প্রশ্ন অনুসারে অধিকার নির্ণয় করিয়া তখন তাহার পক্ষে যাহা হিতকর, সেই উপদেশই দিয়াছেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের দ্বিতীয় উল্লাসে ভগবতীর প্রশ্নে মহাদেব স্পষ্টই বলিতেছেন,—

"যদা যদা কৃতাঃ প্রশ্নাঃ যেন যেন যদা যদা।
তদা তদ্লোপকারায় তথৈবোক্তং ময়া প্রিয়ে॥"

কর্ম্মকার জাতি সম্বন্ধে বেদের প্রমাণ।

(বঙ্গীয় কর্ম্মকার সম্মিলনীর দ্বাবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত)

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম-এ, বি-এল]

সূচনাতেই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা দরকার। কর্ম্মকার জাতির ইতিহাস এ পর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই। এই জাতির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে প্রামাণিক কোন গ্রন্থও প্রকাশিত হয় নাই। শ্রুতি হিন্দুদিগের ধর্ম্ম ও ইতিহাসের প্রাচীনতম উপাদান। আর্য্যজাতি-সম্ভূত কর্ম্মকারগণের সম্বন্ধে প্রাচীনতম তথ্য নিরূপণ করিতে হইলে সেইজন্য বেদের প্রমাণ সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করাই উচিত বলিয়া মনে হয়। তের চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে কর্ম্মকার জাতি সম্বন্ধে শতাধিক পণ্ডিতের অভিমত পূর্ব্ববঙ্গের উদ্যোগী কর্ম্মকারগণকর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল। পণ্ডিতগণের উক্ত অভিমতে যজুর্ব্বেদোক্ত আড়াইখানি মাত্র শব্দ, তাহাও পাঠান্তরিত হইয়া স্থান পাইয়াছিল।

"কর্ম্মকারেভ্যশ্চ বো নমঃ।" শ্রুতি

যজুর্ব্বেদে "কর্ম্মকারেভ্য" নাই, "কর্ম্মারেভ্যো" আছে। "কর্ম্মকার" শব্দ কোনও বেদে নাই। কর্ম্মকারগণের জাতিতত্ত্ব-বিষয়ক যতগুলি গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে "প্রধী-কর্ম্মকার বা কর্ম্মার-ক্ষত্রিয়" নামে জনৈক বেনামা লেখকের গ্রন্থে উক্ত আড়াইখানি শব্দ ও অথর্ব বেদ হইতে আরও আড়াইখানি শব্দ—"কর্ম্মারা যে মনীষিণঃ"—উদ্ধৃত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় আমার মত যৎসামান্য সংস্কৃতাভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা কর্ম্মকার জাতি সম্বন্ধে বেদের সমুদয় প্রমাণ সংগৃহীত হওয়া আদৌ সম্ভবপর নহে। তবে, কর্ম্মকার জাতির গৌরব বৃদ্ধির জন্য আমি যে প্রমাণগুলি সংগ্রহ করিয়াছি, তদ্দ্বারা শিক্ষিত কর্ম্মকারগণের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা জাগিয়া উঠিতে পারে, এরূপ আশা করা অসঙ্গত মনে করি না।

সংস্কৃত ভাষায় 'কর্ম্মকর', 'কর্ম্মকার', 'কর্মার' ও 'কার্ম্মার' প্রভৃতি একার্থবোধক শব্দে ধাতুশিল্পী কর্ম্মকারকেই বুঝায়। এই সকল শব্দের মধ্যে 'কর্মার' ও 'কার্মার' শব্দ দুইটী বেদে আছে। ভাষ্যকারগণ এই দুইটী শব্দের অর্থ ধাতুশিল্পী কর্ম্মকার বুঝিয়াছেন। উক্ত শব্দ দুইটীর, বিশেষতঃ 'কার্মার' শব্দের অপভ্রংশ যে 'কামার' তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। বাচস্পত্যাভিধান, শব্দকল্পদ্রুম, অভিধান রাজেন্দ্র প্রভৃতি সুবৃহৎ সংস্কৃত অভিধানের মতে 'কর্ম্মার' ও 'কার্ম্মার' শব্দের অর্থ কর্ম্মকার জাতি, 'কামার' ইতি ভাষা। অজ্ঞতা হেতু অনেকে মনে করেন যে, 'কামার' অবজ্ঞাত কোনও জাতির নাম। বেদের প্রমাণ ও ভাষ্যকারগণের ব্যাখ্যা হইতে জানা যায় যে, 'কামার' শব্দটি হিন্দুর প্রাচীনতম ও পবিত্রতম ধর্ম্মগ্রন্থ বেদের দেবভাষার 'কর্মার' ও 'কার্মার' শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। 'কর্মার' শব্দটি ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে আছে।

"ব্রহ্মণস্পতিরেতা সংকর্মার ইবাধমৎ।
দেবানাং পূর্ব্যে যুগেঽসতঃ সদজায়ত ॥"

অর্থাৎ "দেবতারা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বকালে ব্রহ্মণস্পতি কর্ম্মকারের ন্যায় দেবতাদিগকে নির্ম্মাণ করিলেন। অবিদ্যমান হইতে বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হইল।" ঋগ্বেদের সময়ে আর্য্য সমাজের যে অবস্থা ছিল তাহার স্পষ্ট আভাস এই বেদের অনেক স্থানে পাওয়া যায়। যে সূক্তে উদ্ধৃত পদটি আছে তাহাতে দেবতাদিগের কর্ম্মবৃত্তান্ত ও সর্ব্বপ্রথম আবির্ভাবের বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মণস্পতি কিরূপে অবিদ্যমান হইতে বিদ্যমান বস্তু সৃষ্টি করিলেন তাহার বর্ণনা উদ্ধৃত পদে "কর্ম্মকারের ন্যায়" এই দুইটি শব্দে ব্যক্ত হইয়াছে। বেদজ্ঞ প্রাচীন পণ্ডিতগণ কর্ম্মকারের শিল্পনৈপুণ্যের উল্লেখ করিয়া উক্ত পদের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—কর্ম্মকার যেরূপে ভস্ত্রা, (যাঁতা) অর্থাৎ বায়ুযন্ত্র বিশেষের সাহায্যে অগ্নির উত্তাপ বৃদ্ধি করিয়া প্রস্তর-মিশ্রিত ধাতুপিণ্ড হইতে বিশুদ্ধ ধাতু নিষ্কাশিত করেন, সেইরূপে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মণস্পতি অবিদ্যমান হইতে দেবতা ও অন্যান্য বস্তু সৃষ্টি করিলেন। তাহা হইলে জানা গেল যে, প্রাচীনতম বৈদিক যুগে কর্ম্মকারগণ ধাতু নিষ্কাশন প্রণালী অবগত ছিলেন। ধাতুশিল্পের ক্রমোন্নতি সহকারে কর্ম্মকারগণ যে আর্য্য সমাজের উপযোগী নানা প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ ঋগ্বেদের ৯ম মণ্ডলে পাওয়া যায়।

"জরতীভিরোষধীভিঃ পর্ণেভিঃ শকুনানাং।
কার্মারো অশ্মভির্দ্যুভির্হিরণ্যবন্তমিচ্ছতীন্দ্রায়েন্দো
পরিস্রব ॥"

অস্যার্থঃ—"দেখ শুষ্ক বৃক্ষশাখা, পক্ষীর পক্ষ ও শাণ দিবার জন্য উজ্জ্বল প্রস্তর এই কয় বস্তুর সহযোগে কর্ম্মকার বাণ প্রস্তুত করিয়া ধনাঢ্য ব্যক্তিকে অন্বেষণ করে। অতএব হে সোম, ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।" এস্থলে 'কার্মার' শব্দের প্রয়োগ দেখা যাইতেছে। সায়নাচার্য্যের মতে কর্ম্মকার কর্ত্তৃক প্রস্তুত এই বাণের ফলক উজ্জ্বল প্রস্তরখণ্ড হইতে নির্ম্মিত হইত। ঋগ্বেদের অন্য কোনও স্থানে 'কর্মার' বা 'কার্মার' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না। কর্ম্মকার কর্ত্তৃক প্রস্তুত লৌহ কলসের উল্লেখ কিন্তু ঋগ্বেদে আছে। এই বেদের ৫ম মণ্ডলে উক্ত হইয়াছে, "হে অগ্নি! আমরা রুশমগণের নিকট চারি সহস্র ধেনু লাভ করিয়াছি এবং জ্ঞান সম্পন্ন হইয়া যাগার্থ প্রস্তুত উজ্জ্বল লৌহ কলসও গ্রহণ করিয়াছি।" ঋগ্বেদের ৯ম মণ্ডলেও উক্ত হইয়াছে,—"রাক্ষসহন্তা, সকলের দর্শক সোম লৌহদ্বারা পিষ্ট হইয়া দ্রোণকলসবিশিষ্ট অভিষবন স্থানে উপবিষ্ট হন।" ঋগ্বেদের ৫ম মণ্ডলে ভস্ত্রা বা যাঁতাযন্ত্র সংযোগে কর্ম্মকার কর্ত্তৃক অগ্নিসংবর্দ্ধিত হইবার বর্ণনা আছে।

"অধ স্ম যস্যার্চয়ঃ সম্যক্ সংযংতি ধূমিনঃ।
যদীমহ ত্রিতো দিব্যুপ ধ্মাতেব ধমতি শিশীতে
ধ্মাতরী যথা ॥"

ইহার অর্থ—"ধূমবান অগ্নির শিখা সকল সর্ব্বত্র সুন্দররূপে ব্যাপ্ত হয়। কর্ম্মকার (ভস্ত্রাদি দ্বারা) অগ্নিকে যেরূপ সংবর্দ্ধিত করে, সেইরূপ ত্রিত যখন অন্তরীক্ষে অগ্নিকে বর্দ্ধিত করে, তখন অগ্নি কর্ম্মকার দ্বারা সন্ধুক্ষিত অগ্নির ন্যায় তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হয়।" সায়নাচার্য্য এস্থলে ত্রিত অর্থে অগ্নি বুঝিয়াছেন। বেদজ্ঞ কোনও কোনও পণ্ডিত

কিন্তু ত্রিত অর্থে বায়ু বুঝিয়াছেন। সে যাহাই হউক, উদ্ধৃত পদে ধ্মাতর শব্দের অর্থ, যে ব্যক্তি অগ্নিসংযোগে ধাতুনিষ্কাশন করে অর্থাৎ কর্ম্মকার তদ্বিষয়ে দ্বিমত নাই। ঋগ্বেদের অনেক শব্দের বানান এই বেদের পরবর্ত্তী যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে দেখা যায়। এইরূপে ধ্মাতর শব্দ হইতে ধ্মাকর শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। অভিধানের মতে, ধ্মাকর শব্দের অর্থ লৌহকার, কর্ম্মকার। আধুনিক কর্মার ও কামার শব্দের বানানে 'র্ম্ম' বেদের 'ম' হইতে হইয়াছে। 'র্ম্ম' বেদে নাই। বেদের পরবর্ত্তী যুগে ইহা দেখা দিয়াছে।

বৈদিক যুগে কর্ম্মকারগণ যে ধাতুশিল্পে অভিজ্ঞ ছিলেন তাহা ঋগ্বেদ হইতে উদ্ধৃত পদগুলি পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়। কর্ম্মকারগণের উৎপত্তি ও শিল্পজ্ঞান লাভ সম্বন্ধে ঋগ্বেদে যদিও স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় না, তাহা হইলেও চমস্ অর্থাৎ সোমধারণক্ষম পাত্র যে তাঁহারা বিশ্বকর্ম্মার নিকট নির্ম্মাণ করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা সুনিশ্চিত। ভাষ্যকার সায়নাচার্য্যের মতে ঋভুগণ ত্বষ্টার শিষ্য কিন্তু ত্বষ্টা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একখানি চমস চারিখানি করিয়া দেবগণের নিকট তাঁহারা অনেক সম্মান পাইয়াছিলেন। এই ত্বষ্টা দেবগণের অস্ত্র নির্ম্মাতা, পুরাণের বিশ্বকর্ম্মা। তিনি ইন্দ্রের বজ্র নির্ম্মাণ করেন। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডল ২০শ সূক্তে উক্ত হইয়াছে,—"যে ঋভুগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দেবগণের উদ্দেশে মেধাবী ঋত্বিকগণ এই প্রভূত ধনপ্রদ স্তোত্র নিজে রচনা করিয়াছেন।" অন্যত্র, "ত্বষ্টাদেবের নূতন সেই চমস্ নিঃশেষিত রূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঋভুগণ পুনরায় সেই চমস্ চারিখানি করিয়াছিলেন।" এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই ঋভুগণ কে? তাঁহারা যে ঋভুনামে সুধন্বার পুত্রের বংশধর তাহাতে সন্দেহ নাই। "অঙ্গিরার পুত্র সুধন্বা, তাঁহার ঋভু বিভু ও বাজ নামে তিন পুত্র ছিল। তাঁহারা নিজ কর্ম্মদ্বারা দেবত্বলাভ করিয়াছিলেন এবং সূর্য্যলোকে বাস করেন এইরূপ আখ্যান।" এই ঋভুগণ ও কর্ম্মকারগণ যে বৈদিক যুগের প্রারম্ভ কালে অভিন্ন ছিলেন, তাহা যদিও স্পষ্টভাবে ঋগ্বেদে উক্ত হয় নাই কিন্তু পুরাণাদি শাস্ত্রে সুধন্বার পুত্রগণ যে শিল্পজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন তাহার উল্লেখ আছে। যাগার্থ লৌহ কলস, সোমধারণক্ষম চমস্ ও বাণ প্রভৃতি দ্রব্য যখন ঋগ্বেদের সময়ে কর্ম্মকারগণ প্রস্তুত করিতেন, ভস্ত্রাযন্ত্রের ব্যবহার যখন তাঁহারাই জানিতেন আর বিশ্বকর্ম্মা যখন ঋভুগণকে চমস্ নির্ম্মাণ করিবার কৌশল শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং কর্ম্মকারগণ যখন আবহমানকাল বিশ্বকর্ম্মার পূজা ও তৎসঙ্গে ভস্ত্রাযন্ত্রেরও পূজা করিয়া আসিতেছেন, তখন তাঁহারা যে ঋভুবংশোদ্ভব এই সিদ্ধান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। এই সিদ্ধান্ত যে নির্ভুল এমন কথা বলিতে আমার এখনও সাহস হয় না। এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা দরকার, আপাততঃ ইহাই আমার মনে হইতেছে। বেদব্যাস-প্রণীত মহাভারতের ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়ে লিখিত আছে,—"অষ্টম বসু প্রভাসের ঔরসে বৃহস্পতির ভগ্নি ব্রহ্মবাদিনী যোগাসক্তা বরস্ত্রীর গর্ভে শিল্প প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সর্ব্ব শিল্পকরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দেবতাদিগের সমুদয় অলঙ্কার ও বিমানাদি বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করেন। ইঁহার শিল্পকার্য্য উপজীব্য করিয়া মনুষ্যেরা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। শিল্পোপজীবী লোকেরা এই অব্যয় বিশ্বকর্ম্মাকে পূজা করিয়া থাকে।" বিশ্বকর্ম্মা দেবগণের অস্ত্রাদি নির্ম্মাণের জন্যই পুরাণাদি গ্রন্থে সুপরিচিত। তাঁহার নিকট কর্ম্মকারগণ যে অস্ত্র সস্ত্রাদি নির্ম্মাণ কার্য্য শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা নেহাৎ অনুমান-সাপেক্ষ নহে, কারণ কর্ম্মকারগণ বৈদিক যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত এই কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। ঋভুগণও বিশ্বকর্ম্মার নিকট শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন ও তাঁহারা অপর সকলকে শিল্পকার্য্য শিক্ষা দিতেন। এই সকল কারণে আমার মনে হয় যে, বৈদিক যুগে ঋভুগণ ও কর্ম্মকারগণ অভিন্ন ছিলেন। মহাভারত যে সময়ে রচিত হয়, তাহার বহু পূর্ব্বে ঋগ্বেদের সময়ে আবিষ্ক্রিয়াদি শিল্পবিজ্ঞানসম্ভূত ব্যাপারগুলি যে আর্য্য ঋষিদিগের মস্তিষ্ক ও প্রতিভা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। শ্রুতি সেইজন্য শিল্পীগণকে বারংবার ঋষিযোগ্য সম্মান প্রদান করিয়াছেন। অথর্ববেদের ৩য় কাণ্ড, ৫ম স্তোত্রে উক্ত হইয়াছে,—"যে

ধীবানো „রথকারাঃ কর্মারা যে মনীষিণঃ।" এখানেও কর্মার শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। এই স্তোত্র পর্ণমণির উদ্দেশে রচিত। রাজা কহিতেছেন,—"এই পর্ণমণির কৃপায় আমি যেন ধীসম্পন্ন রথকার ও মনীষাসম্পন্ন কর্ম্মকারগণকে আমার শাসনাধীন করিয়া রাখিতে পারি।" বৈদিক যুগে রথকার ও কর্ম্মকার আর্য্য সমাজে যে ক্ষমতাশালী ও সম্মানার্হ ছিলেন তাহা সুনিশ্চিত। যজুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে,—

"নমস্তক্ষভ্যোরথকারেভ্যশ্চ বো নমোনমঃ।

নমঃ কুলালেভ্যঃ কর্মারেভ্যশ্চ বো নমোনমঃ॥"

"তক্ষ (সূত্রধর), রথকার, কুলাল (কুম্ভকার) ও কর্ম্মকারকে নমস্কার, নমস্কার।" প্রাচীনতম আর্য্য সমাজে উপেক্ষিত বলিয়া কোনও কিছু ছিল না। সমাজের কল্যাণকর প্রত্যেক শিল্প ও তাহার অনুরক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি ঋষিদিগের চক্ষে মহৎ। এমন কি, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চেতন ও অচেতন সকল বস্তুই ঋষিদিগের উদার হৃদয়ে সমান আদরে স্থান পাইত। আর্য্যধর্ম্ম সর্ব্বজীবে, "দেবতা হইতে কীটাণু এবং কীটাণু হইতে অচেতন পরমাণু পর্য্যন্ত" বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র "দেবতার অধিষ্ঠান উপলব্ধি করিত।" যজুর্ব্বেদে আর্য্যগণের সমদর্শিতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই বেদের মাধ্যন্দিনী শাখার পুরুষমেধ বা নরমেধ প্রকরণে উক্ত হইয়াছে, অগ্নিষ্ঠ যূপ অর্থাৎ অগ্নির সমীপবর্ত্তী প্রথম যূপে ব্রাহ্মণাদি পশু বন্ধন করিবে। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার সেবনীয় ব্রাহ্মণাদি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির তালিকায় উক্ত হইয়াছে, "মায়ায়ৈ কর্মারং লোহকারং" অর্থাৎ কর্ম্মকার মায়াদেবীর জুষ্ট বা প্রীতিপূর্ব্বক সেবনীয়। যজুর্ব্বেদ পাঠে মনে হয় যে, দেবতার প্রীত্যর্থে আত্মবলি আর্য্য সমাজের দৈনন্দিন ঘটনা ছিল।

পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই বলেন যে, বৈদিক যুগে কর্ম্মকারগণের আসন আর্য্য সমাজের অতি উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহারা অথর্ববেদোক্ত পর্ণমণির উদ্দেশে রচিত উপরোক্ত স্তোত্রের উল্লেখ করেন। কর্ম্মকারগণ যে আর্য্য সমাজে প্রভূত ক্ষমতাশালী ছিলেন, এমন কি রাজাও তাঁহাদিগকে ভয় করিতেন, তাহা উক্ত পর্ণমণির স্তোত্র হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই কেবল আর্য্য সমাজ কেন, যে কোন সমাজেই যে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হইবেন তাহাতে বিস্ময়কর কিছুই নাই। শিব সংহিতার মতে, "মাননীয় মনীষিনাম্।" কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে বৈদিক যুগে রাজা আর্য্যসমাজভুক্ত প্রধান ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইতেন এবং কর্ম্মকারগণ এই নির্ব্বাচন কার্য্যে যোগদান করিবার অধিকারী ছিলেন। তাহা হইলে, বেদের উপরোক্ত প্রমাণগুলি হইতে সার সঙ্কলন করিয়া জানা যাইতেছে যে, কেবলমাত্র শিল্পবিদ্যার বলে কর্ম্মকারগণ বৈদিক যুগে আর্য্যসমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কর্ম্মকার জাতি সম্বন্ধে বেদের যে প্রমাণগুলি এই প্রবন্ধে আমি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম, ঐতিহাসিক সত্যের অনুসন্ধানে যাঁহারা ব্যাপৃত আছেন, তাঁহাদের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইলে এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ফলবতী হইবার আশা করা যায়।

যে জাতির ইতিহাস নাই, সে জাতির গৌরব করিবার কিছুই নাই। কর্ম্মকার জাতির ইতিহাস পুরাবৃত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া বেদের ভিতর দিয়া পৌরাণিক যুগে যে সকল অধ্যায় রচনা করিয়াছিল, তাহার ধারাবাহিক সূত্র অনুসন্ধান করিতে হইলে বহু গবেষণার আবশ্যক। হিন্দুশাস্ত্ররূপ মহাসমুদ্রের কোথায় যে কর্ম্মকারগণের লুপ্ত গৌরবের স্মৃতি সাধারণের চক্ষের অন্তরালে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা আমরা জানি না। পণ্ডিতগণ এ পর্য্যন্ত আমাদিগকে যতটুকু সাহায্য করিয়াছেন, তাহার মূল্য কিছুই নয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এরূপ অবস্থায় আমি আশা করি শিক্ষিত কর্ম্মকারগণ অতঃপর অন্যের উপর নির্ভর না করিয়া বেদ পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে নিজেরাই স্বশ্রেণী সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহে রত হইবেন। ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক কিন্তু সত্যের অনুসন্ধান না করিয়া যদি কোনও মতবাদের খাতিরে শাস্ত্রালোচনা করেন, তাহা হইলে তাঁহার সিদ্ধান্ত পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হইবার সম্ভাবনা। বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মণেতর কোনও কোনও শ্রেণীর ঐতিহাসিকেরা স্ব স্ব জাতির ইতিহাস

লিখিতে বসিয়া অনেক সময়ে সত্যের অপলাপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার ফলে, বঙ্গদেশে অসংখ্য অমূলক প্রবাদ বাক্য, জাল পুঁথি, কারিকা, কুলপঞ্জী, শিলালিপি, তাম্রফলক ইত্যাদির সৃষ্টি হইয়াছে। শুনা যায়, কয়েকখানি জাল উপপুরাণও লিখিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ প্রত্নতত্ত্বের আলোকে লিপিতস্কর, উৎক্ষেপক, প্রক্ষেপক ও বেনাম লেখকের ঘৃণ্য ব্যবসাকে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিয়া দিয়া সমাজের যথার্থ উপকার করিয়াছেন। আমি সেইজন্য শিক্ষিত কর্ম্মকার-গণকে সানুনয় অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন কর্ম্মকার জাতি সম্বন্ধে শাস্ত্রগ্রন্থ বা অন্য কোনও গ্রন্থ আলোচনা করিতে বসিয়া 'যৎ পঠিতম্ তৎ সত্যম্' মনে না করেন। জাতীয় ইতিহাসের সৌধ সত্যের উপর স্থাপিত না হইলে তাহা অচিরে লোপ পাইবে। বেদরূপ কল্পতরু হইতে অমূল্য রত্ন আহরণ করিয়া যিনি স্বজাতি-নারায়ণের সেবার জন্য তাহা নিঃস্বার্থভাবে অর্পণ করিবেন, তিনি ধন্য। আমার সামান্য শক্তির উপযুক্ত খণ্ড নৈবেদ্য মাত্র আপনা-দিগকে আমি এ বৎসর নিবেদন করিয়া দিলাম।

পত্রলেখার প্রতি।

[শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়, এম-এ]

তোমারে ঘেরিয়া যে রাগিণী বাজে
ভাষা তার নাহি শুনি;
আসা যাওয়া তব কখন গোপনে
কেহ রাখে নাই গুণি;
নীরব প্রাণের একখানি ব্যথা,
অতি সকরুণ স্নিগ্ধ মমতা,
মনে হয় কোথা রাখিয়াছে যেন
স্বপনের জাল বুনি।

কবে একদিন করিলে প্রবেশ
স্বপনের ছবি মত,
হিয়া দুরু দুরু, চরণে জড়িমা,
দুটি আঁখি লাজ নত;
কোথা হ'তে এলে নাহি পড়ে মনে,
কি কথা কহিলে কবে, কার সনে,
বিজয়ীর পায় তুমি উপহার
—দাসী চিরসেবারত।

জানিনা'ক হায় কেমনে কেটেছে
জীবনের দিনগুলি;
কম্পিত করে কার ছবিখানি
এঁকেছে ধরিয়া তুলি;
কারে মনে মনে সঁপেছিলে প্রাণ,
বিরলে কাহার গেয়েছিলে গান
কদলীর ছায়া কুঞ্জবিতানে
আপনার কথা ভুলি'।

সারা পট ভরি' আলোকোজ্জ্বল
মহাশ্বেতার ছবি
একমনে শুধু গিয়াছে আঁকিয়া
আনমনা সেই কবি;
তুমি তার পাশে সন্ধ্যার তারা,
ক্ষীণ আলো বুকে আপনায় হারা,
অনাদরে হায় লুটায় ধরায়
তোমার যা' কিছু সবি।

পুঁথি শেষ হয়, ফুরাইয়া আসে
বিরাট রঙ্গভূমি;
অবসান দিন, ঝরে পড়ে ফুল
ধরণীর ধূলি চুমি;
শুধু মনে হয় কোথা সেই পুর,
কোথা সে কাহিনী মৌন মধুর,
যেথা আনমনে গৃহবাতায়নে
পথ চাহি আছ তুমি।

কাশ্মীর-কাহিনী।

[শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জলবায়ু—কাশ্মীর সাধারণতঃ শীতপ্রধান। কাশ্মীরের ঋতু-পরিবর্ত্তন খুব অল্প সময়েই হয়। সেইজন্য একটি প্রবাদ আছে "কাশ্মীর, পাখা পোস্তিন" (অর্থাৎ পাখা ও লোম-শীতবস্ত্র একত্র লইয়া এখানে বাস করিতে হয়)। শীতের সময় প্রচুর পরিমাণে তুষারপাত হয় এবং ভীষণ কোয়াসার সৃষ্টি হয়। এমন কি, মধ্যে মধ্যে নদী ও হ্রদগুলি জমিয়া যায়।

হেমন্তকালটি সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর। বসন্তকাল মধুময় এবং গ্রীষ্মকালে গরম পড়ে বটে, কিন্তু তাহা বাঙ্গালা দেশের পশ্চিমাঞ্চলের দেশগুলির মত অসহ্য নয়।

কাশ্মীরিরা বৎসরটিকে নিম্ন ছয় ঋতুতে ভাগ করিয়াছে :—(১) সণ্ট্ (বসন্তকাল)—(২) রেতাকোল্ (গ্রীষ্মকাল)—(৩) ওয়াহারা (বর্ষাকাল)—(৪) হারুদ্ (হেমন্তকাল)—(৫) ওয়ান্দা (শীতকাল)—(৬) শিশুর্ (তুষারকাল)।

কাশ্মীরের বায়ু-প্রবাহ সাধারণতঃ শান্তশিষ্ট। কখনও কখনও ঝড়ও হয়। উত্তর-পূর্ব্ব বায়ুকে ভিজি ওরা, উত্তর পশ্চিমের হাওয়া কামরাজ, পশ্চিম বায়ু নাট্, পূর্ব্ব বায়ু সিন্দাবাটু, দক্ষিণ বায়ু বাণাহল এবং উত্তর বায়ুকে নাগাকোণ্ বলে। সমস্ত শীতকাল ধরিয়া চাং নামক প্রবল বাত্যা ঝিলাম উপত্যকায় বহিয়া যায়।

সাধারণতঃ কাশ্মীরের জলবায়ু সর্ব্বসময়েই স্বাস্থ্যকর ও আনন্দদায়ক। গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে বিবিধ বর্ণের ফুলে কাশ্মীর উপত্যকা একটি নন্দন-কাননে পরিণত হয়। এবং হেমন্তকালে তরুলতা সুমিষ্ট ও অমৃতময় ফলভারে নয়নের প্রীতি ও আস্বাদনের লালসা বৰ্দ্ধন করে।

লোক-পরিচয়—কাশ্মীরে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কয় শ্রেণী লোক বাস করে।

(১) দোগ্রা—সাধারণতঃ বেঁটে এবং হৃষ্টপুষ্ট।

(২) কাশ্মীরী লোক প্রাচীন আর্য্যজাতি সম্ভূত। তাহাদের বর্ণ রক্তিমাভ ও শুভ্র, দেখিতে অতি সুশ্রী এবং দেহের গঠন সুন্দর।

(৩) লাদাকের বাসিন্দাগণ সাধারণতঃ মোঙ্গোলিয়ান জাতি সম্ভূত।

(৪) বারামুলা ও মজ্জাফাবাবাদের মধ্যে ঝিলাম নদীর দক্ষিণ দিকে বাম্বাস্ নামক জাতি বাস করে। ইহারা দামাসকাসের বাণি-উমিয়া জাতি সম্ভূত। তাহারা খৃঃ অব্দ ১৩২২ হইতে এস্থানে বাস করিতেছে।

(৫) বারামুলা ও কোহালার মধ্যে ঝিলাম নদীর বাম তীরে খাকস্ এবং হাটমল নামক দুই শ্রেণীর লোক বাস করে। খকু এবং হাতু নামক দুইজন রাজপুত ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জৈনুলবদীন রাজার অধীনে কাজ করিয়া এইস্থানে একটি জায়গীর পায়। উক্ত খাকস এবং হাটমল তাহাদের বংশ সম্ভূত।

লোকচরিত্র—পূর্ব্বে বলিয়াছি, কাশ্মীরের জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমানই অধিক। কিন্তু তাহাদের চরিত্রের বিশেষত্ব এই যে, তাহারা পরস্পর বিদ্বেষভাব পোষণ করে না। কাশ্মীরে কোনও লোকের মুখে শুনি নাই যে ধর্ম্ম, সমাজ বা কোনও বিষয় লইয়া তাহাদের মধ্যে একটা বিশেষ রকম দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়াছে। তাহাদের ব্যবহার অতি শিষ্ট। আমরা কলিকাতা হইতে একটা ধারণা নিয়ে যাত্রা করেছিলাম, যে তাহাদের সঙ্গে ব্যবহারে আমাদের না জানি কতই গোলমাল হইতে পারে. কিন্তু সেখানে দেখিলাম আমাদের পূর্ব্ব ধারণা একবারে ভ্রান্তিমূলক। ইহাদের একান্ত সভ্য ও বিনম্র ব্যবহার আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। ইহাদের আত্মসম্মান বোধ আছে। সাধা-

রণতঃ ইহারা বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী। দারিদ্র্যের জন্য অনেক সময় বাধ্য হইয়া কাহাকেও অপকার্য্য করিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাদের স্বাভাবিক মনের গতি সে দিকে নয়, একটু বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায়।

কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়—জাপানের মত কাশ্মীরও শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। কাশ্মীরী শাল চিরপ্রসিদ্ধ। ভাল একখানি শাল তৈয়ারী করিতে ২।৩ বৎসরও সময় লাগে। ১৫৲ হইতে ২০,০০০৲ টাকা মূল্যের শাল কাশ্মীরে প্রস্তুত হয়। শুনা যায়, প্রতি বৎসরে ইংলণ্ডের মহারাণীকে তিনখানি শাল প্রেরণ করা হইয়া থাকে। রেশমের কাজ এখানে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। প্রায় ৫০০।৭০০ লোক এখানকার রেশমের কারখানায় নিয়মিত কার্য্য করে। জম্মুতেও একটি রেশমের শিল্পাগার আছে।

কাঠের কাজ, সূতার কাজ, স্বর্ণরৌপ্যের কাজ, চেক্-পট্টু, কার্পেট প্রভৃতি এখানে অতি নিপুণতার সহিত নিখুঁত ভাবে তৈয়ারী হয়।

ফলের বাগান এবং ফলের চাষ অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা। ইহা হইতে দেশবাসীর যথেষ্ট অর্থ সমাগম হয়।

কাঠ, তিসি, শস্যাদি, ফলমূল, রেশমী ও পশমী বস্ত্রাদির চালান অধিক। শ্রীনগরে লালমণ্ডীতে একটি মিউসিয়ম আছে, তাহাতে দেশের শিল্পজাত সামগ্রীনিচয় প্রদর্শনের জন্য রক্ষিত আছে।

শাস্ত্রচর্চ্চা ও শাস্ত্রগ্রন্থ ধ্বংস সম্বন্ধে প্রবাদ—কাশ্মীর যখন ব্রাহ্মণ-প্রধান দেশ ছিল, তখন দেশটী প্রাকৃতিক শোভাসম্পদের অনুরূপ জ্ঞান-গৌরবেও প্রধান ছিল। ১৫শ বর্ষের 'অর্চ্চনা'য় ৮ কাশীধামের ব্যাকরণোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় "কাশ্মীরে শাস্ত্রচর্চ্চা" শীর্ষক একটি গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বোধে সেই প্রবন্ধ হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

"ন্যায়, বেদান্ত, কাব্য, ইতিহাস, তন্ত্র, ব্যাকরণ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই কাশ্মীরদেশীয় পণ্ডিতগণ অনন্যসাধারণ প্রতিভা প্রকাশ করিয়া জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সেই সকল গ্রন্থ এক্ষণে অনেকাংশে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কথিত আছে, জয়াপীড় নামক প্রবল পরাক্রান্ত কাশ্মীরনৃপতি নেপাল আক্রমণ করিয়া তথায় শত্রুহস্তে বন্দী হ'ন। রাজার অনুপস্থিতিকালে রাজ্ঞী রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। এই অবসরে সুযোগ বুঝিয়া রাজার শ্যালক কাশ্মীর আক্রমণ করেন। ভ্রাতার নিকট রাজ্ঞীর প্রেরিত সৈন্য পরাজিত হয়। পতিব্রতা রাজ্ঞী পতির শত্রু স্বীয় ভ্রাতার অধীনতা স্বীকার না করিয়া, খুব সাধারণ ভাবে কতিপয় বিশ্বাসী পরিজন সঙ্গে লইয়া, রাজধানী হইতে পলায়ন করেন এবং এক গ্রামে ছদ্মবেশে সামান্য ভাবে বাস করিতে থাকেন। রাজ্ঞী অলোকসামান্য রূপবতী ছিলেন। সেই গ্রামের কোন ব্রাহ্মণ যুবা রাজ্ঞীর রূপলাবণ্যে অত্যন্ত বিমোহিত হন; অবশেষে মানসিক উৎকট চাঞ্চল্যবশতঃ তিনি কঠিন পীড়ায় অভিভূত হইয়া পড়েন। অনেক চিকিৎসা করিয়াও ঐ পীড়ার কিছুমাত্র উপশম হইল না, ব্রাহ্মণ যুবা উত্তরোত্তর অধিকতর অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, অবশেষে মৃত্যুর করালছায়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। এই ব্রাহ্মণ যুবা এক বিধবার একমাত্র পুত্র ছিলেন। অনাথা বিধবা অনেক চেষ্টায় পুত্রের পীড়ার কারণ সবিশেষ অবগত হইলেন। রাজ্ঞীকে তিনি রাজ্ঞী বলিয়া জানিতেন না; পরন্তু এক সুশীলা মহীয়সী মহিলা বলিয়া জানিতেন। তিনি রাজ্ঞীর নিকট উপস্থিত হইয়া একান্তে তাঁহাকে সকল কথা জানাইয়া উপস্থিত বিপদে কাতর ভাবে তাঁহার দয়া ভিক্ষা করিলেন। মহীয়সী রাজ্ঞী তাঁহাকে মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা দিয়া বিদায় করিলেন, এবং পরদিন আসিতে বলিয়া দিলেন। তাহার পর, পরদুঃখ-কাতরা জয়াপীড়মহিষী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের নিকট ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যদি কোন ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষার্থ কোন নারী নিজের পাতিব্রত্য খণ্ডিত করে, তবে তাহার শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত কি? পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দিলেন যে, এরূপস্থলে তুষানলই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। ধর্ম্মপরায়ণা রাজ্ঞী সেই অনাথা বিধবার পুত্রের প্রাণরক্ষা করিয়া অবশেষে তুষানলে জীবন-বিসর্জ্জন করিলেন। এদিকে জয়াপীড় কৌশলে কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নিজের সৈন্য সকল একত্র করিলেন এবং অতুল বিক্রমে নেপাল

আক্রমণ করিয়া পদদলিত ও লুণ্ঠিত করিলেন। তাহার পর, বিজয়ী সৈন্য লইয়া কাশ্মীরের দিকে প্রধাবিত হইলেন। তাঁহার শ্যালক তাঁহার পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া কাশ্মীর ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। জয়াপীড় কাশ্মীরে উপস্থিত হইয়া পত্নীর শোচনীয় পরিণাম অবগত হইয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তাঁহার পত্নীর এইরূপ শোচনীয় পরিণামের কথা সাধারণে জানিত না, রাজাও প্রচার করিলেন না। এক সময়ে তিনি রাজ্যের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। এই পণ্ডিতেরা তুষানলের ব্যবস্থা দিলেন না, দান ও অনুরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিলেন। রাজা মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, পরন্তু বাহিরে হৃদয়ের ভাব কাহাকেও জানিতে দিলেন না; যথোচিত সম্মানের সহিত পণ্ডিতবর্গকে বিদায় করিলেন। ইহার পর, রাজা মন্ত্রিগণকে আদেশ করিলেন যে, "আমার শাস্ত্রগ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে; আমার রাজ্যে যাহার নিকট যত শাস্ত্রগ্রন্থ আছে, সমস্ত সংগ্রহ করিতে হইবে। ঘোষণা করা হউক যে, শাস্ত্রগ্রন্থের বিনিময়ে গ্রন্থের স্বামী তুল্য পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা পাইবেন।" রাজার আদেশানুসারে এইরূপ ঘোষণা করা হইল, প্রজাবৃন্দ দলে দলে আসিয়া স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে শাস্ত্রগ্রন্থ সকল রাজভাণ্ডারে প্রদান করিতে লাগিল। রাজকোষ শূন্য হইল, সেখানে স্বর্ণমুদ্রার শূন্যস্থান গ্রন্থরাশির দ্বারা অধিকৃত হইল। এইরূপে যখন গ্রন্থ সংগ্রহ সমাপ্ত হইল, তখন একদিন অকস্মাৎ জয়াপীড় শুষ্ক কাষ্ঠস্তূপের সহিত অমূল্য গ্রন্থরাজি সজ্জিত করাইয়া দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ইহার পূর্ব্বে মন্ত্রী বা প্রজাবর্গ কেহই তাঁহার অভিপ্রায় বিন্দুমাত্র জানিতে পারে নাই। এইরূপে পত্নীশোকে উন্মত্তপ্রায় রাজা জয়াপীড়ের ক্রোধের ফলে অসংখ্য শাস্ত্রগ্রন্থ ভস্ম হইয়া গেল।

এই ঘটনা 'তবারিখ কাশ্মীর' নামক পারস্য ভাষায় লিখিত—কাশ্মীরের ইতিহাসে বর্ণিত আছে। কহ্লন পণ্ডিতের 'রাজতরঙ্গিণী'তে এ কথার কিছুমাত্র উল্লেখ না থাকায় অনেকেই ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া থাকেন। পাঠান রাজগণের সময় বহু শাস্ত্রগ্রন্থ 'ডল' নামক হ্রদে নিমজ্জিত করা হইয়াছে, এমন কি সেই সময়ে 'ডলে'র অন্তর্গত একটী পথ শাস্ত্রগ্রন্থের সমবায়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহা অদ্যাবধি জনশ্রুতি ঘোষণা করিতেছে। শ্রীনগরের নিকটবর্ত্তী 'বিচারনাগ' ও 'পণ্ডিতপুর' নামক দুইটী গ্রাম বিদ্যাপীঠরূপে প্রসিদ্ধ ছিল। পাঠান রাজগণের প্রথম আক্রমণের সময় এই দুই স্থানের অধিবাসিগণ বহু শাস্ত্রগ্রন্থ ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়াছিলেন; ঐ সকল গ্রন্থ কেহ আর উদ্ধার করিতে পারেন নাই, সমস্তই পৃথিবীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

* * *

কাশ্মীরদেশীয় জয়ন্তভট্ট-প্রণীত "ন্যায়মঞ্জরী" অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। এই গ্রন্থ এক সময়ে পঠন-পাঠনে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 'ন্যায়'রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গেশোপাধ্যায় তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থে জয়ন্তভট্টের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বেও কাশ্মীরে এই গ্রন্থের পঠন-পাঠন প্রচলিত ছিল।...জয়ন্তভট্ট যেমন নৈয়ায়িক, তেমনই অসাধারণ কবি ছিলেন। তিনি বহুস্থলে অতি-নিগূঢ় দার্শনিক বিচার সকল সুললিত পদ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ন্যায়দর্শনের অনেক বিষয়ে জয়ন্তভট্ট নিজের স্বতন্ত্র মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।..

কাশ্মীরক সদানন্দ-প্রণীত অদ্বৈতব্রহ্ম-সিদ্ধি বেদান্তের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। 'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ' অদ্বৈতমতের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।......"প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন" কাশ্মীরের অনন্যসাধারণ সম্পত্তি।...কাশ্মীরে অলঙ্কার শাস্ত্রের অতিশয় চর্চ্চা ছিল; এমন কি, কাশ্মীর দেশকে অলঙ্কার শাস্ত্রের জন্মস্থান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।...বর্ত্তমান সময়ে অলঙ্কার শাস্ত্রের যতগুলি গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে কাব্যপ্রকাশই তীক্ষ্ণবুদ্ধি পণ্ডিতগণের সবিশেষ আদরণীয় ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থখানিকে 'সাহিত্যদর্শন' বলা যাইতে পারে। এই গ্রন্থের প্রণেতা মম্মট ভট্ট কাশ্মীরী ছিলেন।...

কাব্যরচনায় কাশ্মীরকগণের কৃতিত্ব কম নহে। আমাদের মনে হয়, মিথিলা, বঙ্গদেশ, দাক্ষিণাত্য ও কাশ্মীর—

এই চারি দেশেই বিশেষ ভাবে কাব্যশাস্ত্রের পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে। কাব্যপ্রকাশে উদাহরণরূপে উদ্ধৃত অনেক কবিতা কাশ্মীর দেশে রচিত। অমরু-শতক অতিশয় উৎকৃষ্ট কাব্য। এই অমরু-কবি কাশ্মীরক ছিলেন। আমাদের বিশ্বাস, বাণভট্ট কাশ্মীরী ছিলেন। বাণের হর্ষচরিত পূর্ব্বে কাশ্মীরেই প্রচলিত ছিল। কাশ্মীরের মহারাজ ৺ রণবীর সিংহ প্রথমে এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করেন। বঙ্গদেশে প্রাতঃস্মরণীয় ৺ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমে হর্ষচরিতের প্রচার করেন; তিনি ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, আদর্শ-পুস্তক কাশ্মীর হইতে আনীত হইয়াছে। হর্ষবর্দ্ধন, রাজ্যবর্দ্ধন প্রভৃতি রাজগণও কাশ্মীরী ছিলেন—ইহা আমাদের বিশ্বাস। প্রাচীন কাশ্মীরকগণের নামের শেষেই "বর্দ্ধন" শব্দ সংযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কহ্লন পণ্ডিতের রাজতরঙ্গিণী ইতিহাস হইলেও অসাধারণ কবিত্বে পরিপূর্ণ—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই রাজতরঙ্গিণী পর্য্যালোচনা করিলে কাশ্মীর দেশীয়গণের ইতিহাস রচনায় কৃতিত্ব বুঝিতে পারা যায়। এই গ্রন্থে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া কাশ্মীর রাজগণের ইতিহাস বর্ণিত আছে। ..

ব্যাকরণ-চর্চ্চায় কাশ্মীর সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ছিল, এ কথা না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। ব্যাকরণ-মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি কাশ্মীরদেশীয় ছিলেন, ইহা কাশীর অধ্যাপক সম্প্রদায়ে চিরন্তন প্রচলিত প্রবাদ।"

শ্রীনগরে প্রথম রজনীর পর্ব্ব।

ঝিলাম নদীর প্রধান সেতু 'আমীরা কদল্' পার হইয়া কাশ্মীর রাজের শ্রীনগরস্থ ধরমশালার দুয়ারে যখন আমাদের মোটরগুলি আসিয়া পৌছিল, রাত্রি তখন ৮৷৹টা। তুষার-ধবল সরল সুপ্রশস্ত রাজপথ ইলেকট্রিক আলো ও জ্যোৎস্না-সম্পাতে চক্‌চক্ করিতেছে। বর্ত্মের উভয় পার্শ্বে ১০ ফুট অন্তর সমুন্নত চিনার বৃক্ষের অনন্ত শ্রেণী পথের সৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। বড় বড় শাদা হরফে শাল-মার্চ্চেণ্ট, টেলার্স এণ্ড কাটারস্, মনোহারী দোকান, Motor-transport Co. ইত্যাদির সাইনবোর্ড দেখিয়া বুঝা গেল যে, অতিথি-অভ্যাগতের সুবিধার জন্য মহারাজ বাজারের সন্নিকটে অথচ নদীর অনতিদূরে ধরমশালার হর্ম্ম্যটি নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। নব-নির্ম্মিত দিব্য ত্রিতল অট্টালিকা, বড় বড় হাল-ফ্যাসানি জানালা, সুন্দর কারুকার্য্য-বিশিষ্ট কাঠের সিঁড়ি ইত্যাদি দেখিয়া বাড়ীটি সকলের বড় পছন্দ হইল।

শ্রীনগরে 'গোলাপী' শীত তখন সবেমাত্র পড়িয়াছে। কিন্তু, এখানকার এই 'গোলাপী' শীতেরই এমন দাপট্ যে, রাত্রি ৮৷৹টার মধ্যেই দোকান-পসার অধিকাংশ বন্ধ, রাজ-পথ জন-বিরল! দূরে একটা পানের দোকানে আলো ও গুটীকত কাশ্মিরী-যুবকের সমবেত উল্লাস দেখিয়া মনে হইল—স্ফূর্ত্তিপ্রিয় যুবকবৃন্দের নিশাচরী সখের কাছে শীতের এ হাড় হিম-করা দুরন্ত প্রকৃতিও জব্দ হইয়াছে। আমরা মোটা ড্রয়ার, প্যাণ্ট, ওয়েষ্ট-কোট, ওভার-কোট, বালাক্লাভা, তদুপরি আ-কণ্ঠ কম্ফর্টার জড়াইয়া দারুণ শীতে 'হি হি' করিয়া যখন বংশ-পত্রের মত কাঁপিতেছি, যুবক কয়টি মোটা সুতির চুড়ীদার ও পায়জামার উপর পট্টুর একটা ওয়েষ্ট-কোট পরা—তার উপর একটা ছিপ্‌ছিপের কাশ্মিরী দোরোখা অবহেলা ভরে বিন্যস্ত,—পানের দোকানের সম্মুখে উচ্চ হাসির [illegible] তুলিয়া পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। শীতের প্রতাপ যতই কঠোর—গোলাপী, বেলা, চামেলী বা বকুলে—যাহাই হউক না কেন, উহাদের তাতে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। শীত-কাতুরে হৃষীকেশ তাহাদের দিকে প্রশংসমান নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া তাহার স্বরচিত উৎকট ভাষায় রায় দিল—'অহো! যৌবনের স্ফূর্ত্তি কি দুর্জ্জয় শক্তিধর হে! এই দুর্গম বাঘা শীত ওদের কাছে চরমাধম কেঁচো-প্রায় তুচ্ছ!'

এখন, বিরাট লগেজগুলির সমুদ্ধারের উপায় কি? মোটরচালক আমাদের মনোভাব অবগত হইয়া "স্মি রী রী রী" করিয়া দুর্ব্বোধ্য কাশ্মিরী ভাষায় এক তীব্র হাঁক দিল। পর মুহূর্ত্তেই দেখা গেল—পানের দোকানের পাশের সরু গলি হইতে গুটীচারেক বাচ্ছা কুলী তীব্রবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। তাহাদের রেষারেষী ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন দেখিয়া মনে হইতে লাগিল—যেন একটা সমাবেশের Atheletic sport এ দৌড়ের প্রতিযোগীতায়

জয়-মাল্য অর্জ্জন করিবার লোভে ছেলে ক'টা শ্বাস রোধ করিয়া প্রাণপণ চেষ্টা প্রয়োগ করিতেছে, এবং আমরাই তাহাদের winning-post, অর্থাৎ লক্ষ্যস্থল।

কুলী আসিল—আমরা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। মাতুল মহাশয় ও জ্ঞানেন্দ্র ঘর পছন্দ করিয়া লইতে সস্ত্রীক পুরী প্রবেশ করিলেন। আধ-ঘুমন্ত ছেলে দুটীকে লইয়া পাচক-ব্রাহ্মণ তাঁহাদের অনুগমন করিল। দোতালায় ঘর লওয়া আরাম-প্রিয় ইন্দ্র-ভায়ার অভিমত। কে আবার বার বার অত সিঁড়ি ভাঙ্গে, ওঠা-নাবা করে? কিন্তু দাশুদা বলিয়া দিলেন—"মামা, তেতালাতেই ঘর তিনটি পছন্দ করিবেন। কলিকাতা হইতে এত উচ্চে উঠিয়া এক্ষণে বোঝার উপর শাকের আঁটির মত এই তুচ্ছ সিঁড়ি কয়টা ভাঙ্গিতে আপত্তি করিলে দেশের লোকে শুনিয়া ঘৃণায় যখন 'ছি ছি' করিবে, পাল্টা জবাব কি দিবেন?"

খর্ব্বকায় কুলী-বালকেরা ইতিমধ্যে চক্ষের নিমেষে বিরাট লগেজগুলি যেরূপ অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সহিত মোটর হইতে রাজপথে নামাইয়া ফেলিল, তাহাতে বেশ বুঝা গেল—বেটারা বারো হাত কাঁকুড় হউক, তেরো হাত বিচি বটে। ... বন, আমাদের ইন্দ্র-ভায়া ছিলেন দৌড়ের চিরকাল পক্ষপাতী। প্রথম যৌবনে দৌড়ের পরীক্ষায় ৩।৪ বৎসর নাকি প্রথম পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। এ বয়সে যদিও সে অভ্যাসটা এখন প্রায় 'মোল্লার দৌড়ে' পরিণত হইয়াছে, তথাপি এখনো গ্রীষ্মে দৌড়-দার পাঞ্জাবী, শীতে দৌড়-দার শাল ভিন্ন অন্য কিছু তাঁর গায়ে রোচে না! জনশ্রুতি, ঘোড়-দৌড়ের খেলাতেও তিনি নাকি একজন অগ্রণী! দৌড়-শীল কুলীদের প্রতি প্রথম হইতেই তিনি অত্যন্ত খুশী হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহাদের এবম্বিধ কার্য্য-তৎপরতায় অধিকতর বিমুগ্ধ হইয়া ঝাঁ করিয়া একটি আধুলি তাহাদিগকে 'আগাড়ী বখ্‌সীস্' প্রদান করিলেন। কয়জন কুলীতেই drill-paradeএর মত একসঙ্গে তাঁহাকে লম্বা সেলাম করিয়া অতি দ্রুত যাহা বলিয়া গেল, তন্মার্থ এই, যে—সাহেবদের নিকট হইতে অন্ততঃ ১০৲ টাকা বখ্‌সিস্ তাহারা তো পাইবেই, এবং তদধিক সাহেবরা স্বানন্দ-চিত্তে যাহা খুসী দিবেন, তাহাতে বাঙ-নিষ্পত্তি করিবে, এরূপ অভদ্র তাহারা নহে। হৃষিকেশ চটিয়া আগুন! বলিল—"ইন্দুটা নেহাৎ ছেলে-মানুষ। বারো আনা কুলী-ভাড়ার বেশী যাহা লাগিবে, তাহা নির্ব্বুদ্ধিতার মাশুল স্বরূপ ইন্দুর নিকট হইতেই আদায় করা কর্ত্তব্য।"

মাল-পত্র উপরে উঠাইয়া লইয়া যাইতে উপদেশ দিয়া মাতুল মহাশয়ের উদ্দেশে গেলাম। ইন্দ্র, হৃষিকেশ ও দাশু-দা সিঁড়ির সর্ব্বনিম্ন ধাপে বসিয়া কুলীদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। সোপানে উঠিতে উঠিতে শুনিলাম, সাবধানী হৃষিকেশ তালিম দিতেছে—"ভাই সকল, হুঁসিয়ার! এক একজনে চারটে ক'রে চোখ বের কর। কুলী বেটারা মাল না সরায়।"

ধরমশালাটি সে সময়টা অভ্যাগত-বিহীন বলিলেও চলে। একতালার সব ঘরগুলিই খালি - দরজায় তালা বন্ধ। দ্বিতলের মাত্র দুইখানি ঘরে অতিথি-দেবদ্বয় বিরাজ করিতেছেন। ত্রিতলটিও একতালার সমভাব। কেবল একটি ঘরে দেব-নাগরী অক্ষরে 'কাশ্মীর-হিতকরী-সভা'র সাইনবোর্ড টাঙ্গান রহিয়াছে। ভিতরে মাত্র একটি লোক, চশমা পরিয়া অত্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে পাঠ-রত।

বাটীখানি টাট্‌কা, নূতন ও বহুব্যয়ে নির্ম্মিত। সর্ব্বত্রই বিজলী-বাতির সুবন্দোবস্ত। ভিতরের দিকে ৫ ফিট চওড়া বারান্দা—বৃষ্টির ঝাপ্‌টা নিবারণের জন্য রাণীগঞ্জ-টালির অনুকরণে কাশ্মীর-দেশীয় টালির দ্বারা প্রস্তুত আবরণ (shade) দেওয়া। ঘরগুলির প্রত্যেকটি ১৬ ফিট সম-চতুষ্কোণ। তৎপশ্চাতে আর একটি ১৬×৮ ফিট ছোট-ঘর—অন্দর-মহল এবং ষ্টোভ-সহযোগে ছোট-খাট রান্নাঘর রূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে। এই দুই ঘরের মধ্য দিয়া যাতায়াতের দরজা রহিয়াছে। পিছনে বহির্দ্দিকের বারান্দা ও তাহার আবরণ। খোলা জানালা দিয়া দেখা গেল—ঘরের দেয়ালগুলিতে জলের রঙে সুচারু painting করা। এক কোণে শীত-নিবারণের জন্য আগুন জ্বালিবার বন্দোবস্তও (fire-place) আছে। বারান্দা ও ঘরের মেঝেগুলি Indian Patent Stoneএর ধরণে প্রস্তুত—পরিষ্কার ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করিতেছে।

পশ্চিমের বারান্দায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—মাতুল

মহাশয় পশ্চাতে দুই হাত দিয়া পাইচারী করিতে করিতে তীব্র-স্বরে কঠিন মন্তব্য সকল প্রকাশ করিতেছেন। আমার ডাক-নাম ধরিয়া বলিলেন—"ওহে ছকু! এ কোথায় আনিলে বল দেখি! ইতিহাসগুলো দারুণ মিথ্যাবাদী। ছাপার অক্ষরে চিরটাকাল জগজ্জনকে জানাইয়া আসিয়াছে যে, কাশ্মীর অতি প্রাচীন দেশ—একান্ত অতিথি-পরায়ণ এবং আচার-বিধি-পদ্ধতি সুন্দর, কিন্তু এ কি ব্যাপার!" আমি থতমত খাইয়া গেলাম। দেখি—সেই দুর্দ্দান্ত শীতে বারান্দার এক কোণে ২।৩খানা কম্বল পাতিয়া মাতুলানী ও জ্ঞানেন্দ্রের স্ত্রী বিশুষ্ক মুখে বসিয়া আছেন,—ছেলে দুটী বামুন ঠাকুরের পাশে অঘোর হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—ম্রিয়মাণ জ্ঞানেন্দ্র রেলিং ধরিয়া অবনত-মুখে দণ্ডায়মান! শুনিলাম—ঘরগুলি সব খালি বটে, কিন্তু তালা বন্ধ! যার কাছে চাবি আছে, সে লোকটা নিরুদ্দেশ। অনেক চেষ্টায় এই খবরটুকু সংগ্রহ হইয়াছে যে,—লোকটা আহারাদি করিতে গিয়াছে। কখন সে ফিরিবে, এবং ফিরিবে কি না, তাহার স্থিরতা নাই। তবে মধ্যে মধ্যে রাত্রে সে ফেরেও বটে! মাতুল কহিলেন—"রাম বল! তুমি দেখে নিও ছকু, কাল প্রাতে ৮টার পুর্ব্বে সে আর এ ত্রিসীমানায় পদার্পণ করিবে না। এ দেশের ব্যবস্থা ভাল, কিন্তু বন্দোবস্ত একেবারেই নাই। বামুন-ঠাকুরের মুখে যাহা শুনিলাম, তাহাতে বুঝিয়াছি, এ বাটীর পায়খানা ও মেথরে আড়া আড়ী করিয়া অন্ততঃ গত ছয় মাস কাল ধনুক-ভাঙ্গা পণে ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক চালাইতেছে! রাধে-মাধব! এ হেন রাজকীয় সোণার লঙ্কা, আর তা'তে কি না হনুমানি-বন্দোবস্ত!"

রাওলপিণ্ডীতে শুনিয়াছিলাম- মীরা-কদলের নীচে ঝিলাম-বক্ষে হাউস্-বোটের উপর ভাল একটি কাশ্মিরী-হোটেল আছে। তথায় family-quarters ও পৃথক rooms ভাড়া পাওয়া যায়। সেখানে remove করিবার পরামর্শ স্থির হইল। কুলীরা মোট-ঘাটগুলি বারান্দায় আনিয়া জমা করিতেছিল। তাহাদের একটাকে সঙ্গে লইয়া মাতুল মহাশয়, জ্ঞানেন্দ্র ও আমি নীচে গেলাম।

দুঃসম্বাদে বন্ধুবর্গ সকলেই বিষণ্ন। হৃষিকেশ ও ইন্দ্র কুলীটাকে লইয়া হোটেলের সন্ধানে বাহির হইল। আমরা সেই রাত ৯টায় নিস্তব্ধ নির্জ্জন ধরমশালার ফটকের সিঁড়ির পৈঠায় বসিয়া—অনুপস্থিত চাবি-ওয়ালাটার উদ্দেশে মাতুল মহাশয়ের রোষ-বর্ষিত সমালোচনার বাছা বাছা তীক্ষ্ণ শর-জাল মাঠে মারা যাইতেছে—উপলব্ধি করিতে লাগিলাম।

জ্ঞানেন্দ্র পিপাসিত। সে একটি কুলীকে একটা সোডা ও গ্লাস দোকান হইতে আনিতে বলিল। দেখা দেখি—দাশুদা ও আমি উভয়েই তৃষ্ণা অনুভব করিলাম। উপরে মেয়েদেরও সোডা প্রয়োজন হইতে পারে। সুতরাং ৪টি সোডা ও গ্লাসের অর্ডার পাইয়া কুলী-বালকত্রয় যৎকিঞ্চিৎ উপরি-লাভের সম্ভাবনায় সোৎসাহে ও সানন্দে নক্ষত্র বেগে ছুটিল। শস্যঞ্চ গৃহমাগতম্!

আমি বলিলাম—"গতকল্য রাওলপিণ্ডী হইতে ডাক্তার দত্তের কথা মত বেলা ১২টার সময় যাত্রা করিতে না পারায় এই সমস্ত গোলযোগ-বিসম্বাদের মধ্যে পড়িতে হইয়াছে। দুপুরের সময় পিণ্ডী ছাড়িলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে অনায়াসে আমরা ডোমেল ডাক-বাংলায় পৌঁছাইতাম। তথায় রাত্রি-যাপনের পর আজ বেলা ১০টার সময় মোটরে উঠিয়া বৈকাল ৫টায় শ্রীনগরে পৌঁছাইলে—"

মাতুল মহাশয় আমার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন—"এ সমস্ত অসুবিধার সে ক্ষেত্রে টিকিটি পর্য্যন্ত দেখা যাইত না। তোমরা তো শুনিয়াছ, আমি কলিকাতা হইতে আসিবার সময় অনেক অনুসন্ধানে এখানকার Electrical Engineer শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন বসুর নিকট একখানি মোক্ষম সুপারিস-পত্র আনিয়াছি। তাঁহার যেরূপ প্রসার-প্রতিপত্তি ও নাম-ডাক, বেশাবেশি তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইতে পারিলে দুইখানা না হউক অন্ততঃ একখানা হাউস্-বোট আজই যোগাড় হইত।" দাশু-দা বলিল—"স্ত্রীলোকের গোছগাছ করিয়া লইতে একটু বিলম্ব ঘটিয়াই থাকে।" চিন্তান্বিত জ্ঞানেন্দ্র উৎকণ্ঠায় একদৃষ্টে হৃষিকেশ ও ইন্দ্রের পথপানে তাকাইয়াছিল। সে একটু মুখ ফিরাইয়া বিরক্তি-ব্যঞ্জক-স্বরে বলিল—"একটু নয় হে, বিশেষ বিলম্বই ঘটে! গতকল্য বেলা ১২টার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই আমার স্ত্রীর বিশেষ প্রয়োজনীয়

কি কি জিনিস-পত্র খরিদ করিবার জন্য বামুন-ঠাকুরকে ৩।৪ বার কালীবাড়ী হইতে রাওলপিণ্ডীর বাজারে ছুটিতে হইয়াছিল। কাজেই যাত্রা করিতে পৌণে ২টা বাজিয়া গেল।" দাশুদা ঈষদ্ধাস্যে জ্ঞানেন্দ্রের প্রতি বক্র কটাক্ষ করিয়া মৃদু একটু ঠোকর মারিয়া বলিল—"সেইজন্যই বোধ হয় শাস্ত্রে লেখে—পথে নারী বিবর্জ্জিতা।"

এইখানে দাশুদার হিসাবে একটু ভুল হইয়াছিল। ঠোকরটা জ্ঞান-দাকে তো লাগিলই, পরন্তু পরম পূজনীয় মাতুল মহাশয়েরও পদপ্রান্তে গিয়া পৌঁছিল। তিনি চটিয়া বলিলেন—"ও তোমার কথাই নয়! 'পথে নারী বিবর্জ্জিতা' কখনো হ'তে পারে? ও সব বইয়ের কথা, মুখের কথা,—কাজের কথা নয়! এই ধর না—পথের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন, দীর্ঘ, জটিল ও শ্রেষ্ঠ পথ কোন্‌টা? না, সংসার-পথ! ভাল, তা—সে হেন বিশেষ দুর্গম পথে চলা-ফেরার জন্য পনেরো আনা পৌণে চার পাইয়েরও অধিক লোককে যখন নারী-জাতির সাহচর্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তখন তোমার এই দার্জ্জিলিং-যাত্রা, সিমলা-যাত্রা বা কাশ্মীর-যাত্রা কি একটা পথের মত পথ? বাপু, কোন্ শাস্ত্রে তোমার ওই শোলোকটি লিখেছে?" সন্ত্রস্ত দাশু তখন মাথা চুলকাইতে লাগিল। ভয়ে ভয়ে অনুচ্চকণ্ঠে বলিল—"আজ্ঞে, শাস্ত্র ঠিক নয়, তবে কালিদাস বলেছেন।" মাতুল মহাশয় ধমক দিয়া বলিলেন—"রেখে দাও তোমার কালিদাস! আমি ও সব কালিদাস, হরিদাস, শ্যামাদাস, কেদার দাস, বহু দাস দেখেছি। হরেক রকম বদ-বিট্‌কেল শোলোকও শুনেছি! ও তোমার কথাই নয়।"

কুলীরা ৪টি সোডা ও ৪টি গ্লাস লইয়া উপস্থিত। জ্ঞানেন্দ্র, দাশু ও আমি তিনটির সদ্ব্যবহার করিলাম। একটি গ্লাস ও সোডা উপরে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। মাতুল মহাশয় সাত্বিক প্রকৃতির লোক—কোনো কালেই সোডা-ফোডার ধার ধারেন না। বলিলেন—"প্রয়োজন হইলে ধরমশালার প্রাঙ্গণে খাস্ হিমালয়-water-works হইতে আমদানী খাঁটী কলের জল আছে! সে water-worksএর chief engineerএর degree বা title নাই, কিন্তু জোড়াও নাই।" শ্রীনগরে দিবারাত্র কলে জল পাওয়া যায়, ইতিপূর্ব্বে জানিতাম না।

এই সময়ে হৃষিকেশ ও ইন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—হোটেলের house-boat খানির সমস্ত কামরাগুলি অধিকৃত—বড় জোর একটি মাত্র seat মিলিতে পারে। খবর শুনিয়া বুক আরো সাত হাত দমিয়া গেল। মাতুল মহাশয় শুষ্কমুখে নিরাশার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া—'দুর্গে! মা নিস্তারকারিণী!' বলিয়া হস্তস্থিত যষ্টির উপর ভর দিয়া সিঁড়ির ধাপে বসিয়া পড়িলেন। জ্ঞানেন্দ্র নিঃশব্দে তাঁহার পার্শ্বে গিয়া বসিয়া গালে হাত দিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। সকলেই বিমর্ষ—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়! এমন সময় কুলীদের একজন চীৎকার করিয়া উঠিল—'মোসাফিরখানার দারোগা-সাহেব আসিতেছেন।' মুহূর্ত্তে নির্জ্জীব প্রাণে আবার যেন জীবনী-শক্তি সঞ্চারিত হইল। আমরা একান্ত আগ্রহে বিস্ফারিত নেত্রে নবঘন-দরশনে চাতকের মত একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিলাম—পথিপার্শ্বস্থ চিনার বৃক্ষের তলা দিয়া এক ব্যক্তি পরম নিশ্চিন্ত মনে সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে ধীরপদে ফটকের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমাদের তখনকার মনের ভাবটা ছন্দে প্রকাশ করিতে গেলে বলিতে হয়:—

এস এস বঁধু এস আরো কাছে সখা এস,
দেখে মুখ হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচি।
কোথা শ্রীচাবির থোলো, খোল—দ্রুত দ্বার খোল,
বতক্ষণ পথ চেয়ে আছি।

দারোগা-প্রবর আমাদিগের দুর্গতির বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত অবগত হইয়া লজ্জিত হইলেন। কোমর হইতে আমাদের বড় কামনার ধন—সাধের মানিক সেই চাবির থোলোটি বাহির করিয়া আমাদিগকে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে বলিলেন। জ্ঞানেন্দ্র ও ইন্দ্র তাঁহার অনুগমন করিল। বামুন ঠাকুর উপর হইতে সোডার বোতল ও গ্লাস ফিরাইয়া দিতে নামিয়া আসিয়াছিল, সেও সঙ্গে গেল।

সোডার বোতল, গ্লাস ও তাহার দাম চুকাইয়া দিবার জন্য কুলীরা বিরক্ত করিতেছিল। চারটী সোডার দাম পাঁচ আনা ও গ্লাস-ভাড়া এক আনা, মোট ছয় আনা

দেওয়া হইল। সহসা আর এক বিপদ উপস্থিত—একটি গ্লাস হারাইতেছে। সেটা যখন কিছুতেই খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, কুলীরা তাহার দাম একটি টাকা চাহিয়া বসিল। হারানো গ্লাসের কুলী-বালকটা অদূরে চিনার গাছতলায় অস্পষ্ট জ্যোৎস্না-লোকে দাঁড়াইয়া কাঁদ-কাঁদ-স্বরে বারংবার আবৃত্তি করিতে লাগিল—গ্লাসের দাম না পাইলে দোকান-দার তাহার মাথা ভাঙ্গিয়া দিবে, কোর্ত্তা ফাঁসাইয়া দিবে, টেংরী গুঁড়া করিয়া দিবে, ইত্যাদি। ছেলেটার দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া মাতুল মহাশয় তাহার ক্রন্দন-স্বরে ব্যথিত হইলেন। তাহার কাছে যাইতে যাইতে স্নেহকণ্ঠে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন—"ছি বাবা! কাঁদিস্ নে। খুঁজিয়া দেখ—গ্লাস নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে।" মাতুলের সান্ত্বনা-বাণী অরণ্যে রোদন করিল। সম্ভবতঃ, সে উহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে নাই। অধিকন্তু, তাঁহাকে লাঠী-হস্তে নিকটস্থ হইতে দেখিয়া ভয় পাইয়া বালকটা ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া পশ্চাদপদ হইতে লাগিল ও সঙ্গে সঙ্গে কান্নার স্বর আর এক পর্দ্দা চড়াইয়া দিল। আমরাও খুঁজিয়া হতাশ হইয়াছিলাম। বলিলাম —"দূর হোক্ গে—টাকাটা ফেলিয়াই দেওয়া যাউক।" মামা আমাকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন—"টাকা আমি দিতেছি. তুমি ততক্ষণ হরিকেন্‌টা লইয়া এস। অন্ধকারে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতে পারিব না।" পরে মনি-ব্যাগ হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া আর্ত্ত বালকটিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"গ্লাসের দাম এই টাকাটি লইয়া যাও। ছুঁড়িয়া দিলে গ্লাসের মত আবার হয়ত টাকাটাও হারাইবে!" অপর কুলীরা এতক্ষণ দাঁড়াইয়া যেন মজা দেখিতেছিল, বলিতে লাগিল—ও লেড়্‌কা ভারী ভীতু। লাঠী দেখিয়া ভয়ে কাছে আসিতেছে না। টাকা তাহাদের হাতে দিলেই হইবে। মাতুল মহাশয় কিন্তু তাহাতে নারাজ। ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—"না বাপ-সকল, তাহা হইবে না। টাকাটি লইয়া বেচারাকে তোমরা ফাঁকি দিবে।" পরে হাত বাড়াইয়া টাকাটা বালককে দিতে গেলেন। মাতুলের সহানুভূতি-সূচক কণ্ঠস্বরে ছেলেটা এবার কতক সাহস পাইয়া টাকা লইবার জন্য যেমন হাত পাতিল, তিনি অমনি খপ্ করিয়া তাহার হাতখানি ধরিয়া আমাকে ডাকিলেন। আলো লইয়া কাছে গিয়া দেখি—ছেলেটা সেই হারানো কাচের গ্লাসটিকে দুই উরুর মধ্যস্থলে অতি সন্তর্পণে আল্‌তো চাপিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গ্লাসটি টানিয়া বাহির করাতে একটা বিষম হাসির রোল উঠিল। ফন্দী-বাজ চোর বালকটা ছাড়া পাইয়া চিনার-শ্রেণী ভেদ করিয়া এমন ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল, যেন Viceroy's Cupএর শেষ মুহূর্ত্তে Orange William দৌড়াইতেছে।

"পেটের দায়ে লোকে কত কি করে" বলিয়া মাতুল মহাশয় হাসিতে হাসিতে উপরের কি বন্দোবস্ত হইল দেখিতে গেলেন। বিস্মিত হৃষিকেশ তারিফ্ করিয়া বলিল—"হাঁ, মামা একটা ধড়ীবাজ বটেন। অনেক দেশ-ভ্রমণের এই সকল হচ্চে অভিজ্ঞতা! লজ্জার কথা হে! ওইটুকু একটা 'লিক্‌লিকে' কচি ছেলে আমাদের চোখে ধুলো দিচ্ছেল!"

পশ্চিমের বারান্দায় পাশাপাশি ৩টি মহল আমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রথমটিতে মাতুল মহাশয়, মধ্যে জ্ঞানেন্দ্র, অপরটিতে—'আমরা চারটি ইয়ার!' Suit-case ইত্যাদি ছোট ঘরে তুলিয়া রাখিতে ও Holdal কয়টি খুলিয়া বড় ঘরের চার কোণে বিছানা চারিটি প্রস্তুত করিতে কুলীদের মিনিট দশেক আন্দাজ লাগিল। প্রহরী রহিল—সন্দিগ্ধ হৃষীকেশের অনিমেষ সতর্ক চক্ষু! পরে ৪৲ টাকা মজুরী পাইয়া হৃষ্টমনে চলিয়া যাইবার সময় কুলীরা মাতুল মহাশয়কে সশ্রদ্ধভাবে আরো একটি 'বাড়্‌তি' সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল। বোধ করি, জানাইয়া গেল—গুণের আদর তাহারা জানে।

পর্য্যটন-ক্লান্ত শরীরটাকে বিছানায় এলাইয়া দিতেই আরামে চক্ষু মুদিয়া আসিল। তন্দ্রালসে বিভোর হইয়া কত কথা ভাবিতে লাগিলাম। এই তো সে মর্ত্ত্যে স্বর্গ কাশ্মীর! কতদিন কত বর্ষ ধরিয়া কত গল্প-জল্পনা—কত বিনিদ্র রজনীতে কল্পনায় এ দৃশ্যের কত রকম বিচিত্র-রঙীন ছবি অঙ্কিত করা! কত সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, উৎসাহ-উপহাসের মধ্যে তিল তিল করিয়া দিনে দিনে যে আকাঙ্ক্ষার পরিপুষ্টি হইয়াছিল, আজ এতদিনে তাহার

পরিতৃপ্তি হইল। দীন-দরিদ্রের নিধি মিলিল! জয় ভগবান! তোমার দ্বারে একনিষ্ঠ সাধনা ঐকান্তিক আর্ত্ত ভিক্ষা তবে ব্যর্থ হয় না? আকাঙ্ক্ষার ধন তবে তো পাওয়া যায়? এক-মনে এক-ধ্যানে জীবন পণ করিয়া—মাটির সঙ্গে মাটি হইয়া দিন, মাস, বর্ষ, যুগ ধরিয়া কাতর-যাচিঞা করিলে—বাঞ্ছাকল্পতরু! তবে বুঝি তোমায় পর্য্যন্ত পাওয়া যায়! মিথ্যা নয়, খেয়াল নয়, বুজরুকি নয়। আজ মনে হইতেছে—তুমি দুষ্প্রাপ্য বটে, কিন্তু অপ্রাপ্য নও! অবোধ আমরা—চেতনা ও বিশ্বাস হারাইয়া—অসম্ভব-জ্ঞানে ঔদাস্য ও অবহেলায় এতকাল ভুল-পথে চলিয়াছি। মূঢ়! নাস্তিক! মূর্খ! অনুশোচনায় নিজেকে যখন বারবার বেত্রাঘাত করিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল, তন্দ্রা কাটিয়া গেল।

জানালার কাচের সার্সি'র মধ্য দিয়া জ্যোৎস্নালোকে দেখা যাইতেছে—চতুর্দ্দিকের সেই দিগন্ত-বিস্তৃত শুভ্র শির পর্ব্বত-মালার অনন্ত-সুন্দর অপূর্ব্ব-মোহন সৃষ্টি! সুন্দর! কোথায় কে সুন্দর আছ, কই একবার এস দেখি! এ রূপের কণামাত্রের বিকাশ, কই একবার দেখাও দেখি! ওই যে অদূরে অনতিপ্রসর ঝিলাম নদী উপত্যকার মধ্য-দিয়া হিজিবিজি লেখার মত—আঁকা-বাঁকা পথের পথিক চঞ্চল-গতি হেলে সাপের মত অবিরাম শান্ত মৃদু-কল্লোলে পর্ব্বত-পাদদেশ হইতে নামিয়া আসিতেছে—ওই যে নদী-বক্ষে কত শত রঙিন-বিচিত্র হাউস্‌-বোট—চক্ষে ইলেক্‌ট্রিক আলো, বক্ষে মন্দ স্পন্দন—অনুকূল বায়ুর তাড়নে ও স্রোতের তালে ক্ষণে ক্ষণে মৃদু মৃদু দুলিতেছে নাচিতেছে,—ওই যে আকাশের আ-ভাঙ্গা চাঁদ ধরণীর সৌন্দর্য্যে আত্ম-হারা হইয়া ঝম্প দিয়া জল-তলে ডুবিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দে শিহরিয়া থর থর কাঁপিতেছে, একত্র এতগুলি অতুল সৌন্দর্য্যের সম্মিলন,—ইহারই বা তুলনা কোথায়!

দাশুদা'ও এতক্ষণ সর্ব্বাঙ্গ কম্বলে আবৃত করিয়া দেয়ালে পিঠের ঠেস্‌ দিয়া সার্সি'র কাচের অন্তরাল হইতে একদৃষ্টে হিম-শীর্ষ হিমালয়-শ্রেণীর দিকে অবাক হইয়া মুগ্ধ-নেত্রে চাহিয়াছিল। ঘোর-তমাকি হৃষিকেশের গড়গড়ার শব্দারম্ভে চমকিত হইয়া সহসা তাহার অস্তিত্ব ফিরিয়া পাইল। তাওয়া-দেওয়া ধুনুচির মত জ্বলন্ত কলিকা ও সম্ভোগ-তৃপ্ত হৃষিকেশ-নয়নে অর্দ্ধ-মোদিত ঢুলু ঢুলু আবেশ-ভাব পরিলক্ষ্য করিয়া বোধ করি সে কার্য্য-কারণের মধুর সম্বন্ধ উপলব্ধি করিল। অলক্ষ্যে একটা ঈর্ষাঙ্কিত কটাক্ষ হৃষির প্রতি নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিল—"তোমাদের কাহারও যদি এই স্বর্গ রাজ্যে আসিয়া পাঁচ মিনিটে অক্ষয় পুণ্য-সঞ্চয়ের উচ্চাভিলাষ থাকে, আমি এই মুহূর্ত্তে তাহার short-cut অর্থাৎ সোজা-সন্ধান বলিয়া দিতে পারি।" পুণ্যলোভাতুর হৃষী ব্যগ্র হইয়া প্রশ্ন করিল—"ব্যাপারটা কি বল দেখি! কি করিতে হইবে?" দাশুদা গম্ভীর হইয়া বলিল—"অবিলম্বে এক কপ্‌ গরম চা তৈয়ারী করিয়া আমার হাতে আনিয়া দাও।" "একান্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার" বলিয়া হৃষীকেশ পুনরায় গড়গড়ায় মনঃসংযোগ করিল।

দুই চারটা টান্‌ মারিতেই তাহার বুদ্ধি খুলিয়া গেল। বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া সে বলিল—"দেখ দাশুদা, অভাবে next best available'কে চালাইয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ! কাশ্মীর যাত্রা ভাগ্যে যদি না'ই ঘটে, কলিকাতায় বসিয়া ন্যাংটা, পেঁচো ইত্যাদির মত সকাল-সন্ধ্যা হেদোর চতুর্দ্দিকে বোঁ বোঁ চক্কোর মারার চেয়ে অন্ততঃ না-পর্য্যামানে শিলংটাও ঘুরিয়া আসা কি ভাল নয়!" দাশু বলিল—"অর্থাৎ? অত ঝাপ্‌সা হইতেছ কেন? স্বচ্ছ হইয়া দেখা দাও না!" হৃষী বলিল—"অর্থাৎ আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, যেমন মধু অভাবে গুড়ের চলন—শাস্ত্র-সম্মত, তেমনি 'চা অভাবে গুড়ুকং দদ্যাৎ' এইরূপ একটা নজীর এস্থলে খাটাইয়া লইলে তোমার কথিত সেই অক্ষয় পুণ্যের কতটা অংশ আন্দাজ অর্জ্জন করা যায়!" আজীবন তামাক-বিদ্বেষী দাশু এ রহস্য-প্রস্তাবে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিল! বিশেষ করিয়া খোঁচা দিবার জন্যই বলিল—"কতটা অংশ শুনিবে? 'পোলাও অভাবে পান্তা' এবং 'সোণা অভাবে রাংতা' পাইলে তুমি নিজে যতটা আন্দাজ খুশী হও। অধিকতর সঠিক proportion যদি জানিতে চাও, mathematicsএ M. A জ্ঞানেন্দ্র ও ঘরে আছে, কসাইয়া লও।" হৃষিকেশের কিন্তু সে বিষয়ে আর কোনো ব্যাকুলতা দেখা গেল না। সে পরম সুস্থির মনে গুড়ুক-ভজনা সুরু করিয়া দিল।

ইন্দু এতক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উভয়ের কথা-কাটাকাটি উপভোগ করিতেছিল। সতেজে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—"কুচ্ পরোয়া নেই দাশুদা! এ অক্ষয় পুণ্য-লাভ পুরাপুরি আমিই করিব।" দাশুদা তাহাকে উৎসাহ প্রদান করিয়া বলিল—"ভেলা মোর ভাই রে! লাগ্ তো একবার কোমর বেঁধে, দুর্জ্জনের মুখে চুণ-কালি পড়ুক!"

ষ্টোভ, চিনি, চা, পেয়ালা, condensed milk ইত্যাদি সব সরঞ্জামই সঙ্গে ছিল। ইন্দু over-coatটা পরিয়া ও-ঘরে চা প্রস্তুত করিতে গেল। আমিও ভাবিলাম, মিথ্যা নয়। এক কপ্ চা এখন এ অবসাদ-ক্লান্ত শরীরের পক্ষে যে সঞ্জীবনী-সুধা! এ কথাটা এতক্ষণ মনে হয় নাই! মিনিট ২।৩ কাটিয়া গেল,জ্বলন্ত ষ্টোভের হুস্ হুস্ শব্দ শোনা যায় না? দাশুদা অধৈর্য্য হইয়া হাঁকিল—"কৈ হে ইন্দু, অমূল্য সময় যে হেলায় হারাইতেছ!" বিকৃত-কণ্ঠে আওয়াজ আসিল—"ষ্টোভটা ছাই গেল কোথায়?" "সে কি" বলিয়া ধড়ফড় করিয়া হৃষিকেশ উঠিয়া পড়িল। আমরা ৪ জনে তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাস করিয়াও যখন ষ্টোভ পাইলাম না, হৃষিকেশ বলিল—"বৃথা চেষ্টা বন্ধুগণ! এ কার্য্য নির্ঘাত সেই কুলী-বেটারা 'উরুত-বাজী'র প্রণালীতে successfully সম্পন্ন করিয়াছে। সে আর মিলিবে না।" দাশুদা অবজ্ঞা-ভরে বলিল—"অসম্ভব কথা! বাক্স শুদ্ধ অত বড় একটা Primus stove কে 'উরুত-বাজী' করিতে হইলে পাণ্ডব-মার্কা ভীমসেনের উরুদ্বয়কে আসরে নামিতে হইবে। এ আর ছোট একটা 'ককরে' কাচের গ্লাস নয়!" গুড়গুড়ার নলটা হাতে তুলিয়া লইয়া হৃষিকেশ কহিল, "তোমার কথা মানিলাম। কিন্তু 'উরুত-বাজী'র পরিবর্ত্তে এবার যদি বেটারা 'বগল-বাজী' প্রয়োগ করিয়া থাকে? বাজীরও তো রকমারী আছে!" ভাবিবার কথা! সত্য! একটি মাত্র বাণ করায়ত্ত করিয়া কে কোথায় রণক্ষেত্রে অগ্রসর হয়? দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থার তারতম্যে সম্মোহন, ঐষিক, পাশুপত, ব্রহ্মাস্ত্র ইত্যাদির যথাযথ প্রয়োগ করাই তো নিপুণ যোদ্ধার সনাতন পদ্ধতি! হৃষিকেশের অখণ্ড্য যুক্তি অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া নিষ্ফল-ক্রোধে শয্যা গ্রহণ করিয়া দাশুদা গর্জ্জাইতে লাগিল—"তুমি কিন্তু দেখে নিয়ো ছক্কু, বেটারা অধঃপাতে যাবে—নরকে স্থান হবে না—নেমকহারাম—চা-হন্তারক—নচ্ছার বেটারা!" পাশের ঘর হইতে জ্ঞানেন্দ্র চিৎকার করিয়া বলিল—"তোমাদের কি কাণ্ডজ্ঞান নেই হে! এখানে ladies রয়েছেন, আর তুচ্ছ একটা ষ্টোভের জন্য এই দুপুর রাতে অসভ্যোচিত চেঁচামেচি করিয়া বাড়ী ফাটাইতেছ?" তাই তো! মহিলার অসম্মান! এত সোর-গোল ও চিৎকার করাটা তবে তো নিতান্তই অভদ্রোচিত হইয়াছে! বিশেষতঃ, জ্ঞানের স্ত্রী আবার সুশিক্ষিতা মহিলা—মধ্য-ইংরাজী না ছাত্র বৃত্তিতে Scholarship-holder। পরস্পর মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিয়া ও লজ্জায় জিভ কাটিয়া অধোবদনে যে যার শয্যায় স্থির হইয়া বসিলাম।

খানিকক্ষণ পরে দাশুদাই প্রথম মুখ খুলিল। আক্ষেপে ঠোট কামড়াইয়া বলিতে লাগিল—"থাক্‌তো এই সময় একটা আলাদীনের প্রদীপ! এই দণ্ডে ঘরের দেওয়ালে ঘসে বলতেম—"দৈত্যরাজ! আন তো বাবা চট্ ক'রে গরম এক কপ্ চা!" বোধ করি, সেই মুহুর্ত্তেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া গেল। বন্ধুবৎসল অজাত-শত্রু জ্ঞানেন্দ্র প্রসন্ন-মুখে দুই হস্তে দুই পেয়ালা অত্যুষ্ণ বাষ্পোত্থিত চা লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং দাশুদা ও আমার হাতে এক একটি বাটী দিয়া সহাস্যে বলিল—"ভায়া, প্রদীপ ঘসিতে হয় নাই। স্মরণ মাত্রেই দৈত্যরাজ চা লইয়া উপস্থিত। ইন্দু, তোমারও চা আসিতেছে। ঐ দেখ।" চাহিয়া দেখিলাম—স্বয়ং বধূ-ঠাকুরাণী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার মত এক-হস্তে চা ও অপর-হস্তে এক প্লেট cream craker বিস্কুট লইয়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে দুয়ার-সম্মুখে দণ্ডায়মানা! সকলেই 'হাঁ হাঁ' করিয়া উঠিল। "একি! আপনি নিজে কেন?"—"হুকুম করিলেই তো আমরা—" "বামুনটা কি ঘাস কাটে?" "ছি জ্ঞান-দা"—"হায় হায়!" ইত্যাদি। চা ও বিস্কুট জ্ঞানেন্দ্রের হস্তে দিয়া বধূ-ঠাকুরাণী ধীর মৃদু-কণ্ঠে বলিয়া গেলেন—"উঁহাদের 'হায়' 'হায়' করিতে নিষেধ কর! এমন কি রাজসূয়-যজ্ঞ করিয়াছি, যে এত ঢাক বাজিতেছে?"

জ্ঞান ও হৃষীকেশ চা'য়ে অনভ্যস্ত, উহারা বিস্কুটে ভাগ বসাইল, আর আমরা তিনজনে সেই কন্‌কনে শীতে সন্তঃ বাষ্পোত্থিত চা'য়ের পেয়ালা কয়টি আ-তল নিঃশেষ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম—অমৃত কেমন জানি না, বুঝিবা এরই কাছাকাছি একটা কিছু হইবে। চা'য়ের পালা শেষ হইলে সকলের উচ্চৈঃস্বরে বধূ-ঠাকুরাণীকে ধন্যবাদ-জ্ঞাপনের সমারোহ-ব্যাপারে নির্জ্জন ধরম-শালা-ভবন আরো খানিক-ক্ষণ গম্‌গম্‌ করিতে লাগিল।

হৃষিকেশ জিজ্ঞাসা করিল—"তোমরা কি এখন তবে নিদ্রায় আঁখি-নিবেশ করিবে?" জ্ঞানেন্দ্র বলিল —"কি বল হে হৃকু! উরীতে সকলে যেরূপ আহারের বহর দেখাইয়াছ, ক্ষুধার পীড়ন তো আজ আর নাই!" কথা সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই চপল-স্বভাব ইন্দ্র তড়াক্ করিয়া পকেট হইতে নশি-ব্যাগটি বাহির করিয়া আগ্রহে জ্ঞানেন্দ্রের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল—"নিকটে কোনো খাবার দোকানের সন্ধান পাইয়াছেন নাকি?" ইন্দুর কথায় সকলেই তখন পেট তলাইয়া উপলব্ধি করিল —খাবারের দোকানের সন্ধান লওয়াটা কর্ত্তব্য বটে! কিন্তু, জ্ঞানেন্দ্রের নিরুৎসাহ-জনিত ঘাড়-নাড়ায় সে নব-বিকশিত আশা-লতিকা নিমেষেই মুকুলে উন্মূলিত হইল। জ্ঞান নিজেও স্বীকার করিল—দুরন্ত জল-বায়ুর দোষে তাহার উদরেও এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে। এমন কি—পূজনীয় মাতুল মহাশয়ও অব্যাহতি পান নাই।

প্রস্তাব হইল—এত সস্তার ইলেক্‌ট্রিক আলোর মান-রক্ষা করিতে হইবে। খালি পেটে গানের আসর জমে না, সুতরাং স্থির হইল ২।১ বাজী পাশা-খেলার পর নিদ্রা-দেবীর শরণ লওয়া যাইবে। উদ্যোগী জ্ঞানেন্দ্র তৎক্ষণাৎ ও-ঘর হইতে পাশার সরঞ্জাম বাহির করিয়া আনিল, এবং পরক্ষণ হইতে 'ছ-তিন-নয়'—'কচে-বারো'—'পোহা-বারো' প্রভৃতি বাঁধা-বোল ও রাবণ-চিৎকারে রাজপথের অপর পার্শ্বস্থ কাশ্মীরী-অধিবাসীরা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিল যে, হাঁ —২।৪টে মানুষ শ্রীনগরে আসিয়াছে বটে! পর-কক্ষে যে মহামান্যা মহিলা রহিয়াছেন, জ্ঞানেন্দ্রেরও তখন সে হুঁস নাই।

পাশার নেশায় মস্‌গুল হইয়া আন্দাজ ঘণ্টাখানেক কাটিয়াছে। সহসা আমাদের কক্ষের দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দে জ্ঞানেন্দ্র খেলা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল, এবং 'আর নয়—ডাক পড়িয়াছে' বলিয়া দ্রুত ও-ঘরে চলিয়া গেল। লেপ, কম্বল, বালিস ইত্যাদি গুছাইয়া আমরা শয়নের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় মাতুল মহাশয় ঘরে আসিয়া উপস্থিত। বলিলেন—"উপরে আসিয়া অবধি বুড়া মানুষের খোঁজটুকু পর্য্যন্ত তো তোমরা কেহ লইলে না! আমার ঘর দুইটির কি অবস্থা, একবার স্বচক্ষে দেখিয়া যাও। ব্যাপারটা তোমাদের সকলকেই দেখিতে হইবে।" সত্যই তো! বিগত ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে একবারও তাঁর কথা কাহারও মনে পড়ে নাই! নিঃসন্দেহ তাঁহার শয়ন-কক্ষে বিশেষ একটা কিছু অসুবিধা ঘটিয়াছে। আমরা অপরাধীর মত নিরুত্তরে তাঁহার পশ্চাতে চলিলাম।

মাতুল মহাশয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট মহলের ছোট ঘরটিতে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—কম্বল ও আসন ইত্যাদিতে জোড়া-তাড়া দিয়া ৬টি আহারের স্থান প্রস্তুত! এনামেলের ছয়খানি থালাতে মল্লিকা ফুলের মত ধব-ধবে গরম ভাত, তরকারী ইত্যাদি সাজান—পাচক ব্রাহ্মণটা কোণে দাঁড়াইয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে। মাতুল মহাশয় স্বয়ং একটি আসন অধিকার করিয়া কৌতুক-নেত্রে সস্নেহে বলিলেন— "বোসো হে সকলে—একটু দেরী হইয়া গেল—১১টা বাজে!" আমরা বিস্ময়াবিষ্ট—হতভম্ব হইয়া নিঃশব্দে এক একটি আসনে বসিয়া গেলাম।

সুন্দর পেশোয়ারী চাউলে প্রস্তুত অন্ন—সুগন্ধি গাওয়া ঘি—আলু-ভাতে, মুগের ডাল—ফুলকপি ও চিংড়ী মাছের তরকারী—ইলিশ মাছের অম্বল। দাশু-দা বলিল— "প্রথমে সিদ্ধান্ত করা যাউক,—এটা ইন্দ্র-জাল! না ভানু-মতীর খেল! না আলাদীনের প্রদীপ! না হোসেন খাঁর ম্যাজিক? এ সম্বন্ধে দলের চাঁই—আমাদের এ ভ্রমণ-চিম্‌নির কেরোসাইন মাতুল মহাশয় কি বলেন?" তিনি বলিলেন—"দোহাই বাবা, আমায় আর এর মধ্যে জড়াইয়ো না। এ সব আমার বউমার কীর্ত্তি!" দাশুদা বলিল— "কিন্তু, এই অমূল্য বাগ্‌দা-চিংড়ী ও ইলিশ-মাছ-সম্প্রদায়

কোন্ পথে এ প্রদেশে আসিল?" জ্ঞানেন্দ্র জবাব দিল— "তোমাদেরই মত মোটরে চড়িয়া আসিয়াছে!"

পরিশেষে মাতুলের কথায় সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। কলিকাতা হইতে আসিবার সময় পরম বুদ্ধিমতী বধূ-ঠাকুরাণী মাছগুলি কুটিয়া লবণ ও তৈল সংযোগে টিনের মধ্যে প্যাক্ করিয়া আনিয়াছেন। আর, পাচক-ব্রাহ্মণের কথায়ও প্রকাশ পাইল যে, জ্ঞান-দার স্ত্রীর আদেশ মত এই সকল চাউল, আলু, কপি, কড়াইশুঁটি ইত্যাদি কিনিবার জন্য রাওয়ালপিণ্ডি হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে ২৩ বার বেচারাকে বাজারে ছুটিতে হইয়াছিল। সে আরও বলিল যে, তার বউমার হুকুমে আমাদের primus stoveটি ও ঘর হইতে সে আনিয়াছে। দুইটা ষ্টোভ না জ্বলিলে রান্না শেষ করিতে আরও বিলম্ব ঘটিত। মাতুল মহাশয় বলিলেন—"দাশু না কি শুনিলাম নিরর্থক কুলী ক'টাকে গালি-গালাজ করিয়াছে?" দাশুদার মুখে কথা নাই। হৃষিকেশও মাথা চুলকাইতে লাগিল।

সে রাত্রে যে অনাবিল অদৃষ্ট-পূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে পরম পরিতৃপ্তির সহিত আমরা কয়জনে আহার সমাপন করিলাম, এ জীবনে ভুলিবার নয়!

তারপর—হাসির মাত্রা সপ্তমে চড়িল,যখন পাচক-ব্রাহ্মণ ও ঘর হইতে আসিয়া দাশুদাকে বলিল—"আপনার সেই কালীদাস বাবুর শোলোকটী বউমা শুনিতে চাহিতেছেন।" মাতুলও হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"হাঁ হাঁ,বল তো বাবা, মুখস্থ ক'রে রাখি।" আমাদের হাস্যকলরবে ও নিরতিশয় লজ্জার ভারে দাশুদার মস্তক অবনত হইয়া ভাতের থালার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। কিন্তু, এবার সে মুহূর্ত্তে আপনাকে কতকটা সংযত করিয়া লইল। পরে নেপথ্যে উদ্দেশ করিয়া সপ্রতিভ উচ্চকণ্ঠে বলিল—'মাপ করিবেন বউ-ঠাকুরাণী! আপনার আজ্ঞাবহ সেই মিত্র-দ্রোহী দৈত্য-রাজের হস্তের চা খাইতে খাইতে শ্লোকটি জন্মের মত ভুলিয়া গিয়াছি।"

ক্রমশঃ।

মনের কথা।

[শ্রীদ্বিজপদ মুখোপাধ্যায়, বি-এ]

তুমি আমার মনের মাঝে জ্ঞানের আলো জ্বালো,
আপন ভাবি' বিশ্বে যেন বাস্‌তে পারি ভালো।
বুকের মাঝে খনন করো স্নেহ-প্রেমের খনি,
রূপের জগৎ দেখব চোখে ঠেকাও পরশমণি।
সত্য-আলো দুখের পথের আঁধার রাতে জ্বালো,
জগৎ যদি হয় কভু 'পর' তুমিই বেসো ভালো।
শত্রু যেন হয় না কেহ—হইনে যেন কার,
বিভিন্নতার গণ্ডী ঘুচে হউক একাকার।

ক্ষুদ্র আমার জীবন তোমার মুক্ত আকাশতলে,
উদারতার মৃদুল বায়ে ভরুক ফুলে ফলে।
শাসন তোমার মাথায় নেবার মতন দিও মাথা,
ওষ্ঠ আমার কেবল ফুটাক তোমার বিজয়-গাথা।
সাধ্য আমার সব সাধনা, সব বেদনা—ভুল,
তোমার চরণ নিয়ে লভুক শেষ কিনারের কূল।
সেবক হ'বার গর্ব্ব করার ভাগ্য যেন হয়,
তোমার স্নেহ-ধ্রুবের জ্যোতি নয়ন ভ'রে রয়।

বিশ্ববিদ্যালয় বাহিনীর কথা।

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ রুদ্র এম-এ]

সন ১৯১৭ সালের ঘোর দুর্দ্দিনের যুগে যখন সভ্য-জগতের সর্ব্বত্রই একটা বিষম সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল—যখন সকল দেশের সমর্থ ব্যক্তিমাত্রেই রণভেরীর দুরনিনাদ শ্রবণে রাজার জন্য, দেশের জন্য সংঘবদ্ধ হইয়া অস্ত্র গ্রহণের উদ্যোগ করিতেছিলেন—ঠিক সেই সময়ে ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের ন্যায় বাংলার যুবকবৃন্দের হৃদয়েও একটা মহৎ উদ্দেশ্যের পক্ষে অস্ত্র গ্রহণের অনুপ্রেরণা সহজেই জাগিয়া উঠিয়াছিল। ফলে, অনতিকাল মধ্যেই ন্যূনাধিক বার শত ছাত্র স্বর্গগত লেঃ কর্ণাল সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের আহ্বানে প্রস্তুত হইয়া তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় ভারত-রক্ষা-বাহিনীর অন্তর্গত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাহিনী (কলিকাতা ইউনিভারসিটী কোর) গঠন করেন। "এ", "বি", "সি", তিনটী দলে বিভক্ত হইয়া মধুপুর, বীরাকপুর ও টালীগঞ্জে যাইয়া ইঁহাদের "ক্যাম্প ট্রেনীং" সমাপ্ত হয়। যেরূপ অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার সহিত এই সকল ছাত্র-সৈনিক এই সময়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থার কঠোরতাকে সহাস্য বদনে সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। দেশমাতৃকার কার্য্যে ব্রতী হইবার ঐকান্তিক কামনা না থাকিলে ইহাঁরা কখনই এইরূপ কষ্টসাধ্য লোকহিতকর কার্য্যে আপনাদিগকে নিযুক্ত করিতেন না। ঐ সময়ে যে আফ্‌গান যুদ্ধের সূত্রপাত হয়, তাহাতেও যোগদান করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিতে ইহাঁরা পরাঙ্মুখ হন নাই; ফলে, সর্ব্বত্রই ইহাঁদের সুখ্যাতি ও সুযশ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। "এসার কমিটী" (Esher Committee) তাঁহাদের রিপোর্টে এই সৈন্য-বাহিনীর উৎসাহ ও মহদুদ্দেশ্যের কথা বিশেষ প্রশংসার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন।

এই সকল সদনুষ্ঠান ও নেতৃবৃন্দের সমবেত প্রচেষ্টার ফলে অনতিকাল মধ্যেই "ইণ্ডিয়ান টেরিটোরিয়াল্ ফোর্স এ্যাক্ট" পাশ হইয়া দেশবাসীর হস্তেই স্বদেশ রক্ষার ভার সমর্পিত করে। এখন হইতে "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাহিনী" আত্ম-আদর্শ-জাত নবগঠিত "ইণ্ডিয়ান্ টেরিটোরিয়্যাল ফোর্স" নামক বৃহত্তর বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি বিষয়েও 'নন্-কমিশণ্ড" অফিসারগণকে 'ব্রিটীশ র‍্যাঙ্ক' বা সাম্রাজ্য বাহিনীর মধ্যে পরিগণিত করায় সর্ব্ববিষয়েই বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হইতে থাকে।

উপযুক্ত ভারতীয় যুবকগণকেও "অনারারী কিঙ্গস্ কমিশন" প্রদান করায় এই বিভাগের ইতিহাসে একটি নূতন যুগ আরম্ভ হয়। যথাযোগ্য গুণ ও উদ্যম কখনই যে এ বিভাগেও বৃথায় যায় না, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ লেঃ সুশীলচন্দ্র চৌধুরীর উন্নতি হইতেই পরিদৃষ্ট হইবে। ইনি সাধারণ একজন "প্রাইভেট্" হইতে স্বীয় কর্ম্মকুশলতা ও উৎসাহ বলে টেরিটোরিয়াল্ বাহিনীর সভ্যরূপে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম 'কিঙ্গস কমিশন'ধারী পদে উন্নীত হন।

তিনি যে কেবল স্বীয় কর্ম্মনৈপুণ্য গুণে উচ্চ কর্ম্মচারিগণের প্রশংসা ও সহানুভূতি লাভেই সমর্থ হইয়াছিলেন এরূপ নহে, অমায়িক ব্যবহার ও সুপরিচালন গুণে অধঃস্তন কর্ম্মীগণের ও সাধারণ সৈনিকশ্রেণীর নিকট হইতেও যথেষ্ট প্রীতি সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই সৈনিকবৃত্তি নিয়মিত ভাবে পরিশ্রমসাপেক্ষ হইলেও ইহা অবলম্বন মাত্রেই ছাত্রের শিক্ষাদির পক্ষে যে একান্ত পরিপন্থী হয় না তাহার প্রমাণও আমরা দেখিতে পাই লেঃ চৌধুরীর দৃষ্টান্ত হইতে। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্, এস্, সি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ পদ লাভে সমর্থ হন। মাননীয় ভাইকাউণ্ট চেম্‌সফোর্ড মহাশয় গত বৎসর কন্‌ভোকেশন বক্তৃতায়ও এই কথাই বলেন যে, "স্বাস্থ্যকর ব্যায়ামাদিতে মনোনিবেশ নিবন্ধন ছাত্রগণের শিক্ষা বিষয়ে কোনরূপ ক্ষতি হওয়া

দূরের কথা, বরং এই সকল সদনুষ্ঠানে যোগদানের ফলে স্বাস্থ্যোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্ঞানবৃত্তিও প্রখর হইতে থাকে।"

গত আগষ্ট মাসে লেঃ চৌধুরী "ব্রিগেডিয়ার জেনারেল" প্রমুখ ব্যক্তিগণের কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত এক "মিলিটারী-পরীক্ষা"য় উপস্থিত হইয়া সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। ইহাতে যে কেবল তাঁহার নিজের আত্মতুষ্টি লাভ হয়, এরূপ নহে, তাঁহার সৈন্য-বাহিনীরও যথেষ্ট মুখোজ্জ্বল হইয়াছিল এবং তত্রস্থ সকল যুবকই তাঁহার নিকট যেরূপ আশা করিয়াছিল, তদনুরূপ সংঘটিত দেখিয়া বিশেষ প্রীত ও আনন্দিত হন।

* * *

এই সৈন্য-বাহিনীর ব্যায়াম শিক্ষা বিষয়ে রীতিমত সুবন্দোবস্ত আছে—সারা বৎসর ধরিয়া প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে ব্যায়ামের আয়োজন প্রস্তুত থাকে, তন্মধ্যে যাহার যেটীতে সুবিধা হয়, তিনি সেইটিতে যোগদান করিয়া যথারীতি "প্যারেড্ হাজরী" রাখিতে পারেন। বৎসরান্তে একবার করিয়া কিছুদিনের জন্য 'ক্যাম্প ট্রেনীং' শিক্ষার নিয়মটি সকলের পক্ষেই বিশেষ প্রীতিপ্রদ হইয়াছে। ১৯২২ সালের বাৎসরিক শিক্ষা সেই বৎসর ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা গড়ের মাঠে ও ১৯২৩ সালের উক্ত ট্রেনীং গত নভেম্বর মাসে কাঁচড়াপাড়ায় হইয়াছিল। এই সময়ে নানা প্রকার মিলিটারী ব্যায়ামের, বেয়নেট্ যুদ্ধের, বন্দুক লইয়া শিকারের ও অন্যান্য বহুবিধ ক্রীড়াকৌশলের সুবন্দোবস্ত থাকায় দিনগুলি যেমন শিক্ষাপ্রদ তেমনি আনন্দেরও হইয়াছিল।

এইরূপ শিক্ষাকালে যে আত্মনির্ভরতা, সংযমশীলতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা ছাত্রগণের সমক্ষে জ্বলন্ত অক্ষরে সদাসর্ব্বদা প্রতিফলিত থাকিয়া ক্রমে ক্রমে প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে থাকে, তাহার সুফল পরবর্ত্তীকালে জীবন-সংগ্রামের মধ্যেও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। 'প্যারেড্' ক্ষেত্রে, তথা অন্য সময়ে, বহুবিধ যুবক লইয়া একত্র কার্য্য করিবার দরুণ এই সূত্রে যে জ্ঞানলাভ হয় তাহাও কোন অংশে সামান্য নহে।

মেজর কে, কে, চাটার্জ্জি মহাশয় তাঁহার নানাবিধ কর্ত্তব্যের মধ্যেও একটু সময় করিয়া লইয়া ছাত্র-বাহিনীর কল্যাণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে কখনও ত্রুটী করেন না। কাঁচড়াপাড়ায় অবস্থানকালীন তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া শিক্ষার্থীগণের স্বাস্থ্য ও সুখস্বচ্ছন্দের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতেন। তাঁহার ন্যায় অক্লান্ত কর্ম্মীকে "অনারারী সার্জ্জন" হিসাবে লাভ করিয়া এই বাহিনী যথার্থই কৃতার্থ ও সুধন্য হইয়াছে।

মিঃ প্রফুল্ল গুপ্ত এম, এ প্রমুখ যুবকবৃন্দের উৎসাহে এই "কোরে"র সদস্যগণ কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে আনন্দ-বৈঠক, প্রীতি-সম্মেলন ও নাট্যাভিনয় প্রভৃতি প্রদর্শিত হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে মধুর সৌহৃদ্য ও আন্তরিক ঐক্যভাব উত্তরোত্তর বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে, ইহা অতি সুসংবাদ।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ "প্লেটুনের" (platoon) উপহার "ইন্দিরা-স্মৃতি-পদক"—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার গুপ্ত এম, এ কর্ত্তৃক তাঁহার স্বর্গীয়া ভগ্নীর স্মৃতিকল্পে প্রদত্ত।

মিঃ এইচ্, হব্‌স মহোদয়ের আন্তরিক সহানুভূতি ও সাহায্যের জন্য এই 'কোর' তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। সম্প্রতি ইনি এই বাহিনীর সর্ব্বোপযুক্ত যুবককে পুরস্কার দিবার জন্য একটি চমৎকার "শিল্ড্" দান করিয়াছেন।

আজ এই 'কোরে'র যে সুদিন উপস্থিত—ইহার এখনকার শ্রীসম্পদ সামর্থ্য সমস্তের জন্যই বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ ইহার বর্ত্তমান এড্‌জুটেণ্ট কাপ্তেন্ হাইড্ সাহেব। তাঁহার ন্যায় সংগঠনপটু অসাধারণ কর্ম্মী অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। স্বীয় মহত্বগুণে বাহিনীর সদস্যগণের সকলের নিকটেই তিনি বিশেষ প্রীতিভাজন ও সম্মানিত হইতে সমর্থ হইয়াছেন।

মাননীয় বিচারপতি জি, সি, র‍্যাঙ্কিন্ মহোদয়ের ন্যায় মনীষিকে "কমাণ্ডীং অফিসার" রূপে পাইয়া এই 'কোর' যথার্থই ধন্য হইয়াছে। স্বীয় উচ্চপদের কঠিন কর্ত্তব্যের গুরুভার স্কন্ধে থাকিলেও তিনি এই "কোরে"র কল্যাণের দিকে আবশ্যকমত মনোনিবেশ করিতে কখনই পরাঙ্মুখ হন না এবং তন্নিবন্ধন সদস্যগণের মধ্যে তিনি বিশেষভাবে সম্মানিত।

মাননীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "কোরে"র কল্যাণের পক্ষে যেভাবে আন্তরিক চেষ্টা ও সহানুভূতি করেন তাহাতে ইহার উন্নতি সুনিশ্চিত জানিয়া সকল সদস্যের হৃদয়ই আশান্বিত ও আনন্দ পরিপ্লুত হইয়া উঠে।

কয়েকজন মহামান্য ব্যক্তি এই বাহিনী পরিদর্শনার্থে শুভাগমন করায় এবং ইহার কার্য্যপ্রণালী দৃষ্টে পরিতুষ্ট হওয়ায়, "কোর" অত্যন্ত উৎসাহিত ও ধন্য হইয়াছে। তন্মধ্যে মহা মাননীয় বঙ্গেশ্বর লাট বাহাদুর, জেনারেল্ হাড্‌সান্, মেজর জেনারেল কিউবিট্ ও কর্ণেল উইল্‌শন্ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গত বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কনভোকেশন' দিবসে ও কলিকাতা শিল্প-প্রদর্শনীর দারোদ্ঘাটনের সময়ে উক্ত বাহিনী মহামান্যবর বঙ্গেশ্বর বাহাদুরকে 'গার্ড-অফ্-অনার' রূপে অভিবাদন করিবার সুযোগ পাইয়াছিল ইহা নিঃসন্দেহ আনন্দের সংবাদ। তাহাদেরই মধ্য হইতে উন্নীত বাঙ্গালী যুবক লেফ্‌টেনাণ্ট চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে সেদিন এই কোরের প্রত্যেক সদস্যই যেরূপ কৃতিত্ব ও পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া মাননীয় লাট বাহাদুর লেঃ চৌধুরীকে ধন্যবাদ ও কোরের সদস্যগণের বিশেষ সাধুবাদ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। এই উৎসাহদৃপ্ত কর্ম্মী যুবকবৃন্দ প্রত্যেক সাধারণ সদনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া যেভাবে কৃতিত্ব দেখাইতেছেন তাহাতে অচিরে ইঁহারা যে সমগ্র বাহিনীর,তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বলকারী হইয়া উঠিবেন, সে বিষয়ে আদৌ সন্দেহ নাই।

পরিশেষে বক্তব্য এই, প্রত্যহ মাত্র কয়েক দণ্ডের জন্য পুস্তকের চিন্তা ছাড়িয়া 'রাইফ্যাল্', 'বেয়নেট্' প্রভৃতি শারীরিক ব্যায়ামে মন নিয়োজিত করার যে একটা বিশেষত্ব, একটা আনন্দ আছে, উহা বলাই বাহুল্য। তাহার উপর যখন দেখা যায়, এই শিক্ষায় গৌরবান্বিত হইলে প্রত্যেকেই সময় অসময়ে আপনার ঘর বাড়ী, আত্মীয় পরিজনকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিবার উপযুক্ত শক্তি সামর্থ্য আপনার করায়ত্ত করিতে সমর্থ হইবেন, তখন ইহাকে কোনও প্রকারেই তুচ্ছ জ্ঞান করা যায় না। *

* মূল প্রবন্ধলেখক মিঃ প্রফুল্ল গুপ্ত মহাশয়ের অনুরোধে ইংরাজি হইতে অনুবাদিত।—লেখক।

মাঝিদের গান।

(নেপাল রাজ্যের গান)

জলকে যাওয়া নয় গো রাধে (ধুয়া)
(তোর) ঐ কথা সবাই বলে।
(পথে) যা শুনিলাম আমরা দুজন
অন্যে যেন না শোনে (জানে)।
সাঁঝের বেলায় জল আনিতে গেলি একা
(রাধে) আমার মনে লাগ্‌ল ধোকা
আমার মনে লাগ্‌ল ধোকা॥
আবার মাথার কেশ আউলে দিয়ে
শ্রীরূপে চন্দন কেনে?
(ওরে) শ্রীরূপে চন্দন কেনে?

তোর কথা কে না জানে
রাধে আর কতদিন রাখবি গোপনে?
তোর মাধা নাকেতে নোলক নাড়া
ধাকা খেলি কোন্ খানেতে
(ওগো রাধে) কোন্ খানেতে?
ক্ষেপা বলে ওগো রাধা
কেন না শুনলি কুটিলের বাধা?
আবার ঘরকে আছে আয়েন দাদা
ঢোল বাজাবে দুজনে—
(ওগো রাধে) ঢোল বাজাবে দুজনে॥

পুত্রহারা।

[শ্রীহরিসত্য বন্দ্যোপাধ্যায়]

এক বৎসরের মেয়েটীকে ফেলে রেখে যেদিন আমার স্ত্রী কোন্ অজানা দেশে চলে গেল, সেদিন ভেবে আকুল হ'লাম—কি ক'রে মানুষ করবো ঐ কচি মেয়েটীকে। সংসারে সে আর আমি ছাড়া আর কেউ আমাদের ছিল না। সংসারের ঝাঁট্ দেওয়া থেকে রান্না বাটনা পর্য্যন্ত সকল কাজগুলোই সে নিজে হাতে করতো, কখনও একটা ঝি রাখ্‌তে দেয় নাই—আমার আর্থিক অবস্থা দেখে। আমি সব দেখতাম, সব বুঝ্‌তাম, তবু পান থেকে চুণ খস্‌লে দু'টো কড়া কথা বল্‌তে ছাড়তাম না। সে হাসি মুখে সকল কথাই সইতো, আবার সময় পেলে সুদে আসলে আমাকে ফিরিয়ে দিতো। এমনই করে সুখে দুঃখে, হাসি কান্নার মাঝখান দিয়ে আমাদের দু'টো প্রাণ একটা হ'য়ে সংসারের কোলাহলের অন্তরালে এক রকম কেটে যাচ্ছিলো। ভেবেছিলাম এমনই করে দুঃখের ভাত সুখে খেয়েই জীবনের বাকী ক'টা দিন কেটে যাবে। হঠাৎ আমার চমক্ ভাঙ্গলো তার রক্তহীন নীলপানা মুখখানা দেখে। টুনির দিকে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিয়ে সে জন্মের মত বিদায় হ'লো। রেখে গেল শুধু আমাকে তার তপ্ত স্মৃতি বুকে করে' এই দুনিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে। দুর্ব্বল বুক আমার ভেঙ্গে পড়্‌লো। টুনি কাঁদলে আমারও চোখের পাতা ভিজে যেতো, হতাশ হ'য়ে বল্‌তাম "মঙ্গলময়! আমার এই সুখের কুটীরখানি ভেঙ্গে দিয়ে তুমি যে জগতের কি মঙ্গল কল্লে তা' তুমিই জান।"

এমনই কষ্টের দিনে একটী সদ্গোপের মেয়ে এসে আমার কাছে কেঁদে পড়্‌লো। কেঁদে কেঁদে আমার চোখের কোণে কালি পড়েচে; কান্না হৃদয়ের কোন্ নিভৃততম প্রস্রবণ থেকে বেরিয়ে আসে তা' বেশ বুঝেচি। তার কান্না শুনে আমিও কেঁদে ফেল্লাম। সে বল্লে "বড় হতভাগিনী আমি বাবা! তিন কুলে আমার কেউ নাই। বছর খানেক আগে বিধবা হয়েচি। গরীব হ'লেও কারু দুয়ারে কখনও হাত পাতি নাই। চাষে খেটে গায়ের রক্ত—জল ক'রে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়ে 'দুকো'র বাবা একলাই আমাদের সকল দুঃখটুকু নিজে বইতো। আমাদের মা বেটাকে তার ভাগ দিতো না। সে মরে যাবার পর যেখানে যা কিছু ছিল বেচে বেচে সব খেয়েচি; আর এমন কিছু নাই যাতে একটী দিনও চলে। দুকো আমার পেটের কোলে দশ বছরের হ'লেও তার জ্ঞান ছিল খুব বেশী। বাছা আমার দুঃখ দেখে নিজে হাতে মাটী খুঁড়ে জল তুলে বাড়ীতে ক'টা বেগুণ গাছ পুঁতেছিল; আমার মাথা খেতে পোড়া গাছে বেগুণও যেন পাতায় পাতায় ধরেছিল। বাছা আমার একটা টোকায় করে পাঁচ ছ' গণ্ডা বেগুণ নিয়ে পলকুড়োর হাটে বেচ্‌তে গেল; আর ফিরলো না। কত কাঁদ্‌লাম, কত তল্লাস কর্‌লাম, বাছার সন্ধান পেলাম না!

"বুঝলাম এবার আমার হারের পালা পড়েচে। পাকা ঘুঁটী কেটেছে। স্বামী হারিয়েচি, পুত্র হারালাম! এ জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সবই হারিয়েচি, আশা ভরসা যা' ছিল তাও হারালাম। তাই একজন ভদ্রলোকের আশ্রয় খুঁজ্‌ছিলাম। শুন্‌লাম আপনার ঝিএর দরকার, তাই আপনার কাছে এসেচি। আমার মাইনে চাই না বাবা, তুমি আমার দুকোর তল্লাস ক'রে দাও। আমি আজন্ম তোমার কেনা দাসী হ'য়ে থাক্‌বো, মেয়ের মত তোমার পায়ের কাঁটা দাঁত দিয়ে তুলে দেব।"

চোখের জলে আমার বুক ভেসে গেল। ভাব্‌লাম "লীলাময়! তোমার লীলা বোঝা মানুষের সাধ্য নয়। কি বিপদের দিনে যে তুমি কাকে আশ্রয় নিতে পাঠাও আর কি অবস্থায় ফেলে যে তাকে আশ্রয় দেওয়াও তা তুমিই জান।"

* * * *

বছর পাঁচ গত হ'য়ে গেছে। টুনী এখন কথা বল্‌তে শিখেছে, মানদা তার অগাধ মাতৃস্নেহ টুনীর ওপর সবটুকু ঢেলে দিয়ে তাকে বাঁচাবার পথে ঠেলে তুলেচে। টুনীও মায়ের দরুণ সবটুকু দাবী দাওয়া তার ওপর জারী করেচে। মানদাও আর ভুকোর নাম মুখে আনে না, টুনীও তার মায়ের জন্য কিছু অভাব বোধ করে না।

আমার এই মা দু'টীর মনের ভার কমতে দেখে আমারও নিজের বুকখানা হাল্কা হ'লো। নিশ্চিন্ত মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম "হরি হে! যে চিন্তা আমরা এই অসার সংসার-সুখের আশায় করে মরি, হায় সেই চিন্তা যদি তোমার শ্রীচরণ দর্শন পাবার আশায় করতাম!"

পথ দিয়ে একটা আমওয়ালা ফেরী করতে যাচ্ছে "চাই আম।" টুনী বায়না ধর্‌লে "বাবা! আম নেবো।" মানদা টুনীকে কোলে ক'রে আম কিন্‌তে এলো। আমগুলি বেশ পাকা টুক্‌টুকে। বোঁটাগুলি তার সিন্দুর রঙের। ফেরিওয়ালা ছেলেটীও বেশ ফুট্‌ফুটে। মুখখানি তার দুপুর রোদে ঘুরে ঘুরে সিন্দুর পানা হ'য়ে গেছে। হায় রে হতভাগ্য বালক! তোর কি মা নেই? তাই এ বয়সে এই রৌদ্রে তোকে ছেড়ে দিয়েচে। মা থাক্‌লে নিশ্চয়ই বুকের মাঝে লুকিয়ে রাখ্‌তো, চুমো খেয়ে গাল দু'টী তোর গোলাপ কুঁড়ী করে দিতো; তপ্ত বাতাসের ঝাঁঝানিতে সিন্দুর-গোলা হ'তে দিতো না।

"ওরে বাবা ভুকো নিবি রে!" বলেই মানদা চুপ হয়ে গেল। টুনী দু'হাতে দু'টো আম নিয়ে আমার কাছে নিয়ে বল্লে, "বাবা আম।" আমি পাশের ঘর থেকে মানদার কান্নার মত আওয়াজ শুনেছিলাম। "থাও মা!" বলেই বাইরে এসে দেখলাম, মায়ের কোলে ভুকো মাথা গুঁজে বসে আছে। আমের ঝুড়ীটা তার পড়ে আছে। পুত্রের পিঠে পুত্রহারার মাথা নুয়ে পড়েচে; চোখের জলে তার মন্দাকিনীর পূতধারা ব'য়ে যাচ্ছে। আমি তার সে সুখে বাধা দিলাম না। টুনীকে বুকে জোর করে চেপে ধর্‌লাম। টুনী বল্‌লে, "বাবা, তুমি কাঁদ্‌চো?"

শ্রীশ্রীঠাকুর হরনাথের অমিয় বাণী।

[ভিষগ্‌রত্ন কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী কর্ত্তৃক সংগৃহীত]

শ্রীশ্রীঠাকুর হরনাথের নাম শুনেন নাই এমন লোক খুব কমই আছেন। অনেকে ইঁহাকে পাগল হরনাথ বা ঠাকুর হরনাথ বলিয়া থাকেন। দেশ বিদেশে হিন্দু, মুসলমান, ইউরোপীয়ান, জৈন, মারাঠী প্রভৃতি সকল জাতিই আজ হরনাথের শিষ্য। অনেকে কেবল তাঁহার পবিত্র নাম মাত্র শুনিয়া থাকিবেন। তাঁহার যে কি উপদেশ তাহা হয়তো অনেকেই জানেন না। সে কারণ আমি তাঁহার উপদেশ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। শ্রীশ্রীঠাকুর হরনাথ তাঁহার ভক্তদের মধ্যে যে সমস্ত পত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন সেই সকল পত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আমি সেই সকল পত্র হইতে নিম্নলিখিত উপদেশসমূহ প্রকাশ করিলাম।

(১) সদাই হরিনামে মত্ত থাক। শুচি, অশুচি যেন মনে স্থান না পায়। অশুচি জগতে কিছুই নাই, যদি থাকে তাহাও কৃষ্ণনামের স্পর্শে শুচিতম হইয়া উঠে। শয়নে স্বপনে সদাই নামে ডুবিয়া থাক। নামই মন্ত্র, নামই তন্ত্র, নামই ঈশ্বর। নাম হ'তে বড় আর কিছুই নাই। কৃষ্ণ হইতেও কৃষ্ণনাম বড় ও গুরু বস্তু।

(২) নাম-মহামন্ত্র বলে ভবরোগ নিবারণ হয়, কি ছার দৈহিক ব্যাধির কথা।

(৩) নাম কর, জগৎ তোমার হইয়া যাইবে—তুমি তাঁর হইয়া যাইবে। চিরানন্দে ডুবিয়া থাকিবে—নিরানন্দের ছায়াও কখন দেখিতে হইবে না। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক কোন ভয়ই তোমার থাকিবে না,

সকল ভয় দূরে পলায়ন করিবে—চিরদিনের মত নিশ্চিন্ত হইবে।

(৪) নাম করাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য ও উদ্দেশ্য। নাম ভুলিয়া স্বর্গের ইন্দ্রত্ব ও মহা নরকভোগ মধ্যে পরিগণিত।

(৫) কৃষ্ণ ভুলিলেই মায়ার দাস, আর কৃষ্ণ স্মরণ করিলেই জীবন্মুক্ত, যার সে পলক ক'টি মাত্র জীবন থাকে যেন কৃষ্ণনাম লইয়া জীবনের সার্থকতা সম্পন্ন করে।

(৬) কৃষ্ণ ভুলে ব্রহ্মত্ব শিবত্বও কিছু নয়। সুখ দুঃখ ক্ষণস্থায়ী, ইহাতে মজিয়া কৃষ্ণ ভুলা আর অঞ্জলি অঞ্জলি বিষপান করা সমান কথা।

(৭) কৃষ্ণ অপেক্ষা কৃষ্ণনাম অধিক বলশালী ও পরম শান্তিদায়ক। এমন সজীব মহামন্ত্র আর নাই, দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত নাম করিতে থাক, বিনা শ্রদ্ধাতেও নাম লইলে বিফল যায় না। দুই দিনের পৃথিবীকে চির শান্তির স্থান মনে করিয়া প্রতারিত হওয়া কর্ত্তব্য নয়। এ পৃথিবীর যাহা কিছু দেখিতেছি তাহারা চিরস্থায়ী হইলেও আমার সম্বন্ধে তাহারা ক্ষণস্থায়ী; কেন না পৃথিবী যেমন তেমনই থাকিতে পারে; কিন্তু আমার চিরদিন থাকা কোন রকমেই সম্ভব হইতে পারে না; আমি এই আছি আর এখনই না থাকিতে পারি। তাই বলি, চিরদিনের এবং সকল অবস্থার অকপট বন্ধু কৃষ্ণকে, আর চিরদিনের সম্বল কৃষ্ণনামকে ভুলিয়া যেন দু'দিনের পার্থিব সুখ-দুঃখ, পুত্র পরিবারকে আপন মনে করিয়া ভ্রান্ত না হই। নাম ভুলিও না। সকল শক্তির আধার ও বীজস্বরূপ নামে বিশ্বাস করা এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহার আশ্রয় লওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

(৮) যে বন্ধুর নিকট থাকিলে সদাই হরিকথা হইবে তাহাকেই প্রকৃত বন্ধু মনে করিতে চেষ্টা করা উচিত; আর যাহারা পৃথিবীর সকল বন্ধনকে আরও দৃঢ় ও শক্ত করিতে চেষ্টা করিবে, তাহারা কখনই বন্ধুপদবাচ্য হইতে পারে না।

(৯) এখনকার যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহাকে কর্ত্তব্য জ্ঞানে কর, আর নামটি নিজের পরম মঙ্গল ও প্রীতিদায়ক নিজধন মনে করিয়া তাঁহাকেই প্রাণ দিয়া ভালবাস।

(১০) প্রাণ আর কাহাকেও দিও না। পৃথিবীর শরীর পৃথিবীর জন্য দাও, আর কৃষ্ণের প্রাণ মন কৃষ্ণকে দিয়া সুখ সমুদ্রে ডুবিয়া থাক, কখনই কাতর হইতে হইবে না, কাহাকেও ভয় করিতে হইবে না।

(১১) যিনি জগদ্বীজ ও জগতের মূল কারণ, তাঁহাকে ভালবাসিলে সকল জীব ও সকল বস্তুকে ভালবাসা হয়; যেমন গাছের গোড়ায় জল দিলেই তাহার সকল অঙ্গেই জল সেচন করা হয়, তেমনি কৃষ্ণকে ভালবাসিলেই সকলকে ভালবাসা হয়।

(১২) মাকে রক্তমাংসের শরীরধারী কৃষ্ণ মনে করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যে মা এই শরীর ধারণ, প্রসব, পালন ও পুষ্টি করিয়াছেন, তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর মনে করিবে না ত ঈশ্বরত্ব কিসে? তিনি যেমন জগৎ ধারণ, প্রসব, পালন ও পুষ্টি করিতেছেন, মাও তেমনি এই শরীরের সম্বন্ধে; তবে মা আমার পক্ষে কেন ঈশ্বর হইবেন না?

(১৩) কেবল নিজের মাকে দেবী মনে করিয়া অন্যের মাকে যদি অবমাননা করি, তাহা হইলে মহৎ পাপের সঞ্চয় করা হয়; তাই বলি, নিজের মায়ের মত সকলের মাকেই দেখিবে।

(১৪) যে মা হৃদয়ের রক্ত দিয়া তোমাকে পালন করিয়াছেন, তোমার কর্ত্তব্য সেই মাকে হৃদয়ের প্রেম ভক্তি দিয়া সেবা করা। মা অপেক্ষা পরম দেবতা আর নাই। ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি তেত্রিশ কোটি দেবতাই মায়ের শরীরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন মনে করিও।

(১৫) স্ত্রীকে খেলিবার জন্য সহযোগিনী মনে করিয়া ইহপরকালের সকল শক্তি হারান কোন রকমে উচিত নয়।

(১৬) স্ত্রীকে ইহপরলোকের প্রধান সঙ্গিনী মনে করিতে হয়। সামান্য পার্থিব খেলার সঙ্গিনী স্ত্রী নন; তাঁকে খেলিবার চিরসঙ্গিনী মনে করিয়া তাহার মত ব্যবহার করা উচিত। তাঁকে তাঁর উপযুক্ত মান্য দিয়া সকল অবস্থায় সহযোগিনী করা কর্ত্তব্য। তাদের গুণগুলি লইয়া নিজের গুণ তাঁহাদিগকে দিতে হয়। এই রকম আদান-প্রদানে ঘনিষ্টতা বাড়িয়া ক্রমে দু'টিতে একটি হইতে হয়। তাহাতে আনন্দ, তাহাতেই মজা। যদি ভালবাসি-

য়াছ; যাহাতে দু'দিনে সে ভালবাসা ভুলিতে না হয়, তাহার চেষ্টা করা উচিত।

(১৭) নিকৃষ্ট কামের বশবর্ত্তী হইয়া চিরসুখ বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত নয়।

(১৮) পাপী আছে ব'লেই গঙ্গার এত মান—এত মাহাত্ম্য।

(১৯) কৃষ্ণ পাইবার প্রধান উপায় তাঁর নাম করা; অহরহঃ তাঁর নামে ডুবে থাকা।

(২০) মায়া লক্ষ চেষ্টা করিলেও, যাহারা কৃষ্ণ নাম ও কৃষ্ণপ্রেমে ডুবে থাকে তাহাদের কিছুই করিতে পারে না।

(২১) নাম করিতে করিতে প্রেম আসিবে, আর প্রেম আসিলেই সেই প্রেমের হরিকে পাইবে।

ক্রমশঃ

সংগ্রহ ও সঙ্কলন।

খাদ্য।

দুগ্ধ—দুগ্ধে ছানা জাতীয়, তৈল জাতীয়, শ্বেতসার জাতীয় ও লবণ জাতীয় পদার্থ এবং জল—এই পাঁচটি উপাদানই বিদ্যমান আছে। এইজন্য জন্মের পর শিশু কেবল মাত্র দুগ্ধ খাইয়াই বাঁচে ও বাড়িতে থাকে। দুগ্ধ অতি সহজে হজম হয় বলিয়া ইহা রোগীর পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। মানুষের দুগ্ধে বিভিন্ন উপাদানগুলি কি পরিমাণে আছে তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

প্রোটিড্ বা ছানাজাতীয় উপাদান	তৈল জাতীয় উপাদান	শ্বেতসার জাতীয় উপাদান	লবণ জাতীয় উপাদান	জল।
২·২৯	৩·৮১	৬·২	·৩	৮৭·৪

মানুষের দুগ্ধ অপেক্ষা গো-দুগ্ধে যে ছানাজাতীয় উপাদান ও মহিষের দুগ্ধে ছানা ও তৈল জাতীয় উপাদান বেশী এবং শ্বেতসার জাতীয় উপাদান কম আছে তাহা নিম্নলিখিত তালিকা পাঠে জানা যাইবে।

	প্রোটিড্ বা ছানাজাতীয় উপাদান	তৈল জাতীয় উপাদান	শ্বেতসার জাতীয় উপাদান	লবণ জাতীয় উপাদান	জল
গোদুগ্ধ	৩·৫৫	৩·৬৮	৪·৮৮	·৭১	৮৭·১৭
মহিষদুগ্ধ	৬·১১	৭·৪৫	৪·১৭	·৮৪	৮১·৪

শিশুদিগকে গো-দুগ্ধ খাওয়াইবার সময় কিছু জল ও চিনি মিশাইয়া দিলে মনুষ্যদুগ্ধের তুল্য উপাদান বিশিষ্ট হয়। গোদুগ্ধ খাওয়াইবার পূর্ব্বে জ্বাল দিয়া খাওয়ান উচিত। কারণ দুগ্ধ দোকানে ও গোয়ালাদের নিকট প্রায়ই খোলা পাত্রে থাকে এবং সহজে দূষিত হওয়ায় পেটের অসুখের কারণ হয়; দুধ জ্বাল দিলে ঐ বিষ-দোষ নষ্ট হয়। দুধ জ্বাল দিয়া যতক্ষণ না খাওয়া হয় একটি পাত্রে ঢাকা দিয়া রাখিবে। দুগ্ধের সকল উপাদান আমরা ভিন্ন ভিন্ন আকারেও ব্যবহার করি। দুগ্ধ হইতে ছানা কাটাইলে যাহা পড়িয়া থাকে তাহাতে দুগ্ধের শ্বেতসার জাতীয় উপাদান, লবণ জাতীয় উপাদান ও জলীয় অংশ থাকে। দুধ হইতে মাখন তুলিয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাতে দুগ্ধের তৈল জাতীয় উপাদান ভিন্ন অপর উপাদানগুলি থাকে। এই মাখন আগুনে জ্বাল দিয়া ঘৃত হয়। দুগ্ধের ছানাতে চিনি মিশাইয়া রসগোল্লা, সন্দেশ, পান্তুয়া, ছানাবড়া প্রভৃতি সুখাদ্য প্রস্তুত হয়। দুগ্ধ হইতে যে দধি প্রস্তুত হয় তাহা দুগ্ধের চেয়ে সহজে হজম হয় এবং ইহা অন্ত্রের মধ্যে রোগের বীজ থাকিলে নষ্ট করে। মহিষী-দুগ্ধ অপেক্ষা গোদুগ্ধ সহজে হজম হয়, কিন্তু মহিষীদুগ্ধ বেশী বলকারক। দুগ্ধে খাদ্যের সকল উপাদান আছে বলিয়া ইহাকে সম্পূর্ণ এবং আদর্শ খাদ্য বলা হয়।

খাদ্যের পরিমাণ—শরীর পুষ্টির জন্য পূর্ব্ব-লিখিত খাদ্যের ছয়টী উপাদানই প্রত্যহ আমাদের খাদ্যের সহিত আহার করা উচিত। দুগ্ধ ভিন্ন কোনও এক খাদ্যে সব উপাদানগুলি নাই। সেইজন্য আমাদিগকে বিভিন্ন

খাদ্য খাইয়া সব উপাদানগুলি যোগাড় করিতে হইবে। যাহারা বেশী পরিশ্রম করে তাহাদিগকে বেশী খাইতে হইবে এবং তৈল জাতীয় ও ছানাজাতীয় উপাদান প্রধান খাদ্য বেশী খাইতে হইবে। শীতের দেশের লোকের শরীর গরম রাখা বেশী দরকার বলিয়া তৈলজাতীয় উপাদান প্রধান খাদ্য তাহাদিগকে বেশী খাইতে হইবে। বাড়ন্ত বালক বালিকাকে বৃদ্ধ অপেক্ষা বেশী ছানাজাতীয় উপাদান-প্রধান খাদ্য খাইতে হইবে। তাহা হইলে তাহাদের শরীরে মাংসপেশী সমূহের গঠন ও বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হইবে।

পণ্ডিতেরা একজন পরিশ্রমশীল ব্যক্তির জীবন ধারণের জন্য খাদ্যের কোন্ উপাদান কি পরিমাণে আবশ্যক তাহা হিসাব করিয়া ঠিক করিয়াছেন এবং নিম্নে তাহা লিখিত হইল।—

ছানাজাতীয় উপাদান বা প্রোটিড্	তৈল জাতীয় উপাদান	শ্বেতসার জাতীয় উপাদান	লবণ জাতীয় পদার্থ
২ ছটাক	১॥ ছটাক	৭ ছটাক	॥ ছটাক

ছানাজাতীয় ও তৈল জাতীয় উপাদান যে পরিমাণ আবশ্যক তাহাদের যোগফলকে ২ গুণ করিলে শ্বেতসার জাতীয় উপাদানের পরিমাণ ও তাহাদের বিয়োগ ফলের অর্দ্ধেক করিলে লবণজাতীয় উপাদানের পরিমাণ পাওয়া যায়।

আমাদের দেশের একজন সাধারণ পরিশ্রমশীল বাঙ্গালী যুবককে শরীর ধারণের পক্ষে যথা পরিমাণ খাদ্যের উপাদানগুলি পাইতে হইলে প্রত্যহ দু'বেলায় যে পরিমাণে বিভিন্ন দ্রব্য খাইতে হইবে তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

চাউল	৮ ছটাক।
ডাল	১॥ হইতে ২ ছটাক।
মাছ বা মাংস	২ হইতে ১॥ ছটাক।
আলু ও অন্যান্য তরকারী	৪ ছটাক।
তৈল বা ঘি	আধ ছটাক।
দুধ	৮ ছটাক।
লবণ	সিকি ছটাক।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বাস্থ্য, চৈত্র ১৩৩০।

মিলন ব্যাকুলতায়।

[শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ]

ওপারে দাঁড়ায়ে নাহি থাক আর—
না শুনাও মোরে তোমার গান,
দূরে যদি রবে মিছে কেন তবে
যাতনা বাড়ায়ে কাঁদাও প্রাণ ?
তুমি ঐ সুদূরে দাঁড়ায়ে ওপারে
নীরবে এপারে আমি গো হেথা,
এ সাগর পারে যাব ধ'রে কারে
তুমি বিনা কেবা লইবে সেথা ?
আমি অতি দীন তোমারই অধীন
আমার তোমার—তোমার সব,

হয় এস হেথা, নয় নিয়ে যাও
নয় বাঁশী তব হ'ক নীরব।
আঁখির তারকা হে প্রিয় আমার
আঁধারে রেখ না অন্ধ ক'রে,
তার চেয়ে লহ তুচ্ছ পরাণ
চির হতভাগা ক'রনা মোরে।
তবুও হাসিছ ওরে নিরমম
এদিকে হৃদয় হইছে চুর,
হায় প্রিয় তুমি এতই নিঠুর
শঠ শিরোমণি মধুর ক্রূর।

সাধন-রতা

২১শ ভাগ] { জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ । } [৪র্থ সংখ্যা

কান্ত-কবির প্রতিভা।

[শ্রীঅভয়চরণ লাহিড়ী]

এক সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, চন্দ্রকান্ত প্রভৃতির উদয়ে বঙ্গ-গগনে চাঁদের হাট বসিয়া গিয়াছিল।

'কান্ত-কবি' রজনীকান্তও সেই চাঁদের হাটের একটি চাঁদ ছিলেন। বঙ্গীয় সামাজিক, গার্হস্থ্য ও ধর্ম্মজীবনের অন্ধকার দূর করিয়া, বাঙ্গালীর হৃদয় নির্ম্মল জ্যোৎস্না-বিধৌত করিতে রজনীকান্তের উদয়। তাঁহার প্রতিভার উজ্জ্বল জ্যোৎস্নাধারা কোথাও বা হাসির ছটায়, কথার ঘটায়, কোথাও বা মধুর সঙ্গীতচ্ছন্দে আত্মপ্রকাশ করিয়া বাঙ্গালীর প্রাণে নূতন ভাব ও নূতন শক্তি আনিয়া দিয়াছে। রজনীকান্তের রচনাগুলি শব্দৈশ্বর্য্যে অতুল;—আবার ভাবও এমনি মর্ম্মস্পর্শী যে, তাঁহাকে দ্বিতীয় রামপ্রসাদ বলিলেও চলে। রজনীকান্তের রচনার বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার সকল পদ্যই গান। গানের সুরগুলি সহজ, সুন্দর, সরল, শ্রুতিমধুর ও ভাবপূর্ণ। সকলের মুখেই মিষ্ট লাগে, শুধু আবৃত্তি করিলেও শুনিতে মিষ্ট হয়। আবার তাল, মান, লয় সহযোগে গাহিলেও মর্ম্মস্পর্শী হয়। গানগুলি পুণ্যময়ী দেবকন্যার মত,—শুধু শুক্ল বস্ত্রেও রূপ উথলিয়া পড়ে, আবার অলঙ্কার-বিভূষিতা করিলেও ক্ষতি নাই।

রজনীকান্তের প্রথম লেখনি-প্রসূতঃ দুইখানি কবিতা পুস্তক—"বাণী" ও "কল্যাণী"। গায়ক মাত্রকেই গাহিতে অনুরোধ করিলে তিনি একটু ভাবিতে থাকেন যে—কি গান গাহিব? শুদ্ধ এই ভাবটুকু লইয়া কান্ত-কবি একটি সুন্দর ভাবপূর্ণ গান রচনা করিলেন। তাঁহার মনে পড়িল পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তের কথা, মনে পড়িল শুভ্র কমলাসীনা বাণীর বীণাধ্বনি, নারদের হরিগুণ গান, বৃন্দাবনকেলি-কুঞ্জে মুরলী রব। তিনি ভাবিলেন—"সেথা আমি কি গাহিব গান? যেথা, গভীর ওঙ্কারে সামঝঙ্কারে কাঁপিত দূর বিমান"। তথাপি তিনি গাহিলেন। কিন্তু প্রথমে বঙ্গবাসী তাঁহার 'বাণী" ও "কল্যাণী"কে আদর করে নাই। পরে একদিন এক বিরাট সভায় কয়েকটি বালক মধুর কণ্ঠে গাহিল—"তব চরণ-নিম্নে উৎসবময়ী শ্যাম ধরণী সরসা"। চারিদিকে আনন্দ, উৎসাহ ও অনুসন্ধানের ধুম পড়িয়া গেল। কান্ত-কবি ক্রমে ক্রমে ছয়খানি পুস্তিকা লিখিলেন,—বাণী, কল্যাণী, অভয়া, বিশ্রাম, আনন্দময়ী ও অমৃত। সর্বশুদ্ধ বড় জোর ছয়শত পৃষ্ঠা। কিন্তু তাহাতেই তিনি যে পরিমাণে দেশবাসীর প্রীতি শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর যে কোনও বিখ্যাত লেখকের পক্ষে শ্লাঘার বিষয় বলিয়া মনে হয়। আজ কান্ত পদাবলী ঘরে ঘরে অমৃত বর্ষণ করিতেছে।

রজনীকান্ত স্বীয় কবিতা বা গানগুলিকে সাধারণতঃ

তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছেন,—'আলাপে' 'বিলাপে' ও 'প্রলাপে'। তিনি ভক্তিমূলক গানের পর পার্থিব গানের সমাবেশ করিয়া, নিজেকে অধোগতিপ্রাপ্ত জীব বলিতে প্রয়াস পাইয়া, স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ বিনয় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাহা 'প্রলাপে' 'বিলাপে' ও 'আলাপে' পরিবর্ত্তিত করিয়া লইব, কারণ ইহা হইতে আমরা কবির জীবনের ক্রমোন্নতি, ভগবদ্ভক্তির বিকাশ ও জীবন্মুক্তি স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারি।

হাস্যরসাত্মক কবিতাগুলিকে কবি 'প্রলাপে' আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই সকল প্রলাপোক্তি বা হাসির গানের ভিতর আমরা কবির বুক-ফাটা চোখের জল প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত দেখিতে পাই। সকলের মূলে সেই এক মহান্ উদ্দেশ্য—সমাজের অন্ধকার দূর করা। তাঁহার হাস্য-রসাত্মক কবিতাগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলে দেখিতে পাই যে,তাহার কতকগুলি শ্লেষ,—কতক বা সরল কৌতুক,—কতক বা শুধু শিক্ষামূলক মর্ম্মোচ্ছ্বাস।

শ্লেষ চাবুকের কাজ করে। বিপথগামী অশ্বকে অভীষ্ট পথে লইয়া যাইতে রজ্জুর সাহায্য সত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে কষাঘাতের প্রয়োজন হয়; কিন্তু সেটা স্বেচ্ছাচারী দুরন্ত অশ্বের জন্য। কান্ত-কবি সেই চাবুকে হাস্যরসের শর্করা মাখাইয়া, প্রশংসা-রেশমের আবরণে ঢাকিয়া, বিপথগামী গোঁয়ার জীবের পৃষ্ঠে সজোরে স্পর্শ করিলেন।

বাঙ্গালী-সাহেবদিগকে বলিলেন—"হয় নি' কি ধারণা, বুঝিতে পার না, ক্রমে দেশ ওঠে উচ্চে? কারণ যেটা রুচত না আগে, সেইটে এখন রুচ্ছে"। আমাদের উন্নতির পরিচয় এই যে আমরা "মার্পছি স্কোয়ার ফুটে বায়ু রাশির চাল," "যেহেতু বুঝেছি বিস্কুট কেমন মধুর", "চাকরী দেবে বলে চরণতলে শুই, আর ঘৃণা করি গরীব তুচ্ছে"। যেহেতু, "মোদের অস্থি মজ্জাগত সাহেবী, দৃষ্টান্ত দেখ না অমুক বাড়ুয্যে"। যেহেতু, "ধর্ম্মহীনতা ধর্ম্ম আমাদের, কোনও ধর্ম্মে নেই আস্থা," আর "মনশ্চক্ষু অন্ধ তার খবর কে করে, সে বেচারী আঁধারে ঘুরছে"।

কন্যাভারপীড়িত ব্যক্তির উপর বরের বাপের উৎপীড়ন দেখিয়া, সমাজকে ধিক্কার দিয়া, "বরের দরে"র চিত্র আঁকিলেন। বরের বাপ 'সংক্ষেপে ফর্দ্দ সমাপন' করিয়া নগদে ও তৈজস পত্রে চাহিলেন প্রায় ৫০ হাজার টাকা। বরের বাপের ইহাতে কোনও স্বার্থ নাই, কারণ "তোমার মেয়ে, তোমার জামাই, তোমার আকিঞ্চন; আমার কি ভাই আজ বাদে কাল মুদ্‌বো দু'নয়ন"। এদিকে পাত্রটি কেমন? না,—"যদি দিতেন একটি পাশ, তবে লাগিয়ে দিতেম ত্রাস, ফেল্ ছেলে তাই এত কম পণ; আর এতেই তোমার উঠলো কম্পন?" কন্যাকর্ত্তা ভিটা মাটি উৎসন্নে দিয়া বিবাহ দিলেন, তত্রাপি পাত্রের পিতা বলিলেন—"তোমার খাটে পুডিং দেয়া, তোষক গদি খাটো; টেবিল চেয়ার হাল্কা, তক্তপোষটি ছোট"। কিছুতেই পেট আর ভরে না!

কান্ত-কবি কষাঘাতে কাহারও প্রাণান্ত করিতে ছাড়েন নাই। 'দেওয়ানী হাকিম', 'পুরোহিত', 'ডেপুটী', 'উকিল', 'মোক্তার', 'ডাক্তার', সকলেরই স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িল। আবার 'পুরাতত্ত্ববিদ্' যিনি 'গৌতম সূত্রে' ও 'রেশম সূত্রে' প্রভেদ নির্ণয়ে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছেন, তিনিও আপ্যায়নে বঞ্চিত হন নাই।

বাঙ্গালী যুবকের ও সমাজের কলঙ্ক 'পিতার পত্র' ও 'পুত্রের উত্তরে' প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচীন পিতা 'বিষ্টুপ্রসাদ শর্ম্মা' কলিকাতায় পুত্রকে জানাইলেন, 'তোমার মংগলাদি না পেয়ে বড় চিন্তাণিত আছি, হপ্তাবাদে পত্তর ভির্ণ কি প্রেকারে বাঁচি?' 'বের্দ্ধ বাপ' 'এন-গেলাপের মূল্য'-স্বরূপ 'গায়ের বালাপোষ' আর মায়ের হাতের তাগা 'বাঁধা থুয়ে' 'কায়কেল্লেশে' পাঁচ টাকা পাঠাইলেন। 'বিদেশে রাখিয়ে সদা সংক্কত' থাকেন, সুতরাং অনুরোধ করিলেন—'অত্র পত্র প্রাপ্ত মাত্র পত্রের উত্তর দিও, আর যত্র তত্র থাকি সত্বর তত্র বাত্রা নিও'—ইত্যাদি। এই সরল পত্রে বানান ভুল দেখিয়া শিক্ষিত পুত্র ত রাগিয়াই অস্থির। লিখিলেন—'তোমার মত মুখ্খু বাবা, প্রকাণ্ড গৈগেঁয়ে হাবা,' 'তোমায় বাবা বলে পরিচয় দিতে মরি যে লজ্জায়'। তোমার 'পঞ্চ সংখ্যক রৌপ্যচাক্তি পৌঁচেছে হেথায়, সেদিনই সে ফুরিয়ে গেছে বিলিতি বিনামায়'।

রজনীকান্তের কৌতুকের কবিতাগুলি সরল ও সুন্দর—ইহাতে কাহারও দোষ গুণ লক্ষ্য না করিয়া শুধু পরিহাস-রসিকতা প্রকাশ পাইয়াছে। 'মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই যে পুরো পাঁচ হাত লম্বা' বলিলে বোধ হয় কেউ রাগ করিবেন না।

বঙ্গদেশে রসিকতার চিরন্তন লক্ষ্যস্থল আছেন দ্বিতীয় পক্ষের পতি। 'বাজার হুদ্যা কিন্যা আইন্যা ঢাইল্যা দিছি পায়' বলিয়া তিনি সুন্দরীর পায়ে ধরিতে থাকুন, মানভঞ্জনে অনেক বিলম্বের সম্ভাবনা, ততক্ষণ আমরা 'স্বর্গের খবর' লইয়া আসি। সেখানের খবর বড় মন্দ।—"কার্ত্তিকের বড় ছেলেটি, সারকাসে কাজ করেন সে-টি, লায়েক ছেলে বড়ই রোজগেরে; দুঃখের সংবাদ বটে, গিয়েছে তাঁর মাথা ফেটে, হোরাইজণ্টাল বার থেকে প'ড়ে"।—"আর গণেশের ঐ মূষিক ব্যাটা, ঘটিয়েছে বড় বিষম ল্যাঠা, বাণীর রিডিং রুমে রাত্রে প্রবেশ ক'রে; তাঁর comparative philology'র, manuscriptএর ভিতর বাহির, কেটে দিয়েছে টুকরো টুকরো ক'রে"।

রজনীকান্তের হাস্যরসাত্মক কবিতার তৃতীয় অংশ শুধু শিক্ষামূলক। 'কেরাণী জীবন' ইহার অন্তর্গত। বাঙ্গালী জীবনের সার লক্ষ্য কেরাণীগিরির দিকে দেখি, কেরাণী-বাবুর অল্প আয়, লক্ষ্মীর কৃপা হোক না হোক ষষ্ঠীর কৃপাটি বিলক্ষণ আছে; প্রচুর ব্যয়, সদাই অভাব, তার উপর 'ছেলেগুলো সব স্বনামধন্য মুনকে-রঘুর বাচ্চা'। আবার 'জ্যেষ্ঠ পুত্রটি বাকি ক'রে কার মেঠাই খেয়েছে লুকিয়ে; টেরিও কাটেন, সিগারেটও খান, বাপের হাড়টি জ্বালিয়ে'। যদি শাসন করিলেন, "অমনি গৃহিণী মুখের কাছে নাড়িয়া কোমল হস্ত, বলেন 'আমরি বিদ্যায় তুমি নিজেও পণ্ডিত মস্ত! তোমারি ত ছেলে; গাধার পুত্র বৃহস্পতি হবে নাকি গো? তোমার বাপেরে ফাঁকি দিয়াছিলে, ও দেয় তোমারে ফাঁকি গো।"

অন্যদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কবি বলিতেছেন—"তোরা ঘরের পানে তাকা; এটা কফভরা কঙ্কালের মত বাহিরে একটু আতর মাখা। অথর্ব্ব বুড়োর সনে, সাত বছরের ক'নে, বিয়ে দেয় নিঠুর বাপে হাতিয়ে কিছু টাকা। না যেতে বাসি বিয়ে, মেয়ের যায় সব ফুরিয়ে, মোছে কপালের সিঁদুর, ভাঙ্গে হাতের শাঁখা; সে একাদশীর রাতে, মরে জল পিপাসাতে, বোকা বাপ দাঁড়িয়ে দেখে, মাথায় হাঁকায় পাখা।"

"পাড়াগাঁয়ে দলাদলি, শুধু কান মলামলি, ভাইপোকে রাগের চোটে শালা বলেন কাকা; ইনিই আবার সভায় বলেন, 'উচিত মিলে মিশে থাকা'।"

রজনীকান্তের এই তিন রকম হাস্যরসে দেখিতে পাই, একাধারে Voltaireএর ব্যঙ্গ ও শ্লেষ, Addisonএর mild irony, এবং Swiftএর গোপন কটাক্ষ!

তাঁহার কবিতা-সমষ্টির দ্বিতীয় স্তর—"বিলাপে"। ইহা বিরহিণীর মর্ম্মভেদী গান, প্রণয়িনীর হৃদয়ের সরল অভিব্যক্তি। কিন্তু কান্ত-কবির প্রণয়োচ্ছ্বাসপূর্ণ গানের চমৎকার বিশেষত্ব এই যে ইহা ভগবদ্ভক্তের ভক্তির উচ্ছ্বাস বলিয়া মনে হয়। অকৃত্রিম সরল প্রেম ও ইষ্টদেবের প্রতি ভক্তি, এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য কত সামান্য তাহার পরিচয় রজনীকান্তের প্রেমের গান—

'এস এস কাছে, দূরে কিগো সাজে,
বিছায়ে রেখেছি হৃদয়-আসন!
চরণের ধূলি, দেহ মাথে তুলি,
আজি অভাগীর কি সুখ-মরণ!"

"জীবন-নাথ! পুরিল সাধ,
ভুলেছি যত অনাদর অযতন;
পদে মাথা রাখি, পদধূলি মাখি,
সফল জনম আজি সফল মরণ।"

অধুনা একটি নূতন প্রথা বিলাত হইতে এদেশে আমদানী হইয়াছে। বিবাহের সময় পুরোহিত বাদ দেওয়া চলে, কিন্তু 'প্রীতি-উপহার' না দিলে বিবাহ না-মঞ্জুর। প্রীতি-উপহারের পর 'স্নেহ-উপহার', 'ভক্তি-উপহার', 'আশীর্ব্বাদ-উপহার' এবং আরও কত রঙ-বেরঙের উপ-হারের হার গাঁথিয়া দম্পতি যুগলের গলায় দিতে হইবে, তবে ষোলটি 'কলা' পূর্ণ হইবে। এই উপহারবৃন্দের গুণও অলৌকিক ও অসামান্য! ইহাদের কৃপায় আমরা জ্যৈষ্ঠ মাসের কাটফাটা রৌদ্রে মলয় পবন, আষাঢ়-শ্রাবণের

প্রবল বারিপাতের মধ্যে কোকিলের কুহুস্বর, অগ্রহায়ণ ও পৌষের হিমের মধ্যে ল্যাংড়া ও বোম্বাই আম্রমুকুলের সুগন্ধ, মাঘ মাসের কন্‌কনে শীতে বসন্তের নাতিউষ্ণ জলবায়ু ও ভ্রমরের মধুর গুঞ্জন উপভোগ করিতে পাই। সুতরাং এ প্রথা রদ করা চলে না। তাই রজনীকান্ত এই উপহারের কতকগুলি আদর্শ 'পরিণয় মঙ্গলে' লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে কাক-কোকিলের মধুর স্বর নাই, বসন্তের 'মৃদুল মলয় বায়' নাই, আছে শুধু আর্য্যকুলের দাম্পত্য-জীবনের মূলমন্ত্র আত্মত্যাগ, পতিভক্তি ও সতীত্বের আদর্শ। আর্য্য পরিণয়ের বিশেষত্ব কি, ইহা 'পরিণয়-মঙ্গলে' চমৎকাররূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। জননী কন্যাকে বলিতেছেন—

"মা! নিজের কষ্ট চেপে রেখে, তাদের কষ্ট করিস্ দূর।
তাদের গর্ব্ব মাথায় রেখে নিজের দর্প করিস্ চূর!"

আবার অন্যত্র দেখি,—

"মিলন সঙ্গীত ভরা মধুর এ ধরাধাম,
জীবনের লক্ষ্য মুক্তি মহামিলনের নাম।
সেই মিলনের মূলে মধুর মিলন আজ,
এ মিলন লয়ে যাবে সেই মিলনের মাঝ।
তাই ত দিতেছি বরি' এ যামিনী মধুরে,
মহামিলনের যাত্রী নব বর বধূরে।
জীবনের নব পান্থ! সাথে নিও উহারে,
ওই নিয়ে যাবে তোমা স্বরগের দুয়ারে।"

এ মহৎ ভাব ও আদর্শ পৃথিবীর আর কোথায় পাইব? ইহা হিন্দুর নিজস্ব, হিন্দুর পার্থিব জীবনের চরম লক্ষ্য। কবির লেখনি-প্রসূত কবিতার তৃতীয় অংশ—"আলাপে"।

এই প্রাণমনবিমোহন সঙ্গীতাবলী স্তরে স্তরে সাজাইয়া অধ্যয়ন করিলে আমরা কবির আধ্যাত্মিক জীবনের ক্রমোন্নতি ও জীবন্মুক্তি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই।

কবির হৃদয় প্রথমে পার্থিব মোহে আবদ্ধ ছিল, সংসারে সব আপন ছিল, 'খেলায়' মত্ত ছিল। একদিন যেমন একটিমাত্র আঘাতে ধ্রুব দয়াল হরির অনুসন্ধানে কুটীর ফেলিয়া চলিয়া গেল, বিল্বমঙ্গল প্রণয় ভুলিয়া কৃষ্ণপ্রেমে মজিল, লালাবাবু ভিক্ষুক হইয়া বৃন্দাবনের দ্বারে দ্বারে ভগবানকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল, তেমনি কান্ত-কবির প্রাণে আঘাত লাগিল, 'খেলাভঙ্গ' হইল, কবি কাঁদিয়া বলিলেন,—

"কোলের ছেলে ধূলো ঝেড়ে তুলে নে কোলে।
খেলার সাথী যে যার মত গিয়েছে চ'লে;
পড়ে গেছি, গেছে সবাই চরণে দলে'।
কেউ আর চাইল না ফিরে, নিশায় আঁধার এল ঘিরে,
(তখন) মনে হ'লো মায়ের কথা নয়নের জলে।"

একদিন রামপ্রসাদও ঠিক এইভাবেই কাঁদিয়াছিলেন। সকল বিরাগীই একভাবে কাঁদে।—দারুণ মর্ম্ম ব্যথায় মনে হইল—"আমি সকল কাজের পাই হে সময়,
তোমারে ডাকিতে পাইনে।
আমি চাহি দারাসুত সুখ-সম্মিলন,
তব সঙ্গসুখ চাইনে।"

তখন আসিল প্রাণে—বিষম বিরাগ; মনে হইল ভগবান কেমন 'করুণাময়'! মনে হইল—

"আমি সুকৃতি অধম বলেও ত
কিছু কম করে মোরে দাওনি,
যা দিয়েছ তারি অযোগ্য ভাবিয়া
কেড়েও ত কিছু নাওনি।"

ভগবানের অসীম দয়ার কথা ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল তিনি বিপন্নের 'সখা', সংসার-মরুর সহায়; সকলে ছাড়িবে কিন্তু ভগবান না ডাকিলেও আপনার। কৃপানিধানকে সখাভাবে ডাকিয়া, নিকটে গিয়া, কবি বুঝিলেন যে সখা কিছুরই প্রত্যাশী নয়,—

"আমি ত তোমারে চাহি নি জীবনে
তুমি অভাগারে চেয়েছ,
আমি না ডাকিতে হৃদয় মাঝারে
নিজে এসে দেখা দিয়েছ।
এই চির-অপরাধী পাতকীর বোঝা
হাসিমুখে তুমি ব'য়েছ;
(আমার) নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে
বুকে ক'রে নিয়ে র'য়েছ।"

ভক্তের প্রাণে 'কৃতজ্ঞতা'র উদয় হইল, তাহার সঙ্গে

আসিল ঈশ্বরে 'মমতা'। কবি মিনতি করিয়া বলিলেন, আমায় পায়ে ঠেলিও না, কাছে রাখিও, কারণ—

"আমিও তোমারি গো, সকলি তোমারি ত,
জানিয়ে জানে না এ মোহ-হত চিত।
আমারি ব'লে কেন ভ্রান্তি হ'ল হেন,
ভাঙ্গ এ অহমিকা মিথ্যা গৌরব।"

ভক্ত চতুর্দ্দিকে ধ্রুবতারার অনুসন্ধানে উন্মত্ত হইয়া ছুটিতে লাগিল, কিন্তু—

"সে কি আমার মত, তোমার মত,
রামার মত, শ্যামার মত,
ডালা-কুলোর ধামার মত
যে পথে ঘাটে দেখতে পাবে?
সে যে যোগী ঋষির সাধনের ধন
ভক্তিমূলে বিকিয়ে থাকে,
সর্ব্বং সমর্পিতমস্ত ব'লে যে জন প্রাণে ডাকে;
তারে দেখবি যদি নয়ন ভরে'
এ দুটো চোখ কর্‌রে কানা,
যদি শুনবি রে তার মধুর বুলি
বাহিরের কানে আঙ্গুল দেনা।"

প্রেমময়ের চিন্তায় ভক্তের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল, রহিল শুধু ভক্ত ও ভগবান! চারিদিকে অন্বেষণ করিতে করিতে প্রাণের টানে ধ্রুবতারার নির্ম্মল জ্যোতিঃ নয়নপথে পতিত হইল। ভক্ত উন্মাদের মত অধীর প্রাণে কাঁদিয়া উঠিল—

"তোমারি পতাকা করিয়া লক্ষ্য আসিয়াছি গৃহ ছাড়িয়া,
কণ্টক বনে কে লইল টেনে পাথেয় লইল কাড়িয়া হে।
যদি জাগিতেছ, প্রভু দেখিতেছ,
তবে লয়ে চল আলো বিতরিয়া।"

আলোক আসিল, পথ নির্দ্ধারিত হইল, ভক্ত গন্তব্য-পথে ছুটিল। কিন্তু ভগবানের অদর্শনে প্রাণে এখনও নৈরাশ্য, অধৈর্য্য ও তীব্র আকাঙ্ক্ষার যুদ্ধ চলিতেছে। আর ত বিলম্ব সহে না, আর ত চরণ চলে না! তবে কি ও-চরণ দর্শনে বঞ্চিত হইলাম?—

"আমি কেন বঞ্চিত হব চরণে!
কত আশা ক'রে ব'সে আছি,
পাব জীবনে না হয় মরণে!"

প্রাণে নির্ভরতা ও বিশ্বাস বদ্ধমূল হইল, সবই ভগবানে অর্পিত হইল। বলিলেন—

"তুমি নির্ম্মল কর, মঙ্গল করে মলিন মর্ম্ম মুছায়ে;
আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু,
আমায় দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।"

নির্ভরতার ফলে ভক্ত ভগবানের নিকটবর্ত্তী হইল. উপলব্ধি করিয়া দেখিল, ভগবানের কি অসীম ক্ষমতা!

"যবে সৃজন বাসনাকণা ল'য়ে কৃপা আঁখি কোণে,
চাহিলে হে রাজাধিরাজ!
অমনি, নিমেষে বিরাট বিশ্ব চরণে করিয়া নতি
মহাশূন্যে করিল বিরাজ!!"

এই মহাশক্তির আধার ভক্তের সম্মুখে দেবীমূর্ত্তিতে উপস্থিত হইলেন, জ্যোতিতে ভুবন ভরিয়া গেল! কিন্তু ভক্তের হৃদয় শান্ত হইল না। বলিলেন—

"আমি চাহিনা ও-রূপ, মৃত্তিকার স্তূপ,
আমার মায়ের কভু ও-মূরতি নয়।
কোন্ কুম্ভকারে গ'ড়ে দিলে তারে,
ঈঙ্গিত মাত্রে যার সৃষ্টি স্থিতি লয়!
কোটি কোটি নিষ্কলঙ্ক শরদিন্দু,
যার মুখের লাবণ্য পেয়েছে একবিন্দু,
নয়ন-কোণে যার, কোটি সবিতার
পূর্ণ আবির্ভাব নিরন্তর রয়;
শ্রীপদ-নখরে, এক আকাশের নয়,
সহস্র গগনের নক্ষত্র নিচয়।"

বঙ্গকবি গোবিন্দ চৌধুরীর একটি গান ঠিক এইরূপ—

"আমার এমন মাকে কে সং সাজালে বল তা শুনি?
সে যে শম্ভু রমণী, সংসার সংশয় সংহার কারিণী।
স্বয়ং স্বয়ম্ভু যার মুরতি কল্পিতে নারে,
সে শম্ভুদারারে গড়া কুম্ভকারে কি পারে?
ভুবনমোহিনী বামাটিকে, অঙ্গে উহার বা মাটি দিলে কে,
তুলিতে স্বরূপ উহার তুলিতে কার সাধ না জানি।"

সমালোচক বলিবেন যে এটির চুরী পূর্ব্বেবট। ইহা তিনি বুঝেন না যে একই জিনিসের যথাযথ বর্ণনা একই ভাবের হইবে। যাহারা উপরে উঠিয়াছে তাহাদের গান সব এক ভাবের ও এক সুরের।

প্রাণ যখন ভগবানের বিরাট মূর্ত্তি ভাবিল, ভালবাসিল, তন্ময় হইল, তখন সে বুঝিল যে তিনি—"প্রেম-গগনে চির রাকা! চির প্রসন্ন কি মাধুরী মাখা!" ভক্ত চির-ঈপ্সিতের 'দর্শন' পাইল, গাহিল—

"কেরে হৃদয়ে জাগে, শান্ত শীতল রাগে,
মোহ তিমির নাশে, প্রেম মলয়া বয়;
ললিত মধুর আঁখি, করুণা অমিয় মাখি,
আদরে মোরে ডাকি হেসে হেসে কথা কয়!"

ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইল, সব ক্লেশ দূরে গেল, সে "নবজীবন" প্রাপ্ত হইল। বলিল—

"আর কারো কাছে যাব না আমি,
তোমারি কাছে রব হে;
আর কারো সাথে কব না কথা,
তোমারি সাথে কব হে।"

ভক্ত রজনীকান্ত জীবন্মুক্ত পুরুষ হইয়া গেলেন। তাই জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত দেখিয়াছিলাম তিনি সদানন্দময়, ভগবানে বিশ্বাসী, নিষ্কামসেবী এবং দেশের কল্যাণে আত্মোৎসর্গকারী।

এই সময়ে একবার এই কবিকে, এই জীবন্মুক্ত পুরুষকে, কাশীধামে কয়েক মাস পর্য্যন্ত নিজ আবাসগৃহের পার্শ্বে পাইয়াছিলাম। এ অধমের সৌভাগ্য যে তাঁহার সেই রোগের সময় কিঞ্চিৎ সেবা করিবার অবসর পাইয়াছিলাম। তাঁহার দুই কন্যা ক্লিষ্ট পিতার নিকট বসিয়া গান গাহিত, আমরা নয়নজলে ভাসিতাম। আবার, তাঁহার দুই পুত্র একদিন কাশীতেই সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজে পদার্পণ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠটি অর্গ্যান বাজাইতে লাগিলেন, কনিষ্ঠ গাহিলেন,—

"তাই ভালো মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত;
মায়ের ঘরের ঘি সৈন্ধব, মার বাগানের কলাপাত।"

আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলাম। সে গান, সে কণ্ঠ, পিতার নিকট শিক্ষার ফল; তাহার তুলনা নাই। কবির মুখে কবির-রচিত কবিতা আবৃত্তি শুনিতাম। সে দিন, সে সুখ, আর ফিরিবে না!!

তার পরেই কবির শেষ দশা। দেশবাসী কৃতজ্ঞতা সহকারে মেডিক্যাল কলেজে রাখিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। তিনি জীবনের শেষদান "অমৃত" দিয়া সে ঋণ পরিশোধ করিলেন।

দেহাবশেষের সন্ধিক্ষণে কবি দীনহীন অবস্থায় ছিলেন, দেশবাসীর সেবাই তাঁহার একমাত্র ভরসা ছিল। তাই কবি ভগবানের এই কৃপা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বলিয়াছিলেন,—

'আমায় সকল রকমে কাঙাল করিয়া গর্ব্ব করিছে চুর'।

মৃত্যু-শয্যায় শুইয়াও কবি জন্মভূমিকে ভুলিতে পারেন নাই। দিঘাপাতিয়ার গুণগ্রাহী কুমার শরৎকুমার রায় মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন,—

"রোগ শয্যোপরি গেঁথেছি এ ক্ষুদ্র মালা,
বহু কষ্ট করি,
ধর দীন উপহার, এই মোর শেষ! কুমার,
করুণানিধে! দেখ র'ল দেশ।"

তারপর সব শেষ হইল! বাঙালী কান্ত-কবির মৃত-দেহ লইয়া চলিল। পশ্চাতে লোকারণ্য; অগ্রে অগ্রে করুণ কণ্ঠে গীত হইল,—

"কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব
তোমারি রসাল নন্দনে;
কবে তাপিত এ চিত করিব শীতল
তোমারি করুণা চন্দনে"॥

বিসর্জ্জন।

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(৭)

বাড়ী ফিরিয়া কমনীয় নিজের সামান্ত জিনিসপত্র কয়েকটা গুছাইয়া তুলিতেছিল। শঙ্কর বাজার হইতে ফিরিয়া প্রভুর এ ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল, "কাপড় জামা বাক্সে তুলছেন যে?"

মুখ তুলিয়া একটু হাসিয়া কমনীয় বলিল, "আমি যে আজ চলেছি শঙ্কর।"

বিস্ফারিত নেত্রে শঙ্কর বলিল, "যাচ্ছেন—কোথায়, কেন?"

কমনীয় বলিল, "বাড়ী যাচ্ছি।"

শঙ্কর বলিল, "আবার কবে আসবেন?"

কমনীয় আবার হাসিল—"আর না শঙ্কর, এখানকার সঙ্গে সব সম্পর্ক উঠিয়ে যাচ্ছি একেবারে।"

শঙ্করের চোখ হঠাৎ সজল হইয়া আসিল, সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কোনও মতে দুর্ব্বলতাটাকে চাপিয়া ফেলিয়া বলিল, "কেন যাচ্ছেন, কেন আসবেন না, তা বললেন না তো?"

তাহার কণ্ঠের আর্দ্রতাটা মুহূর্ত্তে কমনীয়ের হৃদয়ও আর্দ্র করিয়া তুলিল, সে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল বৃদ্ধের চোখ দুইটা জলে যেন ভরিয়া আসিয়াছে। সে যে তাহাকে কত স্নেহ করে তাহা মনে করিয়া কমনীয়ের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল, সে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "যাচ্ছি আর এ সঙ্গ ভাল লাগছে না বলে তাই। তুমিই বল শঙ্কর, এই কলুষিত সঙ্গে মিশে থাকার চেয়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া ভাল নয় কি? দেখছ তো, কি এসেছিলুম কি হয়েছি! যে মদের গন্ধ নাকে আসলে ছুটে পালাতুম, বদ সঙ্গ এমনি যে সেই মদ পর্য্যন্ত তারা আমায় খাইয়ে রীতিমত মাতাল করে দেছে। কেন, তুমিই তো কতদিন আমায় টেনে ঘরে তুলে এনেছ শঙ্কর, তুমিই তো আমার মাথায় জল ঢেলেছ, সারারাত আমার মাথার কাছে বসে বাপের মতন আমায় বাতাস করেছ, আমি কতবার জেগে নেশার ঝোঁকেও তোমার স্নেহপূর্ণ দুটি চোখ দেখতে পেয়েছি। আর এখানে থাকব না, এখানে থাকলে আমি এখনও যে জ্ঞানে ভাল মন্দ অনুভব করতে পারছি, সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলব। অনেক ভেবেই আমি এখন আমার পুণ্য চরিত্র দাদা আর স্নেহময়ী বউদির কাছে ফিরে যাচ্ছি।"

শঙ্কর খানিক শূন্য নয়নে চাহিয়া রহিল, তাহার পর চোখ মুছিয়া বলিল, "তাই যান ডাক্তারবাবু। মাঝে মাঝে, আমি যতদিন বেঁচে থাকি, একখানা করে পত্র দেবেন আমায়। আর কেউ না পাক, আমি যেন আপনার খবরটা পাই। আমার আর কেউ নেই ডাক্তারবাবু, আমার আর মায়ার বন্ধ—"

বৃদ্ধ হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল। কমনীয় বলিল, "তোমার তো কেউ নেই, তুমি আমার সঙ্গে চল না কেন শঙ্কর?"

শঙ্কর চোখ মুছিয়া বলিল, "আমায় নিয়ে যাবেন?"

কমনীয় বলিল, "তুমি যদি যাও তা হ'লে নিশ্চয়ই নিয়ে যাব।"

শঙ্কর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমি আপনাকে ছেড়ে থাকতে পারব না ডাক্তারবাবু। আপনি যদি আমায় না নিয়ে যেতেন, আমি আর দুমাসও বাঁচতুম না। আমার ঠিক আপনার মতই এক ছেলে ছিল। ছোট বেলায় তার মা মরে গেলে আমিই তাকে হাতে করে মানুষ করেছিলুম। আপনারই মতন তার কথা, তার চেহারা, কেউ দেখে বলতে পারত না—সে আমার ছেলে। আমি চিরদিনই চাকরী করি নি ডাক্তারবাবু, আমার জমি-জমা ছিল, বাগান, পুকুর সব ছিল। ছেলেকে আমি বেশ লেখাপড়া শিখিয়েছিলুম, সে ভদ্রলোকই হয়ে গেছল। তারপর চাকরী করতে কলকাতায় গেল সে, আর ফিরে এল না। ডাক্তারবাবু, সেখানে সে একলা রোগে পড়ে

প্রাণ হারাল। খবর পেয়ে ছুটে গেলুম, কিন্তু আর তাকে দেখতে পেলুম না।”

বৃদ্ধ বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। কমনীয় রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, “কেঁদ না শঙ্কর, সে সব পুরানো কথা আর তুলবার দরকার নেই। ভুলে যাও সে সব কথা।”

শঙ্কর অতি কষ্টে চোখের জল সামলাইয়া বলিল “আপনাকে পেয়ে সব ভুলে গেছলুম ডাক্তারবাবু, কিছু মনে ছিল না, আজ আমার সেই শোক নতুন করে মনে জাগছে। আমি তারপর পাগল হয়ে গেছলুম, সেই সময়ে লোকে আমার বিষয় সম্পত্তি সব নিলে। তারপর আপনাকে দেখে—ডাক্তারবাবু—আমি—”

কমনীয় সে কথা চাপা দিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বলিল, “তা হ'লে আর বেশী দেরী কোর না শঙ্কর, তাড়াতাড়ি করে তোমার কাপড় চোপড় যা আছে গুছিয়ে নাও গে। আমি বিকেলের ট্রেণে ঠিক রওনা হব। তোমার জন্যে যেন আবার দেরী করতে না হয়।”

শঙ্কর চোখ মুছিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিল। আজ তাহার আনন্দের শেষ ছিল না, পথে ঘাটে যাহাকে দেখিতেছিল তাহাকেই জানাইতেছিল ডাক্তারবাবুর সহিত সে তাঁহার দেশে যাইতেছে, আর সে এখানে কখনও আসিবে না।

কমনীয়কে গ্রামের ছোট বড় সবাই ভালবাসিত, সকলেই ছুটিয়া আসিল। কমনীয় যে ভাবিয়াছিল কাহাকেও না জানাইয়া সে চুপি চুপি এস্থান ত্যাগ করিবে তাহা আর হইয়া উঠিল না। এই সব লোকগুলি আসিয়া যখন তাহাকে ধরিয়া বসিল, তখন তাহাদের হাত ছাড়ানোই কমনীয়ের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল।

কথাটা সতীর কাণে গিয়াও পৌঁছিয়াছিল, সে এ কথা শুনিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। এখন তাহার একমাত্র ভরসা কমনীয়, তাহার সাহসেই বুক বাঁধিয়া সতী এখানে পড়িয়া আছে, সে চলিয়া যাইবামাত্র জমিদার ও তাহার দুষ্ট বন্ধুগণ যে আবার তাহার উপর অত্যাচার করিতে উদ্যত হইবে তাহাতে একটুও সন্দেহ নাই।

দুপুরবেলা—রৌদ্র যখন ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, সেই সময় সতীর সদর দ্বারে আঘাত করিয়া কমনীয় ডাকিল—“মা”। সতী তাড়াতাড়ি আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল, কমনীয়ের কাপড় জামার পানে চাহিয়া বিবর্ণ মুখে বলিয়া উঠিল, “ও ভগবান, তবে সত্যিই তুমি চলে যাচ্ছ বাবা?”

কমনীয় বারাণ্ডায় নিজের হাতেই একখানা চটের আসন বিছাইয়া তাহাতে বসিয়া পড়িল, হাসিয়া বলিল, “এ খবর কি মিথ্যে হয় মা, সত্যিই আমি চলে যাচ্ছি।”

সতী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “আর আসবে না?”

কমনীয় মাথা নাড়িয়া বলিল, “না, আর এ কুসংসর্গে মিশতে আসব না।”

সতী একটু নীরব থাকিয়া বলিল, “এত তাড়াতাড়ি যাবে তুমি, কেন?”

কমনীয় আবার হাসিয়া বলিল, “যত তাড়াতাড়ি যেতে পারি ততই তো ভাল। দেরী করলে আমারই ক্ষতি, নয় কি মা?”

সতী স্বীকার করিয়া বলিল, “কিন্তু বাবা, লোকে তোমায় যে এতে অনেক কথা বলছে তা আমি মোটে সহ্য করতে পারছি নে। তারা তোমার দেবস্বভাব বুঝতে পারে না, আমিও বলে' তাদের বুঝাতে পারি নে।”

কথাটা যে কি, আন্দাজেই তাহা বুঝিয়া লইয়া কমনীয় তথাপি বলিল, ‘কি বলছে তারা মা?”

সতী বলিল, “তারা বলে বাইজির সঙ্গে তোমার কোনও সম্পর্ক আছে, সে চলে যাচ্ছে তাই তুমিও চলে যাচ্ছো।”

কমনীয় হাসিয়া বলিল, “সম্পর্ক ছিল বটে, কিন্তু এখন আর নেই মা। সে সব কথা পরে শুনতে পাবে তুমি এখন বলতে পারি নে। তবে সে যাচ্ছে বলেই যে আমি যাচ্ছি তা নয়। তুমি তো জানোই মা আগে হতেই আমি যাব বলেছি। সে যাবে কোথায় আর আমি যাব কোথায়, তা তুমিও তো দেখতে পাবে।”

সতী যেন চমকাইয়া বলিল—“আমি?”

কমনীয় বলিল, “হ্যাঁ তুমি। তোমায় আমি নিয়ে যাব, এখানে থাকতে দেব না। এখানে থাকলে তোমার দেখবে শুনবে কে? সংসারে তোমার শত্রু যে অনেক। সবাই তোমার অনিষ্ট করবার জন্যে ঘুরছে তাতো জানছো।

আমি অনেক ভেবে দেখেছি তোমার এখন এখানে থাকা কোন মতেই উচিত নয়।"

সতী একটুখানি নীরব হইয়া রহিল। মাত্র কাল দু'পুরে তাহার স্বামী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে, আজই সে স্বামীর ভিটা ত্যাগ করিয়া যাইবে? এখানে তাহার স্বামীর স্মৃতি বুকে লইয়া কেহ কি তাহাকে একটু শান্তিতে থাকিতে দিবে না? এই যে ঘরখানি এ যে তাহার পরম তীর্থ। ওই যে ওখানে তাহার স্বামী শেষ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া গেছে, ওইখানে সে শেষ শুইয়া গেছে! এই পবিত্র তীর্থ ছাড়িয়া সে যাইবে কোথায়? কিন্তু এখানকার লোক যে বড় স্বার্থপর, তারা আপনার দিকেই চায়, পরের দিকে তো চায় না, পরের কষ্ট তো তাহারা অনুভব করিবে না।

সজল চোখের দৃষ্টি কমনীয়ের মুখের উপর রাখিয়া সতী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "বাবা—তুমি তো জানো এই স্থান আমার তীর্থ, কিন্তু তবু আমার তীর্থ ছেড়ে যেতেই হবে। আমি যাব বাবা—তোমার সঙ্গেই যাব। আমার স্বামী যে আমায় বারবার বলেছিলেন 'ভিক্ষা করে খেয়ো তবু আমার ভিটে ছেড়ে যেন কোথাও যেয়ো না', কিন্তু আমি—"

তাহার কণ্ঠ একেবারে রুদ্ধ হইয়া গেল, সে মুখ নত করিল, তাহার চোখ দিয়া টপটপ করিয়া বড় বড় অশ্রু ফোঁটা নীরবে কেবল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

কমনীয় কোমল কণ্ঠে বলিল, "তা বলে আর কি করবে মা? এখানে থেকে তোমার স্বর্গগত স্বামীর কথা রক্ষা করতে পারতে, যদি না দুর্দ্দান্ত জমিদারের লোলুপ চোখ তোমার 'পরে পড়ত, এখন অভিভাবকশূন্যা হয়ে এখানে থাকলেই তারা তোমায় বিপদে ফেলবার চেষ্টা করবেই। যদি জ্যোতিশ কখনও ভাল হয় শুনি, যদি সে তোমায় মায়ের মত পবিত্রভাবে ভাবতে পারে তবেই এখানে এসে আবার থাকতে পারবে তুমি, আমিও নিঃসংশয়চিত্তে তোমায় ছেড়ে দেব। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, এক বছর অন্তর যেমন করে পারি একদিনের জন্যে তোমায় এই পবিত্র তীর্থ দেখাতে নিয়ে আসব। আমার কথায় বিশ্বাস কর মা, আমি মিথ্যা কথা বলছি নে। তোমার যা যা নেবার মত জিনিস আছে শীগ্‌গীর গুছিয়ে নাও, শঙ্কর সেগুলো এখনি ষ্টেশনে নিয়ে যাবে।"

সতী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "নিয়ে যাবার মত কিছু নেই বাবা, তাঁর ওই খড়ম জোড়াটা আছে, ওই শুধু নিয়ে যেতে চাই, আর কিছু নয়।"

কমনীয় বলিল, "আর কিছু নেবে না?"

অশ্রু চাপিয়া বিকৃত কণ্ঠে সতী বলিল, "না, আর কিছু না।"

কমনীয় একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বেশ, আর কিছু নিয়ো না। তোমার ছেলের সংসারে তোমার কিছুরই অভাব হবে না, ভগবান আমায় মানুষের প্রার্থনীয় যা তা সবই দেছেন। তবে চলে এসো মা, আর দেরী করছ কেন?"

"যাই—"

সতী গৃহমধ্যে চলিয়া গেল।

অনেকক্ষণ হইয়া গেল সে আসে না দেখিয়া কমনীয় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। ঘড়ি দেখিল আর বেশী সময় নাই।

উঠিয়া গৃহমধ্যে মুখ বাড়াইয়া দেখিল, সতী ধরাতলে লুটাইয়া পড়িয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছে।

কমনীয় ডাকিল—"মা।"

সতী ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল; ঘন চুলের গোছা দুই হাতে জড়াইয়া মাথার কাপড় টানিয়া চোখ মুছিয়া বলিল, "চল বাবা।"

উভয়ে বাহির হইল। গৃহের পানে ফিরিয়া কমনীয় বলিল, "ঘর খোলা থাকবে?"

সতীর মলিন মুখে একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, "আর ঘরে কি আছে বাবা? কয়েকখানা ছেঁড়া কাঁথা, কাপড়, ভাঙ্গা বাক্স এই বই তো নয়, ও সব কেউ ছোঁবে না।"

শঙ্কর সতীকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "সতী মাও যাবে নাকি?"

বিষণ্ণ সুরে সতী বলিল, "কোথায় থাকব শঙ্কর? জগতে সবারই জায়গা আছে, আমার জায়গা যে কোথাও নেই!"

কমনীয় কৃত্রিম রাগত ভাবে বলিল, "ও কথা বারবার বল না মা, তোমার ছেলে যখন আছে তখন তোমার নেই

কি? আমার যদি একখানা ঘর থাকে মা, সেই ঘর তোমায় দিয়ে আমি বারাণ্ডায় থাকব। আমার যদি একমুঠো ভাত জোটে মা, তোমায় তার অর্দ্ধেক দেব। তুমি বারবার ও রকম কথা ব'লে—বাস্তবিক মা, আমি ভারি কষ্ট পাব।"

সতী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না বাবা, আর বলব না।"

(৮)

অবিরত পরিশ্রমে ইতির শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, তাহার অমন উজ্জ্বল বর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছিল, বড় বড় ভাসা চোখের নিম্নে কালিমা পড়িয়াছিল। তথাপি ইতি পরিশ্রম করিতে ছাড়ে নাই, তাহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল ভাইটিকে কোনও রকমে মানুষ করিয়া তোলা। যতদিন না মণি নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে, ততদিন তাহার বিশ্রাম নাই, শান্তি নাই।

ইতি নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিয়াছে। সে জানে সে খাটিতে আসিয়াছে, জগতে কেবল দুঃখ অর্জ্জন করিতে আসিয়াছে, দুঃখই আজীবন কুড়াইয়া যাইবে।

দিন আসিতেছে যাইতেছে, মাস আসিতেছে যাইতেছে, বৎসরও আসিতেছে আবার ঘুরিয়া যাইতেছে। বিবাহের পর তিন চার বৎসর এইরূপে কাটিয়াছে। স্বামীকে পত্র লিখিয়া লিখিয়া সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। একদিন কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য যে মূর্ত্তিকে সে দেখিয়াছিল, সে মূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে তাহার মন হইতে সরিয়া গিয়াছে।

সেদিন সারাদিবসের কার্য্যাবসানে সন্ধ্যাবেলায় ঘাটে গিয়া ইতি বসিয়া পড়িল। দেহ আর চলিতে চায় না, চরণ অচল হইয়া আসিতেছে যে।

সামনে সুনীল আকাশখানি অস্তগামী সূর্য্যের লোহিত কিরণে উজ্জ্বল। ওপারের গাছগুলির মাঝে আঁধার ঘনভাবে জড়াইয়া আসিয়াছে। আকাশের পশ্চিমদিক একটু ঘেঁসিয়া দ্বিতীয়ার রেখাপ্রায় চাঁদখানি ভাসিয়া উঠিয়াছে, তাহার ছায়া গঙ্গার জলে পড়িয়া তরঙ্গাঘাতে কাঁপিতেছিল। কোথায় কত দূরে পাপিয়া ডাকিতেছিল—'চোখ গেল—চোখ গেল'।

কোথায় কবেকার জ্যোতির্ম্ময় রূপখানি দেখিয়াছিলি রে পাখী, যাহার তেজে এখনও তোর চোখ ঝল্‌সিয়া যাইতেছে? সে কবে একবার মাত্র তোর মুগ্ধ চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিয়া আবার কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে, জীবনে আর হয় তো তাহাকে দেখিবি না। নিত্য কত নূতন আসিতেছে, সৌন্দর্য্যে গুণে তাহারা হয় তো তাহার চেয়েও শ্রেষ্ঠতর, কিন্তু তবু—ওরে প্রেমিক, তবু সেই রূপের নেশাই তোর চোখে এখনও ঘুমের মত লাগিয়া আছে। কিছুতেই সে ঘোর কাটাইতে পারিস্ নাই, আজীবন তাই জ্বলিতেছিস্ আর ডাকিতেছিস,—"চোখ গেল—ওগো চোখ গেল।"

মিথ্যা এ রোদন—মিথ্যা এ হাহাকার। যে রূপ দেখাইয়া বুকে চিরতরে দাগ দিয়া চলিয়া যায়, সে চলিয়াই যায়, সে আর ফিরিয়া চাহে না। সে যে জয় করিতে আসিয়াছে, মোহাস্ত্রে সে নিমেষে সকল হৃদয়ই নিমেষে জয় করিয়া ফেলিয়াছে। মরে নাই কে? অনেকেই মরিয়াছে, অনেকে মরিতেছে, অনেকে মরিবে। যাহারা মরিয়াছে তাহাদের হৃদয়ের উপর জয়ীর সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে। জয়ীর পদচিহ্ন সে হৃদয়ের উপর আঁকিয়া গিয়াছে। গর্ব্বে জয়ীর বক্ষ স্ফীত। সে অন্ধ, সে জ্ঞানহীন। সে পরাজিতের পানে ইচ্ছাপূর্ব্বক চায় না, পরাজিতের কষ্ট ইচ্ছাপূর্ব্বক অনুভব করে না।

ওরে পাখী, ওরে রূপে মুগ্ধ জ্ঞানহারা পাখী, কাহার আশায় আর এখনও বসিয়া আছিস্ রে? সে তাহার তীব্র রূপের কিরণে নয়ন ঝলসিয়া দিয়া গিয়াছে, ঠাণ্ডা করিয়া দিতে নিকটে আর সে আসিবে না।

ইতির চোখ দিয়া দু'ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

পুরাতন কত মধুর, পুরাতন কত শান্তিপ্রদ! জীবনে ঢের আনন্দ পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ছোটবেলায় যে আনন্দ পাইয়াছি, সে আনন্দ তো আর পাইব না। জীবনের পথে অনেকেই আসিয়া দাঁড়ায়, অনেকেই পরিচিত হইয়া যায়, কিন্তু একখানা মুখ হৃদয়ের মধ্যে এমন গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়া যায়, একজনের সঙ্গে যেমন গভীরভাবে পরিচিত হওয়া যায়, সেরূপ নিকটে তো কেহই আসিতে

পারে না। আনন্দে উৎসাহে, কর্ম্মে শ্রান্তিতে সেই এক-খানি মুখের কথাই হৃদয়ে জাগিয়া থাকে।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ইতি চোখ মুছিয়া আকাশ পানে চাহিল, কি চমৎকার বৈচিত্র্যময় আকাশখানি। সে চোখ ফিরাইয়া জলের পানে চাহিল।

"আমায় কবে নিবি মা কল্যাণী, আর যে জ্বালা সহ্য হয় না মা।"

তাহার উদ্বেলিত অশ্রু ছাপাইয়া উঠিতে চাহিতেছিল, জোর করিয়া তাহা চাপিয়া রাখিয়া জোর করিয়া সে উঠিয়া পড়িল। এক ঘড়া জল লইয়া আজ আর সে কোনও রকমে বাড়ী যাইতে পারে না, পা যেন ভাঙ্গিয়া আসিতেছে।

উপরে উঠিয়া ঘড়া নামাইয়া সে খানিকটা দম ফেলিয়া লইল, তাহার পর অতি কষ্টে বাড়ী চলিল।

মণি গৃহে সন্ধ্যা দিয়া পড়িতে বসিয়াছিল, উঠান হইতে ইতি কাতর কণ্ঠে ডাকিল, "মণি ভাই, একবার কলসীটা ধর তো, আমি আর বয়ে নিয়ে যেতে পারছি নে।"

মণি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া ঘড়া গৃহের মধ্যে লইয়া গেল। ইতি গৃহমধ্যে গিয়া শুইয়া পড়িল।

উৎকণ্ঠিত মণি জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে দিদি?"

ইতি বলিল, "কে জানি, বোধ হয় জ্বর আসছে।"

জ্বরটা আসিল অত্যন্ত বেশী রকমেই, সমস্তরাত্রি সে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল, মাঝে মাঝে চীৎকার করিতে লাগিল। বালক মণি কাঁদিয়া আকুল, সমস্তরাত্রি দিদির কাছে বসিয়া সে কাটাইয়া দিল।

ভোরের সময় ইতি শান্তভাবে ঘুমাইয়া পড়িল, শান্ত হইয়া মণি তখন দরজা খুলিয়া বারাণ্ডায় গিয়া দেয়ালে ঠেস্ দিয়া বসিয়া ঘুমাইতে লাগিল।

বেশ খানিকটা ঘুম দিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, চাহিয়া দেখিল ইতি যে বাড়ীতে পাচিকা ছিল সেই বাড়ীর দাসী খুব তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে প্রবেশ করিতেছে।

অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া মণি মৃদুকণ্ঠে বলিল, "চুপ, চেঁচিয়ো না যেন, আস্তে আস্তে কথা বল, দিদি ঘুমোচ্ছে।"

দাসী থতমত খাইয়া গেল, "কেন, কি হয়েছে তার?"

মণি বলিল, "বড্ড অসুখ করেছে, কাল সারারাত ঘুমোতে পারে নি, এই ভোরবেলায় ঘুম এসেছে তার।"

দাসী কর্কশ বিরক্তকণ্ঠে হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিল, "ভাল রে মজা! আজ অমনি অসুখ করে বসলেন, বাড়ীতে অথচ জামাই এসেছে। এখন গিন্নি, বউরা রান্নাবান্না করে, না জামাইয়ের জলখাবার তোয়ের করে? অসুখ করবে তা কাল বলে আসে নি কেন, তা হ'লে তাঁরা অন্য ব্যবস্থা করতেন?"

মণি একেবারে অবাক হইয়া গেল, মাথা চুলকাইয়া বলিল, "তা—তা দিদি তো জানতে পারে নি যে তার জ্বর আসবে—"

দাসী মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ। জ্বর আসে তা নাকি মানুষ আগে হ'তে জানতে পারে না? নেকা সাজাও কাকে? জ্বর হবার তিন চারদিন আগে হ'তে মানুষ জানতে পারে অমুক দিন তার জ্বর আসবে, আর তোমার দিদি কাল তা জানতে পারলে না? আর কিছু নয়, আজ বেশী খাটতে হবে কি না, তাই অমনি জ্বর করে বসা হ'ল। যাই, গিন্নিকে গিয়ে বলি গে, তাঁর সাধের রাঁধুনীটি জ্বর করে পড়ে আছেন, এখন তিনিই খুন্তি বেড়ি নিয়ে ঢুকুন গিয়ে রান্নাঘরে।"

সে চলিয়া গেল। মণি হতভম্বভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এই যে স্ত্রীলোকটা তাহাকে এতগুলা কথা এক নিমিষে শুনাইয়া দিয়া গেল সে পুরুষ বলিয়াই তাহার জবাব দিতে পারিল না। স্ত্রীলোকের সহিত ঝগড়া করিতে নাই, নেহাৎ দিদি পদে পদে এই উপদেশ দিয়াছেন বলিয়াই সে নীরবে রহিয়া গেল।

মুখটা ধুইয়া সে দেশলাই লইয়া রন্ধন-গৃহে গিয়া এই প্রথম উনান ধরাইতে বসিল। দিদির জন্য সাগু তৈয়ার করিতে হইবে—এই জ্ঞানটা তাহার মনে প্রবল ভাবে জাগিয়াছিল।

সাগু রান্নাটা বেশ মনে আছে, কিন্তু উনান ধরানোই হইল ভয়ানক দুঃসহ। সে কেবল ধুম, অনর্গল রাশী রাশী ধুম। মণি হাঁফাইয়া কাশিয়া হাঁচিয়া একাকার করিয়া ফেলিল, চোখ লাল হইয়া গেল, নাসা নিঃসৃত জল ও

চোখের জলে এক হইয়া গেল—তবু সে উনান কিছুতেই ধরিল না। অবশেষে হার মানিয়া মণি কোনও সাহায্যকারিণীর খোঁজে বাহির হইতেছিল, সেই সময় দরজার উপর কমনীয় আসিয়া দাঁড়াইল।

মণির মুখ দেখিয়া সে একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল, "কাঁদছিলি নাকি রে মণি? তোর মুখ চোখ ও রকম হয়েছে কেন?"

মণি ভারি লজ্জিত হইয়া পড়িল, বলিল, "না, উনোন ধরাচ্ছিলুম।"

"উনোন ধরাচ্ছিলি?"—কমনীয় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, মণি অত্যন্ত লজ্জিতভাবে ঘাড় কাত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হাসি সামলাইয়া কমনীয় বলিল, "কেন রে—উনোন ধরাচ্ছিলি, কি দরকার ছিল?"

মণি উত্তর করিল, "সাগু করব—দিদি ঘুম হ'তে উঠে খাবে।"

ব্যস্ত হইয়া কমনীয় বলিল, "কে, ইতি? তার কি অসুখ নাকি?"

মণি বলিল, "হ্যাঁ, দিদির বড্ড জ্বর হয়েছে কাল।"

কমনীয়ের হৃদয়খানা আর্দ্র হইয়া উঠিল। ইতি যে কি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে তাহা সে রেখা ও তুষারের কাছে শুনিয়াছে। পরের অনুগ্রহ সে ঘৃণা করে, নিজে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া কিরূপ সৎভাবে জীবন যাপন করিতেছে তাহা শুনিয়া গভীর শ্রদ্ধায় তাহার হৃদয়খানা ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাহার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিয়া তাহার হৃদয় দুঃখে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিল।

কমনীয় বলিল, "কোন্ ঘরে তোর দিদি?"

মণি বলিল, "ওই ঘরে আছে। তুমি যাও কমদা, আমি দৌড়ে গিয়ে কাউকে ডেকে আনি, উনোনটা ধরিয়ে দেবে সে।"

কমনীয় বলিল, "আর ডাকতে যেতে হবে না, আমি উনোন ধরিয়ে সাগু রেঁধে দিয়ে যাব'খন, আয়।"

কিন্তু মণি ততক্ষণে সে পথ পার হইয়া গেল।

কমনীয় গৃহ দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিল ইতি পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে। বোধ হয় তখনি সে জাগিয়াছিল, এদিক ফিরিয়া শুইতে গিয়া দরজায় কমনীয়কে দেখিয়াই সে কাঠের মতন শক্ত হইয়া গেল, তাহার মলিন মুখখানা আরও মলিন হইয়া গেল।

কমনীয় কোমল সুরে বলিল, "এখন কেমন আছ ইতি?"

ইতি উত্তর দিতে পারিল না।

কমনীয় অগ্রসর হইয়া তাহার শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল, ইতির জ্বর-তপ্ত ললাটে হাতখানা দিবামাত্র সে চমকাইয়া উঠিয়া বালিসে মুখ গুঁজিল। কমনীয় বলিল, "তোমার হাতখানা একবার দেখি ইতি।"

ইতি তেমনি ভাবেই বলিল, "না না, আমি বেশ আছি। আমার হাত দেখতে হবে না, আমার জ্বর ছেড়ে গ্যাছে।"

আহত হইয়া কমনীয় বলিল, "কই তোমার জ্বর ছেড়েছে? বেশ জ্বর রয়েছে, গা এখনো গরম বোধ হচ্ছে।"

ইতি প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না—আমার জ্বর ছেড়ে গ্যাছে, আমি এখন কাজে যাব।"

বিস্মিত হইয়া কমনীয় বলিল, "কাজে যাবে? সর্ব্বনাশ, অমন কাজ কোর না ইতি। আগে নিজের জীবন রক্ষা কর, তারপরে—"

"জীবন রক্ষা," ইতি উঠিয়া বসিল, তাহার মুখে ব্যঙ্গপূর্ণ হাসি ফুটিয়া উঠিল, "জীবন রক্ষা? বেশ কথা বলছ তুমি; আমার জীবন রক্ষা করবার দরকার? জীবন রাখবে তারা—যাদের দ্বারা জগতের কোনও না কোনও উপকার সাধন হবে, আমার থেকে কোন লাভ হবে না। আর কাজ না করলেই বা খাব কি, মণি খাবে কি?"

কমনীয় শান্তকণ্ঠে বলিল, "আমি তোমায় চিরকাল বসে থাকতে বলছি নে ইতি, স্বাবলম্বন যে সবারই থাকে আমি তাই চাই, ভালও বাসি তাই। পরের গলগ্রহ হয়ে যারা থাকে বা পরের কাছে ভিক্ষা করে যারা জীবনধারণ করে তাদের আমি ঘৃণা করি। আমি তোমার এ নীচ কাজ করা পছন্দ করি নে। তুমি বেশ লেখাপড়া জানো, শিল্প

কর্ম্ম জানো, কোনও একটা স্কুলে টিচারের কাজ নিলে তুমি বেশ মানের সঙ্গে কাজ করতে পারবে। আমি এখানে একটা মেয়ে স্কুল করবার সব ঠিক করেছি, তোমায় তার টিচার করব বলেই তোমার কাছে এসেছি। আমাদের এখানে একটাও মেয়ে স্কুল নেই, আমার আর আমার দাদার খুব ইচ্ছে যাতে এখানকার মেয়েরা বেশ শিক্ষিতা হ'তে পারে। ভেবে দেখ ইতি, কাজটা নেবে কি? যদি তোমার মত হয়, আসছে মাস হ'তে স্কুল যাতে চলতে পারে তাই করি।"

ইতি মাথা নীচু করিয়া ভাবিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া কমনীয়ের পানে চাহিয়া বলিল, "কিন্তু এতে লোকে নিন্দে করবে না কি?"

কমনীয় বলিয়া উঠিল, "আবার সেই নিন্দের ভয় ইতি? যদি প্রতি পদে ভয় করেই চলতে হয়, তবে বেঁচে থাকায় সার্থকতা কি? নিন্দেকে কাটিয়ে উঠতে হবে, তবেই হবে যথার্থ মানুষ। যত পার নিজেকে বিস্তৃত করে দাও, গুটিয়ে রাখলে নিজেরও ক্ষতি, দশেরও ক্ষতি। তোমার মধ্যে যে শিক্ষাটুকু আছে, সেই শিক্ষাটা যে দশটা মেয়ে পাবে, তারা আবার দশটা ঘর সেই শিক্ষার আলোয় উজ্জ্বল করে তুলবে। যা তুমি পারবে তা করতে সঙ্কুচিত হোও না, এতে ভগবানের মঙ্গল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। বিশ্বাস কর, তোমার দ্বারা কোনও মহৎ উদ্দেশ্য সাধন হবে বলেই ভগবান তোমায় জগতে পাঠিয়েছেন। এ জগতে প্রত্যেক মানুষেরই নির্দ্দিষ্ট কাজ আছে; কেউ বা তা বুঝতে পেরে কাজ করতে যায়, কেউ বা বুঝেও অবুঝের মত অলস হয়ে পড়ে থাকে। একটা কাণা খোঁড়া মানুষের দ্বারাও সময় সময় মহৎ কাজ হয়, তুমি সুস্থদেহী, তোমার সকল প্রধানেন্দ্রিয় বর্ত্তমান, তুমি কেন পারবে না? সামান্য লোকনিন্দার ভয়ে পিছিয়ে যাবে? তারাই যে সময়ে আবার তোমার দ্বারাই উপকৃত হবে, সেটা ভুলে যাচ্ছ তুমি?"

ইতি শ্রান্তভাবে শুইয়া পড়িল, বলিল, "না কমদা' ভুলি নি। আমায় সাহস দেবার কেউ নেই বলেই আমি ভয় পেয়ে যাই পাছে কেউ কোনও কথা বলে। আমার মন বড় দুর্ব্বল—আমি—"

কমনীয় প্রসন্ন মুখে বলিল, "আমি তোমায় সাহস দেব ইতি, তোমার পেছনে আমি দাঁড়িয়ে থাকব। তোমার কিছু ভয় নেই, তুমি শুধু এগিয়ে যাও, তোমার জীবন শিক্ষা দানের জন্যে উৎসর্গ করে দাও। যাক, দেখি তোমার হাতখানা এবার, এবার বোধ হয় আপত্তি করবে না।"

ইতি হাত বাহির করিয়া দিল। কমনীয় নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিল, "জ্বর তোমার এখনও বেশ রয়েছে। আমি গিয়ে ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি, রীতিমত করে ওষুধ খেয়ো, যেন অবহেলা কোর না।"

সে বাহিরে আসিয়া দেখিল, বিষণ্ণ মুখে মণি ফিরিয়া আসিতেছে। একটু হাসিয়া কমনীয় বলিল, "কাউকে বুঝি পেলি নে মণি?"

মণি মুখ ভার করিয়া বলিল, "কেউ এল না?"

কমনীয় বলিল, "কাও আসতে হবে না। তুই আর দেখি আমার সঙ্গে, তোর দিদির জন্যে ওষুধ দিচ্ছি, নিয়ে আসবি। দেখিস—নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওষুধ খাওয়াস, যেন ভুলিস নে, নইলে হয় তো সে ওষুধ ফেলে দেবে। আমি আমার মাকে পাঠিয়ে দেব'খন, তিনি এসে তোকে রেঁধে দেবেন, তোর দিদির খাবার করে খাইয়ে যাবেন'খন।"

মণি বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি তাহার মুখের উপর রাখিয়া বলিল, "তোমার মা? তোমার মা তো মরে গ্যাছে কমদা'।"

কমনীয় হাসিয়া বলিল, "হ্যা, সে মা আমার মরে গ্যাছে, কিন্তু আর একটা নূতন মা যে পেয়েছি তা বুঝি জানিস নে? আচ্ছা, চল, আমার সে নতুন মাকে দেখাব-খন তোকে, সে তোদেরও মা হবেখন। সে এমন মা যে তাকে পেলে আর ছাড়তে চাইবি নে।"

কমনীয়ের নূতন মাকে দেখিবার জন্য মণি অত্যন্ত ছটফট করিতে লাগিল, তাড়াতাড়ি চলিতে চলিতে বলিল, "কোথায় কুড়িয়ে পেলে এ মাকে কমদা'?"

কমনীয় বলিল, "যেখানে চাকরী করতে গেছলুম, সেইখানে।" ক্রমশঃ।

কাশ্মীর-কাহিনী।

[শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১১ই অক্টোবর বেলা ১১টার সময় আহারাদি সারিয়া আমরা মোট-ঘাট বাঁধিয়া হাউস্-বোটে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া হাউস্ বোটে লইয়া যাইবার জন্য, মাঝি-ভ্রাতা সিদিক ধর্ম্মশালায় শুভাগমন করিয়াছিল। আমরা কতিপয় বাক্স-মুটের মাথায় মোট দিয়া তাহাদের পশ্চাদানুবর্ত্তী হইয়া মীরাকোদলের সেতুর কাছে গমন করিলাম। ধর্ম্মশালা হইতে মীরাকোদলের সেতু ৩।৪ মিনিটের পথ। আমরা তিনখানা শিকারা (ছোট ডিঙ্গি) ভাড়া করিয়াছিলাম। ছোট শিকারায় দুইখানি ও বড় শিকারায় চারখানি খুব পুরু গদি আঁটা, নানাবর্ণের ফুল তোলা ছিটের চাদর মোড়া চেয়ার থাকে। স্প্রীংয়ের চেয়ারের মত ইহাতে বসিতে আরাম হয়। আমরা বন্ধুচতুষ্টয় একখানি বড় শিকারা লইলাম। জ্ঞান দা' ও মাতুল মহাশয়ের জন্য এক একখানি ছোট শিকারা লওয়া হইল। আমাদের শিকারায় বসিয়া গুছাইয়া লইতে বেলা প্রায় ১২টা বাজিয়া গেল। শিকারা ছাড়ে ছাড়ে, এমন সময় জ্ঞান দা'র মনে পড়িল, তাহার অতি প্রিয় ভাওয়ায় টিকেগুলি ধর্ম্মশালায় ফেলিয়া আসা হইয়াছে। আমার বিলক্ষণ হাসি আসিল। মনে পড়িল দাশুদা'র 'কণ্ঠহার' নাটকের জনৈক স্ত্রী-যাত্রীর তেঁতুলের হাঁড়ী না হারায় তৎসম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা-অবলম্বন। বাধ্য হইয়া, আবার শিকারা ছাড়িয়া হৃষীকেশকে ধর্ম্মশালায় ছুটিতে হইল। মাতুল মহাশয় বলিলেন—'আবার যাচ্ছ কোথা?" হৃষীকেশ বলিল, "আজ্ঞে, আমার কাপড়খানা ফেলে এসেছি।" মাতুল মহাশয় একটু ধমকাইয়া বলিলেন—'আচ্ছা আলগা লোক তুমি ত হে। এই রাওয়ালপিণ্ডিতে একখানি কাপড়ের পিণ্ডি দিয়ে এলে আবার ধর্ম্মশালায়?" টিকে ফেলে আসার কথা ত আর গুরুজন মাতুল মহাশয়কে বলা যায় না! আমরা হৃষীকেশের অপ্রতিভ ভাব দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলাম।

অতঃপর হৃষীকেশ টিকে লইয়া ফিরিলে শিকারা আমাদিগকে হাউস-বোটে তুলিয়া দিবার জন্য ধীর মন্থর গতিতে ছাড়িল। হৃষীকেশ বলিল—"ভো ভো শিসা-প্রায় চক্ষু, ভয়ং মা কুরু।" একান্ত অ-কবি চক্ষু তখন মুগ্ধ হইয়া কিনারার দিকে চাহিয়া বিভোর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের সকলেরই তখন অল্প-বিস্তর বিভোর অবস্থা। মাতুল মহাশয়ের শিকারার দিকে চাহিয়া দেখিলাম। মাতুলানীকে তিনি কি বুঝাইতে-ছিলেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কিম্বা টাকাকড়ির হিসাব পত্র তাহা আমরা শুনিতে পাই নাই তবে প্রথমটাই মনে হয়, কারণ তাঁহাদের মুখে-চোখেও বিলক্ষণরূপে বিভোরতার ছাপ পড়িতেছিল! কেবল এই ভাবের ব্যত্যয় ঘটিয়াছিল, জ্ঞান দা' ও বৌ-দি'র মুখে। তাহাদের মুখের অভিব্যক্তি—"ওরে বোকারা এত পয়সা খরচা করে এসে এ ক'দিনে যা দেখ্‌লি সেটুকুর সবই দেখ্‌তে পেতিস্ দুর্জ্জয়লিঙ্গে গেলে। কল্পনায় ও বাস্তবে ঢের তফাৎ!"

মৌনভাব ভঙ্গ করে দাশু দা' বলিল—"ওরা যদি পোলাওকে পান্ত মনে করে, আমাদের অপরাধ কি?"

প্রায় ১৫ মিনিট আমরা একত্রই চলিলাম। তারপর ঝিলামের শাখা চেনারবাগের খালে মাতুল মহাশয় ও জ্ঞান দা'র শিকারা প্রবেশ করিল, কারণ তাহাদের জন্য "পপি ফ্লাওয়ার" নামে যে হাউস-বোটটা ভাড়া করা হইয়াছিল, সেখানা চেনারবাগেই ছিল। আমরা ঝিলামবক্ষে বাহিয়া দূরে, বহুদূরে শ্রীনগর সহরের প্রায় প্রান্তভাগে আমাদের নির্দ্দিষ্ট হাউস-বোট "এলফিন্ কুইনে" উঠিবার জন্য চলিলাম। এই সময়ে দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে চতুর্দ্দিকের বরফমণ্ডিত পাহাড়-

গুলি কেমন ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল। কোনও চিত্রকর যে সে রঙ, সে সৌন্দর্য্য চিত্রে ফুটাইতে পারে না তাহা বিশেষ রূপেই উপলব্ধি করিতেছিলাম। প্রায় ১॥০ ঘণ্টা পরে আমাদের বাঞ্ছিত হাউস্-বোটে পৌছিলাম। সকলে বিশেষ স্বস্তিবোধ করিলাম। আত্মগৌরবে চির অক্ষম দাশু দা'ও বলিয়া উঠিল—"ভাই সকল, শুধু পুইসা।" আমি বলিলাম "দাশু দা', তুমি ভারি ক্লেভর (clever)—জ্ঞান দা'কে ছোট বোট দেওয়ার জন্য কি রকম চটবে তার একটা পূর্ব্বাভাস পাচ্ছ কি?" দাশু দা' বলিল—"বেশ তো, তারা যদি এ বোট পছন্দ করে, ছেড়ে দেব, আমাদের আর কি! তবে ইন্দু বলেছে রোজ একটা কাশ্মীরী নাচের ব্যবস্থা করবে—তার জন্য ত একটা বড় হল-ঘর চাই। এ সব শুনলে সুবোধ জ্ঞান দা' অবোধের মত রাগ করবে না নিশ্চয়ই।"

তারপর মোট-ঘাট যথাযথ স্থানে রাখাইবার ব্যবস্থা হইল। দাশু দা' আমাদের পাণ্ডা, একথা পূর্ব্বেই বলেছি। কর্ত্তা হ'তে গেলে অনেক সহিতে হয়। তাই দাশুদা' আমাদের বল্লেন—তোমরা সব এক একখানি ঘর বেছে নাও। বন্ধু হৃষীকেশের ভূতের ভয় এবং চোরের ভয়—উভয় ভয়ই প্রবল, এবং একাকী একখানি ঘরে আরাম করিয়া থাকিবার সখও সে রাখে। সুতরাং সে মাঝের শয়ন-কক্ষটী মনোনীত করিল। ১ম শয়নঘরের মধ্য দিয়া সেই মাঝের ঘরে যাইতে হয় এবং সেই ঘরের ভিতর দিয়া প্রান্তভাগের ঘরে যাইতে হয়। ইন্দু প্রান্তভাগের ঘরখানি ছোট বলিয়া পছন্দ করিল না। সে প্রথম শয়নকক্ষ মনোনীত করিল। দাশু দা' যেন একান্ত অনিচ্ছা দেখাইয়া প্রান্ত কক্ষটী দখল করিল। তিনজনে ত তিনখানি ঘর লইল। আমায় হয় দরিয়ায় ভাসিতে হয়, নহিলে ভোজন-কক্ষে বা বৈঠকখানায় নিশাযাপন করিতে হয়। কৃপা-পরবশ হইয়া ইন্দু আমাকে তাহার কক্ষে অন্য একখানি খাটিয়া পাতিয়া আশ্রয় দিতে চাহিল। আমি তাহার আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলাম না।

প্রত্যেক কক্ষে একখানি খাটিয়া, একটী আলমারী, একটী হ্যাট-র‍্যাক, একটী অগ্নিকুণ্ডের স্থান (Fire-place)। মেঝেতে দামী গালিচা পাতা। দুইটী বৈদ্যুতিক আলো ও একটী স্নানাগার। তবে দাশু দা'র কক্ষের সংলগ্ন স্নানাগারটী প্রশস্ত এবং একটী প্রকাণ্ড স্নান করিবার বালতি সংযুক্ত। সে ঘরে দেশীভাবে বসিয়াও স্নান করা চলে এবং জল-নিকাশের সুন্দর ব্যবস্থা আছে। এ ঘরে আসিবার পথ আমাদের ঘর দিয়া ত আছেই, উপরন্তু হাউস্-বোটের প্রান্ত দিয়া আর একটী পথও আছে।

তখন তিনটা বাজিয়াছে। আমি বলিলাম, 'আমাদের হাউস্-বোট চলিতেছে। ইন্দু বলিল 'না চলিতেছে না'। কথায় তর্ক এবং ফলে বাজী। একটা পাখীকে লক্ষ্য করিয়া আমরা বাজীর মীমাংসা করিতে বলিলাম। খানিক পরে নৌ-গৃহ চলিতেছে ইহাই সাব্যস্ত হইল। কিন্তু ইন্দু তাহার Debt of honour ৫৲ টাকা উপর্যুপরি তাগাদা সত্ত্বেও প্রদান করে নাই। আমরা চারখানি চেয়ার সারি সারি পাতিয়া নৌ-গৃহের ছাদটীতে বসিলাম।

যথাসময়ে ধীরে ধীরে আমাদের নৌ-গৃহও চেনার-বাগ খালে প্রবেশ করিল। একটা দারুণ দুর্গন্ধ আমা-দিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। বেলেঘাটার সন্নিকট চিংড়ীহাটার খালে যেরূপ দুর্গন্ধ ততটা না হইলেও তার অর্দ্ধেক নিশ্চয়ই। জল সেস্থলে অচলপ্রায়। আমরা মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, খালের ভিতরেও কি এইরূপ গন্ধে বিভোর হইয়া থাকিতে হইবে! ঝিলামের উপরেই আমাদের রাখ না কেন? মাঝি বলিল—ঝিলামের উপর কোন স্থানই এখন খালি নাই। উহা ১ম শ্রেণীর স্থান, সাহেবেরা পূর্ব্ব হইতেই লইয়া রাখিয়াছে। তবে সে আমাদিগকে জোর করিয়া বলিল—চেনারবাগে খালের যেখানে আমাদের নৌগৃহ প্রতিষ্ঠিত হইবে, সে স্থানে আদৌ দুর্গন্ধ পাওয়া যাইবে না। অগত্যা আমরা নিরুত্তর রহিলাম। এই খালের পার্শ্বে অন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নাই, আছে শুধু দুই পার্শ্বে বাঁধের উপর রাস্তা। খালের মধ্যে ১৫।২০ বিঘা জমি লইয়া এক একটী ছোট দ্বীপ তৈয়ারী করা আছে। নৌ-গৃহ হইতে সহরে যাইতে হইলে প্রথমে দ্বীপে উঠিতে হয়, তারপর কাঠের সিঁড়ির উপর উঠিয়া কাঠের সেতু পার হইয়া বাঁধের রাস্তায় পড়িতে হয়।

এইরূপ দ্বীপ তৈয়ারী করার কায়দা সর্ব্বত্রই দেখিলাম। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে নৌ-গৃহ পৌঁছিল। মাঝি যে যুধিষ্ঠিরের বংশাবতংশ, আমাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়াই তাহা উপলব্ধি করিলাম। সত্যই সেখানে দুর্গন্ধ ছিল না। এ কথার প্রমাণ, পাশে পাশে সাহেবদেরও নৌ-গৃহ ছিল। জ্ঞান দা'র নৌ-গৃহটী দ্বীপের পশ্চিমে, উত্তর দক্ষিণ মুখ করিয়া খালের উপখালে ছিল, আমাদের নৌ-গৃহটী ছিল, দ্বীপের উত্তরে পূর্ব্ব পশ্চিম মুখ করিয়া। সুতরাং দাশু দা'র শয়ন-কক্ষ হইতে জ্ঞান দা'র নৌ-গৃহের প্রান্তভাগ ২০।২৫ ফুটের ব্যবধান হইবে। আমরা পৌঁছিয়াই বৈদ্যুতিক আলোক সংযোগের জন্য ইঞ্জিনিয়ারকে পত্র দিলাম। একজন সেই পত্র লইয়া ছুটিল। আমি একজন মাঝিকে লইয়া মীরাকোদলের বাজারে গমন করিলাম। দেখিলাম, আহার্য্য ফল-মূল প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। মুসলমানের দোকানই প্রায় পনর আনা। ২।৩টী মাড়োয়ারীর জলখাবারের দোকানও আছে। স্থানীয় হিন্দু কাশ্মীরকের কয়েকখানি মসলার দোকান দেখিলাম। ছোট বড় প্রায় সকল রকম দোকানেরই মালিক মুসলমান। মাঝিকে লইয়া জিনিস পত্র কিনিতে যাইবার ২টী উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ, আমাদের মনের মত আহার্য্য-সংগ্রহ, দ্বিতীয়তঃ, অনর্থক চুরির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার বাসনা। বলা বাহুল্য, মাঝি ও দোকানদারেরা যে ভাষায় কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল তাহার বিন্দুবিসর্গ আমি বুঝিতে পারিলাম না। আমি ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে যাহা বলি তাহারা তাহা ভালই বুঝে এবং বোধগম্য হইবার মত উত্তরও বেশ দেয়। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিলে তাহা পারসীয়ান বা গ্রীক মিশ্রিত ভাষা তাহা বুঝিবার উপায় নাই। আমি নিবিষ্ট হইয়া তাহাদের কথোপকথন শুনিতে লাগিলাম। কতকগুলা শব্দের তুবড়ী, উচ্চ পর্দ্দায় উঠিতেছে, খাদে নামিতেছে। হয়ত বা আমাদের মাঝি বলিতেছিল—"যে জিনিস কিনিব তাহার অর্দ্ধেক টাকা আমার কমিশন রাখিও। যেমন বাবু অবিশ্বাস করে সঙ্গে এসেছে তার ফল দাও।" ফলও বেশ পাইয়াছিলাম। যে চাল আমার পছন্দ হইয়াছিল, তাহার মণ্য দিয়াছিলাম ৩২৲ টাকা মণ হিসাবে!

গোড়ায় একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। আমরা এখন হ্যাটকোট প্যাণ্ট-আঁটা সাহেব। নিজেদের নূতন পোষাক-পরা চেহারা আর্সিতে দেখে নিজেরাই হাস্যসম্বরণ করিতে পারি নাই। কেশবচন্দ্র বা পরেশ সেন থাকিলে হয়ত তাদের বিদ্রূপে আমরা অস্থির হইয়া উঠিতাম, কিন্তু উপায় ছিল না। আমরা সেই পোষাকেই স্ফীতবক্ষে দরবার, পুরস্কার-বিতরণের সভা হইতে আরম্ভ করিয়া নানা ভদ্রলোকের প্রিয় আস্তানা ললিতবাবুর বৈঠকখানা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই বিচরণ করিয়াছিলাম। লোকে আড়ালে হাসিয়াছিল কি না জানি না, তবে আমাদের সম্মুখে দশনপংক্তি উন্মুক্ত করিয়া আমাদিগকে বিড়ম্বিত করিবার প্রয়াস কেহ পায় নাই, একথা বুক ঠুকিয়া বলিতে পারি!

যখন বাজার করিয়া ফিরিলাম তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। দেখিলাম, আমাদের নৌ-গৃহ আলোকমালায় বিভূষিত!

আমরা সকলে গরম জলে মুখ হাত ধুইয়া বৈঠকখানায় বসিলাম। জ্ঞান দা' ও মাতুল মহাশয় আসিয়া জুটিলেন। আমরা সকলে তখন ললিতবাবুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য একত্র যাত্রা করিলাম।

প্রায় ৮।১০ মিনিটের পথ। ললিতবাবুর বাড়ীখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর। সম্মুখে বাগান। বাগানে নানা জাতীয় ফুলের গাছ আছে, পিয়ার আপেলের গাছ আছে। কলি, কড়াইসুটী, কোয়াস্ প্রভৃতিও আছে। বারান্দা লতানে গাছে মোড়া। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও আঙ্গুর গাছ পাইলাম না। ললিতবাবুর মুখে শুনিলাম, আঙ্গুর কোয়েটাতে প্রচুর পরিমাণে হয়। কাশ্মীরে নানা জাতীয় পিয়ার উৎপন্ন হয়। সুহৃদ্বর কেশবচন্দ্রের পুত্র শ্রীমান্ জয়দেব গুপ্তকে মনে পড়িল। বাবাজীবন কাশ্মীরে আসিয়া গাছ হইতে মুখ দিয়া ছিঁড়িয়া আঙ্গুর খাইবে বলিয়া কত না আনন্দোচ্ছ্বাস করিয়াছিল! তাহাদের আসা হইলে, বাবাজীবনের মনোভঙ্গ হইত নিশ্চয়ই। তাহার উপর এখানে যে আঙ্গুর জন্মায় তাহা গোল এবং টক। কলিকাতার বাজারে চৈত্র বৈশাখ মাসে যেমন বিক্রয় হয় তেমনই। তবে হাঁ, এখানকার ভাল পিয়ার এখানে না

আসিয়া কেহ খাইতে পায় না। সেগুলি চালান হইবার নহে, পথে পচন অনিবার্য্য।

ললিতবাবুর বৈঠকখানায় স্থানীয় প্রবাসী বাঙ্গালী মাত্রকেই সন্ধ্যার পর একবার করিয়া হাজির দিতে হয়। প্রোফেসার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক প্রভৃতি লইয়া আট ঘর বাঙ্গালীর বসতি শ্রীনগরে আছে। ললিতবাবুর অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ। কোনও বাঙ্গালী আজকাল শ্রীনগরে গিয়া ললিতবাবুর সহিত আলাপ-পরিচয় করেন নাই, অথবা তাঁহার বাড়ীতে পদার্পণ করেন নাই, শুনি নাই। ললিতবাবু বিশেষ যত্ন করিয়া আমাদের বসাইলেন। চা, চুরুট, সিগারেট দিলেন এবং একটা প্রকাণ্ড থালে নানা জাতীয় গোটা পিয়ার আপেল আমাদের খাইবার জন্য আনিয়া দিলেন। সেখানে ফল কাটিয়া দিবার রীতি নাই, শুনিলাম। আমরা ভয়ে ভয়ে ফলগুলি একেবারেই গ্রহণ করিলাম না। কারণ রাউলপিণ্ডির ডাক্তার দত্ত মহাশয় আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছিলেন, কাশ্মীরে গিয়া আমরা যেন ফল একেবারে অত্যধিক না খাই। এক টুকরা করিয়া ফল খাইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যহ সামান্য মাত্রায় ফল-ভক্ষণ বাড়াইয়া যাইতে তিনি বার বার উপদেশ দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ললিতবাবু এবং সমাগত ভদ্রমণ্ডলীও সেই উপদেশের সমর্থন করিয়াছিলেন।

ছেলেবেলায় চাণক্য শ্লোকে পড়িয়াছিলাম—'বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে।' এই বাক্যটী যে নির্ভুল নহে সেটা প্রমাণ হইয়া গেল শ্রীনগরে। পাশের মোট-বহা 'পণ্ডিত' না হইলেও, দাশু দা'র গানে বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছিল। শ্রীনগরে একটা 'সাড়া' পড়িয়া গিয়াছিল। বলিতে ভুলিয়াছি, আমাদের অনুরোধে ললিতবাবু প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় আমরা সকলে একত্র মিলিলে আমাদের দৈনন্দিন ভ্রমণের একটা তালিকা করিয়া দিতেন। আমরা (বিশেষতঃ দাশু দা') পাছে কোনও দিন সন্ধ্যার সময় না যাই, এইজন্য তিনি একেবারে ৩।৪ দিনের মত ভ্রমণ-তালিকা করিয়া দিতেন না। তালিকা লইয়া মিষ্ট বচনের আদান-প্রদানের পর আমরা রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় নৌ-গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। আহার্য্য প্রস্তুত ছিল। সকলে একত্র আনন্দ-ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়াই, একটা সিগারেট মুখে দিয়া শয্যা-গ্রহণ করিতে চলিলাম। যাঁহারা দার্জ্জিলিঙ্ বা সিমলায় কখনো গিয়াছেন তাঁহাদিগকে নিশ্চয় আমাদের বিছানার অবস্থা বুঝাইতে হইবে না, যাঁহারা যান নাই তাঁহারা জানিয়া রাখিতে পারেন, তোষকের উপরে এবং লেপের নীচে এক একখানি কম্বল না পাতিলে বিছানায় নিশ্চিন্ত হইয়া শুইয়া নিদ্রা যাইবার উপায় নাই।

শঙ্করাচার্য্যের পাহাড়।

পরদিবস আমরা সকলে শঙ্করাচার্য্য পাহাড়ে উঠিবার জন্য গমন করিলাম। শঙ্করাচার্য্য পাহাড়টী শ্রীনগরের মধ্যে অবস্থিত 'মনুমেণ্ট'। শ্রীনগরে পদার্পণ করিতেই এই মনুমেণ্টের উপর সর্ব্বাগ্রে নজর পড়ে। আমরা ১৫।২০ মিনিট পদব্রজে গিয়া পাহাড়ের পাদমূলে উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম, এক মাইল যাইলে শিখরদেশে মন্দিরে পৌঁছিব। উঠিবার সময় সকলের বেশ স্ফূর্ত্তি দেখা গেল। প্রথম খানিকটা পথ আমরা বেশ উঠিলাম, তাহার পর পথ অত্যন্ত বন্ধুর, প্রায় সোজা উপরে উঠিয়াছে। কোথাও পাহাড় কাটিয়া সিঁড়িও তৈয়ারী আছে। আমাদের সকলকেই অল্প বিস্তর হাঁপাইয়া পড়িতে হইয়াছিল। মাতুল মহাশয়ের জন্য আমরা ভীত হইয়া পড়িলাম। সকলেই বার বার তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিলাম। একটা প্রস্তরখণ্ডের উপর, পাহাড়ের ছায়াতে তাঁহাকে বসাইয়া বলিলাম, আপনি ১৫।২০ মিনিট অপেক্ষা করুন, আমরা মন্দির দেখিয়াই ফিরিতেছি। তিনিও আমাদের অনুরোধে স্বীকৃত হইয়া বসিলেন। আমরা আবার উঠিতে লাগিলাম। খানিকটা অগ্রসর হইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি, মাতুল মহাশয়ও ধীরে ধীরে আসিতেছেন। তাহার সাহায্যের একান্ত আবশ্যক মনে করিয়া পাহাড়ী-পাণ্ডা দাশুদা' তাঁহার নিকট গমন করেন এবং মাতুল মহাশয়কে পর্ব্বতারোহণ হইতে নিবৃত্ত করা অসম্ভব মনে করিয়া তাঁহার দেহের কতক ভার স্বীয় স্কন্ধে লইয়া তাঁহাকে ধরিয়া ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিল। জ্ঞান দা'র পুত্র টুকু কিন্তু পাহাড়ী ভৃত্যের সহিত সর্ব্বাগ্রে দ্রুত আরোহণ করিতেছিল।

উপরে উঠিতে আমরা সকলেই বিশেষ ক্লান্তিবোধ

করিয়াছিলাম, কিন্তু বেলা ১০টার সময়েও স্নিগ্ধ বায়ু সঞ্চালনে, শীঘ্রই সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করিলাম। শঙ্করাচার্য্যের পাহাড়ের শীর্ষদেশ হইতে শ্রীনগরের শোভা অপরূপ! আঁকিয়া বাঁকিয়া ঝিলাম নদী প্রবাহিত—নয়নাভিরাম কমল-কুমুদ-কহ্লার সুশোভিত 'ডল' হ্রদ। কোথাও অপরূপ সুশ্রী কাশ্মীর-কুমারী 'শিকারা' বাহিয়া নানা জাতীয় ফল বাজারে লইয়া যাইতেছে—কোথাও একের পর অন্য শাল বিক্রেতা বিবিধ বস্ত্র হাউস-বোটে ফেরি করিয়া ঘুরিতেছে! স্থানে স্থানে কোথাও ঝিলাম কোথাও ডল হ্রদ বক্ষে অসংখ্য সুসজ্জিত শিকারায় নৌ-বিহাররত বাঙ্গালী, ইংরাজ এবং অন্যান্য জাতীয় দর্শক! দূরে 'বুলার' হ্রদের জলরাশী বিস্তৃত রূপার পাতের মত সূর্য্যরশ্মি-সম্পাতে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।

শিখরদেশটী খুব বিস্তৃত স্থান নহে। সেইখান হইতে কয়েকটী সিঁড়ি দিয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। ১৫৷২০ সের তৈল ধরিতে পারে এমনই একটী সুবৃহৎ দীপাধারে দীপ প্রজ্বলিত। ভিতরে একটী বৃহৎ বাণেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। একজন গেরুয়া বসনধারী পূজারী সন্ন্যাসী এই স্থানে অবস্থান করেন। মহারাজার ব্যয়েই পূজাদি নির্ব্বাহিত হয় এবং প্রত্যহ দ্বিপ্রহরের সময় মহারাজার বাটী হইতে পূজারীর আহার্য্য ও পানীয় জল প্রেরিত হয়।

এই মন্দিরটী খৃঃ পূর্ব্বাব্দ ২৬২৯—২৫৬৪ বৎসরের মধ্যে কাশ্মীর-রাজ সান্দিমান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় এবং ৪২৬—৩৬৫ পূর্ব্বাব্দের মধ্যে রাজা গোপাদিত্য কর্ত্তৃক মন্দিরটী সংস্কৃত হয়। গাজনীর মামুদ খৃঃ অব্দ ৯৯৭—১০৩০ মধ্যে এই মন্দিরে নেমাজ পড়েন। সেখ গোলাম মহিউদ্দীন নামক একজন শিখ সর্দ্দার মন্দিরের চূড়াটী মেরামত করান। বৌদ্ধেরাও এই মন্দিরটিকে পবিত্র মনে করে এবং 'পাশ-পাহাড়' বলে। মুসলমান সমাজে এই মন্দিরের নাম "তখ্‌ত—ই—সুলেমান"। এই পর্ব্বতের পাদদেশে 'শঙ্করাচার্য্যের' মঠ আছে। উহা এখন গোঁসাই সম্প্রদায়ের অধিকারভুক্ত।

"স্থানীয় জনশ্রুতি এইরূপ যে, আচার্য্য শঙ্কর দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া অন্যান্য দেশ জয় করিয়া কাশ্মীরে উপস্থিত হন; নিজের অসামান্য পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার প্রভাবে তিনি কাশ্মীরেও বিজয়মাল্য লাভ করেন। আচার্য্য শঙ্কর কাশ্মীরে আসিয়া এই পর্ব্বতকে সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম ও নির্জ্জন মনে করিয়া এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। আচার্য্য শঙ্করের আদেশানুসারে অথবা তাঁহার স্মৃতিসম্মানার্থ এই পর্ব্বতশিখরে উক্ত শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাশ্মীরে অবস্থান কালে শঙ্কর এখানে বাস করিয়াছিলেন, সেইজন্য এই পাহাড় তাঁহার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই পাহাড়ের সহিত সম্বন্ধ আচার্য্য শঙ্কর সম্বন্ধীয় অন্য একটী কিংবদন্তীও শ্রীনগরে প্রচলিত আছে।

আচার্য্য শঙ্কর প্রথমে, এক অদ্বিতীয় চিদানন্দ পরমাত্ম-স্বরূপ শিবই মানিতেন, শক্তি মানিতেন না। একদিন আচার্য্য এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ আকস্মিক ব্যাধিতে পীড়িত হইলেন, তাঁহাদের উঠিবার সামর্থ্যও রহিল না। সকলেই অনাহারে রহিলেন; কারণ, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও পাক করিবার শক্তি ছিল না। এই পর্ব্বতটী সে সময়ে লোকালয় হইতে দূর ছিল; সশিষ্য আচার্য্যপাদের এই পীড়ার কথা কেহই জানিতে পারিল না। অবশেষে সন্ধ্যার প্রাক্কালে জগজ্জননী আদ্যাশক্তি আচার্য্যের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া 'গুজ্জর' (১) রমণীর বেশে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, তোমরা শুইয়া আছ, দেখিতেছি; দিবা অবসান প্রায়; তোমাদের আহার হইয়াছে ত?" আচার্য্য অতি কষ্টে উত্তর করিলেন, "মা, আজ আমাদের আহার হয় নাই। আমরা সকলেই অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছি; পাক করা দূরের কথা, কাহারও অগ্নি প্রজ্বালনেরও শক্তি নাই।" ইহা শুনিয়া জগজ্জননী মৃদুহাস্যে উত্তর করিলেন, 'বাবা, তুমি ত শক্তি মান না?'—এই কথা শুনিয়াই আচার্য্য অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে কেহই নাই, গুজ্জর-রমণী অন্তর্হিতা হইয়াছে। তাঁহারা সকলে তখনই রোগমুক্ত

(১) যাহারা গরু ও মহিষের পাল লইয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে চরাইয়া বেড়ায়, এইরূপ একজাতীয় লোককে কাশ্মীরে 'গুজ্জর' বলা হয়।

হইয়া উঠিয়া বসিলেন। তখন আচার্য্য বুঝিতে পারিলেন, ইহা আদ্যাশক্তি মহামায়ার ছলনা। জগজ্জননী তাঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া ভ্রম বিদূরিত করিবার জন্য এই উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি ভক্তিভাবে আদ্যাশক্তির স্তুতি করিতে লাগিলেন,—

"শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং
নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।" ইত্যাদি।

'শিব যদি শক্তির সহিত যুক্ত হ'ন, তাহা হইলেই তিনি সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয়ে সমর্থ হন। শক্তি-বিযুক্ত হইলে শুদ্ধ চৈতন্য মাত্র অবশিষ্ট থাকে, সে অবস্থায় শুদ্ধচিদানন্দ-স্বরূপ শিব স্পন্দনেও সমর্থ হন না; কারণ, কেবল চৈতন্যে ক্রিয়া-শক্তি থাকে না।' * ..

এইরূপ খাড়া পাহাড়ে আরোহণ করা কিরূপ কঠিন তাহা অনেকেই জানেন। অবতরণ করাও নিতান্ত সুবিধার নহে। অবশ্য তাহাতে হাঁপাইতে হয় না বটে, কিন্তু প্রতি পাদক্ষেপেই মনে হয় যেন কোন অশরীরী শক্তি ধাক্কা দিয়ে নীচে নামাইয়া দিতেছে।

মন্দির হইতে ২০০ ফুট আন্দাজ নামিয়াছি এমন সময় আমাদের পাহাড়ী ভৃত্য একটা সোজা সরল পথে নামিতে আরম্ভ করিল এবং আমাদেরও তাহার অনুগমন করিতে বলিল। আমরা দেখিলাম, সাধারণ পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নামিতে অনেক বিলম্ব হইবে এবং ভৃত্য-প্রদর্শিত পথে সহরের পথ নিম্নে দেখা যাইতেছে। সকলেরই লোভ হইল, সেই পথই অবলম্বন করিবে। দাশু দা', জ্ঞান দা', টুকু এমন কি মাতুল মহাশয় পর্য্যন্ত ভৃত্যের অনুসরণ করিল। হৃষীকেশ সোজা পথ ছাড়িতে চাহিল না। সেইজন্য তাহার সহিত আমিও সোজা পথের যাত্রী হইলাম। আমাদের নামিতে বিশেষ কষ্ট হয় নাই, কিন্তু শুনিয়াছিলাম আমাদের বন্ধুদের ও মাতুলের নামিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। দাশু দা' এক হস্তে টুকুকে এবং অন্য হস্তে মাতুলকে ধরিয়া, নিজেকে সামলাইয়া নামিয়াছে! বিশ্বাসী পাহাড়ী-ভৃত্য সর্ব্বাগ্রে গরম জামা কাপড়ের বোঝা মাথায় নিয়া নামিয়া পড়িয়াছিল, সম্ভবতঃ পাছে টুকুকে ধরিতে হয় বা অন্যকে সাহায্য করিতে হয় এই ভয়ে।

হাউস-বোটে ফিরিতে সেদিন বেলা ১২টা বাজিয়া গিয়াছিল। 'ফরাসী ভাবে' স্নাত হইয়া আমরা একত্র ভোজনাদি সারিয়া লইলাম। তাহার পর অক্ষ-ক্রীড়া। অবশেষে বেলা ৩টার সময় সকলে সহর-পরিভ্রমণে বাহির হইলাম। সন্ধ্যার পর ললিতবাবুর বাটীতে গমন করিলাম এবং গীত বাদ্য, কৌতুক আনন্দে রাত্রি ৯টা অবধি কাটাইয়া পরদিন বেড়াইবার স্থান-সমূহের তালিকা লইয়া ফিরিলাম। রাত্রিতে আহার-অন্তেও অক্ষ-ক্রীড়া চলিয়াছিল। বলা বাহুল্য, চির পরাজিত জ্ঞান দা'র এই দিনটী বড় গৌরবের ছিল, কারণ এই স্মরণীয় দিনে জ্ঞান দা' হৃষীকেশের সহিত খেলিতে বসিয়া ২ বাজী জিতিয়াছিল।

ললিতবাবুর নির্দ্দেশ মত পরদিন রবিবার আমরা নিষাদবাগ, সালিমারবাগ প্রভৃতি দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম। রবিবারে নিষাদবাগে সাহেব ও দর্শকদিগের মেলা, পান ভোজনাদি—আনন্দ-উল্লাস হয়।

দাশু দা' ঠিক করিলেন, আমরাও নিষাদবাগে আনন্দ করিব ও টিফিন খাইব। তদনুযায়ী বন্দোবস্ত হইল, পাচক ও বেহারা শিকারা ও রন্ধন করিবার নৌকা নিয়া 'ডাল' হ্রদে উপস্থিত থাকিবে। আমরা যদি 'শিকারা'য় যাইতাম তাহা হইলে আরও আনন্দের হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে সকল স্থান একদিনে দেখা হইত না। আমাদের অবস্থানকাল কম, একদিনেই তিনটী স্থান দেখিতে হইবে সেইজন্য আমরা তিনখানি 'টোঙ্গা' ভাড়া করিলাম। একখানিতে আমরা, একখানিতে মাতুল মহাশয় ও একখানিতে জ্ঞানেন্দ্র। যাত্রা করিলাম ১৪ই অক্টোবর বেলা ১০॥০ টার সময়।

এইখানে বলিয়া রাখা ভাল, দাশু দা' একটু কেমনতর হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার ফুল্ল হাস্য বদন বিশুষ্ক এবং মেজাজটা রুক্ষ। কোন কথার প্রতিবাদ সহ্য করিবার এবং নিজের মনকে আয়ত্তে রাখিবার মত ক্ষমতা তার ছিল না। সেইজন্য আমরাও তাহার প্রকৃতি ও মনের অনুসরণ করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতাম।

* ব্যাকরণোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী বিদ্যারত্নের "কাশ্মীরের কথা"—"অর্চ্চনা" ১৫শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা।

আমরা প্রায় ১॥০ ঘণ্টার মধ্যে চশমাসাহিতে পৌঁছিলাম। এই স্থানে একটা 'চিশমা' বা জলের উৎস আছে। পার্শ্বে কাশ্মীর-মহারাজের একখানি ঝকঝকে বিশ্রামাবাস। আমরা যেদিন গিয়াছিলাম, তার পূর্ব্ব দিন পাতিয়ালার মহারাজা চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি এই চশমাসাহির সংলগ্ন উদ্যানে তাঁবু ফেলিয়া ১॥০ মাস যাবৎ বাস করিতেছিলেন। আমরা গিয়া দেখিলাম, বিরাট ব্যাপার। তাঁবু তখন খোলা হইতেছে। তাঁবুর মধ্যেই রাজ-আসবাবের প্রত্যেক খুঁটিনাটি দেখিলাম। শয়ন-কক্ষ, বিরাম-কক্ষ, ভোজন-কক্ষ, মন্ত্রণা-গৃহ, কর্ম্মচারীদের আবাস, রন্ধন-শালা, অশ্বশালা, মোটর-শালা, প্রহরী-নিবাস প্রভৃতির কোন ত্রুটী ছিল না।

চশমাসাহির জল অতি স্বচ্ছ, হজমী ও পুষ্টিকর। বাগানটী তিন তবক। পাতিয়ালার মহারাজের ব্যবহারের জন্য নল বসাইয়া এই জল তাঁবুতে আনীত হইয়াছে দেখিলাম। আমাদের প্রদর্শক বলিয়াছিল, বোতলে দুগ্ধ বা ক্ষার ভরিয়া চশমাসাহির জলে ফেলিয়া দিলে, ২।৫ মিনিটের মধ্যে জমিয়া বরফ হইয়া যাইবে। তাহার কথাটী সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া আমরা বোতলে ভরিয়া জমাইবার কোন তরল পদার্থ লইয়া যাই নাই। তবে গেলাসে আকণ্ঠ জলপান আমরা করিয়াছিলাম এবং জল অত্যন্ত শীতল তাহাও বুঝিয়াছিলাম। সম্ভবতঃ এই জলের সাহায্যে নভেম্বর মাসে আইস-ক্রীম করা যাইতে পারে!

পাহাড়ের ঝরণার জল একটা কুণ্ডে একত্র করিয়া পাইপের সাহায্যে স্থানে স্থানে কোথাও ফোয়ারা, কোথাও প্রপাত, কোথাও ছোট চৌবাচ্ছায় প্রেরিত হইতেছে। কলিকাতা হইতে যে সব সৌখীন বড়লোক কাশ্মীরে বেড়াইতে যান তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রত্যহ ১৲।১॥০ টাকা ব্যয় করিয়া শ্রীনগর হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী চশমাসাহির জল আনাইয়া ব্যবহার করেন।

চশমাসাহির বাগানটী সম্রাট সাহজাহান তৈয়ারী করান। বাগানটী একটা ছবির মত। ইহার মধ্যে একটী প্রকাণ্ড ফুলের বাগান। মধ্যে চৌবাচ্ছায় উৎসের জল আসিয়া জমিতেছে এবং বৃদ্ধি জলটুকু অন্যদিক দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। মালী কতকগুলি ফুল আমাদিগকে উপহার দিল। লাল, বেগুনী, সবুজ, শ্বেত প্রভৃতি নানা রঙের ফুল। পাতাগুলি ভেলভেটের মত মসৃণ। হাতে লইতেও আরাম হয়। চশমাসাহির পশ্চিম দিকে বিস্তৃত 'ডল' হ্রদ। এই হ্রদের মধ্যে 'রূপলাঙ্ক' নামক একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ দৃষ্টিগোচর হয়। স্বচ্ছ জলের ভিতর গাছের ছায়া স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। মরাল মরালী গ্রীবা তুলিয়া সুখ-সন্তরণে বিভোর। আমি বলিলাম—'দেখ ভাই সব, আমরা দেখিয়াছি ফটো-চিত্র বাস্তব অপেক্ষা সুদৃশ্য। কলিকাতার গলির মধ্যে একখানি জঘন্য বাড়ী বা খোলার বাড়ীর ফটোতে দেখিলে সুন্দর মনে হয়। কিন্তু চশমাসাহি ও হ্রদের তৈল বা ফটো-চিত্র সম্বন্ধেও কি সে কথা বলা যায়?' সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইল, "ফটো-চিত্র কেন, স্বয়ং র‍্যাফেল্ আসিয়া তুলি ধরিলেও এ দৃশ্যের শতাংশের এক অংশও ফুটাইতে পারিবে কি না সন্দেহ।" সকলের উত্তর দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক।

আমরা চশমাসাহি দেখিয়া ফিরিতেছি, এমন সময় মাতুল মহাশয় ও জ্ঞানেন্দ্র চশমাসাহির সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছেন। এতক্ষণ তাঁহারা নীচে অন্য দিকের দৃশ্য লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। জ্ঞান দা' সিঁড়িতে উঠিতেই বৌদি ও ছেলেদের ফুলগুলি আমরা উপহার দিলাম। যথা, গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা। হৃষীকেশ কোন কথা সহজে কহে না। এটা তার স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু কোনও কোনও সময়ে ভাবের উৎস আসিলে সে রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতেও পারে না। হৃষীকেশ বলিল—'কি জ্ঞান দা' এইবার কি মত; কাশ্মীর ভাল, না দার্জ্জিলিঙ্ ভাল?' জ্ঞান দা' বলিলেন—"থাকতো যদি কেশব এর একটা মীমাংসা হ'ত।" আমি, দাশু ও হৃষীকেশ তিনজনেই তখন দার্জ্জিলিঙ্-অনভিজ্ঞ, সুতরাং মনে খটকা, খটকা কেন মনে দারুণ সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও দার্জ্জিলিঙ্‌কে একটা মস্ত স্থান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইলাম! ইন্দু কয়বার গিয়াছিল বটে, কিন্তু এরূপ বাক্‌বিতণ্ডায় সে প্রকাশ্যে যোগদান করিত না। আড়ালে বলিত—"আরে রাম, কার সঙ্গে কার তুলনা! একটা বাজপাখার কাছে, ছুগ্‌গো টুন্‌টুনি!"

যাঁহারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর স্থানে গিয়াছেন সেইরূপ বিশেষজ্ঞের মতে কাশ্মীরের মত স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই। কুয়াসাচ্ছন্ন ইংলণ্ড হইতে সূর্য্যালোক-দীপ্ত ইতালী পর্য্যন্ত সর্ব্বদেশের একত্রীভূত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতিনিধি 'কাশ্মীর'!

ক্রমশঃ।

আকাঙ্ক্ষা।

[শ্রীভক্তিসুধা হার]

আমি তো চাহিনে হ'তে প্রভু মহারাজ,
　নাহি চাহি স্বর্গ কভু জীবনের শেষে
চাহি শুধু মর্ত্ত্যবাসী মানবের মাঝ
　এক হ'য়ে মিশে থাকি চির রিক্ত বেশে।

　ধরণীর মানবের অনন্ত সাধনা
　আমার অন্তর দিয়ে করিতে রচনা
　মোর শত জনমের কামনা বাসনা
　　চাহি গো সবারে দান করিতে নিঃশেষে।

আমি তো চাহিনে হ'তে দীন অভাজন
　লাঞ্ছিত পঙ্কিল প্রাণ মরণে চাহিতে
বিশ্ব মানবের মাঝে চাহে মোর মন
　মিলন লাভেতে [illegible] পূর্ণ চিতে।

　চাহি হৃদয়েরে সেথা হৃদয় পরশে
　পূর্ণ [illegible] দিন সেথা মঙ্গল হরষে
　[illegible] মধুর নামে সেথা প্রাণরসে
　　জীবনের পাত্রখানি পূর্ণ ক'রে নিতে।

চাঁদপ্রতাপের ব্রত-কথা।

[শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

(১৪) পূর্ণিমা ব্রত।

অগ্রহায়ণ, মাঘ ও বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে দিবাভাগে এই ব্রত করা হয়। অমাবস্যা তিথিতে কিয়ৎ পরিমাণ আমন ধান্য ব্রতের জন্য রাখিয়া দিতে হয়। ব্রতের দিন মহিলাগণ সতেরটি ধান্য নখ দ্বারা খুঁটিয়া চাউল বাহির করিয়া রাখেন ও অবশিষ্ট ধান ভানিয়া যে চাউল পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা গোলাকার ও অন্য আকারের পিষ্টক প্রস্তুত করেন। উক্ত সতেরটি চাউল সতেরটি গোলাকার পিষ্টকের মধ্যে দেওয়া হয়। অগ্রহায়ণে পিঠা, মাঘে দই-ভাত ও বৈশাখে পায়স এই ব্রতের প্রধান খাদ্যোপকরণ। সাধ্যানুসারে খৈ, মুড়ি, মোয়া, ফল-মূল, ছানা, মাখন প্রভৃতিও দেওয়া হয়। অমাবস্যা হইতে চতুর্দ্দশী তিথি পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রাতে একবার করিয়া ও পূর্ণিমা তিথিতে প্রাতঃকালে একবার এবং ব্রতশেষে একবার কথা বলা হইয়া থাকে।

এই ব্রতে পুরোহিত হর-পার্ব্বতীর পূজা করেন। ব্রতিনী ব্রতের দিন উক্ত পিষ্টকাদি ব্যতীত অন্য কোন কিছু আহার করিতে পারেন না। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ললনা-দিগকে এই ব্রত করিতে দেখা যায় না।

এই ব্রত করিলে ধন পুত্রাদি লাভ হয় ও দুঃখ-দুর্গতি দূর হয়, ইহাই বঙ্গরমণীগণের দৃঢ় বিশ্বাস।

'কথা'—একদা কৈলাস পর্ব্বতে মহাদেব ও দুর্গা-দেবী পাশা খেলায় রত ছিলেন। কামদেব তাঁহাদের

ক্রীড়া দেখিতেছিলেন। খেলায় হার হইল মহাদেবের। ইহাতে কামদেবকে হাসিতে দেখিয়া তিনি রুষ্ট হইলেন ও তাহাকে অভিশাপ দিলেন,—"তোর দেহ এই মুহূর্ত্তে কুষ্ঠগ্রস্ত হউক।" তদ্দণ্ডেই কামদেব কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইলেন এবং দেবাদিদেবের আদেশে মর্ত্ত্যের কোন এক বন-মধ্যে এক কুঁড়েঘরে আশ্রয় লইলেন।

ইহার কিছুকাল পর একদিন হর-গৌরী কৈলাস হইতে শূন্যপথে অন্য স্থানে যাইতেছিলেন। উক্ত কুঁড়ের নিকট-বর্ত্তী হইলে তাঁহারা কামদেবের কাতর প্রার্থনা শুনিতে পাইলেন। কামদেব রোগ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া মহাদেবকে উদ্দেশে প্রার্থনা করিতেছিলেন,—"প্রভু, দয়া করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন এবং এ ঘৃণ্য রোগ হইতে আমাকে মুক্তি পাইবার উপায় বলিয়া দিন।" ইহা শুনিয়া ভগবতীর চিত্ত বিগলিত হইল। তিনি মহেশ্বরকে বলিলেন,—"কামদেব লঘু পাপে গুরু দণ্ড ভোগ করি-তেছে। যাহাতে সে সত্বর রোগ-মুক্ত হয়, তাহা আপনাকে করিতেই হইবে।" মহাদেব ভগবতীর কথা অমান্য করিতে পারিলেন না। তিনি তখনই আড়াই হাত একখানা কাগজে পূর্ণিমা ব্রতের 'কথা' ও নিয়মাদি লিখিয়া কাকা-সুরার দ্বারা কামদেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহাকে জানাইলেন যে, উক্ত কাগজখানা সে যেন যত্ন করিয়া রাখিয়া দেয়। তাহাকে ইহাও জানান হইল যে, পৃথিবীতে এক রাজার এক অবিবাহিতা বয়স্থা কন্যা আছে, তাহাকে বিবাহ করিতে পারিলে এবং সেই কন্যা বিবাহের পর পূর্ণিমা ব্রত করিলে সে ব্যাধি-মুক্ত হইয়া চিরসুখে কালযাপন করিতে পারিবে। কামদেব ইহা অবগত হইয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন এবং কাগজখানা সযত্নে রাখিয়া দিলেন।

এদিকে সেই রাজা একদিন মধ্যাহ্নকালে আহারের পর নিজের শয়নগৃহে পালঙ্কের উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় রাণীর সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিতেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে রাণী তাহাকে বলিলেন,—"ইচ্ছামতীর যে বিবাহের বয়স পার হইতে চলিল, সেদিকে ত আপনার কোন লক্ষ্যই নাই। একমাত্র মেয়ে আমাদের, রূপে-গুণে সে অতুলনীয়া। রাজা হইয়া তাহারও যদি সময়মত বিবাহ দিতে না পারেন, তবে ইহার চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে?" রাজা ইহা শুনিয়া বলিলেন,—"আমি থাকি নানা কাজের ঝঞ্ঝাটে। তুমিও ত আর কোন দিন একথা আমাকে মনে করাইয়া দেও নাই। সে যাহা হউক, আগামী কল্যই ইচ্ছামতীর স্বয়ংবরের দিন ধার্য্য হউক।"

সেই দিনই সর্ব্বত্র এ বিষয় জানান হইল। পর দিবস যথাসময়ে নানা স্থান হইতে ইচ্ছামতীর পাণিপ্রার্থী নরপতি-গণ রাজবাটীতে উপনীত হইয়া স্বয়ংবর সভায় উপবেশন করিলেন। কুষ্ঠগ্রস্ত কামদেবও এ খবর পাইয়া, অতি কষ্টে তথায় উপস্থিত হইয়া সভার এক কোণে নীরবে বসিয়া রহিলেন।

যথাকালে সুসজ্জিতা পরমা সুন্দরী রাজকন্যা মাল্যাদি হস্তে তথায় উপস্থিত হইয়া বর-মনোনয়নে রত হইলেন। শত শত সুশ্রী যুবক সেখানে উপস্থিত। সকলেই রাজ-কন্যার দিকে অনিমেষনয়নে চাহিয়া আছেন। কিন্তু তাহাদের কেহই তাহার মনোনীত হইল না। নানাদিক ঘুরিয়া-ফিরিয়া, অবশেষে কামদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন ও তাঁহাকেই উপযুক্ত মনে করিয়া ইচ্ছামতী তাঁহারই গলদেশে মাল্যদান করিলেন। ইহা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। উপস্থিত যুবকগণ টিট্‌কারি দিতে দিতে রাজবাটী হইতে প্রস্থান করিলেন। ইচ্ছামতী পিতামাতার তিরস্কার নীরবে সহ্য করিলেন এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপকারিগণের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। রাজা নিরুৎসাহ হইলেন। আমোদ আহ্লাদ করিবার প্রবৃত্তি কাহারও রহিল না। বিনা আড়ম্বরে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল।

বিবাহের কয়েক দিন পরই কামদেব পত্নীসহ নিজ কুটীরে উপস্থিত হইলেন। স্বামী মহাব্যাধিগ্রস্ত; তাহাতে যেমন ইচ্ছামতী দৃক্‌পাতশূন্য, রাজার মেয়ে হইয়া পর্ণকুটীরে বাস করাতেও তাঁহার তদ্রূপ চিত্তক্ষোভ জন্মিল না। সত্বরই কামদেব সকল বিষয় জানাইয়া রাজকন্যার হাতে সেই সযত্ন-রক্ষিত কাগজখানা দিলেন ও পূর্ণিমা ব্রত করিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিলেন।

রাজকন্যা কালবিলম্ব না করিয়া ভক্তি সহকারে যথা নিয়মে ব্রত করিলেন। ব্রতের ফলে শীঘ্রই স্বামী রোগ-মুক্ত হইলেন। আবার ব্রত করিবার পর তাঁহাদের দরিদ্রাবস্থা দুরীকৃত হইল। তৃতীয়বার ব্রত করিবার পরই ইচ্ছামতী গর্ভবতী হইলেন। যথাকালে তিনি এক পরম সুন্দর পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। উপযুক্ত সময়ে মহা সমারোহে পুত্রের নামকরণ ও অন্নপ্রাশন কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইল। ছেলের নাম রাখা হইল যুবরাজ। পতি-পুত্রসহ ইচ্ছামতী পরমসুখে ঘর-সংসার করিতে লাগিলেন।

বিবাহের পর হইতেই কন্যার দুরবস্থার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া রাণী সদা সর্ব্বদা অশান্তিতে কালযাপন করিতে-ছেন। একদিন তিনি রাজাকে কন্যার সংবাদ লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অনতিবিলম্বেই রাজা মেয়ের খোঁজে স্থানে স্থানে লোক পাঠাইলেন। অচিরেই খবর আসিল যে, নীরোগ সুশ্রী স্বামী ও সোণার চাঁদ ছেলেসহ রাজপ্রাসাদের ন্যায় সুন্দর বাটীতে সুখে বাস করিতেছেন। এ সুসংবাদ পাইয়াই রাজা-রাণী হৃষ্টচিত্তে লোক-লস্করসহ কন্যা, জামাতা ও নাতীকে দেখিবার জন্য বাটী হইতে রওনা হইলেন।

জামাতার আলয়ে উপনীত হইয়া তাঁহারা কন্যা, জামাতা ও নাতীকে দেখিয়া পরম পুলকিত হইলেন। রাণী মেয়ের নিকট তাহার সুখ-সৌভাগ্যের কারণ অবগত হইলেন এবং তাহার অনুরোধে সুসন্তান কামনা করিয়া ভক্তিপুতমনে সেই স্থানে পূর্ণিমা ব্রত করিলেন। ইহার কয়েক দিন পর রাণীর গর্ভসঞ্চার হইল। ইচ্ছামতীর ইচ্ছানুসারে তিনি তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজা লোক-লস্করাদি সহ নিজ বাটীতে চলিয়া গেলেন।

উপযুক্ত সময়ে রাণীর একটি সুসন্তান জন্মিল। এই শুভ সংবাদ অচিরেই রাজার নিকট প্রেরিত হইল। এই সুসমাচারে রাজার আনন্দের সীমা রহিল না। সত্বরই তিনি জামাতার বাটীতে যাইয়া হৃষ্টমনে পুত্রের চাঁদ মুখ দর্শন করিলেন। কিছুকাল পর তিনি রাণী ও পুত্রাদিসহ নিজ বাটীতে উপস্থিত হইলেন। যথাসময়ে মহা আড়ম্বরে ছেলের নামকরণ ও অন্নপ্রাশন ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল। রাজা পুত্রের নাম রাখিলেন সুবরাজ।

রাজা বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলে পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া রাণীর সহিত ধর্ম্ম-কর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন। কামদেবও বৃদ্ধাবস্থায় শ্বশুরঠাকুরের পন্থা অনুসরণ করিলেন।

ব্রত মাহাত্ম্য অবগত হইয়া দেশ দেশান্তরের সকলেই পূর্ণিমা ব্রত করিতে লাগিল।

বুদ্ধির জয়।

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম-এ, বি এল]

উত্তরভূমের রাজা যশোবন্ত রায় রাজকুমার দিলীপ-চাঁদের বিদ্যাশিক্ষার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। ভূমিহার রাজাদের মধ্যে যশোবন্ত রায় শৌর্য্য বীর্য্যে সর্ব্ব-প্রধান ছিলেন। তাঁহার সমকালে তাঁহার মত ক্ষমতাশালী নরপতি মধ্যভারতে কেহই ছিলেন না। তাঁহার সুবিস্তীর্ণ রাজত্বের চতুর্দ্দিকে যে সকল ক্ষত্রিয় রাজার নাম শুনা যায় তাঁহারা স্ব স্ব অধিকারের মধ্যে প্রজাদিগের জ্ঞানানু-শীলনের সুবিধার জন্য পাঠশালা ও চতুষ্পাঠী সকল স্থাপিত করিয়া মধ্য যুগে যে কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহার সৌরভে যশোবন্ত রায়ের শস্ত্র-শৌর্য্য মলিন হইয়াছিল। রাজা যশোবন্ত বীরকেশরী বলিয়া সম্মানিত হইলেও যৌবনে বিদ্যাশিক্ষার অভাব হেতু রাজসভায় দেশ বিদেশ হইতে সমাগত পণ্ডিতগণের সমক্ষে তিনি নিজেকে অনেকটা খর্ব্বাকার মনে করিতেন। যশোবন্ত রায় যে বৎসর তাঁহার নব-প্রতিষ্ঠিত রাজধানী বিজয়পুরে সমারোহের সহিত সিংহাসনারোহণ করিলেন রাজকুমার দিলীপচাঁদ সে বৎসর

পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রমে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে রাজা মন্ত্রীকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন, "আপনি রাজকার্য্য সুন্দররূপে পরিচালনার জন্য সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, এক্ষণে যুবরাজের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত সদুপায় স্থির করুন। আমি নিজে বিবিধ শাস্ত্রানুশীলনে উদাসীন হওয়াতে বাহুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত আমার যশোরাশি নিষ্প্রভ হইয়াছে। যুবরাজ যেন সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ হইয়া তারাগণের মধ্যে চন্দ্রের ন্যায় পণ্ডিতগণের মধ্যে অগ্রণী হইয়া জ্ঞানাকাশের শোভা বর্দ্ধন করিতে সমর্থ হন। বিচক্ষণ মন্ত্রী সুভায় সিংহ কহিলেন, "কেবল মাত্র যুবরাজের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত প্রভূত অর্থ ব্যয় না করিয়া দেশের সর্ব্বত্র যদি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তাহা হইলে প্রজারা জ্ঞান লাভ করিয়া সুখী হইবে ও আপনি নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিতে পারিবেন। যুবরাজকে নানা বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা না দিয়া যদি তাঁহাকে রাজকার্য্য পরিচালনার উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে অল্প ব্যয়ে তিনি কর্ম্মকুশলী হইতে পারিবেন।" রাজা মন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না। তিনি সুভায় সিংহকে বলিলেন, "প্রজা সাধারণকে শিক্ষিত করিলে তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে এবং মনের মধ্যে উচ্চাশাকে পোষণ করিয়া ভবিষ্যতে তাহারা রাজশক্তির বিরুদ্ধে উত্থিত হইবে। কুমার যদি বয়োবৃদ্ধি সহকারে সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হন, তাহা হইলে তিনি পরিমার্জ্জিত বুদ্ধির সাহায্যে অনায়াসে সুশৃঙ্খলার সহিত রাজ্য শাসন করিতে পারিবেন। অতএব আপনি কাল বিলম্ব না করিয়া যুবরাজের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত শাস্ত্র-জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতগণকে নিযুক্ত করুন।"

মন্ত্রীবর রাজাজ্ঞায় বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণকে দেশ দেশান্তর হইতে বহু অর্থ ব্যয়ে আনয়ন করিয়া যুবরাজের শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। বিশ্ববিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতে হইলে যাহা যাহা আবশ্যক তাহার কোনটির অভাব রহিল না। ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, ভাষা, জ্যোতিষ, ইতিহাস ও ব্যাকরণ প্রভৃতি জ্ঞানের প্রধান প্রধান বিভাগগুলির সম্যক উন্নতি ও তদ্দ্বারা যুবরাজের শিক্ষার সাহায্যার্থে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ রাজধানীতে অবস্থান করিয়া যশোবন্ত রায়ের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। যুবরাজ যাহাতে চৌষট্টি কলায় পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন তজ্জন্য চৌষট্টি জন কলাবিদ্যায় নিপুণ ব্যক্তিও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যুবরাজের শিক্ষার জন্য কিন্তু এত অধিক অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল যে, সুভাষ সিংহ চিন্তিত হইলেন। তিনি একদিন রাজকোষের অবস্থা রাজাকে জ্ঞাপন করিয়া রাজস্ব বৃদ্ধির নূতন একটি পন্থার কথা উত্থাপন করিলেন। তিনি বলিলেন, "সামন্ত রাজাদিগের নিকট হইতে বর্দ্ধিত হারে কর আদায় করিয়া শিক্ষা বিভাগের আয় বৃদ্ধি না করিলে প্রজার হিতকর কোনও কার্য্যেরই সুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই। সামন্ত রাজারা দরিদ্র রায়তের নিকট হইতে যে খাজনা আদায় করেন তাহা তাঁহারা নিজেদের বিলাসিতায় ব্যয় করিয়া থাকেন। মৃগয়া অলঙ্কার বেশভূষা মদ্য দাস দাসী যান বাহন প্রভৃতির জন্য যদি সমুদয় অর্থ ব্যয়িত হয় তাহা হইলে প্রজাদিগের কষ্ট নিবারণ ও দেশের উন্নতি হইবে কিরূপে? সামন্ত রাজাদের পুত্রগণকেও বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক, নহিলে তাহারা মূর্খ হইয়া থাকিবে, আর তাহার ফলে আপনার অবর্ত্তমানে যুবরাজ যখন রাজ্য শাসন করিবেন তখন তিনি তাঁহার অধীনস্থ মূর্খ রাজন্যবর্গকে আয়ত্তের মধ্যে রাখিতে পারিবেন না। মূর্খ প্রজা হইতে মূর্খ অভিজাত শ্রেণী অধিকতর ভয়ের কারণ। আমি সেইজন্য ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়াছি যে, সামন্ত রাজারা যদি শিক্ষার সাহায্যার্থে বর্দ্ধিত হারে আপনাকে কর প্রদান করেন, তাহা হইলে তাহা হইতে যুবরাজ ও তাঁহাদের পুত্রগণের ও অশিক্ষিত প্রজাদের পুত্রগণেরও লেখাপড়া শিক্ষার সুবিধা হইতে পারে। এতদ্দ্বারা এক্ষণে যুবরাজের শিক্ষার জন্য যে অর্থ ব্যয় হইতেছে তাহা উদ্বৃত্ত হইবে এবং তদ্দ্বারা দেশের মধ্যে জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠা ও প্রজা সাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য অন্যান্য উপায় অবলম্বিত হইতে পারে।" রাজা মন্ত্রীর এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সামন্ত রাজারাও নিজেদের পুত্রগণকে যুবরাজের সহধ্যায়ী করিয়া দিয়া যশোবন্ত রাজাকে বর্দ্ধিত হারে কর দিতে আরম্ভ করিলেন। অভিজাত শ্রেণীর অর্থে এইরূপে বিশ্ববিদ্যার

সাহায্য হওয়াতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে উত্তর ভূমের রাজধানী বিজয়পুর মধ্যভারতে উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইল।

(২)

রাজমন্ত্রী সুভাষ সিংহের এক পুত্র ছিল। তাহার নাম মদনগোপাল। যুবরাজ দিলীপচাঁদের ন্যায় তাহার পাঁচ বৎসর, পাঁচ মাস, পাঁচ দিনে হাতে-খড়ি হয় নাই। তাহার পিতা তাহাকে দশম বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বালসুলভ চপলতার বশবর্ত্তী করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহার ফলে মদনগোপাল সমবয়স্ক বালকগণের সহিত মিশিয়া সন্তরণ, বৃক্ষারোহণ, উল্লম্ফন, দ্রুত গমন প্রভৃতি স্বাভাবিক ব্যায়াম অভ্যাস করিয়া বেশ সুস্থকায় সবল ও সাহসী হইয়াছিল। সুভাষ সিংহ কিন্তু দিবসের প্রথম ও শেষভাগে পুত্রকে নিজের নিকটে রাখিয়া তাহাকে মুখে মুখে নানা বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতেন। বালক মদনগোপাল পুরাবৃত্ত ও ইতিহাস সম্বন্ধে এইরূপে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল তাহা অনেক পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি দীর্ঘকাল পুস্তক পাঠ করিয়া লাভ করিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত, সুভাষ সিংহ যখন রাজ্যের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য উত্তরভূমের বিভিন্ন প্রদেশে গমন করিতেন তখন তিনি মদনগোপালকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। নানাপ্রকার লোকের সহিত পরিচয় হওয়াতে বালক মদনগোপাল মানুষ দেখিয়া ভীত বা সঙ্কুচিত হইত না। দশ বৎসর বয়ঃক্রমের পর হইতে সুভাষ সিংহ পুত্রকে রীতিমত বিদ্যাশিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তিন চারি বৎসরের মধ্যে তাহার প্রাথমিক শিক্ষা যাহাতে শেষ হয় সুভাষ সিংহ তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর দুই বৎসর কাব্য ও গণিতশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া মদনগোপাল রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও ব্যবহার শাস্ত্র সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করে। তাহার শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পিতা তাহাকে অধীত বিদ্যা দেশের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্বন্ধে কিরূপে প্রযোজ্য তাহা নিজে বুঝাইয়া দিতেন। এতদ্ব্যতীত, তিনি মদনগোপালকে দপ্তরখানায় খাতা পত্র রাখিবার নিয়ম ও দলিলাদি ও চিঠি পত্র লিখন সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। এইরূপে আট নয় বৎসরের মধ্যে মদনগোপাল বেশ কাযের লোক হইয়া উঠিয়াছিল। রাত্রিকালে সে কোনও পুস্তকাদি পাঠ করিত না। সঙ্গীতের দিকে তাহার স্বাভাবিক টান দেখিয়া সুভাষ সিংহ তাহাকে রাত্রে সঙ্গীতের চর্চ্চা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।

মদনগোপাল এইরূপে সুশিক্ষিত হইলে তাহার পিতা তাঁহাকে এক বৎসরের জন্য ভারতের নানা স্থানে তীর্থাদি ভ্রমণের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। সে যখন গৃহে ফিরিয়া আসিল সুভাষ সিংহ তাহাকে রাজার নিকট লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত বিশেষভাবে পরিচিত করিয়া দিলেন। রাজপুত্রও ইতিপূর্ব্বে অধ্যয়ন শেষ করিয়া পিতার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। রাজা যখন শুনিলেন যে মন্ত্রীপুত্র দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র, জ্যোতিষ, শিল্পকলা ও ভাষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ তখন তিনি সুভাষ সিংহকে বলিলেন যে, তাঁহার পুত্রের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ মাত্রায় সজ্জিত হয় নাই। সুভাষ সিংহ বলিলেন, "এই সকল জিনিষ প্রৌঢ়েরা যেমন সহজে আয়ত্ত করিতে পারে বালকেরা সেরূপ পারে না।" সুভাষ সিংহ আরও বলিলেন যে, তাঁহার পুত্র যেভাবে শিক্ষিত হইয়াছে তাহাতে তাহার বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হইয়াছে। রাজা কহিলেন, "যাহার দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা নাই তাহার বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হইতে পারে না।" রাজা ও মন্ত্রী তাঁহাদের নিজ নিজ পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিদ্যা ও বুদ্ধির বলে যে প্রকার ফলোদয় হয় তৎসম্বন্ধে অনেকক্ষণ বাদানুবাদ করিবার পর স্থির করিলেন যে "বিদ্যা বড়, কি বুদ্ধি বড়" ইহার পরীক্ষা করিতে হইবে। এই সময়ে ভোজরাজার দেশ হইতে সংবাদ আসিয়াছিল যে, তাঁহার একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য দেশ দেশান্তর হইতে রাজপুত্রেরা ভোজপুরে গমন করিতেছেন, কিন্তু সেই কন্যা কাহারও প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন না। রাজকুমারগণের গুণবাদ শ্রবণ করিয়াও ভোজরাজ পুত্রী কাহাকেও বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। রাজপুত্রেরা একে একে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন। সুভাষ সিংহ প্রস্তাব করিলেন যে, যুবরাজ দিলীপচাঁদ ভোজরাজের কন্যাকে স্বয়ম্বর প্রথানু-

স্বামী বিবাহ করিতে ভোজপুরে গমন করুন। যুবরাজের পাণ্ডিত্য সেই বিদুষী রাজপুত্রীকে নিশ্চয়ই মুগ্ধ করিবে, এইরূপ চিন্তা করিয়া যশোবন্ত রায় মন্ত্রীর এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

(৩)

যুবরাজ দিলীপচাঁদ যেদিন অনিন্দ্য-সুন্দরী ভোজরাজ কুমারীকে লাভ করিবার জন্ম বিজয়পুর হইতে যাত্রা করিলেন, রাজধানীতে সেদিন মহাসমারোহ হইয়াছিল। মনোহর বেশভূষায় সজ্জিত যুবরাজ ও তাঁহার শরীররক্ষকগণ পুরবাসীদের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতির সমাবেশ দেখিবার জন্ম প্রধান প্রধান রাজমার্গের উভয়পার্শ্বে এতাদৃশ জনতা হইয়াছিল যে নগররক্ষক অতি কষ্টে লোকসংঘের মাঝে পড়িয়া বালক বালিকাগণ যাহাতে নিষ্পেশিত না হয় তাহার বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যুবরাজের শিক্ষকগণ শুভ্র রেশমী বস্ত্র পরিধান করিয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছিলেন। বাদ্যভাণ্ড, নর্ত্তক-নর্ত্তকী, ক্রীড়াশীল পুত্তলিকা, বিদূষক প্রভৃতি সেই শোভাযাত্রার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল। পুরনারীগণ গবাক্ষ ও প্রাসাদের ছাদ হইতে পুষ্পবর্ষণ ও শঙ্খধ্বনি করিতেছিলেন। রাজা ও রাণী রাজপ্রাসাদের বারাণ্ডা হইতে এই সকল দর্শন করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন।

দিলীপচাঁদ যেদিন ভোজপুরে উপস্থিত হইলেন, সেদিন ভোজরাজের মন্ত্রীগণ তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিয়া পুরদ্বার হইতে রাজপ্রাসাদে লইয়া গেলেন। রাজবর্ত্ম দর্শকবৃন্দ ও পুরস্ত্রীগণের জনতায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। স্বয়ং ভোজরাজ যুবরাজ দিলীপচাঁদের হস্তধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজসভায় লইয়া গিয়া সিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্বে বহুমূল্য আসনে সমাদরে বসাইলেন। যুবরাজের সমভিব্যাহারী পণ্ডিতগণ সময়োপযোগী কবিতা পাঠ করিয়া তাঁহার অশেষ গুণরাশির কথা সভাস্থ সকলকে শুনাইলেন। পর্দ্দার অন্তরালে উপবিষ্ট রাজান্তঃপুরের রমণীগণ যুবরাজের গুণকীর্ত্তন শুনিলেন। রাজকুমারী সুলক্ষণাও সেখানে ছিলেন। তিনি যখন রাজসভার পার্শ্ববর্ত্তী আবৃত স্থানে উপবেশন করিতেন, তখন চক্ষুদ্বয় একখণ্ড বস্ত্রদ্বারা এমনভাবে ঢাকিয়া রাখিতেন যাহাতে সভাস্থ পুরুষগণের মুখাবলোকন করা অসম্ভব। বাস্তবিক, তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, স্বজনগণ ব্যতীত তিনি অপর কোনও পুরুষের মুখদর্শন করিবেন না। ভারতের নানাস্থান হইতে রাজপুত্রেরা যখন সুলক্ষণার পাণিগ্রহণের আশায় ভোজরাজের সভায় আগমন করিতেন তখন রাজকুমারী যবনিকার অন্তরালে উল্লিখিত উপায়ে চক্ষুদ্বয় আবৃত করিয়া বসিতেন ও তাঁহাদের গুণবাদ শ্রবণ করিতেন। দিলীপচাঁদের পাণ্ডিত্যের পত্তময় বিবরণ শ্রবণ করিয়া সভাস্থ সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে, সুলক্ষণা তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবেন। তিনি যখন দিলীপচাঁদের গুণবাদ শ্রবণ করিয়া উঠিয়া গেলেন তখন সকলেই বুঝিলেন যে, তিনি নবাগত রাজপুত্রকে বিবাহ করিতে অসম্মত। দিলীপচাঁদ এরূপ অবস্থায় ভোজপুরে অবস্থান করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। তিনি ভোজরাজের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রাজা যশোবন্ত রায় পুত্রের বিদ্যাবত্তার ফলোদয় হইল না শুনিয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। মন্ত্রী তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্ম বলিলেন, "ভোজরাজ কন্যা যখন অপর কোনও রাজকুমারকে বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই, তখন যুবরাজ দিলীপচাঁদ বিফলমনোরথ হইলেও তাহাতে দুঃখিত হইবার কারণ নাই।" অতঃপর সুভায় সিংহ প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁহার পুত্র মদনগোপালকে তিনি ভোজপুরে পাঠাইয়া দিবেন। রাজার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া তিনি বলিলেন, "মদনগোপাল যদি ভোজরাজ কন্যাকে বিবাহ করিয়া গৃহে আনিতে পারে তাহা হইলে বিদ্যা নিশ্চয়ই বুদ্ধির নিকট পরাজয় স্বীকার করিবে।" যশোবন্ত রায় বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া মন্ত্রীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি মনে করিলেন যে, যুবরাজ যে কার্য্য করিতে পারেন নাই, মন্ত্রীপুত্রের দ্বারা তাহা সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। রাজা বলিলেন, মদনগোপাল চতুরঙ্গ সেনা, বহুমূল্য উপঢৌকন, দাস দাসী, যান বাহন ও অন্য যাহা কিছু সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহে তাহা যেন তাহাকে লইয়া যাইতে দেওয়া হয়। মদনগোপাল এই সকলের মধ্যে

কিছুই লইয়া যাইতে চাহিল না। সে বলিল, কেবল দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করে। রাজা তৎক্ষণাৎ মদনগোপালকে দশসহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিবার জন্য কোষাধ্যক্ষের উপর আদেশ দিলেন। মন্ত্রীপুত্র রাজদত্ত সেই অর্থ ও বিদেশ ভ্রমণোপযোগী বেশভূষা ও শয্যোপকরণ সঙ্গে লইয়া একাকী বিজয়পুর হইতে বহির্গত হইল।

(৪)

মদনগোপাল ভোজপুরে উপস্থিত হইয়া কয়েক দিবস এক পান্থশালায় অবস্থান করিল। ভোজরাজের অবরোধ সম্বন্ধে যথাসম্ভব তথ্য সংগ্রহ করিয়া সে রাজবাড়ীর সন্নিকট এক পল্লীতে রাজনন্দিনী সুলক্ষণার দাসীর বৃদ্ধা মাতা যেখানে বাস করিত সেই বাটীতে একখানি ঘর ভাড়া করিয়া পান্থশালা হইতে তথায় গমন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। প্রতিদিন মাতার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে সেই দাসী উক্ত বাটীতে আসিত। মদনগোপাল রাজকুমারীর দাসী ও তাহার মাতার সহিত এরূপ সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল যে, তাহারা তাহাকে আত্মীয়ের ন্যায় দেখিতে আরম্ভ করিল। সুলক্ষণার সম্বন্ধে অনেক সংবাদ মদনগোপাল তাহাদিগের নিকট সংগ্রহ করিবার সুবিধা পাইয়াছিল। একদিন সে বিস্ময়ের ভাণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রাজকুমারী কেন রাজকুমারগণকে উপেক্ষা করিয়া অনূঢ়া রহিয়াছেন?" ইহার যথার্থ কারণ সুলক্ষণার পিতামাতাও জানিতেন না, সুতরাং দাসী মদনগোপালের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। মন্ত্রীপুত্র দাসীকে গোপনে বলিলেন যে, যদি সে রাজকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া উক্ত কারণ জানিতে পারে তাহা হইলে সে তাহাকে একশত স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিবে। দাসী স্বর্ণমুদ্রার লোভে সেইদিন হইতে এমন ভক্তির সহিত সুলক্ষণার পরিচর্য্যা করিতে আরম্ভ করিল যে, তিনি অল্পদিনের মধ্যে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন।

একদিন সুবিধা বুঝিয়া দাসী সুলক্ষণাকে বিবাহ না করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। রাজকুমারী দাসীর আগ্রহাতিশয় দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। এবং কৌতুক করিয়া তাহাকে নানারূপ কথা রচনা করিয়া উত্তর দিলেন। প্রকৃত ব্যাপার তিনি তাহাকে বলিলেন না। সুলক্ষণা যেমন সুন্দরী তেমনি বিদুষীও ছিলেন। তিনি দাসীকে বলিলেন, "দেখ, আমার উপযুক্ত বরের আজ পর্য্যন্ত সন্ধান পাইলাম না। পুরুষেরা দেখিতে কুৎসিত হইলেও মনে করে যে তাহারা সুন্দরী পত্নী লাভ করিবার উপযুক্ত পাত্র। এ পর্য্যন্ত যতগুলি রাজা ও রাজপুত্র আমার পাণিগ্রহণাভিলাষ করিয়াছেন তাঁহাদের রূপের বর্ণনা শুনিয়া আমি কাহাকেও মনোনীত করি নাই। ইহার কারণ, তাঁহাদের মধ্যে কেহই রূপবান্ নহেন। যদি স্থূলকায় ও কোমল দেহবিশিষ্ট হইলেই পুরুষ সুন্দর হইত, তাহা হইলে আমার পিতার পশুশালায় অনেক জন্তু আছে যাহারা সৌন্দর্য্যের বড়াই করিতে পারিত। আমি চক্ষুদ্বয় বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া রাখিলেও সখিগণের মুখে শুনিতাম যে, কাহারও উদর মেদাধিক্যবশতঃ এত স্ফীত ও কদাকার যে দেখিলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। ইহাদের বক্ষস্থল স্বভাবতঃই অপ্রশস্ত ও ভীরু ব্যক্তিগণের ন্যায় অনুন্নত। ইহারা বীরোচিত কোনও কার্য্য বাহুবলে স্ত্রীগণের মান সম্ভ্রম রক্ষা করিতে অশক্ত। নিজেদের মাতা, স্ত্রী, কন্যা, ভগ্নির রক্ষার্থে ইহারা আমাদের এই রাজধানী ভোজপুর হইতে অসংখ্য যুবককে বেতন প্রদান করিয়া লইয়া যায়। আবার যাহাদের অবয়ব নিরন্তর মৃগয়াদি পশুহনন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় কর্ম্মঠ ও সবল তাহাদের দৃষ্টিতে কেমন একটা নৃশংসতার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। অনেক রাজা ও রাজকুমারের অঙ্গচালনা ও মুখের ভাব ভঙ্গীতে দাম্ভিকতা যেন ফুটিয়া রহিয়াছে। মানুষ উদার-স্বভাব না হইলে তাহার দেহ ও বহিরিন্দ্রিয়াদির ভিতর দিয়া সৌন্দর্য্য বলিয়া জিনিসটি ফুটিয়া বাহির হয় না।"

দাসী বলিল,--"উত্তরভূমের যুবরাজ দিলীপচাঁদ ত পণ্ডিতাগ্রগণ্য, সচ্চরিত্র ও ধনবান, তাঁহাকে আপনি কেন উপেক্ষা করিলেন?"

সুলক্ষণা। বিদ্বান্ হইলেই যদি মানুষ উৎকৃষ্ট জীব হইত তাহা হইলে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে হৃদয়হীনতা, বিশ্বাসঘাতকতা, স্বার্থপরতা, অসত্যবাদিতা, পরশ্রীকাতরতা দেখিতে পাওয়া যাইত না। পঠিত বিদ্যা মানুষকে প্রায়ই

গর্ব্বিত করে। শিক্ষিত ব্যক্তিরা বিলাসপরায়ণ, লোভী ও অত্যাচারী হইয়া থাকে। এই দেখ না কেন, উত্তরভূমের রাজা কত বড় বীর ও তাঁহার পুত্র দিলীপ কত বড় পণ্ডিত, কিন্তু তাঁহাদের রাজত্বে জনসাধারণ অশিক্ষিত ও দরিদ্র, আর সেই কারণে অলস ও পরমুখপ্রেক্ষি। যে রাজা প্রজাকে দাবিয়া রাখিয়া তাহার স্বাধীনতা হরণ করিয়া নিজে ধন মান বিদ্যা ও ভোগবিলাসের অধিকারী হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন তাঁহার কোনও আত্মীয় আমার স্বামী হইবার অযোগ্য।

দাসী। তবে আপনার বিবাহ হওয়া অসম্ভব। আমার মনে হয় যে, আপনি যথার্থ কথা গোপন রাখিয়া আমাকে রচিত কথা শুনাইতেছেন। আমি দরিদ্র দাসী, আমাকে আপনি বিশ্বাস করিয়া আপনার মনের কথা বলিবেন কেন?

দাসীর চক্ষে জল আসিয়াছে দেখিয়া রাজকুমারী তাহাকে বলিলেন, "তুমি যদি আমার জীবনের গোপন-কথা কাহাকেও প্রকাশ না কর তাহা হইলে আমি তাহা অকপটে তোমাকে বলিব।" দাসী রাজকুমারীর উক্ত কথা অপ্রকাশিত রাখিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলে সুলক্ষণা কহিলেন,—

"দুই বৎসর পূর্ব্বে আমার বিবাহের প্রস্তাব হইলে আমি একদিন নির্জ্জনে বসিয়া কল্পনার সাহায্যে আমার ভাবী দাম্পত্য-জীবনের চিত্র মানস-পটে অঙ্কিত করিতেছিলাম। এই অবস্থায় আমার পূর্ব্ব জন্মের কথা অকস্মাৎ স্মরণ হইল। তুমি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে যে, আমি পূর্ব্ব জন্মে হরিণী ছিলাম। আমার স্বামী ও আমি এক সুন্দর বনে বাস করিতাম। আমাদের পুত্র কন্যা ছিল না। একদিন সেই বনে দাবানল প্রবেশ করিল। নিমেষের মধ্যে কে যেন চতুর্দ্দিকে অগ্নির প্রাচীর তুলিয়া দিল। বনবাসী চতুষ্পদেরা যে কে কোথায় পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিবে কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। আমার স্বামী আমাকে বলিলেন, "তুমি এইখানে অবস্থান কর, আমি এই দিকে একবার দেখিয়া আসি যদি বন হইতে নিষ্ক্রমণের কোনও পথ অনুসন্ধান করিতে পারি।" এই কথা বলিয়া তিনি বায়ুবেগে পূর্ব্ব দিকে ছুটিয়া গেলেন। আমি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। ক্রমে অগ্নির শিখা সকল আমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। শুষ্ক তৃণ পাতা ও কাষ্ঠের ধূমে চারিদিক অন্ধকার হইল। আমি ভয়ে ইতস্ততঃ দ্রুত গমনাগমন করিতে লাগিলাম। এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইল, কিন্তু আমার স্বামী ফিরিলেন না। অগ্নির উত্তাপে আমি সংজ্ঞাহীন হইয়া শুইয়া পড়িলাম ও তাহার পর দাবানলে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলাম।" রাজকুমারী পূর্ব্ব জন্মের কথা বলিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তাহার পর তিনি দাসীকে বলিলেন, "পূর্ব্ব জন্মের এই সকল কথা স্মরণ করিয়া আমি বিশ্বাসঘাতক পুরুষগণের মুখাবলোকন করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।" দাসী রাজকুমারীর কথা শুনিয়া বলিল, "ঠিক কথা, পুরুষেরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর, নারী জাতির জন্য তাহাদের হৃদয়ে এক বিন্দু দয়া মায়া নাই।"

(৫)

মদনগোপাল দাসীর নিকট সুলক্ষণার পূর্ব্ব জন্মের ইতি-কথা ও ইহজন্মের প্রতিজ্ঞার বিষয় অবগত হইয়া দাসীকে প্রতিশ্রুত এক শত স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিল। ইহার পর মন্ত্রীপুত্র স্থানান্তরে একখানি সুবৃহৎ বাটী ভাড়া করিয়া দাসীর মাতার গৃহ হইতে উঠিয়া গেল। মদনগোপাল উক্ত বাটী নানাপ্রকার মূল্যবান আসবাবে সুসজ্জিত করিল। দাস দাসী দ্বারবান প্রভৃতি নিযুক্ত হইল। সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিগণকে সে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিত। প্রতিবেশিরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "এই ব্যক্তি কে?" মদনগোপালের লোকেরা প্রচার করিল, সে এক বিদেশী ধনীর পুত্র, দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া ভোজপুরে আসিয়াছে। অল্প দিনের মধ্যে তাহার নাম নগরবাসীদের মুখে মুখে এরূপ প্রচারিত হইল যে, রাজার সভাসদগণ তাহার সহিত আলাপ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ভোজরাজ নিজে গুণজ্ঞ রাজা ছিলেন। তাঁহার সঙ্গীতাদি ললিত কলার প্রতি বিশেষ টান ছিল। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্যগণ দেশ বিদেশ হইতে তাঁহার রাজধানীতে আসিলে তিনি তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেন।

মন্ত্রীপুত্র যে সঙ্গীতানুরাগী সে কথা তিনি শুনিয়াছিলেন। মদনগোপাল রাজার সভাসদগণের সহিত পরিচিত হইবার পূর্ব্বে জন কয়েক বিদেশী কালোয়াত ভোজপুরে আসিয়াছিল। রাজসভায় জলসা উপলক্ষে মদনগোপাল পত্র দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। সভাস্থ সকলে কালোয়াতগণের গীত বাদ্য শ্রবণ করিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। অতঃপর রাজার জনৈক পারিষদ মদনগোপালের সঙ্গীত শুনিবার প্রস্তাব করিয়া রাজার অনুমতি প্রার্থনা করিল। মদন গোপাল রাজার আদেশে এরূপ নৈপুণ্যের সহিত যন্ত্র-সঙ্গীত শুনাইল যে, সকলেই মোহিত হইল। রাজা নিজে এমন অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তিনি মদনগোপালকে রাজ-সিংহাসনের নিকটে একখানি স্বতন্ত্র আসনে বসাইয়া তাহাকে সম্মানিত করিলেন। ভোজরাজ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে মদনগোপাল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "মহারাজ, আমার দুঃখময় জীবনের ইতিহাস শুনিলে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যাইবে। আপনি যদি একান্ত শুনিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অনুমতি করুন, আমি অতি সংক্ষেপে আমার দগ্ধ হৃদয়ের আক্ষেপ যাহা আমি পদ্যময় ভাষায় রচনা করিয়াছি তাহা আপনাকে শুনাইয়া আমার মর্ম্ম-যাতনার স্মৃতিকে প্রবুদ্ধ করি।" মদনগোপাল এই কথা বলিয়া বীণাযন্ত্রে ঝঙ্কার দিয়া গান ধরিল।

রাগিণী ভৈরবী—তাল যৎ।

হরিণী লো এ তো নহে পিরীতি-বিধান,
কভু নহে পিরীতি-বিধান!
ভুলাইয়ে নিজ পতি, করিলে প্রয়াণ,
তুমি করিলে প্রয়াণ!
কাননে হরিণ বঁধু,
হেসে তারে তোষ শুধু,
তব প্রেম-মধু কিন্তু কর কারে দান,
ওলো কর কারে দান?
বন-মাঝে বাস কর,
মানবীয় রীতি ধর,
হ'লে স্থানান্তর করি অপমান,
ওলো করি অপমান!

মদনগোপাল মন প্রাণ ঢালিয়া এই গান গাহিয়াছিল। গান শেষ হইলে রাজসভার প্রত্যেক ব্যক্তির মুখে কৌতুহলের চিহ্ন প্রকাশ পাইল। মদনগোপাল প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা না করিয়া বাষ্পাকুল নেত্রে বলিল, "মহারাজ, আমি পূর্ব্ব জন্মে হরিণ ছিলাম। আমি ও আমার হরিণী এক রমণীয় বনে বাস করিতাম। আমাদের পুত্র কন্যা ছিল না। দুর্ভাগ্যক্রমে একদিন সেই বনে দাবানল প্রবেশ করিল। চতুষ্পদেরা যখন ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে তখন আমার হরিণী আমাকে বলিল, "আমি এই স্থানে তোমার জন্য অপেক্ষা করিব, তুমি একবার চারিদিক দেখিয়া আইস, যদি এই বন হইতে নিষ্ক্রমণের কোনও নিরাপদ পথ অনুসন্ধান করিতে পার।" আমি তাহার কথা শুনিয়া যেমন দ্রুত পদে গমন করিলাম অমনি আমার পশ্চাদ্ভাগে দাবানল বৃদ্ধি পাইয়া আমার প্রত্যাগমন পথ রোধ করিল। আমি অগ্রসর হইতেও পারিলাম না, কারণ আমার সম্মুখে বনভূমি অগ্নিময় হইয়াছিল। অগ্নির উত্তাপে আমার সংজ্ঞা লোপ হইল এবং তদবস্থায় আমি দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলাম।" মদনগোপালের বাক্য শেষ হইতে না হইতে রাজসভার পার্শ্বস্থিত আবৃত স্থান হইতে রাজকুমারী সুলক্ষণা চকের আচ্ছাদন অপসারিত করিয়া বিহ্বল পদবিক্ষেপে সভামধ্যে আগমন করিয়া কম্পিত কণ্ঠে মন্ত্রীপুত্রকে বলিলেন, "আপনিই ত তবে আমার হরিণ। আপনি প্রত্যাগমন না করাতে আমি দাবানলে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলাম। আপনা ব্যতীত আমি পূর্ব্ব জন্মে অপর কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত করি নাই। আমি ভ্রমবশতঃ মনে করিয়াছিলাম যে আপনি আমাকে ত্যাগ করিয়া সেই দাবানল হইতে নিজের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, আর সেই কারণে এ জন্মে পুরুষের মুখ দর্শন করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম।" মদনগোপাল ও সুলক্ষণার পূর্ব্ব জন্মের ইতিহাস শ্রবণ করিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। এই জাতিস্মর-যুগলের পুনর্মিলনে ভোজরাজ ও রাজপরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি আনন্দিত হইয়াছিলেন। কাল বিলম্ব না করিয়া ভোজরাজ স্বীয় কন্যাকে স্বয়ম্বর প্রথানুসারে মদন-গোপালকে বিবাহ করিতে অনুমতি দিলেন। মদনগোপাল রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া যেদিন তাহার সহিত বিজয়-পুরে প্রবেশ করিলেন সেদিন রাজা যশোবন্ত রায় সুভাষ সিংহকে কহিলেন, "বুদ্ধির নিকট বিদ্যাকে চিরকাল পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে।"

ধূমসী।

[শ্রীখগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়]

তারকনাথ সান্যাল আফিসের বড়বাবু। নিজের সুবিধার জন্য প্রায় কুড়ি বৎসর কলিকাতায় বাস করিতেছেন। তাঁহার প্রতিবেশী তারাপদ বাগচী মহাশয়ের ও তাঁহার পরিবারের মধ্যে খুব একটু ঘনিষ্টতা হইয়াছিল। এমন কি, তারকবাবুর পুত্র বিমলের সহিত তারাপদ বাবুর কন্যা হেমলতার বিবাহ সম্বন্ধও মেয়ে-মহলে বহুদিন চলিয়া আসিতেছিল।

বিমল গত বৎসর ইন্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। হেমলতা আজও মহাকালী পাঠশালায় পড়াশুনা করিতেছে। বাপ উকিল। তাঁহার ইচ্ছা হেম বেথুন কলেজে পড়ে, কিন্তু মা ও স্ত্রীর আপত্তিতে সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। স্বোপার্জ্জিত অর্থে ধনবান তারাপদ বাবুর ভ্রাতা রমানাথ ভ্রাতার সংসারে একান্ত ভৃত্যের মতই ছিল। সংসারে রমানাথের কিছুরই সুখ ছিল না—স্ত্রী নাই, রোজগার নাই, বাপের বিষয় নাই—ভাইএর সংসারে তাহাকে মুটে মজুরের মত খাটিয়া ভাতের দুমুঠা, তাহাও মা, বোন, ভাজের গঞ্জনা সহ্য করিয়া খাইতে হয়। একটিমাত্র বয়স্থা কন্যা আছে। এই মেয়েটিকে এক বৎসরের রাখিয়া স্ত্রী ইহলোক ত্যাগ করেন। তাই সে বাপের বড় আদরের মেয়ে, কিন্তু দেখিতে কুরূপা। তাহার উপর তাহাকে পরিজনের শ্লেষ সহ্য করিতে হইত। রমানাথের হৃদয়ে তাহা শেলের মত বিঁধিত এবং মেয়েকে কোলে টানিয়া লইয়া চোখের জলে বুক ভাসাইত। কন্যা পিতাকে সান্ত্বনা দিতে বৃথা চেষ্টা করিত। জেঠা মহাশয়ের সংসারে বড় একটা দাসীর কাজ করিয়াও সে কোনদিন সুনাম অর্জ্জন করিতে পারে নাই। শুধু বিমলের মাতা এই মাতৃহীনার দুঃখে বড়ই ব্যথিত হইতেন। কিন্তু কোন কথাই তাঁহার বলিবার জো ছিল না। গোপনে নিভাননিকে কিছু কিছু পড়াইতেন বলিয়াই হেমের মা তাঁহাকে কতই না বিদ্রূপ করিতেন। হেমের ঠাকুরমা পিসিমা নিভাকে কতই না তিরস্কার করিতেন। বিমল যখন হেমকে বই, কাগজ, পশম, কার্পেট, ছবি উপহার দিত, নিভা শুধু দেখিত। বিমলের মা যদি বিমলকে কিছু বলিতেন, সে বলিত, "ওটা ধূমসী, ওটা কি কোন কাজের মা!"

বিমল থার্ড-ইয়ার হইতে ফোর্থ-ইয়ারে উঠিল। B. A. পাশ করিলেই হেমলতার সহিত তাহার বিবাহ হইবে। সবই ঠিক, শুধু তার পাশ হওয়ার অপেক্ষা। এক বৎসর মাত্র—এক বৎসর কেন, মাস-নয়েক বাকী আছে। বিমল মনে মনে কত না আকাশ-কুসুম সৃজন করিত। তাহার সোণার স্বপ্ন ভাঙ্গিল সেইদিন, যেদিন সে হেমের নূতন বাঁধান ফটোটি এবং কিছু উপহার দ্রব্য হাতে লইয়া হেমের বাড়ীর উদ্দেশে ছুটিয়াছিল। হেমের বাটীর নিকটবর্ত্তী হইয়া তারাপদবাবুর বৈঠকখানার দিকে চাহিয়া দেখিল ৪৫ জন ভদ্রলোক বসিয়া গল্পগুজব করিতেছে, মধ্যে মধ্যে এক একটা উচ্চহাস্যে যেন বাড়ীটি ফাটাইয়া ফেলিতেছে। তাঁহাদেরই সন্নিকটে অবনত মুখে হেমলতা বসিয়া আছে। তারাপদ বাবু ভদ্রলোকদিগকে তামাকু দিবার জন্য চাকরকে হুকুম করিতেছেন। একজন প্রবীণ লোক হেমকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বল ত মা শিবের ধ্যানটি"।

অন্য একজন বলিলেন—"হুঁ, প্রায় যজমান রক্ষে করতে হবে! রাঁধতে বাড়তে পারে কি না তাই জিজ্ঞেস কর।"

বিমল হতভম্ব। হেমলতার ছোট ভাই ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "বিমল দা, দিদিকে আজ দেখতে এসেছে—পাকা দেখা, এস না, ঘরে এস না!"

বিমল নীরোদের হাত ছাড়াইয়া নিজের বাটীতে ফিরিল এবং কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। কিছুতেই আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল। কয়ঘণ্টা আত্মবিস্মৃত

হইয়া থাকিবার পর তাহার কর্ণে তাহার পিতামাতার কথোপকথন প্রবেশ করিল।

"দেখলে,—আমি কতবার করে তখন বলেছিলুম যে ও রকম সম্বন্ধ কোরো না—বড়লোক গরীব লোকে মিশ খায় না—সব তাতেই তোমার—"

মা। কি কোরবো বল; ওরাই তো বলেছিল আর এখনও তো দিদি বড়ঠাকুরকে কত কোরে বল্লে—তিনি রাগী মানুষ জান তো।

বাবা—"হাঁ—হাঁ ..."

মা। কে হরেন মৈত্তির এবার বি, এ ফাষ্ট হয়েছে।

বিমলের মাথা ঘুরিতে লাগিল। তাহার সকল আকাশ-কুসুম আকাশেই শুকাইয়া গেল।

* * *

কয়েক দিবস পরে মহাসমারোহে হরেনের সহিত হেমলতার বিবাহ হইয়া গেল। বিমল ঐ সময়ে কলিকাতায় থাকিতে পারিল না, বিদেশে চলিয়া গিয়াছিল।

রমানাথ দেখিল হেমলতার বিবাহ হইয়া গেল কিন্তু দাদা তাহার মেয়ে নিভাননির বিবাহের কথা উত্থাপনও করিলেন না। নিভাননি হেমের চেয়ে দুই বৎসরের বড়। তাহাকে আর রাখা যায় না। মাকে, বোনকে, বৌদিদিকে সকলকেই বলিল। সকলেরই ঐ একই কথা, "ধূমসীর আবার বে?" যিনি একান্ত সহানুভূতি দেখাইলেন তিনি বলিলেন, "একটা দোজবোরে টোরে চেষ্টা দেখ।"

এমনই একটা প্রত্যুত্তর পাইয়া রমানাথ একদিন বাটী হইতে বাহির হইয়া পড়িল। গভীর বেদনা বুকে লইয়া সে এতদিন সহ্য করিয়াছে আর পারিতেছিল না; চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাটীর বাহির হইয়া পড়িল। স্থির করিল নিভাননির একটা ব্যবস্থা করিয়াই সে দাদার সংসারে আর আসিবে না। কি একটা বুদ্ধি তাহার মাথায় খেলিয়া গেল, সে একেবারে বিমলদের বাটী প্রবেশ করিয়া বিমলের মার দুইটি পা জড়াইয়া ধরিল। "বৌদিদি, তোমাকেই আমার ধূমসীকে নিতে হবে।"

"আঃ—কর কি, কর কি ঠাকুরপো—ব্রাহ্মণ পা ছাড—"

"আগে বল, তবে ছাড়বো।"

"আমি বল্লে হবে কেন ঠাকুরপো, তোমার ভাই ঘরে রয়েছেন, তাঁকে বল।"

"না বৌদি, ওরা রাজি হবে না; তুমি বল তবে পা ছাড়বো।"

"আমার কথা যদি না শোনে?"

"তুমি তো বল।"

দুপুর বেলা, ব্রাহ্মণের চোখের জল পায়ে!

বিমলের মা থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন "ঠাকুরপো, আমিই নিভাকে নোবো, ওকেই বৌ করবো, ওই আমার ঘরের লক্ষ্মী।"

তারকবাবু অলক্ষ্যে দূরে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছিলেন, স্ত্রীর উত্তর শুনিয়া বলিলেন, "আর বিমল যদি সম্মত না হয়?"

অবগুণ্ঠন টানিয়া বিমলের মা উত্তর করিলেন, "বিমলে আমার ছেলে না?"

"হাঁ, এতদিন পরে একটা কথার মত কথা বল্লে। যাও রমানাথ স্নানাগার কর গে—নিভাননিকে বৌ করবো—দেখো ভদ্রলোকের এককথা। রমানাথ, আর এক কথা বলে রাখি, শুধু শাঁখা হাতে দিয়ে সম্প্রদান কর, তোমার দাদাকে যেন এর জন্য বিরক্ত হ'তে না হয়। আমি দরিদ্র বটে, ভিখারী নহি।"

মহানন্দে রমানাথ তারকবাবুকে নমস্কার করিয়া বাটী গিয়া সকলের নিকট এই কথা ঘোষণা করিল। বাটী শুদ্ধ সকলেই ভাবিল, রমানাথ প্রকৃতিস্থ নয়। কিন্তু বিমলের বাপ মার মুখে যখন তাহা শুনিল সকলেই বিস্মিত হইল। একটা কেলেঙ্কারী হইবার ভয়ে পরস্পর কাণাকাণি করিতে লাগিল। বিমলের রূপ গুণ বর্ণনা করিয়া তারাপদ বাবুর স্ত্রী যখন বিমলের মাকে এরূপ গর্হিত কাজ হইতে বিরত হইবার জন্য অযাচিত উপদেশ দিলেন, তখন বিমলের মা অবসর পাইয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলে যে, দারিদ্র্য দোষ গুণরাশিনাশী। আর তাঁহার মুখ হইতে একবার যে কথা বাহির হইয়াছে তিনি তাহা নাকচ করিতে পারিবেন না। গরীব হইলেও তাঁহাদের কথার একটা মূল্য আছে। আর হিন্দু গৃহস্থের ঘরের বৌ হইতে হইলে যে সকল গুণ থাকা

আবশ্যক নিভাতে তাহা আছে। তারাপদ বাবুর স্ত্রী অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া কথাটা চাপা দিয়া ফেলিলেন। বাটীর ভিতর নিভাননির বিবাহ সম্বন্ধ লইয়া আন্দোলনে রমানাথের মনে একটা সন্দেহ আনাইয়াছিল। যখন উভয় পক্ষের পাকা দেখা হইয়া গেল তখনও রমানাথের মা রমানাথকে বুঝাইবার প্রয়াস পাইলেন যে, বিমলে নিশ্চয়ই পালিয়ে যাবে। তখন একটা কেলেঙ্কার হবে। এ বিবাহ কি হ'তে পারে? তারাপদ তো কথাটা কাণেই তোলে না।

তারাপদ বাবু কথাটা কাণে লউন আর নাই লউন, বাটীর কেহ বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, তারকবাবুর সে কথা সেই কাজ, তিনি সমারোহে পুত্রের বিবাহের আয়োজন-উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

ক্রমে বিবাহের দিন আসিল। বিমল পলায় নাই। যথাসময়ে সম্প্রদান হইয়া গেল। শুভদৃষ্টির সময় কেহ কেহ বলিলেন, "বিমল ভাল করে দেখ হে।" এ যে বিদ্রূপ তাহা বিমল বুঝিল, নিভাননি বুঝিল আর বুঝিল রমানাথ। রমানাথের চোখে জল দেখিয়া তারকবাবু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রমানাথ, এখনও সন্দেহ আছে নাকি?" চক্ষু মুছিয়া একটু হাসিয়া রমানাথ কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

* * *

বিমলের পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। বাড়ীতে নানারকম ঝঞ্ঝাট, সে বাপ মার অনুমতি লইয়া হিন্দু হোষ্টেলে থাকিয়া পড়াশুনা করে। বাটী আসে না।

বিবাহের পর দ্বিতীয়বার নিভাননিকে আনিয়া বিমলের মা আর তাহাকে পাঠাইলেন না। নিভাও যাইতে চাহে না, রমানাথও লইয়া যাইতে ইচ্ছুক নয়। এত আদর যত্ন নিভা কখনও পায় নাই। সে আসা অবধি বিমলের মাকে গৃহকার্য্য আর কিছুই দেখিতে হইত না। তারকবাবু মধ্যে মধ্যে বলিতেন, "বেটী, যেন চরকী, ঘুরচেই। একটু ব'স্ না মা, দু'দণ্ড বসে গল্প কর শুনি।"

"কাজগুলা সব সেরে নি, বাবা, তারপর গল্প করবো।" স্বামী স্ত্রীতে হাসিয়া উঠিতেন। এমন গুণের বৌ বিমলের পছন্দ হইল না! বিমলের মার কষ্ট, জিদে পড়িয়া এমন কার্য্যটা করা ভাল হয় নাই। বিমলের বাপ বলিতেন, "সব ঠিক হয়ে যাবে, ভেব না।"

বিমলের পরীক্ষা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। নিভাননি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিত যেন পরীক্ষার প্রথম হইতে পারে, যেন প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়। কি একখানি বই লইতে বিমল হঠাৎ একদিন বাটী আসিল। নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করিল, দেখিল নিভা কার্পেটে কি বুনিতেছে। প্রথম একটা হাসি আসিল, কিন্তু যতই সে নিভাকে দূর হইতে দেখিতে লাগিল ততই তাহার মনে হইতে লাগিল, কই এ তো এত কুৎসিত নয়! যাহা হউক নিঃশব্দে যাইয়া তাহার চোখদুটি টিপিয়া ধরিবে ভাবিল; কিন্তু পারিল না। নিভা পদশব্দে ফিরিয়া দেখিল। মাথার কাপড় টানিয়া দিবার জন্য যেই মাথায় হাত দিল, বিমল হাত ধরিয়া ফেলিল। নিভা হাসিয়া তক্তপোষের একপাশে দেয়াল ঠেস দিয়া দাঁড়াইল। সেইখানেই হেমলতার ফটোটি ঝুলিতেছিল। যেই, সেই ফটোর দিকে বিমলের দৃষ্টি পড়িল তাহার বুকের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল। সে তাহাকে দুই হাতে ঠেলিয়া দিয়া ঘর হইতে প্রায় এক নিশ্বাসে বাহির হইয়া গেল। অত্যধিক হর্ষ ও বিষাদে নিভার মাথার ভিতরটা যেন দুলিতে লাগিল। সে চক্ষু বন্ধ করিয়া আস্তে আস্তে দেওয়াল ধরিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল। সামান্য একটা কথা বলিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত তাহার ছিল না।

নিভাননি দিনভোর আর মাথা তুলিতে পারিল না। রাত্রে শ্বশুর আসিয়া দেখিলেন সামান্য জ্বর হইয়াছে। কয়েকদিন একটু একটু জ্বর হইতে হইতে ক্রমে নিভা শয্যাগত হইল। ডাক্তার আনিতে হইল।

বিমল পরীক্ষা দিয়াই ভাগলপুরে কাকার নিকট বেড়াইতে গেল। তাহার বাপ মা ভাবিলেন, তাহাকে ক্রমে ক্রমে ভোলাইতে হইবে। যথাকালে পরীক্ষার ফল বাহির হইল; বিমল অনারে প্রথম স্থান অধিকার করিল। কিন্তু তথাপি সে বাটী আসিল না। এদিকে নিভার অসুখ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কয়েকদিন পরে ডাক্তার বলিলেন, 'টাইফয়েড ফিবার' (Typhoid fever, বড়ই শক্ত। যাহা হউক, রীতিমত চিকিৎসা হইতে লাগিল, কিন্তু রোগের

কোন উপশমই হইল না; জ্বর বরং বাড়িতেই লাগিল। বিমলের মা মধ্যে মধ্যে কাঁদিয়া ফেলিতেন।

কয়েকদিন পরে নিভাননির জ্ঞান আর রহিল না। বিকার হইল, ভুল বকিতে লাগিল। ডাক্তারেরা ভয় পাইলেন। স্বামী স্ত্রীতে অধীর হইয়া পড়িলেন, ইংরাজ ডাক্তার আনাইলেন কিন্তু কোন ফল হইল না। নিভাননির চেতনা হইল না। তারকবাবু বিমলকে পাঠাইয়া দিবার জন্য ভাইকে তার করিলেন।

সেই রাত্রেই বিমল স্বপ্নে দেখিল কে যেন তাহার পায়ের ধূলা লইতেছে। বিমল ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, জিজ্ঞাসা করিল, "কে?" যেন সে উত্তর করিল, "আমি তোমার ধুমসী—আমাকে তুমি নিলে না আমি মার কাছে চল্লুম।" তাহাকে ধরিবার জন্য যেই হাত বাড়াইল অমনি বিমলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, দেখিল তাহার কাকা একটি তার লইয়া তাহাকে ডাকাডাকি করিতেছেন। আর সময় নাই, তখনই বাহির হইতে হইবে, ট্রেণের সময় হয়েছে। বিমল ব্যথিত অন্তঃকরণে ট্রেণে উঠিল। স্বপ্ন সত্য হয় কি না ইহাই কেবল মনে উদয় হইতে লাগিল। যদি সত্য হয়! বিমল শিহরিয়া উঠিল, ভাবিতে পারিল না, এতদিন পরে তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। প্রত্যুষেই গাড়ী হাবড়া পৌছিল। বিমলের এক মিনিটও বিলম্ব আর সহ্য হইতেছিল না। সে একখানি Taxi করিয়া বাটী পৌছিল।

বাটীতে সব নিস্তব্ধ। যখন সে নিজের ঘরে প্রবেশ করিতে যাইবে তখন মার চীৎকার শুনিতে পাইল। শূন্য গৃহে দেয়ালের উপরে চাহিয়া দেখিল, নিভার হাতের বোনা কার্পেটের ওপর বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—

"অন্তে যেন ও চরণ পাই"

পতিব্রতা।

[শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ]

ভারতের প্রধান গৌরব পতিব্রতা। পতিব্রতার মাহাত্ম্যে হিন্দুর নানা শ্রেণীর সাহিত্যই পরিপূর্ণ। পতিব্রতা মৃত পতিকে আলিঙ্গন করিতে করিতে সিন্দুর-সমুদ্ভাসিত ললাটে তাম্বুলপরিপূর্ণ বদনে সাত জন্মের বৃত্তান্ত কহিতে কহিতে হাসি মুখে সর্ব্বসমক্ষে চিতানলে ভস্মীভূত হইতেন। অধুনা নাস্তিকতাপূর্ণ সভ্যতার ফলে ভারতের সেই অতীত গৌরবের বিষয় বর্ব্বরতার ও নিষ্ঠুরতার নিদর্শন বলিয়া উপস্থিত হইতেছে। আজ অতীত যুগের গৌরবভূমি পতিব্রতার একটি পবিত্র সত্য কাহিনী প্রকাশ করিব। দেহাত্মবাদী ঐহিক-সর্ব্বস্ব নাস্তিক চূড়ামণি চার্ব্বাক শিষ্য যে যুগে "আচার্য্য পদ" বাচ্য, সে যুগে পতিব্রতার এই অলৌকিক মাহাত্ম্য বিশ্বাস করিবার অধিকারী অধিক নাই, তাহা জানি, তথাপি পতিব্রতার চরিত্রালোচনাজনিত আত্মপ্রসাদের প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া, অরণ্য রোদন-ন্যায়ের অনুসরণ করিয়াও এই গল্পটি লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হইলাম। ঘটনাটি এই—

ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাওয়াল পরগণার মধ্যে কমল শিরোমণি নামক একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাস করিতেন। শিরোমণি মহাশয়েরা তিন সহোদর ছিলেন। তাঁহাদের সর্ব্ব কনিষ্ঠা এক ভগিনীও ছিলেন। ভগিনীর ৩ বৎসর বয়সের সময়েই জননী পরলোকে গমন করেন, এবং অল্পদিন পরেই শিরোমণি মহাশয়ের পিতারও লোকান্তর হয়।

ইহার অনেক দিন পর শিরোমণি মহাশয় নিমন্ত্রণোপলক্ষে স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে একটি ভৃত্য ছিল।

পথশ্রমে কাতর হইয়া শিরোমণি মহাশয় বিশ্রামার্থ এক গৃহস্থের বাড়ীতে উঠিয়া বাহির বাড়ীর ঘরে বসিয়া পুকুর হইতে জল আনিবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ করিয়া-

ছিলেন। এমন সময় একটি সাত বৎসরের বালিকা আসিয়া বলিল,—"দাদা! মা আপনাকে ভিতর বাড়ীতে যাইতে ডাকিয়াছেন।" তখন শিরোমণি মহাশয় বালিকাকে বলিলেন, "তুমি যাইয়া তোমার মাকে বল যে, তিনি আমাকে চিনিতে পারেন নাই। হয় ত তাঁহার ভুল হইয়াছে।

কারণ, শিরোমণি মহাশয় জানিতেন যে, সে স্থানে তাঁহার অতি দূর সম্পর্কেও কোন কুটুম্ব নাই। ভৃত্য জল লইয়া আসিল, তিনি পা ধুইতে লাগিলেন, এমন সময় সেই বালিকাটি আসিয়া বলিল,—"না দাদা! মা বলিলেন, তাঁহার কোন ভুল হয় নাই। আপনার নাম কমল শিরোমণি, আপনারা তিন ভাই, আপনার এক ভগিনীও আছেন।" শিরোমণি মহাশয় তখন আত্মীয় স্বজনের খবর না রাখার দরুণ মনে মনে আত্মগ্লানি করিতে করিতে মন্ত্রমুগ্ধের মত আস্তে আস্তে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। যাইয়া দেখিলেন দুচালা একখানা ঘরের বারেন্দায় তাঁহার বসিবার জন্য একখানা পিঁড় পাতা আছে, দরজার কাছেই ঘরের ভিতরে বেড়ার সঙ্গে ঘেঁসিয়া একটি স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন। তাঁহার শরীরের কতকাংশ দেখা যাইতেছিল। বয়স ২৮।২৯ বৎসর, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, কিন্তু তাঁহার দেহ হইতে পবিত্রতাময় জ্যোতিঃ যেন নিরন্তর বহির্গত হইয়া প্রথমদর্শীর চক্ষু ঝলসাইয়া দিতেছিল।

শিরোমণি মহাশয় আসনে উপবিষ্ট হইলে, কন্যাটিকে সামনে রাখিয়া সেই রমণীটি একে একে শিরোমণি মহাশয়ের পারিবারিক সমস্ত অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। শিরোমণি মহাশয় বিস্ময়াবিষ্ট-চিত্তে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন। শিরোমণি মহাশয়ের বিস্ময়ের দুইটি কারণ ছিল। এক—অতি সান্নিহিত আত্মীয়ের খবর না রাখা, অপর, সেই যুবতী কর্ত্তৃক তাঁহার প্রতি তুমি শব্দের ব্যবহার। কথাবার্ত্তা শেষ হইলে শিরোমণি মহাশয় গন্তব্য স্থানে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তখন সেই যুবতী তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "না না বাছা! অনেকদিন পর তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে; আজ তোমাকে দুটা ভাত না খাওয়াইয়া যাইতে দিব না। আজ রাত্রিতে এখানে খাওয়া দাওয়া করিয়া কাল সকালে চলিয়া যাইও।" এ কথার উপর শিরোমণি মহাশয় আর কিছু বলিতে সাহসী হইলেন না। সুতরাং সম্মতি জানাইয়া বাহির বাড়ীতে যাইয়া বসিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই বালিকাটি তাঁহাদের রাত্রি যাপনের উপযোগী শয্যার ব্যবস্থা করিতে আসিয়া ঘরের দুদিকে চৌকির উপর দুইটি পাটী বিছাইয়া দিল, এবং কিছুক্ষণ পর দুইটি বালিসও আনিয়া দিল। ইত্যবসরে সায়ং সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইল। শিরোমণি মহাশয় পুকুর হইতে পা ধুইয়া আসিলেন, তখন বালিকাটি আসিয়া, তাঁহাকে ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যার স্থান দেখাইয়া দিল। সন্ধ্যা শেষ হইলে বালিকাটি কিছু জল খাবার আনিয়া দিল। তন্মধ্যে একখানা ডালাতে দুভাগে বিভক্ত দুভাজা চিড়া ও সরু চিড়া। একখানা পিতলের থালায় কচি শশা ও নারিকেলের লাড়ু। শিরোমণি মহাশয় বাল্য-জীবনে চিড়ার সহিত কচি শশা এবং দুভাজা চিড়ার সহিত নারিকেলের লাড়ু ভালবাসিতেন। বহুদিন পর শৈশবের খাদ্য দর্শনে তাঁহার বাল্য-জীবনের অনেক কথাই মনে পড়িল। যাহা হউক, জলযোগ করিয়া তিনি বাহির বাড়ীতে আসিয়া শয্যার উপর বসিয়া তামাক টানিতে আরম্ভ করিলেন। কতক্ষণ পর দুইটি লোক বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, বাড়ীর কর্ত্তা হাট হইতে আসিয়াছেন, সঙ্গে তাঁহার প্রতিবাসী একজন হাটের বেশাতী বহিয়া আনিয়াছে। গিন্নী কর্ত্তাকে অতিথির আগমনবার্ত্তা জানাইয়াছেন। এক এক করিয়া গিন্নী সমস্ত জিনিস বুঝিয়া লইলে কর্ত্তাটি বস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া পদপ্রক্ষালনান্তে সন্ধ্যা করিবার জন্য ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। দীর্ঘ-সন্ধ্যা শেষ হইলে তিনি স্তব পাঠ করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই সেই বালিকাটি চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে আসিয়া নিদ্রাবেশজনিত অস্পষ্ট স্বরে বলিল,—"দাদা! ঠাঁই হইয়াছে, খাইতে আসুন।" শিরোমণি মহাশয় বালিকার সঙ্গে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, বাড়ীর কর্ত্তা পূর্ব্বেই আসনে বসিয়া আছেন, তাঁহার বাঁ ধারে একখানা

পিড়ী পাঁতা আছে। তিনি সেই পিঁড়ীতে উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পর ভাতের থালাসহ কর্ত্রী উপস্থিত হইয়া প্রথম থালা কর্ত্তাকে দিয়া দ্বিতীয় থালা অতিথির সম্মুখে ন্যস্ত করিলেন।

ইহাতেও অতিথির মনে বিস্ময়ের উদ্রেক হইল, কারণ সাধারণতঃ নিয়ম আছে যে, অতিথিকে অন্ন দিয়া পরে বাড়ীর লোককে দেওয়া হয়। বাড়ীর কর্ত্তা কোন কথা-বার্ত্তা না বলিয়াই খাইতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে শিরোমণি মনে করিলেন যে, লোকটি নিতান্ত অসামাজিক। যাহা হউক, তিনিও খাইতে আরম্ভ করিলেন, ক্রমে গৃহকর্ত্রী পরিবেশন করিতে লাগিলেন, একটির পর অপরটি খাদ্য যাহা পাইলেন, তাহা সমস্তই তাঁহার বাল্য-জীবনের অতীব রুচিকর বস্তু। ইহাতেও তাঁহার মনে বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল। আহারান্তে রাত্রি যাপনের পর প্রত্যূষে উঠিয়া শৌচান্তে প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া তিনি গন্তব্য স্থানে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। এমন সময় বাড়ীর কর্ত্রী আসিয়া তাঁহাকে সস্নেহনেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া বিদায় দিলেন। অতঃপর শিরোমণি নিমন্ত্রণের কার্য্য শেষ করিয়া বাড়ীতে গেলেন, এবং পাড়া প্রতিবেশী সকলের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াও যাঁহার বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলেন, তাঁহার সহিত কোন সম্পর্কের পরিচয় পাইলেন না।

ইহার অনেকদিন পর মহামহা বারুণী যোগ হইয়াছিল। তখন ঢাকা প্রভৃতি জেলার লোক মুর্শিদাবাদেই গঙ্গাস্নান করিত। শিরোমণিও অন্যান্য যাত্রীর সহিত মুর্শিদাবাদে গিয়াছিলেন। সকালবেলায় স্নানের কাজ মিটিয়া গেল, বৈকালে সতীদাহ সতীদাহ বলিয়া একটা রোল উঠিল। সকলেই পতিসহ দহ্যমান সতীর পুণ্যময়ী মূর্ত্তি দেখিতে এবং তাহার মুখে পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত শুনিতে ছুটিতে লাগিল। এ প্রলোভন সংবরণ ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং শিরোমণিও জনতার সহিত মিশিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে সতীদাহ দেখিতে ছুটিলেন। তাঁহার বাসস্থান হইতে শ্মশান অনেক দূর ছিল। তিনি বহু কষ্টে চিতার সন্নিভ হইয়া জনতার মুখে শুনিতে পাইলেন যে, তলপেট পর্য্যন্ত পুড়িয়াছে, আর বেশী বাকী নাই। তখন যথাশক্তি চেষ্টা করিয়া জনতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া শুনিতে পাইলেন যে, তখন ষষ্ঠ জন্মের কথা হইতেছে। সতী তাঁহার পিতৃকুলের পরিচয় দিয়া পতিকুলের পরিচয় প্রসঙ্গে শিরোমণির পিতার সহিত তাঁহার বিবাহের উল্লেখ করিয়া বলিলেন—ঐ জন্মে আমার গর্ভে তিন পুত্র ও এক কন্যা। প্রথম পুত্র কমল শিরোমণি। এই কথা বলা মাত্রই পেট ফাটিয়া গেল, এবং কথা বন্ধ হইল। শিরোমণি মহাশয়ও মা মা বলিয়া শ্মশানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। উপস্থিত জনতা মূর্চ্ছিতের শুশ্রূষা করিল। শিরোমণি প্রকৃতিস্থ হইলে তাঁহার মুখে পূর্ব্বাপর সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া দর্শকবৃন্দ বিস্ময়ে অভিভূত হইল। ক্রমে ঐ বৃত্তান্ত দেশদেশান্তরে যাত্রীদের মুখে প্রচারিত হইয়াছিল। বাল্যজীবনে প্রাচীনদিগের মুখে ঐ গল্পটি আমি অনেকবার শুনিয়াছি। হিন্দুর পক্ষে এই গল্পের বিষয়টি অবিশ্বাস্য নহে। কারণ সত্ত্বগুণবহুল মানবের পক্ষে জন্মান্তর-বৃত্তান্তের অনুস্মৃতি হিন্দুর বিভিন্ন শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। শুশ্রুত বলিয়াছেন যে—"জায়ন্তে সত্ত্বভূয়িষ্ঠাঃ পূর্ব্বং জাতিস্মরা নরাঃ।"

জড়ভরত প্রভৃতির বৃত্তান্ত অনেকেই অবগত আছেন।

বৈজ্ঞানিক কথা।

[শ্রীহরিপদ দাস বি-এ]

জন্ম হ্রাস

ফরাসী দেশের জন্ম সংখ্যা ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে। সে দেশের সভ্যতা বিলাস ও আমোদকে এতই বিকৃতভাবে বুঝিয়াছে যে, যৌবনে সন্তান ধারণ ও পোষণের কষ্ট তাহাদের বিলাসী মহলে অনেকেই স্বীকার করিতে চায় না। সে দেশে এই বিলাসীর সংখ্যা বড় বেশী,—বিশেষতঃ

নগর সমূহে। জন্ম সংখ্যার হ্রাস হওয়া জাতির ভবিষ্যতের পক্ষে বিশেষ চিন্তার কথা। তাই অনেক দেশপ্রাণ ফরাসী মহাত্মা কি উপায়ে জন্ম সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে সেই সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। দেশের লোককে সন্তানবহুল পরিবার গঠনে উৎসাহিত করিবার জন্য তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে মঁসিয়ে কোগ্নাক (M. Cognacq) নামে একজন দেশবন্ধু ফরাসী ধনী লোক বাৎসরিক প্রায় ২৫ লক্ষ ফ্রাঁ আয়ের সম্পত্তি ফরাসী পরিষৎ (French Academy) নামে বিখ্যাত সমিতির হাতে দেন। এই আয় হইতে প্রতি বৎসর অন্যূন নয়টী সন্তানের নব্বইটী পরিবারকে ২৫ হাজার ফ্রাঁ করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইবে। সম্প্রতি তিনি আবার বাৎসরিক ১০ লক্ষ ফ্রাঁ আয়ের আর এক সম্পত্তি ফরাসী পরিষৎকে দান করিয়াছেন। এই আয় হইতে অন্যূন পাঁচটী সন্তান আছে এমন ৫০ বৎসরের কম বয়স্ক একশত জন পিতামাতাকে দশ হাজার ফ্রাঁ করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইবে। মঁসিয়ে কোগ্নাকের উদ্দেশ্য ফরাসীদিগকে যৌবনে দাম্পত্য জীবনে উৎসাহিত করা ও ফরাসী দেশের হ্রাসমান প্রজা সংখ্যাকে বাড়ান। এই উদ্দেশ্যে তিনি ৬ কোটী ফ্রাঁর সম্পত্তি দান করিয়াছেন। এক ফ্রাঁ আমাদের দশ আনার সমান। বাংলায়ও জন্ম সংখ্যা অন্য দেশের অনুপাতে ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে—বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী হিন্দুদিগের জন্ম সংখ্যা। ইহা আমাদের পক্ষেও চিন্তার বিষয় বটে। তবে ইহার প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণ করা আমাদের দেশের পক্ষে বিশেষ সোজা নহে। যৌবনে বিবাহ আমাদের দেশে উৎসাহিত করিতে হইবে না, কারণ যৌবনের অনেক আগেই এ দেশে মানুষ বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হয়। ফরাসী দম্পতি সন্তান না চাহিতে পারে, কিন্তু আমাদের দেশের দাম্পত্য জীবনে সাধারণতঃ সন্তান কামনাই প্রধান জিনিষ। এ সত্ত্বেও যে এ দেশে জন্ম সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে তাহার কারণ বোধ হয়, দেশবাসীর দারিদ্র্য, ব্যাধি প্রাবল্য, কুসংস্কার ও শিক্ষার অভাব। কিন্তু এ সবের সংস্কার কে করিবে?

ক্ষমতার তারতম্য

বাংলায় একটা কথা আছে 'পথ হারিয়ে ঘুরে মরা'। সত্য সত্যই দেখা যায় যে, কোন জায়গায় পথ হারাইয়া যাইলে ঘুরিয়া ফিরিয়া বারে বারে একই জায়গায় গিয়া, উপস্থিত হওয়া যায়। এই আশ্চর্য্য ঘটনা কেন হয়? শারীরতত্ত্ববিদেরা এ বিষয়ে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন:—আমাদের শরীরের দুই পার্শ্বের মধ্যে শক্তির তারতম্য রহিয়াছে। এবং ইহার ফলে সকল সময়েই একটী দিক অজ্ঞাতসারে অপর দিকের উপর একটু আধিপত্য করিয়া থাকে। সম্প্রতি ভিয়েনাতে এ সম্বন্ধে আমাদের শরীরের দুই পার্শ্বের এই তারতম্য ও তাহার ফল সম্বন্ধে যে পরীক্ষা (experiment) হইয়াছে, তাহাতে এই বিষয়ে আরও বিশেষ তথ্য জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। এই পর্য্যবেক্ষণের ফলে জানা গিয়াছে যে, রাস্তায় বাম দিকে ফিরিবার নির্দ্দেশ লেখা থাকা সত্ত্বেও লোকে চলিবার সময় সাধারণতঃ ফিরিতে হইলে ডান দিকেই ফিরে। বাম দিকে ফিরিতে হইলে একটু যেন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ শারীরতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক আবডের হালডেন হলে'র Physiological Instituteএ এ সম্বন্ধে আরও পরীক্ষা করিয়াছেন। এই শিক্ষাগৃহে দুইটী একই রকমের সিঁড়ি আছে। একটী ছোট সিঁড়ি দিয়া কিছুদূর উঠিলে এই সিঁড়ি দুইটীতে আসিয়া পড়া যায়। এই সিঁড়ি দুইটীর একটী এই ছোট সিঁড়ির ডান দিকে গিয়াছে, অপরটী বাম দিকে গিয়াছে। লক্ষ্য করিয়া দেখা গিয়াছে যে বেশীর ভাগ ছাত্রই উপরে উঠিবার সময় ডান দিকের সিঁড়িই ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে, যে ছাত্ররা ন্যাটা (left handed) তাহারা প্রায় সকলেই বাম দিকের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠে। সাধারণ লোকও উঠিবার সময় প্রায় সকলেই ডান দিকে ফিরিয়া ডানের সিঁড়ি দিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু যাহাদের বাম দিক বেশী বশ তাহারা প্রায় অনেকেই ফিরিবার সময় বাম দিক ফিরিয়া বামের সিঁড়ি অবলম্বন করিয়াছে। উপর তালা হইতে নামিবার সময় কিন্তু উভয় সিঁড়িই সমানভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার কারণ

যে, নামার চেয়ে সিঁড়ি উঠিতে বেশী প্রযত্নের দরকার হয়।

—৹—

বয়সকে ফাঁকি দিবার উপায়

যে দেশের লোক যৌবনের আগেই বৃদ্ধ হইয়া পড়ে তাহাদের পক্ষে বয়সকে ফাঁকি দিবার কৌশল নিশ্চয়ই আদরণীয় হইবে। সম্প্রতি একটী ইংরাজী পত্রিকায় একজন শারীরতত্ত্ববিদ্ এই ফাঁকি দিবার যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

প্রায় দেখা যায় মানুষ ষাট পেরুলেই বুড়া হইয়া যায়। তার কারণ মানুষ তখন মনে ভাবে যে তাহারা বুড়া হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু তখনও তাহাদের মাংসপেশী, স্নায়ু, ইন্দ্রিয়, রক্ত, মাংস প্রভৃতি শরীরের সবই নবীন থাকে। ষাট বছর হলেই মানুষ মনে ভাবে যে সংসারের ঝঞ্ঝাট এতদিন বয়ে বয়ে যেন তারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে ও সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিবার সময় তাহাদের হইয়াছে। এই মনে ভাবিয়া সত্যসত্যই তাহারা বৃদ্ধদিগের চাল-চলন অবলম্বন করে। ফলে সময়ের পূর্ব্বেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

এই অসময়ে বৃদ্ধ হওয়া আত্মপ্রেরণার (self-suggestion) ফল। মানুষ মনে যা ভাবে কাজেও তাই হয়। এই সব মানুষ নিজদের বৃদ্ধ ভাবে ও চাল, চলন হাব ভাব প্রভৃতি সব বিষয়েই বৃদ্ধের মতনই চল্‌তে চায়. আর সেই বুড়োমীর ভাণ করিতে যাইয়া সত্যিই বুড়ো হইয়া পড়ে। খালি বাহিরের খোলসটাই বুড়ো হয় না, এই বৃদ্ধত্বের ছাপ তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিক চিন্তাক্ষেত্রেও পতিত হয়।

মানুষের এই ভুল ধারণাটা দূর করিতে হইবে যে তাহারা ষাট বছর ধরিয়া খাটিয়া মরিয়াছে বলিয়া ষাট বছরের পর তাহাদের অলস জীবন যাপনের একটা সত্ত্ব জন্মিয়াছে। যাহারা চুপ করিয়া বসিয়া বার্দ্ধক্যের অপেক্ষা করে, বার্দ্ধক্য কাল বিলম্ব না করিয়া তাহাদের মধ্যে সুনিশ্চিত ভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়। দেহ ও মনের সবলতা নষ্ট হইয়া যাওয়া অকাল বার্দ্ধক্যের একটি প্রধান কারণ। এই দেহ ও মনের সবলতা ষাটের পরেও বজায় রাখিতে হইবে। আমাদের এখন বয়স হইয়াছে এ বলিয়া ইহাদের বিশ্রাম দেওয়ার ব্যবস্থা করা চলিবে না। আগেও যাহা করিতে আমরা অভ্যস্ত, এই ষাট বছরের পরেও সেই সবই আমাদের করতে হবে, তা না হলেই আমাদের জীবনে বার্দ্ধক্যের ভাটা এসে পড়বে। এ কাজ আমরা করিব না, এটা করা উচিত নয়, এ বয়সে এ কাজ করা সাজে না, এই রকমের ভাব মনে মোটেই আনিতে দেওয়া উচিত নয়। বরং সব সময়ই ভাবা উচিত যে, এ কাজ করতে আমরা খুব পারিব, আমরা বরাবর ইহা করিয়া আসিয়াছি এবং এখনও করিতে পারি ও করিব। তা না করিয়া লোক ভাবে যে এই বয়সে তাহারা ছেলেপুলের উপরে সংসারের ভার দিয়া নিজেরা একটু আরাম খাবে। তাদের নিজেদের সেবা শুশ্রূষার ভারও অন্যে লইবে। তাহারা কেবল বসিয়া বসিয়া ঠাকুরদাদার চাল চালিবেন। ইচ্ছাপূর্ব্বক মানুষ এই রকম করিয়া স্বাস্থ্য, মনীষা ও আয়ুকে নষ্ট করে।

মানুষ যখন অসময়ে এই রকম ঠাকুরদাদা সাজিয়া বসে তার জীবন কালের শক্তিগুলিও সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হইয়া পড়ে। দৈহিক যন্ত্রের উপযুক্ত চালনার অভাবে তাহাদের মধ্যে অচিরেই অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হয়। কল্পিত বৃদ্ধত্বের কৃত্রিম জড়তা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াকে ক্রমেই শ্লথ করিয়া তোলে ও সেই ফলে রক্ত চলাচল প্রক্রিয়াও হীনতেজ হইয়া উঠে। রক্ত প্রবাহক্রিয়া মন্দীভূত হইলে জীবনের সমস্ত বৃত্তিগুলিই মন্দীভূত হয়। পাকশক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে, ভুক্তসামগ্রী রস রক্তে পরিণত হইতে চায় না, কাজেই এই অন্নময় প্রাণ প্রাণহীন হইয়া পড়ে। চুপ করিয়া বসিয়া থাকার চেষ্টায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিতে জড়তা আসিয়া পড়ে ও বাতের সৃষ্টি হয়। হৃৎপিণ্ডটি আরাম খাইয়া এমনই স্থূল হইয়া পড়ে যে, একটুমাত্র নড়িতে চড়িতে যাইলেও নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে। অসময়ে ঠাকুরদাদা সাজিবার সাধের ইহাই শাস্তি।

আমরা যদি ভাবতে পারি যে আমাদের আত্মা চিরকালই এক, আমরা চিরকালই নবীন ও সেই ভাবনামত সকল সময় কাজ করি তা হলে আমাদের অকাল বার্দ্ধক্যকে অনায়াসেই ফাঁকি দিতে পারি।

আমাদের এই গরম দেশে লোকে আরও শীঘ্র শীঘ্র পাকে। এখানে আর ষাট বছর পর্য্যন্ত পৌঁছাতে হয় না। ত্রিশ না পৌঁছাতেই লোকে 'ঠাকুরদাদা' হন। তখন দৌড় ঝাঁপ করিতে লজ্জা বোধ হয়, শারীরিক ব্যায়ামের কোন কাজ করিতে কুণ্ঠা আসে। আর এমন একটা বৃদ্ধসুলভ গাম্ভীর্য্য তাহার মধ্যে আবির্ভূত হয় যে, সময় সময় আমাদিগকেও বিস্মিত হইতে হয়। এই অকালপক্কতার ভাব এমন কি ছেলে মহলেও আসিয়া জুটিয়াছে। সেখানেও অনেকে বৃদ্ধত্বেরই অনুকরণ করে। বুড়োর মত চলা, বুড়োর ন্যায় কথা বলা, বুড়োর মত চুপচাপ বসিয়া থাকার প্রবৃত্তি আমাদের ছাত্রদিগের মধ্যে খুবই বেশী লক্ষিত হয়। আমাদের সমাজও এই বুড়োমী ভাবেরই প্রশ্রয় দিয়া থাকে। যে ছেলে খেলা ধূলা না করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে সেই ছেলেই শান্তশিষ্ট। ত্রিশ কি চল্লিশ বৎসরের লোককে যদি যৌবনোচিত খেলা ধূলায় যোগদান করিতে দেখি তাহা হইলে বিস্মিত ও লজ্জিত হই ও বৃদ্ধ বয়সে এই ছেলেমীর জন্য তাহাকেও লজ্জা দিতে ছাড়ি না। চল্লিশ বৎসর বয়স হইলে চুপ করিয়া বসিয়া স্ফীতোদরে হাওয়া লাগান ছাড়া যে শারীরিক শ্রমসাধ্য কাজ কিংবা শারীরিক ব্যায়াম অভ্যাস করার কথা এ দেশ ভাবিতেও পারে না। চল্লিশ বছরে যৌবনসুলভ চাঞ্চল্য প্রকাশ এখানে যেন অতীব বেয়াদপির কাজ। এই সমাজে উপরি উদ্ধৃত উপদেশ অতিশয় প্রয়োজন। শৈশবেই বৃদ্ধত্ব লাভ করিবার ইচ্ছা যদি আমাদের না থাকে, তাহা হইলে এই বৃদ্ধত্ব-প্রীতি ছাড়িয়া দিয়া যৌবনকে সম্মান করিতে শিখিতে হইবে। তাহা না হইলে হয়ত, পৃথিবীতে একদিন এমন সময় আসিবে যখন শৈশব ও বার্দ্ধক্য ছাড়া যৌবন ও কৈশোর প্রভৃতি জীবনের অবস্থাগুলি লুপ্ত হইয়া যাইবে।

পারিবারিক প্রবন্ধ ও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়।

[শ্রীমতী অনুরূপা দেবী]

মনীষী-প্রধান পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পারিবারিক প্রবন্ধ বাংলা ভাষার একখানি শ্রেষ্ঠ পুস্তক। অনেক বিষয়ে ইহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিলেও হয়ত অত্যুক্তি দোষ ঘটে না। হিন্দুর পারিবারিক জীবনের সকল সমস্যার সমাধান ইহাতে এরূপ ভাবে করা আছে যে, সুস্থ ব্যক্তিরা কখনই তাহার খণ্ডন চেষ্টায় সফলপ্রযত্ন হইতে পারেন না। তবে যাহারা যুক্তিহীন অসার তর্ক করিবে, তাহাদের সঙ্গে পারিবার উপায় কাহারও নাই।

এই হিন্দু পরিবারের সম্পূর্ণ শিক্ষনীয় পুস্তকখানি স্ত্রীশিক্ষার অনুপযোগী অপবাদে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নিষ্কাশিত হইতেছে সংবাদ পাইয়া স্তম্ভিত হইলাম! বইখানির কোন্ অংশ বা কোন্ অংশগুলি আধুনিক প্রৌঢ়া কুমারীদের শিক্ষার অনুপযোগী দোষে দোষী হইল, জানিতে পারিলে বিশেষ বাধিত হইতাম। অবশ্য এই দোষারোপ কার্য্যটা কোন বিদেশী নির্ব্বাচকের দ্বারায় হয় নাই, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আমার স্বদেশীয় কোন্ উন্নতচেতা, দূরদর্শী নারীসুহৃদ্ কর্ত্তৃক হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীকুলের এই বিশেষ উপকারটুকু ঘটিল, তাঁহার পরিচয় পাইতে ইচ্ছা করে। যাই হোক, তাঁহার রুচির প্রশংসা করিতে হয়।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, পারিবারিক প্রবন্ধ কি কি কারণে স্ত্রীশিক্ষার অনুপযোগী প্রমাণিত হইল?

১। পারিবারিক প্রবন্ধে বাল্য-বিবাহের শ্রেষ্ঠত্ব লেখক খ্যাপন করিয়াছেন। এক্ষণে প্রৌঢ়া বিবাহের (বাঙ্গালীর মেয়ে কুড়ির পরেই বুড়ি হয়, ইহা অস্বীকার করিলেও অখণ্ডনীয় সত্য, প্রমাণ ঘরে ঘরে) কলি উপস্থিত, তাই কি উহা তাঁদের পড়ার অযোগ্য হইয়াছে?

২। পারিবারিক প্রবন্ধে নারীর সতীত্বকে নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে গ্রহণ করিয়া সতীধর্ম্মের অশেষ গুণানুকীর্ত্তন করিয়াছেন, এক্ষণে নারীর সতীত্বের বাজার দর সাহিত্যক্ষেত্রে একেবারেই পড়িয়া গিয়াছে ও উহা পুরাতন

তান্ত্রিকতার পচা মালে পরিণত হইয়া অসতীদের জয় জয়কার চলিতেছে, পাছে মেয়েরা পুরাতন পন্থার পচা মালের আবার আমদানী করিতে শিখিয়া ফেলে, সেই ভয়েই কি উহাকে 'বয়কট' করা হইতেছে?

৩। অথবা উক্ত প্রবন্ধ পুস্তকখানিতে স্ত্রী-পুরুষের সংযম শিক্ষা ও বৈধব্যব্রত পালন ইত্যাদি বিষয়ে কতকগুলি প্রবন্ধ আছে, আজি কালিকার অসংযত স্বেচ্ছাতন্ত্রতার দিনে, বিধবার ব্যভিচার, সধবার ব্যভিচার, কুমারীর পুরুষ-মৃগয়ার প্রাণান্ত চেষ্টা এ সকলের উপাদেয় বর্ণনার পরিবর্ত্তে ওই পুরাতন সেকেলে শিক্ষা মেয়েদের রুচিকে পাছে বিকৃত করিয়া বইসে, সেই ভয়েই কি হিন্দু শিক্ষালয়ের অভিভাবক-বৃন্দ ভয় পাইয়া অভাগা পুস্তকখানিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী-ছাড়া করিতেছেন?

৪। পারিবারিক প্রবন্ধের ভাষাটা না কি ঠিক গ্রাম্য ভাষা নহে বলিয়াও হয়ত ইহার বিতাড়িত হওয়া অসম্ভব নহে। কতকগুলি চাষাভূষার মধ্যে একজন ভদ্রভাষায় কথা কহিতে গেলে তাহা কতকটা দুর্ব্বোধ্য হইবে বই কি! সাহিত্যের ছত্রপতি বঙ্কিমচন্দ্র এই পুস্তক পাঠ করিয়া ইহার ভাষা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "ইহার রচনা পদ্ধতি সকলেরই বোধগম্য" যাহা "সকলেরই বোধগম্য" তাহাও যদি মেয়ে-দের বোধগম্য না হয়, তবে আর কোন্ লজ্জার মাথা খাইয়া তাঁহারা পুরুষের সহিত এক শিক্ষালাভশালায় কলেজে ঢুকিতেছেন? মেয়ে পুরুষের সমান অধিকারের দাবী তুলিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন না?

হিন্দু পরিবারের জীবনযাত্রার উপযোগী এই আদর্শ পুস্তককে হিন্দু মেয়েদের (ব্রাহ্মদেরও আমরা অ-হিন্দু মনে করি না, সতীত্ব, সংযম, বৈধব্যাচার পালন তাঁদের পক্ষেও উপকারী বলিয়া মনে করি, তাঁরাও যে অনেকে তাহা করেন, ইহাও আমার ভালমতে জানা আছে) শিক্ষার অনুপযুক্ত সত্য সত্যই যদি এই সকল আধুনিক স্বেচ্ছা-তন্ত্রতার বিরোধী বলিয়াই স্থির করা হইয়া থাকে, তবে সেইক্ষণ হইতেই ওই বিশ্ববিদ্যালয়টির নামের সঙ্গে আর যে কোনও শব্দই যোজনা করা হোক না কেন, "হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়" নাম ধারণ করিবার উহার কোনই অধি-কার নাই।

বরের দর।

১

বার তিনেক ফেল হইয়া জীবন আই এ পাশ করিল, কাজেই পিতামাতা আত্মীয় স্বজন খুবই আনন্দিত হইলেন। এমন অঘটন-ঘটনা যে তাঁহার গুণধর ছেলের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে,—অন্যে পারিত না, এ কথা নন্দরাণী পাড়ার সকলকেই বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলেন এবং এই উপলক্ষে ভবানীপুর হইতে হাঁটিয়া কালীঘাটে মা কালীর পূজাও দিয়া আসিলেন।

বাঙালীর ছেলের একদিন অনাহারে কাটিলেও নাকি বিশেষ ক্ষতি হয় না, কিন্তু বিবাহ না করিলে একবেলাও চলে না। বিশেষ ছেলে যদি একটা পাশ করা হয়, তবে ত মণি কাঞ্চন যোগ, বিবাহ তাহাকে করিতেই হইবে। ছেলের অচল দিনগুলি সচল করিবার ভাবনায় নন্দরাণী বিশেষ চিন্তিত ও ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। একদিন কর্ত্তাকে বলিলেন, "ওগো শুনছো?"

আহারাদির পর আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া রাখালবাবু ভিজা মাথায় চিরুণী চালাইতেছিলেন, মাথা তুলিয়া বলি-লেন, "কি?"

গিন্নী বলিলেন, "ছেলের বিয়ের কি কচ্ছ?"

বিস্মিতকণ্ঠে কর্ত্তা বলিলেন, "বিয়ে! এর মধ্যেই বিয়ে? ও বয়সে যে আজকাল মেয়েদেরও বিয়ে হয় না গো!"

গালে হাত দিয়া নন্দরাণী বলিলেন, "ওমা, অবাক কল্লে যে তুমি! ঘরে সোমত্ত ছেলে, আর তুমি বল্লে এরই মধ্যে বিয়ে।" কোটটা গায়ে দিয়া জুতার মধ্যে পা ঢুকাইতে ঢুকাইতে কর্ত্তা বলিলেন, "আর বছর-দু'য়েক পড়ুক জীবন তারপর দেখা যাবে।"

গিন্নী ঝঙ্কারিয়া উঠিলেন, "সে হবে না, বিয়ে আমি এই ফাগুনেই দোব, তুমি দু চার খানা কাগজে বিজ্ঞাপন দাও, একটি খুব সুন্দর মেয়ে চাই, বুঝলে?"

পকেটে ট্রাম ভাড়ার পয়সা আছে কি না দেখিয়া, একটি ছোট্ট "হুঁ" দিয়া, ছাতা বগলে রাখালবাবু বাহির হইয়া পড়িলেন।

২

বাড়ীতে ঘটক ঘটকী ঘন ঘন যাতায়াত করিতে লাগিল। একটি ছেলের জন্য মেয়ের বাপের দল মেয়ে লইয়া সাধাসাধি করিতেছে। রবিবার, কর্ত্তা আহারে বসিয়াছেন, নন্দরাণী বাতাস করিতে করিতে বলিলেন, "জীবন যা হোক্ লেখাপড়া শিখেছে, আর ওর বিয়ে না দিলে চলে না, তাতে ঘরেও বেশ দু পয়সা আসবে, মেয়েটাও ডাগর হ'ল, ঐতে তারও একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আর আমাদের যা' আছে, তাতেই দিন বেশ কেটে যাবে, ছেলেকে পড়তেও হবে না, চাকরীও করতে হবে না।"

নিঃশেষে সজনেখাড়ার সত্বটুকু চুষিয়া থালার পাশে ছিব্ড়ে ফেলিয়া রাখালবাবু বলিলেন, "জীবন আগে বি,এ পাশ করুক, তখন দেখে শুনে একটি টুকটুকে বৌ আনা যাবে। শুভার বিয়ের জন্যে ভাবতে হবে না, যা আছে তাতেই একটি ভাল ছেলে পাওয়া যাবে।"

গিন্নী বলিলেন, "শোন কথা, পরকে ডেকে ঘরের পয়সা দিতে হবে! ও সব হবে না, ছেলের বিয়ে দাও বৌ আসুক, সংসারের কাজ কর্ম্ম করবে, সঙ্গে সঙ্গে দু' পয়সা লাভও হবে। আমি সকলকে মেয়ে খুঁজতে বলেছি, আর বলে দিয়েছি নগদ পাঁচ হাজার চাই।"

কর্ত্তা বলিলেন, "না, না,—সে কি কথা, ছেলের বিয়েতে আমি নগদ একটি পয়সাও নেব না, তারা মেয়েকে গহনাপত্তর যা দেবে, শুধু তাই।"

নন্দরাণী চটিয়া বলিলেন, "তুমি নিতান্ত পুরোন ধরণের লোক, একালের চাল-চলন কিছু জান না, তোমায় এর মধ্যে থাকতে হবে না। আমি সব ঠিক কচ্ছি, তুমি শুধু ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে আনবে।"

রাখালবাবু হতভম্বের মত নির্ব্বাক বিস্ময়ে গৃহিণীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

৩

নানাস্থান হইতে জীবনের সম্বন্ধ আসিতেছে, কিন্তু দু'হাজারের বেশী কেহই দিতে চায় না। শেষে একটা সম্বন্ধ আসিল, তাহারা নগদ পাঁচ হাজার দিবে, তা ছাড়া গহনা ও অন্যান্য খরচ আছে, মেয়ে কিন্তু খুব কালো নন্দরাণী দিন দুই ভাবিলেন, তারপর জীবনের সঙ্গে গোপন পরামর্শ করিয়া বিবাহের সব ঠিক করিয়া ফেলিলেন। রাখালবাবু সমস্ত শুনিয়া চিন্তিত হইলেন, বলিলেন, "দেখ, পয়সার মায়া ছেড়ে দিয়ে, একটি সুন্দর দেখে মেয়ে ঘরে আন, টাকার লোভে কালো মেয়ে এনে, বৌ-বেটাকে ত সুখী করতে পারবেই না, তুমিও হয়ত সুখী হবে না।"

নন্দরাণী বলিলেন, "মনে কচ্ছি কি জান, বছর-দুয়েক পরে জীবনের আবার বিয়ে দেব।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রাখালবাবু বলিলেন, "পয়সার জন্যে একটা মেয়ের সর্ব্বনাশ!"

তারপর চাদরখানি কাঁধে ফেলিয়া বাড়ীর বাহির হইতে হইতে বলিলেন, "চেষ্টা করে দেখি যদি রক্ষে হয়!"

৪

কাল জীবনের গায়ে হলুদ। গৃহিণীর তাড়নায় একরাশ কাগজপত্র ছড়াইয়া রাখালবাবু প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির তালিকা প্রস্তুতে ব্যস্ত। ইজিচেয়ারে কাত হইয়া পড়িয়া জীবন 'ডেলিনিউজ' পড়িতেছিলেন। নন্দরাণী ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "শুনেছ, ওরা বিয়ে দেবে না?"

গৃহিণীর দিকে চাহিয়া সহজ কণ্ঠে রাখালবাবু বলিলেন, "কারা?"

ক্রুদ্ধা নন্দরাণী বলিলেন, "চাটুয্যেরা, আবার কারা।"

গায়ে হলুদের ফর্দ্দ ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে কর্ত্তা বলিলেন, "সে ত ভাল কথা, যাক্, বাঁচা গেল।"

ঝঙ্কার দিয়া গৃহিণী বলিলেন, "বাঁচা গেল কিগো! আমাদের কি মান ইজ্জৎ নেই, মিথ্যেবাদী, জোচ্চোরদের ভাল করে জব্দ করে দাও তুমি। কাগজে ছাপিয়ে দাও, ওদেরপড়া মেয়ে যেন কেউ না বিয়ে করে। আর আমাদের এই যে এত খরচ-খরচা তার দায়ী কে? নালিশ করে তুমি এসব আদায় কর।"

পরিহাস তরল কণ্ঠে রাখালবাবু বলিলেন, "বেশ ত, আজই আমাদের যতীনকে ডেকে একটা প্লীড লিখিয়ে কোর্টে পেশ করে দিচ্ছি।"

২১শ ভাগ] { আষাঢ়, ১৩৩১। } [৩য় সংখ্যা

সেলির কাব্যে ভারতের কথা।

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম-এ, বি-এল]

ইংরাজ কবি সেলি (খৃঃ ১৭৯২—১৮২২) রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ, এই কয়টী সূক্ষ্ম উপাদানে তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সেই কারণে তাঁহার কাব্যের অনেক স্থানে ভারতের বৃক্ষ লতা ও পুষ্পের উল্লেখ দেখিতে পাই। সেলির মতে ভারতের দ্রুমলতা সকল বর্ণে ও গন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

"And Indian plants, of scent and hue
The sweetest that ever were fed on dew,
Leaf after leaf, day by day,
Were massed into the common clay."

(*The Sensitive Plant—Part IV*)

সেলির কল্পনা ভারতের গোলাপ পুষ্প বিশেষ হইতে উত্থিত সুগন্ধকে ঘন মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছে।

"—As a tube-rose
Peoples some Indian dell with scents which lie
Like clouds above the flower from which they rose,
The singing of that happy nightingale
In this sweet forest, from the golden close
Of evening till the star of dawn may fail,
Was interfused upon the silentness."

(*The Woodman and the Nightingale*)

একাধিক এংলো-ইণ্ডিয়ান কবির পদ্য রচনায় চম্পক পুষ্পের উল্লেখ দেখা যায় বটে, কিন্তু খাঁটি ইংরাজ কবিদের মধ্যে সেলি ছাড়া অপর কাহারও কাব্যে এই পুষ্পের উল্লেখ আছে বলিয়া মনে হয় না। পাশ্চাত্যের কোনও কোনও দেশে বিবাহোপলক্ষে বর কনের শয়নকক্ষের জানালার নীচে রাস্তায় দাঁড়াইয়া তাহার প্রণয়িনীর রূপ গুণের প্রশংসা করিয়া সময়োপযোগী গান গাইয়া থাকে। কবি সেলি এই প্রথা অবলম্বন করিয়া তাঁহার একটি গীতি-কবিতার নায়ককে ভারতবর্ষে গান গাইতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। উল্লিখিত গীতি-কবিতাটিতেই চম্পক পুষ্পের উল্লেখ আছে। এই স্বল্পায়তন কবিতাটী এত সুন্দর যে, আমরা ইহার সমুদয় শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

The Indian Serenade.

I arise from dreams of thee,
In the first sweet sleep of night,

When the [illegible] ,
And the stars are shining bright.
I arise from dreams of thee,
And a spirit in my feet
Has led me—who knows how ?
To thy chamber window sweet !

*

The wandering airs they faint
On the dark, the silent stream—
The champak odours fail
Like sweet thoughts in a dream ;
The nightingale's complaint,
It dies upon her heart,
As I must die on thine,
O beloved as thou art !

*

O lift me from the grass !
I die ! I faint ! I fail !
Let thy love in kisses rain
On my lips and eyelids pale.
My cheek is cold and white, alas !
My heart beats loud and fast
Oh ! press it close to thine again,
Where it will break at last.

এই কবিতাটি যথার্থই ভারতবর্ষে প্রচলিত সুরে গীত হইয়াছিল। রক্ত বর্ণ পক্ষীর উল্লেখ করিয়া কবি লিখিয়াছেন,—

—"Flamingo,—that shy bird
That gleams the Indian air. Have
you not heard
When a man marries, dies, or turns
Hindoo,
His best friends hear no more of him ?"
(*Letter to Maria Gisborne*)

সেলির কল্পনা উপমার জগতে দুই এক স্থানে ব্যাঘ্রের চিত্রও রচনা করিয়াছে।

"Even as a tiger on Hydaspes' banks
Outspeeds the antelopes which
speediest are."
(*The Witch of Atlas*)

ভগ্ন জাহাজ সমুদ্র তীরে যেখানে পড়িয়া আছে সেখানেও,—"One tiger is mingled in ghastly affray with a sea-snake." সেলির কাব্য পাঠ করিলে মনে হয় যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা যৎসামান্য ছিল। "হেলাস" (Hellas) নামক কাব্যে তিনি ক্রীতদাসের উল্লেখ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা কবি-কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। স্তাম্বুল নগরীতে (Constantinople) অন্তঃপুরের গৃহের ছাদে মামুদ যখন নিদ্রা যাইতেছেন ভারতবাসী একজন ক্রীতদাস তাঁহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া রুদ্ধ স্বরে বলিতেছে,—"Away unlovely dreams !" ইত্যাদি। সেলি ইষ্ট ইণ্ডিয়া বা প্রাচ্য জগত সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া শয়তানের পানীয়ের তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

"Now he is quite the kind of wight
Round whom collect, at a fixed era,
Version, turtle, hock and claret,—
Good cheer—and those who come to
share it—
And best East Indian madeira !"
(*Peter Bell The Third*)

সুদূর মালয় উপদ্বীপের উল্লেখ করিয়া সেলি যে দুইটী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন—' Far Chersonese" (Oedipus Tyrannus)—তাহা মিল্টনের অনুকরণ মাত্র। সেলি প্রাচীন গ্রীক আদর্শে যে কয়খানি নাটক রচনা করিয়াছেন তাহার ভিতর দিয়াই তাঁহার কবিত্ব-প্রতিভার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। "বন্ধনমুক্ত প্রমিথিউস" (Prometheus Unbound) নামক সুবিখ্যাত কাব্যে সেলি একাধিকবার ভারতের উল্লেখ করিয়াছেন। এই কাব্যের প্রথমাঙ্কে নায়ক তুষার-শীতল উৎসসমূহকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

"Ye icy springs, stagnant with wrinkling
frost,
Which vibrated to hear me, and then
crept
Shuddering through India !"

উদ্ভব প্রদেশ হইতে আকাশ বাণী কহিল,—

"Never such a sound before
To the Indian waves we bore."

দ্বিতীয়াঙ্কে মূর্ত্তিময়ী আসিয়া ভূ-খণ্ড এশিয়িউসকে উল্লেখ করিয়া কহিতেছেন,—

"He taught to rule, as life directs the limbs,
The tempest-winged chariots of the ocean,
And the Celt knew the Indian."

এই রূপকময় নাট্য-কাব্যের নায়ক প্রমিথিউস সমগ্র মানব-জাতির আদর্শ পুরুষরূপে কল্পিত হইয়াছে। এই নায়কের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ন্যায়পরতা ও হৃদয়ের মহত্ত্বে প্রকটিত। জোভ বা জুপিটর-প্রজা পীড়নকারী রাজশক্তি, ডিমোগর্গন অনিবার্য্য ঘটনাচক্র, আসিয়া ভূ-খণ্ড প্রকৃতির অন্তঃস্থ প্রেম ও সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তিময়ী দেবী। গ্রীক পুরাবৃত্তে উক্ত হইয়াছে যে, প্রমিথিউস মানব-জাতির কল্যাণের জন্য স্বর্গাধিপতি জুপিটরের অধিকার হইতে অগ্নি চুরি করিয়াছিলেন ও সেই অপরাধে জুপিটর তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া পর্ব্বতের শৃঙ্গে রাখিয়া দিয়াছিলেন। সেলি গ্রীক পুরাবৃত্তের এই আখ্যানটীকে তাঁহার কাব্যের উপযোগী করিয়া লইবার জন্য ইহার মূলে যে সুন্দর রূপক আছে তাহার আশ্রয় লইয়া অগ্নিকে স্বাধীনতারূপে কল্পনা করিয়াছেন। সেলির প্রমিথিউস মানব-জাতিকে উৎপীড়ক রাজশক্তির অত্যাচার হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে নিষ্ঠুর শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই নাট্য-কাব্যের নায়িকা 'আসিয়া" প্রমিথিউসের প্রণয়িনী। স্বাধীনতা সুখে বঞ্চিত হইয়া আসিয়া যে মর্ম্ম-যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন, জনশূন্য উপত্যকায় একাকী বসিয়া তিনি সে কথা নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই উপত্যকা ইণ্ডিয়ান ককেসাস্ নামক কবি-কল্পিত পর্ব্বতে অবস্থিত। আসিয়ার মুকুটমণি ভারতবর্ষ কবির কল্পনা ও কাব্যের নায়ক নায়িকার জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এত প্রেম, এত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন্ স্থানে আছে? বাহ্য প্রকৃতি ও অন্তর্জগতের প্রেমের লীলাভিনয়ের রঙ্গমঞ্চ সেইজন্য সেলি আসিয়ার ককেসাস পর্ব্বতমালার যে দিক ভারতবর্ষমুখীন সেই দিকের উপত্যকায় প্রস্তুত করিয়া দিগ্বারণ সদৃশ তাঁহার কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। প্রকৃতির বহির্ভাগের সৌন্দর্য্য ও তাঁহার অন্তরের অন্তরতম স্থানে লুক্কায়িত প্রেমের মধ্যে যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহার অস্তিত্ব সেলির অত্যাশ্চর্য্য শব্দ-নৈপুণ্যে এই কাব্যের ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত। দৃশ্যমান জড়জগতের তলে তলে আনন্দের প্রেমের শান্তির ফল্গু শত সহস্র প্রবাহ বিস্তার করিয়া বিশ্বের কল্যাণ সাধন করিতেছে। যে শক্তির প্রভাবে বিশ্বমুখে বারিধারা নির্গত হয় সে শক্তির উৎপত্তি শত যোজন দূরে কোন্ অনালোকিত গিরিকন্দরে তাহা আমরা জানি না। রোমাণ্টিসিজমের কবি সেলি সেইজন্য আসিয়ার মুখ দিয়া আমাদিগকে সেই অজ্ঞাত দেশের বার্ত্তা শুনাইয়াছেন। বিশ্বের হৃদয়গত প্রেমের মধ্যে আমরা কবির কল্পনায় বন, নদী, সমুদ্র, নির্ঝর, বায়ু, আকাশ, চন্দ্র, নক্ষত্র, সাগর, উদ্ভিদ্ প্রভৃতি অসংখ্য গতিশীল জীবন্ত খণ্ড-শক্তির উদ্দীপনায় উপলব্ধি করি। এত দেশ থাকিতে সেলি যে আসিয়াকে মূর্ত্তিমতী করিয়া প্রমিথিউসের প্রণয়িনী রূপে তাঁহাকে বরণ করিয়াছেন তাহার একটী কারণ আছে। স্বাধীনতাহীনতায় সেলির সমকালে আসিয়া ছাড়া অপর কোনও দেশ অধিকতর প্রসিদ্ধিলাভ করে নাই। গ্রীক কবি এস্কিলাসের (Aeschylus) প্রামিথিউস কাব্যের নায়িকা ইও (Io) ও সেলির কাব্যের নায়িকা আসিয়ার মধ্যে কোনও ঐক্য নাই। ইও-চরিত্রের আদর্শ এসকিলাস প্রাচীনতর গ্রীক সাহিত্যে ও সম্ভবতঃ সমসাময়িক গ্রীক সমাজে দেখিতে পাইয়াছিলেন। মানব হৃদয়ের উগ্র বৃত্তিগুলি ইও-চরিত্রের উপাদান। আসিয়া চরিত্র সম্পূর্ণ কল্পনার সৃষ্ট। গ্রীক নাট্য-কলার উপর কলম ধরিয়া উনবিংশ শতাব্দীর রোমাণ্টিসিজম সাহিত্য-জগতে যে বিপ্লবের সূত্রপাত করিয়াছিল তাহার ফলে যতগুলি বিখ্যাত রচনা সাহিত্য-সংসারে আবির্ভূত হইয়াছিল সেলির আলোচ্য নাট্য-কাব্য তাহাদের মধ্যে কল্পনার মনোহারিত্বে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। এই কাব্যের আর একটা দিক আছে। গ্রীক

ট্রেমোডে[illegible] যাহাকে দানবরূপে কল্পনা করিয়া সেলি আলোচ্য কাব্যে ডিমোগর্গন নাম দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা মানব-সমাজে ধ্বংসকারী বিদ্রোহের মূর্ত্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। মানবজগতে বিপ্লব ও বিদ্রোহ সংঘটিত না হইলে অত্যাচারী রাজশক্তির হস্ত হইতে উৎপীড়িত প্রজাপুঞ্জের নিস্তার নাই, এই ঐতিহাসিক সত্যকে কবি তাঁহার নাট্য-কাব্যের খাতিরে তৃতীয়াঙ্কে প্রকট করিয়াছেন। ডিমোগর্গন জুপিটরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া প্রমিথিউসকে স্বাধীনতা প্রদান [illegible]। ডিমোগর্গন, জুপিটর ও তাঁহার পত্নী [illegible] পুত্র। জুপিটর ও থেটিসের বিবাহ জাঁকজমকের সহিত সম্পন্ন হইবার পর এই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। আলোচ্য নাট্য-কাব্যের সমালোচক মিঃ স্কডর (Vida D. Scudder) বলেন যে, মানব সমাজে যখন ধর্ম্মবিবর্জ্জিত রাজশক্তি বৃথা আড়ম্বরের আশ্রয় লয় তখন বিদ্রোহ অনিবার্য্য। ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ব্যাখ্যা ছাড়া সমাজের দিক হইতেও আলোচ্য কাব্যের ব্যাখ্যা করা যায়। অস্বাভাবিক উপায়ে সম্প্রদায় বিশেষ চিন্তার স্রোতকে সমাজ সংস্কারের কার্য্যে যদি প্রয়োগ করে ও তদ্দ্বারা সমাজের মধ্যে ধ্বংসনীতির প্রশ্রয় দেয়, তাহা হইলে সেই সম্প্রদায় ধ্বংসনীতির সঞ্চারশক্তি হইতে উৎপন্ন বিপ্লব ও বিদ্রোহের দ্বারা নিজে বিধ্বস্ত হইয়া পড়ে। সেলির প্রতিভা কিন্তু ধ্বংসনীতির পক্ষপাতী ছিল না। কবি নিজে য়ুরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসি বিপ্লবের ফল স্বরূপ ধ্বংসনীতির নিষ্ঠুর শক্তির যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছিলেন। সেলি সেইজন্য প্রেমের মূর্ত্তিময়ী দেবী এসিয়াকে তাঁহার অতুলনীয় কল্পনার সাহায্যে সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রেম ও বিদ্রোহের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিয়া সেলি প্রমিথিউসের উদ্ধার সাধন করিলেও ইতিহাস যে কবে বাস্তব জগতে কবির উপদেশ কার্য্যে পরিণত হইতে দেখিবে, তাহা আমরা জানি না। তবে, কবির কল্পনার যদি কোনও অর্থ থাকে তাহা হইলে এসিয়া একদিন প্রেমের শক্তির পরিচয় নিশ্চয় দিবে, কারণ প্রেমের বার্ত্তা লইয়া এই এসিয়াতেই যুগে যুগে মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। "ইস্লামের বিদ্রোহ" (The Revolt of Islam) নামক কাব্যে সেলি এসিয়ার অবতারগণের একটী তালিকা দিয়াছেন।

"And Oromaze Joshua and Mahomet,
Moses and Budh, Zerdusht and Brahm, and Foh,
A tumult of strange names, which never met
Before, as watchwords of a single woe,
Arose. Each raging votary 'gan to throw
Aloft his armed hands and each did howl
"Our God alone is God !"

সেলির কল্পনা ভারতবর্ষের আশে পাশে ঘুরিয়া ফিরিয়া কেমন যেন একটু স্ফূর্ত্তি অনুভব করে। কবি ভারতবাসী এক দস্যুর জীবনেতিহাস নাটকাকারে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু নাটকখানি অসমাপ্ত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। ভারত মহাসমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে একটী দ্বীপে এক মায়াবিনী বাস করিত। সে ভারতবাসী এক দস্যুর প্রাণরক্ষা করে। এই দস্যু অসভ্য হইলেও তাহার প্রকৃতি মহৎ। দস্যু যুবকের প্রতি মায়াবিনী আকৃষ্ট হইয়াছিল। যুবক তাহার পূর্ব্বেকার প্রণয়িনীকে ভুলিয়া গিয়া মায়াবিনীর সহিত বসবাস করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে তাহার পরিত্যক্তা বিরহ-কাতরা প্রণয়িনীর স্মৃতি মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিলে সে সেই দ্বীপ হইতে পলায়ন করিয়া তাহার সহিত মিলিত হইল। দস্যুবৃত্তির খাতিরে আবার সেই যুবক সমুদ্র যাত্রা করিতে বাধ্য হইল। মায়াবিনী সুযোগ বুঝিয়া ঝড় সৃষ্টি করিয়া তাহাকে পুনরায় তাহার অধিকারের মধ্যে আনাইল। এই অসমাপ্ত নাটকে ভারতের যুবক ও মহিলার (Indian Youth and Lady) উক্তি প্রত্যুক্তিতে কামগন্ধ আদৌ নাই। বাস্তবিক, ভারতের নারীর আদর্শ প্রেমের যে চিত্র সেলি এই অসমাপ্ত নাটকে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার তুলনা আজকালকার বঙ্গভাষার গল্প-সাহিত্যে ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এমন কি ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যেও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কবি সেলি আলাষ্টর (Alastor) নামক একখানি নাট্যকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্যের নায়ক কাশ্মীরের

উপত্যকায় ভারত-ললনার যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয়ে আদর্শ প্রেমের মূর্ত্তি আঁকিয়া বসিয়াছিল। সেলির আলাষ্টর কাব্যের সহিত কীট্‌সের এণ্ডাইমিয়ন (Endymion) কাব্যের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। সেইজন্য পূর্ব্বোক্ত কাব্যের কথা কীট্‌স শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করিব। সেলির প্রেম-প্রবণ হৃদয়ে ভারতবর্ষ ও ভারতের নারীর কথা যেভাবে স্থান পাইয়াছে তদ্বিষয় চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। রোমান্টিসিজমের কবি সেলির কাব্যে সঙ্কীর্ণতা ও প্রাদেশিকতার লেশ মাত্র নাই। প্রাচ্য জগতের সৌন্দর্য্য ও প্রেম তাঁহার কবি-হৃদয়ে বিশ্ব-মানবতার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। বাঙ্গালী কবি রবীন্দ্রনাথের কল্পনা সেলির পাঠশালায় সৌন্দর্য্য ও প্রেমের যে ইতিহাস পাঠ করিয়াছিল তাহার প্রভাব তাঁহার গীতি-কবিতার নানাস্থানে অনুভব করা যায়। ইংরাজি কাব্য-সাহিত্য ও আধুনিক ভারতের ভাবরাশির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে জাঙ্গাল প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার স্থাপত্য শিল্পে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আদর্শের আশ্চর্য্য সংমিশ্রণের বিষয় চিন্তা করিলে রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় সৃষ্টি-ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেলি আসিয়ার কণ্ঠে কবিত্বের অমূল্য রত্নমালা অর্পণ করিয়া প্রাচ্য জগতকে ভাব-সৌন্দর্য্যে গরীয়সী করিয়াছেন। কাব্যামোদী ভারতবাসী সেইজন্য তাঁহার নিকট ঋণী। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গীতি-কবিতায় সেলির নিকট শিক্ষিত বাঙ্গালীর এই ঋণ যে কতকাংশে পরিশোধ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

বিসর্জ্জন।

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(৯)

দিন কতকের মধ্যেই কমনীয়ের স্কুল প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। ইতি তাহার দুঃখপূর্ণ দিনগুলা ভুলিয়া গিয়া উৎসাহের সহিত অধ্যাপনার কার্য্যে নিযুক্ত হইল।

মেয়ে মহলে ও পুরুষ মহলে রীতিমত হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। শ্রীনাথ ঘোষের মেয়ে ইতিই যে স্কুলের টিচার পদে নিযুক্তা হইবে তাহা কেহই ভাবে নাই। ইতি দুই একদিন কার্য্যে যাইতে না যাইতে চারিদিকে একথা রাষ্ট্র হইয়া গেল, ও চারিদিকে সমালোচনা নিন্দা চলিতে লাগিল।

তুষার সে শনিবারে বাড়ী আসিলে রেখা বলিল, "তোমরা দুই ভাইয়ে মিলে এসব করছ কি? নিন্দেয় যে কাণ পাতা যায় না।"

তুষার বলিল, "কি করছি?"

রেখা বলিল, "স্কুল বসিয়েছ ভালই করেছ, কিন্তু ইতিকে টিচার করেছ কেন? গ্রামের গৃহস্থ ঘরের মেয়ে, সবাই যে ছি ছি করছে। মার কাছে নিত্য না হোক কত যে কথা আসছে তা' আর কি বলব। আর কি টিচার পেতে না তোমরা ইতিকে ছাড়া? একটা সার্কুলার দিলে যে হাজার হাজার ম্যাট্রিক টিচার পেতে।"

তুষার গম্ভীরমুখে বলিল, "তা এতে হয়েছে কি? আমি ইচ্ছে করলে এল-এ, বি-এ পাশ করা টিচার আমার স্কুলে আনতে পারতুম, কিন্তু তা' তো আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি চাই আমাদের ঘরের মতন শিক্ষা দেওয়া, বিলাতীর ধাঁজ তাতে যেন না থাকে। আমাদের ঘরের মেয়েরা বাইরের সমাজে মিশতে চাবে না, স্বাধীন ভাবে চাকরী করতে যাবে না, তারা থাকবে ঘরে। ঘরের মতন শিক্ষা দেওয়া ও-সব টিচারের কর্ম্ম নয়। তারা দেখবে উপরটা, ভেতরটা তো দেখবে না। মুখস্থ পড়াগুলো কেবল গড়গড় ক'রে ব'লে যেতে পারলেই তারা মনে করে পড়া শেষ হয়ে গেল, তার ভেতর কিছু রইল কি না রইল, তা' তারা দেখবে না। আমরা নূতন ধরণে স্কুল করেছি, নূতন প্রণালীতে এ স্কুল চলবে, অথচ এর কোন মেয়েই সভ্যতার শিক্ষায়

পেছিয়ে পড়বে না। আমাদের স্কুলের মেয়ের বিশেষত্ব হবে এইটে যে, তারা নিজের ঘরের পানে তাকিয়ে রাষ্ট্র ব'লে নাক সিঁটকাবে না, জুতো পায়ে দিয়ে আবার জুতো খুলে ধুলোর পা দিতে হবে ব'লে কেঁদে উঠবে না, আমাদের প্রতিমাকে মাটির ঠাকুর ব'লে শিউরে উঠবে না। এসব শিক্ষার টিচার চাই আলাদা। আমি ইতিকে অনেকদিন ধ'রে পরীক্ষা ক'রে তাকেই যোগ্য ব'লে নির্ব্বাচন করেছি। সে টিচার হয়ে থাকবেই, এতে যার ইচ্ছে হয় মেয়ে দিক স্কুলে, যার ইচ্ছা না হবে সে মেয়ে দেবে না, তাতে আমার কিছু এসে যাবে না। আর তুমিও তো ইতিকে চেনো রেখা, অনুভব কর দেখি একবার সে কেমন মেয়ে, কি রকম গর্ব্বিত অথচ সরল পবিত্র মন তার।"

রেখা বলিল, "সে আমি জানি। সে যেমন আকাশের মত উঁচু, আবার ধূলার মত নীচু, বিনয়ী, শান্ত। সে অনাহারে মরবে তবু আত্মসম্মান হারাবে না, আবার যদি দরকার হয় আমাদেরই দরজায় ভিখারীর মত হয়ে বিনা স্বার্থে আমার কাজ ক'রে দিয়ে যাবে। তার মত মেয়েকে যে লোকে কোন রকমে নিন্দে করবার সুযোগ পায় এইটেই আমার কাছে বড় দুঃখের কথা।"

সে সব কথা এইখানেই মিটিয়া গেল।

সোমবারের দিন স্কুল যখন রীতিমত বসিয়া গিয়াছে, তখন বৃদ্ধা শাশুড়ীকে লুকাইয়া রেখা কোলের মেয়েটীকে লইয়া সতীর সঙ্গে একেবারে স্কুলে গিয়া উপস্থিত। ইতি তখন ব্ল্যাক-বোর্ডে গোটাতিনেক অঙ্ক লিখিতেছে। রেখাকে দেখিয়া তাহার মলিন মুখখানা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি অঙ্ক দিয়া তাহাদের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, "এই যে তুমি এসেছ বউদি, অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি। এই বুঝি কমলা'র মা ?"

রেখা একটু হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, এটী আমাদের নতুন মা। বোধ হয় শুনেছ—ঠাকুরপো কোথা হ'তে তাঁর এই মা-টীকে এনেছেন ?"

"শুনেছি" বলিয়া ইতি হাত বাড়াইয়া রেখার মেয়েটীকে কোলে টানিয়া লইল। সেই ছয় মাসের মেয়েটীকে সে ভোলা করিয়া চুমো খাইয়া হাসাইয়া কাঁদাইয়া অস্থির করিয়া তুলিল।

রেখা বলিল, "স্কুল বেশ চলছে দেখছি, অনেক মেয়ে যে এদিকে এসেছে। লোকে কথা বলতে, নিন্দে করতেও ছাড়ে না, আবার মেয়ে পাঠাতেও ছাড়ে না। শুধু পাড়াগাঁয়ের কেন, সহরের লোকগুলোর মধ্যেও এ সংক্রামক ব্যারামটা বেশ আছে। এতে কি তুমি দুঃখ পেয়েছ ইতি ? কিন্তু এ লোকগুলোর কথায় আদতে কান দিয়ো না বলছি, এরা চায় না যে কারও ভাল হয়।"

ইতি হাসিয়া বলিল, "দুঃখ ? না বউদি, দুঃখ পাই নি, কিন্তু বড় হাসি পায়। যাক, আমার কাজ তো আমি করে যাব, যার যা' খুসি তাই ব'লে যাক। তোমরা আমায় ভাল বোলো, তোমরা আমায় সুচোখে দেখো, কারণ তোমাদের সঙ্গেই আমার সম্পর্ক এখন। বেশ মেয়েটী হয়েছে তোমার বউদি, বড্ড হাসে। দেখ না, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি, আর এ আমার মুখের পানে তাকিয়ে কেবল হাসছে। তোমার বড় খুকি এর মধ্যে বর্ণপরিচয় শেষ করেছে—তা' দেখেছো বোধ হয় ?"

সে সব প্রসঙ্গ চাপা দিবার তাহার এই চেষ্টা দেখিয়া রেখাও আর সে সব কথা তুলিল না; বলিল, "দেখেছি বই কি। সে তোমায় বড্ড ভালবাসে ভাই। বাড়ীতে যতক্ষণ থাকে, কেবল তোমার কথা, আর কেবল দৌড়াবে তোমার বাড়ী। ছেলে পুলেকে বশ করতে জানো খুব। তোমারই তো এতদিন ছেলে মেয়ে হ'তে পারত—যদি না—"

তাড়াতাড়ি ইতি বলিয়া উঠিল, "না ভাই বউদি, আমি বেশ আছি। এই তো আমার কত মেয়ে, দেখ সব্বাই আমায় পিসীমা, মাসীমা ব'লে ডাকছে। আমি এদের বড্ড ভালবাসি, এরাও আমায় বড্ড ভালবাসে। নিজের হ'লে কি এমন ক'রে সবাইকে ভালবাসতে পারতুম বউদি, না সবাইকে আপন ব'লে কোলে টানতে পারতুম ? তোমার নিজেকে দিয়েই বল, আগে নিজের ছেলেটীকে মেয়েটীকে দেখ তবে তো অন্যকে দেখ, বল মিথ্যে কথা বোলো না।"

রেখা ও সতী হাসিতে লাগিল। রেখা বলিল, "সে কথা সত্যি ভাই। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি এমনি ক'রে পরের ছেলে মেয়ে নিজের ক'রে সুখে যেন

দিন কাটাতে পার, এর মত সুখ আর কিছুতেই নেই। আচ্ছা যাও, আমরা আর দেরী ক'রে তোমার কাজের ক্ষতি করব না, আমরা এখন চলছি।"

ইতি বলিল, "একটা কথা বউদি—"

গমনোদ্যত রেখা ফিরিয়া দাঁড়াইল, "কি কথা ?"

ইতি অনিচ্ছার সঙ্গে বলিল, "আমি বেশী দিন স্কুল চালাতে পারব না—আমার শরীর ভারি খারাপ বোধ হচ্ছে। তুমি বড়দাকে বোলো আর একটী টিচারের যোগাড় করতে। আর একটা কথা—"

সে থামিয়া গেল দেখিয়া রেখা বলিল, "কি কথা বল।"

ইতি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "বড়দা একদিন মণিকে বলেছিলেন তিনি নিজে শ্যামাপদ বাবুর কাছে জিজ্ঞাসা ক'রে সিঙ্গাপুরে পত্র দেবেন, কিন্তু দেন নি বোধ হয়, সময় পান নি।"

রেখা খানিক হাঁ করিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "সে স্বামীকে এখনও তুমি চাও ইতি ? সে জীবনে কখনও সিঙ্গাপুর দেখেছে ? শ্যামাপদ বাবু যে মিথ্যা কথা ব'লে বিয়ে দিচ্ছিলেন, তা' তুমি এখনও জান না ?"

ইতি খানিক স্পন্দনবিহীনা দাঁড়াইয়া থাকিল—"না, আমি জানি নে।"

কমনীয় যে কথা শুভ্রার নিকট শুনিয়াছিল তাহা গোপনে দাদাকে বলিয়াছিল। দাদা সে কথাটা কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া স্ত্রীকে বলিয়া ফেলিয়াছিল, তাহার পর সাবধানও করিয়া দিয়াছিল এ কথা যেন জনপ্রাণী না শুনিতে পায়। যদি অন্য কেহ শুনিতে পায় ইতির সমাজে দাঁড়ানো দায় হইবে, যদি ইতি শুনিতে পায়, সে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কিন্তু রেখা তাহা কোনমতে গোপন করিতে পারে নাই, সে নিজের দাসীকে আজই কথাটা বলিয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল, এখন ইতিকেও সব বলিয়া ফেলিল।

ইতি শক্ত কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার চোখের পলক পড়িতেছিল না, তাহার নিশ্বাসও যেন রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল।

তাহার ভাব দেখিয়া রেখা ভয় পাইয়া গেল, তাহাকে একটা ধাক্কা দিয়া সভয়ে ডাকিল—"ইতি।"

একটা সুদীর্ঘ শ্বাস টানিয়া লইয়া ইতি মলিন হাসিল, "ভয় নেই বউদি, আগুনে পুড়েছিল সব জায়গাটা, একটু বাকি বোধ হয় ছিল, তাই দেখছিলুম কেমন ক'রে সে জায়গাটাও পুড়ে যায়। ফুরিয়ে যায় সবই। সর্ব্বনাশ যার হয় তার সব দিকেই সর্ব্বনাশ হয়, কিছু অবশিষ্ট আশাপ্রদ থাকতে পারে না যা' সে মুঠো ক'রে ধ'রে অন্ততঃ পাঁচ মিনিটের জন্যেও একটু শান্তি পেতে পারে।"

রেখা বলিল, "কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এ খুব ভালই হয়েছে।"

শান্ত কণ্ঠে ইতি বলিল, "ভাল ? হ্যাঁ, ভাল হয়েছে বই কি বউদি। আমি কায়স্থ, সে জাতিতে তেলি; সে চোর, ডাকাত, সে যাবজ্জীবনের জন্যে দ্বীপান্তরে গ্যাছে। একটা রাত্রের জন্যে এসে সে আমার কাছ হ'তে কতটা ভক্তি পেয়ে গ্যাছে তা' তোমরা জানবে কি বউদি ? লোকে তাকে নিষ্ঠুর বলেছে, রাক্ষস বলেছে, কিন্তু আমার চোখে সে রাত্রে সে দেবতার মতই হয়ে এসেছিল। আমি সম্পূর্ণ অকুণ্ঠিত চিত্তে আত্মসমর্পণ করেছিলুম। বউদি, বিয়ে হয় সবারই, কিন্তু আমার মতন এমন ভয়ানক অথচ পরম শান্তিদায়ক বিয়ে বুঝি জগতে কারও হয় নি। সে রাত্রে আমি জানতে চাইনি কে সে, কোথা হ'তে এল, আমায় কোথা নিয়ে যাবে। আমায় নিয়ে যেতে উদ্যত হয়েও সে যখন চলে গেল তখনও আমি ভাবিনি সে আর আসবে না। প্রতিদিন প্রতিক্ষণ আমি তার অপেক্ষা করছি, আমার মনে আছে সে আসবে, সে আমায় নিয়ে যাবে। যে সেই একটী রাতে আমায় চিরজন্মের মত উদ্ধার ক'রে গ্যাছে, সে আমায় যেখানে নিয়ে যাবে আমি সেখানে যাবার জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলুম। আজ আমার সে প্রস্তুত হয়ে থাকা অনর্থক বুঝতে পারলুম। জানলুম সে ঘৃণিত চোর, সে দ্বীপান্তরবাসী, কিন্তু তবু বউদি, তবু সে যে সেই একটা রাতে আচমকা বাতাসের মত আমায় ছুঁয়ে আমায় তোমাদের পাশে বিবাহিতা নামে খ্যাত ক'রে রেখে গ্যাছে, সে কথা মনে ক'রে কোনও দিনই তাকে প্রণাম করতে ভুলে যাব না।"

ধীর মন্থর পদে সে অন্য গৃহে চলিয়া গেল। বিস্মিতা রেখা সতীর সহিত—যেমন গোপনে আসিয়াছিল তেমনি গোপনে বাড়ী ফিরিয়া গেল।

(১০)

সেবার তুষার বাড়ী আসিলে মা ধরিয়া বসিলেন কাশী যাইবেন। এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন, আর বেশী দিন বাঁচিবেন না। যে কয়টা দিন বাঁচেন কাশীতে যাহাতে থাকিতে পান তুষারের কাছে তিনি তাহাই বারবার বলিতে লাগিলেন।

তুষার অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িল। কোনও মতে মাতাকে সে বুঝাইতে পারিল না, তাহার চোখের জল ব্যর্থ হইয়া গেল। হার মানিয়া সে কমনীয়কে গিয়া ধরিল, "লক্ষ্মী ভাইটি, তুই একটু চেষ্টা কর যাতে মা আমাদের ফেলে কাশী চলে না যান। একটু বুঝিয়ে বলগে যা সেখানে কে দেখবে শুনবে, বুড়ো বয়সে এখন নিজের হাতে রেঁধেও খেতে পারবেন না। অসুখ বিসুখ হ'লে আরও মুস্কিল বাধবে। যা ভাই, তুই যদি বুঝিয়ে রাখতে পারিস মাকে।"

কমনীয়কে গৃহিণী পুত্রের ন্যায় ভাল বাসিতেন। কমনীয় আসিয়া যখন তাঁহার নিকট প্রার্থনা পেশ করিল, তখন তিনি কেবল হাসিতে লাগিলেন। কমনীয় সাহস পাইয়া বলিল, "হাসছ যে মামী মা ?"

গৃহিণী বলিলেন, "হাসছি তোদের ছেলেমানুষি দেখে। তুষারের তিন চারিটি ছেলে মেয়ে হ'ল, এখনও সে যেন সেই ছেলেমানুষটি রয়েছে। মায়ের কাছে বসে মায়ের হাতে সে ভাত খাবে, দেখে তার ছেলেরা পর্য্যন্ত হেসে গড়াগড়ি দেয়। হ্যাঁরা কম, আর কি ছেলেমানুষি করবার বয়েস আছে তোদের ? তুই যেন বিয়ে করলি নে, নইলে এতদিন তুইও যে ছেলের বাপ হতিস্ রে। যত বুড়ো হচ্ছিস তোরা, ততই যেন ছেলেমানুষ হচ্ছিস। এখন এক একটা সংসারের মাথা তোরা, আমার মায়ায় এখনও জড়িয়ে থেকে কাঁদবি আমি কাশী যাব শুনে ? আমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, চিরটা কাল সংসার সংসার ক'রে মরেছি, একমুহূর্ত্ত অবকাশ পাইনি হাঁফ ফেলবার, এখন বউমা মানুষ হ'ল, তোরা মানুষ হ'লি, আমায় জীবনের শেষ কয়টা দিন একটু বিশ্রাম নিতে দে। এখনও আরও জড়িয়ে রাখতে চাস আমায় ?"

কমনীয় আর বাধা দিতে পারিল না, "যাও মা যাও, কিন্তু সেখানে তোমার খাওয়া-দাওয়ার বড্ড কষ্ট হবে যে, আর অসুখ বিসুখ হ'লে কে তোমায় দেখবে ?"

সতী গৃহমধ্য হইতে উত্তর দিল,—"আমি।"

বিস্মিত কমনীয় মুখ ফিরাইয়া দেখিল প্রসন্নবদনা সতী বাহির হইয়া আসিতেছে। কমনীয় বলিল, "তুমি যাবে মা ?"

সতী বলিল, "হ্যাঁ বাবা, সংসার আর আমার ভাল লাগছে না তাই বাবা বিশ্বনাথের চরণে আশ্রয় নিতে চাই। প্রাণ আর ভার বইতে চাচ্ছে না। শান্তি তো আর কোথাও পেলুম না বাবা, দেখি গিয়ে, বাবার কাছে যদি শান্তি পাই। তোমার মামীমার জন্যে তোমাদের কিছু ভাবনা নেই, ওঁর ভার আমি সব নিচ্ছি।"

কমনীয় তুষারের নিকট গিয়া জানাইল গৃহিণী কিছুতেই তাহার সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না, তিনি যাইবেনই।

বিশুষ্কমুখে তুষার বলিল, "কিন্তু মার সঙ্গে কে যাবে—কে থাকবে তাঁর কাছে ?"

কমনীয় বলিল, "মা যাবেন বলছেন তাঁর সঙ্গে।"

তুষার বিস্মিত সুরে বলিল, "কে, সতী মা ?" সে সতীকে সতী-মা বলিয়া ডাকিত।

কমনীয় বলিল, "হ্যাঁ, তিনিই।"

তুষার প্রফুল্ল হইয়া বলিল, "তিনি যদি যান তা' হ'লে তো খুবই ভাল হয়।"

যাওয়ার বন্দোবস্ত সব ঠিক হইয়া গেল। গৃহিণী নিজের থান তিনেক কাপড়, সতীর থান চারেক কাপড়, গামছা বাক্সে ভরিয়া ঠিক হইয়া লইলেন। কমনীয় তাঁহাদের রাখিয়া আসিতে যাইবে, সেও প্রস্তুত হইয়া লইল।

সতীমাকে ছাড়িতে হইবে শুনিয়া রেখার ছেলে মেয়েগুলি আগে হইতেই কান্না জুড়িয়া দিয়াছিল। সতী এই কয়েক মাস থাকিয়া তাহাদের ভারী বাধ্য করিয়া ফেলিয়াছিল, মায়ের কাছে তাহারা কেহই যাইত না, দিনরাত সতীর কাছে থাকিত।

বিদায় মুহূর্ত্তে তাহাদের রোদনে সতীর চোখ ছলছল করিতে লাগিল। রেখা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "সতী মা, দু'দিনের জন্যে এসে ছেলে মেয়েগুলোকে এ কি করে গেলে? এখন আমি এদের রাখব কি ক'রে? তুমি তো বেশ চললে, এখন আমি কি করব?"

সতী সজল নেত্রে এক একটী করিয়া তিনটী ছেলে মেয়ে বুকে টানিয়া ললাটে স্নেহ চুম্বন দিয়া ছাড়িয়া দিল। কোলে মেয়েটী দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁধের উপর মাথাটা রাখিয়া পড়িয়া রহিল। মাত্র আট নয় মাসের সে, তবুও শিশু বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছিল সতী চিরকালের জন্যই চলিয়া যাইতেছে, আর সে আসিবে না। সতীর চোখ দিয়া অজস্রধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। গৃহিণী রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "আর কেন মা যাওয়ার সময় মায়া বাড়াচ্ছ? ওকে দিয়ে দাও বউমার কাছে।"

সতী চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "সব মায়া কাটিয়েও শিশুর মায়ায় জড়িয়ে পড়লুম মা, এ বাঁধন কাটা যে বড় শক্ত। ভগবান সব নিয়ে আবার কোথা হ'তে এই দেব-শিশুদের দিলেন আমায়?"

রেখা জোর করিয়া তাহার কোল হইতে মেয়ে লইল, সে ভীষণ রোদন আরম্ভ করিয়া দিল। চোখ মুছিতে মুছিতে গৃহিণী সতীর হাত ধরিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন।

তুষার মায়ের পদধুলা লইয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল, "মা, আর আসবে না তুমি?"

মা ছেলের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "আসব বই কি বাবা! তোমার বড় ছেলের যখন বিয়ে হবে, মেয়ের যখন বিয়ে হবে, তখন আবার আমি আসব।"

তুষারের চোখ দিয়া টপটপ করিয়া দুফোঁটা জল পড়িয়া গেল, সে বলিল, "আমি মা দু'মাস বাদেই তোমার কাছে যাব, তোমায় ছেড়ে বেশীদিন আমি থাকতে পারব না।"

মার চোখেও জল আসিতেছিল, সামলাইয়া হাসিয়া বলিলেন, "তাই যাস্। পাগল ছেলে, এখন মনে করছিস মাকে ছেড়ে এক দণ্ড থাকতে পারবি নে, ক্রমে সবই অভ্যেস হয়ে যাবে বাবা।"

তুষার সতীর পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, "সতী মা, আমি তোমার চেয়ে বয়েসে অনেক বড় হ'লেও তোমার ছেলে, তোমার পায়ের ধূলো নেবার অধিকার আমার যথেষ্ট আছে, তাতে তোমার অত সঙ্কুচিতা হ'বার কারণ কিছু নেই। তোমার হাতে আমার বুড়ো মাকে দিলুম মা, যার যেন একটুও কষ্ট না হয় দেখো। আমায় দু'দিন অন্তর একখানা ক'রে পত্র দিয়ো মা কেমন থাকেন। আমি আমার মাইনে হ'তে একশ টাকা ক'রে প্রতি মাসে তোমার নামে পাঠাব, আর বেশী যা' যখন দরকার পড়বে আমায় জানালেই তা' পাঠিয়ে দেব। সতী মা, তোমাকে বেশী বলা আমার পক্ষে অনাবশ্যক, আমার মাকে তোমার মা ব'লে ভেবো, তেমনি যত্ন কোরো।"

কমনীয়কে আবশ্যকীয় গোটাকত কথা বলিয়া তুষার চোখ মুছিয়া সরিয়া গেল।

একটা ষ্টেশনে গাড়ী বদলের সময় কমনীয় খুব ব্যস্ত ভাবে সতীকে ও গৃহিণীকে মেয়েদের কামরায় তুলিয়া দিতে গিয়াছিল। সেই মেয়ে-কামরায় একখানা পরিচিত মুখ দেখিয়া তাহার হৃদয় চমকিয়া উঠিল, সে বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিল।

হাঁ, সেই তো বটে। এই তো সেই শুভ্রা, সে হাসি মুখে তাহার পানে চাহিয়াছিল, চোখোচোখী হইতেই অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল; কমনীয় তাড়াতাড়ি পাশের কামরায় চলিয়া গেল।

কাশীতে নামিয়া সে যখন গৃহিণী ও সতীকে নামাইতে গেল, তখন আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল শুভ্রা খুব ভক্তির সহিত গৃহিণী ও সতীর পদধূলা লইতেছে। কমনীয়কে দেখিয়াও সে দেখিল না। নিজেই অগ্রসর হইয়া গৃহিণী ও সতীকে নামাইয়া দিল, তাঁহাদের বাক্সটা বাহির করিয়া দিল। নিজেও নামিয়া পড়িয়া ভিড়ের মধ্যে কোন্‌দিকে যে চলিয়া গেল তাহা কমনীয় দেখিতে পাইল না।

বাঙ্গালীটোলায় তুষারের জনৈক বন্ধু পূর্ব্বেই বাসা ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। কমনীয় একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া গৃহিণী ও সতীকে তাহাতে উঠাইয়া দিল।

গৃহিণী বলিলেন, "তুই কোথা বসে যাবি কমু?"

কমনীয় বলিল, "আমি ছাদে যাব।"

গৃহিণী ব্যস্তভাবে বলিল, "না না, ছাদ হ'তে শেষে পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙ্গবি নাকি। গাড়ীর ভেতর আয়, আমরা দুজনে একটা বেঞ্চে বসি, তুই একটা বেঞ্চে বস।"

সতীও ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "তাই এস বাবা। আমরা দুজনেই তোমার মা, তুমি আমাদের ছেলে; আমাদের কাছে তোমার লজ্জা কি বাবা?"

"না, লজ্জা আর কি" কমনীয় এক লাফে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। গাড়ী চলিতে লাগিল।

গৃহিণী সতীর পানে চাহিয়া বলিলেন, "কেমন খাসা মেয়েটী দেখলে? অত বড় যে একটা নামজাদা বাইজি, তবু তার একটু ঠেকার, গুমর কিছু নেই।"

সতী বলিল, "হ্যাঁ, বড্ড নরম স্বভাব মেয়েটীর। আমার বোধ হয় কোনও গেরস্ত ঘরের মেয়ে ছিল, নইলে এমন স্বভাব ওদের মত লোকের কখনও হ'তে পারে না।"

কমনীয় মুখ ফিরাইয়া বলিল, "কে মা, কার কথা বলছ?"

গৃহিণী বলিল, "ওই যে মেয়েটা আমাদের নামিয়ে দিয়ে নিজেও নেমে পড়ল, তারই কথা বলছি। বানু বাইজির নাম শুনেছিস না, আমাদের বড় খোকার অন্নপ্রাশনের সময় যাকে আনতে গেছল, ওই সেই বানু বাইজি। রূপ বটে, যেন মা দুর্গা। সতীমার জেদে পড়ে একটা গানও গাইলে; আহা, সে কি গলা রে কম, তোকে আর তা' বলব কি। লোকে যে টাকা দিয়ে নিয়ে যায় ওকে, তাদের টাকার সার্থক হয় বটে। ভগবানের কৃপা না থাকলে অমন রূপ গুণ কেউ কি পেতে পারে রে?"

কমনীয় বলিল, "ও বুঝি নিজেই নিজের পরিচয় দিলে?"

গৃহিণী বলিলেন, "দূর, তা কেউ কখনো দিতে পারে? আর একটা মেয়ে ছিল, তারই ঝি সে, সেই চুপি চুপি আমাদের বললে, এরই নাম বানু বাইজি।"

কমনীয় একটু নীরব থাকিয়া বলিল, "বানু বাইজি কে বল দেখি?"

বিস্ময়ে গৃহিণী বলিলেন, "বানু বাইজি কে, তা' আমি কি ক'রে জানব বল দেখি? বাইজি—বাইজি ছাড়া আবার কে?"

কমনীয় গম্ভীর হাসি হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "এঃ, তোমার চোখ একেবারেই নষ্ট হয়ে গ্যাছে দেখছি। কোন্ দিন আমাকেই চিনতে পারবে না। সে একটা নামজাদা বাইজি, কখনও তোমাদের দেখেনি—অমনি তোমাদের 'পরে তার এত ভক্তি হয়ে গেল যে সে তোমাদের পায়ের ধুলো পর্য্যন্ত মাথায় দিলে। কত বড় বড় লোকে এক রাত্রে দশ হাজার টাকা গুণে দিয়ে যার কথা শুনতে পায় না, তোমাদের সে একেবারে আপনার মা ক'রে নিলে। একটু সন্দেহও হয়নি, কেন সে এ রকম আত্মীয়তা করছে তা' জানবার জন্যে?"

সন্দেহাকুল হইয়া গৃহিণী বলিলেন, "সত্যি, আমার মনে তখন একটু সন্দেহ হয়নি, তোর কথা শুনে এখন একটু সন্দেহ হচ্ছে বটে। হ্যাঁরা কম, সত্যি ক'রে বল না সে কে?"

কমনীয় বলিল, "মনে করে দেখ দেখি তোমার চেনা কোনও মেয়ের মুখ সে রকম ছিল কিনা? অবশ্য তের চৌদ্দ বছর হয়ে গ্যাছে, আর সে তখন পনের যোল বছরের ছিল। যদিও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে, তবুও দেখলে চেনা যায় একটু চেষ্টা করলে। বল তো কোন্ মেয়ে আমাদের গ্রাম হ'তে কলঙ্কে ঝাঁপ দিতে গ্যাছে?"

গৃহিণী সচকিতা হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "শুভ্রা?"

কমনীয় মুখ ফিরাইয়া বাহির পানে চাহিয়া বলিল, "সেই বটে।"

গৃহিণী খানিক হাঁ করিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, সেই বটে। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই হাসি। কি চোখ আমার, আমি অতক্ষণ হাঁ ক'রে তার পানে তাকিয়ে থেকেও তাকে চিনতে পারলুম না। একবার মনে হ'ল—যেন একে কোথায় দেখেছি, কিন্তু কোথায় যে তা' ভেবে ঠিক করতে পারলুম না। শুভ্রা—সেই শুভ্রা আজ বানু বাইজি? বুঝেছি, সে এইজন্যেই খোকার অন্নপ্রাশনে গান করতে আসেনি। বুঝছি, সে কেন আমাদের গ্রামের প্রত্যেকের কথা বিশেষ আগ্রহ ক'রে জিজ্ঞাসা করছিল।"

কমনীয় চুপ করিয়া রহিল।

একটু থামিয়া স্খলিত কণ্ঠে গৃহিণী বলিলেন, "আহা, আগে যদি দেখতিস্ একটু দাঁড়িয়ে কম, যদি একবার বলতিস্ আমায়, তা' হ'লে আমি আচ্ছা করে ঝাল ঝেড়ে নিতুম। পোড়ামুখী এমনি করেও সর্ব্বনাশটা করলে গা, এমন ক'রেও বাপ-পিতামোর মুখটা হাসালে? সেও কাশীতে এসেছে, এখানে নাকি তার বাড়ী আছে। বললে তার মা আছে নাকি সে বাড়ীতে। নিজের মা মাসীকে তো খেয়েছেন, এখন কাকে মা ব'লে ভক্তি শ্রদ্ধা করছেন কে জানে। মা অন্নপূর্ণা একদিন তাকে আমার সামনে এনে দেন, আচ্ছা শুনানটা শুনাই তা' হ'লে, মনের ক্ষোভটা মিটিয়ে নেই। হ্যাঁরা কম, তুই ঠিক জানিস যে সে শুভ্রা?"

কমনীয় একটু হাসিয়া বলিল, "এখনও তোমার সন্দেহ হচ্ছে নাকি মামীমা?"

গৃহিণী বলিলেন, "না। আচ্ছা, তার নিজের মা নাকি এখানে এসে আছে? তাকে খোঁজ ক'রে আমার কাছে এনে দিবি কম? আমি তাকে বড্ড ভালবাসতুম রে, তাকে নইলে আমার চলত না একদিন। সে যে তার পতিতা মেয়ের কাছে কক্ষনো যাবে না, তা' আমি বেশ জানি। হয় তো সে মাগী ভিক্ষে-টিক্ষে ক'রে কোনও মতে পেটটা চালায়, আর বাবা বিশ্বনাথের পায়ের তলায় পড়ে থাকে। আহা, সে বড় অভাগিনী। কম, দুদিন থেকে তাকে খোঁজ ক'রে আমার কাছে নিয়ে আসিস, আমি তাকে আমার কাছে রাখব, বুঝেছিস?"

কমনীয় কেবলমাত্র বলিল, "বুঝেছি।"

ক্রমশঃ।

ভারতীয় সেবা-ধর্ম্ম ও তাহার দুই বিশিষ্ট রূপ।

(১৩৩০ ভাদ্র সংখ্যার ২৬৭ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি)

[শ্রীসাহাজী]

কর্ত্তব্য দরিদ্রের সেবা,—কিন্তু নারায়ণেরও অধিক—মূর্ত্ত নারায়ণ জ্ঞানে। (১) সুস্থ—যিনি দুঃস্থ নহেন, তাঁহার সেবা করার যেমন প্রয়োজন হয় না, নারায়ণও সেইরূপ পূর্ণ, তাঁহার অভাব নাই, সুতরাং তাঁহার সেবা করাও সেইজন্য সম্ভবপর হয় না। কিন্তু তথাপি ভক্তের তিনি প্রাণের প্রাণ, ভক্ত তাঁহাকে ভালবাসিয়া, তাঁহার সেবা করিয়া সুখী হইতে চাহেন। ভক্তের এই মনোবাসনা পূর্ণ

(১) মহাপুরুষ দুই প্রকার। জীবকোটি মহাপুরুষ দরিদ্রকে নারায়ণ বলিয়া মনে করেন না। তিনি দরিদ্রকে দয়া করেন, এইমাত্র। অবতারকোটি মহাপুরুষ দরিদ্রকে নারায়ণেরও অধিক বলিয়া জানিতে পারেন। দরিদ্রকে তিনি তাঁহার একমাত্র উপাস্য বলিয়া মনে করেন। একের মতে, দরিদ্র জীবমাত্র। জীব অপূর্ণ, নারায়ণের তুলনায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। সুতরাং দরিদ্র সেবার পাত্র নহে, কেন না সে নারায়ণ নহে। অন্যের মতে, দরিদ্র নারায়ণ নহেন সত্য, কিন্তু নারায়ণেরও অধিক তিনি। কেন না, নারায়ণের সেবা গ্রহণ করিবার শক্তি নাই, আছে দরিদ্র নারায়ণের। নারায়ণই ভক্তের সেবা গ্রহণ করিবার জন্য দরিদ্র হন। সুতরাং যে অপূর্ণতার জন্য জীব একের নিকটে অনাদৃত, উহারই জন্য অন্যের নিকটে সে সমাদৃত। ফলতঃ, একজন ভক্তি মুক্তির আকাঙ্ক্ষী, সুতরাং স্বার্থপর, তাঁহার সাধ্যতাই নারায়ণ—যিনি সর্ব্বশক্তিমান ষড়ৈশ্বর্য্যশালী সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ। অন্যজন নিষ্কিঞ্চন, ভক্তি মুক্তিরও আকাঙ্ক্ষা তাঁহার নাই। তাঁহার সাধ্য তাই দরিদ্র—যিনি সেবার যথার্থ যোগ্যপাত্র।

চৈতন্যের জীব + শঙ্করের শিব + তাঁহার জীবত্ব—তাঁহার সেবা লইবার ক্ষমতা। শঙ্করের শিব = চৈতন্যের জীব — তাঁহার জীবত্ব।

বস্তুতঃ, সাধকের যখন "হেয়োপাদেয়তা" বুদ্ধিরহিত নিঃস্বার্থ জীবমুক্ত গতি লাভ হয়, তখন তাঁহার দিব্যদৃষ্টিতে ব্রহ্ম ও কৃমিকীট, ভূমা ও অণু, নারায়ণ ও নর তুল্য হইয়া যায়। প্রেমে আত্মবিস্মৃত নিষ্কিঞ্চন তিনি। তিনি তাঁহার প্রিয়তমের সেবা করিয়াই তৃপ্ত হন। তাঁহার প্রিয়তম কত বড়, গণ্য মান্য সম্পন্ন জগৎধন্য কিনা, সে দিকে তাঁহার লক্ষ্য থাকে না। যথার্থ সতী পতিকে পতি বলিয়াই ভালবাসেন। তিনি রাজা কিনা, তাহা জানিবার তাঁহার প্রয়োজন হয় না। দরিদ্র নারায়ণবাদের তাৎপর্য্য ইহাই।

করিবার জন্যই তাঁহার ভালবাসায় ভুলিয়া, মহান্ নারায়ণ হইয়াও তিনি ক্ষুদ্র দরিদ্ররূপে প্রকটিত হন। পিতা যেমন সম্পূর্ণ সমর্থ হইয়াও পুত্রের মুখের-কাছে-তুলিয়া ধরা পানের খিলিটি স্নেহবশে মুখ বাড়াইয়া গ্রহণ করেন, তিনিও সেইরূপ স্বয়ং পূর্ণ হইয়াও ক্ষুদ্র জীবের ক্ষুদ্র হস্তের সেবা গ্রহণ করিবার জন্য মায়ার সাহায্যে (২) ক্ষুদ্র হইয়া প্রকটিত হন। এই বিশ্বাস হইতেই দরিদ্র নারায়ণবাদের উৎপত্তি। বৃন্দাবনের প্রেমধর্ম্মের মূল সূত্রও ইহাই। কৃষ্ণ সেখানে, নন্দ যশোদার নিকটে, ছোট হইয়া—গোপাল হইয়া যান। কৃষ্ণকে তাঁহারা ঈশ্বর বলিয়া জানেন না। তাঁহারা জানেন, গোপাল তাঁহাদের সন্তান। কৃষ্ণকে ছোট (৩)—আপনাদের সন্তান মনে করিয়া আপনাদিগকে বড়—তাঁহার পিতামাতা বলিয়া ভাবিয়া থাকেন। কেন না, ঐশ্বর্য্য জ্ঞান জন্মিলে মাধুর্য্য বোধ তিষ্ঠিতে পারে না। ইনি আমার ক্ষুদ্র শিশু নহেন, মহান্ ঈশ্বর ইনি,—এই প্রকার বুদ্ধি যদি হয়, তাহা হইলে আর তাঁহার সেবা করা সম্ভবপর হয় না। ত্রিভুবনের ঈশ্বর যিনি, ক্ষুদ্র জীবের সাধ্য কি, তাঁহার সেবা করে? তাই, প্রেমে রসিয়া গলিয়া মজিয়া ভক্তের যখন ঈশ্বরের প্রতি মমত্ব বুদ্ধির উদয় হয়, তখনই তিনি ঈশ্বর সেবার অধিকারী হন, এবং ঈশ্বরও তখন তাঁহার নিকটে ছোট (৩) অথচ বড় আপনার—প্রাণের প্রাণ হইয়া যান। এইজন্যই, ঐশ্বর্য্যবান ঈশ্বর ভক্তের কেহই নহেন, তাঁহার একমাত্র আরাধ্য মাধুর্য্যের ভগবান। ব্রজবাসীদের সেব্য তাই "ঈশ্বর" নহেন,—"কৃষ্ণ"—লীলারসিক নীলমাণিক,—সেবাধর্ম্মের দিক দিয়া, যিনি "ঈশ্বরেরও" অধিক। * *

বিশ্বের এই যে ব্যাপার—যাহা সংসারের নিত্য ঘটনা—ইহাই সেই নিত্য বৃন্দাবনের নিত্য লীলা। সুতরাং জগতে যে যত ছোট, ভক্ত দেখেন, তাঁহার ভগবানই তাঁহার ক্ষুদ্র সেবাগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে কৃতার্থ করিবেন বলিয়াই ঐরূপ ছোট হইয়া প্রকটিত। তাঁহার তখন এই প্রকার দিব্য দর্শন লাভ হয়। এইজন্যই, যথার্থ সেবক তাঁহার সেব্যকে সামান্য এক দুঃস্থের মধ্যে যত বেশী করিয়া পাইতে পারেন, পূর্ণের দিকে বহুদূর অগ্রসর অসামান্য কোন অবতারের মধ্যে তত বেশী করিয়া পাইতে পারেন না। ইনি অবতার, ইঁহার মধ্যে ভাগবতী শক্তির সর্ব্বাধিক প্রকাশ, অথবা ইনি আমাদের পরম হিতৈষী, অতএব ইঁহার বেশী করিয়া সেবা করিতে হইবে,—সেবার ধর্ম্ম এরূপ নহে। এরূপ সেবা ধনীর প্রতি ভিক্ষুকেরই কাঙাল-বৃত্তির অনুরূপ, অথবা উপকর্ত্তার প্রতি উপকৃতের কৃতজ্ঞতা মাত্র। যথার্থ সেবার সহিত কিন্তু নিষ্কিঞ্চন প্রেমের ভাব বিজড়িত। সুতরাং অবতার অথবা নারায়ণ যথার্থ ভক্তের তত বড় ঈশ্বর নহেন, যত বড় ঈশ্বর তাঁহার—দুঃস্থ-দরিদ্র—ধনে জ্ঞানে বুদ্ধিতে শক্তিতে সর্ব্ব বিষয়ে দরিদ্র। * * *

নাস্তিক্যবাদ প্রধান বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বপ্রধান আস্তিক পরমহংসদেবেরও শ্রীমুখের উক্তি তাই,—ঈশ্বর চাহি না, দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করিতে গিয়া যদি অনন্ত নরক হয়, তথাপি তাহাও স্বীকার।—মহাপুরুষের এই মহতী উক্তি আপাতদৃষ্টিতে যতই নাস্তিক-জনোচিত বলিয়া প্রতীত হউক, সেবা-ধর্ম্মের দিক দিয়া ইহার উপযোগিতা কিন্তু অভ্রস্পর্শিনী। ফলতঃ, অবতারবাদ অপেক্ষাও "দরিদ্র নারায়ণ" বাদেই সেবা-ধর্ম্মের বিকাশ সমধিক। ইহাই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মাহাত্ম্য।

এস্থলে আরও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অন্যান্য দেশে যাহা সামান্যতঃ দরিদ্র সেবা মাত্র, আমাদের দেশে তাহা সাধনারই বিষয়। অন্যান্য দেশে দরিদ্রসেবার মূলে স্বার্থ নিহিত। তাহাদের depressed and distressed—অত্যাচারিত এবং উৎপীড়িত ইত্যাকার শব্দের সহিত বিরোধের এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব বিজড়িত।

---

(২) এইজন্যই, শঙ্করের মতে যে মায়া সকল অনর্থের মূল, চৈতন্য কর্ত্তৃক সেই মায়াই বৃন্দাবন-লীলার সংঘটয়িত্রী বলিয়া শ্রীমতী যোগ মায়াদেবী নামে নিত্য পূজিতা। মায়াই সৃষ্টির মূল। শঙ্করের মতে সৃষ্টি তাই নিরর্থক, জগৎ মিথ্যা। চৈতন্যের মতে কিন্তু সৃষ্টি ভগবানের লীলা, জগৎ নিত্য বৃন্দাবন।

(৩) এই যে ভগবানকে ছোট বলিয়া মনে করা—প্রেমের দিক দিয়া ইহা যে আবার কত আপনার, সুতরাং কত বড় বলিয়া মনে করা, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। ভগবানকে প্রেমের দিক দিয়া দেখিলে যেরূপ বোধ হয়, বৈষ্ণবদের "কৃষ্ণ" শব্দে তাহাই অভিব্যক্তি। তাঁহাদের ব্রজ (বৃন্দাবন)—প্রেমের জগৎ।

কিন্তু এদেশে দরিদ্রসেবা নিঃস্বার্থ সেবা মাত্র, ইহার সহিত কোনও রূপ বিরোধের এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভব নাই। ইহা সম্পূর্ণই ত্যাগমূলক এবং ভারতীয় সেবা-ধর্ম্মের ইহাই বিশেষত্ব। বর্ত্তমান ভারতের এই যে পতিত অবস্থা, স্থূল-দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির বিশ্বাস, ইহা ইংরাজেরই সৃষ্টি। এবং এইজন্যই যত অনর্থের উৎপত্তি। কিন্তু যথার্থ সেবক যিনি—অথচ যিনি অলস-প্রকৃতি জড়বাদী নহেন,—ভারতের দুঃখ কাহার সৃষ্টি, সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই, তাঁহার দৃষ্টি গঠনের দিকে। তিনি জানেন, ইংরাজের মধ্যেও যে ভগবান, ভারতীয়ের মধ্যেও তিনিই, সুতরাং ইহা তাঁহারই সৃষ্টি—ইহা তাঁহারই ইচ্ছা (৪)। অর্থাৎ ভারতের ভগবানই তাহার আত্মদান রূপ মহা সেবা গ্রহণ করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিবেন বলিয়াই দুঃস্থ ভারতরূপে অবতীর্ণ আজ। তাই কাহারও সহিত তাঁহার বিরোধ নাই। ভারতীয় জনসেবার ইহা এক অনন্যসুলভ বৈশিষ্ট্য এবং এইজন্যই সেবা আমাদের নিকটে ধর্ম্ম।

সেবা-ধর্ম্মের এই গূঢ় রহস্য বিদিত হইয়া দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য সাধনা করা, বর্ত্তমান যুগে, শুধু ভারতের নহে, সমগ্র জগতেরই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

* * *

কিন্তু তাই বলিয়া গুরু বা অবতারের সেবা করার প্রয়োজন নাই, আমরা এমন কথা বলি না। তবে, যিনি যথার্থ গুরু নহেন, তাঁহার সেবায় ঈশ্বরের সেবা কদাপি হয় না, বরং উহাতে ঈশ্বরসেবারই ব্যতিক্রম হয়। কিন্তু যথার্থ গুরু যিনি, যিনি ভক্তির যথার্থ পাত্র, তাঁহারও অনুচিত ভাবে করিতে নাই। নরপূজার সমর্থন করা কদাপি সঙ্গত হয় না। কেন না, যথার্থ গুরুর স্বরূপ—তাঁহার ব্যক্তি স্বরূপ এবং তাঁহার অতি-মানব স্বরূপ। ব্যক্তিরূপে গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই, উভয়েরই দুই হস্ত, দুই পদ। ফলতঃ, গুরু আমাদের গুরু-পদবাচ্য হন,—তাঁহার অব্যক্ত অতি-মানব স্বরূপে, ব্যক্তি রূপে নহেন। এইজন্য, গুরুর অব্যক্ত সত্তাই তাঁহার যথার্থ স্বরূপ। বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক চৈতন্যদেব, "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, মহাকবি সেক্সপীয়র,—ইঁহারা আমাদের গুরু। অথচ ইঁহারা সকলেই, বহুদিন হইল, গত হইয়াছেন। ব্যক্তি চৈতন্য, ব্যক্তি-বঙ্কিম, ব্যক্তি সেক্স-পীয়রের বিন্দুমাত্রও আজ আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু অব্যক্ত স্বরূপে ইঁহারা চির অমর। ইঁহারা ইঁহাদের ধর্ম্মের মধ্য দিয়া, মন্ত্রের মধ্য দিয়া, কাব্যের মধ্য দিয়া আজিও অমর হইয়া রহিয়াছেন। ব্যক্তি গুরুর মৃত্যু হয়, সদ্‌গুরুর তাই মৃত্যু নাই। সদ্‌গুরু সত্যদ্রষ্টা ঋষি, তাই তাঁহার মন্ত্রই তাঁহার যথার্থ স্বরূপ,—উহা তাঁহার গভীর সত্যদর্শন হইতে প্রাপ্ত বলিয়া। এইজন্যই, গুরু ত্যাগ করা যায়, কিন্তু যথার্থ গুরুর যথার্থ মন্ত্র ত্যাগ করা কদাপি সম্ভবপর হয় না। সুতরাং, গুরুর ব্যক্তিত্ব তত বড় নহে, যত বড় তাঁহার সত্য, তাঁহার উপদেশ, তাঁহার বাণী। এবং সেই সত্যের দ্রষ্টা, সেই উপদেশ ও বাণীর প্রবর্ত্তক বলিয়াই তিনি আমাদের গুরু, অন্যথা নহেন। অতএব, চৈতন্যের মূর্ত্তি যিনি পূজা করেন, তিনি তাঁহার শিষ্য নহেন। প্রকৃত শিষ্য তাঁহার তিনি, যিনি তাঁহার বাণীর অনুবর্ত্তী হন। বিবেকানন্দও তাই বলিয়াছেন, "We must stick to the principle and not to the person." ফলতঃ, ব্যক্তি-গুরুর পদ সেবা করিবার, তিনি অবতার অথবা জগদ্‌গুরু বলিয়া চীৎকার করিবার, তাঁহার মূর্ত্তি গড়িয়া ধূপ দীপ দিয়া আরতি করিবার, তাঁহার পাদুকা লইয়া পত্র পুষ্প দিয়া পূজা করিবার, তত প্রয়োজন নাই, যত প্রয়োজন আছে তাঁহার বাণী—তাহার মন্ত্র সাধনায় আপনার মধ্যে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার, এমন মন্ত্র, এমন বাণী যিনি দিতে পারেন, তিনিই যথার্থ গুরু। আর,

(৪) অলসপ্রকৃতি দুর্ব্বলের মুখে যে "ভগবানেরই ইচ্ছা" ইত্যাকার উক্তি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার সহিত সেবার্থীর এই উক্তির তুলনা হয় না। নিঃশক্তিক তমোগুণীর জড়তা এবং পূর্ণশক্তিক সত্ত্বগুণীর শান্তভাব বাহ্যদৃষ্টিতে একরূপ বলিয়া মনে হইলেও দুইটি কিন্তু বস্তুতঃ এক নহে। পূর্ণশক্তির বিদ্যমানতা অথচ সেই শক্তির শান্ত এবং সংযতভাব, এই প্রকার যে অবস্থা, তাহাই প্রকৃত বৈষ্ণবতা—সত্ত্বগুণের অবস্থা। এই অবস্থায় শক্তির রজোগুণসুলভ প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসপ্রবণতা থাকে না, উহার কার্য্য তখন সম্পূর্ণ গঠনমূলক হয়।

সেই মন্ত্রের সাধনা করিয়া যিনি সিদ্ধ হইতে পারেন, তিনিই যথার্থ শিষ্য। এই প্রকারের সত্যদর্শী গুরুই যথার্থ ভক্তির পাত্র। কেন না, তাঁহার সেবা করিলে উহাতে বিশ্বেরই সেবা করা হয়। প্রকৃত গুরুর যখন অরূপ স্বরূপ, মনুষ্য হইয়াও তিনি যখন অতি-মানব, বিশ্বরূপ কৃষ্ণের ন্যায় তিনি যখন বিশ্বময় বিশ্বপ্রেমিক এবং বিশ্বাত্ম বোধসম্পন্ন, তাঁহার জীবনধারণ যখন "বহুজন হিতায়", তখন তাঁহার সেবা করিলে, উহাতে যে বিশ্বেরই, অতএব বিশ্বেশ্বরেরই সেবা করা হয়, তাহা নিঃসন্দেহ। সংসার-ত্যাগী না হইলে বৈষ্ণবধর্ম্ম সাধনার যোগ্য হওয়া যায় না ভাবিয়া জনসাধারণের চিত্ত যখন ক্ষুণ্ণ হইতেছিল, প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেব তখন আপনার বিরাট সত্তার মাঝে তাহাদের সেই দুঃখ অনুভবকরতঃ বৈষ্ণবধর্ম্মকে সার্ব্বজনীন করিবার জন্য স্বয়ং অবধূত নিত্যানন্দকেই বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে আদেশ করিয়াছিলেন। আকৌমার সন্ন্যাসীর হৃদয় ইহাতে যে কতদূর ব্যথিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। তথাপি প্রভু নিত্যানন্দ কিন্তু গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছিলেন। কেন না, উহা তাঁহার নিকটে জগন্নাথ মিশ্রের পুত্রের আদেশ ছিল না, তাঁহার নিকটে উহা ছিল বস্তুতঃ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের জগন্মঙ্গলকর শুভ আদেশ। তিনি উহা মনুষ্য চৈতন্যের আদেশ বলিয়া বুঝেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, উহা সেই অরূপ চৈতন্যের আদেশ, যে চৈতন্য তৎকালীন বঙ্গের প্রতিজনের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যাঁহার শ্রীমুখ দিয়া তাই তাঁহাদেরই প্রাণের কথা ব্যক্ত হইয়াছিল। অতএব, উহা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তাঁহার নিকটে সেই গুরুরই আদেশ,—যে গুরু বস্তুতঃই "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুরেব মহেশ্বরঃ" অর্থাৎ সর্ব্বভূতে অবস্থিত, সে যুগের সমগ্র বাঙ্গালী জাতির "হৃদিস্থিত"। তাহা শ্রীচৈতন্যের আদেশ পালন করিতে গিয়া প্রভু নিত্যানন্দের কিন্তু সেদিন প্রকৃতপক্ষে সেবা করা হইয়াছিল নিখিল বঙ্গেরই। এই প্রকার, অর্জ্জুনেরও একদিন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন হইয়াছিল, কৃষ্ণের মধ্যেই সর্ব্বভূত অবস্থিত, এই দিব্যদর্শন—কৃষ্ণের মধ্যে কৃষ্ণাতীতের দর্শন তিনিও একদিন পাইয়াছিলেন; তাই শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করিতে গিয়া প্রকৃত পক্ষে সেদিন করা হইয়াছিল তাঁহার বিশ্বেরই সেবা। আজ আবার আমাদের সম্মুখে গান্ধির ভারতরূপ দীপ্তিমান্। ভারতবাসীর প্রাণের কথা তাঁহারই মুক্তকণ্ঠে আজ উচ্চরবে উদ্‌ঘোষিত। তাহাদেরই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা তাঁহারই মধ্যে আজ মূর্ত্তিমতী। ভারতবাসীর স্বরূপ তাঁহারই মধ্যে আজ পরিস্ফুট। ইহাই গান্ধির ভারতরূপ।—আবার, বর্ত্তমান বিশ্বের ভাব গতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, এ যুগের সকলেরই প্রাণের ইচ্ছা, যুদ্ধে অনর্থক কাটাকাটি করিয়া মরিতে না হয়, অথচ যেজন্য যুদ্ধের প্রয়োজন, সেই উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়। মহাত্মার কর্ম্মজীবন এই সমস্যা পূরণেরই জীবন্ত উদাহরণ। ইহাই গান্ধির বিশ্বরূপ।

সুতরাং মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধি নহেন,—এই অতি-মানব গান্ধি যে মহাত্মা নামের, গুরু নামের যথার্থ যোগ্য, তাহা কোনরূপে অস্বীকার করা যায় না। এক্ষণে, ভারতবাসী, তথা বিশ্ববাসী, যদি এই গান্ধির আদেশ পালন করেন, তাহা হইলে তাহাদেরই বাণী তাঁহার মধ্যে মূর্ত্তিমতী বলিয়া প্রকৃত পক্ষে কিন্তু উহাতে তাহাদের নিজেদেরই আদেশ পালন করা হইবে। আর, এই আদেশ পালন করিতে গিয়া প্রকৃত পক্ষে কিন্তু করা হইবে তাহাদের, গান্ধির নহে, ভারতেরই, তথা বিশ্বেরই, সেবা। ইহাই গান্ধির মাহাত্ম্য এবং এইজন্যই, প্রতীচ্য জগৎ তাঁহাকে মহাত্মা খৃষ্টের অবতাররূপে বর্ণনা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। সুতরাং বিশ্বসত্তায় বিলীনপ্রায় এই প্রকার গুরুর সেবা করিলে তাহাতে ভূমারই সেবা করা হয়। ইহারই নাম যথার্থ গুরুর যথার্থ সেবা—যাহা বস্তুতঃ মানবেরই সেবা। এবং যথার্থ শিষ্যই যে এরূপ সেবার অধিকারী, তাহা বলাই বাহুল্য। মনে করুন, জীর্ণকুটীরে এক স্ত্রীলোক কতিপয় শিশুকে লইয়া বাস করেন। উহাদের সকলকেই যদি ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইয়া দেওয়া যায়, তবে উহাই হয় দরিদ্রনারায়ণ সেবা। কিন্তু ঐ স্ত্রীলোক যদি ঐ শিশুদের জননী হন, তবে শুধু তাঁহাকেই ডাকিয়া আনিয়া অন্ন ব্যঞ্জন ধরিয়া দিলে উহাই হয় গুরুসেবা। কেন না, জননীকে দিলে তাঁহার সন্তানদিগকেই দেওয়া হয়, সন্তান-

দিগকে না খাওয়াইয়া জননী নিজে কখনও খাইতে পারেন না। সুতরাং এই যে দেওয়া, ইহা আপাতদৃষ্টিতে জননীকে দেওয়া বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃত পক্ষে কিন্তু ইহাতে ঐ জীর্ণকুটীরে সকলেরই সেবা করা হয়। ইহাই যথার্থ গুরুসেবা। পক্ষান্তরে, ঐ শিশুদের সহিত ঐ স্ত্রীলোকের সম্বন্ধ যদি সত্যিকারের না হয়, তবে তাঁহাকে কিছু দিলে ঐ শিশুরা তাহার ফলভাগী হইবে না। এইজন্য, এই প্রকার মিথ্যা গুরুর সেবা করিলে তাহাতে প্রত্যবায়েরই ভাগী হইতে হয়। Truly seifless and public spirited নহেন যিনি, এমন গুরুর সেবা করিলে ঈশ্বর-সেবারই ব্যতিক্রম হয়। ফলতঃ, নেপোলিয়নের সেবা করার প্রয়োজন নাই, এরূপ নহে। তবে, as a private man তাঁহার সেবা করার প্রয়োজন থাকিলেও উহা গৌণ প্রয়োজন। সাধারণের কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকায় নিজের ব্যক্তিগত কার্য্য করিবার অবসর তাঁহার হয় না এবং এইজন্যই তাঁহার ব্যক্তিগত সেবা করার যাহা কিছু প্রয়োজন। কিন্তু as a public man তাঁহার সেবা করিবার প্রয়োজনই সমধিক, অর্থাৎ যে পরিমাণে তিনি ফেঞ্চ রিপাব্লিকের, তাঁহার সেবা করিবার মুখ্য প্রয়োজন সেই পরিমাণেই। তবে, এই সেবা কিন্তু নেপোলিয়নের সেবা নহে, উহা বস্তুতঃ ফ্রেঞ্চ নেসনেরই সেবা। অবতার-বাদীর যথার্থ সদ্গুরু সেবা এবং রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের দরিদ্রনারায়ণ সেবা যে একই কথা, তাহা এইরূপেই প্রতিপন্ন হয়। উভয় মতের সামঞ্জস্য এইখানেই।

অতএব, যথার্থ গুরুসেবার প্রয়োজন কদাপি অস্বীকার করা যায় না।

* * *

পরিশেষে প্রশ্ন এই, মানব ক্ষুদ্র, তাহার সাধ্য কি, সে "বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর"—অনন্ত জগতের এই অনন্ত জীবের—এই বহুরূপী ঈশ্বরের প্রত্যেকের সেবা করে? সুতরাং তাহার সমগ্র ঈশ্বর-সেবার সম্ভাবনা নাই (৫) এবং এই হিসাবে অনেকে সেবা ধর্ম্মকে অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ, এইভাবে বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, অনন্ত বিশ্বের সমস্ত জীবের অর্থাৎ সমগ্র ঈশ্বরের সেবা করা দূরে থাকুক, তাঁহার ধারণা করিতেও কেহই সমর্থ নহেন। কি ব্রহ্মবাদী, কি দেববাদী, কি আত্মবাদী, কি ভগবদ্‌বাদী, কি ভক্তবাদী, কি দরিদ্র নারায়ণবাদী,—কাহারও গর্ব্ব করিবার অধিকার নাই, তাঁহারা ঈশ্বরের সম্পূর্ণ সত্তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ। এক এক সম্প্রদায় ভগবানের সত্তা এক এক ভাবে উপলব্ধি করেন, এইমাত্র। ভগবানের ইতি নাই। ভূমা তিনি। ক্ষুদ্র মানবের সাধ্য নাই, তাঁহার অন্ত পায়। তবে "চীনির পাহাড়ের একদানা পাইলেই পিপীলিকার ভরপুর হইয়া যায়।" সুতরাং ক্ষুদ্র মানবের ইহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই। বিশেষতঃ, এই যে ভগবানকে পূর্ণরূপে না পাওয়া, ইহা নিরর্থক নহে। তাঁহাকে পূর্ণরূপে না পাওয়ার জন্য এই যে অতৃপ্তি, ইহাতেই সুখ, ইহাতেই ভূমার সার্থকতা। এই না-পাওয়াই ভবিষ্যতে তাঁহাকে আরও বেশী করিয়া পাইবার সম্ভাবনা সূচনা করিয়া দেয়। প্রেমিকেরও তাই প্রণয়ীকে ভালবাসিয়া তৃপ্তি হয় না, "লাখ লাখ জনম হিয়ায় হিয়ায় রাখনু, হিয়া না জুড়ন গেল"—তাঁহার এই দশা হয়। "কৃষ্ণ প্রেম" তাই "তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ,"—"মুখ পুড়িয়া যায়, প্রাণ কিন্তু তবু ত ছাড়িতে চায় না।" তাই "প্রিয়ার আগমন-পথের প্রত্যেক ধূলিকণা যদি চক্ষু হয়, তবে তাহাকে সেই অনন্ত

(৫) অনেক সাধুর মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়, "তোমরা মুখে বলিতেছ জীব সেবা, জীব সেবা, কিন্তু কয়জন জীবের সেবা করিতে সমর্থ তোমরা?"—তাঁহাদের এরূপ কথা বলিবার অভিপ্রায় কি, জানা কঠিন। তবে, তাঁহাদিগকেও জিজ্ঞাসা করা যায়, 'আপনারা মুখে ব্রহ্ম ব্রহ্ম, ঈশ্বর ঈশ্বর করিতেছেন সত্য, কিন্তু ব্রহ্মের অথবা ঈশ্বরের কতটুকু জানিতে সমর্থ আপনারা?" পরমহংসদেব বলিতেন, "হাঁস-পাতাল কর আর যাহাই কর, জীবের দুঃখ দূর হইবার নহে। তবে, জীবের সেবা করিতে গিয়া তোমার আত্মার যে উন্নতি হয়, উহাই তোমার পরম লাভ।" ফলতঃ, শুধু দরিদ্র-নারায়ণবাদের নহে, সকল মতেরই সার্থকতা ইহাই। তুমি যতই ব্রহ্ম সাধনা কর, ব্রহ্মের তাহাতে কিছুই আইসে যায় না, তোমার আত্মারই শুধু উন্নতি হয়, এইমাত্র। তবে, সেবাধর্ম্ম কর্ম্মমূলক, এইজন্যই উহার দোষ গুণ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কাজেই, উহার বিরুদ্ধে কিছু বলা যত সহজ, অন্যান্য ভাব-সাধনা সম্বন্ধে কিছু বলা তত সহজ নহে।

চক্ষু দিয়া দেখিয়া—দেখিয়া—দেখিয়াও আশা মিটে না, তৃপ্তি হয় না।” সুতরাং, এই যে ভগবানকে পূর্ণরূপে না-পাওয়া, ইহা কিন্তু এক হিসাবে বেশী করিয়াই পাওয়া, কেন না, তাঁহাকে যখন পূর্ণরূপে পাওয়া যায় তখন পাওয়ার শেষ হইয়া যায়, এবং সেরূপ স্থলে সেই পাওয়াই হয় যথার্থ না-পাওয়া অথবা অতি অল্প করিয়া পাওয়া। ফলতঃ, প্রেম একদিক দিয়া পূর্ণকে ক্ষুদ্র করিয়া, আবার অন্যদিক দিয়া সেই ক্ষুদ্রকেই পূর্ণ করিয়া—নারায়ণকে দরিদ্র করিয়া, আবার সেই দরিদ্রকেই নারায়ণ করিয়া, দেখিবার শক্তি প্রদান করে। ইহাই প্রেমধর্ম্মের বৈচিত্র্য—সেবাধর্ম্মের মাহাত্ম্য। বিশেষতঃ, বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আরও ভাবিয়া দেখিবার বিষয় এই যে, অল্পের সার্থকতা নাই সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া অল্প নিরর্থকও নহে। মানব ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু তথাপি ভূমার অংশ সে। সুতরাং তাহার কোন কার্য্যই ক্ষুদ্র হইতে পারে না। সকলের সঙ্গেই তাহার যখন যোগ, তখন সে যাহাই করুক, তাহার ফলভাগী সে এবং তাহার আবেষ্টনের মধ্যবর্ত্তী যাহারা তাহারাই শুধু করে না, সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্মভাবে সকলেই তাহার কৃতকার্য্যের ফলভোগ করে। অতএব, সে যাহাই করুক, তাহাতে তাহার অনন্তেরই সেবা করা হয়। বাঙলাদেশের এক কাঠা ভূঁই মাটিতে সে জন্মিয়াছে, সুতরাং সে ক্ষুদ্র; তাই, সেই এক কাঠা ভূঁই মাটিতে যাঁহারা বাস করেন, সে শুধু তাঁহাদের সেবা করিয়াই তৃপ্ত হয়। কারণ, তাহার সেই এক কাঠা ভূঁই মাটির সঙ্গে যখন সমস্ত বাঙলাদেশের যোগ, তখন নিখিল বাঙলাই তাহার জন্মভূমি। সেই এক কাঠা ভূঁই মাটিতে যাঁহারা বাস করেন, সে শুধু তাঁহাদেরই সেবা করিলেও তাঁহাদের যখন নিখিল বঙ্গবাসীর সঙ্গে যোগ তখন সে প্রকৃত পক্ষে নিখিল বঙ্গবাসীরই সেবা করে। একের ভাব অন্যে পায়, তাহার নিকট হইতে অন্যে আবার সেই ভাব গ্রহণ করে, এইরূপে একজনেরই ভাব বাঙলার সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সুতরাং সে ক্ষুদ্র নহে। পিতার ভাবও এইরূপে পুত্র পৌত্রাদি বংশ-পরম্পরা অনন্ত যুগ ধরিয়া বিস্তৃত হয়। সুতরাং পিতা যিনি, ক্ষুদ্র হইয়াও মহান্ তিনি। এই হিসাবে, স্ত্রীপুত্রাদি পরিজন, অবতারাদি মহাপুরুষ অথবা দরিদ্র-নারায়ণ, যাহারই সেবা করা যায়, কায়মনোবাক্যে নিঃস্বার্থ হইয়া যদি একজনেরও সেবা করা যায়, এক হিসাবে তাহাতে সমগ্র ঈশ্বরেরই সেবা করা হয়। কি ব্রহ্মবাদ, কি ভক্তিবাদ, কি দরিদ্র-নারায়ণবাদ, সকল মতই একদিক দিয়া যেমন সম্পূর্ণ, অন্যদিক দিয়া আবার তেমনি অসম্পূর্ণ। সকল মতই সম্পূর্ণ, কিন্তু স্ব স্ব ভাবে। সুতরাং, সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ লইয়া কোনও কথা নাই। আমাদের এত কথা বলিবার তাৎপর্য্য শুধু এই যে, নিঃস্বার্থ সেবকের, নারায়ণ অথবা অবতার তত বেশী সেবার পাত্র নহেন, যত বেশী সেবার পাত্র তাঁহার দুঃস্থ দরিদ্র। দরিদ্র-নারায়ণবাদ এই হিসাবেই অধিকতর সার্থক। বিশেষতঃ, বর্ত্তমান সময়ে জগতের যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে ভগবান্‌কে দরিদ্ররূপে প্রত্যক্ষ করিবার প্রয়োজন যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহা নিঃসন্দেহ। * * * ফলতঃ, ব্রহ্মবাদ, দেববাদ এবং আত্মবাদের যুগ বহুদিন অতীত হইয়াছে। গুরুবাদ ও অবতারবাদের অযথা অন্ধ ব্যাখ্যায় ভারত আজ আচ্ছন্ন। মহাবতারক রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের “দরিদ্র-নারায়ণ”বাদ প্রচারিত হইবার দিন তাই আগত-প্রায়। মানব সাধারণতঃ নিকটে অল্প আয়াসে যাহা পায়, উৎকৃষ্ট হইলেও সে তাহার যথাযথ আদর করে না, দূরের দুর্লভ বস্তুর প্রতিই তাহার অধিক আকর্ষণ হয়। এইজন্যই, সে সর্ব্বপ্রথমে ছুটিয়াছিল নির্গুণ ব্রহ্মবাদের দিকে, কিন্তু তাহাতে তাহার তৃপ্তি হয় নাই। পরে, দেবতায় সে ঈশ্বরের সন্ধান করিয়াছে, বিগ্রহে সে তাহাকেই খুঁজিয়াছে, কিন্তু তাহাতেও সে তৃপ্ত হয় নাই। কেন না, ইঁহাদের সকলেরই পূজা করা যায়, কিন্তু ভালবাসিয়া—সেবা করিয়া তৃপ্ত হওয়া যায় না। শেষে, সে অবতার ও গুরুর মধ্যে ঈশ্বরের অন্বেষণ করিয়াছে; কিন্তু তাহাতেও তাহার পূর্ণ তৃপ্তি হয় নাই। তাই দরিদ্রের মাঝে নারায়ণের সন্ধানে ব্যস্ত সে আজ। দূরের ভগবানকে সে এমনই করিয়াই ক্রমে ক্রমে আপনার করিয়া লইতেছে। আকাঙ্ক্ষা তাহার পূর্ণ হউক। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের যুগবাণী সার্থক হউক। ভারতের সেবাধর্ম্মের জয় হউক।

টান।

[শ্রীদ্বিজপদ মুখোপাধ্যায় বি-এ]

(১)

তরী মোর চল্লো ছেড়ে তীর,
কেন আর কর্‌ছ বল ভিড় ?
যাও ফিরে যাও আপন ঘরে,
চেয়োনা আর পিছন ফিরে,
মান-অভিমান আর কেন গো নয়ন কেন থির ?
তরী মোর চল্লো ছেড়ে তীর।

(২)

তোমার ওই আঁখির কি এক টান,
রেখেছে কুলেই তরীখান ;
খুলে দাও কঠিন বাঁধন,
ফিরাও ফিরাও আকুল নয়ন ;
যাওয়ার কথায় পাচ্ছি ব্যথা চায়না যেতে প্রাণ।
রয়ে যায় কুলেই তরীখান।

(৩)

বিরস বদন অশ্রু-কাতর আঁখি,
ঠোঁট ফোলানো ঐ যে থাকি' থাকি',
আজকে ওগো বিদায় দিনে,
সত্য ভাবের বইছে চিনে ;
বুকের ব্যথা জান্‌ছি তো সব নেইক কিছু বাকী।
বিরস বদন অশ্রু-কাতর আঁখি।

(৪)

ছেড়ে দাও জড়িয়ো নাকো আর,
ফিরে যাও আপন গৃহ পানে,
আজকে প্রেমের সূত্র খুলে,
চলুক তরী দূরের কূলে,
নূতন লাভের নিশান তুলে ফিরবে নূতন টানে।
বিরহের দিনের অবসানে।

মরু-রহস্য।

[শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়]

আমি একজন গ্রীস দেশীয় বণিক। ব্যবসাসূত্রে যখন আমি মিশর দেশে অবস্থান করি, তখন একটা রহস্যের মধ্যে পড়ে, আমার ওপর দিয়ে এমন ভয়াবহ ঘটনার স্রোত বয়ে গিয়েছিল যে, যার ফলে আমি বিশেষ লাভবান হ'লেও—তার সেই বিভীষিকার স্মৃতিটা এখনও পর্য্যন্ত আমার মনে মাঝে মাঝে উঁকি মেরে, আতঙ্কে আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত ক'রে তোলে। সেই লোমহর্ষক ঘটনার কথা, সেই মরু-রহস্যের কথা, আর আমি গোপন ক'রে রাখতে পারছি না,—আজ আমি তা' সকলের কাছে বল্‌ব।

ব্যবসার কাজে মিশরের নানা দেশ ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে, একদিন রাতে একটা মরুভূমির প্রান্তদেশে রাত্রিবাস কর্‌বার জন্যে তাঁবু খাড়া করেছি। গভীর রাত,—চাকরেরা সব ঘুমিয়েছে,—আমার কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না। আমি তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে ঠাণ্ডা বাতাসে একটু পায়চারী করছি, এমন সময় বালির ওপর যেন কার পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। ঘন অন্ধকার, যতদূর দৃষ্টি চলে তাতে কাউকে আমি কোথাও দেখতে পেলাম না। কিছুক্ষণ পরে একটা অস্পষ্ট আর্ত্তনাদ আমার কাণে গেল। যেদিক থেকে আওয়াজ এল, সেদিকে চেয়ে দেখি, একটা লোক দৌড়ে আমার দিকে আসবার চেষ্টা করছে, কিন্তু বালির ওপর তাড়াতাড়ি পা চালাতে পারছে না। সে লোকটা আমাকে দেখতে পেয়েই, একটা ভয়াবহ

চীৎকার ক'রে, সেই বালির ওপরেই অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেল।

তাঁবুর মধ্যে এনে তার মুখে চোখে জল দিতে দিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই তার জ্ঞান হ'ল বটে, কিন্তু তখনও সে ভয়ে কাঁপছে,—তার চক্ষু কোঠরগত, মুখে রক্তের লেশ মাত্র নেই। সে ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টিতে চারিদিক চাইতে চাইতে, যেন কত সঙ্গোপনে, পাগলের মত কত কি কথা আমায় বল্‌তে লাগল;—কখনও একটা মরুদ্বীপের কথা, কখনও ইসমাইলের গুপ্ত সম্পত্তির কথা, আবার কখনও বা যাদু করবার কথা। যদিও তার সব কথাগুলি অসংলগ্ন প্রলাপের মত, কিন্তু আমি তার মধ্যেও সত্যের আভাষ পেয়েছিলাম। বহুকাল এদেশে থাকার দরুণ এই ব্যাপারের কথা আমি ইতিপূর্ব্বে কিছু কিছু শুনেছিলাম; কাজেই বেশ বুঝতে পারলাম, ইসমাইলের গুপ্ত রহস্য জানতে গিয়ে বেচারীর এই দশা ঘটেছে।

কথায় কথায় জানতে পারলাম, এ লোকটি এই মিশর দেশেরই অধিবাসী—নাম আবদুল। বেচারী কথা কইতে কইতে কত যে জল খেলে তার ঠিকানা নেই। ভয়ে অভিভূত হ'য়ে পড়লেও তার কথা কিন্তু বন্ধ হ'ল না,—সে আমার কাণের কাছে মুখ এনে আস্তে আস্তে হাঁপাতে হাঁপাতে ব'লে যেতে লাগল,—"এখান থেকে দক্ষিণ দিকে চার দিনের পথ—একটা মরু দ্বীপ—শাদা পাহাড়—একটা ছোট গ্রাম—ধর্ম্মাত্মা সৈয়দ এবনালাসের বংশ লোপ পায় নি—তারা সব সেই গ্রামে আছে—আমি স্বচক্ষে দেখেছি।" বল্‌তে বল্‌তে আবদুল আমায় ভয়ে জড়িয়ে ধরলে। দেখলুম, সে ভয়ানক কাঁপছে। আমি তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু সে থামল না, আবার বল্‌তে আরম্ভ করলে,—"যদিও আমি নিজের চোখে সে গুপ্ত ধন দেখি নি—আমার স্বকর্ণে তার কথা শুনি নি—আমার হাত দিয়ে তাকে স্পর্শও করি নি—তবুও ইসমাইলের রহস্য আমারই রহস্য।"

আবদুলের কথা শেষ হ'তে না হ'তে, হঠাৎ তাঁবুর বাইরে একটা বিশ্রী শব্দ হ'ল। আমি তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দাঁড়ালাম, কিন্তু এই নিশীথ মরুর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করবার মত কোথাও কিছু দেখতে পেলাম না। গভীর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে যতদূর সম্ভব চারিদিক লক্ষ্য করবার চেষ্টা করছি এমন সময় তাঁবুর ভেতর অতি ভীষণ রকমের একটা বিকট আর্ত্তনাদ হয়ে উঠ্‌ল। সে আর্ত্তনাদ এত তীব্র,—এমন ভীতিপ্রদ যে আমি হতবুদ্ধি হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলাম; কিছুক্ষণের জন্যে আমার চলবার বা ভাববার শক্তি পর্য্যন্ত যেন লোপ পেয়ে গেল। শেষে আর্ত্তনাদ যখন ক্রন্দন রোলে পরিণত হ'ল, তখন আমার এই হতবুদ্ধির ভাবটা যেন কেটে গেল। যতদূর আমার জ্ঞান আছে, তাতে শপথ ক'রে বলতে পারি, আমি কাকেও তাঁবুর ভেতর ঢুকতে বা বেরুতে দেখি নি। তবে এ কি ব্যাপার! এ ব্যাপার কি ক'রে ঘটল! আমি ছুটে তাঁবুর ভেতর ঢুকে, সেখানে যে ব্যাপার দেখলাম, তা' আরও ভীষণ;—সে দৃশ্যের স্মৃতিটা এখনও আমার চোখের সামনে জ্বল জ্বল করছে। বেচারা আবদুলের জিব কাটা,—তার মুখের ওপর রক্তের ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

(২)

আবদুলের দুর্দ্দশা দেখে ইসমাইলের রহস্য উদ্ভেদ করবার জন্যে আমার কেমন একটা জেদ জন্মে গেল। আমি আবদুলের মুখে যতটা বিবরণ শুনেছি, তার ওপর নির্ভর ক'রে, উটের পিঠে খাদ্য দ্রব্যাদি বোঝাই দিয়ে দক্ষিণদিকে যাত্রা করলাম। চারদিন ক্রমাগত মরুভূমির ওপর দিয়ে চলবার পর, একটা মরুদ্বীপের কাছে এসে উপস্থিত হ'লাম। মরুদ্বীপের শেষভাগে দেখতে পেলাম, সেই শাদা পাহাড়। পাহাড়ের একটা সরু খাদের চারিদিকে অনেকগুলো ঝাউগাছ হয়ে আছে। আমি সেই ঝাউগাছের ঝোপের ভেতর উটগুলোকে লুকিয়ে রেখে, গভীর রাতে পাহাড় থেকে নীচে নেমে পড়লাম। মরুদ্বীপের এই ক্ষুদ্র গ্রামটির মধ্যে এমন কিছু বিশেষত্ব নেই,—ছোট ছোট কতকগুলি বাড়ী, একটা বড় মসজিদ, আর অসংখ্য খেজুর গাছ। গ্রামের পশ্চিমদিকে শাদা পাঁচিলে ঘেরা একটা বড় বাড়ী আর তার চারিদিকে বড় বড় বাগান। এই বাড়ীর মধ্যেই যে ইসমাইলের রহস্য লুকোনো আছে, সে বিষয়ে আর আমার কোনও সন্দেহ রইল না।

গ্রামের বাঁ' দিকে অনেকগুলি খেজুর গাছের ঝোপ; কাজেই এই ঝোপের ভেতর দিয়ে অনেকটা নিরাপদে যাওয়া যাবে মনে ক'রে, এই দিক দিয়েই আস্তে আস্তে এগুলুম। গ্রামের কাছাকাছি এসে আমার কুকুরের বড় ভয় হ'ল; কেন না আমি জানি, আরব পল্লীতে কুকুর থাকবেই। আরও খানিকটা অগ্রসর হ'বার পর, যা' ভয় করেছিলাম তাই ঘটল। একদল কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে করতে আমার দিকে আসতে লাগল। আমি সেইখানেই মাটির ওপর শুয়ে পড়লাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, আমার কাছ থেকে প্রায় বিশ গজ দূরে একটা ঝোপের কাছে এসে কুকুরগুলো সব দাঁড়িয়ে গেল, ডাকাও বন্ধ ক'রে দিলে। কেন যে এ রকম ঘটল, তা আমি বুঝতে পারলাম না। যাই হ'ক, এটা আমার একটা সৌভাগ্য বলতে হবে। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে আমি আবার চলতে লাগলাম।

পাঁচিলের কাছে পৌঁছে দেখি, এই মসজিদ, বাগান আর বড় বাড়ীটাকে দূর থেকে যতটা সাধারণ রকমের মনে করেছিলাম, তা নয়;—এগুলো বেশ জমকাল রকমের—দামী পাথরের তৈরী। বাগান ও মসজিদের মাঝে ছোট গলি পথ দিয়ে চলতে চলতে দেখি, বাগানের একটা ছোট্ট দোর হঠাৎ খুলে গেল। এই খোলা দোর দিয়ে ঢোকাটা আমার কেমন নিরাপদ ব'লে মনে হ'ল না। জ্যোৎস্নার আলোকে লক্ষ্য ক'রে দেখলাম, এই পাঁচিলটা খুবই পুরাণ,—অনেককাল সারান হয় নি—ইট পাথরগুলো সব বেরিয়ে আছে। আমার সুবিধাই হ'ল,—আমি পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে বাগানের ভেতর গিয়ে পড়লাম।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আরব পল্লী নিস্তব্ধ ছিল; কিন্তু আমার বাগানের ভেতর ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই, এ নিস্তব্ধতা আর রইল না,—নারী কণ্ঠের সুমধুর গানে বাগানটাকে ছেয়ে ফেললে। এ গানটা আরব দেশের একটা প্রচলিত প্রেমের গান। এই গভীর রাতে এমন সুললিত প্রেমের গানে আমার মনটাকে এক সঙ্গে যেন ভয় ও বিস্ময়ে জড়িয়ে ধরলে; আর সেই সঙ্গে এ দেশের চির প্রসিদ্ধ যাদু বিদ্যার কথাও মনে পড়ে গেল।

চাঁদের আলোতে বাগান ছেয়ে ফেলেছে। কাজেই আমি বাগানের ভেতর যে বড় বাড়ীটা আছে, তার ছায়ার মধ্য দিয়ে, যতদূর সম্ভব আত্মগোপন ক'রে, ধীরে ধীরে চলতে লাগলাম। এই বড় বাড়ীটার একটা কোণ বরাবর এসে দেখি, এই বাড়ীটার সংলগ্ন অথচ সম্পূর্ণ আলাদা একটা ছোট বাড়ী আছে। এর সামনের দিকটা কতকটা পটমণ্ডপের মত,—জানালাগুলি রঙিন, দরজাটা খুব বড়,—পেতলের তৈরি। এই ছোট বাড়ীটার আকৃতি দেখেই আমার মনে কেমন ধারণা হ'ল যে, এই বাড়ীর মধ্যেই ইসমাইলের গুপ্তধন রক্ষিত আছে। এই বাড়ীর দোরের সামনে যমদূতের মত ভীষণাকার দু'জন নিগ্রো রক্ষী পাহারা দিচ্ছে। আমি প্রায় এদের সামনা-সামনি হয়ে পড়েছিলাম; কিন্তু অতিকষ্টে পালিয়ে বড় বাড়ীটার একটা পাঁচিলের কোণে তাড়াতাড়ি নিজেকে লুকিয়ে ফেল্লাম। এদের ভেতর একজন, যেন মনে হ'ল ঘুমুচ্ছে, আর একজন তার দু'পাটি দাঁত বার ক'রে হাসছে। সে হাসি দেখলেই ভয় হয়। মনে হ'ল, আমার উপস্থিতি জানতে পেরে নিগ্রোটা বিদ্রূপের হাসি হাসছে, এইবার আমায় আক্রমণ করবে। ভয়ে আমার বুক দুর দুর ক'রে উঠ্‌ল—আমি পকেটের পিস্তলটাকে বেশ ক'রে বাগিয়ে ধরলাম। নিগ্রোটা কিন্তু কিছুই করলে না,—হাসতেই লাগল। পরে বুঝলাম, সেই প্রেমের গানটা 'তার প্রাণের ভেতর দিয়ে মরমে পশেছে', আর তাই সে তার দাঁত-গুলোকে ঢেকে রাখতে পারছে না।

আমি এইবার কি করব ভাবছি, এমন সময় বাগানের বাইরে কুকুরগুলো সব এক সঙ্গে ঘেউ ঘেউ ক'রে ডেকে উঠ্‌ল। আমার আসবার সময় কুকুরগুলোর ডাক হঠাৎ থেমে গিয়েছিল, কিন্তু এবার তাদের ডাক ক্রমে বেড়ে যেতেই লাগল। নিগ্রো দুটো তাদের সঙ্গীন খাড়া ক'রে,—প্রায় আমার গা ঘেঁসেই, ফটকের দিকে ছুটল। আমি এ সুবর্ণ সুযোগ আর ছাড়তে পারলাম না,—তারা ফটক পার হয়ে যেতেই, ছোট বাড়ীটার পটমণ্ডপের সামনে এসে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে গান থেমে গেল। যেমনি আমি মণ্ডপের প্রথম সিঁড়িতে পা দিয়েছি, অমনি দৈববাণীর

মত অজানা নারী কণ্ঠে সুমধুর স্বরে কে আমায় বল্‌লে,—"প্রিয়তম, তুমি এসেছ! এই নাও চাবি,—ওরা ফিরে আসবার আগেই ঢুকে পড়।" কথা শেষ হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই একটা সিল্কের কাপড়ে জড়ান চাবি আমার পায়ের সামনে এসে পড়ল।

(৩)

দূরে কতকগুলো লোকের পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। আমি ভাবলাম, যদি মণ্ডপের পাশ দিয়ে পালাবার চেষ্টা করি, তা হ'লে নিশ্চয়ই ধরা পড়ে যাব, সুতরাং এই অজানার নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে দেখা যাক, বরাতে কি আছে। আমি আর কালবিলম্ব না ক'রে বড় পিতলের দরজাটা চাবি ঘুরিয়ে খুলে ফেল্লাম। যদিও ভয়ে আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপছিল, তবু উপস্থিত বুদ্ধিটুকু আমার একেবারে লোপ পাই নি। ঘরের মধ্যে ঢুকেই তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে, চাবিটা পকেটে রেখে দিয়েছিলাম।

এই ঘরখানির সাজ সরঞ্জাম বাস্তবিকই অসাধারণ রকমের জমকাল। ঘরের মেঝে আগাগোড়া গদি দিয়ে মোড়া, আর তার ওপর সিল্কের চাদর ঢাকা। ঝাড় লণ্ঠনের আলোগুলো কোনটা লাল কোনটা নীল। বাতি-দানগুলো কাঁচের কি পাথরের বোঝা কঠিন। স্ফটিকের শয্যা ও চৌকিগুলির প্রত্যেকটি মূল্যবান মুক্তার মালা ও ময়ূরপুচ্ছ দিয়ে সাজান, আর চৌকির পাশে আতরদান সুরাপাত্র সব পাশাপাশি রাখা। দরজার ঠিক সামনে ঘরের ভেতর একটা খিলানের মত আছে, সেটা সিল্কের ওপর সোনার কাজ করা পরদা দিয়ে ঢাকা।

আমি ঘরের মধ্যে ঢুকে সবে মাত্র দু' এক পা এগিয়েছি, এমন সময় সেই খিলানের পরদা আপনা আপনি যেন সরে গেল। আমি কি দেখলাম! যা' দেখলাম, তা' কেহ কখনও কল্পনাতেও আনতে পারবে না। হাফিজ, ওমর, আওর প্রভৃতি প্রাচ্য কবিগণ সৌন্দর্য্যের যতটা চরম কল্পনা করতে পেরেছেন, তাঁদের সবগুলি কল্পনা একত্রিত করলেও, বোধ হয়, এর ছায়ার সঙ্গেও তুলনা করা যায় না। এ দেবী না মানবী! মানুষের কি এত রূপ হওয়া সম্ভব? এ রূপ-বহ্নিতে চোখ ঝলসে যায়; কিন্তু এত স্নিগ্ধ এমন মনোমুগ্ধকর যে চোখ ফেরাতেও পারা যায় না। মনে হ'ল, যদি এই সুন্দরী একবার আমার দিকে করুণার দৃষ্টিতে ফিরে চায়, তাহ'লে হাসতে হাসতে নিগ্রো দুটোর হাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারি। কিন্তু হায়! তাতেও আমি নিরাশ হ'লাম। আমায় দেখবামাত্র সুন্দরীর হাস্যময়ী মূর্ত্তি হঠাৎ বদলে গিয়ে ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল। সে ভীতিবিহ্বল নেত্রে আমার দিকে চেয়ে ব'লে উঠ্‌ল,—"এ কে? এ ত আমার প্রিয়তম সৈয়দ নয়! তবে কাকে আমি ঘরে ঢুকতে চাবি দিলাম! কে তুমি? বল—কে তুমি? ওঃ—বুঝেছি, আল্লা—রক্ষা কর,—আমি ইসমাইলের চক্রান্তে পা দিয়েছি!"

সুন্দরীর মোহিনী মূর্ত্তির আকর্ষণে আমি এতটা অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে, আমার যেন বোধ হ'ল, আমি আর বাস্তব জগতে নেই,—কোন অজানা মায়া রাজ্যে। আমি সুন্দরীর কথার উত্তর পর্য্যন্ত দিতে পারলাম না, অবাক হয়ে নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। এমন সময় দরজায় অতি সন্তর্পণে মৃদু করাঘাত হ'তে লাগল। সুন্দরী সেই করাঘাত শুনেই—"সৈয়দ—প্রিয়তম!" বল্‌তে বল্‌তে দ্বারের দিকে ছুটে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আমি শুনতে পেলাম, বাইরে যেন সেই নিগ্রো দুটো ফিরে এল, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝটা-পাটি সুরু হয়ে গেল। এদিকে ঘরের মধ্যে সুন্দরী হতাশে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ক'রে, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মেঝের উপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। বাইরে অনেকগুলি লোকের দৌড়াদৌড়ি ও রোষ গর্জ্জনের শব্দ হ'তে লাগল; ক্রমে দ্বারে চাবি লাগাবারও আওয়াজ পাওয়া গেল। আমি বুঝে নিলাম, সুন্দরীর প্রণয়ী সৈয়দের অবস্থা প্রাপ্ত হ'তে আমারও আর বেশী বিলম্ব নেই। মৃত্যু অনিবার্য্য, কাজেই আমি প্রাণরক্ষার শেষ চেষ্টা করবার জন্যে, সুন্দরীর সংজ্ঞাহীন দেহটা ডিঙ্গিয়ে একটা স্ফটিকের শয্যার মধ্যে আত্মগোপন করলাম।

সশব্দে ঘরের দরজা খুলে গেল; আর সেই সঙ্গে লম্বা, রোগা, বাজপক্ষীর মত চেহারার একজন বৃদ্ধ রাগে কাঁপতে কাঁপতে ঘরের ভেতর ঢুকল। বৃদ্ধের পেছনে দু'জন নিগ্রো

একজন সুন্দরকান্তি মিশরদেশীয় যুবাকে টেনে হিঁচড়ে ঘরের মধ্যে আন্‌লে, আর ক'জন রক্ষী দরজা ঘিরে দাঁড়িয়ে গেল।

এই কদাকার বৃদ্ধই যে আমাদের সৈয়দ ইসমাইল সে বিষয়ে আমার আর কোনও সন্দেহ রইল না। বৃদ্ধ ঘরের মধ্যে ঢুকেই, সুন্দরীর চেতনাশূন্য দেহটাকে রাগে একেবারে উঁচুতে তুলে ধরে আবার মাটিতে ফেলে দিলে। আমার বোধ হ'ল, যেন ইসমাইল এবার সুন্দরীর বুকের ওপর চড়ে দাঁড়াবে। বৃদ্ধ কিন্তু তার কিছুই করলে না, কেবল সুন্দরীর দেহের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ ধরে এইভাবে চেয়ে থাকবার পর, তার চোখ দিয়ে ঝর ঝর ক'রে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল,—সে তার বুকটা চাপড়ে আপশোষ ক'রে বল্‌তে লাগল,—"ধিক্ আমার এই চক্ষুকে! ধিক্ আমার ঐশ্বর্য্যকে! আর তার চেয়েও ধিক্ আমার এই পাকা দাড়ীকে!!"

ইসমাইল তার সেই ভাবটা সামলে নিয়ে, তার বন্দীর দিকে ফিরে দাঁড়াল। তার এই সময়ের মূর্ত্তি দেখে বাস্তবিকই আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। আমার যেন মনে হ'ল—আমি অজ্ঞান হয়ে গেছি,—কিন্তু আমি যে অজ্ঞান হয়ে পড়ি নি, এটা নিশ্চয়ই, কেন না, তখনও আমি ঘরের সব ঘটনা বেশ দেখতে পারছিলাম।

রক্ষিগণ যখন বন্দীকে ইসমাইলের পায়ের কাছে এনে ফেলে দিলে, ইসমাইল তখন তার দিকে কট্‌মটিয়ে চেয়ে বল্‌তে লাগল,—"রে কুলাঙ্গার! মৃত্যুই তোর এখন উপযুক্ত শাস্তি! তুই কি ভেবেছিলি, চুপি চুপি কাজ সারবি! কিন্তু তা' হয় না। যে ধর্ম্মাত্মারা যোগবলে সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন, যাঁরা মন্ত্রবলে কত ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করতেন, তাঁদের বংশধর হয়ে, তোর মত একজন সামান্য কীটের গতিবিধি আমার অজ্ঞাত থাকবে! তুই জানিস্! যে দিন প্রথম তুই আমার রহস্য জানবার চেষ্টা করেছিস, সেই দিনই আমি জানতে পেরেছি। তোর কলঙ্কের সহচরী,—মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়িয়েও যার মুখের দিকে তুই এখনও একদৃষ্টে চেয়ে আছিস,—ঐ সুন্দরী, আমার কাছ থেকে যখন ঐ দরজার চাবি চুরী করে,—তুই কি ভেবেছিস, আমি তা' জান্‌তে পারি নি! তোরা কতটা বাড় বাড়তে পারিস তাই আমি শুধু দেখে যাচ্ছিলাম। তুই জানিস, আমারই ইসারায় কুকুরগুলো খেজুরগাছের ঝোপের কাছে গিয়ে চুপ ক'রে গিয়েছিল। আমারই ইসারায় কুকুরগুলো ফের ডেকে উঠেছিল। আমারই হুকুমে রক্ষিগণ যে যার স্থান ত্যাগ ক'রে বাগানের ফটক পর্য্যন্ত ছুটে গিয়েছিল। এখন বুঝেছিস্,—তোকে এই ঘরের দোর পর্য্যন্ত আসবার সুযোগ আমিই ক'রে দিয়েছি।"

ইসমাইলের কথায় আমার চোখের সামনে দিয়ে একটা প্রহেলিকার পর্দ্দা সরে গেল। আমি এখন বুঝলাম, কেন কুকুরগুলো খেজুরগাছের ঝোপের কাছে এসে হঠাৎ থেমে গিয়েছিল,—কেনই বা নিগ্রো দু'টা আমার গা ঘেঁসে গিয়েও আমায় দেখতে পায় নি। আমরা দু'জনে একই উদ্দেশ্যে আসছিলাম, কিন্তু এদের লক্ষ্য ছিল একজনের ওপর,—আর সেইজন্যেই এরা আমায় মাঝে মাঝে এই যুবক ব'লে ভ্রম ক'রে আমার আসবার পথ পরিষ্কার ক'রে দিয়েছিল। বেশ বুঝলাম, আমি যে এখানে আছি তা এরা জানে না। কিন্তু তবুও আমি ইসমাইলের মুখের দিকে চাই, আর আমার বুক গুর গুর ক'রে ওঠে।

ইসমাইল একটু দম নিয়ে আবার বল্‌তে আরম্ভ করলে,—"জানিস্ সয়তান! তোর আগেও কেউ কেউ আমার রহস্য জানবার চেষ্টা করেছিল। তাদের কি দশা হয়েছে জানিস? মুস্তাফা আমার সম্পত্তি সচক্ষে দেখেছিল, তাই তার আজ চোখ নেই। হাসান তার হাত দিয়ে আমার সম্পত্তি ছুঁয়েছিল, তাই সে আজ তার হাত হারিয়েছে। আবদুল আমার সম্পত্তির কথা কিছু কিছু জেনেছিল, তাই তার জিভ কেটে দিয়েছি,—একজন বিদেশী বণিক তাকে রক্ষা করতে চেষ্টা ক'রেও পারে নি। আমার সম্পত্তি ধনদৌলতের নয়—মণিমাণিক্যের নয়,—আমার গুপ্তধন একটা রক্তমাংসের শরীর—একটা অতুলনীয় সৌন্দর্য্য, যা' জগতে দুর্লভ। এই গুপ্তধন তুই যে কেবল দেখেছিস বা স্পর্শ করেছিস, তা' নয়—তুই আল্লার পবিত্র বাগান অপবিত্র করেছিস। তোর শাস্তি কত গুরুতর হওয়া উচিত তা' আমি কল্পনাও করতে পারছি না।"

তারপর ইসমাইল রক্ষিগণকে হুকুম দিল,—"এই কুকুরকে বাগানের ভেতর জীবন্ত গোর দে।"

হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, দরজাও সশব্দে বন্ধ হ'ল।

* * *

যে অনুকূল বাতাসের ভেতর দিয়ে আমি এই মরু রহস্য জানতে পেরেছিলাম, সেই অনুকূল বাতাসের সাহায্যেই আমি নিরাপদে,—কেবল নিরাপদেই বা বলি কেন,—ইসমাইলের সযত্নে রক্ষিত গুপ্ত সম্পত্তি—সেই সংজ্ঞাহীন সৌন্দর্য্যের রাণীকে কাঁধের ওপর তুলে—এই দ্বিতীয় যমপুরী থেকে পালাতে পেরেছি। আমার কাছে দরজার চাবি ছিল, আর রক্ষিগণ সকলে হতভাগ্য সৈয়দকে কবরস্থ করতে ব্যস্ত ছিল; কাজেই অতি সহজেই আমি পালাতে পেরেছিলাম। ভোর হ'বার আগেই আমার লুণ্ঠিত ধন—ইসমাইলের রহস্য, উটের ওপর বোঝাই দিয়ে, আমার গন্তব্য পথে রওনা হয়েছি। উষার আলোক যখন প্রথম প্রকাশ হ'ল, তখন আমি দেখলাম, সুন্দরীর জ্ঞান ফিরে এসেছে। সে তার অবস্থা বুঝতে পেরে, এমন করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলে, যেন মনে হ'ল, তাকে ইসমাইলের পুরী থেকে উদ্ধার করবার জন্যে সে আমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

ইসমাইলের যে রহস্য জানতে গিয়ে কেউ চোখ, কেউ হাত, কেউ জিভ, আবার কেউ বা প্রাণ পর্য্যন্ত হারিয়েছে, ঈশ্বরের কৃপায় আমি সেই অতুলনীয় সম্পত্তি—সেই অপরূপ লাবণ্যময়ী রমণী-রত্ন লাভ ক'রে নিরাপদে স্বদেশে ফিরে এসেছি। ইসমাইলের গোপনীয় রত্ন এখন আমারই অঙ্কলক্ষ্মী—মরু রহস্য এখন আমারই রহস্য। *

শ্রীশ্রীঠাকুর হরনাথের অমিয় বাণী।

[ভিষগ্‌রত্ন কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী-সংগৃহীত]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২২) মন চলিবার দুইটী মহা মহা খাদ—কামিনী ও কাঞ্চন। এই দুয়ের মধ্যে আবার কামিনীই প্রধানা, অতএব, মনকে স্থির করিতে হইলে এ বড় খাদের নিকট যাওয়া বন্ধ করা চাই। তুমি কি জান না যে বড় নদীর নিকটে কূপ খুঁড়িলে তাহার জল নদীর জলের সঙ্গে হ্রাসবৃদ্ধি পাইয়া থাকে? নদী সতত কূপের জলকে টানিয়া কূপকে শুকাইয়া দেয়। তাই বলি, বড় নদী কামিনী হইতে দূরে থাকাই উচিত, তবে যখন মনকে শক্ত ঘড়ার মধ্যে পুরিবে তখন নদীর মধ্যে থাকিলেও আর তোমার কোন ক্ষতি হইবে না।

(২৩) স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী মনে করিবে, খেলবার জিনিষ মনে ক'রে ভ্রমে প'ড় না। দূরে রাখিয়া স্ত্রী-মূর্ত্তি অন্তরের ধন করিয়া চিন্তাতে যে সুখ, নিকটে সে সুখ নাই। কাছে রাখার নাম মায়া, দূরে ভালবাসার নাম প্রকৃত প্রেম ও অনুরাগ। চারিদিক রেখে চলার নাম চতুরতা।

(২৪) "নাম করা, গুণ গাওয়া" ছাড়া আর কি আছে? ইহাই সকলের মূল, ইহা হইতে সবই হয়। ইহাতেই শিব মত্ত, ইহাতেই নারদ মুক্ত ও ইহারই জোরে শুকদেব শ্রেষ্ঠ। নাম হইতেই প্রেম, আর প্রেম হইতেই সেই প্রেমের ঠাকুর আমার রসময় রাসবিহারী।

(২৫) যেমন ধ্রুবকে আশ্রয় করিলেই সকল গ্রহ নক্ষত্রকে আশ্রয় করা হয়, যেমন বৃক্ষের মূলে জল দিলে, তাহার প্রত্যেক শাখা, প্রশাখা, পত্র ও পুষ্পে জল দেওয়া হয়, তেমনি নাম আশ্রয় করিলেই সকল তপস্যা ও ঋদ্ধি সিদ্ধিকে ভজনা করা হয়। নাম করিলেই সকল তপস্যার

* Sax Rohmer প্রণীত একটি ছোট গল্পের ছায়াবলম্বনে লিখিত।

ফল আপনা আপনিই আসে, তাই নিবেদন "নাম করা, গুণ গাওয়া" ছাড়া আর কি আছে জানি না।

(২৬) অনেক তপস্যার ফলে নামে বিশ্বাস হয়। কৃষ্ণনাম কৃষ্ণ অপেক্ষা গুরু বস্তু ও মধুময়। নারদের কোন্ তপস্যার অভাব ছিল? শিব কি যোগ ও কি সিদ্ধি না পাইয়াছেন? শুকদেব কি শাস্ত্র না অধ্যয়ন করিয়াছিলেন—যে তাঁহারা সর্ব্বশেষে নামই আশ্রয় করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

(২৭) জন্ম মৃত্যু দুইটী একই জিনিষ, আমরা না জেনে কেবল মৃত্যুর আতঙ্কে দিনে সাতবার ক'রে ম'রে যাই—কিন্তু একটু ভেবে দেখ্‌লে জন্মেও যেমন আনন্দ করা উচিত, মরণেও তাই করা উচিত। জন্ম মৃত্যু একই জিনিষ, কোন পদার্থ নাই, আমরা কেবল সংস্কার দোষে ভয় পাই।

(২৮) সদা হরি-প্রেমে মত্ত থাক, হরিনামে রত থাক, পরোপকারে ব্রতী থাক, অবশ্যই কৃষ্ণ কৃপা করিবেন। কৃষ্ণ কিনিবার মূল্য একমাত্র লালসা, অন্য কোন ধনরত্নের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। জপ বল, তপ বল, ব্রত, অধ্যয়ন প্রভৃতি কোন জিনিষেই তাঁহাকে বশ করা যায় না; তাই বলি যেন অনুরাগ বজায় থাকে।

(২৯) কৃষ্ণের নিকট সকলেই সমান, জগৎকে আপনার ভাব; জগৎ কৃষ্ণের, কৃষ্ণ আমার নিজের, এইজন্য তাঁর দ্রব্য অবশ্যই আমার প্রিয়। জগৎকে জগৎ বলিয়া ভালবাসিও না, জগৎ কৃষ্ণের বলিয়া ভালবাস, তাহা হইলে হিংসা, দ্বেষ আসিবে না, কেন না পরের দ্রব্য বলিয়া জ্ঞান থাকিলে সে দ্রব্যে কখনও আত্মজ্ঞান হইবে না। রাখালেরা গরুগুলি গোঠে পরস্পর আপনার গরু বলিয়া সম্বোধন করে, বলে—ভাই আমার গরুটা ফিরাইয়া আন, আমার গরুটার অসুখ ক'রেছে, আমার গরুর বাচ্ছা হ'য়েছে—কিন্তু ইহাতে তাহার কোন সুখ দুঃখ হয় না। কেন না সে মনে প্রাণে জানে গরুগুলি তার নয়, মুখে কেবল আপনার বলে মাত্র। সেই প্রকার যদি মনে প্রাণে জানিতে পারা যায় যে যদি এ সমস্তই কৃষ্ণের, তাহা হইলে কোন জিনিষেই আসক্তি হয় না, অথচ সকল জিনিষই আপনার বলিতে পারি,—ইহার নাম সন্ন্যাস, আত্মসংযম ইত্যাদি। এই চিন্তাতেই জীব মুক্ত হয়, এ রকম পুরুষই জীবন্মুক্ত। অতএব, সদাই এইভাবে থাকিবে। এইভাবে থাকিয়া পরোপকার করিলে কখনও অহঙ্কার আসিবে না। অহঙ্কার না আসিলেই অভিমান শূন্য হইবে, নিরভিমানী হইলেই সেই অভিমান-শূন্য নিতাইয়ের দয়া পাইবে, আর নিতাইকে পেলেই চৈতন্য করতলগত, তখন নিশ্চিন্ত হইবে। তখন কেবল যে তুমি একা আনন্দ পাইবে তাহা নয়, অনেকে তোমার জন্য প্রেমানন্দে ভাসিবে, অনেককে তুমি প্রেমে ডুবাইতে পারিবে।

(৩০) জগতের সকল স্ত্রীই সেই এক মহাশক্তি রূপিণী মহা প্রকৃতির এক একটা মূর্ত্তি। তাই কথাতে বলে—"মেষের শিং বাঁকা যুঝবার বেলা একা", সেই রকম সব স্ত্রী এক, এইজন্যই লিখে গেছে "All women are the same, but their faces are different." কথাটি সত্য, যেদিকেই লউন কথাটি সত্য। ইংরাজ মহাপ্রভু যে sense এ লিখিয়াছেন তাও সত্য, আর জগতের সকল স্ত্রী সেই মহাশক্তি এটিও মহাসত্য। শাস্ত্রে আছে, যখন ব্যাস শিব দ্বারা কাশী হইতে বিতাড়িত হইয়া নূতন কাশী করিবার জন্য যত্ন করেন এবং গঙ্গাকে আপনার কাশীর চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া যাইবার জন্য তপস্যার দ্বারা সন্তুষ্ট করেন, তখন গঙ্গা দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন—"ব্যাস, তুমি ভ্রান্ত, পার্ব্বতীর অসন্তোষ উৎপাদন করিয়া, আমার নিকট পার্ব্বতীর বিরুদ্ধে প্রার্থনা করিতে আসিয়াছ, কিন্তু তোমার জানা উচিত পার্ব্বতীতে আমাতে ত অভেদ সত্যই, কিন্তু কেবলই যে পার্ব্বতীতে আমাতে অভেদ তা' নয়, পৃথিবীতে নানা যোনিতে যে সকল স্ত্রী-মূর্ত্তি আছে সকলের সঙ্গেই আমি অভেদ"। অতএব, স্ত্রী-রহস্য বুঝিবার কাহারও ক্ষমতা নাই, দূর হইতে তাঁহাদিগকে নমস্কার করাই স্ত্রী-রহস্য ভেদ করিবার প্রধান উপায়। নির্ব্বাণ পথ পরিষ্কার করিবার মালিকও স্ত্রী, আবার চির জীবনের জন্য সে পথ বন্ধ করিয়া ঘোর নরকের পথ পরিষ্কার ক'রে দেবার মালিকও তাঁরাই।

(৩১) যাহারা পাপকে পাপ জানিয়া করে, তাহারা

কৃষ্ণের নিকট ক্ষমা পায়। কিন্তু যাহারা প্রভুর নাম লইয়া, ধর্ম্মের ভাণ করিয়া পাপ করে, তাহাদের উদ্ধার কোথায় ?

(৩২) পাপীগণ যেদিন কৃষ্ণনামে দীক্ষিত হয়, সেই দিন হইতে তাহার পূর্ব্ব পাপ ধ্বংস হইয়া নবজীবন হয়।

(৩৩) কৃষ্ণনাম হইতে মহামন্ত্র আর নাই। নামই ভবরোগের একমাত্র মহৌষধ। নাম করিলে ইহ পরকালে অবিশ্রান্ত আনন্দ ও শান্তি পাওয়া যায়। নাম করিতে সময় অসময়, স্থান অস্থান, পবিত্রতা অপবিত্রতা কিছুই বিচার নাই, ইহাতে আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি নাই, যখন তখন লইলেই উপকার ও আনন্দ।

(৩৪) শরীর ভাল রাখিবার জন্যই ব্রহ্মচর্য্যই সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান উপায়। বীর্য্যই জীবন, বীর্য্যই শরীর রক্ষার মূল কারণ; বীর্য্যধারণই প্রধান ব্রহ্মচর্য্য, এটি যেন মনে থাকে।

(৩৫) পরের সামান্য উপকার করিতে পারিলে জীবন সার্থক মনে করিবে। বাক্যের দ্বারা, কার্য্যের দ্বারা পরের উপকার করিবার চেষ্টা করিবে।

(৩৬) আহারের উপর বিশেষ নজর রাখিবে। অপবিত্র দ্রব্য আহার করিবে না।

(৩৭) পতিপ্রাণার উপর নজর রাখিবে। তাঁর উপযুক্ত মান্য করিবে। তাঁরাই গৃহলক্ষ্মী ও মূলশক্তি বলিয়া মনে করিবে। জগতের স্ত্রীমাত্রকেই উপযুক্ত মান্য করিবে। কুকুর বিড়ালের স্ত্রীকেও সেই মহাশক্তি মনে করিবে। তাঁহাদের মর্য্যাদার অতিক্রম করিবে না। তাঁরাই বল দিবার ও হরিবার একমাত্র মালিক।

(৩৮) ইষ্ট মন্ত্র যাহা হউক, নাম লইবার সময় মধুমাখা রাধাকৃষ্ণ নাম লইবে; সবই এক, নাম মাত্র ভেদ কোন রকমে দ্বিধা করিবে না।

(৩৯) কৃষ্ণ নামই সকলের মূল কারণ। পৃথিবীতে যাহা কিছু আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইবে, তাহাই কৃষ্ণের খেলা মনে করিবে। মানুষের কৃত মনে করিয়া ভ্রান্ত হইবে না। জীবের কোন শক্তি নাই। জীব পুতুল,—কৃষ্ণ সূত্রধর, যেমন নাচান তেমনি নাচে। কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণের দাসত্ব অঙ্গীকার কর, চিরসুখে থাকিবে ও নিশ্চিন্ত হইবে। মানুষকে মানুষ মনে করিবে, কৃষ্ণকে কৃষ্ণ মনে করিবে; জীবকে কখন কৃষ্ণ মনে করিবে না। সেই জন্য শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণ দর্শন ক'রে ঘরে আসিলে, যখন সখিগণ তাঁহার চঞ্চলতায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন শ্রীমতী বলিয়াছিলেন,—

"সখি আমি কি রূপ হেরিলাম; মোহন মূরতি,
পিরীতি রসেরই সার।
হেন লয় মনে, এ তিন ভুবনে,
তুলনা নাহিক যার।"

বুঝি তাঁর তুলনা তাঁতেই আছে। তাই বলি কৃষ্ণের তুলনা কৃষ্ণই। কৃষ্ণ পাদপদ্মে কায়মনোবাক্যে শরণ লইয়া ও কৃষ্ণপ্রেমে প্রাণ ঢালিয়া দিয়া চলিতে থাকুন,—দেখিবেন কত সুখ কত আনন্দ। আপনি কৃষ্ণের জন্য পাগল হইলেই কৃষ্ণও আপনার জন্য পাগল হইবেন। কৃষ্ণের জন্য যখন রাধা অতীব কাতরা ও কৃষ্ণপ্রেমে একেবারে উন্মত্তা, তখন কৃষ্ণের অবস্থা চণ্ডীদাস লিখিয়া গিয়াছেন,—

"তার উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী
কিশোরী করেছে সার।
শয়নে কিশোরী, স্বপনে কিশোরী,
কিশোরী গলার হার।"

ইত্যাদি। তাই বলি, যদি কৃষ্ণকে কাঁদাইতে চান নিজে কৃষ্ণ ব'লে কাঁদুন। কৃষ্ণকে যদি পাগল করিতে চান, কৃষ্ণ নামে পাগল হউন, যদি কৃষ্ণের ভালবাসা পাইয়া অমর হইতে চান তাঁহাকে ভালবাসুন; যেমন কুকুরে শিয়ালে কামড়ান ব্যক্তি জলে স্থলে কুকুরের, শৃগালের মূর্ত্তি দেখিতে পায়, তেমনি কৃষ্ণভক্তগণ পৃথিবীর সকল দ্রব্যেই কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিতে পান। এই জন্যই চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন,—

"স্থাবর জঙ্গমে দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা ইষ্ট স্ফূর্ত্তি॥"

কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিতে করিতে এই রকম একদিন নিশ্চয়ই আসিবে, কোন সন্দেহ নাই।

(৪০) কাম ও প্রেম একই জিনিষ—তবে প্রভেদ

এইমাত্র কাম প্রাকৃত ও প্রেম অপ্রাকৃত; মনোবৃত্তি নীচ পথগামিনী হইলেই তাহার নাম কাম; আর কৃষ্ণপথানুরাগিনী হইলে তাহার নাম প্রেম।

কাম লৌহ, প্রেম স্বর্গ; লৌহ পরেশপাথর স্পর্শে সোনা হয়। পার্থিব কামও তেমনি কৃষ্ণানুরাগী হইলে সোনার মত প্রেমরূপে পরিণত হইয়া থাকে।

(৪১) এ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর কোন দ্রব্যকেই প্রাণ দিও না; তাহা হইলে কাতর হইতে হইবে। এস্থানের সকল দ্রব্যই বাজিকরের বাজি মাত্র; এখনই একরকম, এখনই আর একরকম; তাই বলি, এ ভ্রান্তিতে ভুলে থেক না, একমাত্র কৃষ্ণই অপরিবর্ত্তনশীল ও চিরস্থায়ী; অতএব তাঁকে ভালবাসিতে শিক্ষা কর, কখনই হারাইয়া কাঁদিতে হইবে না; কেন না, সে জিনিষ কখনই হারান যায় না; সে চিরদিন সমানভাবে থাকে।

(ক্রমশঃ)

সুরের হাওয়া।

[শ্রীভক্তিসুধা হার]

তোমার　সন্ধ্যাবেলায় এসেছিলাম
　　আমার কিছু হয়নি পাওয়া
হৃদয়-পাতে ব'য়ে গেল
　　বেদন-ভরা ব্যাকুল হাওয়া।
সেদিন আমার হ'ল মনে
শুধুই যেন অকারণে
সুরের হাওয়ায় কাঁপিয়ে ভুবন
　　সাঙ্গ হ'ল আমার গাওয়া
মনে　পাওয়ার আশা যা' ছিল মোর
　　অন্ধকারে হয়নি পাওয়া।

আজ　প্রভাতবেলা পিয়াল তলায়
　　ছুটল তোমার গানের হাওয়া
সুরের সাথে জড়িয়েছিল
　　ব্যর্থ আমার নীরব চাওয়া।
আজকে শুধু ভাবছি প্রাতে
পেয়েছিলাম সেদিন রাতে
বৃথাই শুধু হয়নি জানা
　　পূর্ণ তোমার সকল দেওয়া
আমার নীরব চাওয়া গেল প্রাণে
　　আনিয়ে দিল সুরের হাওয়া।

পথহারা।

[শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত এম-এ, বি-এল]

(ক)

বড় ভাই যতীন কল-ঘর হইতে আসিতেই যদু অত্যন্ত বিরক্তির সহিত কহিল,—"এ বাড়ী যদি না ছাড় তবে আমার আর পোষাবে না। এই সাতটা দিন এখানে এসেছি, একটা রাত্তিরও যদি চোখ বুজতে পেরেছি। তুমি ত দিব্যি মরার মত পড়ে থাক! আমি যে বাড়ীটা দেখেছিলুম সেটা নিলে কত ভাল হ'তো! তাতো তুমি শুনলে না, এখানে এসে হুড়মুড় ক'রে আস্তানা গাড়লে।"

বড় ভাই একটু মৃদু হাসিয়া বলিল,—"কেন ঘুমুতে পারিস না তুই, বল দেখি।"

যদু কহিল,—"কেন! রাত এগারটা হ'তে সাড়ে চারটা অবধি যে মরা কান্না পড়োশে হয়ে যাচ্ছে তা' কি

তোমার কাণে যায় না? আর সেই যে কান্নার সঙ্গে ফিস্ ফিস্ একটা আওয়াজ তা' কি তুমি একদিনও শোন নাই?"

যতীন কহিল,—"তুই একটু ঠাণ্ডা হয়ে চা খেয়ে দেখে আয় ত ওপাশের বাড়ীটায় কে থাকে। তারপর যদি লোকটাকে থামানই না যায় তবে একটা বাড়ী ঠিক ক'রে নেব এখন।"

চা খাইয়া একখানি ইতিহাসের কেতাব বগলে করিয়া যদু পাশের বাড়ীর রকে যে লোকটা পান বেচিত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, বাড়ীটায় থাকে কে? পানওয়ালা নূতন করিয়া একটা পান মুখে গুঁজিয়া ঠোঁট দুইটা যথাসাধ্য চাপিয়া ধরিয়া ভগ্ন গলায় কহিল,—"কেউ থাকে না, আমি এক জোড়া গরু রাখি মাত্তর।"

এক পয়সার পান সিগারেট কিনিয়া যদু বাড়ীটার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল সত্যই একজোড়া গরু রহিয়াছে, আর উপরের তলাটা ভাঙ্গিয়া একটা ইট শুরকীর পাহাড় হইয়া গিয়াছে। বাড়ীটায় যে মানুষ থাকিতে পারে না সে বিষয়ে যদুর মনে কোনও সন্দেহ রহিল না। পশ্চাৎ ফিরিতেই দেখিল পান-ওয়ালা কেমন একটু উদ্বিগ্ন ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। যদু ফিরিয়া আসিয়া তিন পয়সা দিয়া দুইটি সিগারেট কিনিয়া বলিল,—"এ সহরটা ভারী বিশ্রী। একটা দোকানেও "নেভিকাট" পাওয়া যায় না।"

(খ)

যদু দাদাকে বাড়ীটার কথা বলিতেই সে কহিল,—"তুই দেখতে পারিস নাই ভাল ক'রে। এখনকার দিনে ভূতে কি আর কান্নাকাটি করতে আসে। আর শাস্ত্র যদি সত্য হয়, তবে গঙ্গার ধারে ভূত তাও আবার থাকতে পারে? তুই ঐ পানওয়ালাটার উপর নজর রাখিস, আমি একটা বাড়ী দেখে আসব এখন।"

যতীন বাহির হইয়া গেলে যদু জানালায় গিয়া বসিল। লক্ষ্য করিবার মত কিছুই সেখান হইতে দেখিতে না পাইয়া সে ছাদের চিলা কুঠরীতে গিয়া জানালাটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া উঁকি মারিতে লাগিল। নিকটেই আর একটা ছাদে একটি রমণী তাহার সুদীর্ঘ কৃষ্ণ কুন্তল রৌদ্রে শুকাইতেছিল আর মধ্যে মধ্যে অঙ্গুলী সঞ্চালন করিয়া কুন্তল মধ্যে ঢেউ খেলাইয়া দিতেছিল। কাণের উপরকার চুলের ফাঁক দিয়া সূর্য্য কিরণ প্রবেশ করিয়া তাহার গণ্ডদেশের উপর পড়িয়া নানা রঙ্গে খেলিয়া যাইতেছিল।

যদু ছবি আঁকিতে পারিত, তাই সে তাড়াতাড়ি নীচে যাইয়া তাহার কাগজ পেন্সিল যন্ত্রপাতি সব লইয়া আসিয়া রমণীটির চিত্র আঁকিতে বসিয়া গেল। মিনিট পোনর পরে রমণীটি যখন উঠিয়া গেল যদুর মুখ হইতে তখন ছোট্ট একটি 'আঃ' বাহির হইয়া পড়িল।

খাইতে বসিয়া যতীন যদুকে কহিল,—"তিনটে বাড়ী দেখলুম, সব-কটাই সাক্ষাৎ ইন্দ্রপুরী, আর সিঁড়িও ঠিক স্বর্গ থেকে আনা।" যদু ছোটখাট একটা 'হুঁ' করিয়া এক মনে খাইতে লাগিল। তারপর সহসা বলিয়া উঠিল,—"আঁ! কি রেঁধেছে! মুখটা একেবারে নুনে পুড়ে গেল।" যতীন একটু সন্দেহের চোখে ভাইএর দিকে চাহিয়া কহিল,—"কোন্‌টায় তোর নূন লাগলো?"

"কেন, তুমি বুঝি মাছের ঝোলটা মুখে দাওনি? এমন চমৎকার মাছটা একেবারে মাটি ক'রে দিয়েছে।"

"বলিস্ কি! আমার কাছে ত বেশ ভালই লাগল।" যদু বাটি হইতে খানিকটা ঝোল মুখে দিয়া বুঝিল, ঝোলটার কোন দোষই নাই। তারপর পাতের দিকে চাহিয়া দেখিল তাহারই দোষ হইয়াছে। ভাতের সঙ্গে আলুণা নূনটুক সবখানিই সে মাখিয়া ফেলিয়াছে। তাই সে চুপ করিয়া রহিল।

যতীন ব্যাপারটা বুঝিয়া বলিল,—"অমন ক'রে নূন মেখে নিলে দ্রৌপদী যে দ্রৌপদী তার রান্নাও মুখে তোলা দায় হবে।"

যদু তখন এক চুমুকে দুধটা খাইয়া সটান উঠিয়া চলিয়া গেল।

(গ)

পরের দিন চা খাইয়াই যতীন বাড়ীর খোঁজে বাহির হইয়া গেল। আর যদু সিগারেটটা মুখে গুঁজিয়া ছাদের ঘরটায় আসিয়া সাজ-সরঞ্জাম লইয়া অপেক্ষা করিতে

লাগিল। রমণীটি সেদিনও ছাদে আসিয়া চুল শুকাইতে লাগিল, আর এদিকে যদু আনন্দ-চিত্তে তাহার স্কেচটা ফুটাইয়া তুলিতে লাগিল।

জানালার কবাটটা সেদিন একটু বেশী উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, আর তুলিটাও একবার কাঠের সঙ্গে লাগিয়া ঠক্ করিয়া উঠিয়াছিল। তাই রমণীটি যদুর কাণ্ডকারখানা চোখ ফিরাইতেই দেখিয়া ফেলিল। আর কপাল কুঞ্চিত করিয়া যদুর দিকে একটা ভ্রূকুটি করিয়া মাথার কাপড় টানিয়া জানালার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিল।

যদুও সশব্দে জানালাটা বন্ধ করিয়া ধুপধাপ করিয়া নীচে নামিয়া গেল। তারপর আবার পাঁচ মিনিট পরেই পা টিপিয়া টিপিয়া উপরে আসিয়া সেই জানালাটির কাছে বসিয়া একটা ছোট্ট ছিদ্র দিয়া দেখিতে লাগিল। এই যে ব্যাঘাতট হইয়া গেল, সেজন্য তাহার মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিল ছবিতে হাত দিতে আর মন উঠিল না।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে রমণীটি উঠিয়া ছাদের উপর দুই তিন বার ঘুরা ফিরা করিয়া কি মনে করিয়া যেদিকে যদু নিবিষ্ট-চিত্তে চাহিয়াছিল ঠিক সেই দিকের আলসেতে বুক ঠেকাইয়া মাথাটা ঈষদ্ নোয়াইয়া কি যেন দেখিতে লাগিল। জানালার ফাঁক দিয়া যদু তখন দেখিল রমণীটার চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতেছে।

যদুর হাত হইতে তুলিটা পড়িয়া গেল। তারপর কি ভাবিয়া যেন সে জানালাটা একেবারে খুলিয়া শিকের সঙ্গে মুখ ঠেকাইয়া রমণীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

(ঘ)

বৈকালে যতীন আসিয়া কহিল,—"একটা বাড়ী পাওয়া গেছে। তবে ভাড়াটা একটু বেশী, আর ছাদে শু'লে হাওয়া পাবার আশাটা একটু কম।" এমন সময় ভৃত্য আসিয়া খবর দিল,—"চেরো বাবু বোলাতেঁ হ্যায়।" "তবে আর ও ছাই নিয়ে কি করবে" বলিয়া যদু চটীর শব্দ করিতে করিতে নীচে নামিয়া গেল। বড় ভাই যতীন সিগারেট ধরাইয়া ইজি-চেয়ারটায় বসিয়া পড়িল।

যদুকে দেখিয়াই চারু বলিল,—"মস্ত একটা খবর আছে। সেই যে পচা ছোঁড়া গুণ্ডামী ক'রে খেত, তাকে কাল রাত্রে সোনা ও সখি মেথর এই দুইজনে মিলে ভয়ানক মেরেছে, আর তার মুখে সেই সব যত কিছু লাগিয়ে দিয়েছে। সদর রাস্তায় সে ঘাটটা অবধি পড়েছিল। এখন গঙ্গায় যেয়ে ধুয়ে পুছে এসেছে, লজ্জায় আর মুখ দেখাতে পারছে না।"

"তা বাঁচা গেছে। তবে আমিও একটা খবর ব'লে দিচ্ছি। কিন্তু খবরদার, কাউকে বলো না কিন্তু। এই যে পাশের বাড়ীটা দেখচ, এতে কে যেন মরা কান্না কেঁদে মরে। আর ঐ যে পাশের ছাদটা দেখচো, ওতে, বেশ ক'দিন ধ'রে বল্‌তে হবে, একটি স্ত্রীলোককে দেখতে পেয়েছি। আরও দেখিছি তার চোখ দিয়ে টস্ টস্ ক'রে জল পড়ে।"

চারু একটু বিস্মিত হইয়া কহিল,—"কোন্ বাড়ীটা হে?"

যদু কহিল,—"কেন, দেখ্‌তে পাচ্ছ না? ঐ যে ছাদটা দেখা যাচ্ছে।"

চারু ছিল মাতব্বর গোছের লোক। তাহাদের দলের এক রকম সর্দার বলিলেই হয়। সে যদুর হাত ধরিয়া বাড়ীটার নম্বর ইত্যাদি বিশেষ পরিচয় জানিতে বাহির হইল। তার পর ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহারা যখন দেখিল, ঐ পানওয়ালার সম্মুখ ছাড়া সে বাড়ীটায় প্রবেশ করিবার আর দ্বিতীয় পথ নাই, তখন যদু কহিল,—"এস না, এই রাস্তাতেই ঢুকে পড়ি।"

চারু তাহাকে বাধা দিয়া একটু জোরের সহিতই বলিল,—"সুরেশ যে কাল একটা ছবি এঁকেছে, তা বুঝি তুমি দেখ নাই? "নবতরুর" ব্লকের চাইতে সেটা অনেক ভাল। চল একবার দেখে আসবে এখন।"

(ঙ)

সুরেশদের বৈঠকখানায় বসিয়া কথা হইতেছিল। চারু বলিয়া উঠিল,—"তা হ'লে কাল ভোরে নেপার ঘাটেই যাওয়া স্থির রইল। দেখো যেন ভুলো না। আমি ঠিক চারটায় উঠে আসব এখন" সুরেশ কহিল,—"আমার কিন্তু ভাই বড্ড ঘুম। এই বুঝলে কি না সকাল বেলাটাই ঘুমটা খুব জোরে আসে। তা' নেহাৎ যখন তোমরা আমাকে যোগস্নানটা না করিয়ে ছাড়বে না, তখন আর কি করা যায়।"

এটা-সেটা খেলেও হিন্দুয়ানীটা যদু একটু সতর্কতার সহিত মানিয়া চলিত। তাই সে গলার স্বর কয়েক মাত্রা উঠাইয়া বলিল,—"এই মিশনারীদের স্কুলে কাজ ক'রে তুমি দেখচি একেবারেই গেছ। এই যে হাজার হাজার মাইল দূর হ'তে বুড়ো বুড়ীরা এইখানে একটা ডুব দিতে আসছে, তা' ভেবেও কি তোমার মনে একটু উৎসাহ আসে না ?"

সুরেশ একটু হতাশ ভাবে কহিল,—"কি করব ভাই, সত্যি বলচি, ভক্তি উৎসাহ আমার মনে মোটেই আসে না।" যদুর বক্তব্যটা মুখেই রহিয়া গেল। চারু তাহাকে বাধা দিয়া কহিল,—"কিন্তু সাত সমুদ্দর তের নদীর ওপারে কিসের কোন্ "ভক্ত" তাকে দেখতে আর তার কি হলো জানতে ত দেখছি হপ্তায় দুবার ক'রে ছুটছ।"

যদু তখন বলিল,—"ঠিক কথা, বায়োস্কোপও যেমন এসব স্নানটানও তেমনি—কিংকুম্ভ উৎসবীর। চেনা নাই, শোনা নাই এমন তারা হাজার হাজার লোক চলাচল দেখা বই আর কি। তা' তুমি যখন একজন ছোটখাট আর্টিষ্ট, তখন লিখে রাখ তোমায় যেতেই হবে। না হ'লে, বুঝলে কি না, তোমার ঐ যে জানালার ছেঁদাটা আছে, ঐখান দিয়ে তোমাকে খুঁচিয়ে তুলব।"

সুতরাং স্থির হইয়া গেল, পরের দিন চারটার সময় কেদারঘাটে তাহারা তিনজনে মিলিয়া স্নান করিতে যাইবে। বিশেষরূপ যত্ন লওয়া সত্ত্বেও চারু ও যদু সেদিন পর্য্যন্তও সেই কান্নাকাটীওয়ালা বাড়ীর রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিল না। পানওয়ালা তখনও পূর্ব্বের মত পান বেচিতেছিল।

পরের দিন ঘাটে নামিতেই যদু সহসা থামিয়া পড়িল। দক্ষিণ দিকে সেই রমণীটি স্নান করিতেছিল, আর নীলবর্ণ চশমা-পরিহিত একটি আধবয়েসী ভদ্রলোক উপরে অপেক্ষা করিতেছিল। সুরেশ তাড়াতাড়ি জলে নামিয়া সে যে পশ্চিমে থাকিয়াও সাঁতার দিতে ভুলিয়া যায় নাই, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য একটু বেগে নানা রকম ভঙ্গীতে জলের উপর ছুটিয়া চলিল। এদিকে যদু চারুর পিঠটা টিপিয়া দিয়া খুব ধীরে কহিল—"সেই।"

চারু চমকিয়া বলিল,—"কোথায় ? কে ?"

যদু একটু বিরক্তির সহিত কহিল,—"আ, মলো, ঐ না, নাচ্ছে, দেখছ না ?"

"তাই না কি" বলিয়া চারু জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তারপর সুরেশের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"নে, আর ওস্তাদি দেখাতে হবে না, এখন ফিরে আয়। লোকে বলবে কি ? তোর একটুও জ্ঞান নাই। যোগস্নান করতে এসে আবার সাঁতার। মাথায় জল দিয়ে এখন বার দশেক গঙ্গা মাইকে পেন্নাম ক'রে নে, নইলে তোর নরকেও স্থান হ'বে না।"

ঘাটের লোক উদ্‌গ্রীব হইয়া চারুর শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিয়া রহিল। আর সকলের সঙ্গে রমণীটিও সেই দিকটায় চোখ ফিরাইল, সুতরাং তাহাকে চিনিতে চারুর আর বিলম্ব হইল না। যদুও একটা চীৎ সাঁতার দিয়া সেই চশমা-ওয়ালা লোকটিকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। কিন্তু মুখ-জোড়া রঙ্গীন চশমাটার জন্য সে তাহাকে চিনি চিনি ক'রয়াও চিনিতে পারিল না।

রমণীটি উঠিয়া পড়িলে চারু সুরেশকে ডাকিয়া কহিল,—"নে, এখন উঠে পড়্। আর বাহাদুরী দেখিয়ে অসুখ ক'রে বসতে হবে না।" কি যেন বলিতে গিয়াও সুরেশ বলিতে পারিল না। রমণীটির বদলান কাপড় তখন ধোয়া হয়ে গিয়েছিল; তাই চারু ও যদু উঠিয়া গা মুছিতে আরম্ভ করিল।

ঘাট হইতে খানিকটা আসিতেই বন্ধু তিনটি দেখিল সেই চশমাপরা লোকটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ রমণীটি মস্তক নীচু করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। মিনিট পাঁচেক চলিবার পর সেই লোকটি দক্ষিণের রাস্তা ধরিয়া চলিয়া গেল। সেখান হইতে সেই রহস্যাবৃত বাড়ীখানি বেশী দূরে নয়। রমণীটি পানওয়ালার অধিকৃত স্থানটির পার্শ্ব দিয়াই বরাবর ঢুকিয়া পড়িল।

সুরেশ মধ্য পথ হইতেই সরিয়া পড়িয়াছিল। চারু তখনও যদুর সঙ্গে আসিতেছিল। রমণীটি চলিয়া গেলে সে বলিল,—"ব্যস, এইবার ব্যাপারটা যে কি তা' বোঝা যাবে। সুরেশকে ঘাঁটায়ে আর কাজ নাই। কাল আমাতে তোমাতে, বুঝলে কি না, ঠিক এই সময়ে আবার গঙ্গায় যাব।"

যদু কহিল,—"নিশ্চয়ই, তা' আবার বোলতে। যাহ হউক না কেন, খুব সুন্দর কিন্তু, ঠিক আর্টের মডেল হ'বার উপযুক্ত।" চারুর মন অন্যদিকে ছিল, তাই সে কথাটা কাণে না তুলিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল।

সেই দিন হইতে প্রত্যহ গঙ্গার ঘাটে রমণীটির সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। ছাদের সেই ঘরটিতে যদুর চিত্রাঙ্কণও চলিতে লাগিল। রমণীটি দ্বিধা না করিয়া প্রত্যহ সেই সময়টা ছাদের উপর আসিয়া বসিয়া থাকিত। তাহার চোখের জল কান্নাকাটি তখনও কিন্তু সমান ভাবেই চলিতেছিল। গঙ্গার ঘাট হইতে ফিরিবার সময় কয়েকবার যে রমণীটি যদুর দিকে ফিরিয়া না তাকাইয়াছিল তাহাও নয়। কিন্তু সে দৃষ্টির মধ্যে যে একটা করুণ নিবেদন জড়িত ছিল তাহা যদু বুঝিতে পারিয়াছিল। তথাপি সে রমণীকে অনুসরণ করা হইতে নিবৃত্ত হইল না।

(চ)

সেদিন সন্ধ্যাবেলা যতীন আসিয়া কহিল,—"আজ চমৎকার একটা বাড়ীর খোঁজ পেয়েছি। এটারই মত ভাড়া। বাপ রে! কাল রাত্রে আমি মোটেই ঘুমুতে পারি নাই। মনে করেছি আর একদিনও এ বাড়ীতে থাকা নয়। কাণের কাছে সারারাত ঘ্যান ঘ্যানানী আর সহ্য হয় না।" যদু দাদার দিকে একটু বিস্মিত হইয়াই চাহিল। কি যে সে বলিবে তাহা খুঁজিয়াই পাইল না। তারপর কহিল,—"ঐ অসি ঘাটে গেলে কিন্তু একটা মানুষও পাব না যে দু দণ্ড কথা ব'লে জিরুব। তা বৌদি যখন শীঘ্রই আসছেন ততদিন নয় অপেক্ষা করাই যাক। তাঁকে ওখানে নিয়ে রাখা আর নির্ব্বাসন দেওয়া এক রকমই হবে কিন্তু।"

যতীন সিগারেট ধরাইয়া কহিল,—"তা হোক গিয়ে। সে বাড়ীটা খুব পছন্দ হবে। আমি এক রকম কথা দিয়েই এসেছি।"

যদু কহিল,—"না, তা' হয় না। এই আমি একবার দেখে আসব বাড়ীটা। কাল নয়, পরশু তোমার সঙ্গেই যাব। এত ভাল বাড়ী যখন এত সস্তায় ছাড়ছে, নিশ্চয়ই ওতে কেশো রোগী ছিল। চুণকাম না করিয়ে আর ফিনাইল দিয়ে বেশ আচ্ছা ক'রে না ধুয়ে এখানকার বাড়ীতে যাওয়া ঠিক নয়।"

যতীন একটু বিরক্ত হইয়াই কহিল,—"আমি তা' হ'লে আর বাড়ী দেখতে পারবো না ব'লে রাখছি। এত ঘোরা ফেরা আর বরদাস্ত হয় না।"

সে রাত্রে কথাবার্ত্তা কান্নাকাটি প্রভৃতি উপসর্গ এত বেশী হইল যে, দুই ভাইএর কাহারও চোখ বুজা আর হইল না।

এলার্মিংটা বাজিয়া উঠিতেই যদু বিছানা হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া কাপড় লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। যতীন তখন নাক ডাকাইয়া বিভোরে নিদ্রা দিতেছিল।

রাস্তায় বাহির হইয়া যদু দেখিল দুইটি ভদ্রলোক ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিতে বলিতে অগ্রসর হইতেছে, আর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই রমণীটি যাইতেছে। পায়ের শব্দ শুনিয়া রমণীটি পশ্চাৎ ফিরিয়া একবার যদুকে দেখিয়া লইল।

চারুর আসিতে সেদিন মিনিট তিনেক দেরী হইল। রমণীটি সেদিন অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করিল নতুবা হয়ত চারুর সহিত সেদিন আর তাহাদের সাক্ষাৎই হইত না। চারু আসিয়া বেশ জোর গলাতেই কহিল,—"আজ যে বড়ই সকাল সকাল! কেন, কোথাও যাবে নাকি?" যদু কহিল,—"কি করব ভাই! দাদা বলেছে আজ বাড়ী দেখতে যেতে হবে তার সঙ্গে। তাই কয়েক মিনিট আগেই আসতে হ'লো।"

তখনও সেই চশমাপরা লোকটি বসিয়াছিল। তাহার সঙ্গীটি পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিল।

সেদিন ঘাট হইতে ফিরিবার সময় রমণীর সঙ্গীটি যখন তাহাকে যথাস্থানে পৌছাইয়া দিয়া তাহার নিজের অভ্যস্ত পথে চলিয়া গেল তখন রমণীটি তাহার গতি আরও কমাইয়া দিল। তারপর একেবারে থামিয়া পড়িল। যদুও সেই সঙ্গে থামিয়া পড়িল। কিন্তু চারু তাহাকে ধাক্কা দিয়া কহিল,—"চল না।"

রমণীকে অতিক্রম করিয়াই তাহারা চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় রমণীটি কহিল,—"ওগো ছেলে দুটি!" চারু ও যদু দুইজনেই থামিয়া পড়িল। রমণীটি তাহাদের দিকে

কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া কহিল,—"তোমরা দুটিতে আমার বাড়ীটায় যদি একবার আসতে।" যদুর মুখে উত্তরটা আটকাইয়া গেল, কিন্তু চারু খুব স্পষ্ট করিয়াই কহিল,—'চলুন।"

রমণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চারু ও যদু সেই পানের দোকানের রাস্তাটা দিয়া প্রবেশ করিল। গরুর ঘরের ভিতরে একজোড়া কবাট লাগান ছিল। সেই কবাট খুলিয়া রমণীটি তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে বলিল। তিন দিন হইল পানওয়ালা তাহার দোকান উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে, গরু দুটিও সে সঙ্গে লইয়া গিয়াছে।

বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া বন্ধু দুইটিকে একটি নূতন মাদুরে বসিতে দিয়া রমণীটি তাহার ভিজা কাপড় রাখিতে গেল। যদু ও চারু তখন পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

ফিরিয়া আসিয়া রমণীটি যখন তাহাদের সম্মুখে মাটীতে বসিয়া পড়িল তখন তাহার দুই চক্ষু দিয়াই অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতেছিল। বার বার আঁচল দিয়া মুছিয়াও রমণীটি সে অশ্রুধারা শুষ্ক করিতে পারিল না। ঠোঁট দুইখানিই শুধু থাকিয়া থাকিয়া নড়িয়া উঠিতেছিল, কিন্তু মনের কথা আর মুখ দিয়া বাহির হইতে পারিতেছিল না। চারুর মনও এই করুণ দৃশ্যে গলিয়া গেল। গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া সে কহিল,—"আপনি যা' বল্‌তে চান তা' নিঃসঙ্কোচে বলুন। আমাদের দিয়ে যদি আপনার কোন উপকার হয়, তা' আমরা কোরব জানবেন।"

রমণীটি তখন ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অবশেষে অতি কষ্টে বলিল,—"বাবা, আমি একজন মহাপাপী। আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে। আমি দুনিয়ায় আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছি না বাবা! কি বোল্‌ব বাবা, একদিন আমি খুব ভালই ছিলাম, দশজনের উপরেই তখন আমার স্থান ছিল। আমি সতী হ'তে পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম। সে চিহ্ন আমার গা হ'তে এখনও মুছে যায় নি। পুড়ে মরাই আমার ভাল ছিল বাবা! কিন্তু পারলুম কৈ? দশজনে আমাকে সেই আগুন থেকে তুলে নিয়ে এলো। তারপর হাঁসপাতালে তিন মাস কাটিয়ে আমি বেঁচে উঠলুম।

"হাঁসপাতাল থেকে দেশে ফিরে গিয়ে দেখলুম বিষয়-আশয় যা' ছিল তা' আমার স্বামীর শরিক প্রায় গ্রাস ক'রে ফেলেছেন। আমার স্বামীর সংসারে আমি ছাড়া প্রাকার মধ্যে ছিল কেবল স্বার্থপর ঐ শরিক। বাপ মাও আমার তখন বেঁচে ছিলেন না। ছিল মাত্র দুটি বোন। তারাও তখন চাক্‌রে স্বামীর সাথে বিদেশেই থাকতো। তাই আমার বিষয়-আশয় দেখবার আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না।

"প্রথমে আমি দেখিয়াও কিছু দেখিলাম না। কিন্তু আমার স্বামীর সাধের পুকুরটির বড় বড় রুইমাছগুলো যখন লুটতে লাগল, বাগানের আম কাঁঠালের উপর শরিকের চাকর যখন হাত দিল, তখন আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। কিন্তু বাবা, মেয়ে হয়ে আমি আর তাঁদিকে কি করতে পারি? তাই তখনও চুপ করিয়া রইলাম। পূজার সময় আমার বোন তাহার স্বামীর সাথে এসে এক সপ্তাহ থেকে গেল। একদিন পুকুরের দুটো টাট্‌কা মাছ তাদের পাতে দিতে সখ হ'লো। তাই আমার একটি জেলে প্রজাকে ডেকে মাছ ধরতে পুকুরটায় নাবিয়ে দিলাম। কিন্তু শরিক এসে বাধা দিল। মাছ ধরা আর হ'য়ে উঠল না। আরও মুখের উপর শুনতে হ'লো আমার ছেলে হয় নাই। স্বামীর সম্পত্তিতে আমার কোন স্বত্ব নাই। সেখানেই শরিক আমায় থেমে রইলেন না। পূজার পর আমার কর্ম্মচারীরা এসে বল্‌লো প্রজারা কেউ খাজানা দেবে না। শরিক সবাইকে নিষেধ ক'রে দিয়েছে। কেউ কেউ আবার তাকেই মনিব স্বীকার ক'রে খাজানা দিয়ে এসেছে। আমি আর স্থির থাকতে পারলুম না। আমাদের পাড়াতেই একটি উকিল ছিল। তার স্ত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, তাকে গিয়ে ধরলুম। স্ত্রীর কথায় উকিলটি আমার হ'য়ে দাঁড়ালো। ফলে, আমার বিষয় রক্ষে হ'লো। কিন্তু বাবা, আমি রক্ষা পেলুম না। সে রক্ষা না পাওয়ার বিষময় ফল মাস দুয়েকের মধ্যেই ফল্‌লো। সুতরাং ডাক্তার ডাকা হ'লো। সেবার কোন মতে পরিত্রাণ পেয়ে, বাবা, প্রতিজ্ঞা করলুম ঝাঁটা পেটা ক'রে ঐ উকিলটাকে তাড়িয়ে দেব, যদি সে আমার

বাড়ীতে আর কখনও আসে। দিলামও তাই। তার পর এক বৎসর নির্ঝঞ্ঝাটে কেটে গেল।

"কিন্তু একদিন আবার সেই উকিলটি কলেজের একটি গরীব ছেলেকে নিয়ে আমার ওখানে এলো। আমি তাহাকে আশ্রয় না দিলে সে, শুনলুম চিরজন্ম মূর্খ হয়েই থাকবে, পড়াশুনা তার আর হবে না। ছুটি খেতে দিতে হবে আর থাকবেও সে আমার সেখানে। আমাকে এক রকম একাই থাকতে হয়, একজন ছেলে ছোকরা থাকলে আমারও একটু সুবিধে হবে, এই ভেবে তাকে আশ্রয় দিলুম।

"মাস তিনেক পরে সেও তাহার চিত্ত হারিয়ে ফেল্‌ল। একদিন বাজারের জিনিস পত্র বুঝিয়ে দিতে দিতে খপ্‌ ক'রে সে আমার সাড়ী ধরে ফেল্‌ল। তখন যদি ঝাঁটা পেটা ক'রে তাকে তাড়িয়ে দিতুম, তবে আর এ দুর্দ্দশা আমার কপালে হ'তো না বাবা! কিন্তু তাত আমি করলুম না। আমি শুধু চোখ রাঙ্গিয়ে উঠলুম তার উপর। আর সে কুকুরের মত আমার পায় পড়ে ক্ষমা চাইল। আমার ঘাড়ে দুর্বুদ্ধি চেপেছিল, তাই তাকে ক্ষমা করলুম। ফলে একদিন রাত্রে এক ঘুম দিয়ে উঠে দেখি, সে আমায় জড়িয়ে নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে। কি বোল্‌ব বাবা, আবার আমি পুড়ে মলুম। নরকের কথা আমার মনে এলো না। যাঁর জন্য আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিলুম, তিনিও স্বর্গ থেকে আমায় ঠেকিয়ে রাখলেন না। শুধু একটা আকাঙ্ক্ষা আমায় বুকের নীচ থেকে জেগে উঠল। মাতৃত্বের ডাকে আমি যেন পাগল হ'য়ে গেলুম।

"কয়েক মাস যেতে না যেতেই আমার সারা অঙ্গে মাতৃভাব ফুটে উঠতে লাগল। বুঝতে পেরে ছেলেট এসে বিদায় চাইল। পাঁচশো টাকা নিয়ে সে একদিন পালিয়ে গেল। ঠিক পালিয়ে যায়নি। আমিই একদিন হাত বাক্সটা দেখিয়ে তাকে নিয়ে যেতে বলেছিলুম, কিন্তু সে অনেক দিন আগে। সে পশুর মতই ভালবেসেছিল। আমি তাকে একরকম তাড়িয়েই দিয়েছিলুম, মুখ দেখতুম না একেবারেই।

"তারপর সেই উকিলটিকে যেয়ে আবার ধরতে হ'লো। তার দয়া হ'লো। তাই সেই ডাক্তারকে সঙ্গে ক'রে আমাকে নিয়ে এখানে চলে এলো। শুনেছিলুম বিশ্বনাথ সকল পাপী তাপীকেই আশ্রয় দেন। তারা যে পিশাচের অন্তঃকরণ নিয়ে আমাকে এখানে এনেছে, তা' তখন বুঝতে পারি নাই। এখানে এনে আমাকে তারা একরকম বন্দী করেই রেখে দিল, আর আমার উপর একটা হিন্দুস্থানী পানওয়ালাকে পাহারায় বসিয়ে দিল। তখন বুঝলুম তাদের মতলব কি। আমি ত সম্মান চাই নাই। তবুও তারা বল্‌লো কি না যে নির্দ্দোষ অবোধ তাকে বিনাশ না করলে আমার সম্মান আর থাকবে না। হায় রে সম্মান! আমাতে যে পদার্থ ছিল, তা-না এই সম্মানের জন্যই বিসর্জ্জন দিয়ে ফেলেছি!

"এই দুই পিশাচ আমাকে আজ পর্য্যন্ত সময় দিয়েছে। আমি যদি তাদের কথামত না চলি, তাদের ওষুধ পত্র না খাই, তারা আমায় এই নির্ব্বান্ধব পুরীতে একলা ফেলে যাবে বাবা।"

রমণীটি আর বলিতে পারিল না, শুধু ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

যদুর চোখের জল ছুটি ছুটি করিতেছিল। চারু কোন মতে নিজেকে সম্বরণ করিয়া কহিল,—"আপনি কাঁদবেন না।"

রমণীটি চোখের জল মুছিতে মুছিতে কহিল,—"তোমরা বাবা আমার ছেলের মতন। এই পাপী মা'টার একটা ব্যবস্থা ক'রে দাও বাবা। নইলে—"

চারু তখন স্পষ্ট গলায় কহিল,—"তুমি মা নির্ভয়ে থাক। তোমার মনে যখন মায়ের স্নেহ আছে, তখন তোমার ব্যবস্থা আমরা কোরবই কোরব। আর, আমরাই বা বলি কেন, ভগবানই ক'রে দেবেন।"

যদু এতক্ষণ মাটীর দিকে চাহিয়াছিল। তাহার চোখ দিয়া তখনও জল পড়িতেছিল। বাড়ী ফিরিয়া সে ছবিখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া আগুনে ফেলিয়া দিল। যতীন তখন সবেমাত্র ঘুম হইতে উঠিয়াছিল। সিগারেটে টান দিতে দিতে সে বলিল,—"কি পোড়াচ্ছিস্‌ রে? বাড়ী দেখতে যাবি ত?"

সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া নিজের ঘরে গিয়া সে খিল দিয়া শুইয়া পড়িল।

(ছ)

সুরেশ মিশনারী স্কুলে মাষ্টারী করিত। সেই মিশনেই রমণীটির থাকিবার ব্যবস্থা সহজেই হইয়া গেল। তাহাকে সেখানে পৌঁছাইয়া দিয়া গেটের বাহির হইতেই যদুকে চারু কহিল,—"আমি বল্‌তে ভুলে গেছি, সোনা ও সখি মেথর যে পচাকে মেরেছিল বলেছিলাম, তা' সত্য নয়। আমার সঙ্গে সোনার আজ দেখা হয়েছিল। ঐ চশমাপরা লোকটি তখন সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। সোনা তার সঙ্গে একটু রসিকতা ক'রে বল্‌লো, "বড় যে চশমা লাগানো হয়েছে! পিঠের দাগটা সেরেছে ত?" সে লোকটা তাড়াতাড়ি মাথা নীচু ক'রে চলে গেল। আমি ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করায়, সে সব খুলে বল্‌লো। পচার কথা জিজ্ঞাসা করায় সে তিনবার কপালে হাত ছোঁয়াইয়া বলিল, --"গুরুজিকে! বাপরে! তার গায় কি হাত তোলা যায়! গুরুজীর কোন দুসমুন নিশ্চয়ই এই সব মিছে কথা আপনাদিগকে বোলেছে।"

যদু আর সাড়া শব্দ না করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল। পরদিন সকালেই তাহার বৌদি আসিয়া পড়িলেন। তিনি যদুকে বিমর্ষ দেখিয়া কহিলেন,—"বিয়ে না হওয়ায় দেখছি ঠাকুরপোর মনটা শুকিয়ে যাচ্ছে একেবারে। আহা! কি কষ্ট!"

যদু তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া সিগারেট ধরাইয়া ফেলিল।

(জ)

সেই রমণীটি এখন একজন সুবিখ্যাত লেডী ডাক্তার। সেবার তাহার একটি ছেলে হইয়াছিল। সে ছেলেটি দু'দিন হইল বিলাতে ডাক্তারী শিখিতে চলিয়া গিয়াছে।

অস্ফুট

[শ্রীসরোজরঞ্জন মুখোপাধ্যায় এম-এ]

সে নহে আকাশ-গলা নীল জলধি,
সে যে মরুপ্রান্তরে লুকান নদী,
সে যে গো লুকান প্রীতি,
সুদূর স্বপন-স্মৃতি,
আদরের ফুলমালা নিশা অবধি।

সে যে গো ঊষার খেলা প্রভাত কূলে,
পরাগের রাঙা রাগ বকুল মূলে,
প্রথম প্রণয় কথা,
প্রথম বিরহ ব্যথা,
প্রথম ফাগুন দেখা নব মুকুলে।

দীনের হিয়ার খেদ শুধু নিশ্বাসে,
ভক্তের ভগবান শুধু বিশ্বাসে,
শবরীর প্রেম আশা,
মূকের নয়ন ভাষা,
অন্ধের রূপ-তৃষা হিয়ার বাসে।

সে যে গো মণির আলো খনির মাঝে,
ঘুমপাড়ানীর গান নিঝুম সাঁঝে,
উছল যমুনা কূলে
জীবন কদম্বমূলে
শুধু নিমিষের দেখা আধেক লাজে।

শনিবারের বাজার।

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম-এ, বি-এল]

শীতকালের শনিবার কলিকাতায় সৌখিন-সম্প্রদায়ের দ্বারে শত আশার ডালি মাথায় করিয়া আলোক-আঁধারের সন্ধিক্ষণে হাজির হয়। ছ-টা বাজতে না বাজতে চায়ের সরঞ্জাম বৈঠকখানায় যে রকম জাঁকজমকের ছটা বিস্তার ক'রে দেখা দেয়, তাতে মনে হয় যে, আজ বুঝি এদের বাড়ীতে একটা ধুমধাম না হয়ে যায় না। চা চিনি দুধ পিরিচ পেয়ালা চামচে ছাঁকনি কেটলি বিস্কুট ট্রে, যেন দশকর্ম্মের দশবিধ দ্রব্য টেবিলের উপর সাজান রয়েছে। এটর্ণিবাবুর বাড়ী—সকাল থেকেই লোকের আমদানি হচ্ছে। মক্কেল নয়—পাড়ার বে-আক্কেল যত লোক। মকদ্দমার কথা হচ্ছে না—ঘোড়দৌড়ের টিপ্‌স নিয়ে কল্পনা-জল্পনা চলেছে। ঘড়ীতে যেমন সাড়ে আটটা বাজল অমনি বৈঠকখানার সজীবতা নষ্ট ক'রে যে যার বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল। প্রত্যেকের মাথার ভেতর এখন থেকে ঘোড়দৌড়ের বাজীর হার জিৎ আরম্ভ হ'ল। মত্ততা! মত্ততা!! কেহ মদ ভাং খেয়ে মত্ততা-সুখ অনুভব করে, কেহ বা ঘোড়দৌড়ের উত্তেজনায় সেই সুখ অনুভব করে। মত্ততার পর অবসাদ আসবেই আসবে। সেটা বিকেল বেলা, শেষ বাজীর আগে নয়।

প্রসিদ্ধ সওদাগরের আপিসের বড়বাবু সকাল সকাল স্নানাহার ক'রে বিছানায় একটু আড় হয়ে শুয়েছেন। তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী গৃহিণী পালঙ্কের পাশে এসে দাঁড়িয়ে স্বামীর চিন্তামাখান মুখের দিকে চাহিলেন। "আজ জামাইকে রাত্রে খাবার জন্যে নিমন্ত্রণ ক'রেছি। মেজ খোকা সকাল বেলা ব'লে এসেছে।"

"ভালই হয়েছে। 'জামায়ের জন্তে মারে হাঁস, গুষ্টি শুদ্ধ খায় মাস', আমাদেরও তা হ'লে ওবেলা ভাল রকম খানা হবে ত?"

"কোন্ শনিবারে না হচ্ছে। মা কালি করুন আজ যেন তুমি রেশে পাঁচ-শ টাকা জিতে এস।"

"এক-শ টাকা ধরলে পাঁচ-শ টাকা জেতা যায় বটে, কিন্তু আমার হাতে পঞ্চাশের বেশী যে আজ নাই।"

"আমার বাক্সে কুড়িয়ে বাড়িয়ে পঞ্চাশ টাকা হ'তে পারে। আমি ধার দিচ্ছি, আমায় কত দেবে?"

"তোমায় সুদের এক টাকা আর আসলের পঞ্চাশ টাকা সন্ধ্যার সময় দেব।"

"বেশ! পঞ্চাশ টাকায় আড়াই-শ টাকা জিতে আমাকে একটি টাকা হাত তুলে দেবে। আমি তা' নেব না, পঞ্চাশ টাকাও দেব না।"

"কেন? হিসেব ত প'ড়ে রয়েছে। টাকায় এক পয়সা সুদ হ'লে পঞ্চাশ টাকায় মাসে সাড়ে বার আনা সুদ হয়। তুমি ত একদিনেই এক টাকা সুদ পাচ্ছ। কাবুলির কাছে টাকা নিলে কি টাকায় মাসে এক আনা সুদ দিতে হয়। তাতে ত আমার সুবিধা হবে, টাকাটা এক মাসে চারটে রেশে লাগাতে পারব।"

গৃহিণী শেষে অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর পাঁচ টাকা সুদ আগে কেটে নিয়ে বড়বাবুকে পঁয়তাল্লিশ টাকা দিলেন। বড়বাবু সহাস্য বদনে আপিসে বেরিয়ে গেলেন। কর্ত্তা বেরিয়ে গেলে গৃহিণী উড়ে বামুনের হাতে পাঁচ টাকা দিয়ে বাজারে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি ব'লে দিলেন, জামাইবাবু খাবেন, শনিবারের বাজার যেমন হয়ে থাকে তেমনি হয় যেন।

সাড়ে দশটা। একখানা মোটর আসিয়া জুনিয়র ব্যারিষ্টারের বাড়ীর সদর দরজার সামনে থামিল। পিঁয়াজ রঙের সাড়ী-পরা একটি স্ত্রীলোক মোটর হইতে নামিয়া বাড়ীর ভিতরে আসিলেন। নীচের তলায় বেহারাকে

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেম সাহেব ঘরমে হ্যায়?" বেহারা সেলাম্ করিয়া হাঁ বলিলে তিনি উপরের তলায় মবুট পদবিক্ষেপে সিঁড়ির ধাপ গুণিতে গুণিতে উঠিলেন। মেম সাহেব শয়নকক্ষে কাউচের উপর শুইয়াছিলেন। যিনি আসিলেন তিনিও মেম সাহেব। দুইজনে গাঢ় আলিঙ্গনের পর কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। যিনি আসিয়াছেন তিনি সিনিয়র ব্যারিষ্টারের পত্নী, নাম—মিসেস্ রডার। রুদ্রজায়া জুনিয়ার ব্যারিষ্টারের পত্নী ঘোষজায়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিষ্টার গুজ্ কোথায়?" মিসেস্ গুজ্ বলিলেন, "কোর্টে বেরিয়েছেন।"

"শনিবারে কোর্ট! আজ ত হাইকোর্ট বন্ধ।"

"হাওড়া শেসনে মকদ্দমা আছে।"

"ও—ও—ও, তাও বটে, আমারই ভুল হয়েছে। গুজ্ সাহেবের যে শনিবারে নগদ টাকার দরকার। যাই হ'ক, আজকের রেশে জিতলে সব টাকা তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিও ভাই।"

"রডার সাহেব রেশ খেলেন না?"

"খেলেন বৈ কি। এই ত ব্রেকফাষ্ট সেরেই একজন নামজাদা জকির কাছ থেকে লেটেষ্ট টিপ্ স্ জেনে নিতে বেরিয়েছেন, বাড়ী ফিরবেন লাষ্ট রেশের পর। চল না ভাই আমার সঙ্গে ব্রাড্ লর হাফ্ প্রাইস্ সেলে। আমি গোটা কতক জিনিষ কিনব। তোমার যদি কিছু দরকার থাকে ত সস্তায় কিনতে পারবে।"

"আমার একটা ব্লাউজ প্যাটার্ণ সিল্ক জ্যাকেটের দরকার আছে।"

'ব্লাউজ প্যাটার্ণ সিল্ক জ্যাকেট? মোটরে প্রাইস্-লিষ্টখানা ভুলে রেখে এসেছি। সইস্—সইস্—মোটরমে একঠো কিতাব হ্যায়, ওই কিতাবটো লাও।"

সহিস ব্রাড্ লর প্রাইস্-লিষ্ট আনিলে মিসেস রডার পাতা উল্টাইয়া ব্লাউজ প্যাটার্ণ জ্যাকেটের ছবিখানা বা'র করলেন। সেল্ প্রাইস্ ৮০ৎ টাকা। মিসেস গুজ্ বলিলেন, "তবে আর আজকে হ'ল না। আমার ড্রয়ারে ৫০ৎ টাকার বেশী নাই।" 'বাকী টাকা আমি দেব, আমার সঙ্গে চল্। আজ আবার শনিবারের বাজার, ছটোর সময় ব্রাড্ লর দোকান বন্ধ হবে।"

এক ঘণ্টা পরে মিসেস রডার বাড়ী থেকে ফিরে এসে মিসেস গুজ্‌কে মোটরে তুলে নিয়ে ব্রাড্ লর দোকানে গেলেন। সুন্দরী বিদেশিনীগণ তাঁহাদিগকে প্রত্যেক হলে অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নানান রকম জিনিষ দেখাইয়া মিসেস রডার ও মিসেস গুজের মন ভিজাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। মিসেস রডার সিল্কের মোজা রুমাল ইত্যাদি খরিদ করিতে করিতে চলিলেন। পোষাকের হলে আসিয়া যখন তাঁহারা ৮০ৎ টাকা দাম-লেখা সেই জ্যাকেট দেখিতে পাইলেন তখন দুইজনেই সমস্বরে বলিলেন, "কি সুন্দর জ্যাকেট!" সপ্-গারল্ বলিলেন, "এই ব্লাউজ প্যাটার্ণ জ্যাকেটটী একজন ইণ্ডিয়ান প্রিন্সেসের অর্ডারে বিলাতে প্রস্তুত হইয়াছিল, তিনি ডেলিভারি না লওয়াতে আমরা অর্দ্ধেক দামে বিক্রয় করিতেছি, ইহার ওরিজিনাল্ দাম দশ গিনি।" পোষাকটি বিস্তর আসল মুক্তার থোকায় সুশোভিত, কলারের বেড় ডবল রো আসল মুক্তা দিয়ে ঘেরা। মিসেস গুজ্ বলিলেন, "আমার গায়ে ফিট্ হবে?" সপ্-গারল্ তখনি ঈষৎ হাসিয়া তাঁহার দেহের মাপ লইতে আরম্ভ করিলেন। মিসেস রডার বলিলেন, "এত টাকা দামের জিনিষ খরিদ করা তোমার উচিত নয়। মিষ্টার গুজ্ নিশ্চয় রাগ করবেন।" সপ্-গারল্ মাপ লইয়া বলিলেন, "ফিট্ হবে।" মিসেস রডার বলিলেন, "আমার গায়ে ফিট করবে কি না দেখ ত।" সপ্-গারল্ মিসেস রডারের গায়ের মাপ লইতে সুরু করিলেন। মিসেস গুজ্ বলিলেন, "হাফ্ প্রাইস্ সেলের জিনিস কি আপনার ব্যবহার করা উচিত? লোকে যে মিষ্টার রডারের নিন্দা করবে। আপনি বরং একটা নূতন অর্ডার দিন। আমিই এটা খরিদ করি।" সপ্-গারল্ মাপ লইয়া বলিলেন, "দুজনেরই গায়ে ফিট্ করবে।" মিসেস রডার মিসেস গুজ্‌কে বলিলেন, 'তুমি ঠিক ব'লেছ ভাই, তবে আমি একটা নূতন জ্যাকেটের অর্ডার দি। (সপ্-গারলকে) অর্ডার দিলে আর একটি ঠিক এই রকম জ্যাকেট বিলাত হইতে কত দিনে আসবে? সপ্-গারল্ বলিলেন, "তিন মাসের মধ্যে।"

"তবে দিদি এই জ্যাকেটটি আমি কিনব।"

"আমি অন্য অনেক জিনিস কিনে ফেলেছি, আমার কাছে ত এখন অত টাকা নাই।"

"আমার কাছে ৫০ টাকা আছে। আপনি ত বলেছিলেন, বাকী টাকা দেবেন? তাই ত আপনার সঙ্গে এসেছি।"

"তা হ'ক, কাল এসে কিনে নিয়ে যেও।"

সপ্-গারল্ অন্য এক মেমের সঙ্গে কথা কহিতেছেন দেখিয়া মিসেস রডার তাঁহাকে ইসারা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমরা আসছি।" এই কথা বলিয়া মিসেস রডার অন্য হলের দিকে যাইবার জন্য ফিরিলেন দেখিয়া মিসেস গুজ্ তাঁহাকে বলিলেন, "তবে দিদি আমি বাড়ী যাই, আপনার সোফারকে ব'লে দিন, আমাকে বাড়ী রেখে আসুক।" সোফার দোকানের দরজায় দাঁড়িয়েছিল। মিসেস রডার তাকে বলিলেন, মিসেস গুজ্‌কে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবে। তারপর মিসেস গুজের হতাশ চেহারা দেখে তাঁহাকে বলিলেন, "আচ্ছ, একটু পরে যেও, একবার টেপ্‌ষ্ট্রির ঘরে দেখিগে চল।" টেপ্‌ষ্ট্রির ঘরে জজ সাহেবের মেমকে দেখিয়া মিসেস রডার তাঁহার করমর্দ্দন করিবার জন্য দ্রুত চলিলেন, আর মিসেস গুজ্‌কে বলিলেন, "গুড বাই।" মিসেস রডার জজ সাহেবের মেমকে পাইয়া তাঁহার সহিত নানা বিষয়ের কথোপকথনে সময় কাটাইতে লাগিলেন। মিসেস গুজ্ টেপ্‌ষ্ট্রির ঘর হইতে বাহির হইলে মিসেস রডার মনে মনে বলিলেন, "আঃ বাঁচা গেল!" মিসেস গুজ্ টেপ্‌ষ্ট্রির ঘর হইতে পোষাকের ঘরে যাইয়া সেই পূর্ব্বপরিচিত সপ্-গারলকে ৫০ টাকা নগদ দিয়া বলিলেন, "এখনি বেহারার হাতে—নম্বর—ষ্ট্রীটে জ্যাকেটটি পাঠাইয়া দিন, আমি বাকী ৩০ টাকা তার হাতে দেব।" সপ্-গারল্ তৎক্ষণাৎ কাগজের বাক্সে সেই জ্যাকেটটি প্যাক করিয়া দোকানের বেহারাকে বাক্সটী দিয়া বলিলেন, "এই মেম সাহেবের নিকট বাকী ৩০ টাকা লইয়া বিল দেবে।" মিসেস গুজ্‌কে বলিলেন, "ইহাকে ১ টাকা বকশিস দিবেন।" বেহারা ব্রাড্‌লর দোকান হইতে একদিক দিয়া মাল লইয়া বাহির হইয়া গেল, মিসেস গুজ্ অপরদিক দিয়া রাস্তায় আসিয়া মিসেস রডারের মোটরে বসিয়া বাড়ী ফিরিলেন। বাড়ীতে আসিয়াই মিসেস গুজ্ বাড়ীর সামনে রাস্তার অপরদিকে পোদ্দারের দোকানে একটি ব্রেস্‌লেট মিষ্টার গুজের লোক যিনি ইতিপূর্ব্বেই হাওড়া হইতে ফিরিয়াছিলেন, তাঁহার মারফৎ বন্ধক দিয়া ৫০ টাকা কর্জ্জ করিয়া আনাইলেন। ব্রাড্‌লর দোকান হইতে বেহারা জ্যাকেট আনিলে তাহাকে ৩১ টাকা দিয়া বিল ও প্যাকেট গ্রহণ করিলেন। গুজ্ সাহেবের ক্লার্কের নিকট তিনি শুনিলেন যে, হাওড়া সেসনে মকদ্দমা জিতিয়া সাহেব রেশ খেলিতে গিয়াছেন।

ঘড়ীতে সাড়ে চারিটা বাজিল। মিষ্টার গুজ্ বেশ একটু গুডদার ফ্র্তির সহিত বাটীতে ফিরিয়া মেম সাহেবকে ৮৫০ টাকা দিয়া বলিলেন, "আজ সব কাযেই সাক্‌সেস্‌ফুল। মকদ্দমা জিতে একখানা টেক্সি ভাড়া ক'রে রেশ কোর্শে গেলাম। যত টাকা আমার পকেটে ছিল, সব "ভাগ্যপরীক্ষক" নামে ঘোড়ার উপর ধরিলাম। দ্বিতীয় রেশে এই ঘোড়া আমাকে ১৮০০ টাকা টোটে জিতিয়া দিল। আমি আর অন্য বাজী না খেলে বাড়ী ফিরছি। লোন আপিসে যে ঋণ ছিল, পাই পয়সা শোধ ক'রে দিয়ে আসছি। এখন তোমার যা' দেনা আছে শোধ ক'রে শিগ্‌গীর তৈরী হও, মহারাজার বাড়ীতে 'এ্যাট্ হোমে'র নিমন্ত্রণ আছে, সাড়ে পাঁচটার সময়ে অন্ততঃ সেখানে পৌঁছান চাই, নইলে মজলিস ভেঙ্গে যাবে।"

মিসেস রডার যতক্ষণ না জজ সাহেবের মেমের সহিত কথা কহিয়া নিজেকে ফুল্‌ডোজে আপ্যায়িত মনে করিলেন, ততক্ষণ তিনি তাঁহার সঙ্গ ছাড়িলেন না। জজ সাহেবের মেমের নিকট বিদায় লইয়া তিনি দ্রুতপদে পোষাকের হলে পুনরায় প্রবেশ করিলেন। সেই ব্লাউজ প্যাটার্ণ জ্যাকেটটি যথাস্থানে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। মিসেস গুজ্ কি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিল? সেই সপ্-গারলের বদলে আর একজন তাঁহার স্থান টলে অধিকার করিয়াছে। তাঁহাকে জ্যাকেটের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কোনও সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া মিসেস রডার রাস্তায় আসিয়া নিজের সোফারকে জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন। মিসেস গুজ্ কোনও জিনিষ লইয়া মোটরে

বাড়ী ফিরিয়াছে কি না, এই কথা বার বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলেন যে, তাঁহার সন্দেহের কোনও কারণ নাই। ভাল বারিণেন্ হাত-ছাড়া হ'ল, এবার থেকে আর কারুর সঙ্গে সপিং করতে বেরুব না, জজ সাহেবের মেমের সঙ্গেও বা যদি দেখা না হয়, তাহ'লে মিসেস গুজ্ যেমন চলিয়া গেল আমি তখন জ্যাকেটটি কিনতে পারতেম, আজকে শনিবারের বাজারটা বড় সুবিধা হ'ল না, এই প্রকার নানান কথা মনের মধ্যে তোলা-পাড়া করতে করতে মিসেস রডার বাড়ী ফিরিলেন।

সাড়ে পাঁচটার সময় গুজ্-দম্পতি যখন মহারাজার এ্যাট্ হোমে উপস্থিত হইলেন, তখন মজলিস ভরপুর। মহারাজার প্রকাণ্ড বাটীর সংলগ্ন বিস্তীর্ণ পার্কে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সপরিবারে উপস্থিত হইয়া বেশভূষা ও রূপের ছটায় দশদিক আলোকিত করিয়া রহিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান্ ও য়ুরোপীয়ান্ সম্প্রদায়ের মধ্যে নামজাদা স্ত্রী-পুরুষের এমন সম্মেলন অনেক দিন দেখা যায় নাই। জজ সাহেবের মেম একদল শিক্ষিতা বাঙ্গালিনীর মাঝে দাঁড়াইয়া মিসেস্ রডারের সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন। তিনি দূর হইতে মিসেস গুজ্‌কে দেখিতে পাইয়া মিসেস রডারকে বলিলেন, "আপনার সহিত ঐ সুন্দরী মহিলাটিকে আজ ব্রাড্‌লর সেলে দেখিয়াছিলাম না? আহা কি সুন্দর জ্যাকেট!" মিসেস রডার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া সেখান হইতে যে কোথায় সরিয়া পড়িলেন তাহার সংবাদ কেহ জানে না।

কে কার আপন?

[শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ]

কে কার আপন?
কার সনে কি সম্পর্ক? কেন মিছে করি তর্ক?—
ভাই বল, বন্ধু বল, আত্মীয় স্বজন—
সকলে স্বার্থের দাস,— মর গলে দিয়ে ফাঁস
কেহ না দেখিবে তাহা!—দাও যদি ধন—
বিনিময়ে পাবে তবে স্নেহ-আলিঙ্গন।
চঞ্চলা হইলে লক্ষ্মী—সবই হয় পর।

মাতা কন কুবচন,— প্রেয়সী বিদ্রোহী হ'ন—
শত্রুবৎ আচরণ করে সহোদর!
প্রাণ হ'তে প্রিয়তম মিত্র হয় শত্রু সম—
নিসর্গ বিপক্ষে তার হয় অগ্রসর
করি যেন রক্ত চক্ষু—অতি ভয়ঙ্কর।
যাই যেথা করে' আশা পাব ভক্তি ভালবাসা—
পাই সেথা কৃতঘ্নতা, ঘৃণা হলাহল,—
চঞ্চলা হইলে লক্ষ্মী মরণ মঙ্গল।

সংগ্রহ ও সঙ্কলন।

মনুষ্য-বিক্রয়-পত্র।

দ্বাদশবর্ষ পূর্ব্বে আমি "যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাসের" উপাদান সংগ্রহ কালে আমারই নিজ গ্রামের সন্নিকটে একখানি দাসখত বা মনুষ্য-বিক্রয় পত্র হস্তে পাই। সে পুরাতন জীর্ণ দলিলখানি এখনও আমার নিকট আছে। গত ১৩১৯ সালের ফাল্গুন মাসে আমি "ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন" নামক মাসিক পত্রে উক্ত দাসখতের অবিকল প্রতিলিপি মন্তব্য সহ প্রকাশিত করিয়া কয়েকটি ঐতিহাসিক রহস্য উদ্ধারের জন্য তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়াছিলাম। উহার কি ফল হইয়াছে, তাহা পরে বলিতেছি। উক্ত দাসখতে দেখিতে পাইয়াছি, প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে বরিশালের একজন কায়স্থ ভদ্রলোক ৭টি ছোট বড় স্ত্রী পুরুষকে ৩১৲ একত্রিশ টাকায় বিক্রয় করিতেছেন। সম্প্রতি যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমা নিবাসী জনৈক ভদ্রলোকের

কট হইতে আমি আর একখানি "বান্দাজীরী" বা মনুষ্য-বিক্রয়-পত্র সংগ্রহ করিয়াছি। দলিলখানি ১১৯৪ সালের ১৬ই পৌষ বা ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রদত্ত। সুতরাং উহার বয়স ১৩৬ বৎসর এবং উহা ইংরাজ রাজত্বারম্ভের পর লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসন কালে সম্পাদিত হইয়াছিল। এই দলিল পুরাতন তুলট কাগজে উৎকৃষ্ট কালো কালী দ্বারা সুন্দর হস্তাক্ষরে, প্রায় একই মর্ম্মে, উপরি ভাগে ফারসী ভাষায় এবং নিম্ন ভাগে বহু উর্দ্দু শব্দ সম্বলিত বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। ফারসী ও বাঙ্গালা উভয় হস্তাক্ষর এমন সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন, যে, বর্ত্তমান যুগে উহা এক প্রকার দুর্ল্লভ। তবে লিপির ভাব ও ভঙ্গি, রচনা ও বানান সকলই যে প্রাচীন কালের স্মৃতি বহন করিতেছে, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। দলিলের মর্ম্ম এই যে, (বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত) আমীরাবাদ পরগণাস্থিত গোয়ালা গ্রাম নিবাসী রামনাথ চক্রবর্ত্তী তাহার পদ্মলোচন দাস নামক একটি সাত বৎসর বয়স্ক দাসকে দুর্ভিক্ষ বশতঃ অন্নবস্ত্র দিতে না পারিয়া দুই টাকা মাত্র পণে রাজচন্দ্র সরকারের নিকট বিক্রয় করেন। দলিলের বাঙ্গালা অংশের অবিকল প্রতিলিপি এবং ফারসী অংশের সরলানুবাদ নিম্নে দিতেছি।

মূল বাঙ্গালা দলিলখানি (হস্তলিখিত বানানের কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া) অবিকল উদ্ধৃত হইতেছে :—

"ইয়াদি কির্দ্দি[১] সকল মঙ্গলালয় শ্রীরাজচন্দ্র সরকার সচ্চরিতেষু। লিখিতং শ্রীরামনাথ শর্ম্মণঃ পিসরে[২] রামবল্লভ চক্রবর্ত্তী এবনে রামকেসব চক্রবর্ত্তী সাকিন গোয়ালা পরগণে আমিরাবাদ বান্দাজীরী[৩] পত্রমিদং সন ১১৯৪ সন এগারো সও চৌরানব্বৈ সালাব্দে লিখিনং কার্য্যানঞ্চাগে আমার কওলার মনুস্য[৪] শ্রীপদ্য লোচন দাশ পিসরে রামকান্ত দাশ ইবনে দুর্গারাম দাশ ওলদে[২] সতানন্দ দাশ উমর[৫] সাত বৎসর উত্তম শ্যাম বর্ণো কতসানীতে[৬] ইহাকে প্রতি-পালন করিতে না পারিয়া সেৎসা পূর্ব্বক[৭] নগদ ২ দুই টাকা সিক্কা পন দস্তবদস্ত[৮] পাইয়া তোমার স্থানে বিক্রী করিলাম জাবত জিবন পর্য্যন্ত অন্ন বস্ত্র দিয়া প্রতিপালন করিবা তোমার নকরী[৯] ব্যাপার করিবেক তোমার দাসীর সহিত বিবাহ দিবা সন্তানাদি যে হয় তাহারাও তোমার নকরী ও দাসিত্ব করিবেক দান বিক্রীর অধিকার তোমার কোন-থানে পলাইয়া জায় আপন একক্তিয়ারে[১০] পাকড়া করিয়া আনিবা মর্দ্দত[১১] ৭০ সত্তরী বৎসর ইহার পর আজাদ[১২] হইতে চাহে হলব্বা[১৩] সহরের ২২ বাইষ মন সিসা[১৪] ও রযুনের ছিলকা[১৫] দিয়া আজাদ হইবেক এতদর্থে মনুষ্য-বিক্রী পত্র দিলাম ইতি সন সদর বতারিখ—১৬ সোলত্ত্বী পৌষ।" *

দলিলে উপরিভাগে ফারসীতে যাহা লিখিত আছে, তাহার সরল বঙ্গানুবাদ এইরূপ :—

'চাকলা ভূষণার অন্তর্গত পরগণে আমীরাবাদের মৌজা গোয়ালা নিবাসী আমি রামনাথ শর্ম্মা পিতার নাম রামবল্লভ চক্রবর্ত্তী সুস্থাবস্থায় স্থির বুদ্ধিতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এইরূপভাবে অঙ্গীকার করিতেছি এবং লিখিয়া দিতেছি যে একজন গোলাম - নাম পদ্মলোচন দাস পিতা রামকান্ত দাস তদীয় পিতা দুর্গারাম দাস বয়স ৭ বৎসর, শ্যামবর্ণ (মূল ফারসীতে গোন্দুম বা গোধুম রঙ্) উহাকে দলিল করিয়া নিজ অধীনে আনিয়াছিলাম, বর্ত্তমানে দুর্ভিক্ষের সময় বলিয়া তাহার ভরণপোষণ দিয়া প্রতিপালন করিয়া অসমর্থ হইয়াছি। সেইজন্য শ্রীরাজচন্দ্র সরকারের নিকট হইতে

১ ইয়াদি কির্দ্দি—ইয়াদে কোর্দ্দেগার (ফারসী)—ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া। ২ পিসরে, এবনে বা ইবনে, ওলদে তিনটি শব্দই তস্য পিতা এইরূপ এক অর্থে প্রযুক্ত হয় এবং যথাক্রমে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহের নামের পৃষ্ঠে ব্যবহৃত হইত। ৩ বান্দাজিরী—"বান্দা-আজীর" (দাস-মজুর) হইতে প্রতিপন্ন—দাস-বিক্রয়-দলিল। ৪ কওলার মনুস্য—কোবলা দ্বারা পূর্ব্বক্রীত মনুষ্য বা দাস। ৫ উমর—বয়স। ৬ কতসানী—কহৎছালী (ফারসী)—দুর্ভিক্ষ। ৭ সেৎসা—স্বেচ্ছা। ৮ দস্তবদস্ত—হাতে হাতে। ৯ নকরী—দাসত্ব। ১০ একক্তিয়ার—এক্তিয়ার অর্থাৎ অধিকার। ১১ মর্দ্দত—মুদ্দত—মেয়াদ (সময়)। ১২ আজাদ—মুক্ত। ১৩ হলব্বা—এই সহর কোথায় ঠিক জানা যায় না; সম্ভবতঃ আরব বা শ্যাম দেশের অন্তর্গত হলভ্ বা হলভী নামক সহর হইতে পারে। ১৪ সিসা—কাচ বা সীসক ধাতু। ১৫। ছিলকা—খোসা।

* দলিলের লিপিতে অন্য যে সব বর্ণাশুদ্ধি আছে, আশা করি পাঠকগণ উহা সহজেই ধরিয়া লইয়া সমস্ত লিপির অর্থবোধ করিতে পারিবেন।

সিক্কা দুই টাকা গ্রহণ করিয়া ঐ টাকার পরিবর্ত্তে স্বেচ্ছা-সম্মতিপূর্ব্বক উক্ত সরকারের নিকট বর্ণিত দাসকে বান্দা-আজাীর (দাস বিক্রয় দলিল) করিয়া দিলাম। সে উক্ত সরকারের সর্ব্বত্র তাহার সঙ্গে থাকিয়া সেবা করিবে। তিনি উহাকে আপন দাসীর সহিত বিবাহ দিবেন। উহার যে সকল সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারাও ঐরূপ দাস দাসীর কার্য্য করিবে। যদি কখনও অন্যত্র পলাইয়া যায়, তাহাকে নিজ ক্ষমতায় ধরিয়া আনিতে পারিবেন। যদি সে কখন মুক্ত হইতে চায়, হুলভ্ সহরের এক মণ * সিসা ও রসুনের খোসা দিয়া মুক্তিপত্র গ্রহণ পূর্ব্বক মুক্ত হইতে পারিবে। এতদর্থে দান বিক্রয় পত্র লিখিয়া দিলাম। ভবিষ্যতে আবশ্যক মত কার্য্যে লাগিবে। সন ১১৯৪ সালাব্দ ১৬ই পৌষ।'

এই ফারসী অংশের শিরোভাগে যে প্রাচীন কালের সিলমোহর দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে সৈয়দ জালাল্ উদ্দীন হাইদরের অনুগত আমীর (প্রধান) কাজি রফি-উদ্দীনের নাম পাওয়া যায়। পার্শ্বে হস্তাক্ষরে লিখিত আছে, সাক্ষীদিগের সম্মুখে মোহর সংযুক্ত হইল এবং মোহরের দুই পার্শ্বে সাক্ষী কানুনগো গোকুলকৃষ্ণ দাসের স্বাক্ষর আছে। ইহা ব্যতীত বাঙ্গালা অংশে দক্ষিণ শিরোভাগে দলিলদাতা রামনাথ শর্ম্মা সাং গোহালা পোঃ আমীরাবাদ বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন। মূল বাঙ্গালা দলিলের পৃষ্ঠে ৬ জন সাক্ষীর দস্তখত আছে। তন্মধ্যে ৪ জনের নিবাস বাঐগ্রানি, একজনের নিবাস নারায়ণপুর এবং অবশিষ্টের নিবাস তেলিহাটি পরগণার ভাটরা গ্রাম। বর্ত্তমান যশোহর জেলার অন্তর্গত যে মহম্মদপুরে রাজা সীতারাম রায়ের রাজধানী ছিল, এবং যে স্থানের উক্ত নামকরণ তিনিই করিয়াছিলেন, তাহারই পূর্ব্বনাম বাঐ-জানি বা বাগজানি; এখন রাজধানী নাই, বাঐজানি নাম আছে এবং উহার পার্শ্বে নারায়ণপুর গ্রাম বিদ্যমান (যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৫৪১ পৃঃ)। এই স্থান যে ভূষণা সরকারের অন্তর্গত, তাহা ফারসী লিপি হইতে পাওয়া গেল। ইংরাজ আমলের প্রথমে এই মহম্মদপুরেই যশোহর জেলার সদর ষ্টেশন করিবার কথা হইয়াছিল। দলিলোক্ত সময়ে সম্ভবতঃ এইস্থানে কাজির আদালত ছিল এবং তথাকার কাজি রফিউদ্দীনের নিকট দলিলখানি তদানীন্তন প্রথায় রেজেষ্ট্রী করা হয়। দাস-ক্রেতা রাজচন্দ্র সরকারের বাড়ীর উল্লেখ না থাকিলেও তাহার বাসস্থান যে বাঐজানি বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। সরকারী কানুনগো ও ছয়জন লেখাপড়া জানা বিশিষ্ট সাক্ষীর স্বাক্ষর, কাজির মোহর ও হস্তলিপি প্রভৃতি প্রমাণ হইতে দলিলের সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না।

দলিলের আরও দুই একটি উক্তি হইতে সমসাময়িক অবস্থার ইতিবৃত্তের দিকে আমাদের দৃষ্টি পতিত হয়। প্রথমতঃ কহৎছালী বা দুর্ভিক্ষ তখনও হইত। † এত কষ্ট উপস্থিত হইত যে, দুই টাকায় একটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ সাত বৎসর বয়স্ক সুন্দর বালককে বিক্রয় করিয়া ফেলিবার হৃদয়হীনতার অভাব হইত না।

দ্বিতীয়তঃ রামনাথ শর্ম্মা উল্লেখ করিতেছেন যে, বালকটি তাহার কওলার মনুষ্য; অর্থাৎ ঐ বালককে তিনি কোবালা পত্রে খরিদ করিয়া লইয়াছিলেন; এখন আবার বিক্রয় করিতেছেন। আমি যে অন্য দাসখতখানি ঢাকা রিভিউ পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে লিখিত আছে, "আমার খানে জাত নিজ মনুষ্য শ্রীশিবাই সজ্জন আর তিতি নামে তাহার স্ত্রী, এবং শ্রীরামপাল, শ্রীকৃষ্ণ জীবন পাল, শ্রীরাজারাম পাল ও শ্রীমণিরাম পাল এই চাইর (চারি) পুত্র ও রুক্মিণী নামে তাহার কন্যা এই সাতজন

* বাঙ্গালা দলিলে অঙ্কে ও অক্ষরে ২২ বাইশ মণ সীসার উল্লেখ আছে, কিন্তু ফারসী অংশে স্পষ্টই একমণই আছে। সম্ভবতঃ বাঙ্গালার উক্তিই সত্য, কারণ পণটি যথাসাধ্য ভাবে অসম্ভব করা হইয়াছে, অর্থাৎ সহজে আর উদ্ধারের উপায় নাই। তবে রসুনের খোসার ওজন দেওয়া আছে। সীসা সংগ্রহ করিতে না পারিলে পর্ব্বত প্রমাণ রসুনের খোসা দিয়াও নির্দ্দিষ্ট ওজন পূরণ করার সম্ভাবনা ছিল না।

† এই দলিল সম্পাদিত হইবার বৎসরে অর্থাৎ ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে যে একটি দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তাহা সরকারী কাগজপত্র হইতে জানিতে পারি। See Calcutta Gazette, 20th September, 1787 and 27th March, 1788.

মনুষ্য সুদ দিতে না পারিয়া দায়গ্রস্ত হইয়া তোমার নিকটে বলগে ৩১৲ টাকায়” ইত্যাদি। এখানকার উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, শিবাইকে দাসরূপে ক্রয় করা হয়। তাহার প্রভু তাহার সহিত তিতি নাম্নী এক দাসীর বিবাহ দেন, উহার ফলে উহাদের ৪ পুত্র ও এক কন্যা হয়। ইহাতেই “খানে জাত নিজ মনুষ্য” বা দাস বলা হইতেছে। এখনও যাহারা চাকরগিরি করে বা দৈনিক কৃষাণ দেয়, তাহাদিগকে স্থানভেদে মনিষ (মনুষ্য) বা মজুর বলে। মোট কথা, বুঝা যাইতেছে যে, লোকে পুরুষানুক্রমে দাসদাসী হইয়া থাকিত।

তৃতীয়তঃ কোন ব্যক্তি নিজ দাসের ভরণপোষণ দিতে অসমর্থ হইলে সময় সময় উহাকে নামমাত্র শুল্ক লইয়া অন্য ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতেন। টাকার মূল্য তখন অনেক বেশী ছিল, তাহা সত্য। কিন্তু দুই টাকা পণে দূরে গিয়া দলিল রেজেষ্ট্রী করিয়া কাজিকে নজরানা দিয়া পোষাইত না তাহা সত্য। সুতরাং এখন যেমন কেহ কেহ কাহাকেও গবাদি পশু উপহার দেওয়ার সময় স্বত্বত্যাগের নিদর্শন স্বরূপ একটি পয়সা মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন, পূর্ব্বেও কোন কোন সময় নামমাত্র পণ লইয়া দাস বিক্রয় করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। চতুর্থতঃ দুর্ভিক্ষাদি জন্য লোকে যে শুধু দাস বিক্রয় করিত, তাহা নহে; কেহ কেহ আত্মবিক্রয় করিয়া অর্থাৎ চির জীবনের দাসত্ব স্বীকৃতি পূর্ব্বক কিছু পণ লইয়া তদ্দ্বারা নিজের পূর্ব্ব দেনা পরিশোধ করিতেন। কোন কোন প্রভু নিজের খরিদা দাসীকন্যাকে বিবাহ দিবার সময় “ফারগ-পত্র” লিখিয়া দিয়া নিজে মুনিবানার জন্য সামান্য কিছু অর্থ লইয়া অবশিষ্ট শুল্ক দাসীকন্যার পিতামাতাকে দিতেন। এই দুইপ্রকার দাস বিক্রয় প্রথার প্রমাণ স্বরূপ সুলেখক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহোদয় স্বপ্রণীত “শ্রীহট্টের ইতিহাসে” (২য়, ৫ম ৮৮-৯পৃঃ) দুইখানি মনুষ্যবিক্রয় পত্র অবিকল প্রকাশিত করিয়াছেন।

গত ১৯২২ অব্দে কলিকাতার ওরিয়েণ্টাল কন্‌ফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশনের ঐতিহাসিক শাখায় ঢাকা মিউজিয়মের কিউরেটর প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লেখক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ মহাশয় “পরগণাতি সনের” সময় নির্দ্দেশকল্পে একটী উপাদেয় নিবন্ধ পাঠ করেন। উহাতে তিনি যে ১৬খানি প্রাচীন দলিলে পরগণাতি সনের উল্লেখ পাইয়াছেন, তন্মধ্যে “ঢাকা রিভিউ” পত্রে প্রকাশিত আমার “দাসখত”খানি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন বলিয়া অবধারণ করেন। তিনি ঐখানি ব্যতীত আরও ৪খানি দাসখত বিচার করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ২খানি তাঁহার নিজের সংগৃহীত এবং ২খানি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয়ের ‘ঢাকার ইতিহাসে” প্রকাশিত হইয়াছে। নানাপ্রকার বিচারফলে শ্রীযুক্ত ভট্টশালী মহাশয় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, ১১২৪ শকাব্দের ১লা কার্ত্তিক অর্থাৎ ১২০২ খৃষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে পরগণাতি সনের সূত্রপাত হয়। আমিও ঐ মত সমর্থন করি। মৎ প্রকাশিত পূর্ব্ব দাসখত খানিতে ৪৬১ সনের উল্লেখ আছে, এবং উহা যে পরগণাতি সন তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। তাহা হইলে উক্ত দাসখতখানি ৪৬১+১২০২ অর্থাৎ ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত হয়। তাহা হইলে উহার বয়স ২৬০ বৎসরের কম নহে। আমার বর্ত্তমান মনুষ্যবিক্রয় পত্রখানিতে পরগণাতি সনের উল্লেখ নাই, ইহাতে সুস্পষ্টভাবে বাঙ্গালা মাসই দেওয়া হইয়াছে। খুব সম্ভবতঃ ইংরাজ আমলের প্রাক্কাল হইতে পরগণাতি সনের গণনা স্থগিত হইয়াছিল। ভট্টশালী মহাশয় বলেন যে, বাঙ্গালা দ্বাদশ শতাব্দে অর্থাৎ ১৬৯৪ হইতে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ মধ্যে পরগণাতি সনযুক্ত দলিল কদাচিৎ পাওয়া গিয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে উহার ব্যবহার সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। আমাদের বর্ত্তমান দলিলখানি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ৬৭ বৎসর পূর্ব্বে সম্পাদিত।

অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, বি-এ।

ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১

—০—

চুল পড়া বন্ধের চেষ্টা।

চুল আঁচড়াইবার জন্য যে ব্রাস ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার মত চুলের পক্ষে উপকারী আর কিছু নাই। ইহা ব্যবহারে মাথার মরা মাস দূর হয় এবং প্রত্যহ দ্রুত ও জোরে মস্তক বুরুশ দ্বারা পরিষ্কার করিলে যে উপকার

পাওয়া যায়, তাহার তুলনা হয় না। নূতন কেশোদ্গমের জন্য ইহা অমূল্য। কেশের চাকচিক্য ও পুষ্টি ক্রশ ব্যবহারে যেরূপ হইয়া থাকে সেরূপ আর কিছুতে হয় না।

মানুষের মাথার চুল স্বভাবতঃ আপনি উঠিয়া যায়। আমাদিগের চামড়ার উপরের শুষ্ক পর্দ্দা যেমন আমাদের শরীর হইতে ক্রমাগত খসিয়া পড়ে তদ্রূপ মাথার চুলও পড়িয়া যায় এবং অধিকাংশ লোকের মাথায় খুস্কি বা মরামাস হয়, তাহা একই কারণে। আমাদিগের চুল স্বাভাবিক নিয়মানুসারে যাহা উঠিয়া যায়, তাহার জন্য আমাদিগের কোনও চিন্তা নাই। প্রত্যেক চুল কিছু দিন মস্তকের ত্বকে সংলগ্ন থাকিয়া স্বাভাবিক নিয়মানুসারে আপনি গোড়া আলা হইয়া গিয়া পড়িয়া যায়। তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে নূতন চুল উঠিতে থাকে। প্রত্যেক চুল কত দিনে ত্বকের সহিত সংলগ্ন থাকে তাহা অজানিত; কারণ এবিষয়ে চিকিৎসকগণের বিভিন্ন অভিমত আছে। সম্ভবতঃ মাথার প্রত্যেক চুল কয়েক মাস হইতে আরম্ভ করিয়া দুই হইতে চারি বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। ঋতু অনুসারে এবং স্বাস্থ্যের অনুযায়ী ইহার স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

এই স্বাভাবিক চুল পড়া অনেক সময়ে বৃথা চিন্তার কারণ হইয়া থাকে। অবশ্য যদি অনেক পরিমাণ চুল পড়িয়া যাইতে থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে, এই বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। যে সকল মহিলা চিন্তাভারাক্রান্ত এবং অত্যন্ত স্নায়ুদৌর্ব্বল্যগ্রস্ত তাঁহাদেরই চুল উঠিয়া যাইতে আরম্ভ করিলে তাহা থামান কষ্টকর, কারণ তাঁহারাই অধিকরূপে ইহা দ্বারা আক্রান্ত হন এবং যে সকল মহিলা হর্ষ ও আনন্দে থাকেন, তাঁহাদের চুলপড়া রোগ কমই হইয়া থাকে। মানুষের স্বাস্থ্য যেরূপ, চুলের অবস্থায় সেইরূপ হইয়া থাকে। হিসাবে দেখা যায় যে, শতকরা ৮০ হইতে ৯১ জনের মাথায় টাক পড়ার মূল কারণ মাথায় খুস্কি বা মরামাস।

এই মরামাস দূর করিতে হইলে মাথার ত্বক ভাল করিয়া পরিষ্কার রাখিতে হইবে এবং পরিষ্কার রাখার নিশ্চিত উপায় প্রত্যহ পরিষ্কার বুরুশের দ্বারা মাথা বুরুশ করা। তাহা ছাড়া মাথা উৎকৃষ্ট সাবান কিম্বা তদপেক্ষা উত্তম রিঠা, খইল বা ব্যসন দ্বারা পরিষ্কার করা। কাহারও এইরূপ সপ্তাহে একবার পরিষ্কার করা উচিত, কাহারও বা মাসে একবার পরিষ্কার করিলেও চলে। এই সকল জিনিষ চুলের অবস্থা বুঝিয়া করিতে হয়।

প্রত্যহ মস্তকের ত্বক হস্ত দ্বারা সঞ্চালন করিলে এবং মস্তকে বুরুশ ব্যবহার করিলে শতকরা ৭৫ জনের মাথায় টাক পড়িত না। মস্তকের ত্বক সঞ্চালন করিয়া মাথায় রক্তের চলাচল বাড়ান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপায় বর্ত্তমান সময়ে আর জানা নাই। এই উপায় দ্বারা মাথার যত ময়লা যে কেবল দূর হয় তাহা নহে কিন্তু ইহার জন্য মাথার ত্বকে যে সকল গ্রন্থি আছে এবং যে সকল গ্রন্থির কার্য্য হইল মাথায় চর্ব্বি যোগান এবং তদ্দ্বারা চুল পুষ্ট এবং উজ্জ্বল রাখা হয় সেই সকল গ্রন্থির ভাল ও অধিক কার্য্য করে মস্তকের ত্বক সঞ্চালনের জন্য। তাহা ছাড়া ভাল কেশতৈল যাহাতে নূতন চুল উঠে, তাহা প্রয়োগে আরও উপকার হয়।

যে বুরুশ চুলে ব্যবহার করা যাইবে, সেই বুরুশ পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন এবং তাহা অন্য লোকে যাহাতে ব্যবহার না করে, তাহা দেখিতে হইবে। যে বুরুশ ব্যবহার করা হইবে, তাহা যেন এমন কড়া না হয় যাহাতে মাথার ত্বকের অনিষ্ট হয়. ঘন ঘন চিরুণী ও বুরুশ সাবান জলে ধোওয়া উচিত এবং একটু এমোনিয়া দ্বারাও পরিষ্কার করা উচিত। যাঁহাদের অত্যধিক মরামাস আছে, তাঁহারা তাঁহাদিগের বুরুশ মধ্যে মধ্যে বীজাণুশূন্য করিবেন।

—সঞ্জীবনী।

প্রোষিত ভর্তৃকা

শিল্পী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ

২১শ ভাগ] { শ্রাবণ, ১৩৩১ । } [৬ষ্ঠ সংখ্যা

কীট্‌সের কাব্যে ভারতের কথা।

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম-এ, বি-এল]

জন কীটস (খৃঃ ১৭৯৫-১৮২১) ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যের সমালোচকদের নিকট চন্দ্রগ্রস্ত কবি বলিয়া সুপরিচিত। তাহা হইলেও তিনি ভারতের কথা লইয়া তাঁহার কাব্যের নানাস্থানে আলোচনা করিয়াছেন। গোলকণ্ডার খনির উল্লেখ করিয়া কীটস লিখিয়াছেন,—"Hast thou from the caves of Golconda, a gem pure as the ice-drop that froze on the mountain ?" (Address to a Lady) কবি একজন মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আপনি কি গোলকণ্ডার খনি হইতে একটি মাণিক প্রাপ্ত হইয়াছেন ?" কবির ভাষায় এই মাণিকের বিশুদ্ধতা পর্ব্বত-শৃঙ্গে তুষার-বিন্দুর সহিত তুলনীয়। ভারতজাত তালবৃক্ষের নির্য্যাসের উল্লেখ করিয়া কীটস লিখিয়াছেন,—"like a palm cut by an Indian for its juicy balm," (Isabella) কবির সমকালে ইংরাজগণ বোধ হয় এদেশে তালরসের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং পাশী যখন তালবৃক্ষে আরোহণ করিয়া তাহার শীর্ষদেশ কর্ত্তন করিত, তখন তাঁহারা বিস্মিত হইয়া উক্ত কার্য্য অবলোকন করিতেন। কবি শেষোক্ত কবিতায় অন্যত্র লিখিয়াছেন, "warm Indian clove."—ভারতের লবঙ্গ ও অন্যান্য সুগন্ধি মশলার কথা ইংরাজ কবিরা তাঁহাদের রচিত কাব্যে অসংখ্যবার উল্লেখ করিয়াছেন। কীটস গ্রীক সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। গ্রীক সাহিত্যের ভিতর দিয়া তিনি প্রাচ্য জগত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। কবি আসিয়া ভূ-খণ্ড সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে ভারতের সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গা নদীর উল্লেখ আছে।

"Asia, born of most enormous caf,
Who cost her mother Tellus keener pangs,
Though feminine, than any of her sons.
More thought than woe was in her dusky
face,
For she was prophesying of her glory ;
And in her wide imagination stood
Palm-shaded temples, and high rival fanes,
By Oxus or in Ganges' sacred isles."

(*Hyperion*)

উদ্ধৃত শ্লোকে কবি আসিয়া ভূখণ্ডের উৎপত্তি সম্বন্ধে ইতালিয়ান ও মুসলমানদিগের পুরাবৃত্তে যতগুলি রূপক আছে তৎসমুদয় মিশ্রিত করিয়া লইয়া কল্পনার ছাঁচে ঢালিয়া নূতন একটি মনোহর আখ্যানের সৃষ্টি করিয়াছেন।

কাফ্ (caf) নামক প্রকাণ্ড পর্ব্বত সম্বন্ধে মুসলমানদিগের পুরাতত্ত্বে উক্ত হইয়াছে যে, এই পর্ব্বতের আধারে পৃথিবী অবস্থিত। টেলস্ (Tellus) প্রাচীন ইতালীর ভূ-দেবী। কবি বলেন, আসিয়ার চিন্তাপূর্ণ মুখমণ্ডলে ক্লেশের ছায়া পড়ে নাই। মধ্য আসিয়ার Oxus নদীর তীরে ও ভারতের গঙ্গাগর্ভস্থ দ্বীপে তালবৃক্ষের ছায়ায় উচ্চ মন্দির সকল অবস্থিত। "Ganges' sacred isles" অর্থাৎ গঙ্গাগর্ভস্থ পবিত্র দ্বীপসমূহ সম্বন্ধে অধ্যাপক সেলিনকোর্টের (E. De Selincourt) টীকা বিশেষ কোনও তথ্য লিপিবদ্ধ করে নাই। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে উপরোক্ত Hyperion নামক কবিতার রচনা শেষ হয়। কীটস এই কবিতা রচনাকালে বঙ্গদেশ-প্রবাহিনী গঙ্গার সুবৃহৎ চর সমূহের বিবরণ কোনও য়ুরোপীয় পর্য্যটকের গ্রন্থে পাঠ করিয়াছিলেন, এই অনুমান অসঙ্গত নহে। এণ্ডাইমিয়ন (Endymion) নামক কাব্যে কবি যখন ভারতের অন্যান্য নদীর কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন তখন তিনি যে এদেশের প্রাকৃতিক বিবরণ সম্বন্ধে য়ুরোপীয় পর্য্যটকের গ্রন্থ হইতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভবপর বলিয়াই মনে হয়। এণ্ডাইমিয়নের দ্বিতীয় সর্গে কীটস লিখিয়াছেন,—

"Alexander past
The Indus with his Macedonian numbers."

সিকন্দর মাসিডোনিয়ার সৈন্যদল লইয়া পঞ্জাবের সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়াছিলেন। ইহা প্রাচীন গ্রীক ইতিহাসের কথা। এণ্ডাইমিয়ন কাব্যের চতুর্থ সর্গে কবি লিখিয়াছেন,—

"Didst thou not after other climates call,
And murmur about Indian streams ?"

ভারতবর্ষের প্রবহমান জলরাশির কথা স্মরণ করিয়া কবি চতুর্থ সর্গে অন্যত্র লিখিয়াছেন,—

"Ah, woe is me ! that I should fondly part
From my dear native land !
Ah, foolish maid !
Glad was the hour, when, with thee,
myriads bade

গ্রীক পুরাবৃত্তে লিখিত বেকাস্ কর্তৃক ভারতবর্ষ জয়ের উল্লেখ করিয়া কীটস চতুর্থ সর্গে অন্যত্র লিখিয়াছেন,—

"The kings of Inde their jewel-sceptres vail,
And from their treasures scatter pearled
hail;
Great Brahma from his mystic heaven
groans,
And all his priesthood moans ;
Before young Bacchus' eye-wink turning
pale,"

কবির মতে ভারতবর্ষের বহির্দেশ হইতে শত্রুর আক্রমণে শুধু ভারতের রাজন্যবর্গ কেন, স্বয়ং ব্রহ্মাও কাতর। কীটস কল্পনার সাহায্যে বিজেতার অধীনে রাজকগণের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে অস্বাভাবিকতা দোষ আছে বলিয়া মনে হয় না। পাশ্চাত্য চিত্রকলার আদর্শে কীটস গঙ্গাবক্ষে মরালের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার প্রণয়িনীকে বলিতেছেন,—

"Thou swan of Ganges, let us no more
breathe
This murky phantasm !"

সৌন্দর্য্যের কবি কীটসের হৃদয়ের অন্তঃপুরে ভারত-ললনার মধুর স্মৃতি মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠিত। আলোচ্য কাব্যের চতুর্থ সর্গে কবি অন্যত্র লিখিয়াছেন,—' Sweet Indian, I would see thee once again."

কীটস কল্পনার রাজ্যে যে সকল সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার মধ্যে তাঁহার মানস সুন্দরী সিন্থিয়া (Cynthia) অর্থাৎ চন্দ্রের দেবী মূর্ত্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। চন্দ্রকে কীটস এণ্ডাইমিয়ন কাব্যে প্রণয়িনীরূপে কল্পনা করিয়া কত শত চিত্র যে রচনা করিয়াছেন তাহার সংখ্যা হয় না। কীটসের সমসাময়িক ইংরাজ কবি সেলির চিত্রশালাও সিন্থিয়ার অসংখ্য চিত্রে সজ্জিত। সেলি ও কীটস গ্রীক পুরাবৃত্তের চন্দ্রদেবীর (moon Goddess) আদর্শে তাঁহাদের প্রণয়িনী সিন্থিয়ার চিত্র যে অঙ্কিত করিয়াছেন, এ কথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের দেব-দেবীর তালিকায় চন্দ্র পুরুষ-দেবতা। গ্রীকদিগের

[স্তি]তে অবস্থিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গীতিকবিতায় [চন্দ্র]কে একাধিকবার ইংরাজ কবি সেলি ও কীটসের অনু-[ক]রণে প্রণয়িনী ও বধূরূপে কল্পনা করিয়াছেন। রবীন্দ্র-[না]থের চিত্র অনুকরণের অনুকরণ। মাইকেল মধুসূদন কিন্তু লাটিনাদি নানা প্রাচীন য়ুরোপীয় ভাষা ও সাহিত্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও তাঁহার অমর কাব্য সকল রচনা করিবার সময় যতদূর সম্ভব প্রাচ্য আদর্শকে অনুসরণ করিয়াছেন। মধুসূদনের রচিত বীরাঙ্গনা কাব্যে "সোমের প্রতি তারা" শীর্ষক কবিত্বময় রচনা পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি হিন্দু আদর্শে চন্দ্রকে নায়করূপে কল্পনা করিয়াছেন। সিন্থিয়া কীটসের অন্তর্জগতের সবটা অধিকার করিয়া লইলেও কল্পনা-দূতী একবার কবিকে সঙ্গে লইয়া অভিসারে বহির্গত হইয়াছিল আর সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাকে কিছুদিনের তরে সিন্থিয়ার সতিনী-সৌন্দর্য্য মধ্যে ভারত-ললনার কুঞ্জে নব-প্রেমের ডোরে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। কীটসের কবি-হৃদয় সিন্থিয়ার প্রেমকে উপেক্ষা করিয়া ভারতবাসিনীর প্রেমে মজিয়াছিল, এ কথা মনে হইলে বিস্মিত হইতে হয়। কীটস গ্রীক পুরাবৃত্ত হইতে এণ্ডাইমিয়নের আখ্যান ভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। পশুপালকদিগের রাজার পুত্রের নাম এণ্ডাইমিয়ন। তিনি তাঁহার হৃদয়েশ্বরী সিন্থিয়ার অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বস্থান পরিভ্রমণ করিবার পর বনের মধ্যে একটি সুন্দরী ভারতবাসিনীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। সুন্দরী তাঁহার প্রণয়ীর বিচ্ছেদে কাতর হইয়া আক্ষেপ করিতেছিলেন। এণ্ডাইমিয়ন তাঁহার দুঃখে সহানুভূতি দেখাইবার জন্য তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইলেন। এণ্ডাইমিয়নের প্রেমপ্রবণ হৃদয় কিছুদিন এই নূতন প্রণয়িনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া রহিল। সিন্থিয়ার কথা এণ্ডাইমিয়ন যেন ভুলিয়া গেলেন। অবশেষে সিন্থিয়ার স্মৃতি তাঁহার মনোমাঝে জাগিয়া উঠিলে তিনি স্বীয় ভগ্নি পিওনার (Peona) তত্ত্বাবধানে সেই ভারত কামিনীকে রাখিয়া সিন্থিয়ার অনুসন্ধানে পুনরায় বহির্গত হইলেন। সিন্থিয়ার প্রতি তাঁহার অকপট প্রেম শেষে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনে পরিণত হইল। এণ্ডাইমিয়ন তখন দেখিলেন যে, সিন্থিয়া ও সেই ভারতবাসিনীর মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই।

কবি কীটস ও তাঁহার কাব্যের নায়ক এণ্ডাইমিয়ন একই ব্যক্তি। কীটস সৌন্দর্য্যের আদর্শ সিন্থিয়ার অনুসন্ধানে মানস-ভ্রমণে বহির্গত হইয়া রূপকময় কাব্য রচনা করিয়াছেন আর এণ্ডাইমিয়নের মুখ দিয়া তিনি তাঁহার হৃদয়ের চির-আকাঙ্ক্ষার ইতিহাস পদ্যময় ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। Ideal Beautyর সন্ধান লইতে গিয়া কীটস যে এদেশের নারীর রূপের ফাঁদে পড়িয়াছিলেন ইহাতে কাব্যামোদী পাঠকের বিস্মিত হইবার কোনও কারণ নাই। একাধিক ইংরাজ কবি সৌন্দর্য্যের আধার নারীরত্ন ভারতবর্ষ ছাড়া অপর কোথাও দেখিতে পান নাই। রূপের মোহ কাটিয়া গেলে কীটসের কল্পনা আবার স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের অনুসন্ধানে ছুটিয়া গিয়াছিল। কবির পরিণত বিচারশক্তি শেষে বুঝিতে পারিল যে মর্ত্ত্যের নারী ভারত-ললনার সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া স্বর্গের দেবী মূর্ত্তিতে বিকাশিত। স্বপ্নের রাজ্য হইতে কীটসের কল্পনা বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বমানবতার দিকে যখন অগ্রসর হইতে সাহসী হইল, তখন Ideal Beauty তাঁহার কবি-হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া শোক-সন্তাপগ্রস্ত মানব-জগতে যথার্থ প্রেমের বার্ত্তা প্রচার করিল। কবির শেষ কথা এই যে, মানব হৃদয়ের বিশ্বপ্রেম হইতে সুন্দরতর আর কিছু ইহজগতে নাই। কীটসের কবি-হৃদয়ে ভারতের কথা আর একবার অনেকটা স্থান অধিকার করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল এবং তাহার ফলে তাঁহার অমর লেখনী The Cup and Bells নামক একটি সুবৃহৎ কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ভারতের মধ্যপ্রদেশে—Midmost Ind—এই কবিতায় লিখিত পরীর গল্পের নায়ক রাজত্ব করিতেন। কবিতাটী অসমাপ্ত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। কীটস এণ্ডাইমিয়ন কাব্যে মানবাত্মার চির আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন। কীটসের সমসাময়িক কবি সেলি আলাষ্টর (Alastor) নামক কাব্যে মানবাত্মার চির আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গীয় প্রেমের তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কীটসের এণ্ডাইমিয়নের সহিত সেইজন্য সেলির আলাষ্টরের কতকটা সাদৃশ্য আছে। কীটস Ideal Beautyর সন্ধানে বহির্গত হইয়া সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে একটা

তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছিলেন। সেলি কিন্তু Ideal Loveএর সন্ধানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণ করিয়া শেষে বিঘোরে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। সেলি তাঁহার কাব্যের নায়ক আলাষ্টরের মুখ দিয়া বলিয়াছেন যে, Ideal প্রেমের জীবন্ত মূর্ত্তি তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বপ্ন নিদ্রার আবেশে ভাসিয়া গেলে, নিদ্রাভঙ্গে তিনি যে বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করেন, তাহার দংশন হইতে নিষ্কৃতি লাভের আশায় স্বপ্নে দৃষ্ট মূর্ত্তির অনুসন্ধানে বহির্গত হন। আলাষ্টর স্বপ্ন দেখিবার পূর্ব্বে নানান দেশ পরিভ্রমণ করিয়া পরিশ্রান্ত দেহের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য কাশ্মীরের উপত্যকায় বিশ্রাম করিতে গিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন। তারপর স্বপ্নে যাহা তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা ভাষান্তরিত করিলে সেলির কবিত্বের প্রাণ-বস্তুটিকে ফুটাইয়া বাহির করা যায় না। আমরা সেইজন্য এস্থলে কবির নিজের ভাষা কতকটা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"The poet wandering on, through Arabic
And Persia, and the wild Carmanian waste,
And o'er the aerial mountains which pour
down
Indus and Oxus from their icy caves,
In joy and exultation held his way;
Till in the vale of Cachmire, far within
Its loneliest dell, where odorous plants
entwine
Beneath the hollow rocks a natural bower,
Beside a sparkling rivulet he stretched
His languid limbs. A vision on his sleep
There came, a dream of hopes that never yet
Had flushed his cheek. He dreamed a
veiled maid
Sate near him, talking in low solemn tones.
Her voice was like the voice of his own soul
Heard in the calm of thought; its music
long,
Like woven sounds of streams and breezes,
held
His inmost sense suspended in its web
Of many-coloured woof and shifting hues.
Knowledge and truth and virtue were her
theme,
And lofty hopes of divine liberty,
Thoughts the most dear to him, And poesy,
Himself a poet. Soon the solemn mood
Of her pure mind kindled through all her
frame
A permeating fire; wild numbers then
She raised, with voice stifled in tremulous
sobs
Subdued by its own pathos: her fair hands
Were bare alone, sweeping from some
strange harp
Strange symphony, and in their branching
veins
The eloquent blood told an ineffable tale.
The beating of her heart was heard to fill
The pauses of her music, and her breath
Tumultuously accorded with those fits
Of intermitted song. Sudden she rose,
As if her heart impatiently endured
Its bursting burthen: at the sound he
turned,
And saw by the warm light of their own life
Her glowing limbs beneath the sinuous veil
Of woven wind; her outspread arms now
bare,
Her dark locks floating in the breath of
night,
Her beamy bending eyes, her parted lips
Outstretched, and pale, and quivering
eagerly.
His strong heart sank and sickened with
excess
Of love. He reared his shuddering limbs,
and quelled
His gasping breath, and spread his arms
to meet
Her panting bosom:—she drew back awhile,
Then, yielding to the irresistible joy,
With frantic gesture and short breathless cry
Folded his frame in her dissolving arm

Now blackness veiled his dizzy eyes, and
night
Involved and swallowed up the vision ;
sleep,
Like a dark flood suspended in its course,
Rolled back its impulse on his vacant
brain."

ড্রাইডেন, সাদে, মুর, সেলি, কীটস প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ কবিরা ভারতের নারীকে চরিত্র, সৌন্দর্য্য ও প্রেমের স্বর্গীয় আদর্শরূপে বর্ণন করিয়া তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। উদ্ধৃত কবিত্বময় রচনায় সেলি ভূস্বর্গ কাশ্মীরে স্বপ্নাবেশে ক্ষণেকের তরেও স্বর্গীয় প্রেমের জীবন্ত মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর কবি সেই মূর্ত্তির পুনরায় দর্শনলাভের আশায় অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিফলমনোরথ হইয়া শেষে স্থির করেন যে, সেই মূর্ত্তিমতী স্বর্গীয় প্রেম জীবনে না মিলিলেও মরণে নিশ্চয়ই মিলিবে। কীটসের সৌন্দর্য্য-স্পৃহা এণ্ডাইমিয়ন কাব্যে বিশ্বপ্রেমে মিশিয়া গিয়াছে। সেলির প্রেমের চর্চ্চা আলাষ্টর কাব্যে ট্রেজেডিতে পরিণত হইয়াছে। সে যাহা হউক, ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যে রোমাণ্টিসিজমের কবিরা ভারতের নারীকে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের জগতে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন, একথা স্মরণ করিলে কাব্যামোদী স্বদেশপ্রেমিক ভারতবাসীর হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

আমার।

[শ্রীদ্বিজপদ মুখোপাধ্যায় বি-এ]

তুমি যদি শুধুই হ'তে বসন্তেরি ফুল,
বৃন্ত সারা কণ্টকহীন—কোমল মধুময় ;
সবটা তুমি আমার বলা হয়তো হ'ত ভুল,
কাঁটার ব্যথায় যে জয় আনে সেইতো আমার জয়।

যদিই হ'তে পথের মাঝে কুড়িয়ে পাওয়া মণি,
চেয়েই পাওয়া কিম্বা কোন অভীপ্সিত ফল ;
উঠতে কি না কণ্ঠে আমার তাইতো মনে গণি',
রসনাতে লাগতে কি না রসাল অবিরল।

অনাহুত অতিথ্ সাজে আসতে যদি ঘরে,
আশাতীত অনুগ্রহের বিপুল বোঝা বয়ে ;
দিতাম কি না ফুলের ডালি তোমার পূজার তরে,
সেই কথাটা হঠাৎ মনে পড়ছে রয়ে রয়ে।

সিন্ধু-মথন-যতন-রতন যাহার গৃহে আজ,
বিজয়-আশীষ মাল্য রাশি কণ্ঠে যাহার হার ;
সফলতার পুণ্যে যাহার দীপ্ত বুকের মাঝ,
হেলায় পাওয়ার রিক্ততা যে তিক্ত লাগে তার।

ওগো,
বুকের শোণিত জল যে লাগি তারেই পাওয়া—জয়,
গরব করার এই কথাটা কেবল আছে জানা ;
কাঁটার ব্যথায় যে জয় আনে নেইতো তাহার ক্ষয়,
পরশ পাথর সমান সে যে চেনায় খাঁটি সোনা।

বিসর্জ্জন।

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(১১)

ভক্তিভরে গঙ্গায় গোটাকত ডুব দিয়া কমনীয় উঠিতেছিল। ঘাট তখন লোকে লোকারণ্য। শিবরাত্রির দিন, নানা দেশ বিদেশের যাত্রীতে কাশী পুরিয়া উঠিয়াছে। ঘাটে তখন মেয়ে পুরুষ অনেক লোকই স্নান করিতে আসিয়াছে।

উপরে উঠিয়া কোনও মতে ভিড় ঠেলিয়া সে বাড়ী পানে চলিয়াছিল, সেই সময় একটী বালক তাহার সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনাকে ডাকছে।"

বিস্মিত কমনীয় তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "কি বলছ?"

বালক উত্তর করিল, "আপনাকে আমার দিদি ডাকছে।"

"তোমার দিদি" কমনীয় অতিরিক্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, "তোমার দিদি আমাকে ডাকবেন কেন? আমি তোমায় বা তোমার দিদি কাউকে তো চিনি নে। বোধ হয় তোমার দিদি আর কাউকে ডাকছেন।"

বালক দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "না, দিদি আপনাকেই ডাকছে। ওই যে দিদি দাঁড়িয়ে রয়েছে আপনার জন্যে।"

কমনীয় চাহিয়া দেখিল সত্যই একটী অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা রমণী ঘাটের অনতিদূরে দাঁড়াইয়া আছে।

ব্যাপার কি জানিবার জন্য কমনীয় অগ্রসর হইল। বালক দৌড়াইয়া রমণীর নিকট গিয়া বলিল, "এই যে দিদি, তিনি এসেছেন।"

রমণী বিশ্বনাথের মন্দির পানে ফিরিয়াছিল, বালকের কথা শুনিয়া মুখ ফিরাইল। গঙ্গাবক্ষে বহমান চঞ্চল বাতাসে তাহার অর্দ্ধাবগুণ্ঠন উড়িয়া পড়িল, মুখখানা সম্পূর্ণ ভাবেই প্রকাশ হইয়া পড়িল। সে অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি শুভ্রার ব্যতীত আর কাহারও নহে।

কমনীয় বিস্মিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "শুভ্রা—"

হাসিয়া শুভ্রা বলিল, "হ্যাঁ, আমি শুভ্রাই বটে। শুভ্রা ব্যতীত আর কারও সাহস হয় নি যে তোমায় ডেকে আনবে। তুমি অবাক হয়ে ভাবছিলে কে আবার তোমায় ডাকলে—কেমন? একবার বোধ হয় ভেবেছিলে কেউ বোধ হয় গঙ্গাস্নান ক'রে জলদান করবে ব'লে তোমায় ডেকেছে, তুমি যে বামুন নও সেইটে জানাবার জন্যেই তুমি আসছ, না—?"

সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কমনীয় বলিল, "না, তা' ভাবি নি। আমি দেখতে আসছিলুম কাশীতে কে আমার পরিচিত মেয়ে আছে যে আমায় ডাকছে।"

শুভ্রার পরণে শুভ্র থান, তাহার সুগোল সুগৌর হাত দুখানি খালি। কমনীয় মাথার পানে চাহিয়া দেখিল জানুবিলম্বিত লম্বা সুকৃষ্ণ তরঙ্গায়িত চুলগুলিও সে কাটিয়া ফেলিয়াছে। তাহাকে দেখিলে কেহ এখন বলিতে পারিবে না এই সেই বানু বাইজি, যে রূপের ও গানের জন্য বিখ্যাত হইয়া আছে, দশ হাজার টাকা এক রাত্রে দিয়াও অনেক বড়লোক যাহাকে আসরে নামাইতে পারে না। বানু বাইজি আর নাই, বিধবা শুভ্রাই এখন কমনীয়ের সামনে।

কমনীয় তাকাইয়া আছে দেখিয়া শুভ্রা বলিল, "কি দেখছ?"

কমনীয় বলিল, "দেখছি বানু বাইজির এ পরিবর্ত্তন হঠাৎ হ'ল কেন? সে বেশভূষা কোথা গেল?"

শুভ্রা বলিল, "বলছি, আমার বাড়ী চল আমি সব কথা বলব। বানু বাইজি মরে গ্যাছে, বেঁচে আছি আমি। আমায় শুভ্রারূপে দেখছ বটে, কিন্তু সে দুর্দ্দান্ত প্রকৃতি, চপল হৃদয়া শুভ্রারও মরণ হয়েছে। বানু বাইজি সাজত বাইরে, ভেতরে তার এই সাজই ছিল, তাই জ্যোতিশ এগুতে পারি নি। সে সাজ এবার বার হয়ে পড়েছে তাই দেখে তুমি অবাক হয়ে যাচ্ছ। আমার সঙ্গে আমার বাড়ী চল এ বেলাটার মতন, সমস্ত কথা, আমার জীবনের আগাগোড়া সব আজ খুলে বলব তোমাকে, কিছু গোপন করব না।"

কমনীয় বলিল, "আমার ভিজে কাপড় যে।"

শুভ্রা সুন্দর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কেন, আমার কি কাপড় নেই নাকি? আমার দুখানি মাত্র কাপড় নয়, আরও কাপড় আছে। ঘৃণা ক'রে যদি আমার কাপড় না পর, আমার মার কাপড় আছে তাই পরো'খন। মার কাপড় পরতে দোষ নেই তো?"

তাহার কথাগুলা যেমন মিষ্ট তেমনি জ্বালাকর। কমনীয় নীরবে তাহা পরিপাক করিয়া বলিল, "চল যাচ্ছি, কিন্তু বাড়ীতে আমার মা, মাসীমা আছেন, তাঁরা—"

ঝঙ্কার দিয়া শুভ্রা বলিয়া উঠিল, "ভয় নেই গো, ভয় নেই, তোমায় চিবিয়ে খেয়ে ফেলব না। তাঁরা তাঁদের ছেলেকে আস্তই ফিরে পাবেন'খন, আমি তোমায় আটকে রাখব না। তোমার বাড়ীতে গিয়েই তুমি ভাত খেয়ো, আমার বাড়ী খাইয়ে তোমার জাত নষ্ট করব না।"

কমনীয় অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "জাত তো আমার বড্ড আছে কি না। কত মুসলমানের হোটেলে খেয়েছি, সাহেবদের হোটেলে খানা খেয়ে এলুম, জাত আর নেই।"

শুভ্রা চলিতে চলিতে ফিরিয়া তাহার মুখের উপর তীব্র কটাক্ষ ফেলিয়া বলিল, "সে তবু ভাল। মুসলমান খৃষ্টানের হাতে খেয়েও তোমরা জাতের বড়াই করতে পার, কিন্তু যে ছোটবেলায় না বুঝতে পেরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে, তাকে ছুঁলেই তোমরা জাত গেল ব'লে মনে কর। সে যদি আজন্ম অনুতাপ করে—তার পাপ ধুয়ে গিয়ে যদি সে কতকটা পুণ্যও সঞ্চয় ক'রে ফেলে, তবু তোমরা তাকে ক্ষমার যোগ্য ব'লে মনে কর না। যাক, এসো, এই সামনে আমার বাড়ী।"

প্রকাণ্ড ত্রিতল অট্টালিকাটী ঠিক গঙ্গার উপরে, বিশ্বনাথের মন্দির হইতে খানিকটা দূরে। পাশে প্রকাণ্ড ফুলের বাগান, তাহার মাঝখানে সুদৃশ্য একটী মন্দির। চারিদিকে বাঁধানো বারাণ্ডা, কতকগুলি লোক সেখানে ছিল।

শুভ্রা বাগানে প্রবেশ করিয়া একজনকে আদেশ করিল, "মার কাছ হ'তে একখানা কাপড় এনে এই বাবুকে দিয়ে যাও।"

তাহার পর কমনীয়কে লইয়া বারাণ্ডায় উঠিল। মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া বলিল, "দেখতে পারছ—কি ?"

কমনীয় প্রণাম করিল,—"শিবমূর্ত্তি।"

গলায় কাপড় দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া শুভ্রা বলিল, "হ্যাঁ, শিবমূর্ত্তি। অনেক কষ্টে গত বছরে এই শিবমূর্ত্তি স্থাপনা করেছি। নানা দেশ হ'তে বড় বড় পণ্ডিত আনিয়ে ব্যবস্থা নিয়ে করেছি, আমি যে করতে পাবব না এমন কথা তাঁরা কেউ বলেন নি। শিবপূজার অধিকার সবারই আছে, আমিও তাই এই শিবপূজা করি। ওই কাপড় এনেছে। তুমি কাপড় ছেড়ে খানিক এই বাগানটায় বেড়াও, আমি ততক্ষণ শিবপূজা করে নেই।"

সে প্রতিদিনই স্নানান্তে এই সময়ে পূজা করিতে আসিত। পুজারী তাই পূজার জিনিস সবই গুছাইয়া রাখিত। স্নিগ্ধা পূজা করিতে বসিল।

কমনীয় মুগ্ধনেত্রে দাঁড়াইয়া তাহার পূজা দেখিতে লাগিল। শুভ্রার এই পরিবর্ত্তনে সে হৃদয়ে অপরিসীম আনন্দ পাইতেছিল। পূজা শেষ করিয়া শুভ্রা যখন ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া উঠিল, তখন কমনীয়ও ভক্তিভরে প্রণাম করিল।

বাহিরে আসিয়া শুভ্রা বলিল, "আমার অতিথিশালা দেখবে ? ওই দেখ, ওদিকে অতিথিশালা।"

কমনীয় চাহিয়া দেখিল বাগানের অন্যদিকে সারি সারি গৃহ। সেখানে বড় বড় গাছতলায় অনেক ভিখারী জড় হইয়াছে।

শুভ্রা আনন্দে হাসিয়া বলিল, "সব চেয়ে বড় তৃপ্তি পাই ওদের খাইয়ে। আমার মনে হয় ওরা খেলেই ভগবান খেলেন। ওদের তৃপ্তিই তাঁর তৃপ্তি, তাঁর সন্তোষ। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—

"বহু রূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে সেবা করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

কথাটা কিন্তু বাস্তবিক সত্যি। আমার শিব ওদের মধ্যেই আছেন, আমি তাই ভেবে ওদের বড় ভালবাসি, বড় যত্ন করি। ওদের ছেলে মেয়ে সব আমায় দিদি ব'লে ডাকে। যে তোমায় ডাকতে গেছল, সেও অমনি একটী ভিখারীর ছেলে।"

গাঢ় স্বরে কমনীয় বলিল, "তুমি ঠিক মানুষের মতই কাজ করছ শুভ্রা, তুমিই ঠিক বুঝেছ।"

শুভ্রা চলিতে চলিতে ফিরিয়া দাঁড়াইল, সজল চোখ দুইটা কমনীয়ের চোখের উপর ন্যস্ত করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "এতেও কি আমার পাপ ধুয়ে যাবে না ? ছোট বেলায়, মনের ভুলে না বুঝতে পেরে বেরিয়ে পড়েছিলুম। তোমাদেরই বন্ধু সত্য আমায় প্রলোভন দেখিয়ে বার ক'রে নিয়ে গেল। সত্যি কথা বলব। আজ যখন আমার মনে পাপ নেই, আকর্ষণ নেই তখন কেন সত্যি কথা বলব না ? আমি বেরুতে চাই নি, সে বুঝেছিল আমি তোমায় প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি। সে আমার তোমায় প্রলোভন দেখিয়ে বার ক'রে নিয়ে গেল। নিয়ে গেল কোথায়, সেই দূর চুনারে। আমি ফিরবার জন্যে আছড়ে পড়ে কাঁদলুম,

নিজের ভুল বুঝতে পেরে মাথা ভেঙ্গে রক্তারক্তি করলুম, কিন্তু না, কিছু হ'ল না। তারপর সে আমায় ওস্তাদ রেখে নাচ গান শিখাতে লাগল, বাধ্য হয়ে আমি তা শিখলুম। যখন আমার নাচ গান শেখা শেষ হয়ে গেল, সেই সময় সত্য একদিন কলেরাতে মরে গেল। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম, চুনার হ'তে পালালুম, বাড়ী আসতে পারলুম না, কারণ আর সে পথ আমার নেই। অনেকে আমায় আবার পাপে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমি আর ডুবি নি। সত্যর অনেক টাকা আমি পেয়েছিলুম, নাচ গান জানতুম, আমি বানু নাম দিয়ে বাইজি হলুম। ভগবান সাক্ষী, একমাত্র তোমাকে ছাড়া শুভ্রা আর কাউকে ভালবাসে নি। সত্য আমায় পাপে নিয়ে গেছল, তার জন্তে আমি এই এগার বার বছর ধ'রে অনুতাপ করছি, এমন দিন যায় না যেদিন আমি সেই দিনের, সেই মুহূর্ত্তটার ভুলের জন্ম হাহাকার ক'রে না কাঁদি। আমার সে পাপ কি এই সুদীর্ঘকাল ধ'রে প্রায়শ্চিত্ত করাতে কেটে যাবে না?"

কমনীয় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কেটেছে শুভ্রা; অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। তোমার পাপ কেটে গ্যাছে বলেই তুমি শিবস্থাপনা করতে পেরেছ, দশজনকে খেতে দিয়ে নিজেকে ধন্ত জ্ঞান করছ। পাপ না কাটলে এ সৌভাগ্য কারও আসে না।"

চোখ মুছিয়া শুভ্রা বলিল, "তাই বল, সে কথা শুনলে আমার প্রাণটা ভরে ওঠে, আমি বড় শান্তি পাই। নাচ গানে এতদিন ধরে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করেছি যা স্বপ্নাতীত। আজ চার দিন হ'ল আমি আমার পিতৃগুরুর কাছে দীক্ষিত হয়েছি। তিনি এতদিন কিছুতেই আমায় দীক্ষা দেন নি, সেদিন নিজেই আমায় দীক্ষা দিলেন। আমার মরাদেহে আমি প্রাণ পেয়েছি, আমি বানু বাইজিকে মেরে ফেলেছি। জগতে আমার আর এখন কেউ নেই, কিছু নেই, আছে এই শিবমূর্ত্তি—আর আমার বড় আপনার ওই দরিদ্র, ভিখারীগুলি। আজ আমি যথার্থ চিত্ত জয়ে সমর্থ হয়েছি, তোমাকে ওই শিবমূর্ত্তির মধ্যেই দেখতে পেয়েছি, আলাদা তোমাকে পুজো করতে হবে না।"

হঠাৎ নত হইয়া সে কমনীয়ের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল—কমনীয় শশব্যস্ত হইয়া পিছনে সরিবার অবকাশ পাইল না।

কম্পিত কণ্ঠে শুভ্রা বলিল, "তোমায় ছুঁয়ে ফেললুম—এই দুর্ব্বলতাটুকুর জন্মে আমায় মাপ কোরো তুমি। কিন্তু এই শেষ, তোমায় আর কখনও ছুঁয়ে কলঙ্কিত ক'রে দেব না। দেবতা তুমি, আমার ধ্যানের বস্তু, স্পর্শের নও।"

তখনি সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া হাসিল, "বাঃ, বেলা যে অনেক হয়ে উঠল। স্নান করেছ, তেষ্টা পেয়েছে বোধ হয়। আমার এমনি আক্কেল যে সে কথা মনেই করতে পারি নি। মার কাছে চল তিনি হাতে ক'রে খাবার দিলে খাবে তো তুমি?"

আবার তাহার কণ্ঠ স্বরে সেই খোঁচা! কমনীয় বলিয়া উঠিল, "না শুভ্রা, তোমার হাতে ভিন্ন আমি আর কারও হাতে খাব না।"

শুভ্রা বলিল, "এসো।"

ক্ষিপ্রপদে সে বাড়ীতে ঢুকিয়া একেবারে দ্বিতলে উঠিয়া গেল—"মা, দেখ কমদা এসেছে আমাদের বাড়ী।"

কমনীয় দেখিল শুভ্রার মাতা হাসি মুখে একটা গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। কমনীয় বিস্ময় চাপিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। সে ভাবে নাই সুষমা এখানেই আছেন। মামীমার কথা শুনিয়া সেও ধারণা করিয়াছিল শুভ্রা কাহাকেও ধর্ম্মমাতা বলিয়াছে।

সুষমা তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "এস বাবা, ভাল আছ তো? বাড়ীর সব ভাল আছেন তো?"

কমনীয় বলিল, "হাঁা, বাড়ীর সবাই ভাল আছেন। মামীমা এখানে এসেছেন। তিনি আপনার খোঁজ করতে আমায় আজ কয়দিন হ'তে বলছেন। আমি অনেক খোঁজ করছি, কিন্তু আপনাকে পাই নি।"

সুষমা বলিলেন, "আমি এখানে এসে প্রথমে গাছতলাতেই পড়ে থাকতুম, তার পরে শুভ্রার সঙ্গে দেখা হ'ল। যখন জানতে পারলুম সে যথার্থই ভাল, তখন আমি তার কাছে আসলুম। আমি কাল যাব তোমাদের বাড়ী, আমায় নিয়ে যেয়ো।"

ততক্ষণে শুভ্রা গৃহমধ্যে একখানি আসন পাতিয়া দিয়া খাবার আনিয়া দিল। একটাও দ্বিরুক্তি না করিয়া কমনীয় সবগুলিই খাইয়া ফেলিল।

শুভ্রা হাসিয়া বলিল, "আজ দেখছি পেটে আগুন জ্বলেছিল, নইলে—"

আবার সেই খোঁচার সম্ভাবনা দেখিয়া কমনীয় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না খেলেও তো আবার যা-না-তাই বলবে। দেখুন খুড়িমা, শুভ্রা সেই ছোটবেলার মত এখনও আমায় গালাগালি করতে ছাড়ে না। নেহাৎ বয়েসটা তেমন নয় তাই, নইলে চিমটি কেটে, চড় মেরে কি করত যে তা' আপনিও জানেন, আমিও জানি।"

সুষমা হাসিলেন, বলিলেন, "আজ এখানে খেয়ে যাও না বাবা। যদিও হবিষ্য, তবুও—"

কমনীয় বাধা দিয়া বলিল, "কাল এসে খেয়ে যাব খুড়িমা, আজ বাড়ীতে কিছু ব'লে আসি নি। মামীমা যে প্রকৃতির লোক তাতো জানেন। এখান হ'তে খেয়ে গিয়েও আবার খেতে হবে, কারণ বলতে তো পারব না যে খেয়ে এসেছি। এখনি তা' হ'লে এত জেরা করতে আরম্ভ করবেন যে কোনও কথা আমি চেপে রাখতে পারব না।"

সুষমার মুখখানা নিমেষে মলিন হইয়া গেল, তিনি বলিলেন, "লোকে তো বুঝবে না, লোকে তো জানবে না শুভ্রা ভাল হয়েছে। এতে তোমার মামীমাকে দোষ দেওয়া যায় না, সবাই এক কথা বলবে। না বাবা, আমি কোনও দিনই তোমায় আমার বাড়ী খেতে বলব না।"

কমনীয় অপ্রস্তুত হইয়া তোয়ালেতে হাত মুখ মুছিয়া উঠিয়া পড়িল। বলিল, "আমি আসি এখন খুড়িমা, কাল তা' হ'লে আসব আপনাকে নিয়ে যেতে।"

সুষমা বলিলেন, "মাপ কর বাবা, আমি যাব না তোমার মামীমার সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে গেলেই শুভ্রার কথা হবে, সে সব কথা শুনতে আমি যাব না।"

কমনীয় প্রণাম করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

(১২)

দিন পনের কাশীতে থাকিয়া কমনীয় দেশে আসিবার উদ্যোগ করিতেছিল। সেই সময়ে ইতির একখানা পত্র সে পাইল।

ইতি লিখিয়াছে তাহার স্বামী কোনও রকমে আণ্ডামান হইতে পলাইয়া আসিয়াছে। সেদিন রাত্রে তাহার স্বামী তাহার সহিত দেখা করিয়াছে। সে টাকা চায়, ইতি তাহার মাসিক বেতন যাহা পাইয়াছিল তাহাকে দিয়াছে। সে সমস্ত দিন কোথায় লুকাইয়া থাকে, রাত্রে আসিয়া তাহাকে বড় উৎপীড়ন করে। তাহার নেশার জন্য যে অজস্র অর্থ আবশ্যক, ইতি তাহা কোথা হইতে আনিয়া দিবে। ইহার উপর লোকে ইতির নামে যে সব দোষ দিয়াছে তাহা সে শুনিয়াছে, ও কাল ইতিকে শাসাইয়া গিয়াছে কমনীয়কে সে খুন করিবে। কমনীয় যেন খুব সাবধানে থাকে। ইতির নিজের জন্য ভয় নাই, সে মরিবার ভয় করে না, কিন্তু কমনীয়ের জন্য তাহার ভয় হয়। তাহার স্বামী যেরূপ দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোক, তাহাতে সে কমনীয়কে হত্যাও করিতে পারে।

পত্রখানা পড়িয়া তাহার জন্য যে ইতির এত ভয়, ইহা মনে করিয়া সে একটু হাসিল, কিন্তু তখনই ইতির জন্য ভারি শঙ্কিত হইয়া উঠিল। সে নির্দ্দয় ইতিকে খুন করিতেও তো পারে।

কমনীয় আরও তাড়াতাড়ি দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল, সেখানে গিয়া সেই দুর্দ্দান্ত লোকটাকে যদি কোনক্রমে নরম করিতে না পারা যায় তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাকে আবার পুলিসের হাতে দিতে হইবে।

যেদিন সে দুপুরে রওনা হইবে, সেই দিন সকালে সে শুভ্রা ও সুষমার নিকট বিদায় লইতে গেল।

শুভ্রা নীচের ঘরে ছিল, তাহার একটা চাকরের জ্বর হইয়াছিল, সে কিছুতেই ঔষধ খাইতে চায় না বলিয়া শুভ্রা নিজে তাহাকে বুঝাইয়া ঔষধ খাওয়াইতে আসিয়াছিল। কমনীয় গৃহে উঁকি দিয়া বলিল, "এ ঘরে কি করছ শুভ্রা?"

শুভ্রা বাহির হইয়া হাসিয়া বলিল, "এই দেখ না কমদা, আমার একটা চাকরের জ্বর হয়েছে, সে কিছুতেই ওষুধ খাবে না, তাই তাকে জোর ক'রে ওষুধ খাওয়াচ্ছিলুম।"

কমনীয় বলিল, "এখন খেয়েছে তো?"

শুভ্রা বলিল, "খেয়েছে। এমন বোকা যে নিজের ভাল মন্দ বোঝে না। তুমি আর এস না কেন কমদা?"

কমনীয় গম্ভীরভাবে বলিল, "তোমার ধ্যান ভঙ্গ করতে আসবার ইচ্ছে মোটেই নেই আমার। আমি যে এসে অনর্থক কতকগুলো গল্প করি, এতে তোমার অমূল্য সময় নষ্ট হয় অনেক। যাক, আজ আমি চলে যাচ্ছি শুভ্রা।"

শুভ্রা এক মুহূর্ত্তে নিভিয়া গিয়া বলিল, "দেশে?"

কমনীয় বলিল, "তা' নইলে আর কোথা?"

শুভ্রা একটুখানি নীরব থাকিয়া বলিল, "যাও। আমার একবার দেশ দেখতে বড় ইচ্ছে করে, কিন্তু যাবার মুখ রেখে আসি নি তো কমদা, আর যাব না। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, মরে যদি আবার জন্মাই, যেন আমার সেই চির পরিচিত পল্লী-মায়ের কোলেই যাই, আর কোথাও যেন না যাই। আমার পুরোনো সেই পথ, সেই গঙ্গার ঘাট, সব তো তেমনিই আছে কমদা? আজও দলে দলে গ্রামের মেয়ে, ছেলে তেমনি করে ঘাটে যায়, তেমনি হাসে, গঙ্গা তাদের ছায়া বুকে নিয়ে তেমনি কি কুল কুল ক'রে ছুটে যায়? কমদা, নদীর ধারের বাবলা গাছগুলোতে আজও কি বাদলা দিনে তেমনি ক'রে হলদে ফুলগুলো ফুটে ওঠে, পাখীর পায়ের ভরে, বাতাসের জোরে তেমনি ক'রে তলা বিছিয়ে পড়ে? আমাদের শিউলি গাছে তেমনি ক'রে শিউলি ফুটে গন্ধ ছড়ায় কি আজও? আজও কি প্রথম প্রভাতের তরুণ সূর্য্যের অরুণ আলো তেমনি ক'রে ছুটে এসে আমাদের ছোট বাড়ীখানা রঙিন ক'রে দেয় কমদা?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কমনীয় বলিল, "সবই তেমনি আছে শুভ্রা, মানুষ বদলায়, প্রকৃতি বদলায় না। মানুষ মরে যায়, প্রকৃতি মরে না। যখন যে সময় আসে তখন সে তেমনি সাজে।"

শুভ্রা নিশ্বাসটা প্রশমিত করিয়া বলিল, "একদিনে এক নিমেষে সব হারিয়ে ফেললুম কমদা! আজ আমি দেশ-ত্যাগিনী, সেখানে যাবার অধিকার আমার আর নেই। সেখানে তেমনি ক'রে গঙ্গা বয়ে যায়, তেমনি ফুল ফোটে ঝরে পড়ে, তেমনি মুক্ত চাঁদের আলোয় আমাদের বাড়ী-খানা হেসে ওঠে, রান্নাঘরের ওপরের আম গাছটা মুকুলে ভরে ওঠে, বাগানে বাঁশগাছের সরু আগা বাতাসে দোলে, তার মাঝে পাপিয়া ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, দোয়েলে শিষ দেয়। সবই তেমনি আছে, সবাই তা' চোখ ভরে দেখতে পাবে, দেখতে পাব না কেবল আমি। আমার সে পথে আমিই কাঁটা দেছি কমদা, আমার জন্যে আমার মাকে পর্য্যন্ত বিদেশবাসিনী করেছি, আমার এ দুঃখ কি মরেও যাবে কমদা? স্বদেশ আমার, স্বজন আমার, কিন্তু আমি কোথায়?"

তাহার চোখে জল আসিতেছিল, সামলাইয়া বলিল, "না, যাও তুমি। দেশে গিয়ে দেশের কাজ কর গিয়ে, এর বাড়া প্রার্থনীয় বস্তু জগতে আর কিছুই থাকতে পারে না। আঃ, আমার সমস্ত ধনসম্পত্তির বিনিময়ে আমায় যদি তারা সেখানে ভিক্ষা ক'রেও থাকতে দিত—"

কমনীয় বিগলিত স্বরে বলিল, "চল না শুভ্রা, কেউ তোমায় চিনতে পারবে না।"

"ছদ্মবেশের আবরণে" ঘৃণায় ললাট কুঞ্চিত করিয়া শুভ্রা বলিল, "না, তা আমি যাব না। আমি বিদেশিনী নামে পরিচিতা হ'তে যেতে চাই নে, আমি চাই দেশের মেয়ের যে দাবী আছে সেই দাবীর জোরে দাঁড়াতে। সে দাবী আমি হারিয়ে ফেলেছি। আমি আর যাব না, চির জীবন নির্ব্বাসিতা হয়েই কাটিয়ে দেব।"

তাহার ও সুষমার নিকট বিদায় লইয়া কমনীয় বাড়ী আসিল। দুপুরে গৃহিণী ও সতীর পদধূলি লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল।

বাড়ী আসিবামাত্র তুষার, রেখা ও চারটী বালক বালিকা তাহাকে ঘেরিয়া ফেলিল। ছেলে মেয়েদের নানাবিধ খেলনা, পুতুল দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া কমনীয় তুষার ও রেখার পানে ফিরিয়া হাসি মুখে বলিল, "নাও, এবার তোমাদের যা' বলবার থাকে বলতে পার। বউদির খেলনা চাই না কি?"

রেখা হাসিয়া বলিল, "না ভাই, ভগবান যে সব পুতুল আর খেলনা দেছেন, আর আমার পুতুল খেলনার সাধ নেই। তোমার দাদাকে জিজ্ঞাসা কর উনি যদি খেলনা নেন।"

কমনীয় ব্যাগ খুলিয়া একটী হস্তীদন্ত নির্ম্মিত সিন্দুর

কৌটা ও এক প্যাকেট সিন্দুর বাহির করিয়া বলিল, "এই তোমার খেলনা।"

লুব্ধ রেখা ছোঁ মারিয়া কৌটা ও সিন্দুর তুলিয়া লইল। তুষার হাসিয়া বলিল, "তুমিও তো ছেলে মানুষের মত করলে রেখা।"

রেখা মুখ ভার করিয়া বলিল, "আমার এ খেলনা নয়, আসল জিনিস।"

তুষার বলিল, "তারপর কমনীয়, মাকে কেমন রেখে এলে সেখানে? মা বেশ স্ফূর্ত্তিতে আছেন, সতীমা বেশ যত্ন করেন তো মাকে?"

কমনীয় বলিল, "সে আর বলতে? সতীমা মামীমার পেছনে ছায়ার মতন আছেনই। আর মামীমার স্ফূর্ত্তি খুব। সারাদিন কেবল ঠাকুর দেখে গঙ্গাস্নান ক'রে বেড়াচ্ছেন।"

তুষার খুব আরাম পাইয়া গেল, "যাক, মা তা হ'লে বেশ থাকবেন ওখানে। সামনে বৈশাখ মাসের শেষে আমার কলেজ ছুটী হ'লেই আমি মার কাছে যাব।"

রেখা বলিল, "আমিও যাব।"

তুষার মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা বই কি, মা সংসার ছেড়ে কাশী গেলেন তবে কি করতে? সেখানে আবার নাতি নাতনী, ছেলের বউ নিয়ে নতুন ক'রে মাথা ঘামিয়ে সংসার পাতাতে তিনি নিশ্চয়ই রাজি নন। কোথায় দুধ, কোথায় খাবার, আজ কি রান্না হবে, এ সব নিয়ে আবার বিব্রত করতে যেতে চাও তুমি, আর কি।"

রেখা অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিল, "শুনলে ঠাকুরপো, কথাটা শুনলে একবার। আচ্ছা, বল দেখি, এতে রাগ হয় না কি? ওঁরই মা, আমার আর কেউ না? আর এ ছেলে মেয়েগুলো যেন আমারই, ওঁর কেউ না। আচ্ছা, এই রইলুম আমি চুপ করে, দেখি ওঁর ছেলে মেয়েদের কে খেতে দেয়, কে দেখে।"

বেগতিক দেখিয়া তুষার হাসিয়া বলিল, "রাগ কোর না। যাবে যেয়ো, আমি কোনও আপত্তি করব না তাতে। সে তো এখনই নয়। এই তো চৈত্র মাসের আজ মাত্র তিন তারিখ, এখনও ঢের দিন বাকী।"

রেখা অত্যন্ত রাগিয়া গিয়াছিল, হাতখানা উল্টাইয়া বলিল, "আমি কক্ষনো যাব না। যাই যদি, আমার নাম রেখাই নয় তা হ'লে। তুমি যেয়ো মার কাছে, আমি এখানে পড়ে থাকব।"

সে চলিয়া গেল।

তুষার হাসিতে লাগিল, কমনীয়ও সে হাসিতে যোগ দিল।

সেদিন কমনীয় ইতির সহিত দেখা করিতে পারিল না। পরদিন ইতি যখন স্কুলে গিয়াছে, তখন সে স্কুলে গিয়া উপস্থিত হইল।

হঠাৎ কমনীয়কে দেখিয়া ইতি ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল, "আমার পত্র পাও নি তুমি?"

তাহার শুষ্ক মুখখানার পানে চাহিয়া কমনীয় বলিল, "পেয়েছি।"

ইতি বলিল, "আমার পত্র পেয়েও তুমি আসলে? আমি তোমায় বার বার বারণ করেছি না আসতে?"

কমনীয় শান্তকণ্ঠে বলিল, "আমি এসেছি তাতে কি হয়েছে ইতি?"

ইতির বুকের মধ্য হইতে একটা ব্যথা গলার কাছে ঠেলিয়া উঠিল, কম্পিতকণ্ঠে সে বলিল, "কি হয়েছে? আমি কি তোমায় লিখি নি আমার স্বামী তোমায় খুন করবে ব'লে শাসিয়েছে?"

কমনীয় বলিল, "তাতে আমি কি ভয় পাব ইতি? আমি যথার্থ যখন কোনও মন্দ কাজ করি নি, তখন ভয়ের তো কোনই কারণ নেই। তোমার 'পরে মিথ্যা দোষারোপ ক'রে সে তোমায় নির্য্যাতন করছে তাই শুনেও আমি তফাতে থাকব ইতি? না—আমায় সে রকম কাপুরুষ ভেব না। আমি তোমায় রক্ষা করব ব'লে এসেছি, রক্ষা করবও।"

ইতির চোখ ছল ছল করিতেছিল, সে চোখ নীচু করিয়া পদাঙ্গুলী খুঁটিতে লাগিল, কোনও উত্তর দিবার ক্ষমতা তখন তাহার ছিল না। তাহার ভয় হইতেছিল, কথা কহিতে গেলেই অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িয়া কমনীয়ের নিকট তাহাকে ব্যক্ত করিয়া ফেলিবে।

কমনীয় দেখিতেছিল এই কয়দিনেই ইতি বড় বিশ্রী

হইয়া গিয়াছে। তাহার বাম হাতের কাটা ও স্ফীতির পানে চাহিয়া কমনীয় বলিয়া উঠিল, "তোমার হাতে কি হয়েছে ইতি?"

"কিছু না" বলিয়া ইতি হাতখানার উপর কাপড় ফেলিয়া দিল।

ক্লিষ্টকণ্ঠে কমনীয় বলিল, "আমার কাছে গোপন করছ ইতি? তোমার এই গোপনতাই তোমায় ব্যক্ত ক'রে ফেলেছে। সত্যি বল দেখি, এ ক্ষত কি তোমার নির্দ্দয় স্বামীর দেওয়া নয়?"

ক্ষীণকণ্ঠে ইতি বলিল, "তাকে নির্দ্দয় বোলো না কমদা, সে আমায় বিয়ে ক'রে আমার জীবন রক্ষা করেছে।"

মর্ম্মপীড়িত কমনীয় বলিল, "ঠিক তাই বটে ইতি। মূর্খ আমি, তখন বুঝতে পারি নি, তখন জানতে পারি নি নারী হৃদয় কি, তাই পিছিয়ে গেছলুন, কোনও মতে কিছু ধারণা করতে পারি নি। যদি সেদিন আমিই দাঁড়াতুম, আমিই তোমায় গ্রহণ করতুম—"

ইতি মুখ উন্নত করিল, দীপ্তকণ্ঠে বলিল, "আর সে কথা ব'লে আগুন জ্বালিয়ে তুলবার কি দরকার কমদা? তুমি যা' করতে পারতে, তা' যখন করনি তখন নীরব থাক, আমাকেও নীরব থাকতে দাও। সে আমায় দয়া ক'রে গ্রহণ করেছে, সে জাতিতে নিকৃষ্ট, চরিত্রে নিকৃষ্ট হয়েও আমায় উদ্ধার করেছে, আমায় রক্ষা করেছে। সে আমার প্রণম্য। যখন এ দেহ তার, তখন সে পীড়ন করতে পারে, প্রহার করতে পারে, দু পায়ে দলন করতে পারে, তাতে তোমার কথা বলবার তো কোনও দরকার দেখছি নে। আমি আমার নিজের আশা তো ছেড়েই দেছি। নিত্য তার কাছে কীল লাথি খাচ্ছি, সব সয়ে গ্যাছে, আর তা গায়ে বাজে না। আমি তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি, তুমি সাবধান হও।"

কমনীয় মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমার সে কিছু করতে পারবে না। সে কখন আসে বল, আমি তার সঙ্গে দেখা ক'রে তাকে সব বুঝিয়ে বলব, বললে সে বুঝবে নিশ্চয়ই—"

বাধা দিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে ইতি বলিয়া উঠিল, "না না, আমি কক্ষনো বলব না সে কথা। সে কিছুতে বুঝবে না, সে কিছু শুনবে না। সে বাঘের মত প্রকৃতি বিশিষ্ট, তোমায় দেখলেই তার বুকের মধ্যে প্রবল ক্ষুধা জেগে উঠবে, সে তখনই তোমায় খুন করবে। মণির সঙ্গে সেদিন তার মারামারি হয়ে গ্যাছে, তুষারবাবু মণিকে কলকাতায় নিয়ে গ্যাছেন, সে বেঁচেছে। আমি তোমায় রক্ষা করব, আমি তোমায় তার সামনে দাঁড়াতে দেব না। তোমার পায়ে পড়ি কমদা, তুমি আবার কাশী চলে যাও, তিলার্দ্ধ এখানে থেক না। তার ফেলা বাজ আমার মাথাতেই পড়ুক, আমি পুড়ে ছাই হয়ে যাই—তাই আমার প্রার্থনীয়।"

দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া সে ধীরপদে সরিয়া গেল।

ক্রমশঃ।

অন্বেষণে।

[শ্রীকৃষ্ণধন দে, এম-এ]

(সনেট)

কোথা পথ?—কোথা পথ?—মিলন-কাতর,
ভগ্ন-প্রাণে খুঁজি শুধু কত যুগ ধরি'
অভিসার-পথখানি! শুনেছি বাঁশরী
হৃদয়-যমুনা-তটে; আকুল অন্তর
খুঁজিয়া ফিরিছে শুধু, কোথা বংশীধর?
কোন্ ফুল্ল-নীপ-কুঞ্জে সুতান লহরী
অধীর মদির-মন্দ্রে উঠিছে শিহরি';
—কাঁপিছে তারকা-স্তোম, দীপ্ত নীলাম্বর!

সে আহ্বানে,—সে ইঙ্গিতে,—রোমাঞ্চিত কায়
ছুটি' বাঁশরীর তানে,—কোথা পথরেখা?
একে একে জীবনের দিন চলে' যায়,
হে নিঠুর, হে মোহন, কোথা তব দেখা?
ক্লান্ত-দেহ, ভগ্ন-প্রাণ, আকুল তৃষায়!
—আশার আকাশে লুপ্ত ক্ষীণ-চন্দ্রলেখা!

শিক্ষায় শোরগোল।

[শ্রীমনীন্দ্রনাথ রায় এম-এ]

(৩)

প্রাথমিক শিক্ষা। *

শিক্ষার যে তৃতীয় বিষয়টী দেশে যথেষ্ট উত্তেজনা এবং কতকটা চাপা হাসির সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা শ্রীযুক্ত ইভান বিসের প্রাথমিক শিক্ষার শেষ প্রস্তাব। বিস সাহেবের প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের অনেকগুলিই অতি সুন্দর। স্যাডলার কমিশন যেমন দেশের মধ্য ও উচ্চতম শিক্ষা সম্বন্ধে প্রভূত গবেষণার পর একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন, মিশনরীদের চেষ্টায় অনুরূপ একটী বিশেষজ্ঞ সমিতি সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরিয়া বালক বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে একটী অতি উৎকৃষ্ট বিবরণ প্রকাশ করেন। † শ্রীযুক্ত এ-পি-ফ্রেজারের নেতৃত্বে এই সমিতি প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল উৎকৃষ্ট প্রস্তাব করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত বিস মহোদয় তাহাই বাংলাদেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সুচারুরূপে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই প্রয়োগেই তাঁহার কৃতিত্ব; তাঁহার প্রস্তাবগুলির উৎকৃষ্টতা ভারতবর্ষের গ্রাম্য শিক্ষা কমিশনের সুচিন্তিত অনুসন্ধানের ফল।

(ক) বিদ্যালয়ের গঠন।

শ্রীযুক্ত বিসের সকল অবধারণের আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। তিনি বড় বড় কেন্দ্র বিদ্যালয়ের পক্ষপাতী। এইটী সুশিক্ষার খুব অনুকূল অবস্থা হইলেও, ছোট ছোট প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকেও যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে। এই ছোট ছোট বিদ্যালয় দেশে সব সময়েই থাকিবে। দেশকে জ্যামিতিক ক্ষেত্রে ও সুন্দর সুন্দর বড় বড় বৃত্তে বিভাগ করা যত সহজ, মানুষের সমাজ ও মানুষের জীবনধারাকে তত সহজে গণিত শাস্ত্রের মাপ-কাঠীতে ঠেকাইয়া রাখা চলে না। ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিকে কোন সময়েই অন্ধ থাকিলে চলিবে না।

বিদ্যালয়ের শ্রেণী বিভাগ ও বর্গ গঠন সম্বন্ধে তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করা যায় না। দশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার কাল হওয়া উচিত। তারপর আন্তর বিদ্যালয়ে (middle school) ইহার সহিত দুই বৎসর যোগ হইলেই যথেষ্ট হয়। উচ্চ বিদ্যালয়গুলির শেষ বয়স চৌদ্দ বৎসর হইলে, এগুলি নামে উচ্চ বিদ্যালয় থাকিবে, এবং প্রকৃত-পক্ষে অন্যান্য দেশের নিম্ন বিদ্যালয়ের (elementary school) অনুরূপ হইবে। নামের গুরুত্বের দ্বারা শিক্ষা বিষয়ে প্রলোভনের সৃষ্টি করা শ্রীযুত বিসের মত বিশেষজ্ঞের উপযুক্ত হয় নাই। যদি উচ্চ বিদ্যালয়গুলির শেষ বয়স কমাইবার প্রয়োজন থাকে, নাম পরিবর্ত্তন করিলে ক্ষতি কি? এই বয়সের পরিবর্ত্তন শিক্ষার একটী নগণ্য ব্যাপার নয়। বয়স কম করিলেই শিক্ষার আদর্শের পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইবে, এবং উচ্চতর শিক্ষার জন্য নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। এই নূতন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা প্রভৃত অর্থ সাপেক্ষ ব্যাপার। কাজেই উচ্চ শিক্ষার সঙ্কোচ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার সঙ্কোচ জাতীয় জীবনের উৎকর্ষের পক্ষে কল্যাণকর হইবে না। দেশবাসীদের এ বিষয়ে খুব সাবধান হওয়ার প্রয়োজন আছে। উচ্চ বিদ্যালয়ের শেষ বয়স আইনের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করার কোন প্রকার আবশ্যকতা না থাকিলেও, হিসাবের সময় উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা যে যোল বৎসর বয়সের শিক্ষা তাহা মানিয়া লইয়া নিম্নক্রমের মধ্য শিক্ষার পরিচালনা আবশ্যক। ক্ষেত্র বিশেষে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের শেষ দুই শ্রেণী এবং কলেজের প্রথম দুই শ্রেণী সংযুক্ত করিয়া, পূর্ণাঙ্গ

* Report on the Expansion and Improvement of Primary Education in Bengal, by Evan E. Biss.

† Village Education in India (H. Milford)

মধ্য শ্রেণীর কলেজ প্রতিষ্ঠার অবসর থাকিলেও, সকল স্থলেই এরূপ পূর্ণাঙ্গ মধ্য শিক্ষার প্রথম দুই শ্রেণী বর্ত্তমানের উচ্চ বিদ্যালয়গুলি হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, শিক্ষা বিস্তারে এবং সৎ শিক্ষার অনেক বিভ্রাট উপস্থিত হইতে পারে।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এবং অনেকটা সৎ শিক্ষার জন্য শিক্ষার সকল স্তরে ব্যবহারিক শিক্ষার প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। কিন্তু তাই বলিয়া নয় বৎসর বয়সের পরই বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে, বিশেষ কোন ফললাভ হইবে না। এরূপ শিক্ষার জন্য যে ব্যয় হইবে, তাহা এই দুর্দ্দিনে পরীক্ষা হিসাবেও অমার্জ্জনীয়। এত কম বয়সে বৃত্তি শিক্ষা সার্থক হইতে পারে না। উপযুক্ত হস্ত শিক্ষা দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষাকে ব্যবহারিক ভাবাপন্ন করাই এরূপ ক্ষেত্রে সমীচীন ব্যবস্থা। দশ বৎসরের পর প্রথম দুই বৎসর সাধারণ শিক্ষার সহিত যোগ রক্ষা করিয়া এইরূপ ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদত্ত হইলেই, ছাত্রদিগের অধিকতর উপকার হইবে। এবং বার বৎসরের পর নিম্নক্রমের বৃত্তি শিক্ষার উদ্যোগই উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা।

(খ) বর্গ বিভাগ।

সমান্তরাল বর্গ বিভাগ ও বেঞ্চি চেয়ারের মোহ পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থায় অত্যন্ত অধিক। খুব সুখের বিষয় শ্রীযুক্ত বিস মহোদয় তাঁহার দ্বিতীয় বিবরণে টেবিল চেয়ারের মোহ কাটাইয়া, মাদুর ইত্যাদির সপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী বিভাগের মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারিলেই ভাল হইত। নব শিক্ষার মোহে প্রাচীন পাঠশালাগুলিকে অস্বীকার করা, এবং ইহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা যেন একটা ফ্যাসান হইয়া উঠিয়াছে। দেশের প্রাচীন বিদগ্ধতা কি এই পাঠশালা, টোল ও মঠকে আশ্রয় করিয়া বিকশিত হয় নাই? শিক্ষার এই প্রাচীন উপায়গুলিকে উপেক্ষা করা, এই প্রাচীন বিদগ্ধতাকে অস্বীকার করার নামান্তর। আমাদের দেশে প্রাচীন পাঠশালায় বয়োনুক্রমিক সমান্তরাল বর্গ বিভাগ ছিল না। এরূপ শ্রেণী বিভাগ আমাদের জাতিগত বিধান নয়। এই শ্রেণী বিভাগ ছিল না বলিয়াই প্রাচীন পাঠশালায় যতটুকু শিক্ষা প্রচলিত ছিল, তাহাতে মেকির সম্ভাবনা ছিল কম। ছাত্রদিগকে নিজ নিজ সুবিধা ও শক্তি অনুসারে নিজ নিজ পাঠ সমাপন করিতে হইত। সহপাঠী ও উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের নিকট তাহারা এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিত। গুরুমহাশয়েরাও যখন সাহায্য করিবার সুযোগ পাইতেন, তখন ছাত্রদিগকে ব্যক্তিগত ভাবেই সাহায্য করিতেন বলিয়াই এরূপ সাহায্যে অধিকতর সুফল ফলিত। এখানকার মত সমবেত শিক্ষা, অর্থাৎ জেলের কয়দীদের আহারের ব্যবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল খুব কম। এখনও আমাদের টোলের শিক্ষা বিষয়ানুক্রমিক এবং অনেকটা ব্যক্তিগত শিক্ষা, ইংরাজি বিদ্যালয়ের মত সমবেত শিক্ষা নয়। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে আমরা পাঠশালায় কতকটা এরূপ শিক্ষাই পাইতাম। ইংলণ্ডে মণ্টেসরী ও শ্রীমতী পার্কহার্ষ্টের প্রণালীর যথেষ্ট আদর হইতেছে। এই শিক্ষাও সমবেত শিক্ষা নয়। ব্যক্তিগত শিক্ষার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাথমিক শিক্ষায় শ্রেণী বিভাগের বাঁধাবাঁধি থাকা উচিত নয়। এরূপ ব্যবস্থায় কম শিক্ষকের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত অধিক ছাত্র ছাত্রীর উৎকৃষ্টতর শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে, এবং মাদুর ইত্যাদির দিকে যখন নজর দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে, তখন দেশীয় শিক্ষার এই পুরাতন ব্যবস্থাটী ফিরাইয়া আনিলে, শিক্ষা ভালই হইবে, এবং ব্যয়ও অপেক্ষাকৃত অনেক কম হইবে।

(গ) শিক্ষার ব্যয়।

কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার এই কতকটা আভ্যন্তরীণ বিধানই এই স্তরের শিক্ষার কঠিন সমস্যা নয়। ব্যয় সঙ্কুলানই এখানকার দুরূহ সমস্যা। সহরের শাসন-সঙ্ঘগুলিতে ক্রমে ক্রমে এই সমস্যার সমাধানের উপায় হইলেও, গ্রাম্য শিক্ষার অর্থ সমস্যাই অধিকতর জটিল। গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন সর্ব্বত্রই বিশেষ আকর্ষণের বস্তু নয়। স্বায়ত্ততাও এখানে খুব সঙ্কীর্ণ। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিলে, সার্কল্ অফিসার, লোকাল্ বোর্ড, মহকুমার হাকিম, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ প্রভৃতি ছোট বড় প্রভুদের আওতা হইতে নবীন সমিতিগুলির রক্ষার ব্যবস্থা হইলে, বোধ হয়, গ্রাম হইতেও কিছু কিছু অর্থ মিলিতে পারে। পূর্ব্বে গ্রামের চৌকিদারেরা

চাকরাণ জমি হইতে প্রতিপালিত হইত। এই জমিগুলি উদ্ধার করিয়া, গ্রাম্য সমিতির হাতে দিলে, এবং চৌকিদারদের সংখ্যা হ্রাস করিয়া এই জমি হইতে তাহাদের পোষণের ব্যবস্থা পুনঃ প্রচলিত হইলে, বর্ত্তমান চৌকিদারি কর শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইতে পারে। গ্রামের জমিদারেরা অনেক ক্ষেত্রেই গ্রামবাসী প্রজাদিগের সুখ দুঃখের কোন খবরই রাখেন না। তাঁহারা চিনেন জমা এবং তাহার আদায়। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য তাঁহাদিগকে একটু সচেতন করার ব্যবস্থা হইলেও মন্দ হয় না। অবশ্য দেশ মুখরিত করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দাবীর চীৎকার উঠিবে। কিন্তু এই দাবী জমিদারদের নানা দাবী ও নানা ক্রটীর ভিতর দিয়া দেশবাসীকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। পূর্ব্বে ও বর্ত্তমান জমিদারদের পিতৃ-পিতামহগণ গ্রামের শান্তি রক্ষার ভার বহন করিতেন। এখনই তাঁহাদিগকে গ্রামের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি বিষয়ে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে থাকিতে দেওয়া হইবে কেন? কিন্তু অর্থের অপর যে কোন ব্যবস্থাই হৌক না কেন, সরকারী ধনভাণ্ডারে যথেষ্ট দাবী আসিয়া পড়িবে, এবং ধনশালী পাশ্চাত্য দেশসমূহের দোহাই দিয়া, এই অর্থ সাহায্যের হার নির্দ্ধারিত হইলে, গ্রাম্য শিক্ষার বিশেষ কিছু উন্নতির সম্ভাবনা খুব অল্প।

বাঙ্গালা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র।

[শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন কবিরাজ]

ইংরাজী শিক্ষার প্রবল বাত্যায় বাঙ্গালীর নিজস্ব ভাষা যখন তাহার নিকট উপেক্ষিত ও অনাদৃত হইতেছিল, ইংরাজী পড়িয়া, ইংরাজী শিখিয়া, ইংরাজের হাব-ভাব চাল-চলন এমন কি কথোপকথন সময়েও বাঙ্গালী যখন ইংরাজের অনুকরণে একান্ত অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ইংরাজী শিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্র তখন বুঝিলেন, অনুকরণপ্রিয় বাঙ্গালীর মতি পরিবর্ত্তন করিতে হইলে শুধু বক্তৃতা করিয়া, প্রবন্ধ লিখিয়া শুভ ফল ফলিবে না; বাঙ্গালীর এই রুচি পরিবর্ত্তনের জন্য ইংরাজ জাতিরই নভেলকে আদর্শ করিয়া বাঙ্গালায় নভেল লিখিয়া তাহার চক্ষুর সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে "আলালের ঘরে দুলাল"কে বাঙ্গালী লাভ করিতে পাইয়াছিল, কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার তখন প্রাথমিক স্রোতে বাঙ্গালী জাতি এমনিই ভাসিয়া গিয়াছিল যে, উহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া অঙ্গ শীতল করিবার সুকৃতি সকলে লাভ করিতে পারিল না। নাটক আমাদের নিজস্ব সামগ্রী, কিন্তু নাটক দৃশ্যকাব্য; পাঠের স্পৃহা অপেক্ষা দর্শনের স্পৃহা নাটকের পক্ষে স্বাভাবিক, কাজেই বঙ্কিম যুগের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় কয়েকখানি উৎকৃষ্ট নাটকের অবতারণা ঘটিলেও অভিনয়ের সুলভতার অভাবে ঐ সকল নাটকও বাঙ্গালীর মতি পরিবর্ত্তনে সক্ষম হইল না। বাঙ্গালায় কাব্যেরও অভাব ছিল না, ঐ সকল কাব্যের মধ্যে মধুসূদনের কাব্যের রসাস্বাদ লাভ বাঙ্গালী প্রথমে করিতে পারিল না, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক গীতিকাব্যগুলির সমাদর বৈষ্ণবেরা ভিন্ন আর কেহ করিলেন না; কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ কেবল মুদির দোকানেই সুর করিয়া পঠিত হইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকগুলি অমূল্য রত্ন বাঙ্গালীর সমক্ষে উপস্থাপিত করিলেন, কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল ভিন্ন ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী অবসর কালে সেগুলি পাঠ করা অপেক্ষা 'সেলি', 'বায়রণের'ই অধিক অনুরাগী হইয়া পড়িলেন। দাশুরায়ের পাঁচালী, নীলকণ্ঠের কৃষ্ণযাত্রা—দেশে তখন এখনকার থিয়েটার-বায়োস্কোপের মত প্রভাব বিস্তার করিল বটে, কিন্তু আসরে ঐ সকল বিষয়ের রচনা শ্রবণ ভিন্ন ঐ সকল পুস্তক সখ করিয়া পড়িবার প্রবৃত্তি তখন ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর মোটেই হইল না। কবির লড়াই, তরজার উত্তর প্রত্যুত্তরে বাঙ্গালা ভাষার মৌলিকতা যথেষ্ট নিবদ্ধ থাকিলেও বাঙ্গালী সখ মিটাইবার জন্যই ঐ

সকল শ্রবণ করিত। আরব্য উপন্যাস তখন বাজারে বাহির হইয়াছে, কিন্তু ঐ শ্রেণীর গ্রন্থের পাঠক হইতেন তখন যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষার ধার ধারিতেন না।

সত্য সত্য বাঙ্গালীর তখন অবস্থা অতি ভীষণ ভাবই ধারণ করিতেছিল। বাঙ্গালী জাতি তখন ইংরাজী ছাঁচে অনুপ্রাণিত হইতেছে। স্কুল কলেজের তখন এখনকার মত এত প্রতিষ্ঠা হয় নাই, সুতরাং ইংরাজী শিখিবার জন্য সকলকেই তখন সহরে আসিতে হইত। একে ইংরাজী শিক্ষার প্রথম ও প্রবল প্রতাপ, তাহার উপরে সহরের সভ্যতা বাঙ্গালী জাতিকে এরূপ বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিত যে, তাহা সমাজের পক্ষে ক্ষতির কারণই হইত। ইংরাজী শিখিলেই সুরাপান করিতে হইবে তখন বাঙ্গালী মনে করিত,—দীনবন্ধুর নিমচাঁদ—তাৎকালিক ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর সুন্দর আলেখ্য। দীনবন্ধু 'জামাই বারিকে'র তাৎকালিক চিত্র যেরূপ সুস্পষ্ট আঁকিয়া গিয়াছেন, সুরার দাস ইংরাজী শিক্ষিত 'নিমচাঁদে'র চিত্রও সেইরূপ ইংরাজী শিক্ষার প্রাথমিক সময়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

একদিকে ইংরাজী শিক্ষিত দলের অবস্থা যেরূপ হইল, তাহাতে তাঁহারা বাঙ্গালা গ্রন্থ স্পর্শ করা দূরে থাকুক, ইংরাজী ভিন্ন বাঙ্গালায় কথা বলিবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত হারাইতে আরম্ভ করিলেন, অন্যদিকে যাঁহাদিগের ভাগ্যে ইংরাজী শিক্ষার স্বাদ গ্রহণের সুযোগ ও সুবিধা ঘটিল না, কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণই তাঁহাদের নিকট বাঙ্গালা চর্চ্চার পরিসমাপ্তি করিতে লাগিল। ফলে বাঙ্গালীর বুদ্ধির দোষে বাঙ্গালা ভাষার ক্ষীণ রশ্মি তখন নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় অন্ধ তমসাচ্ছন্ন, ঠিক এমনই দুর্দ্দিনে ইংরাজী বিদ্যায় সুপণ্ডিত বাঙ্গালা সাহিত্য-গগনের উজ্জ্বল ধ্রুবতারা মহামতি বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজী ভাষার সাধনা না করিয়া তাঁহার স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দকে ইতিহাস-বিজড়িত অমূল্য গ্রন্থ দান করিলেন 'দুর্গেশনন্দিনী'।

ইংরাজী শিক্ষিত বাবুর দল দেখিল এ এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি,—এমন মাদকতা, এমন প্রাণস্পর্শী উন্মাদনা বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠে যে আসিতে পারে, এ-তো ধারণার অতীত। ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ বাঙ্গালীও বুঝিল বাঙ্গালী কবির হস্ত-তুলিকায় যে অপূর্ব্ব চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে—এক-বার পড়িয়া তাহার পরিতৃপ্তি হইবে না, শুধু নিজে পড়িয়া সে সুখ উপলব্ধি করিলে চলিবে না, একবার, দুইবার, তিনবার, বহুবার এই গ্রন্থ পড়িতে হইবে। নিজে পড়িতে হইবে, সংসারে নিজের বলিতে যাহারা—সে পত্নী, কন্যা, ভগ্নীগণের হস্তে ইহা প্রদান করিতে হইবে। ফল কথা বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালার ঘোর দুর্দ্দিনে 'দুর্গেশনন্দিনী'র চিত্র আঁকিয়া দেশবাসীর সম্মুখে যাহা উপস্থাপিত করিলেন, হেলায় হউক, শ্রদ্ধায় হউক, বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠের দিকে বাঙ্গালীর সেই হইতে যে প্রবৃত্তি সঞ্চারিত হইল—তাহা বলা যাইতে পারে।

দুর্গেশনন্দিনীর পরে যখন 'মৃণালিনী' বাহির হইল, বাঙ্গালী তখন দেখিল স্বর্গের মন্দাকিনী যেন তাহার সমক্ষে আবির্ভূতা হইয়াছেন। দুর্গেশনন্দিনীতে মুসলমান মহিলা আয়েসার চিত্র দেখিয়া বাঙ্গালী সেই দেবী প্রতিমাকে অর্ঘ্য দিবার জন্য প্রাণভরা ভক্তিটুকু যাহা ঢালিয়া দিয়াছিল, মৃণালিনীতে

"বিকচ নলিনে যমুনা পুলিনে
বহুত পিয়াসা রে
চন্দ্রমাশালিনী যা মধু যামিনী
না মিটল আশা রে।"

পড়িয়া প্রাণের পিয়াসা আরও বাড়িয়া উঠিল। বাঙ্গালী তখন গিরিজায়ার কথায় ভাবিতে লাগিল

"যে ফুল ফুটিত সখি গৃহ তরু শাখে
কেন রে পবনা উড়ালি তাকে।"

বাঙ্গালী কি দোষ করিয়াছিল পরমেশ্বর! যাহার জন্য তাহার নিজস্বকে এতদিন ভুলিয়া পরসেবায় প্রবৃত্তি জন্মিয়া-ছিল? ফলে বাঙ্গালী দুর্গেশনন্দিনী ও মৃণালিনী পড়িয়া ঐ শ্রেণীর গ্রন্থ পড়িবার জন্য আকুল হইয়া উঠিল। ক্রমশঃ বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি বহু গ্রন্থই বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিবর্দ্ধন করিল। ইংরাজী শিক্ষাভি-মানী বাঙ্গালী পাঠক বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল যখন পাইল, তখন ইংরাজীর সহিত তুলনা করিয়া দেখিল—

ইংরাজের তুলিকায় সেরূপ চিত্র যুগ-যুগান্তর ধরিয়া চেষ্টা করিলেও বাহির হওয়া বুঝি সম্ভব নহে। ইহার প্রধান কারণ—পাউরুটী বাঙ্গালীর রুচিপ্রদ হইতে পারে, কিন্তু ভাত না খাইলে পর্য্যাপ্ত পাউরুটী ভক্ষণেও বাঙ্গালীর যেমন পরিতৃপ্তি হইতে পারে না—সেইরূপ বিলাতী নবেলের হাব-ভাব, সৌন্দর্য্যে বাঙ্গালী বিস্ময়বিমূঢ় হইলেও 'সূর্য্যমুখী' ও 'ভ্রমরে'র মত মূর্ত্তিমতী পতিগতপ্রাণা রমণী-পুষ্পের চিত্র সম্পাদন বিলাতী নবেলে সম্ভবপর নহে। মহাকবি হেমচন্দ্র যে বলিয়া গিয়াছেন—

"কে খোঁজে সরস মধু বিনা বঙ্গ-কুসুমে
কোথায় এমন আর
কোমল কুসুম হার
পরিতে, দেখিতে, ছুঁতে আছে এ নিখিল ভূমে
কোথা হেন শতদল
হৃদে পূরি পরিমল
থাকে প্রিয়-মুখ চেয়ে মধুমাখা সরমে
বঙ্গনারী পুষ্প বিনা মধু কোথা কুসুমে।"

* * *

"কে দেয় বিলাতি "লিলি" নলিনীতে উপমা
দেশে যে কুমুদ আছে
আসুক তাহারি কাছে
তখন দেখিব বুঝে কার কত গরিমা।
বিধুর কিরণ কোলে
কুমুদ যখন দোলে
কি মাধুরী মরি তায় কে বোঝে সে মহিমা,
কোথায় বিলাতি "লিলি" নলিনীর উপমা।"

কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য। বাঙ্গালীর নারী চরিত্রের যাহা বিশেষত্ব,—বাঙ্গালীর নারী জাতির স্নেহ ভালবাসার ভিতর যে স্বর্গের মন্দাকিনীর ধারা সহজেই আনিয়া দেয়, যে ভালবাসা প্রিয়জনের জন্য নিজের সকল সুখ বিলাইয়া দিতে পশ্চাৎপদ নহে, বঙ্কিমচন্দ্র 'সূর্য্যমুখী' ও 'ভ্রমরে'র সেই চিত্রই আঁকিয়াছেন। কমলমণির বাটী হইতে নগেন্দ্রনাথ যখন সূর্য্যমুখীকে কুন্দের সকল কথা লিখিয়া পাঠাইলেন, সূর্য্যমুখীর তখন একটু যে ভয় হয় নাই তাহা নহে, সেইজন্য তিনি উত্তরে লিখিলেন—

"দাসী শ্রীচরণে কি অপরাধ করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কলিকাতায় যদি তোমায় এত দিন থাকিতে হইবে, তবে আমি কেনই বা নিকটে গিয়া পদসেবা না করি। এ বিষয়ে আমার বিশেষ মিনতি, হুকুম পাইলেই ছুটিব।"

তাহার পরে মনের ভাব আরও খুলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার কলম দিয়া বাহির হইল—

"একটী বালিকা কুড়াইয়া পাইয়া কি আমাকে ভুলিলে? অনেক জিনিসের কাঁচারই দরকার। নারিকেলের ডাবই শীতল। স্ত্রী-জাতিও বুঝি কাঁচা-মিঠে। নহিলে বালিকাটী পাইয়া আমায় ভুলিবে কেন?"

কিন্তু তাহার পরই আশঙ্কা নিবারণের জন্য একটা পথ খুঁজিয়া পাইলেন। তারাচরণের সঙ্গে যদি কুন্দের বিবাহ হয় তাহা হইলে তো আর কোন গণ্ডগোল থাকে না, সেই জন্য তাহার পরে লিখিলেন—

"তামাসা যাউক, তুমি কি মেয়েটীকে একেবারে সত্ত্ব-ত্যাগ করিয়া বিলাইয়া দিয়াছ? নইলে সেটি আমি তোমার নিকট ভিক্ষা করিয়া লইতাম। মেয়েটিতে আমার কাজ আছে—মেয়েটিতে কি কাজ? আমি তারাচরণের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিব।" ইত্যাদি।

তাহার পর কুন্দনন্দিনীর সহিত তারাচরণের বিবাহ হইল। কুন্দ তিন বৎসর পরে বিধবা হইয়া নগেন্দ্রনাথের গৃহেই স্থান পাইল। নগেন্দ্রনাথ প্রথম দর্শনেই কুন্দনন্দিনীর রূপে অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু সূর্য্যমুখীর মুখ দেখিয়া সে রূপ-বহ্নিতে ঝাঁপ দিতে পারেন নাই। কিন্তু কুন্দ যখন তাঁহার সুবৃহৎ প্রাসাদে আশ্রয় পাইয়া বিদ্যুৎ প্রভার মত সময়ে সময়ে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল, একদিন মাতার আদেশ পালনের জন্য ধীরে ধীরে অস্খলিত সঙ্কল্পে সে যখন সরোবর-সোপানে নামিতেছিল, সেই সময় নগেন্দ্র ধীরে ধীরে তাহার পৃষ্ঠে অঙ্গুলি স্পর্শ করিল।

নগেন্দ্র তখন সূর্য্যমুখীকে ভুলিয়া কুন্দের ভাবে বিভোর হইয়াছে। তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল—"কেন কুন্দ, বিধবার বিবাহ কি অশাস্ত্র?" কুন্দ বলিল, "না।"

নগেন্দ্র বলিল,—"তবে 'না' কেন? বল—বল—বল, আমার গৃহিণী হইবে কি না? আমায় ভালবাসিবে কি না?"

কথা গোপন রহিল না। সূর্য্যমুখী সকলই বুঝিলেন। স্বামী সন্নিধানে কুন্দের প্রসঙ্গ তুলিয়া যখন বুঝিলেন, তাঁহার কপাল পুড়িয়াছে, স্বামী যখন তাঁহাকে বলিলেন,—"সূর্য্যমুখী! অপরাধ সকলই আমার। তোমার অপরাধ কিছুই নাই। আমি যথার্থই তোমার নিকট বিশ্বাসহন্তা।" ইত্যাদি। সূর্য্যমুখী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, যোড় হাত করিয়া কাতর স্বরে বলিলেন,—"যাহা তোমার মনে থাকে থাক, আমার কাছে আর বলিও না, তোমার প্রতি কথায় আমার বুকে শেল বিঁধিতেছে। আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল ঘটিয়াছে,—আর শুনিতে চাহি না, এ সকল আমার অশ্রাব্য।"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন—"না—তা নয়—সূর্য্যমুখী! আরও শুনিতে হইবে। যদি কথা পাড়িলে, তবে মনের কথা ব্যক্ত করিয়া বলি। কেন না অনেক দিন হইতে বলি বলি করিতেছি। আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। মরিব না—কিন্তু দেশান্তরে যাইব। বাড়ী ঘর সংসারে আর সুখ নাই, আমি তোমার অযোগ্য স্বামী। আমি আর কাছে থাকিয়া তোমাকে ক্লেশ দিব না। কুন্দনন্দিনীকে সন্ধান করিয়া আমি দেশ দেশান্তরে ফিরিব। তুমি এ গৃহে গৃহিণী থাক। মনে মনে ভাবিও, তুমি বিধবা, যাহার স্বামী এরূপ পামর সে বিধবা নহে তো কি? কিন্তু আমি পামর হই আর যাই হই, তোমাকে প্রবঞ্চনা করিব না। আমি অন্যাগত-প্রাণ হইয়াছি, সে কথা তোমাকে স্পষ্ট বলিব, এখন আমি দেশত্যাগ করিয়া চলিলাম। যদি কুন্দনন্দিনীকে ভুলিতে পারি তবে আবার আসিব, নচেৎ তোমার সঙ্গে এই শেষ সাক্ষাৎ।"

এই শেলসম কথা শুনিয়া সূর্য্যমুখী কি বলিলেন? কয়েক মুহূর্ত্ত প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিবৎ পৃথিবী পানে চাহিয়া রহিলেন। পরে সেই ভূতলে অধোমুখে শুইয়া পড়িলেন। দণ্ডেক পরে সূর্য্যমুখী উঠিয়া বসিলেন, আবার স্বামীর পায়ে ধরিয়া বলিলেন—"এক ভিক্ষা।"

নগেন্দ্র বলিলেন—"কি?"

সূর্য্য। আর এক মাস গৃহে থাক। ইতিমধ্যে যদি কুন্দনন্দিনীকে না পাওয়া যায় তবে তুমি দেশত্যাগ করিও। আমি মানা করিব না।

নগেন্দ্রনাথ মৌনভাবে বাহির হইয়া গেলেন। সূর্য্যমুখী মনে মনে বলিতেছিলেন, "আমার সর্ব্বস্ব ধন! তোমার পায়ের কাঁটাটী তুলিবার জন্য প্রাণ দিতে পারি। তুমি পাপ সূর্য্যমুখীর জন্য দেশত্যাগী হইবে? তুমি বড়—না আমি বড়?"

আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থের সমালোচনা করিতে বসি নাই, এজন্য তাঁহার অতুলনীয় চরিত্রগুলি লইয়া আমি বেশী কিছু বলিব না, কথা প্রসঙ্গে যেটুকু না বলিলে নয় তাহাই বলিয়া যাইতেছি মাত্র। প্রকৃত কথা, আমার বক্তব্য, বঙ্কিমবাবু যে দেব-দুর্ল্লভ নারী চিত্র বাঙ্গালী পাঠককে দান করিয়াছেন, তাহার সহিত বিলাতী নবেলের চিত্রিত চরিত্রের কথাই আসিতে পারে না। বঙ্কিমবাবু যাহা বাঙ্গালীকে দিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহার খাঁটী জিনিষ—সমাজের নিখুঁত চিত্র; সে জিনিষ—সে চিত্র ইউরোপ বা অন্য দেশ কোথায় পাইবে?

বঙ্কিমবাবুর পুস্তকগুলিতে 'তিলোত্তমা', 'মৃণালিনী', 'ভ্রমর', 'সূর্য্যমুখী' প্রভৃতি যাঁহাদিগকে আমরা বিবাহিতা পত্নীরূপে পাইয়াছি—তাঁহাদিগের চরিত্রে প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর গুণগুলি দেখিয়া আমরা তো তাঁহাদিগকে কোটী কোটী প্রণাম না করিয়া থাকিতেই পারি না; তদ্ভিন্ন যে চরিত্রগুলি নিজের জীবন অলক্ষ্যে বিলাইয়া দিয়াছে এবং জীবনাবধি প্রতিদানের ফলে অশেষবিধ কষ্টভোগ করিয়াই আসিয়াছে, সেগুলির মাধুর্য্য যাঁহারা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারিয়াছেন তাঁহারা তাহাদিগকে কোনো কালেই ভুলিতে পারিবেন না। 'আয়েসা'র মত মহীয়সী রমণী প্রবল প্রভাপান্বিত 'ওসমানে'র প্রাণভরা ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করিয়া যখন বলিয়া উঠিল,—"শুন, ওসমান, আবার বলি, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর। যাবজ্জীবন অন্য কেহ আমার হৃদয়ে স্থান পাইবেন না। কাল যদি বধ্যভূমি ইঁহার শোণিতে আর্দ্র হয়, তথাপি দেখিবে, হৃদয়

মন্দিরে ইঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্তকাল পর্য্যন্ত আরাধনা করিব। এই মুহূর্ত্তের পর যদি আর চিরন্তন ইঁহার সঙ্গে দেখা না হয়, কাল যদি ইনি মুক্ত হইয়া শত মহিলার মধ্যবর্ত্তী হন, আয়েসার নামে ধিক্কার করেন, তথাপি আমি ইঁহার প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী দাসী রহিব।"

তাহার পর যখন 'অভিরাম স্বামী' গড়মন্দারণে গমন করিয়া মহাসমারোহের সহিত দৌহিত্রীকে জগৎসিংহের পাণিগৃহিত্রী করিলেন, তিলোত্তমার সহিত জগৎসিংহের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল, আয়েসা তখন তিলোত্তমাকে বহুমূল্য রত্নালঙ্কার উপহার দিয়া কহিলেন, আমি যে রত্নগুলি দিলাম—অঙ্গে পরিও। আর আমার—তোমার সার রত্ন হৃদয় মধ্যে রাখিও। 'তোমার সার রত্ন' বলিতে আয়েসার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল, তিনি আর তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতবেগে গৃহত্যাগ করিয়া দোলারোহণ করিলেন।

প্রাসাদে আসিয়া অঙ্গুলি হইতে একটী অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিলেন। সে অঙ্গুরীয় গরলাধার। একবার মনে মনে করিতেছিলেন, "এই রস পান করিয়া এখনি সকল তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারি।" আবার ভাবিতেছিলেন—"এই কাজের জন্য কি বিধাতা আমাকে সংসারে পাঠাইয়াছিলেন। যদি এ যন্ত্রণা সহিতে না পারিলাম তবে নারীজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম কেন?"

আবার অঙ্গুরীয় অঙ্গুলিতে পরিলেন। আবার কি ভাবিয়া খুলিয়া লইলেন। ভাবিলেন 'এ লোভ সংবরণ করা রমণীর অসাধ্য। প্রলোভনকে দূর করাই ভাল'। এই বলিয়া আয়েসা গরলাধার অঙ্গুরীয় দুর্গ পরীখা জলে নিক্ষিপ্ত করিলেন।

আয়েসার এই চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে জগৎসিংহের প্রতি তাঁহার যে অনুরাগ দেখিতে পাই তাহাকে 'কাম' বলিতে পারি না, তাহা প্রেম পদবাচ্য। সে প্রেম স্বর্গের জিনিস,—বৈষ্ণব কবির পদে সে প্রেম আমরা দেখিতে পাই। সেই প্রেমে উন্মাদিনী হইয়া একদিন আমার রাধারাণী বলিয়াছিলেন,—

"হিয়ার মাঝারে যতনে রাখিব
বিরল মনের কথা।
মরম না জানে ধরম বাখানে
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা।"

বঙ্কিমচন্দ্রের 'শৈবলিনী' খুব স্বাভাবিক চিত্র। বাল্য প্রণয়ের ফলে শৈবলিনী বিবাহের পরও প্রতাপকে ভুলিতে পারে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও যে সে প্রতাপের জন্য কলঙ্কের পসরা মাথায় লইতে কুণ্ঠিতা হয় নাই তাহাও কিন্তু প্রেমের প্রকার ভেদ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। শৈবলিনীর সেই অবস্থা—ব্রজাঙ্গনাগণের ভাবেরই অভিব্যক্তি মাত্র। স্বীকার করি, চন্দ্রশেখরের বিবাহিতা পত্নী শৈবলিনী হিন্দুর ঘরের অন্যান্য রমণীর মত চন্দ্রশেখরকে ভালবাসিতে না পারিয়া এবং প্রতাপের মোহন মধুর স্মৃতিখানি হৃদয়পটে অহোরহ আঁকিয়া রাখিয়া যথেষ্ট অন্যায় কাজ করিয়াছিল; স্বীকার করি, শৈবলিনী যখন স্বামীগৃহে থাকিয়াও প্রতাপের সহিত মিলন কামনায় আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে তখন ফষ্টরকে অবলম্বন করিয়া সে মুঙ্গের যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যে অপকর্ম্ম করিয়াছিল, তাহা হিন্দুর ঘরের স্ত্রীলোকের পক্ষে অনেকটা অস্বাভাবিক; স্বীকার করি, নাপিতানীবেশী সুন্দরী যখন তাহাকে ফিরাইবার উদ্দেশে বহুবিধ চেষ্টা করিলেন, তখন তাহার ফিরিয়া না যাওয়া ভাল হয় নাই। তথাপি বলিব, বঙ্কিমবাবু প্রতাপের প্রণয়ে উন্মাদিনী করিয়া তাহার যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহার উপমা দিতে হইলে বৈষ্ণব কবির বর্ণিত বরনারীর অভিসারের কথা স্বতঃই যেন মনে আসিয়া পড়ে। শৈবলিনী গৃহত্যাগ করিয়া ভাল কাজ করিয়াছিল, সে কথা আমরা বলিতেছি না, কিন্তু বাল্যে প্রতাপের সহিত বহুকাল কাটাইয়া তাহার রূপে সে যে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল, সে রূপের ধারণা তাহার হৃদয় মধ্যে রাখা একান্তই স্বাভাবিক। সে স্বাভাবিক বিষয়টিকে বঙ্কিমবাবু যদি অন্যরূপ করিতেন, তাহা হইলে শৈবলিনী চিত্রে অনেক অসঙ্গতি দোষই থাকিয়া যাইত। শৈবলিনীর অবস্থা তখন বৈষ্ণব কবির ভাষায় এইরূপ দাঁড়াইয়াছে—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।
হিয়ায় পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে।

সই কি আর বলিব!
যে বাণী করিয়াছি মনে সেই সে বলিব।
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।
বল কি বলিতে পার যত মনে উঠে।
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা'।
দরশ পরশ লাগি আর্ত্ত লাইছে গা।"

শৈবলিনী তখন করিবে কি? এক কথায় পরপুরুষ প্রতাপকে ভালবাসা তাহার পক্ষে নারকীয় অপকর্ম্ম হইলেও যাহা স্বাভাবিক, শৈবলিনীর সাধ্য কি তাহার অন্যথা করে?

বঙ্কিমচন্দ্রের সকল গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিলে আমার পুঁথি বাড়িয়া যাইবে, ততটা সময়ও আমাকে সাহিত্য সম্মিলনীর কর্ত্তৃপক্ষগণ দিতে পারিবেন না, শ্রোতৃবৃন্দেরও ধৈর্য্য থাকিবে না, সেইজন্য তাঁহার অন্যান্য পুস্তকগুলির এখানে আর উল্লেখ না করিয়া শুধু 'আনন্দমঠে'র কথা সামান্য একটু বলিয়াই আমার অদ্যকার বক্তব্য শেষ করিব।

বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালীকে যতগুলি গ্রন্থ দান করিয়াছেন তন্মধ্যে আনন্দমঠে বাঙ্গালীর যতটা উপকার হইয়াছে এমন আর কিছুতে হইয়াছে কি না জানি না। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে একটা জাগরণের সাড়া এই আনন্দমঠ হইতেই পড়িয়া গিয়াছে। ঐ গ্রন্থের প্রথমবারের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন,—"বাঙ্গালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর প্রধান সহায়—অনেক সময় নয়। সমাজ-বিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরাজেরা বাংলাদেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল কথা এ গ্রন্থে বুঝান গেল।"

"আনন্দমঠ" পড়িয়া বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেই বঙ্কিমবাবুর বিজ্ঞাপনোল্লিখিত কথাগুলি বুঝিয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে 'মহেন্দ্র' ও 'ভবানন্দ' দুইজনে যখন নীরবে প্রান্তর পার হইয়া চলিতেছিলেন, জ্যোৎস্নাময়ী, শান্তিশালিনী পৃথিবীর প্রান্তর কানন নগ-নদীময় শোভা দেখিয়া ভবানন্দের যখন চিত্তের বিশেষ স্ফূর্ত্তি হইল, সে সময় তাঁহার রণ নিপুণ বীর মূর্ত্তি—সৈন্যাধ্যক্ষের মুণ্ডঘাতীর মূর্ত্তি আর রহিল না, তিনি হাস্যমুখ, বাগ্মিয়, প্রিয়সম্ভাষী হইলেন। মহেন্দ্রের সহিত কথাবার্ত্তার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, মহেন্দ্র কিন্তু কথা কহিল না, তখন ভবানন্দ নিরুপায় হইয়া আপন মনে গাহিলেন,—

"বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাম্
শস্য শ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম্
ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
সপ্তকোটী কণ্ঠ কল কল নিনাদ করালে
দ্বিসপ্তকোটী ভুজৈর্ধৃত খর করবালে
অবলা কেন মা এত বলে,
বাহুবল ধারিণীং নমামি তারিণীম্
রিপুদল বারিণীং মাতরম্।"

বাঙ্গালী ভবানন্দের শ্রীমুখ নিঃসৃত এ কথাটা ভাল করিয়াই বুঝিল, ইহার ফল ফলিল বাঙ্গালীর দুর্ব্বল মনে জাতীয় উন্নতির প্রবল বাসনার উদ্দীপনা,—সে উদ্দীপনা কালে কিরূপ পরিপুষ্টি লাভ করিল তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ডি, এল, রায় বঙ্কিমবাবুর সেই রাগিণী আলাপ করিয়াই গান বাঁধিলেন—

"সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি।"

বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলি লইয়া আর কিছু বলিব না। তাঁহার নবেলগুলি পড়িয়া বাঙ্গালী যে নবযুগের আলোক দেখিতে পাইয়াছিল, ঐ নবেলগুলিকে আদর্শ করিয়া বাঙ্গালার গদ্য লেখকের দল একটা মার্জ্জিত বাঙ্গালা লিখিতে শিক্ষা করিয়াছিল, বাঙ্গালা ভাষার মরা মালঞ্চে আবার স্থলপদ্মের দল ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সে পক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এইবার একটু সাহিত্যের ভিতর আর্টের কথা তুলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আর্ট উপন্যাসের প্রাণ, উপন্যাসের ভিতর আর্টের সৌন্দর্য্য ফলাইতে না পারিলে সে উপন্যাস কখনই মনোজ্ঞ হইতে পারে না। বঙ্কিমবাবু তাঁহার উপন্যাসগুলিকে সাধারণের মনোজ্ঞ করিবার জন্য সেই আর্টের সৌন্দর্য্য সকল প্রকারেই ফলাইতে চেষ্টা

করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—'আলালের ঘরে দুলাল' বাঙ্গালার প্রথম উপন্যাস, কিন্তু সে পুস্তকে আর্টের সৌন্দর্য্য যাহা ছিল, তাহা সংস্কৃত নাটকীয় আর্টের অনুকরণেই লিখিত। বঙ্কিমবাবু যখন উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, বিলাতী অনুকরণকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। তথাপি তিনি যতটা পারিলেন পাশ্চাত্য আদর্শের সঙ্গে পাশ্চাত্য কামলীলা রক্ষা করিয়া চলিলেন, কিন্তু তাঁহার পুস্তকগুলির পর বর্ত্তমান যুগে যে সকল উপন্যাস বাঙ্গালা দেশ ছাইয়া ফেলিল, সেগুলির মধ্যে পাশ্চাত্য আদর্শের সঙ্গে—পাশ্চাত্য উদ্দাম কামলীলা নানা ছাঁচে প্রকটিত হইয়া পড়িল। বঙ্কিমবাবু সুদক্ষ শিল্পী ছিলেন, এজন্য তিনি যতটা পারিয়াছিলেন, দেশী ছাঁচে দেশীয় নরনারীর চিত্র অঙ্কণ করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু এখনকার সাহিত্য শিল্পীর দল—দক্ষ কি অদক্ষ জানি না—তাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের উপন্যাস ক্ষেত্রে যে বসোরার গোলাপ আনিয়া সাধারণের চক্ষে ধরিতেছেন, দেখিতে নেত্র-তৃপ্তকর হইলেও উহার ভিতর যে অলক্ষ্যে কীট বর্ত্তমান, স্পর্শ করিলেই তাহার দংশন জ্বালায় অস্থির হইতে হইবে—বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেরই ইহা মনে করিয়া ঐ সকল গ্রন্থ দূরে পরিহার করা কর্ত্তব্য।

প্রকৃত কথা বলিতে কি, এখনকার উপন্যাস লেখকেরা তাঁহাদের রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে গণিকা, ক্ষণিকা, পরকীয়া, নরকীয়া প্রভৃতির যে সকল চিত্র অঙ্কণ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের অর্থাগমের পথ প্রশস্ত হইতেছে বটে, কিন্তু উহার ফলে সমাজে যে অন্তর্ব্বিপ্লব ঘটিয়া পড়িতেছে তাহার জন্য তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে দায়ী করা চলিতে পারে। সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রে সৎ সাহিত্যের আলোচনা চতুর্ব্বর্গ ফলদায়িনী বলিয়া কথিত হইয়াছে। বাঙ্গালায় গদ্য সাহিত্য ছিল না, কিন্তু পদ্য সাহিত্যে যে সময় বিদ্যাসুন্দর রচিত হইয়াছিল সে সময় দেশ এরূপ বিলাতী আলোকে ঝলসিয়া যায় নাই। অতি পুরাকালে মানব জাতির দেহ আবরণের যখন আবশ্যকতা হয় নাই এখনকার দিন ও আধুনিক সভ্যযুগের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। 'বিদ্যাসুন্দরে'র সময় কবির লড়াই, তরজার উত্তর প্রত্যুত্তর সমাজে দোষাবহ ছিল না। দুর্গোৎসবে নবমীর দিন পল্লীগ্রামে 'কাদা' মাখিয়া বৃদ্ধের দল খেউড় গাইতে লজ্জিত হইত না, সে সময়ের অবস্থা 'ভারতচন্দ্রে'র বিদ্যাসুন্দর সময়োপযোগী হইলেও বাঙ্গালীর স্ত্রী জাতি তখন লেখাপড়ার ধার ধারিতেন না, কাজেই বিদ্যাসুন্দরের শ্লীলতা বিগর্হিত কবিতাগুলি তাঁহাদের কোমল প্রাণে একটা বিকট উন্মাদনাও আনিয়া দিত না। এখন ত দেশের মা লক্ষ্মীরা আমার, সকলেই এক একজন খনা-লীলাবতী—এ অবস্থায় বর্ত্তমান লেখকদিগের নবেলগুলি তাঁহাদের নিকট যে কালকূটের ফল প্রদান করিবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? বাঙ্গালী রমণীর স্বাস্থ্যহানি, বাঙ্গালী যুবকদলের স্বাস্থ্যের অপচয়—বাঙ্গালী জাতির অকাল মৃত্যু—এখন যতগুলি কারণে ঘটিতেছে—বাঙ্গালা সাহিত্যের কণ্টক স্বরূপ এখনকার বাঙ্গালা নবেলগুলি যে তাহার অন্যতম কারণ—ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। কামে ও প্রেমে আকাশ-পাতাল তফাৎ। কামকে ভিঙান্ রসে নিঙড়াইয়া মিছরির পাক করিলে তবে প্রেম প্রস্তুত হয়। বঙ্কিমবাবুর নবেলগুলি বিলাতী কামের গন্ধ একেবারে না এড়াইলেও তাহা এত অল্প যে, তাহার ফলে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না, তাহা ভিন্ন তাঁহার চিত্রিত কতকগুলি চরিত্রে নিষ্কাম প্রেমের চিত্রই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এখনকার নবেল রচয়িতাগণ সে প্রেমের দিক দিয়াও না গিয়া নারকীয় কামের চিত্রই ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন। বাঙ্গালাদেশের স্বাস্থ্যকামী পাঠক মাত্রেরই সে সব পাপ পঙ্কিলগ্রন্থ, প্রতিজ্ঞা করিয়া দূরে পরিহার করা কর্ত্তব্য। বঙ্কিমবাবু এখনকার দিনে নবেলিষ্টদিগের গুরু পদবাচ্য হইলেও এখনকার নবেলিষ্টগণও তাঁহার সহিত স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ। সে গুরুর উপযুক্ত শিষ্য একজনও হইয়াছেন কি না জানি না। তা' ছাড়া বঙ্কিমবাবু শুধু ঔপন্যাসিকই ছিলেন না, উপন্যাস-জগতে তিনি সম্রাট ছিলেন, সম্পাদক সম্প্রদায়ের তিনি শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, সমালোচনায় তৎকালে কাহার সহিত তাঁহার তুলনা দিব বুঝিতে পারি না। তাঁহার 'কৃষ্ণ চরিত' যে অপূর্ব্ব,

তাহা যিনি ভাল করিয়া না পড়িয়াছেন তিনি বুঝিতেই পারিবেন না। ইহা ভিন্ন তিনি একজন উচ্চ শ্রেণীর কবিও ছিলেন। তাঁহার উপন্যাসগুলিকেও গদ্য-কাব্য বলিলে অন্যায় হয় না। যদি সেগুলিকে কাব্য হিসাবে নাও ধরা যায়, তাহা হইলেও তাঁহার "কবিতা পুস্তক" প্রথম শ্রেণীতে আসন পাইবার উপযুক্ত। আমরা নিম্নে উহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া অদ্য অবসর লইতেছি—

"এই মধু মাসে মধুর বাতাসে
শোন লো মধুর বাঁশী,
এই মধু বনে শ্রীমধুসূদনে
দেখ লো সকলে আসি।
মধুর সে গায় মধুর বাজায়
মধুর মধুর ভাবে,
মধুর আদরে মধুর অধরে
মধুর মধুর হাসে।
মধুর শ্যামল বদন কমল
মধুর চাহনি তায়,
কণক নূপুর মধুকর যেন
মধুর বাজিছে পায়।
মধুর ইঙ্গিতে আমার সঙ্গেতে
কহিল মধুর বাণী,
সে অবধি চিতে মাধুরী হেরিতে
ধৈরয নাহিক মানি।
এ সুখ রঙ্গেতে পর লো অঙ্গেতে
মধুর চিকণ বাস,
তুলি মধুফুল পর কাণে দুল
পুরাও মনের আশ।
গাঁথি মধুমালা পর গোপবালা
হাস লো মধুর হাসি,
চল যথা রাজে যমুনার কূলে
শ্যামের মোহন বাঁশী।

* * *

চল যথা বাজে যমুনার কূলে
ধীরে ধীরে ধীরে বাঁশী,
ধীরে ধীরে যথা উঠিছে চাঁদিনী
স্থল জল পরকাশি।
ধীরে ধীরে যাই চল ধীরে যাই
ধীরে ধীরে ফেল পদ,
ধীরে ধীরে শুন নাচিছে যমুনা
কল কল গদ গদ।
ধীরে ধীরে জলে রাজহংস চলে
ধীরে ধীরে ভাসে ফুল,
ধীরে ধীরে বায়ু বহিছে কাননে
দুলায়ে আমার দুল।
ধীরে যাবি তথা ধীরে কবি কথা
রাখিবি দোঁহার মান,
ধীরে ধীরে তার বাঁশীটী কাড়িবি
ধীরেতে তুলিবি তান।
ধীরে শ্যাম নাম বাঁশীতে বলিবি
শুনিব কেমন বাজে,
ধীরে ধীরে চূড়া কাড়িয়ে পরিবি
দেখিব কেমনে সাজে।
ধীরে বনমালা গলাতে দোলাবি
দেখিব কেমন দোলে,
ধীরে ধীরে তার মন ক'রে চুরি
লইয়া আসিবি চলে।"

বঙ্কিমবাবুর এই শ্রেণীর কবিতা নন্দন কাননের কোন্ বৃক্ষ হইতে ফুটিয়াছে তাহা শ্রোতৃবৃন্দই বিচার করিবেন। আমি আর সে কথা বলিয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ করিব না।

অপরাধী।

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু]

(১)

দেবেন্দ্র ও রমেন উভয়ের মধ্যে আবাল্য বন্ধুত্ব। দেবেন্দ্রের বাড়ী হইতে রমেনের বাড়ী কিছু দূরে। স্কুলে যাইবার পথে প্রতিদিন দেবেন রমেনকে ডাকিয়া লইয়া যায়। রমেনও সুহৃদের আগমন-প্রতীক্ষায় পথের দিকে চাহিয়া থাকে।

অনেক দিন পূর্ব্বে—তখন দেবেন্দ্র ও রমেন নিতান্ত বালক, সেই সময় একটা জমি লইয়া দেবেন্দ্রের পিতা নীলকমল বাবু ও রমেনের পিতা হারাধন বাবুতে বিবাদ বাধে। প্রতিবাসীরা মিট্‌মাটের যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কেহই জেদ্ ছাড়িতে পারিলেন না, নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়া মিটমাটে সম্মত হইলেন না। বহুদিন মামলা চলিয়া নিষ্পত্তি হইয়া গেল; নীলকমল বাবু হারিয়া গেলেন। অজস্র অর্থব্যয়, এত পরিশ্রম, শরীরের রক্ত জল করিয়া যে মোকর্দ্দমা করিয়াছেন তাহাতে পরাজিত হইয়া নীলকমল উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন। তারপর ছয়টী বৎসর কালের অতল গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে। হারাধন বাবু প্রায় এক বৎসর হইল পৃথিবীর কাছে চিরবিদায় লইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু এত দিনের মধ্যেও নীলকমল বাবুর হৃদয়ের বিদ্বেষের আগুন নির্ব্বাপিত হয় নাই, বরং জমি অধিকারে আনিবার মতলব আঁটিতে লাগিলেন। ফলে, একদিন লোকজন সঙ্গে লইয়া সেই জমির একটা কাঁঠাল গাছ কাটিতে গেলেন, সুবিজ্ঞ নায়েবের পরামর্শে রমেন ও তাহার জননী বাধা দিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। যে জমি লইয়া স্বামী অগাধ অর্থ ব্যয় করিয়া মামলা মোকর্দ্দমা করিয়া অধিকারভুক্ত করিয়াছেন, আজ সেই জমি রমেনের মাতা কি নির্ব্বিচারে ছাড়িয়া দিতে পারেন? ফৌজদারী বাধিল, আবার মামলা আরম্ভ হইল, বহু অর্থ ব্যয় করিয়াও নীলকমল বাবু হারিয়া গেলেন। ক্রোধের আগুন দ্বিগুণ তেজে তাঁহার বুকের মধ্যে জ্বলিতে লাগিল, রমেনের সর্ব্বনাশ সাধনের কোন উপায় যখন খুঁজিয়া পাইলেন না, তখন পুত্রকে আদেশ করিলেন রমেনের সহিত সে যেন আর মেলামেশা না করে, তাহাদের ছায়া না মাড়ায়। পিতার নির্ম্মম হৃদয়হীন কঠোর আদেশ শুনিয়া দেবেন্দ্রের মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে কঠোর কথাগুলি তাহার কর্ণে ভীষণ ভাবে বাজিয়া উঠিয়া কোমল অন্তঃকরণটাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিল। যাহার সহিত তাহার এত প্রণয় সৌহার্দ্দ, যে তাহাকে কত স্নেহ করে, আজ কেমন করিয়া সেই প্রিয়জনকে শত্রুজ্ঞান করিবে সে? গলা ধরিয়া যাহার বাড়ী গিয়াছে, যাহার জননী পুত্রের মত স্নেহ যত্নে কত ভাল খাবার দিয়াছেন, এখনও অনেক সময় যে রমেন ডাকিয়া লইয়া গিয়া খাবার দেয়, স্কুল হইতে ফিরিবার সময় রমেনদের বাড়ী যায়, কত গল্প করে, রমেনের জননী তাহাকে কত আদর যত্নে খাওয়ান, আজ অকৃতজ্ঞের মত কেমন করিয়া তাহাদের অতিবড় শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে সে! না, তাহা সে পারিবে না, অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া দেখিল, অতবড় অন্যায় অধর্ম্ম অকৃতজ্ঞতা তাহার দ্বারা হইবে না। পিতার আদেশ হইলেও বিবেকটা তাহার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

পরদিন কিন্তু দেবেন্দ্র স্কুলে যাইবার সময় রমেনদের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দেখিল রমেন বই হাতে প্রস্তুত হইয়া তাহারই অপেক্ষা করিতেছে। উভয়ে আবার পূর্ব্বের ন্যায় হাসিতে হাসিতে গল্প করিতে করিতে স্কুলে গেল।

সেদিন আকাশে মেঘ করিয়াছিল। দ্বিপ্রহরের পর একটু একটু বৃষ্টিও পড়িতেছিল। ছুটির পর বৃষ্টি আরও জোরে আসিল; উভয়ে ছুটিতে ছুটিতে রমেনদের বাড়ীর সম্মুখে আসিতে না আসিতে কাপড় জামা সব ভিজিয়া গেল। রমেন দেবেন্দ্রকে কহিল, "এ বৃষ্টিতে আর ভিজে

বাড়ী যেয়ো না দেবুদা, একটা অসুখ বিসুখ হ'তে পারে, এস, বৃষ্টি ধরলে যেও।" দেবেন্দ্র সে কথার কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই রমেন টানিয়া তাহাকে ভিতরে লইয়া গেল। সন্ধ্যা হইয়া গেল, বৃষ্টির গতি কমিল না। নীলকমল বাবু পুত্রের ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন। যখন এই দুর্য্যোগ পূর্ণ সন্ধ্যার মধ্যেও পুত্রকে ফিরিতে দেখিলেন না তখন ভাবনার তরঙ্গ তাঁহার বুকটিকে অবিরত আঘাত করিয়া উন্মত্তের মত ছুটিতে লাগিল। অস্থির হৃদয়ে এক প্রতিবেশীর গৃহে গিয়া একটী ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন যে দেবেন্দ্র ও রমেন ছুটীর পর একসঙ্গেই স্কুল হইতে বাহির হইয়া রমেনদের বাড়ী প্রবেশ করিয়াছে। পুত্রের জন্ম যে অস্থিরতা স্নেহময় পিতৃ-হৃদয়টাকে ক্ষত-বিক্ষত করিতেছিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে ক্রোধের আগুনে তাহা একেবারে পুড়িয়া গিয়া বুকখানাকে কঠিন, কঠোর করিয়া তুলিল। ক্রোধকম্পিত হৃদয়ে উত্তেজিত ভাবে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। নিদারুণ মানসিক আবেগে অধীর হইয়া চণ্ডীমণ্ডপের বারেন্দায় বসিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন। তখন বৃষ্টির গতি মন্দীভূত হইয়াছে। রমেন একজন ভৃত্য সঙ্গে করিয়া দেবেন্দ্রকে বাড়ীর সম্মুখে পৌঁছিয়া দিয়া ফিরিয়া গেল। দেবেন্দ্র যখন উঠান পার হইয়া ধীরে ধীরে অন্দরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, সেই সময় পিতার গম্ভীর কণ্ঠ বজ্রের মত তাহার কানে বাজিয়া উঠিল—"কে যায়?" সে কণ্ঠস্বরের মধ্যে দেবেন্দ্র এতটুকু কোমলতাও অনুভব করিতে পারিল না, সে স্বর যেন স্বাভাবিক হইতে স্বতন্ত্র। তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল, তবে কি পিতা জানিতে পারিয়াছেন যে সে এতক্ষণ রমেনদের বাড়ীতে ছিল। পিতার গম্ভীর স্বর আবার ধ্বনিত হইল,—"কে দাঁড়িয়ে ওখানে?"

কম্পিত কণ্ঠে দেবেন্দ্র কহিল, "আমি।"

"এদিকে আয়"—দেবেন্দ্র ধীরে ধীরে পিতৃসমীপে উপস্থিত হইল। ধীর গম্ভীরস্বরে পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় ছিলি এতক্ষণ?" এ প্রশ্ন শুনিয়া দেবেন্দ্রের মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, ভয়ে সে আড়ষ্ট হইয়া গেল, একটি কথাও মুখ হইতে বাহির হইল না। পুত্রকে নিরুত্তর দেখিয়া পিতা তাহার একটী কর্ণ ধরিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় ছিলি হতভাগা?" তথাপি দেবেন্দ্র উত্তর দিতে পারিল না। সে যদি এখন পিতার নিকট সত্য কথা বলে তাহা হইলে কি আর রক্ষা আছে! আবার পিতৃ সমীপে মিথ্যা কথাই বা বলে কি করিয়া। পুত্রের গণ্ডদেশে একটি চড় মারিয়া পিতা চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"বল্ কোথায় ছিলি?" দেবেন্দ্রের শুষ্ক ওষ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল। তাহার সারা মনটা অনুসন্ধান করিয়াও সে কোন উত্তর যখন খুঁজিয়া পাইল না তখন সত্য কথাটাই তাহার জড়িত কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া গেল। আর সে কথা শুনিয়া ক্রোধোন্মত্ত পিতা চীৎকার করিয়া কহিলেন, "লক্ষীছাড়া, কুলাঙ্গার! আমি না বার বার নিষেধ করেছি যে তাদের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ তুলে দিতে হবে! পাজী, এমন করেই আমার মাথা হেঁট করবি তুই! দশ জনের কাছে আমাকে অপদস্ত করবি!" দুঃখে, ক্ষোভে, তিরস্কারে দেবেন্দ্র কাঁদিয়া উঠিল, গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইতে লাগিল। কিন্তু নীলকমল ক্রন্দনে ভুলিবার পাত্র নহেন। পুত্রের দেহের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়া কঠোরস্বরে কহিলেন, "এ কার কাপড় প'রে এসেছিস?" করুণ কাতর দৃষ্টিতে পুত্র পিতার মুখের দিকে চাহিল, সে দৃষ্টি বড় মর্ম্মস্পর্শী, বড় বেদনা-পীড়িত।

পিতা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার কাপড়?"

কম্পিতকণ্ঠে দেবেন্দ্র উত্তর দিল, "রমেনের। পথে আসতে খুব জোরে বৃষ্টি এল, জামা কাপড় সব ভিজে গেল, তাই রমেনদের বাড়ী কাপড়টা ছেড়ে এসেছি।"

"স্কুলের সব ছেলে তাদের বাড়ী ফিরে এল, আর তুমি আসতে পারনি, বৃষ্টির জল শুধু তোমার গায়ে পড়েছে" বলিতে বলিতে পুত্রের কেশরাশি ধারণ করিয়া নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিলেন। তারপর কহিলেন, "যা, এখনই কাপড় ফিরিয়ে দিয়ে আয়"। নির্দ্দোষ বালক অসহ্য যন্ত্রণা, কঠোর পীড়ন অকাতরে সহ্য করিয়াছে, একটুও কাঁদে নাই, যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পিতাকে নিবৃত্ত হইবার অনুরোধ পর্য্যন্ত করে নাই, নির্ব্বাক ভাবে প্রহার বেদনায় জর্জ্জরিত হইয়াছে। কিন্তু এখন পিতার এ নিষ্ঠুর আদেশ কেমন

করিয়া সে পালন করে? নির্দ্দয়-হৃদয়হীনের ন্যায় কোন্ মুখে এখন সে রমেনকে গিয়া বলিবে যে, 'পিতার আজ্ঞায় আমি তোমাদের কাপড় ফিরাইয়া দিতে আসিয়াছি, তোমাদের আমরা এমন ঘৃণা করি যে, কাপড়খানি স্পর্শ করিয়াও কঠোর দণ্ড গ্রহণ করিতে হইয়াছে।' এইরূপ নানা কথা ভাবিয়া অশ্রু-উদ্বেলিত নেত্রে পিতার মুখপানে চাহিয়া বাষ্পরুদ্ধ কম্পিত স্বরে কহিল, "আমার একা যেতে ভয় করে বাবা, কাল সকালে—"

কথার মধ্যেই পিতা কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ভয় করে? যখন তাদের বাড়ী গিয়েছিলি সে সময়ে ভয় ছিল না? যা, এখনই ফিরিয়ে দিয়ে আয়। দূর হয়ে যা হতভাগা," বলিতে বলিতে পুত্রের গলদেশ ধারণ করিয়া ঠেলিয়া পথের সম্মুখে লইয়া আসিলেন। তারপর তেমনি কর্কশকণ্ঠে "আমার শত্রুর বাড়ীর একগাছি তৃণও আমার ভিটের উপর প'ড়লে অমঙ্গল হয়, আর তুই তার কাপড় পরে এসেছিস, তার সঙ্গে তোর এতদূর বন্ধুত্ব! এখনই গিয়ে কাপড় ফিরিয়ে দিয়ে তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ তুলে দিয়ে আস্‌বি, নতুবা এ বাড়ীতে আর স্থান হবে না!" বলিয়া পুত্রকে পথের দিকে ঠেলিয়া দিয়া, নালকমল বাবু আবার চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় গিয়া বসিলেন। উপায়হীন প্রহার-বেদনাব্যথিত বালক সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্য্যোগপূর্ণ রাত্রে কর্দ্দমাক্ত পিচ্ছিল পল্লীপথে কম্পিতবক্ষে ছুটিতে ছুটিতে রমেনের বাড়ীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। লজ্জায়, ভয়ে রমেনকে ডাকিতেও সাহস করিল না। রমেনের ভৃত্য বাহিরে আসিয়া দ্বার সম্মুখে দেবেন্দ্রকে দণ্ডায়মান দেখিয়া বিস্মিতভাবে বলিল, "এ কি দেব বাবু! এইমাত্র যে তোমাকে বাড়ী রেখে এলাম"। দেবেন্দ্র কোন উত্তর দিল না, অবনত মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভৃত্য আবার জিজ্ঞাসা করিল, "এমন সময় অন্ধকারে একা এসে দাঁড়িয়ে আছ কেন? বাবুকে ডাকনি কেন?" জড়িতকণ্ঠে দেবেন্দ্র কহিল, "কাপড়খানা দিয়ে যেতে এসেছি"। "এখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে এস, বাবুর কাছে, মার কাছে চল।" "না, আমি ভিতরে যাব না। তুমি আমার কাপড়খানা এনে দাও।" অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াও কিছুতেই যখন দেবেন্দ্রকে ভিতরে লইয়া যাইতে পারিল না, তখন ভৃত্য বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। আর দেবেন্দ্র সেই স্থানে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। অজস্র অশ্রু গণ্ড বাহিয়া মাটীর উপর টস্ টস্ করিয়া পড়িতে লাগিল। প্রসন্নময়ী ও রমেন সংবাদ পাইয়া বিস্মিত হইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, দেবেন্দ্র দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে। ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া বুকের কাছে টানিয়া লইয়া প্রসন্নময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে দেবেন? কাঁদ্‌ছ কেন বাবা?"

"কাপড়খানা নিয়ে যাব, বাবা বলেছেন"—আর কোন কথা দেবেন্দ্রের মুখ হইতে বাহির হইল না, শুধু অবিরল অশ্রুধারা গণ্ড প্লাবিত করিয়া ছুটিতে লাগিল। অকস্মাৎ প্রসন্নময়ীর সমস্ত কথা স্মরণ হইল। তাঁহাদের উপর যে দেবেন্দ্রের পিতা সন্তুষ্ট নন, তাহা তিনি জানিতেন। দেবেন্দ্রকে তাহার পিতা যে আদেশ করিয়াছিলেন তাহাও তিনি শুনিয়াছিলেন। তাই আজ দেবেন্দ্রের ক্রন্দনের প্রকৃত কারণ, এই অন্ধকার রাত্রে একাকী কাপড় ফিরাইয়া দিতে আসার প্রয়োজন বুঝিতে আর তাঁহার বিলম্ব হইল না। স্নেহভরে দেবেন্দ্রকে তিনি বুকে চাপিয়া ধরিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "ছিঃ, কাঁদতে নেই, মাণিক আমার, কেঁদ না। বাবার আদেশ পালন কর, যদি আমাদের বাড়ী আস্‌তে নিষেধ করেন, তবে তাঁর আদেশ অগ্রাহ্য ক'র না, তাতে পাপ হবে। আমাদের তুমি মনে মনে ভালবেস, তারপর বড় হ'লে, যখন তোমার বাবা আমাদের উপর শত্রুতা ভুলে যাবেন, তখন আবার এস। বাবার কথা অমান্য ক'র না। এই কাপড় পর বাবা"—বলিয়া দেবেন্দ্রের চক্ষুদুটি আঁচল দিয়া মুছিয়া তাহার কাপড়খানি ফিরাইয়া দিলেন। দেবেন্দ্র নিজের কাপড়খানি পরিয়া রমেনের কাপড় ফেরৎ দিল। তারপর করুণ দৃষ্টিতে রমেনের মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিল সে নত মুখে কি চিন্তা করিতেছে। তাহার সে উজ্জ্বল হাসি হাসি মুখ কাল হইয়া গিয়াছে, চক্ষের স্নিগ্ধ দৃষ্টি নৈরাশ্যব্যঞ্জক বিষাদ বিশুষ্ক। ভৃত্যের দ্বারা প্রসন্নময়ী দেবেন্দ্রকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। ভাবনার প্রকাণ্ড বোঝা ক্ষুদ্র মনটার মধ্যে

ভরিয়া লইয়া নয়নজলে বুক ভাসাইতে ভাসাইতে বালক বাড়ী ফিরিল।

এই ঘটনার পর হইতে রমেনের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। সে কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা বলে না, সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক ভাবে কি যেন চিন্তা করিতে থাকে। রাত্রে নিদ্রা হয় না, স্কুলের পড়া পড়িতে ভাল লাগে না। দেবেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইলে উদাস ভাবে শূন্য দৃষ্টিতে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকে। বর্ষণোন্মুখ মেঘের মত সে চক্ষু দুটি উচ্ছ্বলিত হইয়া কি এক মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করে। উভয়েই প্রতিদিন স্কুলে যায়, কিন্তু কেহ কাহারও সহিত কথা কহে না, দুই জন দুই পার্শ্বে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। ভালরূপ পড়াও হয় না। এমনই ভাবে কিছুদিন কাটিবার পর প্রসন্নময়ী পুত্রের শরীর ও মন বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া তাহাকে পড়িবার জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। আরও কিছুদিন পরে দেবেন্দ্রও গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করিয়া কলিকাতায় পড়িবার জন্য চলিয়া গেল।

(২)

সুদীর্ঘ ছয়টি বৎসর অতীতের গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে, দেবেন্দ্র এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একটা কলেজে শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছে, আর রমেন ডাক্তারী পড়িতেছে। এ ছয় বৎসরের মধ্যে উভয়ের আর দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। রমেন মাঝে মাঝে বাড়ী আসিত বটে, কিন্তু নিজের পড়া ও বাগানের কাজ কর্ম্ম লইয়াই সে যে কয়দিন দেশে থাকিত সে কয়দিন কাটাইয়া দিত। দেবেন্দ্র বাড়ী আসিয়া অনেক সময় বেড়াইতে বাহির হয়, কিন্তু রমেনের সহিত তাহার একদিনও সাক্ষাৎ হয় না। অনেক দিন প্রসন্নময়ীর নিকট রমেনের সংবাদ জানিবার জন্য বাড়ীর দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু কি একটা নিদারুণ সঙ্কোচ তাহার ইচ্ছায় বাধা দিয়াছে।

আজ বহুদিন পরে দেবেন্দ্র গ্রীষ্মাবকাশে দেশে আসিয়াছে। অপরাহ্নে যখন সে নদীর ধারে বেড়াইতে বাহির হইল, তখন তাহার কত পরিচিত বন্ধু, বাল্যসঙ্গী, কত সহপাঠী, আত্মীয় স্বজন কুশল প্রশ্নে, আলাপে তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। সে অস্থিরতা কত আনন্দের; তার মধ্যে কত সুখ, কত তৃপ্তি বিজড়িত ছিল। সে যে কত আকাঙ্ক্ষার অস্থিরতা, তাহা দীর্ঘ প্রবাসের পর দেশে আসিয়া দেবেন্দ্রের আজ স্পষ্ট অনুভূত হইল। তারপর বেড়াইতে বেড়াইতে যখন সে রমেনদের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন বাল্যকালের সেই ঘটনাগুলি আবার তাহার মনটার মধ্যে বিদ্যুতের মত চমক দিয়া উঠিল।

(৩)

বাড়ী আসিয়া দেবেন্দ্র শুনিয়াছিল যে রমেনও দেশে আসিয়াছে। কিন্তু কয়দিনের মধ্যে রমেনের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল না।

সেদিন আকাশে মেঘ করিয়াছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি আসিল, ধরণী অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল। কড়-কড় শব্দে মেঘ ডাকিতে লাগিল। সেই বৃষ্টিধারার মধ্যে ভিজিতে ভিজিতে চিন্তা-ক্ষুব্ধ মনটা লইয়া দেবেন্দ্র নদীতট হইতে বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। এই নির্জ্জন নদীতটে সে আর রমেন উভয়ে বসিয়া কত সুখ দুঃখের কথা বলিয়াছে, পিতার নিকট তিরস্কৃত হইয়া উভয়ে উভয়ের নিকট কত মনোবেদনা প্রকাশ করিয়াছে। এমনই মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় বৃষ্টিধারায় ভিজিতে ভিজিতে দুইজনে কতদিন বাড়ী ফিরিয়াছে। আজ কোথায় সেই রমেন! কতদিন অদর্শন! আজ যদি সে একবার আসিয়া 'দেবদা' বলিয়া ডাকে, তাহার গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া বিচ্ছেদ-কাতর প্রাণটা শীতল করে, তাহার চিন্তাক্ষুব্ধ অন্তরটার সমস্ত গ্লানি যে তাহা হইলে ধুইয়া মুছিয়া যায়, অপূর্ণ কামনা তাহার কিছুই ত' থাকে না। এমনই ভাবে চিন্তা করিতে করিতে দেবেন্দ্র যখন কতকটা পথ অতিক্রম করিল, তখন হঠাৎ দেখিতে পাইল রমেনের মত কে একজন তাহার আগে দ্রুতপদে চলিয়াছে। দেবেন্দ্রও একটু দ্রুত অগ্রসর হইয়া বেশ চিনিতে পারিল, রমেনই বটে। ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিল—"রমেন।" রমেন একবার মাত্র পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দ্রুতপদে দেবেন্দ্রের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। নৈরাশ্যের হাহাকারে দেবেন্দ্রের

হৃদয় হা হা করিয়া উঠিল, দারুণ বেদনা বক্ষ-পঞ্জর ভাঙ্গিয়া দিল, তাহার চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

রমেনের উপর তাহার যেমন একটা আন্তরিক স্নেহ মনটাকে উদ্বেলিত করিত, রমেনও যে তাহাকে অন্তরের মধ্যে ঠিক তেমনি ভাবে রাখিয়াছে ইহাই দেবেন্দ্রের বিশ্বাস ছিল। সে যে সেই সামান্য অপরাধটা হৃদয়ে পোষণ করিয়া বন্ধুত্বের সিংহাসন হইতে তাহাকে টানিয়া ফেলিয়া দিবে তাহা সে মুহূর্ত্তের জন্য কল্পনাতেও আনিতে পারে নাই। তবে আজ আর তাহার কিছুই ত ভাবনার নাই —সবই শেষ।

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রবল বৃষ্টি-ধারার মধ্যে উন্মত্তের মত ছুটিতে ছুটিতে দেবেন্দ্র বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

(৪)

সেই যে দগ্ধ প্রাণটা লইয়া দেবেন্দ্র বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে বাড়ী আসিয়া শয্যা গ্রহণ করিয়াছিল, এক সপ্তাহ মধ্যে সে শয্যা আর ত্যাগ করিল না। প্রবল জ্বরে সপ্তাহ-কাল সে বেহুঁস হইয়া পড়িয়া রহিল। নীলকমল বাবু বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। ডাক্তার দেখান হইতেছে, রীতিমত ঔষধ পথ্য দেওয়া হইতেছে, তথাপি কোন উপশম হইতেছে না। সকলেই শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। নীলকমল বাবু আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন। কয়দিন দেবেন্দ্র একজ্বরী অবস্থায় আছে, আজ অবস্থা আরও খারাপ হইয়া উঠিয়াছে, নানারকম প্রলাপ বকিতেছে, ডাক্তার বাবু অবস্থা দেখিয়া নিরাশ হইলেন। নীলকমল বাবুর চক্ষু দিয়া অবিরল অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

একজন চাকর শিশি লইয়া ঔষধ আনিবার জন্য ডাক্তার-খানায় ছুটিতেছিল, সেই সময় রমেন রাস্তার উপর নীলকমল বাবুর বাড়ীর দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার মুখখানি মেঘভরা আকাশের ন্যায় বিষাদ-গম্ভীর। নয়ন দুটি ভরা নদীর মত উচ্ছ্বলিত অশ্রুভরে টল টল করিতেছে। ভৃত্যকে শিশি হস্তে ছুটিতে দেখিয়া রমেন জিজ্ঞাসা করিল, দেবেন্দ্র কেমন আছে? সে যে উত্তর দিয়া গেল তাহাতে রমেনের বুকের হাড়গুলি মড় মড় করিয়া যেন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল, আর সেই সঙ্গে কয়েকটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস তাহার হৃদয়টাকে কাঁপাইয়া নিষ্পিষ্ট করিয়া বাহির হইতে লাগিল। কয়েক দিন হইল সে দেবেন্দ্রের অসুখের সংবাদ পাইয়াছে। এবং সেই দিন হইতে প্রত্যহ অনেক সময় দেবেন্দ্রের বাড়ীর সম্মুখে রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকিত, তাহার পর ভৃত্যের কাছে দেবেন্দ্রের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইত। দেবেন্দ্রকে দেখিতে যাইবার প্রবল বাসনা মনটাকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিলেও বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবার সাহস তাহার হইত না। দেবেন্দ্রের পিতা সে বাড়ীতে তাহার প্রবেশ-দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, দেবেন্দ্রও যে সে অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে! দেবেন্দ্রের সেই অপরাধের কথা রমেন এখনও বিস্মৃত হয় নাই। সেই রাত্রে কাপড় ফিরাইয়া দিয়া আসিয়া সে যে রমেনের মনটাকে একেবারে ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। তারপর যদি দেবেন একটুও অনুতপ্ত হইত, যদি রমেনের নিকট এ নির্ম্মম অপরাধ স্বীকার করিয়া অনুশোচনা করিত, তাহা হইলে ত' রমেনকে এত বড় অভিমান হৃদয়ে পোষণ করিয়া দিন কাটাইতে হইত না। সে দিনের পর অনেক দিন ত' তাহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে, কত দিন স্কুলে গিয়াছে, কিন্তু রমেনের নিকট অপরাধ স্বীকার করা দূরে থাক একটী কথা পর্য্যন্ত বলে নাই। পিতার আদেশ! হউক না কেন, সে ত' স্বচ্ছন্দমনে বলিতে পারিত, 'রমেন ভাই, এখন আমি পিতার অধীন, তাঁর আদেশ পালন করিবার জন্য আমি এরূপ করিয়াছি।' তাহা হইলে ত' রমেন সন্তুষ্ট মনে বলিত, 'যখন পিতা তোমাকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া দিবেন তখন আবার আমরা গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া বন্ধুত্বের দৃঢ় বন্ধনে বাঁধা রহিব।' সে ত' দেবেনকে পিতৃদ্রোহী হইতে বলিত না। দেবেনের এই ভুলের জন্যই যে নিদারুণ অভিমান তাহার বুক জুড়িয়া রহিয়াছে, তাইত সে এত দিনের মধ্যে দেবেনের সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করে নাই। দেখা হইলে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছে, ডাকিলে সাড়াও দেয় নাই। তাই সে ভাবিত দেবেন্দ্রও হৃদয়হীন, তাহার বাড়ীতে সে কেমন

করিয়া প্রবেশ করিবে? কোন্ অধিকারে সে রুদ্ধ কপাট উন্মুক্ত করিবে? কিন্তু তথাপি দেবেন্দ্রের অসুখের সংবাদ পাইয়া তাহার উদ্বেলিত কাতর চিত্ত তাহাকে দেখিবার আশায় বিবেকের বিপক্ষে দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে সেই রুদ্ধ দ্বার ঠেলাঠেলি করিত। কিন্তু তখনই বিবেক কঠোর কষাঘাত করিয়া বুঝাইয়া দিত, 'এখনও যদি সে সময় না আসিয়া থাকে; যদি দেবেন্দ্রের পিতা তাহাকে কড়া কথা বলিয়া বসেন; যদি ভিতরে প্রবেশের অনুমতি না দেন; যদি তাহাকে বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয় তবে সে অপমান জীবনে কি সে ভুলিতে পারিবে?

কিন্তু আজ প্রিয়তম বন্ধুর আসন্ন-মৃত্যুর সংবাদ যখন রমেন শুনিতে পাইল, তখন আর স্থির থাকিতে পারিল না। অভিমানের বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

নীলকমল বাবু পুত্রের অবস্থা দেখিয়া ভগ্ন হৃদয়ে বাহিরের বারান্দায় বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রুধারা গণ্ড প্লাবিত করিতেছিল। আজ তাঁহার সব শেষ হইয়া যায় বুঝি! একমাত্র সন্তান, যাহার জন্য সংসারটা নিরবচ্ছিন্ন সুখের স্রোতে ভাসিতেছিল, তাঁহার দগ্ধ অদৃষ্টের দোষে আজ সে স্রোত বিপরীত পথে ঘুরিয়া গিয়া সে সুখ সৌভাগ্য পূর্ণ সংসার-নিকেতন ধ্বংস হইয়া যায় বুঝি!

"জ্যেঠামহাশয়"—অকস্মাৎ এই অপ্রত্যাশিত সম্বোধনে নীলকমল বাবু চমকিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলেন। দেখিলেন রমেন একটা অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছে। তাহার বিশুষ্ক মুখ, রক্তবর্ণ চক্ষু দেখিয়া তিনি মনে মনে কাঁপিয়া উঠিলেন। বুকের মধ্যটা কি এক অব্যক্ত বেদনায় টন্ টন্ করিয়া উঠিল। রমেনের মুখের দিকে অশ্রুসজল নয়নে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

রমেন দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "দেবদাকে দেখতে যাব জ্যেঠামহাশয়?"

নীলকমল বাবুর নয়ন হইতে কয়েক বিন্দু অশ্রু মাটীর উপর ঝরিয়া পড়িল। রমেনের কথার উত্তর দিতে সমর্থ না হইয়া শুধু তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া ভিতরে লইয়া চলিলেন।

(৫)

দেবেন্দ্রের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া দীর্ঘকাল পরে রমেন স্নেহপূর্ণ স্বরে ডাকিল, "দেবদা, কেমন আছ এখন?" বলিয়া তাহার শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা করিতে লাগিল। দেবেন্দ্র অসাড় হইয়া শয্যার উপর পড়িয়াছিল। এ চিরাকাঙ্ক্ষিত স্নেহ মধুর ডাক শুনিয়া ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া রমেনের মুখের দিকে চাহিল. তারপর দুই হস্তে একেবারে তাহার কণ্ঠদেশ জড়াইয়া ধরিয়া বিকট চীৎকার করিয়া বলিল, "রমেন, রমেন, ভাই! ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হোক্।"

দেবেন্দ্রের প্রবল আকর্ষণে রমেন একেবারে তাহার বুকের উপর গিয়া প'ড়িল। ব্যাকুল ভাবে কহিল, "কর কি, কর কি দেবদা, দেড়ে দাও।"

"না ছেড়ে দেবনা, অপরাধের ক্ষমা চাই। দীর্ঘকাল তীব্র অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েও আমার অপরাধী জীবনটা তোর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করবার জন্য পড়ে আছে। তোর জন্যে আমি মরতেও পারছি না আজ"—

"তা নয় দেবদা আমার জন্যই আজ তোমার অসুখ। হায়, সেদিন যদি আমি তোমার স্নেহের আহ্বানে নিষ্ঠুর না হতুম!" এই বলিয়া রমেন কাঁদিতে লাগিল। একটু খানি চুপ করিয়া থাকিয়া রমেন আবার বলিল, "হাঁ, আমিই অপরাধী, কেন সেদিন তোমার ডাকে সাড়া না দিয়ে চলে গেলুম! কেন তোমায় হাত ধ'রে বাড়ীতে নিয়ে গেলুম না"।

বাধা দিয়া দেবেন্দ্র বলিল, "ওরে না, না ভুলে যা। শুধু মনে কর্ আমি তোর দাদা, মনে কর্ আমাদের বন্ধুত্বের কথা, মনে কর্ যে আমরা দুজন ভিন্ন হৃদয় ছিলুম না।"

দেবেন্দ্র আর বলিতে পারিল না, হাঁপাইয়া উঠিল। বিস্ফারিত চক্ষে ভয়ানক কাঁপিতে লাগিল। রমেন ব্যস্তভাবে বলিল, "দেবদা, দেবদা"। কোন সাড়া না পাইয়া দেবেন্দ্রের শিথিল দেহখানি শয্যার উপর শয়ন করাইয়া দিল। তারপর তাহার বুকের উপর একখানি হাত রাখিয়া মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া আবার ডাকিল, —"দেবদা, দেবদা"।

ক্ষীণ কণ্ঠে দেবেন্দ্র উত্তর দিল, "রমেন! ভাই! ক্ষমা—"

ব্যাকুল ভাবে উন্মত্তের ন্যায় রমেন উঠিয়া দেবেন্দ্রের পায়ের উপর মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে বলিতে লাগিল, "করলুম। যদি কোন অপরাধ ক'রে থাক তবে ভগবানের দিব্বি ক্ষমা করলুম। তুমি শুধু বেঁচে ওঠ এই তোমার কাছে ভিক্ষা। বন্ধু-হত্যার মহাপাতক হ'তে আমায় মুক্ত কর, রক্ষা কর দেবদা"।

দেবেন্দ্র একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল! নিদ্রার ঘোরে তাহার নয়ন-পল্লব নিমীলিত হইয়া আসিল।

যখন ডাক্তার আসিয়াছেন তখন দেবেন্দ্র নিদ্রাভঙ্গান্তে রমেনের সহিত দু' একটা কথা বলিতেছিল। ইহার মধ্যে রমেন নিজ মনোমত ঔষধ পথ্য ব্যবস্থা করিয়া নিজেই শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিয়াছিল।

ডাক্তার রোগীর শুশ্রূষা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "শুশ্রূষা ঔষধের চেয়ে ঢের বড়। রমেন বাবুই দেখ্‌ছি রোগীকে বাঁচালেন।"

কৃতজ্ঞতার আতিশয্যে নীলকমল বাবু বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, কি ভুল বুঝেই এক বৃন্তের দুটী ফুলকে আমি তফাতে রাখ্‌তে গিয়েছিলাম! আজ থেকে তোমরা দুই জনে আমার দুই ছেলে।" এই বলিয়া তিনি দেবেন্দ্র ও রমেন উভয়ের মস্তকে হস্ত প্রদান করিলেন!

ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায়।

[কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন গুপ্ত ভিষগ্‌রত্ন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী এল্‌-এ-এম্‌-এস্‌, এচ্‌-এম্‌-বি]

ম্যালেরিয়ার আক্রমণে বাঙ্গালার পল্লীগুলি ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। এই ম্যালেরিয়া বিষের জ্বালায় বাঙ্গালার কত শত পল্লীর যে সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বুক ফাটিয়া যায়। আমাদের সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা পল্লীমাতার দুর্গতি যে ম্যালেরিয়া হইতেই আরম্ভ হইয়াছে তাহা খাঁটি সত্য কথা। এই ম্যালেরিয়া রাক্ষসী যখন গ্রামের পর গ্রাম, পল্লীর পর পল্লী, এক ঘর গৃহস্থের পর আর এক ঘর গৃহস্থ গ্রাস করিতে বসিল, তখন অনেকেই উপায়ান্তর না দেখিয়া সহরে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। সে আজ কত দিনের কথা বলিতে পারি না। তবে ১৮০৪ খৃঃ অব্দে মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজারে এই রোগ প্রথম প্রবেশ করে। তারপর ইহার ২০ বৎসর পরে রাজা সীতারাম রায় প্রতিষ্ঠিত যশোহর জেলার মহম্মদপুর এই রোগের আক্রমণে বিধ্বস্ত-প্রায় হইয়াছিল। ঐ আক্রমণে মহম্মদপুরের প্রায় পাঁচ সহস্র লোক কাল-কবলিত হইয়াছিল। এই সময় হইতেই বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীবৃন্দ ম্যালেরিয়ার নাম বেশ করিয়া জানিতে পারেন। মহম্মদপুর ধ্বংস হইলে নলডাঙ্গা, গদাখালি প্রভৃতি যশোহরের চিত্রা নদীর উভয় পার্শ্বস্থ গ্রামগুলির লোক ধ্বংস করিয়া ম্যালেরিয়া নদীয়া জেলায় প্রবেশ করিল। এই সময় ম্যালেরিয়ার আক্রমণে উলা বা বীর নগরের প্রায় ৯০০০ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। ইহার পর ২৪ পরগণায় এই রোগে বহু লোক কালকবলিত হইল। কাচড়াপাড়ার লোক সংখ্যা ৩০০০ এর মধ্যে ১৩৫৫ জন ইহার আক্রমণে ভবলীলা সাঙ্গ করে। ১৮৫৭ সালে নৈহাটি ও হালিসহর গ্রাম দুইখানি এই রোগের আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়া পড়িল। ১৮৬১ সালে হুগলী জেলা-বাসীগণকে এই রোগের আক্রমণে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে ম্যালেরিয়া আক্রমণের পর দ্বারবাসিনী আক্রমণপূর্ব্বক বারাসাত অধি-কার করিল। ইহার কয়েক বৎসর পরে ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে কাটোয়া, মেহেরপুর ও গোবরডাঙ্গার লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইল। ক্রমে সমগ্র বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া সর্ব্ব-রোগকে পরাজিত করিয়া প্রবল ভাবে বিরাজ করিতে লাগিল।

মশকই যে রোগের উৎপত্তির কারণ তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। বাঙ্গালাদেশে ম্যালেরিয়ার আধিক্যের কারণও আমরাই উপস্থিত করিয়াছি, ইহা না বলিলে বোধ

হয় সত্যের অপলাপ করা হইবে। যে মশক হইতে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হয়, সে মশককুলের ধ্বংসের আমরা কোনরূপ চেষ্টাই করি না।

ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত করিতে হইবেই হইবে। ইস্‌ম্যালিয়া ও সুইটহেম বন্দরে এই জল নিকাশের বন্দোবস্ত করিয়াই ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে ঐ অঞ্চলের লোক রক্ষা পাইয়াছিল। ১৯০২ সালে ইসমালিয়াতে ১৫৫১ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। জল নিকাশের বন্দোবস্ত করিয়া ১৯০৫ সালে ৩৭ জনের বেশী ম্যালেরিয়াক্রান্ত রোগী সেখানে ছিল না। ক্ল্যাং এবং সাইটেনহামে ১৯০১ সালে ৩১০ জন ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়, ১৯০৫ সালে ঐরূপ চেষ্টায় ২১ জনের অধিক ম্যালেরিয়াক্রান্ত হয় নাই।

হংকংয়ে ১৯০১ সালে ১২৯৪ জন ম্যালেরিয়া রোগী ছিল। ১৯০৫ সালে জল নিকাশের বন্দোবস্তের ফলে ৪১৯ মাত্র ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত জানিতে পারা যায়। জল নিকাশের বন্দোবস্ত করিয়া ইটালী, হল্যাণ্ড, আলজিরিয়া ও আমেরিকার অনেক স্থানই স্বাস্থ্যকর হইয়াছে। যাক্ সে কথা। যা' হইবার তা' হইয়াছে, এখন আর নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। যাহাতে বাঙ্গালা দেশ হইতে ম্যালেরিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নিম্নলিখিত উপায়গুলি পালন করিলে ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

জল নিকাশের বন্দোবস্ত করিতে হইবে, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আগে আমাদের দেশে প্রকৃতির বিকৃতি ভাব পরিলক্ষিত হইত না। সময়ে বৃষ্টি হইত, সে বৃষ্টির ফলে পল্লীপথের আবর্জ্জনাসমূহ উত্তমরূপে ধৌত হইয়া পল্লীভূমির লোক-সঙ্কুল স্থান সকল হইতে প্রান্তর ভূমিতে চলিয়া যাইত। তাহার ফলে সময়ের সুবৃষ্টির দরুণ পল্লীগ্রামের জলনিকাশের কার্য্য সম্পাদিত হইত। এখন সময়ে সুবৃষ্টি হয় না। অতএব যাহাতে জল নিকাশ হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পল্লীর বনগুলি পরিষ্কার করিতে হইবে। বাড়ীর নিকটে যে সকল ডোবা বা গর্ত্ত আছে তাহা বুজাইয়া ফেলিতে হইবে।

জলাশয়গুলি যাহাতে কলুষিত না হয় তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

মশক দংশন হইতে অব্যাহত থাকিবার জন্য সন্ধ্যার পর আর নগ্নগায়ে থাকা চলিবে না, সকলকেই জামা বা কাপড় গায়ে দিয়া থাকিতে হইবে। মশারি খাটাইয়া রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে হইবে।

শয়নকক্ষের জানালাগুলি বন্ধ করিয়া শুইতে হইবে। ইহাতে অসুবিধা হইলে ঘরের জানালাগুলি তার দ্বারা ঘিরিয়া লইতে হইবে।

প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় গৃহ মধ্যে ধূপ-ধুনা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ধূপ-ধুনার গন্ধ মশকগণ সহ্য করিতে পারে না, ইহা সকলে মনে রাখিবেন।

আগে প্রত্যেক হিন্দুর সংসারে তুলসী ও কৃষ্ণচূড়া ফুলের গাছ যত্নে রক্ষিত হইত। ইহার দু'টী কারণ আছে, এক হিন্দুর প্রত্যেক কর্ম্মকাজে, দ্বিতীয় স্বাস্থ্যরক্ষা। ইহারা রস টানিয়া স্যাঁতসেতে জমি শুষ্ক করে। তাহার ফলে স্বাস্থ্যরক্ষা কার্য্যে অনেক উপকারে আসে। সে প্রথা পুনঃপ্রচলন করিতে হইবে।

শয়নঘরে খাট, পালঙ্ক, তক্তাপোষ ভিন্ন আর কিছুই রাখা চলিবে না। আলনা, বাক্স, সিন্দুক এসকল অন্য ঘরে রাখিলে ভাল হয়।

বাঙ্গালীকে আবার তৈলমর্দ্দনে অভ্যস্ত হইতে হইবে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বলেন, উত্তমরূপে তৈলমর্দ্দনকারী ব্যক্তিগণের ম্যালেরিয়ার আক্রমণ অনেক কম হইয়া থাকে।

পল্লীগ্রাম ম্যালেরিয়ার লীলা-নিকেতন হইয়াছে বলিয়া পল্লী পরিত্যাগ করিলে চলিবে না, পল্লীরক্ষার জন্য চেষ্টা-শীল হইতে হইবে। দেশমাতার সুসন্তানদিগকে আবার পল্লীগ্রামে ফিরিয়া যাইতে হইবে। তাই বলি, মাতৃসন্নিধানে ফিরিয়া গিয়া অর্থে পার, সামর্থ্যে পার, যত্ন লইয়া, চেষ্টা করিয়া, কতক নিজেরা চাঁদা লইয়া, কতক বা লোকাল বোর্ড ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া যাহাতে গ্রামের বন জঙ্গলগুলি বিদূরিত হয়, রাস্তাঘাটগুলির সংস্কার হয়, কুপের জলসংস্থানের ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রমপূর্ব্বক চেষ্টা করিতে হইবে। দেশরক্ষা করিতে—সমাজরক্ষা করিতে হইলে, বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলে, এরূপ ব্যবস্থা ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই।

পথিক-বন্ধু।

[শ্রীভক্তিসুধা হার]

ওগো এ কোন্ বিভোল পাগল পথিক্
থমকি দাঁড়াল আমারি দ্বারে,
তার আকুল বাঁশরী সহসা থামিল
চকিত নয়নে নেহারি' কারে ?

বাতায়ন পথে দাঁড়ানু বারেক্
নয়নে নয়ন পড়িল ক্ষণেক্
উতলা বাঁশীর ব্যাকুল উছাস্
অমনি গো সখি, থামিল যেন,
পথ-ভোলা চির উদাসী পথিক্
মোর দ্বারে এসে দাঁড়াল কেন ?

শুধু দূরে দূরে থাকি শুনিতাম আমি
রাজ-পথে কার বাঁশীটি বাজে,
তাই বারে বারে যেন আনমনা হয়ে'
চাহিতাম ওই পথেরি মাঝে ;

মোরে কভু, সখি, দেখেনি ত আগে
তবু সে চাহিল ভরা অনুরাগে
সরমে নয়ন মুদিয়া আমি গো
কেন বা রহিনু বিভোল প্রাণে,
পথের পথিক কি লাগিয়া সখি,
নীরবে চাহিল আমার পানে ?

আমি সরম ভাঙিয়া মরম ঢাকিয়া
বিদায় করিতে আসিনু যবে,
মোর আঙিনার 'পরে দাঁড়ায়ে পাগল
মুখপানে চেয়ে হাসিল তবে ;

কহিনু 'পথিক ! কি দিব তোমারে' ?
সে দিল সাজায়ে তারি ফুলহারে—
আদরে আবেগে বাঁশীটি তাহার
সঁপিল নীরবে আমার করে,
মোর দুটি হাত ধরিয়া, হাসিয়া
পশিল পথিক আমারি ঘরে !

মায়া।

[শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী]

'খুকি ! খুকি আঙ্গুর খেবে ?' এক থোলো আঙ্গুর হস্তে করিয়া রামচরণ একটী ত্রিতলবাটীর দ্বারদেশে দণ্ডায়মান কুসুমকলি সদৃশ বালিকার দিকে অগ্রসর হইল।

প্রলুব্ধ বালিকা মুহূর্ত্ত দ্বিধা না করিয়া কৃষ্ণ-ভ্রমধ্য শিশু-বিনিন্দিত গুচ্ছ গুচ্ছ কেশে ভরা তাহার ছোট মাথাটী সম্মতি জ্ঞাপনে হেলাইয়া, শুভ্র সুডোল বাহুটী বাড়াইয়া দিল।

কোথা হইতে কেমন করিয়া যে সেই ত্রিশ বৎসর দৃঢ়কায় অসুরবলী রামচরণের সহিত, প্রজাপতির মত চঞ্চল ক্ষণভঙ্গুর মেয়েটীর এমন সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়া গেল, তাহা বিধাতাই জানেন !

বালিকা অচিরেই অপরিচিত পথিকের ক্রোড়ে উঠিয়া একটী একটী আঙ্গুর নিঃশেষ করার সঙ্গে সঙ্গে দমদেওয়া গ্রামোফোনের স্থায় আপনার শৈশব-গীতিটী গাহিয়া গেল।

বালিকার নাম মায়া। সে নামটী প্রদান করিয়াছিলেন তাহার পিসিমা। বাড়ীর সকলেই তাহাকে মায়া বলিয়া ডাকিয়া থাকে। কেবল প্রবাসী পিতা তাহার কোন দিনই ঐ নাম ধরিয়া ডাকেন নাই। তিনি 'খুকি'

বলিয়া ডাকিয়া থাকেন ও প্রতি পত্রের ছত্রে খুকি বলিয়া তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। বাড়ীর সকলের মধ্যে পিতাকেই যে সে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসে, একথাটাও মেয়েটী বলিতে ভুলিল না।

নবীন বন্ধু রামচরণের কোলে চড়িয়া বালিকা যখন আপনার কাহিনীটী বলিতে ব্যস্ত ছিল, তখন প্রস্তর মূর্ত্তিবৎ স্থির সেই শ্রোতার বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিটা ধীরে ধীরে কেমন জলে ভরিয়া আসিতেছিল! বহুকাল পরে, তপ্তমরুবক্ষে, অনেক দিনের হারাণ নিধির কোমল শীতল স্পর্শে উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত রামচরণ তাহার বলিষ্ঠ বাহুর নিবিড় স্নেহ-বেষ্টনে বালিকাকে বাঁধিতে চাহিতেছিল। তাপদগ্ধ তাহার দেহখানিও যেন বালিকার স্নিগ্ধ ছায়াতলে ক্ষণেকতরে একটা শ্রান্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার জন্ত উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল।

রামচরণের ভাগ্যদেবতা কিন্তু এ মধুর মিলন সহ্য করিতে পারিলেন না। বিধাতার অভিশাপে অকস্মাৎ তাহা চূর্ণ হইয়া পড়িল।

মায়ার মানুষ-করা ঝি, বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য কালীর সহিত কলহ শেষ করিয়া, অচিরেই যে তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য, এই কথাটা উচ্চকণ্ঠে জানাইতে জানাইতে সদর রাস্তায় পদার্পণ করিয়াই অকস্মাৎ ভরা মধ্যাহ্নে সুপ্তপ্রায় পাড়াখানিকে চমকিত করিয়া প্রাণপণ চীৎকারে কহিল,—'ওগো! মায়াকে ছেলেধরায় ধরেছে, তোমরা এসগো শীগ্‌গির—'

ভগ্নকাংস-বিনিন্দিত পরিচারিকার মধুর কণ্ঠধ্বনি দিগন্ত বিকম্পিত করিয়া বাজিয়া উঠিতেই সারা পাড়াখানি ভাজিয়া যে যেমন সজ্জায় ছিল, তেমনি ভাবেই ছুটিয়া আসিল। বালিকা আতঙ্কে কাঁদিয়া ফেলিল।

শুনিতে পাওয়া যায়, দশচক্রে ভগবান ভূত হইয়াছিলেন, রামচরণের অবস্থাও অনেকটা সেইরূপ দাঁড়াইল। পথের মাঝে তাহার এই বাৎসল্য রসের উদ্বেলটা লোকচক্ষে যে কি অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা সম্যক উপলব্ধি করিবামাত্র সে হতবুদ্ধি হইয়া মায়াকে কোল হইতে নামাইয়া আপনি পলায়ন করিতে গেল।

ক্ষুব্ধ জনতা পশ্চাতে পুলিস পুলিস রবে ছুটিল। কোথা হইতে একটা পাহারওয়ালা আসিয়া রামচরণকে ধরিয়া ফেলিল।

উত্তেজিত প্রহার-উন্মুখ জনতা তখন নানা কটুকাটব্য রামচরণের উপর বর্ষণারম্ভ করিল। ঝি তখন উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিতে লাগিল, মিন্সে খুঁকির গলা হইতে সোণার হার লইয়া টানাটানি করিতেছিল, সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে ইত্যাদি।

গলদ্‌ঘর্ম্ম দুর্ভাগা রামচরণ বহুবার চেষ্টা করিয়াছিল, মিনতির সহিত আপন বক্তব্যগুলা ক্ষুদ্র জনমণ্ডলীকে জানাইয়া দিতে। কিন্তু কে তাহার কথা শুনিবে? তখন গলিতে গলিতে একটা ছেলেধরার বিষম হুজুক উঠিয়াছে; সবেমাত্র গুণ্ডাবিল পাশ হইয়াছে—এতগুলি লোক চীৎকার করিয়া ঘোষণা করিতেছে, সুতরাং স ত্য না হইয়া যায় না।

* * *

কয়েকদিন হাজত সুখবাসের পর পুলিস-কোর্টের সর্ব্বাপেক্ষা কড়া ম্যাজিষ্ট্রেট দত্ত সাহেবের এজলাসের কাঠগড়ায় রামচরণ শীর্ণ-শুষ্ক মুখে দেখা দিল।

পুলিস ফরিয়াদি। সাক্ষীর পর সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হইল। আনুসঙ্গিক কোন প্রমাণেরই অভাব ঘটিল না। নির্ব্বিঘ্নে সাব্যস্ত হইয়া গেল,—'দেহারবাসী রামচরণ বেকার। ঐ ছোট মেয়েটীর গলা হইতে সোণার হার ছিনাইয়া লইবার অভিপ্রায়েই সে বালিকাকে আঙ্গুরের লোভ দেখাইয়া কোলে তুলিয়াছিল। দৈব সহায়ে উদ্দেশ্য সফল হইবার পূর্ব্বেই ধরা পড়িয়াছে।'

আসামী রামচরণের তরফে একজন নবীন উকীল বোধ হয় বিনা দর্শনীতেই দাঁড়াইয়াছিলেন। বিধাতার বিড়ম্বনা! তাঁহার বক্তৃতার ধারায় ব্যাপারটা আরো জটিল হইয়া উঠিল।

পরিশেষে রায় লিখিবার পূর্ব্বে, রামচরণের সপ্তভাগ্য বিধাতা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রথামত একবার আসামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার কিছু বলিবার আছে কি না।

একটা মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা কোনমতে চাপিয়া, রামচরণ নিঃশব্দে মাথা নাড়িয়া জানাইয়া দিল, বলিবার তাহার কিছুই নাই। তাহার চোখে মুখে একটা নিবিড় ঘৃণার

ছাপ এমন সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যেন মনে হইল এ বিচারের প্রহসন সে চাহে না।

রামচরণের পক্ষের তরুণ উকিলটী আর একবার খাসারম্ভে মকরধ্বজ মৃগনাভি ব্যবস্থার ন্যায় শেষ চেষ্টা করিলেন। রামচরণ বেহার-নিবাসী গরীব বাঙ্গালী। আশৈশব তাহার বেহারেই কাটিয়াছে। সেখানে তাহার মন্দ চরিত্র বলিয়া কোনই দুর্ণাম পাওয়া যায় নাই। বরং পরোপকারী বলিয়া একটা অল্প-বিস্তর খ্যাতি ছিল। তাহার একটি মাত্র কন্যার সম্প্রতি কাল হইয়াছে। সেইজন্যই রামচরণ বিভ্রান্তচিত্তে কলিকাতায় আসিয়াছে। তাহার কৃতকর্ম্মের জন্য সে যথেষ্ট অনুতপ্ত! এখন মাননীয় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দয়া সে প্রার্থনা করে।

পাথরে বীজ নিক্ষেপের ন্যায় সে বক্তৃতায় কোন ফল ফলিল না। দীর্ঘ ছয়মাস সপরিশ্রম কারাবাস রামচরণের ভাগ্যলিপি।

* * *

মেজার গ্লাসটা টেবিলের উপর রাখিয়া, প্রবাস প্রত্যাগত স্বামীর পানে চাহিয়া, মাধুরী কহিল,—'দেখ, সেই হ'তে মেয়েটা ভুগ্‌ছে! যেদিন শুনলাম মিস্টোর জেল হ'ল, সেই রাত হ'তে বাছার আমার কি জ্বর এল, এ কিছুতেই ছাড়্‌চে না।'

চিন্তিত মুখে রমেন্দ্র কহিল,—'আমি ত তাই ভাবছি। একটা কথা মনে হ'লে—'

রমেন্দ্র রসনায় অর্দ্ধোচ্চারিত বাক্যটাকে সংযত করিয়া কহিল,—'খুকিকে আর একবার থার্ম্মমিটার দাও দেখি।'

থার্ম্মমিটার লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া মাধুরী কহিল,—'কই, কি বল্‌তে গিয়ে বল্‌লে না?'

অন্যমনস্ক ভাবে রমেন্দ্র কহিল,—'না থাক্‌গে। আমার সেই বিদেশের অসুখের কথা।'

'অসুখের কি কথা আমায় বল না।' স্বামীর নিকট সরিয়া গিয়া নিজের পূর্ণ আগ্রহ ভরা আয়ত আঁখি দুটী রমেন্দ্রের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া মাধুরী কহিল,—'আহা, বিদেশে কেই বা তোমায় দেখ্‌ত, সেবা যত্ন করত! একলা কত কষ্ট—'

মধ্যপথে বাধা দিয়া রমেন্দ্র কহিল,—'না মাধু! তার জন্য আমার কোন অভাবই হয় নি। অমন কলেরা রোগ, আত্মীয় স্বজন সেবা করতে যেখানে ভয় পায়, সে পর হয়েও এতটুকু 'কিন্তু' হয় নি। রামচরণ আমায় দেখিয়েছিল—সেবা যত্ন কি জিনিষ! নিমক খাওয়ার সফলতা কাকে বলে।'

মাধুরীর বিস্ময়ভরা কণ্ঠধ্বনি বাহির হইল,—'কে? তোমার সেই বেহারী চাকরটা?'

'সে বেহারী নয় মাধু। বেহারে বাস করে। জাতে বাঙ্গালী। আমার বুকখানা কেঁপে উঠে, যখন মনে হয়, উঃ—'

খপ্‌ করিয়া স্বামীর হাতখানি ধরিয়া মাধুরী কহিল,—'কি মনে হয় গো তোমার?'

'তার মেয়ের কথা। আমায় সে প্রাণপাত সেবা ক'রে বাঁচালে। কিন্তু তার বুক-জুড়ান ধন, শেষ অবলম্বনকে পারলে না। তার স্ত্রী মরণকালে, মেয়েটাকে স্বামীর হাতে হাতে গচ্ছিত ক'রে দিয়েছিল। রামচরণ তাকে রক্ষা করতে পারলে না। আমি সারবার মুখে সেই কাল রোগ তার মেয়েটাকে ধরল। অতটুকু মেয়ে অতবড় রোগের আক্রমণ সইতে পারলে না। ক' ঘণ্টার মধ্যেই নেতিয়ে পড়ল। রামচরণের জীবন-পথের শেষ আলো নিভে গেল। উঃ! বাপ্‌ হয়ে সে সেই গভীর রাতে যখন মেয়েটাকে নিয়ে গেল;—ঢের বুঝিয়েছিলাম, বলেছিলাম, ওকে আর কারু হাতে দাও, রামচরণ। আমায় বল্‌লে,—'ও কথা বলবেন না, আমি যাকে এনেছি, আমিই তার সব শেষ ক'রে যাব।'

গ্রন্থীচ্ছিন্ন মুক্তাফলের ন্যায়—ঝর ঝর করিয়া অশ্রুধারা মাধুরীর বড় বড় আঁখি দুটা হইতে ঝরিয়া পড়িল। সে সেই বাষ্পাকুল শূন্য দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া রমেন্দ্র কহিল,—'মেয়েটা দেখ্‌তেও প্রায় আমাদের খুকির মতই ছিল।'

শিহরিয়া যাট্ যাট্ বলিয়া কন্যার শিয়রে আসিয়া মাধুরী মায়ার বগলে থার্ম্মমিটারটা চাপিয়া ধরিল।

পরে মুখ তুলিয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কহিল,—'তোমার সে রামচরণ এখন কোথা?'

শূন্যপানে চাহিয়া রমেন্দ্র কহিল—'জানি না, সে আর ফেরেনি। অনেক খুঁজেছি তাকে পাই নি।' রমেন্দ্র দুই হস্তে বেষ্টনী দিয়া টেবিলের উপর আপন মস্তক রক্ষা করিল।

হঠাৎ অঙ্গস্পর্শে চমকিয়া মাথা তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে, মাধুরী ভয়ার্ত্ত ব্যাকুল কণ্ঠে কহিয়া উঠিল,—'ওগো সেই ছেলেধরার নামও যে রামচরণ শুনেছি! তার মেয়েটিও কলেরায় মরেছে বলেছিল!'

স্বপ্নের অগোচর একটা সন্দেহের তীক্ষ্ণ ছুরিকা রমেন্দ্রের বক্ষে বিঁধিয়া, তাহার সারা মুখখানিতে একটা দারুণ ব্যথার ছাপ মারিয়া দিল। তেমনই যন্ত্রণা ভরা চক্ষে পত্নীর মুখপানে চাহিতেই কণ্ঠ দিয়া বাহির হইল,—'তুমি কি বল্‌ছ মাধু?'

একটা উচ্ছ্বসিত কান্নার আবেগ দমন করিয়া, কম্পিত-কণ্ঠে মাধুরী কহিল,—'ওগো আমি কিছু ভুল বলিনি। আমরা যাকে চোর ব'লে, ঝিব কথা শুনে জেলে দিলুম; সে নিশ্চয়ই তোমার সেই রামচরণ। খুকি আমায় ঠিক বলেছিল,—'মা সে ছেলেধরা নয়, সে কাঁদছিল।' তখন তার কথা শুনিনি, এখন যে সব সত্যি ব'লে মনে হচ্ছে।'

ক্ষুব্ধ আগ্নেয়গিরির ন্যায় রমেন্দ্র কাঁপিয়া উঠিল। প্রতি শিরায় শিরায় যেন তড়িৎ প্রবাহ খেলিতে লাগিল। উত্তেজিত কণ্ঠ ভেদিয়া বাহির হইল,—'কি বল্‌ছ তুমি! আমার প্রাণদাতা রামচরণ, আমারই মেয়েকে তার আগুন-জ্বালা বুকে-তোলার অপরাধে জেলে গিয়েছে! আমাকে তোমরা একবার জানালে না! তোমরা ভাব্‌তে পারবে না, কি ক'রে সে মরণ-মুখ হ'তে আমায় ফিরিয়ে আন্‌লে—'

'ওগো দেখ! দেখ! খুকি কেমন কর্‌চে।'

পত্নীর ভীত ব্যাকুল কণ্ঠ রমেন্দ্রনাথের উৎক্ষিপ্ত চিত্তের উপর একটা কশাঘাত করিয়া তাহার চেতনা সঞ্চার করিল।

ত্বরিত পদে পত্নীর পার্শ্বে গিয়া, থার্ম্মমিটারটি লইয়া দেখিল,—টেম্পারেচার, একশ পাঁচ।

মায়ার তাপদগ্ধ বিশীর্ণ দেহলতা শয্যার উপর মৃদু মৃদু কম্পিত হইতেছিল। চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত।

রমেন্দ্র তাড়াতাড়ি কন্যার মস্তকে আইস্‌-ব্যাগটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—'মাধু, ডাক্তারকে ফোন্ কর্‌তে বল।'

কন্যার স্পন্দিত বক্ষে হস্তখানি সযত্নে, সন্তর্পণে রাখিয়া রমেন্দ্র আকুলকণ্ঠে ডাকিল,—'খুকু! খুকুমণি, মা আমার!'

রক্তনেত্র পিতার দিকে ফিরাইয়া মায়া কহিল,—'বাবা, ওই দেখ আঙ্গুর নিয়ে আমায় ডাকৃচে। বাবা, সত্যি বল্‌ছি, ও ছেলেধরা নয়।'

অর্দ্ধ অচেতন কন্যার পানে দীন করুণ নয়নে চাহিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় পিতা কহিল,—'মা মা! আমি নিশ্চয় তাকে ফিরিয়ে এনে তোকে তার কোলে দেব।'

অশ্রু-উপচার।

৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল]

কালের করাল স্পর্শে জননীর পঞ্জর ভাঙ্গিয়া যখন কোনও কৃতী সন্তান জীবনের পরপারে বিশ্রাম লাভ করে, তখন পতন-অভ্যুত্থান-বন্ধুর পথে একটা সংসারের শ্রী ম্লান হইয়া যায়, ভেসে যায় শুধু সেই পরিবারের লোক, আত্মীয় স্বজন। কিন্তু যখন দেশ-জননীর অঙ্ক হইতে মরণের শীতল স্পর্শ তাঁহার কৃতী কুমারকে কাড়িয়া লয়, তখন সারা বিশ্ব-সংসার অকুন্তদ মর্ম্মোচ্ছ্বাসের হাহাকার ধ্বনিতে ভরিয়া উঠে—ম্লান হয় একটা জাতি, হৃতশ্রী হয় একটা দেশ—ধ্বংসের পিচ্ছিল পথে সে ছুটিতে থাকে। বঙ্গ-জননীর আজ সেই দশা—অভাগিনীর দীর্ঘশ্বাস গুমরিয়া

গুমরিয়া আকাশ বাতাস ছাইয়াছে, তাহার নয়ননীরে আজ তাহার অপোগণ্ড শিশুর দল অগ্রজ-হারা, গুরু-হারা, অতি-মানুষ-হারা হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছে। আশুতোষের মরণে ভীষণ জীবন স্রোতের এই দুর্দ্দিনে বাঙ্গালার তরণী বাণচাল হইবার উপক্রম হইয়াছে—সারা বিশ্ব এ সংবাদে ম্রিয়মাণ।

অসামান্য দেশভক্তি, স্বজাতি-প্রীতি, দয়া, দাক্ষিণ্য, পাণ্ডিত্য, সাধনা, নির্ভীকতা, কর্ম্মক্ষমতা—এ-সব গুণের মাত্র একটা গুণ থাকিলে মানুষ সমাজে বরেণ্য হয়। এ সকল গুণ একাধারে যদি অতিমাত্রায় কাহারও নিজস্ব হয় তাঁহা হইলে সে মানুষের স্থান সমাজের শীর্ষে। ৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাই আজ যে সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন, সে সিংহাসন অধিকার করিতে পারে এমন ব্যক্তি বঙ্গদেশে—বঙ্গদেশে কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে নাই। তিনি ছিলেন ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ। তাঁহার প্রতিভা, তাঁহার মনীষা সমগ্র জগতের প্রশংসা আকর্ষণ করিয়াছিল। তাই আজ তাঁহার মৃত্যুতে দেশে এমন একটা অভাবের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহা পূরণ করিবার কোনও উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না।

আশুতোষের জীবনের কাহিনী বাঙ্গালার আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট বিদিত। সে কাহিনী শুনিলে মনে হয় সাফল্যই সে কাহিনীর ছত্রে ছত্রে লিখিত। আপনাকে বড় করিতে হইলে যে শক্তির আবশ্যক, তাহা তাঁহার আয়ত্তের মধ্যে ছিল। বাল্যে ও তরুণ বয়সে বিদ্যাশিক্ষা, যৌবনে উচ্চশিক্ষা, পিতামাতা আত্মীয় স্বজনের প্রতি কর্ত্তব্য পালন, ব্যবসায় সম্যকরূপে যশ ও অর্থ উপার্জ্জন, পদলাভ করিতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বোচ্চ পদ প্রাপ্তি, প্রচুর মাত্রায় উপাধি অর্জ্জন, পুত্র কন্যার সুশিক্ষার ব্যবস্থা, পুত্রদিগকে পাণ্ডিত্য দান, অর্থোপার্জ্জনের ক্ষমতা, সুমিত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকা, স্বধর্ম্মে নিরত থাকা, দৈহিক নিরাময়তা,—গৃহস্থ যাহা চায়, যাহাতে গৃহস্থের জীবন কল্যাণময় ও সফল হয়, আশুতোষের সে সমস্তই ছিল। তাই হঠাৎ শুনিলে মনে হয় শক্তিময়ী জননী সাফল্য-বীজমন্ত্রে আশুতোষকে গঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা উত্তমরূপে তাঁহার জীবন কাহিনী বিদিত তাঁহারা জানেন এ সাফল্য তাঁহার অদৃষ্ট বলে আসে নাই। তাঁহার গৃহস্থ-জীবনের প্রত্যেক সুফলটি তাঁহাকে অর্জ্জন করিতে হইয়াছিল, প্রত্যেক ফলটি তাঁহার পরিশ্রম-লব্ধ। আশুতোষ অসামান্য বিদ্বান হইয়াছিলেন বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া, পরিশ্রম করিয়া। তিনি শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবী হইয়াছিলেন বহু কৃতবিদ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত সংগ্রাম করিয়া, এবং সেই সংগ্রামে তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া। বিচারক আশুতোষের আইনের ব্যাখ্যা কঠোর সাধনা, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ফল। বিচারের সূক্ষ্ম দৃষ্টি আসিতে পারে সহজ বুদ্ধিতে, কিন্তু সমস্ত সভ্য জগতের আইন আলোচনা করিয়া ন্যায় বিচার করিতে কত পরিশ্রম কত সাধনার আবশ্যক, তাহা অল্প চিন্তাতেই বোধগম্য হয়। আশুতোষের জীবনের মিত্রলাভের অধ্যায়টা বড় মনোরম ও বিশদ। কত বিজ্ঞ কত মনীষি, কত উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, কত স্বনামধন্য পুরুষ আশুতোষকে মিত্র বলিয়া গৌরবলাভ করিত। আবার অন্যদিকে দীনহীন কাঙ্গাল যাহার অর্থ নাই, যশ নাই, পদগৌরব নাই এমন অসংখ্য লোকের তিনি ছিলেন মিত্র, তাহারা ছিল তাঁহার অন্তরঙ্গ। পদ, যশ, মান বা অর্থ তাঁহার বন্ধুত্বে কোনও পার্থক্যের সৃষ্টি করিতে পারিত না। কিন্তু এই মিত্রলাভ করিতে তাঁহাকে রাশি রাশি বাধা বিপত্তি, শত্রুতা, নীচতাকে যুঝিতে হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রগুলিকে কৃতবিদ্য করিতে তাঁহাকে যত্ন করিতে হইয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের সকল অঙ্গে সাফল্যের প্রাদুর্ভাব পরিদৃষ্ট হয়, সে সাফল্য বিধি অদৃষ্টের সহিত তাঁহার জীবন-পথে ফেলিয়া দেন নাই—প্রত্যেকটি তাঁহার নিজ পুরুষকারের দ্বারা অর্জ্জিত। এ ধৃষ্টতা আমার নাই যে বলি ভগবানের কৃপা বা সুকৃতিকে বাদ দিলে কেবল চেষ্টাতে মানুষ জীবনকে সফল করিতে পারে। তবে এ কথা নিশ্চিত যে "উদ্যমেন হি সিদ্ধন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।" দৈবের সঙ্গে যে পুরুষকারের সংযোগে সিদ্ধি পাওয়া যায়, কর্ম্মবীর আশুতোষের সে পুরুষকার অতিমাত্রায় ছিল।

তাঁহার জীবনের যে দিক্‌টা আমাদের—তাঁহার দেশসেবায় আত্মনিয়োগ—সেদিকেও ঐ পুরুষকার ও পরিশ্রমের

প্রাচুর্য্যই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহার উজ্জ্বল কীর্ত্তিস্তম্ভ কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় কি বাধা বিপত্তির তরঙ্গের সহিত যুঝিয়া, কি পরিশ্রমে, কি উদ্যমে তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যে কর্ম্মক্ষমতা তিনি এই গঠন কার্য্যে দেখাইয়াছেন তাহা এ যুগের বাঙ্গালীর ইতিহাসে অপূর্ব্ব। আমরা এই গঠনের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতেছি তাই ইহার সম্যক কারুকার্য্য ততটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। কারণ একটা সৌধ গঠিত হয় ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে এবং দর্শকও ধীরে ধীরে অভ্যস্থ হইয়া যায় তাহার সৌন্দর্য্যে। কিন্তু যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই অবস্থা স্মরণ করি, যে অবস্থায় আশুতোষের কোনও প্রভাব এ অনুষ্ঠানের উপর ছিল না এবং সেই দিনের বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত আজিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনা করি, তাহা হইলেই বুঝি আশুতোষের কৃতিত্ব কি বিপুল!

যাহা সত্য, যাহা কর্ত্তব্য, তাহার জন্য নির্ভীক ভাবে জগতের ভ্রূকুটী ও বিদ্বেষকে উপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইবার আশুতোষের শক্তি তাঁহার জীবনের একটা বিশিষ্টতা। বিধবা কন্যার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত, ইহা ন্যায়, এই ধারণা যেদিন আশুতোষের হইয়াছিল সেদিন তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী হন নাই, সত্যের মুখে, ধর্ম্মের মুখে চাহিয়া ব্রাহ্মণ আশুতোষ বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। ইংরাজি কথার অনুবাদ করিয়া তাঁহার এ কার্য্যকে "সৎ-সাহস" বলিলে তাঁহার চরিত্রের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয় না। ইহা ধর্ম্মনিষ্ঠা, ধর্ম্মপ্রাণতা। ধুতি চাদর দেশের বেশ, এ বেশে লজ্জা নাই, এ ধারণায় এ মহাপুরুষ ধুতি চাদর লইয়া রাজসভায় গিয়াছেন—বিলাতী পণ্ডিতদের সঙ্গে সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া তাঁহাদের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার দরবারে আপামর সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল, ইহা হিন্দুর পক্ষে, ভারতবাসীর পক্ষে যশের কথা নয়। কিন্তু এখনকার সমাজ যে পথে চলিতেছে তাহাতে নিজ গৃহে আপামর সাধারণকে লইয়া মেলামেশা করা তাঁহার মত পদস্থ লোকের পক্ষে শ্লাঘার কথা।

মাতৃ-ভূমির সর্ব্বাঙ্গীন গৌরব বৃদ্ধি করাই ছিল আশুতোষের জীবনের ব্রত। মাতৃ-ভাষার গৌরবে মাতৃ-ভূমির গৌরব। বঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এমন একটা বিচিত্র অনুষ্ঠান—যেখানে মাতৃভাষা অনাদৃত হইত, যেখানে জাতীয় সাহিত্য ব্যতীত প্রায় সকল সাহিত্যই শিক্ষা করিবার ব্যবস্থা ছিল। এ দুর্দ্দশার অবসান করিয়াছেন আশুতোষ। তাঁহারই সাহচর্য্যে জননী বঙ্গ ভাষা আজ সমাদৃতা, বঙ্গভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়া ছাত্রেরা উপাধি লাভ করিতে পারে। সংস্কৃত কলেজও তিনি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িয়াছিলেন এবং সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা-সংস্কার ব্যবস্থা তাঁহারই।

বাণীর বরপুত্র, মনীষায় বরেণ্য, প্রতিভায় প্রোজ্জ্বল, দেশহিতৈষণায় মহান, জ্ঞানবীর কর্ম্মবীর আশুতোষ স্বর্গে। বাঙ্গালার শিক্ষার নৌকা আজ কর্ণধার হীন। বাঙ্গালীর ভরসা তাঁহার আশীর্ব্বাদ। বাঙ্গালীর সে মনীষা-মন্দিরে অর্চ্চনার উপচার অশ্রু। আমাদের হৃদয়ের গভীর শোকের নিদর্শন অশ্রু-উপচারে আজ তাঁহার স্মৃতির অর্চ্চনা করিতেছি।

স্যর আশুতোষ।

[শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র]

বাঙ্গালা, ভারতবর্ষ এবং সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে জ্ঞানগারমায় যিনি শ্রেষ্ঠ, পুরুষের মধ্যে যিনি পুরুষসিংহ, অমিত তেজের যিনি আগ্নেয়গিরি, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ ভারত-গৌরব স্যর আশুতোষ আর ইহজগতে নাই। জজীয়তি কর্ম্মে অবসর গ্রহণ করিয়া পাটনায় তিনি ডুমরাঁও-রাজের মামলা পরিচালন করিবার জন্য অবস্থান করিতেছিলেন। হঠাৎ সংবাদ আসিল, স্যর আশুতোষ নাই! প্রথম শ্রবণে এ সংবাদ লোকে বিশ্বাস করিতে চাহিল না। ৩।৪ দিন পূর্ব্বে স্যর

আশুতোষ চৌধুরীর মৃত্যু হইয়াছিল, তাই লোকে ভাবিল, হয়ত সংবাদটা ভ্রমমূলক। কিন্তু মৃত্যু সংবাদ ত মিথ্যা হয় না। সত্যই স্যর আশুতোষের অমরত্ব লাভ হইয়াছে। পাটনা হইতে তাঁহার শবদেহ কলিকাতায় নীত হয়। হাবড়া ষ্টেশন সহস্র সহস্র লোকে লোকারণ্য। সকলেই উৎসুক, সেই জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধির হিমালয়, বিরাট পুরুষ স্যর আশুতোষকে একবার শেষ দেখা দেখিতে।

স্যর আশুর শবদেহ তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রিয়, জীবনের ধ্যান-জ্ঞান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হাউসের সমক্ষে আনয়ন করা হয়। হাজার হাজার লোক—অধ্যাপক, ছাত্র, সাহেব, বাঙ্গালী, হিন্দু, খৃষ্টান, পার্শী, মুসলমান, ধনী, নির্ধন গণ্যমান্য সকল শ্রেণীর জনমণ্ডলী সেই পূতদেহে শ্রদ্ধার সম্মান ও অশ্রু-অর্ঘ্য দিতে লাগিল। বুঝিবা দেবতারাও স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন!

তাহার পর শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহার বাড়ীতে তাঁহাকে ফুলে মুড়িয়া ফুলশয্যায় লইয়া যাওয়া হয়। দেশের শিক্ষিত জনসঙ্ঘ নগ্নপদে তাঁহার অনুগমন করেন। তার-পর বাটী হইতে শ্মশানঘাট অবধি পথে হাইকোর্টের জজ হইতে আরম্ভ করিয়া দীন দরিদ্র পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করেন। হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ, খৃষ্টান সর্ব্বজাতির সমন্বয়ে এ শোভাযাত্রা মৃত মহাপুরুষের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতেছিল। মরণে এমন শোভাযাত্রা কখনও দেখি নাই। এমন বাঙ্গালীকেও ত মরিতে কখনও দেখি নাই। বিদ্যায়-বুদ্ধিতে অতুল্য, মনুষ্যত্বে ও তেজে অপ-রাজেয়, প্রতিভার কল্পতরু অদ্বিতীয় স্যর আশুতোষের মরণটাও যেন দেবতাবাঞ্ছিত হইয়াছিল।

ঠিক যে সময় সমগ্র দেশটা স্যর আশুতোষের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে নানা কল্পনা-আলোচনায় নিরত ছিল, দেশের ভবিষ্যৎ গতির পরিচালন-ভার তাঁহার উপযুক্ত হস্তে ন্যস্ত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মহাকালের আহ্বানে মহাপুরুষের অন্তর্দ্ধান হইল!

স্যর আশুতোষ দেশের জন্য কি করিয়াছিলেন, সে কথা আলোচনা করিবার এ সময় নহে। তাঁহার কীর্ত্তি বিশেষরূপে জানেন না এমন শিক্ষিত বাঙ্গালী দেশে আছে বলিয়া আমরা জানি না।

অনেকে অনুযোগ করেন, অধিক সংখ্যক ছেলেকে পাশ করাইয়া স্যর আশুতোষ পাশের মূল্য কমাইয়াছেন। এ কথার উত্তরে আমরা বলিব, সঙ্কীর্ণচিত্ত লোকের বিবাহ-বাজারে স্যর আশুতোষ হয়ত কতটা ক্ষতি করিয়াছেন কিন্তু অনুযোগকারীরা কি কখনও তলাইয়া দেখিয়াছেন যে পাশ-করাটা সুলভে হইলে কত অধিক ছাত্র সংখ্যা উচ্চ-শিক্ষা-লাভের কতকটা সুযোগ পায়? নহিলে, অনেককে প্রবেশিকার দ্বার হইতেই শিক্ষা শেষ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিতে হইত। স্যর আশুতোষের আন্তরিক ইচ্ছা, দেশে সকলে শিক্ষিত হইয়া উঠুন, সকলেই মানুষ হইবার প্রয়াসী হউন।

যে বাংলা ভাষায় কথা কহিতে ইংরাজী শিক্ষিত মহলে অনেকে নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন—স্যর আশুতোষের চেষ্টায় সেই বাংলা ভাষা সকল পরীক্ষায় পাঠ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে; বাংলায় এম-এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ফলে, এখন মাতৃভাষার আদর দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে চলিয়াছে।

স্যর আশুতোষ কখনও সাহেবীয়ানায় অনুকরণপ্রিয় ছিলেন না। বড় বড় সাহেবের বৈঠকে জামা কাপড় পরিয়া তিনি সগৌরবে সদস্যগিরি করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার উঁচু মাথা কখনও নীচু হয় নাই, কখনও তাঁহাকে এজন্য অপ্রতিভও হইতে হয় নাই। তাঁহার এই স্বদেশী-য়ানার আদর্শে দেশে কাজ হয় নাই, এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করিতে হয়। এত কর্ম্মবহুল জীবন তাঁহার যে তাঁহার প্রসঙ্গ উঠিলেই তাঁহার কীর্ত্তি-কাহিনী স্মৃতি-পথে স্বতঃই উদয় হয়; বক্তব্য রোধ করা যায় না।

যাহা গেল তাহা ত আর পাইব না। বাঙ্গালায় একটী স্যর আশুতোষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার জোড়া আর কোথাও দেখি না। তাই বাংলার গভর্ণর লর্ড লিটন্ পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, আশুতোষের স্থান কখনও পূর্ণ হইবে কি না সন্দেহ! সে তেজোদীপ্ত পুরুষপ্রধান, সে আদর্শ কর্ম্ম-জীবন, সেই অন্তর্ভেদী সূক্ষ্ম দৃষ্টি, সেই বিদ্যাবুদ্ধি পাণ্ডিত্যের

ভাবে যূথিকা-স্তবকের ন্যায় নিজ গৌরব-সৌরভে সদা অবনমিত কুসুমগুচ্ছ আর ত দেখিব না। তাই দুঃখ হয়, তাই অজ্ঞাতে দুই চোখ দিয়া অশ্রু ঝরে, তাই এক একবার নিরাশার তপ্তশ্বাসে পাঁজর যেন ঝাঁঝরা হইয়া যায়, এক একখানি খসিয়া পড়ে। ভারতবর্ষে শিক্ষাবিস্তার ত অনেকে করিতেছেন, কিন্তু স্যর আশুতোষের মতন আর একটী বিশ্ব খুঁজিয়া আনিতে পারিবে কি? গুরুর গুরু তিনি, বিদ্বান, জ্ঞানবান, চরিত্রবান্, অসীম তেজে বলীয়ান তাঁহার মত আর একজন আন দেখি! তেমন হইবার নহে, তেমন আর নাই। তাই বাঙ্গালার ঘরে ঘরে স্যর আশুতোষের জন্য শোক উথলিয়া পড়িতেছে।

যাও দেব! পারিজাত কুসুমের মত তুমি আসিয়াছিলে, সেইভাবে, তুমি আপনার ভাবে আপনি মজিয়া, আপনার কর্ম্মে বিভোর থাকিয়া চলিয়া গেলে। রহিল, তোমার বিরাট কীর্ত্তি বিশ্ববিদ্যালয়, স্মৃতি তোমাকে সোহাগের কুসুম কিঞ্জল্কে আবৃত করিয়া রাখুক, ভগবানের নিকট ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

সংগ্রহ ও সঙ্কলন।

পোড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সালেমের ডাক্তার ওয়াটার্স ম্যাসাচুসেট ডেন্টাল সোসাইটীতে বলিয়াছিলেন যে বাইকার্ব্বনেট অফ্ সোডা (Bicarbonate of Soda)—পোড়া এবং ঝল্‌সে যাওয়ার একটী উৎকৃষ্ট এবং তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা নিবারণের মহৌষধ, এবং অতি ভয়ানক দগ্ধ ক্ষত অতি অল্প সময়ে আরোগ্য করিতে সক্ষম। এইটা সর্ব্বসমক্ষে পরীক্ষার জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ একটা স্পঞ্জকে খুব ফুটন্ত গরম জলে ফেলিয়া সেই জলটা নিংড়াইয়া নিজের হাতে দিলেন, দিবা মাত্রই মুহূর্ত্তের জন্য ভয়ানক যন্ত্রণা হইল বটে, কিন্তু তিনি তাহার উপর বাই-কার্ব্বনেট-অফ-সোডার গুঁড়া ছড়াইয়া দিলেন এবং তাহার উপর একটা পরিষ্কার সাদা ন্যাকড়া জলে ভিজাইয়া বাঁধিয়া দিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যেই যন্ত্রণা নিবারিত হইল। যে স্থানে তিনি পরীক্ষার্থে গরম জল দিয়াছিলেন, সে স্থানটা প্রায় ২ ইঞ্চি চওড়া হইয়া সিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বাই-কার্ব্বনেট-সোডা দেওয়াতে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা নিবৃত্তি হইয়াছিল, কিন্তু ২ মিনিট কাল বিলম্ব হওয়াতে একটু ফোস্কা ও ক্ষত হইয়াছিল। কিন্তু পরদিন আর একবার ঐ ঔষধে অচিরে ক্ষত আরোগ্য হইয়া গেল এবং সে স্থান যে পুড়িয়া গিয়াছিল, তাহার চিহ্ন আর দেখা যায় নাই। এইরূপ পোড়া ঘায় শুষ্ক বাই-কার্ব্বনেট-অফ-সোডার গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়া তাহার উপর একটা পাতলা ন্যাকড়া জলে ভিজাইয়া দিয়া রাখিলেই অতি অল্প সময়েই ক্ষত আরোগ্য হইবে। ডাক্তার বলিয়াছেন যে "The severe wounds in a few days without other treatment than wet cloth kept over it showed every sign of rapid healing." এইটী সামান্য হইলেও অতি আবশ্যকীয় জিনিষ, প্রত্যেক ঘরে রাখা উচিত।

—০—

এনামেলের বাসনে সাংঘাতিক বিপদ।

"The attention of Public Analyst has been called by Mr. R. Tatlock to the danger attendant on the use of enamelled cooking vessel. He has it seems made experiments on the enamels as found in commerce with the result of obtaining fatal dose of arsenic from one ounce of enamel of a cooking utensil".

ডাক্তার টাট্‌লক্—পাবলিক আনালিষ্টের মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে দেখিয়েছিলেন যে, এনামেলের বাসনে কদাচ রান্না খাওয়া উচিত নয়; কারণ তিনি একটী এনামেলের বাসনের গায়ের এনামেল-চূর্ণের এক আউন্স লইয়া তা হ'তে সাংঘাতিক মাত্রায় আর্সেনিক বার কর্ত্তে সক্ষম হয়েছেন।

যেটুকু আর্সেনিক পেয়েছেন, তাতেই একটা মানুষ মৃত্যুমুখে পড়্‌তে পারে। সৌখিনত্বের এবং সস্তার খাতিরে এদেশে এনামেলের ব্যবহার খুবই বেশী হয়ে পড়েছে। কত লোক যে আর্সেনিকের স্লো-পয়েজন হ'তে মরে কে জানে বল? ছিল আমাদের বেশ কাঁসা, পিতল ও মাটীর পাত্র; আজ সাহেবি-আনা চাল চাল্‌তে গিয়ে যে ধনে প্রাণে মানুষ মরতে বসেছে! তবুতো চৈতন্য নাই!

—কাজের লোক।

—•—

আলোক।

বাইবেলে লিখিত আছে যে আলোক প্রকাশিত হউক, অমনি আলোক প্রকাশিত হইল। আলোক প্রকাশের পরেই পৃথিবীতে গাছপালা ও প্রাণীর সৃষ্টি হয়। আলোক মানব জীবনের পক্ষে কত প্রয়োজনীয় তাহা এ বিংশ শতাব্দীতেও আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। সূর্য্যপূজক হিন্দু হইতে সূর্য্যপূজক মিশরবাসী পর্য্যন্ত এই সমস্ত দেশের লোক অজ্ঞাত কারণের জন্য সূর্য্যপূজক ছিল। নানাপ্রকার রোগ, মুক্ত বায়ু ও সূর্য্যালোকে আরাম হইয়া যায়, তাহা বর্ত্তমান সময়ে জানা গিয়াছে। এতদিন ইহা বুঝিতে পারা যায় নাই কারণ বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় পূর্ব্বে বিজ্ঞান এত উন্নত ছিল না কিম্বা বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় এত সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণও ছিল না।

আলোকের রশ্মি অতি জটিল জিনিষ, ইহার কতকাংশ দৃষ্টিগোচর হয় এবং কতকাংশ চক্ষের অগোচর। আমরা যে আলোক চক্ষে দেখিতে পাই তাহার বিশ্লেষণ করিলে রামধনুর বর্ণ দেখিতে পাই। বেগুণি, নীলাভ, নীল, সবুজ, হরিদ্রা, কমলা রং ও লাল এই কয়টি বর্ণই আমাদের চক্ষুগোচর হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা ব্যতীত আরও আলোক রশ্মি আছে তাহা আমাদিগের চক্ষুগোচর হয় না। এই রশ্মির অস্তিত্ব আমরা অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে বুঝিতে পারি। অতি জটিল ও কষ্টে নির্ম্মিত যন্ত্র সাহায্যে এই চক্ষুর অগোচর বর্ণকে আমরা বিশ্লেষণ করিয়া বিভিন্ন করিতে পারি। তাহা ছাড়া আমরা এই চক্ষুর অগোচর বর্ণ শরীরে লাগার যে ফল হইয়া থাকে তাহার জন্য এই রশ্মির অস্তিত্ব বুঝিতে পারি। এই তিন প্রকারে মোটামুটি রকমে আমরা জানিতে পারি যে আমরা আলোকের যে বিভিন্ন প্রকার রশ্মি দেখিতে পাই তাহা ছাড়া আরও অন্যান্য রশ্মি আছে। বর্ত্তমান সময়ে মাত্র দুইটি রশ্মিই বেশী করিয়া কার্য্যে লাগান হইতেছে। প্রথমটি রামধনুর বর্ণের এক প্রান্তে যে বেগুণি রং আছে তাহাকে অতি বেগুণি রং বলা যাইতে পারে। এই রশ্মি অতি প্রখর, ইহা সুস্থ ও অসুস্থ অবস্থায় শরীরের অনিষ্ট করিয়া থাকে সেই জন্য অতি সাবধানতার সহিত এ রশ্মির দ্বারা চিকিৎসা করা প্রয়োজন। এই রশ্মি যক্ষার জীবাণুকে দুই মিনিটের মধ্যেই নষ্ট করিতে পারে কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, এই রশ্মির কোন পদার্থ ভেদ করিবার শক্তি নাই। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে এই রশ্মির ভেদ করিবার শক্তির অভাব এত বেশী যে, দুইটি যক্ষার জীবাণু লইয়া যদি একটার উপরে আর একটা রাখা যায় এবং তাহার উপর এই অতি বেগুণি রশ্মি ফেলা যায়, তবে ঐ রশ্মির প্রভাবে মাত্র উপরের জীবাণু নষ্ট হইবে কিন্তু ঐ রশ্মির ভেদ করিয়া যাইবার শক্তি না থাকায় নীচে জীবাণুটি মরে না।

যদিও এই রশ্মির ভেদ করিবার শক্তি নাই তথাপি ইহার অপর এক আশ্চর্য্য শক্তি আছে। এই রশ্মির প্রভাবে কোন অজানিত কারণে শরীরস্থ রক্তের অনিষ্টকর জীবাণু নষ্ট করিবার শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। শরীরে ঐ রশ্মি লাগার পরেও রক্তের এই শক্তি দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকে। ইহা প্রকাশ হওয়ার পরে জীবাণু নষ্ট করার নিশ্চিত উপায় জানা গিয়াছে। এই রশ্মির সাহায্যে স্নায়ুর বেদনা, সায়াটিকা (Sciatica) প্রভৃতি নিশ্চিত আরোগ্য হয় বলিয়া জানা গিয়াছে।

আলোক রশ্মি বিশ্লেষণ করিলে যেমন বেগুণি এক প্রান্তে হয় তেমনি লাল রং অপর প্রান্তে থাকে, কারণ বিশ্লেষণ করা আলোক বেগুণি, নীলাভ, নীল, সবুজ, হরিদ্রা, কমলা রং ও তৎপরে লাল রং। এই লাল রঙের পরেও আরও রঙের রশ্মি আছে এবং তাহাও চক্ষুর অগোচর।

এই লোহিত রশ্মির জিনিষ ভেদ করিবার শক্তি অত্যন্ত বেশী এবং রক্তের উপর ইহার প্রভাবও অত্যন্ত বেশী; যেটুকু স্থানে এই অতি লোহিত রশ্মি লাগে সেই স্থানের উত্তাপ ১১০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে অথচ সমস্ত শরীরের উত্তাপ স্বাভাবিক থাকে। কোন কোন প্রকার রোগে অতি লোহিত রশ্মির এই শক্তি প্রয়োগে অত্যন্ত উপকার হয়। কোন জন্তুকে কোনও প্রকার বিষ সেবন করাইলে সূর্য্যের আলোকে রাখার ফলে আর মৃত্যু মুখে পতিত হয় নাই কিন্তু ঐ বিষ ঐ প্রকার জন্তুকে সেবন করাইয়া সূর্য্যালোকে না রাখায় তাহাদের মৃত্যু হইয়াছে; ইহাতে প্রমাণ হয় যে রক্তের স্থানিক উত্তাপের জন্য ঐ বিষের শক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

আলোক চিকিৎসার মধ্যে একটা আশ্চর্য্য জিনিষ হইল, রৌদ্র লাগিয়া শরীরের বর্ণ কাল হওয়া। এইরূপ হওয়ার জন্য অধিক আলোক লাগিয়া শরীরের অনিষ্ট করিতে পারে না। অনেকে সমুদ্র স্নানে উপকার হয় বলিয়া সমুদ্র স্নান করিতে চাহেন। কিন্তু সমুদ্র স্নান অপেক্ষা সূর্য্যকিরণ ও মুক্ত বায়ুতেই উপকার অধিক হইয়া থাকে এই কথা তাঁহারা জানেন না। সূর্য্যকিরণে এত উপকার হইলেও অতি সাবধানে সূর্য্যকিরণ গাত্রে লাগান উচিত, কারণ অধিকক্ষণ লাগাইলে ইহাতে অনিষ্ট হয়। অধিকক্ষণ সূর্য্যালোকে থাকিয়া এক প্রকার জ্বর হয় কিম্বা সূর্য্যের উত্তাপে থাকিয়া সন্দিগর্ম্মি রোগ হইয়া থাকে। — সঞ্জীবনী।

শাকসব্জী ও আমাদের খাদ্য।

আমরা সাধারণতঃ তরীতরকারী রাঁধিয়াই খাই। অনেক জাতি আছে যাহারা শাকসব্জী বড় একটা খায় না। তাহাদের ভোজন মাংসপ্রধান। আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা ঠিক করিয়াছেন আমাদের ভোজ্য বস্তুর মধ্যে শাকসব্জী বিশেষ দরকারী জিনিষ। সম্প্রতি খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে যে সব পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে জানা গিয়াছে যে, আমাদের খাদ্যের মধ্যে আমাদের স্বাস্থ্যোপযোগী কম পক্ষে তিনটি জিনিষ থাকা দরকার। তাঁহারা এগুলির নাম দিয়াছেন ভাইটামিন। আর ইহাও আজকাল একরকম স্থির হইয়াছে যে, এই ভাইটামিন আমরা উদ্ভিদ জগৎ হইতেই পাই। এই জন্যই তাঁহারা বলেন যে আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে আমাদের খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণে শাকসব্জী থাকা দরকার।

আমাদের দেশের—বিশেষতঃ বাঙ্গালার—লোকে শাকসব্জী যথেষ্টই খাইয়া থাকে। এই নূতন সিদ্ধান্ত তাহাদের খাদ্য প্রণালীকে সমর্থনই করিয়া থাকে। তবে গ্রহণ করিবার রকমে একটু মতভেদ দেখা যায়। আমরা সাধারণতঃ জিনিষগুলি রাঁধিয়া খাই। কিন্তু ইঁহারা বলেন যে, রাঁধিলে জিনিষগুলির গুণ বেশীর ভাগই নষ্ট হইয়া যায়। শাকসব্জী কাঁচা খাওয়াই ভাল।

এই মত সত্য হইলে যে সব জাতির মাংসই প্রধান খাদ্য তাহাদের বিশেষ উপকার হইবে, আর কিঞ্চিৎ উপকার সেই সব প্রাণীকুলের যাহারা মানুষের রসনা তৃপ্তির জন্যই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

শ্রীহরিপদ দাস, বি-এ।

মুক্তি।

[শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু।]

ওগো, বেঁধনা বেঁধনা থাক্ যেথা যায়,
কল কল কল, ছল ছল, স্বরে,
চকিতে বাঁধিলে কঠিন পাথারে,
ভেঙ্গে যাবে দিক্ বদ্ধ আলায়।

ওগো, ফুটিতে দাওগো নিশি অবসানে,
বিলাতে দাওগো গন্ধ-ভার,
রেখ না চাপিয়া সৌরভ তার,—
টুটিয়া মিশিবে মুক্ত পরাণে।

ওগো, ভাসিতে দাওগো আপন সুতান,
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে বিস্ময়,
রেখ না বাঁধিয়া, সুর-তান-লয়,
বদ্ধ আকোরে, ছুটিবে গান।

"পল্লীকুসুম- "শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ"

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২১শ ভাগ] ভাদ্র, ১৩৩১। [৭ম সংখ্যা

আলোচনা।

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত]

রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু, সি, আই, ই মহাশয়ের "খাদ্য" তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের ছাত্রবৃন্দ "উড্ডীয়মান" রাজনীতিজ্ঞদের গোটাকতক স্বরাজ্যের বক্তৃতা শুনিবার লোভ সম্বরণ করিয়া সেই সময়টা "খাদ্য" পাঠে মন দিলে স্বরাজ্য লাভের দিকে জাতিটা অগ্রসর হইবে। জাতীয়তার প্রধান অঙ্গ সুস্থদেহ। বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য দিন দিন ভাঙ্গিতেছে, আর এই ভাঙ্গনের একটা প্রধান কারণ, খাদ্যদ্রব্যের নির্ব্বাচনে অমনোযোগিতা। দুষ্ট, স্বার্থান্ধ ব্যবসায়ীদের কৃপাপাত্র বাঙ্গালী ভদ্রলোক ঘৃতের সহিত বিশ্ব সংসারের সকল জন্তুর চর্ব্বি গলাধঃকরণ করে; ময়দার সহিত পাথর খায়, জলের সহিত পাহাড় পর্ব্বতের টুকরা উদরস্থ করে, আর যে কি ছাই ভস্ম খায় তাহার ফিরিস্তি করিতে গেলে ভূতত্ব, জীবতত্ব প্রভৃতি নানা তত্ব আয়ত্ত করিতে হয়। আর "গবাং পয়ঃ!" দুগ্ধের নামে বাঙ্গালী কি না পান করে? স্বরাজ্য লাভ করিতে হইলে জাতীয়তার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল চাই—এ ধারণাটুকু দেশাত্মবোধ উদ্বোধনের প্রারম্ভেই দেশের কল্যাণকামী নরনারীর মনে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। বসু মহাশয়ের "খাদ্য" পুস্তকখানি বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পঠিত হইলে আমরা পরিতোষ লাভ করিব।

* *

খাদ্যের পর ব্যায়াম। কিশোরদিগের ব্যায়ামের কি ব্যবস্থা দেশ-হিতৈষী বাবুমণ্ডল করিতেছেন? কিশোরীদের কথা তুলিলে তো প্রহারের ব্যবস্থা হইবে, এমন কি বালিকাদিগের পক্ষেও ব্যায়াম বা ক্রীড়া তাহাদের শীলতার পরিপন্থী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। বালকদের কোনও ব্যায়ামের ব্যবস্থা নাই; পাঠ্যপুস্তকের ভারে তাহাদের সহজাত ক্রীড়ার বাসনাও চাপা পড়িয়া যায়। একটু ফুটবলের প্রচলন কলিকাতায় আছে, কিন্তু অর্দ্ধশন ও অনশনক্লিষ্ট ছাত্রের পক্ষে এ ক্রীড়াটা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। ব্যায়ামশালাগুলা এনার্কীর জনন-স্থল সন্দেহে পুলিস মহাপ্রভুরা সম্যকরূপে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ঘরে বসিয়া ডাম-বেল মুগুর সাহায্যে মাংসপেশীকে সবল করা এমন একটা একঘেয়ে নিরানন্দময় অনুষ্ঠান যে, ইহাপেক্ষা যুবকদের হটযোগ বা বেদ পাঠে অধিক প্রবৃত্তি উদ্রেক করা সম্ভবপর। "বয়স্কাউট" কলিকাতায় বালকের পক্ষে একটা ব্যায়াম। কিন্তু তাহার উর্দ্দী ও আসবাব পত্রে কেরাণীনন্দনের পিতৃধন নিঃশেষ হইবার সম্ভাবনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে মাত্র কয়েকটি ছাত্র সখের সেপাই সাজিয়া কুচকাওয়াজ শিখিতে পারে। কিন্তু মোহের দ্বারা মোহ আসে, আলস্য আরও গাঢ় আলস্যের সৃষ্টি করে। অতএব দূর হ'ক ছাই, এ কাজে কে যায়? কিন্তু যখন ছাত্রের

দল "জয়" "জয়" "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিতে গগন পবন ধ্বনিত করে, তখন কি একবারও কেহ তাহাদের বুঝাইয়া বলে না যে জীর্ণ শীর্ণ, প্লীহা-রোগী, কালাজ্বর ভোগীর ভাগ্যে বিজয়লক্ষ্মী কেবল একটা দাসের ব্যবস্থা করেন তাহা—দুঃখ। স্বরাজ-লাভ করিতে গেলে স্বরাজের জন্য পরিশ্রম করিতে হইবে আর পরিশ্রম সম্ভবে না তাহার পক্ষে যাহার হাড়ের ভিতর মজ্জাগত নানা রোগের জীবাণুর বাসা—যাহার ধমনীতে চলাফেরা করে রক্ত নয় জল, যাহার দেহে নাই বল, মনে নাই উৎসাহ, প্রাণে নাই ধর্ম্ম-বুদ্ধি। দেশের স্বাস্থ্যকে প্রধান লক্ষ্য না করিলে এ আঁধার ঘোর কাটিবে না।

* * *

স্বাস্থ্যের পরই শিক্ষা। যে শিক্ষায় মানুষের মনের সেই শক্তিকে জাগরিত করে, যে শিক্ষায় সে জনসমাজে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে পারে এবং যাহার আত্মপ্রতিষ্ঠার ফলে তাহার নিজের সমাজ, তাহার আপনার জাতি, তাহার জননী জন্মভূমি সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে গৌরব ও সমৃদ্ধির উচ্চাসনে। দেশের হিতের জন্য শিল্পী ও শ্রমিকের আবশ্যক হয়—যাহার মধ্যে শ্রম-শিল্পের শক্তি নিহিত তাহার সে শক্তি জাগাইয়া তুলিতে হইবে। চারু শিল্পের প্রসার না হইলে জাতীয় জীবনে সৌন্দর্য্যের পালিস থাকে না। অধিকারী বুঝিয়া চারু-শিল্পী গড়িয়া তুলিতে হইবে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র—জাতিকে বর্ব্বরতার পাশবিকতা হইতে টানিয়া তোলে—পাত্র পাত্রী বুঝিয়া দেশের সন্তানকে উচ্চ শিক্ষা দিতে হইবে। যাহার ভিতর যে শক্তি নিহিত তাহার সেই শক্তির উদ্বোধনই শ্রীগুরুর কার্য্য। কিন্তু যে দেশে আপামর সাধারণের জন্য শিক্ষার একমাত্র বাঁধা রাজপথের ব্যবস্থা, যে দেশের শিক্ষার দৈনন্দিন কাজের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নাই, যে দেশের শিক্ষা—যদি ইহাকে শিক্ষা বলা যায়—কেবল পণ্ডিত-মূর্খের সৃষ্টি করে, সে দেশের শিক্ষা-পদ্ধতির যে আমূল পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক তাহা স্বীকার করে সকলেই। কিন্তু পরিবর্ত্তন করে কে? পরিশ্রম করে কে? এ দুরূহ কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করিবার প্রবৃত্তি বা বাসনা আছে কয় জনের? দুইটা ফাঁকা বক্তৃতা দিলে, মাসিক পত্রিকায় চাঁদের নিঙড়ান জ্যোৎস্নার উপর বা প্রিয়ার অধরোষ্ঠের ব্রীড়া-কম্পনের উপর দুইটা কবিতা লিখিলে যখন সহজে দশজনের একজন হওয়া যায়, "নেতা" হওয়া যায়, তখন কেন বাবা এত ঝঞ্ঝট।

* * *

সামাজিক অনুষ্ঠান! সর্ব্বনাশ! তাহার পরিবর্ত্তনে কি সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের, অনন্তকাল প্রবর্ত্তিত সামাজিক জীবনের হানি করিব? এ পাপ তো আমার দ্বারা সাধিত হইবে না। মোটেই না। কারণ ইহা ফাঁকা আওয়াজে চলিবে না; ধাপ্পাবাজী চালবাজীর দ্বারা সামাজিক অনিষ্টের মূলোচ্ছেদ হইবে না; এ কার্য্যে স্বার্থত্যাগ চাই, আত্ম-বলিদান চাই, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম চাই, বাধা বিপত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিবার শক্তি ও উৎসাহ চাই। যত গোল এই খানে। "মোটা তাকিয়ায় দিয়া ঠেস" যদি মন্ত্রবলে দেশটাকে একেবারে যশের মলয়-পর্ব্বতের চূড়ার উপর তুলিয়া দেওয়া যাইত, দুঃখিনী বঙ্গমাতা আজ এ পঙ্কিল নিম্নাসনে পড়িয়া থাকিতেন না। কিন্তু একটা অন্যায় নিয়ম আছে যে, "উদ্যমেন হি সিদ্ধ্যন্তি কার্য্যানি ন মনোরথৈঃ।" এ সব বিধানগুলা সৃষ্টিকর্ত্তার ভুল। বেচারা বাঙ্গালী করিবে কি?

* * *

কিন্তু যাঁহারা আমাদের সামাজিক পাপগুলার জন্য শাস্ত্রের দোহাই দেন তাঁহাদের বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করি যে বালিকা বধূ নির্য্যাতন বা মেয়ের বাপকে নিঙড়াইয়া পণ আদায় করা কোন্ শাস্ত্রের কোন্ পৃষ্ঠায় আছে? যাহারা জাতির মধ্যে বলিষ্ঠ, কর্ম্মঠ, শ্রমিক—যাহাদের পরিশ্রমে বসুন্ধরা শস্যশ্যামলা হাস্যমুখী, তাহাদের অস্পৃশ্য, ঘৃণ্য, ইতর বলিয়া বর্জ্জনের ব্যবস্থাও কি ধর্ম্মশাস্ত্র সম্মত? "নর-নারায়ণ", "জীবই শিব", "সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান" কথাগুলা কি অশাস্ত্রীয়? মুসলমান দুর্ব্বৃত্তের হস্তে যখন ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ নিগৃহীত হয়, তখন বাগদী নমঃশূদ্র

যদি মুখ টিপিয়া হাসে, তো সে স্মিত-মুখের হাস্য-চপলার জন্য দায়ী কে? ব্রাহ্মণ না নমঃশূদ্র? যাহাকে চিরদিন অস্পৃশ্য চণ্ডাল বলিয়া দূরে সরাইয়া রাখ—বিপদের সময় তাহার সাহায্য চাও কোন্ সাহসে? কত অত্যাচার শান্ত হইত যদি সকল হিন্দু বুঝিত তাহারা এক। তাহাদের সকলের স্বার্থ এক। কত বড় অত্যাচার প্রশমিত হইত যদি সকল বাঙ্গালী—হিন্দু মুসলমান বুঝিত স্বার্থের একতা। কিন্তু গণ্ডী দেওয়া যাহাদের জীবনের সার লক্ষ্য, দূরদৃষ্টির রশ্মি যাহাদের চক্ষে নাই, তাহাদের নিকট কি আশা করা যায়? জীবন-স্রোতের গতি নির্ণয় করে যাহারা পরদার অন্তরাল হইতে, তাহাদের বিচারশক্তি, বিবেচনাশক্তি, জ্ঞান বাড়াইবার কোনও সুব্যবস্থা কি আমরা করি? কত চারু শিল্পের সহজ বাসনা আমাদের মহিলাদের প্রাণের ভিতর "মরে গুমারি গুমারি।" সেগুলার নীরব ভাষা শুনিয়া কি আমাদের গার্হস্থ্য জীবনকে লালিত্য-লেপিত করিবার প্রয়াস পাই? একবার মোহনিদ্রা ছাড়িয়া যদি আমরা শক্তিকে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে কত ইষ্ট হয়। শক্তি শক্তিকে জাগায়, বলে বল আনে।

বিসর্জ্জন।

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(১৩)

শুভ্র জ্যোৎস্নাধৌত যামিনী। যতদূর দৃষ্টি যায়, চাঁদের আলোয় সিক্ত হইয়া ততদূর হাসিতেছে। সামনে প্রবাহিতা গঙ্গা, তাহার ক্ষুদ্র স্রোতগুলির উপর চাঁদের আলো পড়িয়া ঝিকৃমিক্ করিতেছে। নিকটে বড় হেনা গাছটীতে থরে থরে ফুল ফুটিয়া বাতাসে অপূর্ব্ব গন্ধ বিকীর্ণ করিতেছে। ধীরে ধীরে বেল, চামেলি, গন্ধরাজ ফুটিয়া উঠিয়াছে, সব গন্ধ মিলিয়া একটা অভিনব গন্ধ মাঝে মাঝে বহিয়া আনিতেছে। অদূরে মালতী ফুলের কুঞ্জের মাঝে গা লুকাইয়া একটা পাপিয়া চীৎকার করিতেছে, ওপার হইতে আর একটা পাপিয়া তাহার প্রত্যুত্তর দিতেছে।

এই শান্ত রজনীতে কমনীয় বাগানে একটা বেঞ্চে অৰ্দ্ধ শয়ানাবস্থায় পড়িয়া নীল আকাশের পানে চাহিয়া ছিল। প্রকৃতি আজ বড় সুন্দরী, এ সৌন্দর্য্য দেখিবার লোভ সে সামলাইতে পারে নাই। নিস্তব্ধ রজনীতে একাকী শুইয়া পড়িয়া সে ভাবনা করিবার অবকাশ পাইয়াছে। আজ তিন দিন সে আসিয়াছে, নির্জ্জনে চিন্তা করিবার সময় সে একদিনও পায় নাই।

ইতির কষ্ট তাহাকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। বরাবরই কি শান্ত সে! ছোটবেলায় সকলে তাহাকে মারিয়া যাইত, নীরবে সে চোখের জল ফেলিত, একদিনও সে কাহারও কাছে নালিশ করিতে যায় নাই। নিজের দুঃখ সে নিজেই চাপিয়া রাখিত, কখনও কাহারও কাছে প্রকাশ করিত না। অভিমান বরাবরই তাহার প্রবল ছিল, কখনও সে কাহারও নিকটে দীনতা প্রকাশ করিতে পারে নাই। বয়োবৃদ্ধি সহ তাহার সে অভিমান বাড়িয়াছে, নিজেকে সে আরও বেশী করিয়াই গোপনে রাখিতে চায়।

হায়, ইতিকে সে অনায়াসে রক্ষা করিতে পারিত। আজ যে সে তাহার কোমল দেহে সহস্র পদাঘাত সহ্য করিতেছে, সে তো শুধু তাহারই জন্য। ইতিকে গ্রহণ করিয়া সে সুখী হইতে পারিত, ইতির তো কথাই নাই। ইতি প্রাণপণে সে কথা গোপন করিয়া রাখিলেও সে তাহার হৃদয় স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছে। তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য ইতির সে কি ব্যগ্রতা! হায়, ইতিকে কেন সে স্বেচ্ছায় অপরের হাতে তুলিয়া দিল? এ মহাপাপ যে তাহারই, ইহার শাস্তি যে তাহাকেই সহ্য করিতে হইবে।

শুভ্রার সহিত তুলনা করিয়া ইতিকে সে যেমন মহিমাময়ী দেখিতে পাইল, এমন আর কখনও দেখিতে পায় নাই। এই যে মেয়েটী অবাধে সকল কষ্ট সহ্য করিয়া

যাইতেছে, হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেলেও সে মাটীতে লুটাইয়া পড়ে নাই, ইহা বাস্তবিকই বড় কষ্টকর।

খানিকটা পিছনে মালতী-কুঞ্জ মধ্যে একটা কিসের শব্দ শুনা গেল। সঙ্গীতরত পাপিয়াটী হঠাৎ যেন বড় ভয় পাইয়া থামিয়া গেল। কমনীয় সে দিকে মনোযোগ দিল না, কারণ এমন শব্দ প্রায়ই শুনা যায়। বোধ হয় বড় খোকার আদরের কুকুরটা সেখানে আসিয়া শুইয়া পড়িল।

সহসা কাহার দ্রুত পদশব্দে সে এবার সচকিত হইয়া উঠিয়া বসিল, ইতি সেথা হইতে স্বপ্নের মতই ছুটিয়া আসিয়া তাহার সামনে আসিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে মালতী-কুঞ্জ হইতে গুড়ুম করিয়া একটা বন্দুকের আওয়াজ হইল। যে গুলি ছুড়িয়াছিল সে কমনীয়কে লক্ষ্য করিয়াই ছুড়িয়াছিল, কিন্তু ইতি এমন ভাবে কমনীয়ের উপর পড়িল যে সে গুলি কমনীয়ের দেহ স্পর্শ করিতে পারিল না, ইতির বক্ষের বাম দিক বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া আহত বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া ইতি কমনীয়ের পদতলে বেঞ্চের তলে লুটাইয়া পড়িল।

আর্ত্তকণ্ঠে কমনীয় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"ইতি"।

মুহূর্ত্তে সুন্দর প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ঘুচিয়া গেল। বিশ্বের যেখানে যত অন্ধকার গোপনে ছিল, কমনীয়ের সামনে সব প্রকাশ হইয়া পড়িল।

কমনীয় বসিয়া পড়িল, ইতির মাথা কোলে তুলিয়া লইল, ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "এ সর্ব্বনাশ কে করলে ইতি?"

ইতি চোখ মেলিল, অস্ফুট কণ্ঠে বলিল,—"আমার স্বামী।"

সে তাহাকেই হত্যা করিতে আসিয়াছিল, ইতি তাহা জানিতে পারিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে, নিজের জীবনদানে সে কমনীয়কে বাঁচাইল। কমনীয় আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কেন নিজের জীবন দিতে এলে ইতি, সাধ ক'রে কেন মৃত্যু বরণ করলে?"

ইতির কণ্ঠ এড়াইয়া আসিয়াছিল, চক্ষু মুদিয়া আসিতেছিল, তবু সে প্রাণপণে একবার চাহিল, মৃদু কণ্ঠে বলিল—"তোমার জন্যে। মণিকে দেখো, আমি চললুম!"

দুই একবার নড়িয়া সে একেবারেই নীরব হইয়া গেল, ইতির প্রাণ দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া অনন্তে প্রয়াণ করিল। হতভাগ্য কমনীয় তখনও আর্ত্তকণ্ঠে একবার ডাকিয়া উঠিল—"ইতি।" কিন্তু সে আর সাড়া দিল না, সে আর কখনও সাড়া দিবে না!

কমনীয়ের চোখ হইতে দুই ফোঁটা অশ্রুজল ঝরিয়া পরলোকগামিনীর ললাটের উপর পড়িয়া চাঁদের আলোয় মুক্তার মতই জ্বলিতেছিল।

বন্দুকের শব্দ পাইয়া তুষার ও রেখা বাগানে ছুটিয়া আসিল। ব্যাপার দেখিয়া তুষার পথেই দাঁড়াইয়া গেল, আর অগ্রসর হইতে পারিল না। রেখা নিকটে আসিয়া রক্তাক্ত ইতিকে দেখিয়া ভীতা হইয়া বসিয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পরে রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"এ কি হ'ল ঠাকুরপো?"

কমনীয় প্রস্তর মূর্ত্তির মতই বসিয়াছিল, এখন একটা নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে ফেলিয়া বলিল, "আমায় বাঁচাতে ইতির আত্মদান দেখ বউদি। আমার জন্যই আজ প্রাণটা দিল সে!"

তাহার কণ্ঠ কাঁপিয়া গেল।

রেখা বলিল, "কে গুলি করলে?"

দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া কমনীয় বলিল, "ইতির নররাক্ষস স্বামী, একটা রাতের দাবী যে চিরজীবন স্থায়ী ক'রতে এসেছিল। আমাকে খুন করবার জন্যে সে আগে হ'তে বেড়াচ্ছিল, ইতি আমায় বার বার সাবধান করেছে, কিন্তু আমি সাবধান হইনি। এখন ভাবছি, আমি যদি তার কথা শুনতুম, যদি এ দেশে না থাকতুম, ইতি আজ এমন ক'রে প্রাণ হারাত না!"

রেখা নীরবে ইতির পানে চাহিয়া বসিয়াছিল।

আজ কমনীয়ের হৃদয়ের রুদ্ধ আবেগ খুলিয়া গিয়াছিল, সে বলিল, "আমি চিরদিনই উপেক্ষার চোখে দেখে এসেছি একে, কখনও তার হৃদয়টা বুঝবার চেষ্টা করিনি। ইতি আমায় বড় ভালবেসেছিল বউদি, তাই সে আজ আত্মদান ক'রে আমায় বাঁচিয়ে গেল। আজ মনে হ'চ্ছে কেন আমি তাকে গ্রহণ করিনি, তা হ'লে আমিও সুখী হ'তে

পারতুম, সেও সুখী হ'তে পারত। বৌদি, আমি জীবনে যে মহা ভুল করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত সারাজীবন ধ'রে এখন আমায় করতে হবে। আমার জীবনের সুখ শান্তিও আজ ইতির সঙ্গে আমি বিসর্জ্জন দিলুম। যতদিন বাঁচব, এর এই পবিত্র প্রেম, পবিত্র আত্মত্যাগ মনে ক'রে রাখব।"

রুদ্ধকণ্ঠে রেখা বলিল, "আমি ইতিকে অনেকদিন আগে হ'তেই চিনেছি ঠাকুরপো। তার হৃদয়ের তেজ, দর্প, অভিমান বড় বেশী ছিল, সে কিছুতেই কারও কাছে নিজেকে ধরা দেয় নি। জীবনে শান্তি পায় নি সে, বড় শান্তিতে ঘুমিয়েছে। ঘুমাও অভাগিনী, ঘুমাও! প্রার্থনা করি, যদি আবার জন্মগ্রহণ কর, যেন নিজের বাঞ্ছিতকে পেতে পার।"

রেখা মুখখানা লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

* * *

ইহার পর কমনীয় যতদিন বাঁচিয়াছিল, ইতিকে সে ভুলিতে পারে নাই। ইতির কথা উঠিলেই সে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িত, তাহার চোখ জলে পূর্ণ হইয়া যাইত।

ইতি যে দিন মারা যায় তাহার পরদিন হইতে তাহার স্বামীও একেবারে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছিল, অনেক খোঁজ করিয়াও কমনীয় তাহাকে দেখিতে পায় নাই।

মণির ভার সে লইয়াছিল, ইতির শেষ কথা সে প্রাণপণে রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল।

সমাপ্ত।

কাঙ্গাল।

(শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)

আমি যে তাহারে চাই—
প্রেম পাশে থাকি বাঁধা তা'রি সনে,
প্রেম ছবি হৃদে আঁকিয়া যতনে;
ধরিয়া মরমে, গোপন সরমে,
ভরম ভুলিয়া যাই।
এর চেয়ে সুখ নাহি জানি আমি
এই ত আমি রে চাই।
নাহি চাই কিছু আর
মিশায়ে বিরলে প্রাণে প্রাণ তার,
আলাপন রসে, মজি অনিবার,
উথলিবে হৃদে প্রেম পারাবার;
ডুবে রই মাঝে তা'র।

(যেন) ভু'লে যাই সব বাহিরের কথা,
বাহিরের স্মৃতি আর॥
আকাশের গায় চারু শশধর,
হাসিবে উজলি ধরা কতবার,
কত বার সুখে গাহিবে পাখীটী
সোহাগে গগন-গায়।
সেদিকেতে মোর রবে না দৃষ্টি,
মুছে যাবে যাক বিভুর সৃষ্টি,
আমি প্রাণভরে, ভাবিব তাহারে,
সে মোরে না চায়, ক্ষতি কি তায়
প্রেমের কাঙ্গাল আমি যে তাহার
তারে ছাড়া প্রাণ আরে না চায়।

একখানি চিঠি।

[শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল বি-এল্।]

শ্রীচরণকমলেষু,—

প্রিয়তম, আমার চিঠি ছোট হয় বলে' প্রতিবারই তুমি বড় রাগ কর; তাই আজকের এ চিঠিখানিতে আমার আগের সব দোষই আমি পুষিয়ে নিয়েচি। তবে, এ চিঠি প'ড়ে তুমি কতটা সুখী হ'তে পারবে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে অনেকখানি! আজ চারদিন ধ'রে

এই চিঠিখানি লিখেচি; লিখ্‌তে লিখ্‌তে অনেক জায়গায় আমার চোখ ছাপিয়ে জল এসেছে। ভাই, এ চিঠি পেয়ে তুমি আমার ওপর খুসী হবে কি রাগ করবে, হাসবে কি চোখের জল ফেলবে, তা আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিনি।

আমাদের এখানকার পাশের বাড়ীর ইন্দুকে তোমার মনে পড়ে বোধ হয়? সেই একদিন পূর্ণিমা রাতে ছাদে চাঁদের আলোয় তারা স্বামী-স্ত্রীতে হাত ধরাধরি ক'রে বেড়াচ্ছিল, আমি জানলা দিয়ে চুপি চুপি তোমায় দেখিয়েছিলুম; তুমি হিংসে ক'রে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলে,—চাঁদের আলোটা ওরাই ভোগ ক'রে নিলে; মনে পড়ে না?

সে আজ অনেক দিনের কথা; বোধ হয় ছ' সাত বচ্ছর হবে, না? ইন্দুর বয়স এখন ২১।২২ হবে। এবার বাপের বাড়ী এসে যখন প্রথম তাকে দেখ্‌লুম, তখন যেন তাকে বড়ই ফ্যাকাশে আর রোগা ব'লে মনে হ'ল! আমি জিজ্ঞেস করায় শুধু একটু হেসে বল্লে, 'আর কি বল ভাই, যেতে পারলেই হয়! কুড়ি পেরুলেই বুড়ী, এটা তো আর একেবারেই মিছে কথা নয়!' আমি হেসে বল্‌লুম, 'সত্যি? এরি মধ্যে বুড়ী? তবু যদি দু'চারটে ছেলে মেয়ে পেটে ধরতে হো'ত।'

সে শুধু মুচ্‌কি হাস্‌লে; এবং সেই হাসিটুকু নিভ্‌তে না নিভ্‌তে তার মুখখানা কেমন অন্ধকার হ'য়ে উঠ্‌ল। কি বল্‌তে যাচ্ছিলুম, কিন্তু তার পানে তাকিয়েই রীতিমত থমকে পড়লুম। ইন্দুর দুটী চোখের কোণ জলে ভ'রে উঠেচে ব'লে মনে হোল! সে আমাকে আর কিছু বল্‌তে না দিয়েই কাজের অছিলা ক'রে নীচে নেমে গেল।

এই খট্‌কাটুকু কিন্তু আমার কিছুতেই গেল না। অবসরে-অনবসরে যখন-তখন এসে আমি জানালা হ'তে মুখ বাড়িয়ে তাদের বাড়ীর যতটা দেখা যায়, কেবল ইন্দুর খোঁজ ক'রেছি; কিন্তু একটিবারও তার দেখা পাইনি। মনে হোত, যেন সে ইচ্ছা ক'রেই আমার সঙ্গে দেখা করচে না!

হঠাৎ সেদিন দুপুরবেলা যা' শুন্‌লুম, তাতেই আমার মনের আঁধার অনেকটা কেটে গেল। ইন্দুর শাশুড়ী মাকে বল্‌চেন,—'কর্ত্তা তোমাদের নেমন্তন্নপত্তর দিয়ে আসবেন; তা' ভাই আসা চাই কিন্তু! আমাদের বাড়ীতে লোক-জন ত' দেখ্‌চ; তোমরা এসে একটু আমায় সাহায্য করলে আমার অনেক ভরসা।'

মাকে জিজ্ঞাসা করলুম; তিনি বল্লেন,—ওদের ছেলের বিয়ে যে! প্রথমটা বুঝ্‌তে পারলুম না; কেন না, ইন্দুর স্বামী পরেশবাবু মায়ের একটী মাত্র ছেলে। মা হেসে বল্লেন,—বুঝ্‌তে পারলিনি বুঝি? ওদের এ বউটা বাঁজা কি না, তাই ছেলের আবার বিয়ে হচ্ছে। ছেলে প্রথমে রাজী হয়নি; এখন নাকি বউ মত দেওয়ায় রাজী হয়েচে। বউটাও খুব ভাল।

আমি আর কোন কথা না বলে' উঠে এলুম! প্রথমটা ঐ ইন্দুর ওপর এমনি রাগ হোল, কি বল্‌বো! তাদের বাড়ীর পানে চেয়ে চেয়ে অনেকক্ষণ তার খোঁজ করলুম; বোধ হয় তখন তার দেখা পেলে খুব একচোট ঝগড়া করতুম তার সঙ্গে! তারপর কিন্তু নিজের মনেই অনেকটা নরম হ'য়ে এলুম, যখন মনে হ'ল স্বামীর বিয়েতে ইন্দুর এই সম্মতি দেওয়ার দামই বা কি! বাড়ীর সবাই মিলে যখন ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে তারই বিরুদ্ধে এতবড় একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলেচে, তখন তার ঐ একরত্তি মতটুকু না দিয়েই কি সে ছাড়ান্ পেয়ে যাবে? তাই, সে নিজের এই মরণ-যজ্ঞে আহুতি দেবার ভারটুকু নিজের ওপরই তুলে নিয়েছে।

কালই নাকি বিয়ে! তা' হ'লে ইন্দু বোধ হয় নিজে হাতে স্বামীকে বরণ ক'রে সতীন আনতে পাঠাবে! মনে মনে ভাবলুম, নভেলে সূর্য্যমুখীর কথা পড়েচি, এবার ভগবান বুঝি সাক্ষাৎ এক সূর্য্যমুখী দেখিয়ে দিলেন।

* * *

আজ সকাল থেকেই আমি কেবল পাশের বাড়ীর দিকে চেয়ে আছি। ইন্দুর ননদ একখানা সাদা গরদ প'রে কেবল নীচে-ওপর ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্চে, আর মাঝে মাঝে এটা-ওটা ধরে ইন্দুকে উদ্দেশ ক'রে ধমক দিচ্ছে। মা আমাকে ডেকে বল্লেন, 'আয়, চুলটা একটু আঁচড়ে দিই;

পরেশের বাবা কাল এসে বড়ই ব্যগ্রতা ক'রে ব'লে গেছেন।' আমার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত জ্ব'লে উঠ্‌ল। মাকে শুধু বললুম, আমি যাবো না মা, তোমরা যাও। মা বোধ করি মেয়ের মনের ভাব একটু বুঝেছিলেন, তাই তিনি বেশী পেড়াপীড়ি অনর্থক জেনে পিসীমাকে নিয়ে ও-বাড়ী চ'লে গেলেন।

কেন বল্‌তে পারি না, আমার সারা মন যেন কেমন বিষিয়ে উঠেচে। তুমি হয় ত' রাগ করবে, কিন্তু আজ তোমাদের পুরুষ জাতটার ওপর আমার যা-কিছু শ্রদ্ধা ছিল সব যেন হারিয়ে ফেল্‌চি! তোমার কি মত, আমি জানি না; ঐ পরেশের অবস্থায় পড়্‌লে তুমিও কি করতে ঠিক বল্‌তে পারি না; কিন্তু আমার মনে হচ্চে, এ সম্বন্ধে আমার নিজের মতটাকে গ'ড়ে পিটে পরের মনোমত ক'রে নিতে কিছুতেই পারি না, এমন কি স্বামীরও না! আজ আমার বুকের ভেতর তর্ক করবার, ঝগ্‌ড়া করবার এত বড় ইচ্ছা হচ্চে যে, কেবলই মনে হচ্চে আজ যদি তুমি আমার কাছে থাক্‌তে!

আচ্ছা, সত্যি বলতো, তোমাদের কাছে আমাদের দাম কি শুধুই এইটুকু? আজ ঐ পুরোণো অকেজো বউটাকে ফেলে ঐ নির্লজ্জ লোকটা এত জাঁকজমক ক'রে সেজেগুজে বন্ধুবান্ধব নিয়ে যে নতুন বউটাকে নিয়ে আস্‌তে যাচ্চে, এতে যাকে ফেলে চল্‌লো আর যে আস্‌চে, দুজনেরই অপমান কি সমান নয়? আমার ত দেখে শুনে মনে হচ্চে, এ অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে মেয়েমানুষের এ সৃষ্টি থেকে মুছে যেতে পারাই সব চেয়ে ভাল, সব চেয়ে উচিত!

হয়ত' তুমি মনে মনে ভাব্‌বে, এটা কেবল এ যুগের হাওয়া, যাকে তোমরা ইংরেজী হাওয়া বল! বল্‌তে পারি না; কেন না, ইংরেজী আমি পড়িনি; কিন্তু, সত্যিই যদি তাই হয়, তা হ'লে বল্‌বো—ইংরেজী হাওয়া অন্ততঃ এটুকু উপকার আমার করেচে যে, আজ এই কথাগুলো মনের ভেতর চেপে চেপে না রেখে অন্ততঃ স্বামীর কাছেও মুখ ফুটে বল্‌বার সাহস হয়েচে! এ কথা আমি কিছুতেই মানিনে যে, ঐ ইন্দু স্বামীর এই ব্যভিচারে মত দিয়েচে ব'লেই মনটাকেও তার একেবারে অতখানি দেবতার মত উদার ক'রে ফেল্‌তে পেরেচে! তবে, মুখ ফুটে বল্‌তে পারেনি, কেন না, মাঝখানে শাস্ত্র, মাঝখানে পুরুষের কড়া হুকুম!

যাক্‌, তারপর শোন। শুধুই যে এ মালা-বদলের বিয়ে, তা' নয়; সদর দরজায় রীতিমত সানাই বসেচে! ছেলের বিয়েতে মায়ের সাধ। কাজেই, ছেলে আর কি রকম ক'রে টুঁ শব্দটী করবে! তাই মনে হয়, এম্‌নি মাতৃভক্ত যদি ছেলেরা অন্য বিষয়েও হোত, তা' হ'লে সংসারে অনেক কাজ হোত। নয় কি?

বর-বরযাত্রী সব চ'লে গিয়েচে। ও বাড়ীটা সব যেন নিঝুম! মাঝে মাঝে ইন্দুর ননদের ছেলেমেয়েদের চীৎকার শোনা যাচ্চে। মা পিসীমা ওখান থেকে ফিরে এসেচেন; আমায় বল্‌লেন, তুই গেলি নে, ইন্দু কতবার জিজ্ঞাসা কর্‌লে!

আমার এমনি রাগ হ'ল! আস্তে আস্তে উঠে ছাদে গেলুম। চাঁদের আলোয় আকাশ ভেসে গিয়েচে! স্থির দৃষ্টিতে চাঁদের পানে চেয়ে রইলুম। মনে অনেক দিনের অনেক স্মৃতি জেগে উঠ্‌ল! কিন্তু আজ মনে হ'ল—সে সব মিথ্যা, সব ভুয়ো! এ জগতে পুরুষ আর নারীর মধ্যে ভালবাসা কোনোকালেই হয় নি, কোনোকালেই হবে না! ভালবাসার জায়গা এ পৃথিবী নয়! পুরুষ ভালবাসার কিছুই জানে না!

হঠাৎ পায়ের খস্‌ খস্‌ শব্দে চমকে উঠ্‌লুম। ফিরে দেখি, আমাদের আর ইন্দুদের বাড়ীর ছাদের মাঝখানে যে সরু আড়ালটুকু ছিল, সেটা ডিঙ্গিয়ে ইন্দু চুপি চুপি আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েচে! আমি তাড়াতাড়ি তার হাতদুখানা চেপে ধরতে সে আমার কাণে কাণে বল্‌লে,—গোল ক'রো না ভাই, লুকিয়ে এসেচি!

আমরা দুজনে ছাদের একটা ধার আঁচল দিয়ে ঝেড়ে ঝুড়ে নিয়ে সেই চাঁদের আলোয় শুয়ে পড়্‌লুম। আমি কিছু বল্‌বার আগেই ইন্দু বল্‌লে,—তুমি গেলে না যে?

বল্‌লুম,—কোথায়? তোমার বরের 'নিকে' দেখতে? দূর্‌!

আমি একটু চুপ ক'রে থেকে ব'লে ফেল্‌লুম, তা যে

যা করে করুক্‌, নিজের এ সর্ব্বনাশে তুমি মত দিলে কি ভেবে ?

ইন্দু অনেকক্ষণ চুপ ক'রে চাঁদের পানে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তারপর বল্‌লে, কেন বাধা দোব ভাই! একদিন ভালবাস্‌ত, আজ যদি ভালবাসার দাবী সত্যিই হারিয়ে থাকি, বুঝে-সুঝে কেন বাধা দোব!

আমার মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না। দু'চোখ জলে ভ'রে এল। ইন্দু একে একে অনেক কথা আমায় ব'লে গেল। আমি কোন কথা না ব'লে শুনতে লাগলুম। আহা, বেচারী! এখনো ওর বিশ্বাস, ওর জিনিস ওরই রইল; শুধু অপরে একটু তার অংশ নেবে বইত' নয়!

সিঁড়ির কাছে কার পায়ের শব্দ শুনে ইন্দু গায়ের কাপড় মাথায় টেনেটুনে উঠে বস্‌ল।

কে, সুধা বুঝি এখনো শুয়ে আছিস্‌ এখানে?—ব'লে ছোড়দা ছাদের একধারে আল্‌সের কাছে দাঁড়ালেন। তিনিও পরেশবাবুর বিয়ে দিতে গিয়েছিলেন; বোধ হয় এইমাত্র ফিরে আস্‌চেন!

ছোড়দা বল্‌লেন,—জান্‌লি সুধা, পরেশবাবুর কি বিয়ের ধুম! ক'নের বাড়ীতে এখন বর-ক'নে দু'জনের রীতিমত গানের আড়াআড়ি চলেছে! যাহোক্‌, পরেশবাবু যেমন গাইয়ে, তেমনি গাইয়ে বউটীও জুটেছে মনের মতন!—ও কে রে?

ছোড়দা বোধ হয় এতক্ষণ ইন্দুকে লক্ষ্য করেন নি; এখন আমার পানে ফিরে ইন্দুকে দেখেই ছোড়দা থেমে গেলেন। ইন্দু যেন হঠাৎ আমার গায়ের ওপর নেতিয়ে পড়ল। মাথাটা তার গড়িয়ে মেঝের পড়তে আমি তাড়াতাড়ি তার মুখের ঘোমটাটুকু খুলে দেখি, সে মূর্চ্ছা গিয়েছে!!

* * *

আমার চিঠি পেয়ে যা'ই তুমি মনে কর, রাগ ক'রে যেন চুপ ক'রে থেকো না। শীগ্‌গীর তুমি এখানে এসে আমায় নিয়ে যেও। এখানে আর আমি থাক্‌তে পার্‌বো না। পাশের বাড়ীটার দিকে আমি আর মোটেই চাইতে পারি না। মনে হয়, ও-দিক্‌টায় বিষ মাখানো আছে, আমার ধাতে সহ্য হ'চ্ছে না! ইতি—

তোমার সুধা।

সুখী প্রাণ।

(৺হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

গান গেয়ে বেড়াব ঘুরে—
কেবলি গাহিব হেসে।
চুমো দেব প্রাণের সুরে—
প্রাণ চুম্বনের শেষে॥

বাধা তায় দিওনা কেহ,
পড়িব তা'হলে মারা।
বেঁচে আছে আমার দেহ
তাহার তরেই হারা,
চুম্বনটীর পারা॥

মাসিক পত্রিকা।

[শ্রীসুরেন্দ্রলাল মিত্র।]

বাবু রাজনারায়ণ বসু তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"বিদ্যাসাগরের ইদানীন্তন ভাষা যেরূপ সহজ, কোমল ও মসৃণ হইয়াছে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। তিনি সংস্কৃত শব্দ-বহুল সাধুভাষা ব্যবহার করাতে শ্রীযুক্ত রাধানাথ সিকদার ও শ্রীযুক্ত প্যারীচাঁদ মিত্র বিরক্ত হইয়া ১৮১৪ সালে অপভাষায় লিখিত একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। উহার নাম "মাসিক পত্রিকা"।

এই মাসিক পত্রিকা ১৮৫৪ আগষ্ট হইতে ১৮৫৭ জুলাই পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। মাসে এক এক খণ্ড করিয়া প্রকাশিত হইত ও সাধারণে কিনিয়া পাঠ করিবে বলিয়া প্রতি খণ্ডের মূল্য এক আনা হিসাবে ছিল। পাদ্রি লং সাহেব (Reverend J. Long) ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে Descriptive catalogue of Bengali Books প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তিনি উহাতে এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—

"Masik Patrika—by Pearychand Mitra and Radha Nath Sikdar written in colloquial Bengali to enlighten women and the common people. The Government has lately subscribed for 500 copies for Bengal and Assam. It advocates female education, the abolition of various superstitious practices among Hindus, gives historical anecdotes and dialogues on various useful subjects."

(মাসিক পত্রিকা—মহিলা ও সাধারণ লোকদিগের শিক্ষার্থে চলিত ভাষায় প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ সিকদার কর্ত্তৃক লিখিত। ইদানিং বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশের জন্য গভর্মেণ্ট ৫০০ কাপির গ্রাহক হইয়াছেন। ইহাতে স্ত্রীশিক্ষা, হিন্দুদিগের নানান কুসংস্কার ত্যাগ, ঐতিহাসিক গল্প ও নানাপ্রকার ব্যবহারযোগী কথোপকথন লিখিত হয়।)

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে লং সাহেব একখানি Return পুস্তিকা * প্রকাশ করিয়াছিলেন। "মাসিক পত্রিকা" সম্বন্ধে এই পুস্তিকার স্থানে স্থানে লিখিত আছে:—

The advocates of social reform have, during the last four years, published a monthly periodical the *Masik Patrika*, which, in simple language, adapted to the capacity of the ingnorant, points out various social evils among Hindus, and in the form of popular tales recommends many measures of improvement (Page V).

The editor of the Masik Patrika, a monthly magazine, has adopted the colloquial style —very good for females and others who have never learned through their mother tongue—but this is not the style of books generally acceptable,as natives consider language ought to have some elegance and not the boldness of the bazar. This latter style has not been answered, though the editors Peary Chand Mitra and Radha Nath Sikdar devoted much time and zeal to popularize it. (Page XVIII).

Masik Patrika—A monthly magazine to advocate social reforms. Printing 750 copies monthly.

নিম্নে ফুট নোটে—Written in a colloquial style to level the capacity of women—by means of tales, dialogues, remarks. It is very useful (Page 39).

(গত চারি বৎসরাবধি সমাজ সংস্কারকেরা অজ্ঞ লোকদিগের বোধগম্য চলিত ভাষায় "মাসিক পত্রিকা" নামক একখানি মাসিক সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত করিতেছেন। ইহাতে হিন্দুদিগের মধ্যে নানা সামাজিক কুপ্রথা এবং লোকরঞ্জক গল্প দ্বারা সামাজিক উন্নতির কথা বর্ণিত হয়)।

---

*, পুস্তিকাখানির সম্পূর্ণ নাম:—A Return relating to publications in the Bengali language in 1857 with a notice of the past condition and future prospects of the Vernacular Press of Bengal, submitted to Government by Rev. J. Long 1859.

"মাসিক পত্রিকা" নামক সাময়িকের সম্পাদক চলিত বাঙ্গালা ভাষা অবলম্বন করিয়াছেন, এই ভাষা ললনা ও যাহারা মাতৃভাষা বিশেষ পারদর্শী নহেন তাহাদিগের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। কিন্তু এইরূপ লিখিবার ধারা সাধারণের পছন্দ নহে কারণ দেশীয় লোকদিগের ধারণা যে ভাষায় কিছু চারুতা থাকা প্রয়োজন, এরূপ বাজারে প্রগলভ হওয়া উচিত নহে। এই চলিত ভাষা কেহই সঙ্গত বিবেচনা করেন না এবং সম্পাদকদ্বয় (রাধানাথ সিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্র) লোকসাধারণের প্রিয় করিবার জন্য আগ্রহের সহিত তাঁহাদের কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন।

মাসিক পত্রিকা—সামাজিক সংস্কার সমর্থন উপযোগী মাসিক সাময়িক। মাসে ৭৫০ খানি ছাপা হয়। আখ্যায়িকা কথোপকথন ও মন্তব্য দ্বারা নারীদিগের সামর্থ্য উচ্চ করিবার জন্য সাধারণ কথিত ভাষায় লিখিত। এই পত্রিকা বিশেষ হিতকারী।

মাসিক পত্রিকার প্রতি সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইত :—

"এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই। প্রতি মাসে এক এক নম্বর প্রকাশ হইবেক তাহার মূল্য এক আনা মাত্র।"

পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সকল কাহার লিখিত তাহা এখন জানিবার উপায় নাই। তবে তখনকার সময়ে পরিচালকদ্বয়ই যে প্রায়ই সব গুলিই লিখিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। পূজ্যপাদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে যে সব প্রবন্ধে গ্রীক ও রোমক জাতির বীর্য্য ও সাহসের আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে, সেগুলি রাধানাথ সিকদারের লেখনী-প্রসূত। ১২৯১ সালের আর্য্যদর্শনে রাধানাথ সিকদারের জীবনী বাহির হইয়াছিল। উহাতে ঐরূপ কোনও উল্লেখ নাই। এমন কি রাধানাথ সিকদার কোনও বাঙ্গালা পুস্তক লিখিয়া যান নাই। আমাদের বোধ হয় প্রবন্ধ সকলের আভাষ ও ভাব রাধানাথের, কিন্তু প্যারীচাঁদের লেখনী-প্রসূত।

"মাসিক পত্রিকায়" প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল সপ্তবিংশতি অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে আরও তিন অধ্যায় যোগ করিয়া তিনি ১২৬৪ সালের শেষ ভাগে গ্রন্থকারের নাম টেকচাঁদ ঠাকুর পরিচয় দিয়া প্রকাশ করেন। এতৎ ব্যতীত তাঁহার প্রকাশিত আরও কতক প্রবন্ধ তাঁহার "মদ খাওয়া বড় দায়" ও "রামারঞ্জিকা" স্থান পাইয়াছে।

পত্রিকার শীর্ষদেশে লিখিত হইত প্রবন্ধগুলি সাধারণ চলিত ভাষায় প্রকাশিত হইবে। তখন বাঙ্গালা ভাষার পন্থ সংস্কৃতানুসারিণী ছিল। কিন্তু "মাসিক পত্রিকা" যুগ প্রবর্ত্তক হইল। এক সময়ে তারাশঙ্কর পণ্ডিত মহাশয় "কাদম্বরী" লিখিয়া পণ্ডিতি ভাষার চূড়ান্ত দেখাইয়াছিলেন। তিনিই অন্য প্রবন্ধে চলিত ভাষায় লিখিয়া ডেভিড হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড (David Hare Prize Fund) হইতে পারিশ্রমিক পাইয়াছিলেন। (বেঙ্গল হরকরা। ৪ জুন ১৮৪৯) এই হেয়ার প্রাইজ ফণ্ডের প্রবর্ত্তক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি মহোদয়েরা ছিলেন।

সে সময়ে খৃষ্টান লেখকেরা সময়ে সময়ে বাঙ্গালা মাসিকপত্র প্রকাশ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের বিদ্বেষ ভাব ও খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের চর্চ্চা করিতেন। "তত্ত্ববোধিনী"তে ধর্ম্ম সাহিত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোচনা হইত, কিন্তু সেগুলি উচ্চ অঙ্গের প্রবন্ধ ছিল, সাধারণ বোধগম্য নহে। কলিকাতার ধর্ম্মসভার প্রকাশিত একখানি সাময়িক ছিল, তাহা প্রাচীন পথাবলম্বী হিন্দুদিগেরও তাহাতে কেবল "দলাদলি" কথা থাকিত। সরল সহজ ও চলিত ভাষা কেবল "মাসিক পত্রিকায়" ব্যবহার হইত এবং বিলাতী পেনী ম্যাগাজিনের (Penny Magazine) ন্যায় মূল্যও সুলভ ছিল।

তিন বৎসর চালাইয়া ১৮৫৭ জুলাই মাসের পর হইতে এই সাময়িকখানি বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু ইহার অভাব শিক্ষিত সম্প্রদায় বিশেষ অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার ফল হইয়াছিল—বিবিধার্থ সংগ্রহ। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে ইহার অনুষ্ঠান পত্র বেঙ্গল হরকরা সংবাদপত্রে প্রকাশিত ও তাহার পর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ভার্নিকুলার লিটারেচর

সোসাইটি (Vernacular Literature Society) স্থাপিত হইয়াছিল এবং ঐ পত্রিকাখানি তাঁহাদের কীর্ত্তি কিন্তু ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার সম্পাদক ছিলেন।

"মাসিক পত্রিকা"কে সর্ব্বাঙ্গীন করিবার জন্য ঈশ্বর উপাসনার কথা, সামাজিক প্রথা, ইতিহাস, জীবনী, আখ্যায়িকা প্রভৃতি প্রকাশিত হইত। ডিমাই ১২ পৃষ্ঠা থাকিত। প্রত্যেক খণ্ডে ইংরাজি ও বাঙ্গালা প্রকাশ তারিখ থাকিত। আমরা তৃতীয় ভাগের প্রথম সংখ্যার প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত করিলাম। কেবল ইহাতে আলালের ঘরের দুলালের অষ্টাদশ অধ্যায় ছিল তাহা বর্জ্জিত করিলাম। ইহাতে বর্ণাশুদ্ধি ও ছেদ প্রভৃতির কোনও পরিবর্ত্তন করিলাম না, তবে সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য (Proper noun) সকল বড় হরপে ছিল তাহা এক্ষণে প্রচলিত নহে বলিয়া এক সমান অক্ষরে দিয়াছি।

—১—

পরমেশ্বরের নিকটে কি বলে ধনের জন্যে আরাধনা করা কর্ত্তব্য।

শিবচন্দ্র, তুমি সর্ব্বদা পরমেশ্বরের নিকটে বিষয় আশয়ের বৃদ্ধির জন্যে প্রার্থনা কর কেন? বিষয় আশয় বাড়িলে তোমার ত সুখ বাড়িবেক না। দেখ, রামহরি চক্রবর্ত্তী, প্রত্যহ তিনি বরাহনগর থেকে কলিকাতায় হাঁটিয়া আসিয়া কুঠী করেন, এক্ষণে তাঁহার সত্তর বৎসর বয়েস, তথাচ তিনি এক দিবসের জন্যে পীড়া কি জানেন না। আরো দেখ হরকালী, তিনি কলিকাতার মধ্যে একজন বড় বড় মানুষ, থাকেন বড় মানুষের মতন। রাত্রে শুইবার সময়ে দুইজন চাকরে হাত পা টিপিয়া দেয়। সকালে তাঁহাকে চাকরে তেল মাখাইয়া নাওয়াইয়া দেয়। তিনি দুই পাও হাঁটেন না, কোন স্থানে যাইতে হইলে, হয় পাল্‌কি নয় গাড়ী করিয়া যান। এইরূপে হরকালী থাকেন বটে, কিন্তু এক দিবসের জন্যে শরীরের আরাম কি, তাহা তিনি জানেন না; কাল তাঁহার পেটের ব্যারাম হইয়াছিল, আজ তাঁহার মাথা ধরিয়াছে, কাল হয় তো সর্দ্দি কিম্বা আর কোন ব্যারাম উপস্থিত হইবেক। বড় মানুষ হইলেই আলস্যে হয়, আলস্যে হইলেই সর্ব্বপ্রকার শারিরীক পীড়া জন্মে। এইজন্যে বড় মানুষ হইবার আকাঙ্খা করা জ্ঞানির কর্ম্ম নয়।

শিবচন্দ্র, তুমি পরমেশ্বরের নিকটে ধনের জন্যে আরাধনা কর বটে, কিন্তু ধন হইলে তোমার কি হইবেক, তাহা তো তুমি জান না। ধন হইলে তোমার ভালও হইতে পারে, মন্দও হইতে পারে। হয় তো ধন হইলে তুমি আলসে হইয়া চিররোগী হইবে, হয় তো তোমার ছেলেরা খারাপ হইয়া যাইবেক, এই সকল বড় বিষম আপদ বলিতে হইবেক। এই নিমিত্তে যদি ধনের জন্যে পরমেশ্বরের নিকটে আরাধনা করিতে চাও, তবে এই বলিয়া আরাধনা কর, তাহাতে হানি নাই—হে পরমেশ্বর, যদি ধন হইলে আমার ভাল হয়, তবে ধন দিবেন, তাহা না হইলে ধন দিবেন না, ধনের জন্যে প্রার্থনা করিলেও দিবেন না।

—•—

মেকসিকো দেশের নরবলির কথা।

কলিকাতায় মার্কিণ নামে কতকগুলিন সওদাগরের কুঠী আছে। যে দেশ থেকে মার্কিণ সওদাগরেরা আইসে, তাহার দক্ষিণ ও পশ্চিমদিগে মেকসিকো নামে এক দেশ আছে। তিন চারিশত বৎসর হইল, মেকসিকো দেশে প্রতি বৎসর কম্‌বেস ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার নরবলি হইত। সে নরবলি কেমন করে হইত, বলি শুন।

মেকসিকো বাসিরা লড়াই করিতে যাইত। লড়াইয়ে জয়ী হইলে বিপক্ষদিগের যে যে লোক বেঁচে থাকিত, মেকসিকোবাসীরা তাহাকে ধরিয়া খুন করিত না, কয়েদ করিত। লড়াইয়ে লওয়া কয়েদিদিগের মধ্যে যে যে পুরুষ সুশ্রী সুন্দর হইত, অথচ তাহাদিগের গায়ে কোন দাগ টাগ নাই, এমন সব পুরুষ পাইলেই মেক্‌সিকোবাসিরা বলিদানের জন্যে রাখিত। যেন একজন সুন্দর পুরুষ বলিদানের জন্য পসন্দ হইল, তাঁহাকে মেক্‌সিকো বাসিরা দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিত। ক্রমাগত এগার মাস তাঁহাকে ভাল কাপড় চোপড় পরিতে দিত, তাঁহাকে ভাল খাওয়া দাওয়া দিত, তাঁহার মাথায় ও গলায় ভাল ভাল ফুলের মালা বাঁধিয়া দিত, তাঁহার থাকিবার ঘরে ধুনা জ্বালাইত সুগন্ধের জন্যে,

তাঁহার হাতে সর্ব্বদা একটা বাদ্যযন্ত্র থাকিত; ইচ্ছা হইলেই সে যন্ত্র বাজাইয়া সুন্দর পুরুষ গান করিতেন। যে সময়ে সুন্দর পুরুষ বাহিরে বেরুতেন, তাঁহার সঙ্গে অনেক ভাল ভাল পোষাক পরা চাকর বাকর যাইত। পথে তাঁহাকে দেখিলেই লোকজনে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ করিত। এই প্রকারে ভাল খাইয়া, পরিয়া, সর্ব্বত্রে দেবতার তুল্য পূজিত হইয়া, সুন্দর পুরুষ এগার মাস কাটাইতেন। পরে বার মাসের পহিলা তারিখে চারিজন পরম সুন্দরী কুমারী মেয়ের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইত। এই যে মাসটা তিনি পরম সুখে যাপন করিতেন। চারিজন পত্নীর সহিত আহ্লাদ আমোদ লীলা করিতেন। দেশের মধ্যে বড় বড় লোকেরা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরম যত্ন পূর্ব্বক খাওয়াইতেন। তিনি যে বাড়ীতে থাকিতেন, সেখানে প্রত্যহ দিবারাত্রি নাচ, গীত, বাজনা হইত।

বার মাস হইয়া গেল, তের মাসের প্রথম দিবস বলিদানের দিন, সে দিবস মন্দিরের চতুর্দ্দিগে শত সহস্র লোক ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহারা সকলেই মন্দিরের পানে চাহিয়া আছে। মেক্সিকো দেশের মন্দির এদেশের মন্দিরের মত নয়, সে মন্দির রথের মতন, পাঁচ ছয় তালা উচ্চ, চারিদিগে খোলা। সিঁড়ি মন্দিরের বাহিরে চারিদিকে ঘুরিয়া উঠিতে হয়। সিঁড়ির উপরে কিম্বা মন্দিরের ভিতরে লোক জন থাকিলে, তাহাদিগকে বাহিরের লোক স্পষ্ট দেখিতে পায়। লোকজনে ভিড় করিয়া মন্দির পানে চাহিয়া আছে, এমন সময় সুন্দর পুরুষ চারিজন পত্নীর ঠাঁই বিদায় লইয়া বাহিরে আইসেন, ধীরে সুস্থে সিঁড়ির উপরে উঠেন, সে সময়ে হয় তো গায়ের কাপড় খানা কিম্বা গলার মালা গাছটা লইয়া ভিড়ের মধ্যে ফেলিয়া দেন। মনে ভাবেন,—আর আমি এসব জিনিষ লইয়া কি করিব, আমার পক্ষে সুখ দুঃখ কি, এই আমার শেষ দিন, মন্দিরের উপর উঠিবামাত্র মারা পড়িব। সুন্দর পুরুষ মন্দিরের উপর উঠিলে ছয়জন পুরোহিত তাঁহাকে ধরিয়া দেবতার নিকটে লইয়া যান। দেবতার সম্মুখে একখানা মস্ত পাথর পড়ে থাকে। পুরোহিতেরা সুন্দর পুরুষকে পাথরের উপর চিৎ করে শোয়াইয়া দুইজন পুরোহিত দুই পা ধরেন, দুইজন পুরোহিত দুই হাত ধরেন, একজন পুরোহিত মাথা ধরেন। এই প্রকারে পাঁচজন পুরোহিত সুন্দর পুরুষকে পাথরের উপর চেপে ধরিলে, প্রধান পুরোহিত রক্তবর্ণের কাপড় পরিয়া একখানা বড় চকমকে ধারওয়ালা খুব হাতে করেন। খুর লইয়া সুন্দর পুরুষের এক দিগে দাঁড়াইয়া তাঁহার বুকটা চিরিয়া ফেলেন, পরে তাহার ভিতরে হাত দিয়া পেট থেকে অন্তঃকরণটা বাহির করিয়া একবার সূর্য্যপানে দেখাইয়া দেবতার সম্মুখে রাখিয়া দেন। মেক্সিকো দেশে এই রকমে নরবলি হইত। বলিদান হইবার সময়ে শত সহস্র লোক যাহারা বলিদান দেখিতে আসিত, তাহারা সকলেই গড়াগড়ি দিয়া দেবতাকে দণ্ডবৎ করিত।

দিনের বেলা নরবলি হইত, রাত্রে সে মাংস রন্ধন করিয়া বড় বড় ভদ্র পরিবারেরা আহ্লাদ আমোদ করিয়া আহার করিত।

—•—

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

কোন এক দেশে এক ওমরায়ের বিবাহ হইবেক বলিয়া বড় এক খানা প্রস্তুত হইতেছিল। খানার জন্যে সকল জিনিষপত্র পাওয়া যায়, কিন্তু মাছ পাওয়া যায় না, তাহার কারণ, পূর্ব্ব দিবস রাত্রে বড় ঝড় বৃষ্টি হইয়াছিল, এই নিমিত্তে জেলেরা মাছ ধরিতে পারে নাই। দিনের বেলা একজন মেছো এক ঝুড়ি মাছ বেচিতে আনে। মাছ দেখিবামাত্র ওমরায়ের পরিবারের সকল লোক বড় খুসি হয়। ওমরাও আপনি বড় খুসি হন। তিনি মেছোকে ডাকিয়া বলেন,—তুই কি দাম নিবি বল্, তুই যে দাম চাইবি সেই দাম দিব। মেছো উত্তর দেয়,—মহাশয়, আমাকে একশো ঘা কোড়া মারিতে হুকুম দেন; এই মাছের দাম একশো ঘা কোড়া বই আর কিছু লইব না। একথা শুনিয়া ওমরা বড় চমৎকৃত হন, কিন্তু মেছো জেদ করিয়া বলে,—আমার এক কথা বই দুই কথা নয়, আমি যে দাম চাহিয়াছি,—তাহাই লইব, অন্য কোন দাম লইব না। মেছোর জেদা জেদি দেখিয়া ওমরা বলেন,—তুই বেটা বড় মস্কারির লোক, আচ্ছা আস্তে আস্তে তোর পিঠে একশো ঘা কোড়া মারিব, পরে মাছের জন্যে খুব বেশী দাম দিব।

এই সকল কথা বলিয়া ওমরা একজন চাকরকে হুকুম দেন, —মেছোকে একশো ঘা কোড়া আস্তে আস্তে মার্। মেছো পঞ্চাশ ঘা কোড়া খাইয়া বলে,—মহাশয়, আর আমাকে মারিবেন না, মাছের দামের আর একজন ভাগীদার আছে, আমি অর্দ্ধেক দাম লইলাম, তাহাকেও অর্দ্ধেক দাম দিন। ওমরা উত্তর দেন,—তোর মতন কি আর এক জন পাগল আছে, আচ্ছা, তাকে ডাক, সে অর্দ্ধেক দাম নিক্। মেছো বলে,—মহাশয়, সে লোকটি আপনার ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া আছে, সে আপনার দরওয়ান। দরওয়ানকে মাছের অর্দ্ধেক দাম দিতে কবুল করি, তবে সে আমাকে আপনার বাড়ীর ভিতর আসিতে দেয়। ওমরা কহেন,—এত বেস্ কথা, দরওয়ানকে ডাক, সে আপনার কবুল ক্রমে মাছের অর্দ্ধেক দাম নিক্। এই বলিয়া ওমরা দরওয়ানকে ডাকাইয়া পিঠের কাপড় চোপড় খুলিয়া পঞ্চাশ ঘা কোড়া খুব জোরে মারিতে হুকুম দেন। মার খাইলে পর দরওয়ানের জবাব হয়, আর মেছো ওমরায়ের ঠাঁই অনেক বক্শিষ টক্শিস পাইয়া আহ্লাদ মনে ঘরে চলিয়া যায়।

—০—

জঙ্গলের পশুরাও ছেলের জন্যে মায়ের কাতরতা বুঝিতে পারে।

(একটি সত্য গল্প)।

কোন এক সহরে একবার একটা সিংহ পিঁজারা ভাঙ্গিয়া পলাইয়া সকল রাস্তার উপরে দৌড়া দৌড়ি করে। সে যেখানে যায়, সেখানকার লোকজনেরা প্রাণের ভয়ে হাহাকার করিয়া উঠে। সিংহের কাছ থেকে একজন মেয়ে মানুষ কোলের ছেলেটি কোলে করিয়া দৌড়িয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে সে ছেলেটি ফেলিয়া দেয়। সিংহ তৎক্ষণাৎ আসিয়া ছেলেটিকে মুখে করে। সিংহের মুখে ছেলেটিকে দেখিয়া মা পাগলের মতন হইয়া আপনার প্রাণের ভয় দূর করিয়া সিংহের নিকটে আইসে, আসিয়া অত্যন্ত কাতরতা পূর্ব্বক বলে,—সিংহ আমার ছেলেটিকে মারিস্ নে ছেড়ে দে। এই কথা শুনিয়া সিংহ ক্ষণেককাল মায়ের পানে চাহিয়া থাকে, পরে ছেলেটি জমির উপর রাখিয়া চলিয়া যায়। সিংহ ছেলেটিকে মুখে করিয়াছিল বটে, কিন্তু কামড়ায় নাই।

—•—

ভদ্র স্ত্রী প্রাণ দিয়া স্বামীকে বাঁচাইয়া রাখেন।

অনেক বৎসর ফরাসী দেশের একজন ওমরা লড়াই করিতে যান। সে সময়ে কামান কি বন্দুক ছিল না, লোক জনে ধনুক তীর লইয়া লড়াই করিত। তীরে বিষ লাগান থাকিত। বিষওয়ালা তীর কাহার গায়ে লাগিলে সে প্রায় বাঁচিত না। লড়াইয়ের সময়ে পূর্ব্বোক্ত ওমরায়ের গায়ে একটা বিষওয়ালা তীর লাগে। চাকর বাকর তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডুলি করিয়া বাড়ী লইয়া যায়। ডাক্তারেরা তীরের ঘা দেখিয়া বলেন,—যদি কেহ ঘায়ে মুখ দিয়া বিষটা চুষিয়া লইতে পারে, তবে ওমরা রক্ষা পাইবেন, তাহা না হইলে পাইবেন না। আরো যে ব্যক্তি ঘা চুষিবেক, সে বাচিবেক না, মরিয়া যাইবেক। ডাক্তার দিগের বিধি শুনিয়া ওমরা কহেন,—আমি মরিয়া যাই ক্ষতি কি, বরং ভাল। দেখ যেন আমার ঘা কেহই চুষে না, পরকে মেরে আপনার প্রাণ বাঁচান বড় নিষ্ঠুর কর্ম্ম বলিতে হইবেক। এই সকল কথা বলিয়া ওমরা ঘুমিয়া পড়েন। সে সময়ে ওমরায়ের পত্নী মনে ভাবেন,—স্বামী ঘুমচ্ছেন, এই বেস্ সময়। এক্ষণে আমি তাঁহার কাছে আস্তে আস্তে বসিয়া বিষ চুষিয়া খাই, জেগে থাকিলে স্বামী কখন আমাকে বিষ চুষিতে দিবেন না। মনে মনে এই সকল কথা বলিয়া পত্নী ওমরায়ের নিকটে বসিয়া তীরের ঘা থেকে সকল বিষ আস্তে আস্তে চুষিয়া খান; বিষ খাইয়া পরদিবস তিনি মরিয়া যান, কিন্তু ওমরা প্রাণ হারান না, তিনি বেঁচে থাকেন।

—•—

প্রাণ দিয়া মা ছেলেকে বাঁচাইতে যান।

ইংলণ্ডে অর্থাৎ ইংরাজদিগের দেশে একবার একটা বসতিতে বড় আগুন লাগে, তাহাতে অনেক গরীব গুর্ব্বের ঘর পুড়িয়া যায়। একখানা বাড়ীতে চারি পাঁচ গরীব পরিবার বাস করিত। সে বাড়ীতে আগুনের ফিন্কি লাগিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে বাড়ীর সকল লোক বাহিরে

পলাইয়া আইসে। একজন মেয়ে মানুষ দেখে, তাহার সকল ছেলে বাহিরে আসিয়াছে, কিন্তু ছোট ছেলেটি আইসে নাই। ইহা দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ বাড়ীর ভিতর দৌড়িয়া যায়। ধুঁয়াতে কিছুই দেখিতে পায় না, এই জন্যে আপনার ঘরে না গিয়া আর একজনের ঘরে যায় সেখানে একটি ছোট ছেলে ছিল, ছেলেটি আপনার জ্ঞান করিয়া তুলিয়া বাহিরে আনে। বাহিরে আসিয়া দেখে ছেলেটি আপনার নয়। ইহা দেখিয়া মা পাগলের মতন হইয়া উঠে, আগুন ধুঁয়া কিছুই মানে না, বাড়ীর ভিতর আবার দৌড়িয়া গিয়া আপনার ঘরে প্রবেশ করিতেছে, এমন সময় ছাতটা জ্বলিয়া পড়িয়া যায়, তাহাতে মাও মারা পড়ে ছেলেও মারা পড়ে।

—•—

সব সেয়ানাকো এক মত।

এক বাদসা আপন মুলকে একটা পুষ্করিণী খনন করাইয়া স্থির করিলেন এই পুষ্করিণীটি দুগ্ধের পুষ্করিণী হইবে কিন্তু সরকার হইতে এক পয়সাও ব্যয় করিব না। এই জন্য দেশের যাবতীয় ওমরাকে ডাকাইয়া কহিলেন তোমরা রাত্রের মধ্যে প্রত্যেকে এক ২ কলসি দুগ্ধ অবশ্য ২ অমুক পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দিবে, আমি কল্য প্রাতে সেই স্থানে যাইয়া যেন দেখি যে আমার আজ্ঞা পালন করিয়াছ, যদি আমার হুকুম আমলে না আন তবে তোমাদিগের দণ্ড করা যাইবেক। ওমরারা সকলে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বাটী গেল। রাত্রে সকলেরই মনে এই উদয় হইল বাদশার যখন হুকুম হইয়াছে তখন সকলকেই এক এক কলসি দুগ্ধ পুষ্করিণীতে ঢালিয়া দিতে হইবেক, তাহা না হইলে পশ্চাৎ জবাব দিহি আছে কিন্তু যে স্থলে সকলে দুধ সরবরাহ করিবে সে স্থলে আমার এক কলসি জল দিলে মালুম হইবে না—তবে মিছামিছি এক কলসি দুধ কেন নষ্ট করি। এই বিবেচনায় সকলেই এক ২ কলসি দুগ্ধ না ঢালিয়া এক ২ কলসি জল ঢালিয়া আসিল—। প্রাতঃকালে বাদসা উজির সহিত পুষ্করিণীর নিকটে আসিয়া দেখিলেন পুষ্করিণীটি কেবল জলে পোরা—এক ফোঁটাও দুধ নাই। তিনি অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া ওমরাদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা আমার হুকুম কেন মান নাই—। ওমরারা জোড় হাত করিয়া উত্তর করিল যদ্যপি মাফ হুকুম হয় তবে আমরা আপন ২ মনের কথা বলি। বাদসা বলিলেন আমাকে সত্য কথা বল প্রতারণার কথা বলিলে তোমাদিগের প্রাণ নষ্ট হইবে। যে কারণে দুধ না দিয়া জল দেওয়া হইয়াছিল ওমরারা একে ২ তাহা ব্যক্ত করিল। বাদসা সকলেরই এক কারণ শুনিয়া কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্য হইয়া উজিরের প্রতি চাহিয়া থাকিলেন, উজির কহিল জাহাঁপণা সব সেয়ানা কো এক মত।

উক্ত সংখ্যা বাঙ্গালা ১ ভাদ্র ১২৬৩ ও ইংরাজি ১৬ আগষ্ট ১৮৫৬ তারিখে প্রকাশিত হয়।

রাধানাথ সিকদার চির কুমার ছিলেন। অপর সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্র খড়দহ নিবাসী প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের কনিষ্ঠ কন্যা বামাকালীর সহিত পরিণীত হইয়াছিলেন। এই নারী তৎকালের উপযুক্ত শিক্ষিতা ছিলেন। প্রবন্ধগুলি লিখিত হইলে প্যারীচাঁদ মুদ্রাযন্ত্রে পাঠাইবার পূর্ব্বে তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে একবার দেখাইতেন ও তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিতেন। সে সময়ে মাসিক পত্রিকা কিরূপ আদৃত হইয়াছিল তাহা জানিবার জন্য পাঠকের মনে কৌতূহল হইতে পারে। উপরে উদ্ধৃত "মেক্‌সিকো দেশের নরবলির কথা" প্রবন্ধ লইয়া কার্ত্তিক মাসের পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ হইয়াছিল, আমরা নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম:—

মাসিক পত্রিকা পড়াতে কি উপকার হয়।

(মাসিক পত্রিকা সম্পাদকে ও মাসিক পত্রিকা পাঠকে কথাবার্ত্তা)।

মাসিক পত্রিকা পাঠক।—মহাশয়, আপনি মাসিক পত্রিকা করে আমাদিগের অনেক ভাল হইয়াছে।

মাসিক পত্রিকা সম্পাদক।—মাসিক পত্রিকাতে আপনাদিগের কেমন করে ভাল হইল, বলুন দেখি।

পাঠক।—মহাশয়, মাসিক পত্রিকা হইবার পূর্ব্বে প্রতি দিবস স্ত্রীর সঙ্গে এই এই বিষয় লইয়া কথাবার্ত্তা কহিতাম, —হরচন্দ্রবাবু মাগকে দুই হাজার টাকার গহনা দিলেন। শম্ভুবাবু বড় ছেলের বিবাহেতে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করিলেন। বনরামবাবু বাপের শ্রাদ্ধ খুব ঘটা করে

করিলেন বটে, কিন্তু সে শ্রাদ্ধে অমুক বড় মানুষ আড়াআড়ি করে আইসেন নাই। প্রতিদিবস এই সকল বিষয় লইয়া স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইত। এমন সব কথাবার্ত্তায় কিছু মাত্র ফল নাই, তাহা কহা কেবল বৃথা সময় নষ্ট করা বলিতে হইবেক। যে পর্য্যন্ত মাসিক পত্রিকা হইয়াছে, শুনুন আমি কি করি,—প্রতি মাসে পত্রিকা বেরুলেই আমি একখানা বই পাই, সন্ধ্যাকালে বই খানি স্ত্রীর কাছে লইয়া গিয়া তাহা থেকে দুই একটা রচনা পড়ি। ছেলেরা কাছে থাকে, তাহারাও মাসিক পত্রিকা পড়া শুনে, শুনিয়া সকল কথা বুঝিতে পারে। দুই একটা রচনা পড়া হইলে পর, আমরা তাহা লইয়া অনেক গল্প সল্প করি। হয়তো ছেলেরা একটা কথা ধরে বসে, সে কথাটি আমি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দি। হয় তো স্ত্রী একটি কথা ধরিয়া আপত্তি করেন, সে আপত্তিটি আমি আপন সাধ্যমতে কাটি। এই প্রকারে গল্প সল্প করে প্রতি মাসের পত্রিকা লইয়া তিন চারি দিবস সন্ধ্যাকাল কাটাই। কেমন মহাশয়, হরচন্দ্র বাবুর মেগের গহনা টহনা লইয়া যে কথাবার্ত্তা হইত, তাহা অপেক্ষা মাসিক পত্রিকা লইয়া গল্প সল্প করা লক্ষ গুণ ভাল বলিতে হইবেক।

সম্পাদক।—আচ্ছা, আপনি মাসিক পত্রিকা লইয়া স্ত্রীর সঙ্গে কেমন গল্প সল্প করেন, তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেন দেখি।

পাঠক।—মহাশয়, আমি মেক্‌সিকো দেশের নরবলির কথা স্ত্রীর নিকটে পড়ি, তাহা তিনি মনোযোগ পূর্ব্বক শুনেন, শুনিয়া, বলেন,—একি বিষম দেশাচার। মেক্‌সিকো বাসিদিগের শরীরে কিছুমাত্র দয়া মমতা নাই। তাহারা কেমন করে একজন মানুষকে ধরে বলিদান দিত। আরো সে মানুষটা কেমন করে ভাল খাইয়া পরিয়া সুখ ভোগ করিত, কেমন করে স্ত্রীদিগের সঙ্গে আহ্লাদ আমোদ করিত। সে তো জানিত আমি এত দিনের পর মারা পড়িব। যাহার শরীরে এমন ভয় থাকে, তাহার সুখভোগ করা দূরে থাকুক, তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা সকল উড়িয়া যায়, সে আধ মরার মত হইয়া থাকে। মেক্‌সিকো দেশের নরবলি সংক্রান্ত আমার স্ত্রী এই সকল কথা বলেন, তার আমি জবাব দিতে পারি নে।

সম্পাদক।—আচ্ছা, আপনার স্ত্রীর নিকটে আপনি এই সকল কথা বলিয়া দেখুন দেখি,—পূর্ব্বে আমাদিগের দেশে সতী হইত। সে সময় যখন একজন মেয়ে মানুষ বলিত,—আমি স্বামীর সঙ্গেই সহগমন করিব, প্রথম প্রথম জ্ঞাতি কুটুম্বেরা তাহার কথা বিশ্বাস করিত না, কহিত,—তুমি দৃঢ়মনা নও, দৃঢ়মনের চিহ্ন দেখাও, তবে তোমার কথা বিশ্বাস করিব। দৃঢ় মনের চিহ্ন দেখাইবার জন্যে মেয়ে মানুষটা জলন্ত আগুনের ভিতরে হাত পুরে দিত, হাতের মাংস গুলা পট্ পট্ করে পুড়িয়া যাইত, তথাচ সে কিছুমাত্র যন্ত্রণা প্রকাশ করিত না, পরে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক মরা স্বামীর সঙ্গে জীবন্ত পুড়িয়া মরিত। সতী মনে করিত,—স্বামীর সহিত সহগমন করিলেই আমি একেবারে স্বর্গে গিয়া স্বামী প্রাপ্ত হইব। এই কথাটি দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া সে মরিব বলিয়া ভয় করিত না। এইরূপে মেক্‌সিকো বাসীদিগের মধ্যে যে সুন্দর পুরুষ বলিদানের জন্য পসন্দ হইত, সে মনে ভাবিত,—আমি স্বয়ং দেবতা, মরিলে পর দেবতা হইব। এমন একটা দৃঢ় বিশ্বাস তাহার মনে হইত। এইজন্যে সে বলিদান যাইব বলিয়া ভয় করিত না, স্বচ্ছন্দে ভাল খাওয়া দাওয়া করিত, ভাল কাপড় চোপড় পরিত, পত্নীদিগের সঙ্গে আহ্লাদ আমোদ করিয়া যতদিন বেঁচে থাকিত, পরম সুখে কাটাইত।

জগৎদুর্লভ।

[শ্রীসাহাজী]

চল্লিশ বৎসরের পুরাতনী হইলেও জগৎদুর্লভের মাতাঠাকুরাণীকে গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা কেন "নতুন গিন্নী" নামে অভিহিত করিত, এক্ষণে আমরা কেহই তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ নহি। তবে "কবিপ্রসাদাৎ" শুনিতে পাই, প্রেমিকের নিকটে প্রণয়িনী চির-নবীনা। তাই অনুমান হয়, দুর্লভের মাতার "নতুন গিন্নী" নাম তাঁহার প্রণয়ী

স্বামী কর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়া অসম্ভব নহে। তবে, অনুমান ও হনুমান, দুইই সমান, কোথা হইতে কোথায় যায়, তাহার ঠিক থাকে না। বিশেষতঃ, এই বিদ্‌ঘুটে বিজ্ঞানের যুগে আমাদের এই অনুমান যে কখনও সত্যরূপে গৃহীত হইবে, সে আশা আমাদের বিন্দুমাত্রও নাই। তবে, সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, যে স্ত্রী স্বামিসোহাগিনী, তিনি সন্তানসন্ততিদিগের প্রতিও স্বভাবতঃই অত্যন্ত স্নেহময়ী হইয়া থাকেন। সুতরাং আমাদের উক্ত অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে জগৎদুর্লভের মাতাঠাকুরাণী পুত্রকে তাদৃশ অত্যধিক স্নেহ কেন করিতেন, তাহা বুঝিবার পক্ষে কিঞ্চিৎ সাহায্য হয়। বস্তুতও, বিধবা "নতুন গিন্নী" তাঁহার উচ্ছ্বসিত পরিপূর্ণ স্নেহনীরে দুর্লভকে যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহ। দ্বাদশবর্ষের দুর্লভও জননীর মাত্রাধিক স্নেহবশতঃ মস্তিষ্ক বিকৃতি দোষে নিতান্ত বিগড়াইয়া গিয়াছিল। "পান থেকে চুণটুকু" খসিলে দুর্লভ তৎক্ষণাৎ মাতার ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিয়া চাউল ডাউল মিশাইয়া খিঁচুড়ি বানাইত, রান্নাঘরে গিয়া ভাতের হাঁড়ি আছড়াইয়া ভাঙিত, সশব্দে ঘটি বাটী কুয়ার জলে ছুঁড়িয়া ফেলিত। পৌষ মাসের বিকালে মা যদি বলিতেন, "দুর্লভ, বেলা থাকতে পায়খানায় যা", দুর্লভ বলিত, "ক্যাস্ আগে সন্দেশ খাবার পাঁচ পয়সা, তবে যাব।" এইরূপে, জননীর নিকট হইতে সন্দেশ খাইবার পাঁচ পয়সা আদায় করিয়া তবে সে পায়খানায় ছুটিত। রাত্রিতে শুইতে বলিলে সে জিদ ধরিত, "অম্বল খাব, তবে শোব।" মা কত বুঝাইতেন, কিন্তু দুর্লভ রাগের মাথায় চুল ছিঁড়িয়া বলিত, "যদি না দিস্, তবে এক্ষুণি লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দেব।" মা উপায়ান্তর না দেখিয়া খানিক তেঁতুল গুলিয়া আনিতেন। দুর্লভ বলিত, "সর্ষে কৈ?" মা আবার তখন খানিকটা সরিষা নষ্ট করিতেন, তবে সে ঠাণ্ডা হইয়া শুইতে যাইত। এমনি করিয়া সে জননীর হাড় কয়খানি কালি করিয়া দিত। জননীও স্নেহের মোহে পুত্রের সমস্ত আবর্জ্জনা অঞ্চল পাতিয়া গ্রহণ করিতেন। দুর্লভ 'স্কুলে' গিয়া "dog কুকুর, fox খেঁকশিয়াল, bride কনে, groom সহিস, bridegroom বর" মুখস্থ করিত। আর ঘরে আসিয়া অঙ্গভঙ্গী সহকারে তর্জ্জন গর্জ্জন করতঃ সেই সকল 'ইট্‌মিট্' ইংরাজি শুনাইয়া মাতৃদেবীকে স্তম্ভিত করিয়া দিত। কিন্তু সুযোগ পাইলেই 'ভৈরবী গোয়ালিনীর' গাছের শশা, 'হরিকুণ্ডুর' বাগানের গোলাপজাম চুরি করিয়া আনিত। কেহ তাহাতে কিছু বলিলে সে তাহাকে dog, fox বলিয়া গালি দিয়া অধীত বিদ্যার সার্থকতা প্রদর্শন করিত। মাতা কিন্তু ছেলেমানুষের বুদ্ধি ভাবিয়া এ সকল হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। ভাবিতেন, বড় হইলে দুর্লভের এ সকল দোষ থাকিবে না। কিন্তু বড় হইলে দুর্লভ কেমন হইবে, তাহা দেখিবার জন্য তিনি যমরাজের নিকট হইতে কোনওরূপ 'স্পেসাল প্রিভিলেজ্' আদায় করিতে পারিলেন না। একদিন তিনি তাঁহার বড় আদরের ষোল বৎসরের 'দুধের ছেলে' দুর্লভের দর্শন চিরদুর্লভ করিয়া অলক্ষ্য এক কঠোর হস্তের সম্মোহন ইঙ্গিতে চিরদিনের জন্য সংসার ছাড়িয়া কোথায় কোন্ এক অজ্ঞাত দেশে চলিয়া গেলেন।

মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন, দুঃখ-সহিসের কশাঘাতে মানব-অশ্ব সহজ হয়। কিন্তু দুর্লভের বেলায় সে কথা খাটিল না। মাতৃবিয়োগের পর, তাহার বিবর্দ্ধমান লোভ জাম, শশা ছাড়াইয়া তাহার আত্মদৃষ্টিকেও পরাহত করিয়া বহু উচ্চে অনন্ত আকাশ স্পর্শ করিতে ছুটিয়া গেল।

মাতৃবিয়োগের কয়েক বৎসর পরে পাড়ার পিতৃমাতৃহীনা অনাথা এক বোবা মেয়ের সঙ্গে দুর্লভের বিবাহ হইল। মেয়েটি বোবা হইলেও আকারে ইঙ্গিতে সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিতে পারিত। বুদ্ধির অপ্রতুলতা থাকিলেও সে অভ্যাসগুণে খাটিতে পারিত গর্দ্দভীর মতো। ফলতঃ, এই বাক্‌শক্তিহীনা স্ত্রীকে দুর্লভ বিধাতার অভিসম্পাতরূপে গ্রহণ করিলেও তাহার নেত্রীহীন সংসার কিন্তু এই মেয়েটির শ্রীহস্তস্পর্শে শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু জগতের সৌন্দর্য্য দর্শন করিবার জন্য তাহার চক্ষু দুইটির সৃষ্টি হয় নাই। সে তাই কারণে অকারণে এই নিরীহ স্ত্রীটিকে জুতা খড়মপিটা করিয়া আপনার প্রাপ্য খেসারত সুদ আসলে আদায় করিয়া লইত। কোনও সহৃদয় প্রতিবেশী তাহাতে বাধা দিতে আসিলে সে বলিত, "তোমরা বাঙালী লোক, কিছু বোঝ না। ইংরেজি bridegroom শব্দের অর্থ 'কনের

সহিস।' সহিসের কর্ত্তব্য ঘোড়াকে পিটিয়ে ঠিক রাখা।" বাঙ্গালী লোকদের কেহ এ কথা বুঝিত না, কেহ বা বুঝিয়াও পরাজয় স্বীকার করিত। কেন না, ইংরেজের নিকটে বাঙালীর পরাজয় অবশ্য স্বীকার্য্য এবং উহা শেষোক্ত জাতির গৌরববর্দ্ধক।

যাহা হউক, বসিয়া খাইলে রাজার ভাণ্ডারও ফুরাইয়া যায়। দুর্লভও পিতৃত্যক্ত সামান্য পুঁজি তিন ফুঁয়ে উড়াইয়া দিয়া চাকুরির চেষ্টায় ফিরিতে লাগিল। উত্তর অঞ্চলে এক চাকুরিও জুটিল। দুর্লভ সেখানে তিন মাস কাজ করিয়া একদিন লোভের বশে এক আসামীর এক জোড়া মহিষ চুরি করিয়া ধরা পড়িল। শ্রীঘর-বাসের ভয়ে রাতারাতি সে মুলুক ছাড়িয়া বাড়ীতে পলাইয়া আসিল। কিন্তু আসিলে কি হয়? চাকুরি আর মিলিল না। কষ্টে পড়িয়া দুর্লভ দেখিল, অর্থ জীবের সর্ব্বস্ব। কে যেন তাহার কর্ণকুহরে তারকব্রহ্ম নাম শুনাইল, 'বিনার্থং কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।'

কষ্ট কখনও একক আইসে না, এই মহাজন বাক্যের সার্থ সঙ্গতির জন্য তাহার সেই বোবা পত্নীর গর্ভে এক অনাহুত কন্যারত্ন সেই দুর্দ্দিনে তাহার গৃহে অতিথি হইল। দুর্লভ দেখিল, এ সকলই নিষ্ঠুর বিধাতার ব্যঙ্গ হাসি। এইবার সে কল্পিত বিধাতার অস্তিত্ব মন হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া দিয়া মূর্ত্তিমান্ অর্থ-বিধাতার প্রসন্নতা লাভের জন্য ধর্ম্মান্ধতার গণ্ডী ছাড়িয়া নিষ্ক্রান্ত হইল। দিনের আলোয় 'কোঁচার পত্তনিদার' জগৎ দুর্লভ রাত্রির অন্ধকারে এক শ্রেণীর নিশাচর জীবের 'শাকরেদি' আরম্ভ করিয়া দিল।

(২)

এইরূপে আট বৎসর কাটিয়া গেলে, দুর্লভের 'অনাহুত' 'অতিথি' কন্যা অষ্টমবর্ষীয়া গৌরীতে রূপান্তরিত হইয়া পিতার জন্য এক 'দাঁও' জুটাইয়া দিল। পিতাও 'দাঁও' বুঝিয়া ও-পাড়ার পিতৃমাতৃহীন বিশ ত্রিশ বিঘা মাটির মালিক গঙ্গাধরকে জামাই করিয়া লইল। গঙ্গাধরেরও সংসারে কেহ ছিল না। সেও বিবাহ অন্তে নূতন শ্বশুর মহাশয়কে আপনার সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে বিদেশে কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া গেল। দুর্লভও আজ সুদীর্ঘ দশ বৎসর পরে লক্ষ্মীর সংসারে পড়িয়া আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিলক্ষণ স্বস্তি অনুভব করিল।

'বতরের' সময় আসিল। সেবার 'ভরা ভাদরে' গঙ্গাধরের সোণার ক্ষেত পাকা ধানের বোঝা বহিতে পারিল না। সকালবেলার উঠন্ত রৌদ্রের রাঙা কিরণ মাখিয়া শরতের গন্ধে ভরা মন্দ হাওয়ায় যখন ধানের শীষ মৃদুমন্দ দুলিতে থাকিত, তখন দুর্লভ পলকহীন চখে ক্ষেতের দিকে চাহিয়া রহিত। কি ভীষণ লোলুপ সেই দৃষ্টি! চক্ষু দুইটি যেন ঠিকরাইয়া পড়িত। বোধ হইত, দুর্লভের মাংসহীন কঙ্কাল দেহের প্রেতছায়া দুই চক্ষু কোটরে গঙ্গাধরের সমস্ত ক্ষেত শুষিয়া লইতেছে। জামাতার সংসারের যে বস্তুতে সে দৃষ্টি করিত, তাহাই যেন নরকের তীব্র জ্বালাময় চাকচিক্য সমন্বিত হইয়া তাহার চক্ষুদুইটি ঝলসাইয়া দিত। দর্শনজনিত মনোবেগ হৃদয়ে দুর্দ্দমনীয় আশা আকাঙ্ক্ষার তরঙ্গ তুলিত। মনের এই রাক্ষসী প্রবৃত্তিকে নিদ্রিত রাখিবার জন্য দুর্লভ কত চেষ্টা করিত। কতবার গঙ্গাধরের সেই চিঠির কথা ভাবিত। কি সুন্দর চিঠিখানি!

"শ্রীচরণে নিবেদন, এ সংসারে আমার আর কেহ নাই। আপনারাই আমার মা বাপ। আমার যা কিছু আপনি নিজস্ব জ্ঞানে যথেচ্ছ ব্যবহার করিবেন। তাহাতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিবেন না। * * * ইতি সেবক শ্রীগঙ্গাধর।" ভাবিতে ভাবিতে গঙ্গাধরের এই চিঠিখানির প্রত্যেক শব্দ দুর্লভের স্মৃতির মনোময় পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। কি এক দৈববাণী অলক্ষ্যে তাহার কর্ণকুহরে ফুকারিত, "দুর্লভ, এমন 'ভোলা মহেশ্বর' জামাই সকলের ভাগ্যে মিলে না।" কিন্তু পরক্ষণেই শত শত ভূত প্রেত পিশাচ তাহার মস্তকের প্রত্যেক স্নায়ু টানিয়া ছিঁড়িয়া এক বিকট চিন্তাপ্রবাহের সৃষ্টি করিত। কে যেন রাবণের ন্যায় দশ মুখে চীৎকার করিয়া বলিত, "দুর্লভ, এ সকল যদি তোমার না হইল, তাহা হইলে ধিক্ তোমার এই পরাধীন জীবনে।" বৈশাখে দুর্লভ মেয়ের বিবাহ দিয়াছিল। আশ্বিন মাস আসিল। কিন্তু এই কয়েক মাস তাহার কি ভাবে কাটিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল

না। পূজার ছুটিতে জামাই বাড়ীতে আসিল, শ্বশুরকে প্রণাম করিল, বলিল, "শরীর যে বড় কাহিল দেখ্‌ছি আপনার।" দুর্লভ প্রত্যুত্তরে শুধু একটিবার হুঁ করিয়া সরিয়া পড়িল। গঙ্গাধরের বাতাস তাহার গায়ে যেন হুল বিঁধাইয়া দিতেছিল। চোখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিবারও তাহার সাহস হইতেছিল না।

পূজায় জামাই আসিয়াছে। শাশুড়ী পুলি পিঠা গড়িল। বাড়ীতে 'ব্যস্ত সমস্ত'তার আর অন্ত রহিল না। দুই দিন গেল। তিন দিনের দিন দুর্লভ কি একটা কালো পদার্থ আনিয়া 'বোবার' হাতে দিয়া, তাহাকে কি করিতে হইবে, তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিল। বোবা বোকা দুর্লভগৃহিণী সেই দুর্লভ বস্তুটি সযত্নে ছিকায় তুলিয়া রাখিল। জামাইকে খাইতে দিতে হইবে, ভুলিয়া না যায়, সেজন্য পরণের আঁচলে 'গেরো' দিয়া রাখিল। সে বুঝিল, ওটা জামাই বশ করার ঔষধ। জামাই পরের ছেলে, বশ না করিলে চলিবে কেন? যাহা হউক, আঁচলে 'গেরো' দিয়া রাখিলেও কার্য্যকালে সে কিন্তু সে কথা একেবারেই ভুলিয়া গেল। রাত্রিতে দুর্লভ যখন একথা শুনিল, তখন সে বুঝিল, এ কাজ অমন মনভোলা হাবা বোবাকে দিয়া হইবার নহে। তাই সে পরদিন সন্ধ্যাবেলায় দুধের বাটীতে জামাই বশকরা সেই পদার্থটি গুলিয়া দিয়া গৃহিণীকে ভালো করিয়া যথাকর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিল। বুঝাইয়া পড়াইয়া সে নিজে কিন্তু সে রাত্রিতে খাইবে না, গৃহিণীকে সে কথাও বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়া বাহিরের ঘরে শুইতে গেল। কিন্তু সে দিন দরজা জানালায় খিল আটকাইয়া, গৃহের প্রত্যেক ছিদ্র খুঁজিয়া বাহির করিয়া 'ন্যাকড়া' দিয়া সেগুলি বন্ধ করিয়া দিয়াও সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। মনে হইল, লখাইকে বাঁচাইবার জন্য চাঁদ সওদাগর যেমন এক ছিদ্রহীন লৌহ সিন্দুক প্রস্তুত করাইয়াছিলেন তেমনি একটি সিন্দুক পাইলে আজ সে তাহার মধ্যে শুইয়া নিশ্চিন্ত মনে রাত্রি কাটাইয়া দিত। দুর্লভ মড়ার মতন পা মাথা লেপমুড়ি দিয়া সটান হইয়া শুইয়া পড়িল। স্মৃতির কবাটখানিও বন্ধ করিয়া দিবার জন্য কত বিফল চেষ্টা করিল।

পরদিন, প্রভাতে ভাষাহীন বোবা গিন্নীর বুক-ফাটান কুকুর কান্না শুনিয়া পাড়ার লোক ছুটিয়া আসিয়া সকলে মিলিয়া গঙ্গাধরের মৃতদেহ টানিয়া বাহির করিল। মুখে ফুকরি দেখিয়া অনেকে বলিল, ছোঁড়ার বুঝি 'মৃগীরোগ' ছিল। এই কথায় বোবা গিন্নী হাউমাউ করিয়া আকারে ইঙ্গিতে কি যেন বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু হঠাৎ দুর্লভ একটা দম্‌কা হাওয়ার মতো ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল এবং "কানা খোঁড়ার একগুণ বেয়াদা" এইরূপ বলিয়া গৃহিণীকে এক ধমক দিয়া আবার দম্‌কা হাওয়ার মতো ছুটিয়া ঘরে গিয়া লেপমুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। দুর্লভের কি বিকট সেই মূর্ত্তি। মুখের কি ভীষণ সেই ভঙ্গি! জগতে যতপ্রকার বৈষম্য বর্ত্তমান্, উঁহাদের সকল-গুলি আসিয়া সেদিন যেন তাহার মুখে বাসা বাঁধিয়াছিল। সেদিন যে তাহার মুখ দেখিল, সেই শিহরিয়া উঠিল। কেহ কেহ কি 'কাণাঘুষা' করিল। কেহ কেহ চক্ষুঃ ঠারিল। কেহ কেহ আবার উদার বুদ্ধিতে বলিল, "জামায়ের শোকে লোকটি পাগল না হয়।"

দ্বিপ্রহরে লেপের ফাঁক দিয়া যখন সদ্যোবিধবা বালিকা কন্যার শূন্য হাত, শূন্য সীঁথি, রুক্ষ চুল দুর্লভের চক্ষে পড়িল, তখন তাহার 'যাত্রায়' দেখা সেই সঙের পেত্নীর কথা মনে পড়িল। একটা বিশ্বদ্রোহী কালানল তাহার সমস্ত হৃদয় ব্যাপিয়া দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বিকালে মেয়ে আসিয়া যখন ডাকিল, "খাবে না, বাবা?" দুর্লভ তখন উন্মত্তের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল, "সরে যা, ছুঁস্‌নে। তোকে দেখ্‌লে আমার চক্ষে শূল বেঁধে। দূর হ'।" বালিকা সভয়ে ছুটিয়া পলাইল।

তিন দিন পরে পাড়ার সকলে শুনিল, দুর্লভের জ্বর হইয়াছে।

(৩)

সে দিন শনিবার। কয়েকদিন অনবরত বৃষ্টি হইবার পর সবে মাত্র একটু 'ফর্সা' হইয়াছিল। তখনও আকাশে 'ন্যাও দোত্যি' মড়ার মুণ্ড লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছিল। বাঁশঝাড়গুলি বৃষ্টিতে ভিজিয়া কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া যেন নিজের কৃত অপরাধ স্বীকার করিতেছিল। সন্ধ্যা হইবারও বেশী বিলম্ব ছিল

না। প্রলয়ের কৃষ্ণ অন্ধকার আবার ঘনাইয়া আসিতেছিল। বিশেষতঃ, দুর্লভদের বাঁশতলার পায়খানা ঘেরিয়া কি যেন এক প্রচ্ছন্ন অন্ধকার নৃত্য করিতেছিল। শনিবারের শেষে ছুটি পাইয়া ভূতের দল একে একে যেন সেই অন্ধকারে আসিয়া জুটিতেছিল। দুর্লভ কয়দিনের পর, আজ একটু সুস্থ হইয়া পায়খানায় আসিয়াছিল। রান্নাঘরের 'ছোঞ্চায়' গাড়ু হাতে বোবা গিন্নী দাঁড়াইয়াছিল। এমন সময়, হঠাৎ "ঐ গঙ্গাধর ধরলে রে, মারলে রে, বাপ" বিকট চীৎকার এবং সঙ্গে সঙ্গে ধপ্ করিয়া একটি শব্দ হইল। গিন্নী সভয়ে গোঙাইয়া উঠিল। মেয়েটিও "কি হল" বলিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহাদের চীৎকারে পাশের বাড়ী হইতে একজন আত্মীয় ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, দুর্লভ পায়খানার ধারে পড়িয়া অজ্ঞান। সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া তাহাকে ঘরে আনিয়া শোয়াইল। দেখিতে দেখিতে বাহিরে 'প্রকৃতি গর্জ্জিয়া উঠিল। ঘরের ভিতরে দুর্লভও ১০৭ ডিগ্রি জ্বরে প্রলাপ বকিতে লাগিল, "ঐ গঙ্গাধর ধর্‌ল রে মার্‌ল।" সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ঝড় বৃষ্টি শিলা বজ্র—প্রকৃতির যুদ্ধ চলিল। ভিতরেও অন্যের অজ্ঞাতসারে—কেবল একজনের—যিনি ঝড় উঠাইবার ও থামাইবার মালিক, তাঁহারই সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে আর এক ভীষণ যুদ্ধ চলিল। রাত্রিশেষে ঝড় বৃষ্টি থামিল। রোগীর ঝঞ্ঝাবাতও কাটিয়া গেল। ভোর না হইতে দুর্লভের জীবনান্ত ঘটিল।

যিনি আলোকে ছায়ার, চন্দ্রে কলঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি জানেন, জগৎ দুর্লভের জীবনে তাঁহার কি নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছিল, এবং তিনিই জানেন, পরজীবনে সে কি অবস্থায় কোথায় গিয়া পৌঁছিয়াছিল।

আমারও ছিল একদিন।

[শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ, কবিগুণাকর]

আমারও ছিল একদিন—
চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয় করিয়াছি ঘৃণ্য হেয়
সবারে রেখেছি দূরে—ছিনু অর্ব্বাচীন
তখন বুঝিনি হায় এ দিন রবে না—প্রায়
অনশনে অর্দ্ধাশনে হবে দেহ ক্ষীণ
আমারও ছিল একদিন।

আমারও ছিল একদিন—
নিত্য নব পরিচ্ছদ না হ'লে হ'তো বিপদ
যোগাতেন স্নেহময় জনক প্রবীণ,
আজি বস্ত্র অর্দ্ধ ছিন্ন শুধু লজ্জা ঢাকা ভিন্ন
আর কিছু নাহি জানি—হ'ক সে মলিন,
আমারও ছিল একদিন।

আমারও ছিল একদিন!
যে আসি দাঁড়াত দ্বারে আশা মিটাইয়ে তারে
দিয়াছি তুলিয়া হায় করিয়াও ঋণ—
আজি কপর্দ্দক মম অমূল্য রতন সম
বলি—যাও বসুন্ধরে হও দ্বিধা ভিন্
আমারও ছিল একদিন!

শিক্ষায় শোরগোল।

[শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায় এম্-এ]

(৪)

প্রাথমিক শিক্ষার নূতন বাহন।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে যে চাঞ্চল্যের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, শিক্ষণ বিত্তাবিদ্ শ্রীযুক্ত বিস মহোদয়ের পূর্ব্বোল্লিখিত প্রস্তাবগুলিই তাহার কারণ নয়। লিখন ও পঠন শিক্ষার যে অভিনব প্রণালী তিনি উদ্ভাবন করিয়াছেন, এই সংস্কারটীই এই চাঞ্চল্যের মূল কারণ। অনেকেই প্রস্তাবটীকে হাস্যাস্পদ বলিয়া উড়াইয়া দিতে

চাহেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা নামে অভিহিত করিয়া প্রস্তাবটীর দ্বারা দেশবাসীর জাতীয়তার প্রতি যে অসম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়াই অনেকে ক্ষান্ত হইয়াছেন। কেহ কেহ আরো একটু অগ্রসর হইয়া, এই প্রস্তাবটী যে শিক্ষাবিস্তারের ও শিক্ষার সুফল লাভের অন্তরায় হইবে, তাহাও প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু কেবলই তাচ্ছল্য অথবা কেবলই বিদ্রূপের ভাবে প্রস্তাবটী আলোচনা করিলে, শ্রীযুক্ত বিস সাহেবের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইবে। তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষার বিবরণ পাঠ করিলে মনে হয়, তিনি আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়াছেন। সেইজন্য প্রস্তাবটীর পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আবশ্যক।

(ক) ইংরাজি বর্ণমালা। *

এই অভিনব প্রস্তাবটীর সম্বন্ধে প্রথমেই তাঁহাকে একটী প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয়। ইংরাজি বর্ণমালার মোট সংখ্যা ছাব্বিশটী হইলেও, ইহার চারটী রূপ—ছাপার অক্ষরের দুইটী এবং লিখার অক্ষরের দুইটী। তাঁহার দেশেই বিশেষ পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ছাপার অক্ষরকে লিখার অক্ষরে (script writing) পরিণত করা খুব সহজ; ইহাদ্বারা লিখন প্রণালীর নানাদিক দিয়া বিশেষ উন্নতি হয়। স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়া ছাপার অক্ষর লিখার অক্ষরে পরিণত করা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে ডাক্তার কিমিন্ প্রভৃতির পরীক্ষার ফল ইংলণ্ডীয় শিক্ষকসমাজে বিশেষ পরিচিত। † ইহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে এই ছাপার অক্ষর (script writing) প্রচলিত লিখার অক্ষর (cursive writing) অপেক্ষা অনেক তাড়াতাড়ি লিখা যায়। ছাপার অক্ষরের স্বপক্ষে যখন এতগুলি অনুকূল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তখন মিঃ বিসকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি,—তাঁহার দেশে বর্ণমালার চারিটী রূপের পরিবর্ত্তে প্রাথমিক শিক্ষা সৌকর্য্যের জন্য একটী রূপ সাধারণ ভাবে প্রচলিত হয় নাই কেন?

তারপর ইহাও সর্ব্ববাদিসম্মত যে ইটালিয়ান্ অক্ষরমালার ন্যায় ইংরাজি অক্ষরমালার সহিত পরিচয় ঘটিলেই পঠনের সকল সমস্যার তিরোধান হয় না। ইংরাজি অক্ষরগুলির নাম এক প্রকার, উচ্চারণ অন্য প্রকার এবং বিভিন্ন শব্দের মধ্যে একই অক্ষরের ধ্বনি বহুপ্রকার। এই সকল বিশেষত্ব ও পার্থক্য অনুসারে যদি ইংরাজি বর্ণমালার অক্ষর সংখ্যা গণনা করা হয়, তাহা হইলে এই সংখ্যা বড় কম হইবে না। আমাদের দেশের ছোট ছোট বালিকারা বাংলা ভাষার মাত্র দুইটী পুস্তক পড়িয়া খুব কম বয়স হইতেই রামায়ণ ও মহাভারত বেশ সুন্দর পড়িতে শিখে। আমি যখন পাঠশালে পড়িতাম তখন আমাদের পাঠশালে দুইটী বাগ্দীর ছেলেও পড়িত। তাহাদের শিক্ষা বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। তথাপি ইহারা নিজেরা রামায়ণ ও মহাভারত পড়িয়া নিজেদের ও স্বজাতির অনেকের আনন্দবর্দ্ধন করিত। ইহাদের একজন এখন ইহজগতে নাই; অপরজন এখনও স্বজাতির ভিতর সম্মানের স্থান লাভ করে। ইংরাজি ভাষার একখানি কি দুইখানি পুস্তক পড়িয়া এরূপ ফললাভের সম্ভাবনা আছে কি? এরূপ সম্ভাবনা নাই বলিয়াই ইংরাজ শিক্ষকসমাজে বর্ণধারা (Alphabetic method) ধ্বনি ধারা (Phonetic অথবা phonic method) প্রভৃতি প্রাথমিক ভাষা শিক্ষার নানা প্রণালীর আলোচনা এত বেশী। বর্ত্তমান সময়ে ওখানকার শিক্ষকদিগকে স্বরবিজ্ঞান (phonetics) আয়ত্ত করিয়া প্রচলিত বর্ণমালার সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া ধ্বন্যাত্মক বর্ণমালার সাহায্যে প্রাথমিক ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়, এবং ওখানে নিত্য নূতন পদ্ধতির কথা প্রায়ই শোনা যায়। এই ধ্বন্যাত্মক বর্ণমালার রূপটী কতকটা সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রচলিত প্রাচীন বর্ণমালা পরিত্যাগ করিয়া, এই নূতন বর্ণমালার সাহায্যে কেবল প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় এই স্তরের শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হইবার কথা। এবং সমগ্র জাতীয় সাহিত্যে এবং সমগ্র জাতীয় জীবনে এই

* Second Report on the Expansion and Improvement of Primary Education in Bengal—*The Calcutta Gazette, Dec. 13.9.22.*

† Dr. C. W. Kimminএর "The Hand-writing of the Future"—*Child Study, Dec. 1920.*

ধ্বন্যাত্মক অক্ষরমালা প্রচলিত হইলে, দেশের প্রভূত উপকারের সম্ভাবনা। এই নূতন প্রণালীতে প্রচলিত বর্ণগুলিকে একেবারে পরিত্যাগ করাও আবশ্যক হয় না; মাত্র ক্ষেত্র বিশেষে দুই একটী নূতন অক্ষর সৃষ্টি করিতে হয়, কএকটী বর্ণকে উলট-পালট করিয়া লিখিবার প্রয়োজন থাকে, এবং অপরাপর স্থলে কএকটী ছোটখাট নূতন চিহ্নের ব্যবহার আবশ্যক হয়। এরূপ পরিবর্তনে জাতীয়তার কথাও উঠে না, এবং জাতির উপর পরোক্ষভাবে বর্ব্বরতার আরোপেরও অবসর থাকে না। এই অবস্থাতেও ইংলণ্ডের প্রাথমিক শিক্ষাতেও এই নূতন অক্ষরমালার কেন প্রচলিত হয় নাই, এবং পাঠ্য পুস্তক ইত্যাদি এই অক্ষরে কেন মুদ্রিত হয় নাই,—শ্রীযুক্ত বিস মহোদয় তাহার সদুত্তর দিবেন কি?

(খ) অন্য ভাষার বর্ণ সংখ্যা।

তারপর কেবল বাংলা ভাষার বর্ণমালার সংখ্যাই অধিক নয়। জাপান ও চীনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কি দেখা যায়? এখানে বর্ণমালাই অনেকটা ভাষার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। এই বর্ণমালাকে গণনা করিতে শতকের সংখ্যাই পর্যাপ্ত নয়,—সহস্রের কোঠায় বহুদূর অগ্রসর হইতে হয়। এই সকল দেশে ও জার্ম্মেণী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড এবং যুক্ত রাষ্ট্রের সম্পর্কে আসিয়াছে। দেশবাসীরাও রোমান অক্ষরের সংবাদ রাখে। তাহাদের দেশের শিক্ষা-ক্ষেত্রেও বিশেষজ্ঞের অভাব নাই। শিক্ষিত ইংরাজ ও ইংরাজ মিশনারীরা সে দেশেও প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু কৈ সেখানে ত দেশীয় ভাষায় রোমান বর্ণমালার প্রচলন করিয়া প্রাথমিক শিক্ষাকে সহজ করিবার প্রস্তাব সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয় নাই! জাপানে যে কেবল মাতৃভাষা ও চীনা ভাষার বর্ণমালা শিক্ষার জন্য সময় সময় শিক্ষার অতিরিক্ত দুই হইতে চার বৎসরেরও অধিক সময়-ক্ষেপ আবশ্যক হয়! তবুও ত এখানে বর্ণমালা এমন বিজাতীয় ভাবে সংস্কৃত হয় নাই! এরূপ হইবার কারণ সম্বন্ধে মহামতি বিস সাহেবের কিছু বক্তব্য আছে কি?

(গ) বর্ণ পরিবর্ত্তনের বর্ব্বরতা।

এখন দেখা যাক অন্য দেশের বর্ণমালা গ্রহণ করে কিরূপ জাতি। এখানে ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হইতেছি না। এরূপ গবেষণা আমার শক্তির বাহিরে। যাহা সহজ জ্ঞানেই বুঝা যায়, এবং এই দেশের যাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই, এমন দুই একটী কথা বলিব। যে জাতির একটা প্রাচীন সভ্যতা, একটী প্রাচীন ঐতিহ্য, এবং সর্ব্বোপরি একটী প্রাচীন সাহিত্য আছে, তাহার নিজস্ব বর্ণমালাও আছে। কোন ঐতিহাসিক যুগে এই বর্ণমালা পরের নিকট ধার করা হইলেও, বর্ত্তমানে উহা এরূপ জাতির নিজস্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিজের জিনিষ ভালই হোক আর মন্দই হোক তাহার প্রতি একটা আন্তরিক আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা থাকিবেই থাকিবে। জিনিষটী মন্দ হইলে, নিজেরাই মন্দ বলিব; কিন্তু পরে মন্দ বলিলে প্রাণে কেমন ব্যথা বোধ হয়। যুক্তি তর্ক সর্ব্বত্রই কর্ম্ম-নিয়ামক নয়। হৃদয়টা কি একেবারে তুচ্ছ করিবার জিনিষ? ভাবাবেগই যথার্থ কর্ম্ম-প্রবোচক। এই ভাবের মুখে ছাই দেওয়া, একটী জাতির ভাবময় জীবনকে অস্বীকার করা, কি সুবুদ্ধির পরিচায়ক? এই ভারতবর্ষের মধ্যে এমন সব জাতি আছে, যাহাদের ভাষা আছে—কিন্তু সাহিত্য নাই, শব্দ আছে—কিন্তু বর্ণ নাই;—এরূপ অসভ্য বর্ব্বর জাতিদের উন্নতির জন্য মিসনারীরা রোমান বর্ণমালা দ্বারা তাহাদের ভাষা শিক্ষার উপায় করিয়া দেন। বাঙ্গালীরাও কি এমনই একটী অসভ্য বর্ব্বর জাতি, যে তাহাদের বর্ণমালার সংখ্যাধিক্যের জন্য তাহাদের জাতীয়তা, প্রাচীন ঐতিহ্য, প্রাচীন সাহিত্য, এবং ইহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তাহাদের গভীর ভাবাবেগ অস্বীকার করিয়া, তাহাদের শিশু ও বালকবালিকাদের প্রাথমিক ভাষা শিক্ষার সামান্য একটু সুবিধা করিয়া দেওয়ার নিমিত্ত, একটী বিজাতীয় বর্ণমালার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে? মিঃ বিস শিক্ষা সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ; জাতীয়তাকে অপমান করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা শিক্ষাশাস্ত্রের অনুমোদিত কি? তিনি তাঁহার নূতন প্রস্তাবটী দ্বারা পরোক্ষভাবে, বোধ হয় অনিচ্ছাতেই, বাঙ্গালী জাতির উপর যে বর্ব্বরতার আরোপ করিয়াছেন, তাহার ফলে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষাসম্বন্ধীয় সুন্দর অপরাপর প্রস্তাবগুলির বিরুদ্ধে দেশে একটী তীব্র প্রতিবাদের ভাব যদি পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তাহা হইলে আশ্চর্য্য হওয়ার কোন বিশেষ

কারণ থাকে কি? এই বিষয়টী তাঁহার মত বিবেচক লোকের ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল, এবং তাঁহার এই অভিনব প্রস্তাবটী কলিকাতা গেজেটে ছাপাইবার পূর্ব্বে বঙ্গীয় শিক্ষা-দপ্তরের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত ছিল। আজকাল এই শিক্ষা-দপ্তর একজন বাঙ্গালী মন্ত্রীর অধীন; সেইজন্য প্রস্তাবটী জাতীয়তা ও জাতীয় ভাব-প্রবণতার দিক দিয়া বিচার করা সর্ব্বাগ্রেই আবশ্যক ছিল।

(ঘ) পরিবর্ত্তনের সীমা।

অনেকেই এই প্রস্তাবের একটী অসম্পূর্ণতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রাথমিক শিক্ষা যে সকল বালকবালিকাদের শেষ শিক্ষা, তাহাদের জন্যই যদি এই নূতন বর্ণমালার বিশেষ প্রয়োজন মনে করা হয়, এই বর্ণমালা দ্বারা ভাষা শিক্ষা করিয়া তাহাদের কি উপকার হইবে? এই অক্ষরগুলির সাহায্যে ভবিষ্যতের সামাজিক ও কর্ম্মজীবনে তাহারা নিজ নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিলে, সকলেই কি তাহা বুঝিতে পারিবে? লিখিত মনোভাব বুঝা ও লিখিয়া মনোভাব প্রকাশ করার সম্বন্ধে তাহারা "নিজ বাসভূমে" অনেকটা ভিন্ন ভাষাভাষী দূর দূরান্তরের "পরবাসী" রূপেই জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইবে না কি? এবং ভবিষ্যতে তাহাদের এই অর্জ্জিত জ্ঞান ব্যবহার করিবার যদি কোন সুবিধাই না থাকে, তাহা হইলে এরূপ শিক্ষা দ্বারা যথার্থ শিক্ষা বিস্তার হইবে কি? এখনই অনেক বালক প্রাথমিক শিক্ষার পর কিছু দিনের মধ্যে আবার নিরক্ষর শ্রেণীভুক্ত হয়। নূতন প্রণালীর শিক্ষা প্রচুর অর্থ ব্যয়ের দ্বারা এরূপ অজ্ঞতাই দেশের মধ্যে চির প্রতিষ্ঠিত রাখার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থায় পরিণত হইবে না কি? কারণ বাংলা বর্ণমালা যে একেবারে উঠিয়া যাইবে, এরূপ কল্পনা বাতুলতার নামান্তর। দেশের সাহিত্য, দেশের সংবাদপত্র, দেশের পুস্তক ইত্যাদিতেও এই বর্ণমালাই ব্যবহৃত হইবে,—শ্রীযুক্ত বিস মহোদয় কি এইরূপই অনুমান করেন? এবং ইহাই কি বাঞ্ছনীয়?

(ঙ) পরিবর্ত্তনের কু অভিসন্ধি।

তাহার পর যাহারা নিম্ন শিক্ষার পর মধ্য ও উচ্চশিক্ষার গণ্ডীতে প্রবেশের চেষ্টা করিবে, তাহাদিগকে আবার পুনরাচমন করিয়া বাংলা বর্ণমালা শিক্ষার ব্রতী হইতে হইবে। অবশ্য বয়োধিক্যবশতঃ বর্ণমালা শিক্ষায় অপেক্ষাকৃত কম সময় লাগিবে। কিন্তু ইহাও কি সময়ের অযথা অপব্যয় নয়? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভবিষ্যতে বাংলা ভাষাকে স্বস্থানে সতেজে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, এবং অনেকে ইহাকেই প্রকৃত সৎশিক্ষা এবং জাতীয়তা ও স্বদেশপ্রাণতা বর্দ্ধনের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত। জানি না, শ্রীযুক্ত বিস সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ভাবী পরিবর্ত্তনটী কিরূপ চক্ষে দেখেন। কিন্তু বাংলা ভাষাকে যখন শিক্ষার এরূপ উৎকৃষ্ট স্থান দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে, তখন তাঁহার অভিনব প্রস্তাবটী কি তাহার সহিত বেশ সুসমঞ্জস হইবে? কোন বিদেশী ভাষাকে শিক্ষায় সর্ব্বপ্রধান স্থান প্রদান করিলে, শিক্ষা দ্বারা একটী বিদেশী ভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। সেই কারণে এই বিদেশী ভাবটীর প্রতি অজ্ঞাতসারে একটা গোলামির ভাব অর্জ্জিত হইতে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে মনন ও চিন্তন শক্তি স্বাভাবিক স্ফুরণে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া, অনেকটা আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। অনেকে সন্দেহ করেন, যে বিদেশী শাসকসম্প্রদায় প্রকাশ্যভাবে না হইলেও কতকটা অপ্রকাশ্য ভাবে মনের ও চিন্তার দাসত্বকে শাসনের অনুকূল বলিয়া বিবেচনা করেন। সেই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্ধারণ অনুসারে মধ্য শিক্ষা দ্বারা মাতৃভাষা শিক্ষার ভিতর দিয়া জাতীয়তা, স্বাধীন চিন্তা এবং স্বদেশপ্রাণতা সতেজ হইয়া উঠিলে, তাঁহাদের ভয়ের কারণ হইয়া উঠিবে অনুমান করিয়া, এই শাসকসম্প্রদায় পরোক্ষভাবে এরূপ শিক্ষার গতিরোধ বাঞ্ছনীয় মনে করিতে পারেন। বিস সাহেবের নূতন প্রস্তাবের ভিতর এরূপ কোন কু অভিসন্ধি না থাকিতেও পারে। প্রচলিত প্রবাদ বাক্যে বলে—"মনের অগোচর পাপ নাই।" কিন্তু নব মনোবিজ্ঞান এই প্রবাদটীকে সত্য বলিয়া মনে করে না। এই মনোবিজ্ঞান বলে—মনের সম্পূর্ণ অগোচরেও পাপ থাকিতে পারে, এবং এই অপরিজ্ঞাত পাপ আমাদের অনেক কর্ম্মের নিয়ামক হয়। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ফলে, এরূপ অনেক সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত পাপ ইচ্ছা ধরা পড়িয়া যায়; শ্রীযুক্ত বিস সাহেবের প্রস্তাবটীর সম্বন্ধে তাঁহাকে যদি ডাক্তার

শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসুর বীক্ষণাগারে মনোবিশ্লেষণের দ্বারা পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে মিঃ বিসের মনের এইরূপ কোন অপরিজ্ঞাত পাপ ইচ্ছা প্রকাশ হইয়া পড়িবে না ত ? এরূপ পরীক্ষার পূর্ব্বে স্বয়ং ভগবানই অবশ্য এ কথার যথাযথ উত্তর দিতে পারেন। তবে মিঃ বিস যদি রাজি হন, গিরীন্দ্রবাবুর সহিত আমার পরিচয় না থাকিলেও, তাঁহাকে উপরোধ অনুরোধ করিয়া, একবার বিশ্লেষণের ব্যবস্থা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

বিনিময়।

[শ্রীভক্তিসুধা হার]

কে তুমি এমন সহসা আসিয়া
হৃদয়ের দ্বারে দাঁড়ালে
আপন বুকের কোন্ সে মাণিক
আমার হৃদয়ে হারালে।
লও তবে মোর বুকের রতন
হে আমার চির মনের মতন
আপনা হারায়ে মোর হৃদি পানে
দুই হাত যদি বাড়ালে
মোর যাহা কিছু আছে ভরি দিনু তাই
রেখেছি যা' চির আড়ালে।

তোমার প্রাণের হারানো মাণিকে
আমার দৈন্য ঢেকেছি
অন্তরে তাই গোপন করিয়া
সে মহারতন রেখেছি,
শত সম্পদে ঢাকে নাই যাহা
নিমেষে আসিয়া ভরি দিলে তাহা
তব অঙ্গের ধূলি যতনে তুলিয়ে
আমার এ বুকে মেখেছি
তোমার আকুল বাসনাখানি রে
মর্ম্মে মর্ম্মে এঁকেছি।

কত কাল পরে, হে অজানা মোর,
বাঞ্ছিত ধন এনেছ
আপনি আসিয়া হৃদয় দুয়ারে
নীরবে যে কর হেনেছ
আপনি জানিয়া হারায়েছ যারে
কেন বৃথা আর খুঁজে মর তারে
হে রাজার রাজা, মোর যাহা আছে
সে রতনখানি চিনেছ
আপনা হারায়ে নিতে তাহা আজ
গোপনে কি তাই এসেছ ?

লও তবে বঁধু সে মহারতন
চিরকাল যারে বয়েছি
যে ধনে আমার সকল গরিমা
বুকে ক'রে তারে রয়েছি।
তুমি যদি দিলে বাঞ্ছিত ধনে
আর কিবা কাজ আমার রতনে
তোমার গলায় পরাতে যতনে
তব পাশে এনে ধরেছি
লহ প্রিয়তম, দয়িত আমার
এতকাল যারে বয়েছি।

চাঁদপ্রতাপের ব্রত-কথা।

[শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

(১৫) ঈড়াব্রলী ব্রত।

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষে রবিবার ও বৃহস্পতিবার দিবাভাগে ললনাগণ এই ব্রত করিয়া থাকেন। কেহ কেহ মাত্র এই মাসেই ব্রত করেন। আবার কোন কোন মহিলাকে এই মাসে আরম্ভ করিয়া তৎপরবর্ত্তী প্রতি মাসেই ব্রত করিতে দেখা যায়। সুখ-সৌভাগ্যাদির কামনা করিয়া রমণীগণ এই ব্রত করিয়া থাকেন।

ব্রতের পূর্ব্বে ব্রতিনী একুশটি আসল ধান খুঁটে চাউল বাহির করেন এবং কিয়ৎ পরিমাণ তণ্ডুলের চূর্ণ করিয়া রাখেন। তৎপর চাউল, গুড় ও দুগ্ধ দ্বারা পায়স ও উক্ত চূর্ণ দ্বারা একটি বড় ও ষোলটি ছোট গোলাকার পিষ্টক প্রস্তুত করেন। উক্ত একুশটি চাউল বড় পিষ্টকটির মধ্যে দেওয়া হয়। এই ব্রতের পায়স ও পিষ্টকই প্রধান খাদ্যোপকরণ। তদ্ভিন্ন দধি, দুগ্ধ, মোদক, ফল, মূল ইত্যাদিও সাধ্যানুসারে দেওয়া হয়। পুষ্প-পত্রাদি ও খাদ্যোপকরণ প্রভৃতি ব্রতস্থানে সাজাইয়া দেওয়া হইলে পর পুরোহিত শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে দেবী ভগবতীর পূজা করিয়া থাকেন। পূজা শেষে ব্রতিনী কিংবা অপর কোন মহিলা 'কথা' বলেন।

ব্রতের দিন ব্রতিনী দেবী-প্রসাদ পিষ্টকাদি ব্যতীত অন্য কিছুই আহার করিতে পারেন না। এই ব্রত চিরকালই করিতে পারা যায়। শাস্ত্রে এই ব্রতের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। নিম্নশ্রেণী রমণীদিগকে এ ব্রত করিতে দেখা যায় না।

'ব্রতকথা'—এক গ্রামে এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। দুইটি কন্যা জন্মিবার পর তাঁহার পত্নী পরলোকগতা হ'ন। মেয়ে দুইটির নাম রমুনা ও ঝমুনা। প্রতিবেশী ও আত্মীয়গণের একান্ত অনুরোধে ব্রাহ্মণ দ্বিতীয় বার বিবাহ করিলেন। নূতন গৃহিণী সংসারে প্রবেশ করিয়াই মেয়ে দুইটিকে নানারূপ যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিলেন। তাহারা বিমাতার স্নেহের কণামাত্রও লাভ করিতে পারিল না। মেয়েদের সুখ-সুবিধার জন্য ব্রাহ্মণ পুনরায় বিবাহ করিল; কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। কালক্রমে নূতন গিন্নি বৃদ্ধ পতিকে সম্পূর্ণরূপে নিজের বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। কন্যা দুইটির প্রতি পিতা আর ফিরিয়াও চাহেন না। এইরূপে দিন যাইতে লাগিল।

রমুনা ও ঝমুনা ঈড়াব্রলী ব্রত করিত। ইহা তাহাদের বিমাতার সহ্য হইত না। একদিন ব্রতের পর গৃহিণী পতিকে বলিলেন,—"তোমার এই সৃষ্টিছাড়া মেয়ে দুইটির কাণ্ড-কারখানা আমি যে আর চক্ষে দেখিতে পারি না। কি যে এক অদ্ভুত ব্রত করে এরা! ব্রত ত' নয়, খাল খাওয়া দাওয়ার একটি অছিলা মাত্র। এ ব্রত বৎসরে একদিন করিলে হয় না; প্রতি মাসেই, তাহাও আবার দুই দিন করা হয়। সন্তান হইবার বয়স আমার চলিয়া গেল। এরূপ ধারণা হয় যে, আমার সন্তান না হইবার কামনা করিয়াই এই ডাকিনীরা এই ব্রত করে। তুমি এ দুইটির শীঘ্র বিবাহ দাও; নতুবা যেখানে ইচ্ছা, সেখানে পার কর। এরা এখানে থাকিলে আমি সত্বরই বাপের বাড়ী চলিয়া যাইব। ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও।" নূতন গিন্নীর রূপমোহে অন্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"দুই একদিনে ত আর মেয়েদের বিবাহ দেওয়া যাইবে না। তা' কালই আমি তাহাদিগকে বহুদূরে যে-কোন স্থানে রাখিয়া আসিব, যেন তাহারা এখানে ফিরিয়া আসিয়া তোমাকে পুনরায় উৎপাত করিতে না পারে। তোমার সুখের জন্য তুমি আমাকে যাহা করিতে বলিবে, তাহাই আমি করিব।"

পরদিন প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণ মেয়েদিগকে ডাকিয়া বলিলেন,—"তোমাদের মাসী খবর পাঠাইয়াছেন সেখানে তোমাদিগকে লইয়া যাইতে। তাহার নাকি তোমাদিগকে

দেখিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছে। তোমাদের কাপড় চোপড় গুছাইয়া লও। এখনই রওনা হইতে হইবে।" তাহাদের মাসী কোথাও আছে বলিয়া তাহারা আর কখনও কাহারও নিকট শুনে নাই। আজ পিতার মুখ এই নূতন কথা শুনিয়া কন্যারা আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কিন্তু বিনা প্রতিবাদে তাহারা পিতৃ-আদেশ পালন করিল।

ব্রাহ্মণ, কন্যা দুইটিকে সঙ্গে লইয়া দুই তিন দিন পথ চলিয়া শেষ দিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক গ্রামে এক মঠের নিকট আসিয়া তথায় সে রাত্রিতে থাকিবার নিমিত্ত উপবেশন করিলেন। মঠের সন্ন্যাসী তখন ধ্যানমগ্ন ছিলেন। পথশ্রমে কাতর মেয়েরা পিতার হাঁটুতে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল এবং অত্যল্প কাল মধ্যেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল। সুযোগ বুঝিয়া পিতা মেয়েদের মাথা অতি সন্তর্পণে মাটীতে রাখিয়া, তাহাদিগকে ঐরূপ অবস্থায় সন্ন্যাসীর আশ্রমের সম্মুখে ফেলিয়া রাখিয়া তথা হইতে তস্করের ন্যায় প্রস্থান করিলেন। যখন সন্ন্যাসীর ধ্যানভঙ্গ হইল, তখনও নৈশ অন্ধকারে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন হয় নাই। সাধু পুরুষ বাহিরে আসিয়া নিদ্রিতা রমুনা ঝমুনাকে দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন যে, এই দুইটি পরমা সুন্দরী কিশোরী এখানে আসিল কিরূপে। তিনি পুনর্ব্বার ধ্যানস্থ হইয়া সকল বিষয় জানিতে পারিলেন ও তাহারা জাগরিত হইলে বলিলেন,—"তোমরা তোমাদের বিমাতার চক্রান্তে পিতা কর্ত্তৃক এই স্থানে পরিত্যক্ত হইয়াছ। তিনি মূঢ়ের ন্যায় তোমাদিগকে এখানে ফেলিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, কোন ভয় নাই তোমাদের। এখন হইতে আমি তোমাদিগকে কন্যাবৎ প্রতিপালন করিব। তোমরা আমার সঙ্গে আইস।" তিনি তাহাদিগকে আশ্রমে লইয়া গেলেন। রমুনা ঝমুনা তখন হইতে সন্ন্যাসীর আশ্রমে নিরাপদে বাস করিতে লাগিল।

ইহার অনেক কাল পর একদিন সেই দেশের রাজপুত্র ও তাঁহার বন্ধু কোতোয়ালের পুত্র এই মঠের নিকটবর্ত্তী বনে হরিণ শিকারে আসিয়া পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন, এবং মঠে উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসীর নিকট জল চাহিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে বসিতে আসন দিয়া, রমুনা ও ঝমুনাকে যাইয়া বলিলেন,—"তৃষ্ণার্ত্ত রাজপুত্র ও কোতোয়ালের পুত্র এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। তোমাদের দুইজনকে দুইটী পাত্র দিতেছি। উভয়ে নিজেদের একগাছি করিয়া চুল ছিঁড়িয়া পাত্রের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া সুবাসিত শীতল জলে পাত্র দুইটি পূর্ণ করিয়া বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে দিয়া আসিবে।" এই বলিয়া তিনি অপর গৃহ হইতে একটি সোণার ও একটি রূপার পাত্র আনিলেন এবং প্রথমোক্তটি রাজপুত্রকে জল দিবার নিমিত্ত রমুনার হস্তে ও দ্বিতীয়টী কোতোয়ালের পুত্রকে জল দানার্থ ঝমুনার হাতে দিলেন।

দুই ভগ্নী জলপাত্র হস্তে সন্ন্যাসীর সহিত রাজপুত্রদের নিকট আসিলেন। রমুনা রাজপুত্রকে ও ঝমুনা কোতোয়ালের পুত্রকে জলপাত্র দিলেন। দুই বন্ধুর তখন পাত্রের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। তাঁহারা তখন কিশোরীদিগকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখেন নাই। জল পান করিতে উদ্যত হইয়া উভয়েই দেখিতে পাইলেন জলের উপর চুল ভাসিতেছে। তাঁহারা উহা হাতে রাখিয়া, এক নিঃশ্বাসে জল পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিলেন ও পরে চুল মাপিয়া দেখিলেন যে, দুইটিই দৈর্ঘে আড়াই হাতের অধিক। তখন তাঁহারা সম্মুখে দণ্ডায়মানা সুন্দরী কিশোরীদ্বয়কে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, এই দীর্ঘ কেশ দুইগাছি নিশ্চয় ইহাদের। রাজপুত্র রমুনা ও কোতোয়ালের পুত্র ঝমুনার সৌন্দর্য্য দর্শনে বিমোহিত হইলেন। তাঁহারা সন্ন্যাসীর সহিত নানাবিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন। এই সময় সাধু পুরুষের ইঙ্গিতে দুই ভগ্নী নিজেদের গৃহে চলিয়া গেলেন। কথা-প্রসঙ্গে কিশোরীদের পরিচয় অবগত হইয়া সন্ন্যাসীর নিকট রাজপুত্র রমুনার ও কোতোয়ালের পুত্র ঝমুনার পাণি প্রার্থনা করিলেন। তিনি সাগ্রহে তাঁহাদের এ শুভ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

সত্বরই খুব আড়ম্বর সহকারে তাঁহাদের বিবাহ হইল। বিবাহের পর দুই বন্ধু স্ত্রীসহ নিজেদের বাড়ী গেলেন। ইহার কিছুকাল পর রাজা ও কোতোয়াল পুত্রদের উপর সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া ইহলীলা সংবরণ করিলেন।

অসীম সুখের অধিকারিণী হইয়া রাণী রমুনা ব্রতের

কথা ভুলিয়া গেলেন। ব্রত ভঙ্গ করায় দেবী তাঁহার প্রতি অপ্রসন্না হইলেন। দেবীর কোপে রাজ-সংসার ক্রমেই ছারেখার যাইতে লাগিল। কোতোয়াল মহিষী ঝমুনা নিয়মিত ভাবে ভক্তিসহকারে ব্রত করিয়া আসিতেছেন। কোতোয়ালের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

কালক্রমে রাজার পথের ভিখারী হইতে আর বড় বেশী বিলম্ব রহিল না। কোতোয়াল অগাধ ধন সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। তাঁহার উন্নতিতে রাজার ঈর্ষা জন্মিল। রাজা বন্ধুকে শত্রুবৎ মনে করিতে লাগিলেন।

ঝমুনা মনে করিলেন যে, তাঁহার দিদি নিশ্চয়ই ব্রত করেন না। তাহা না হইলে তাঁহাদের এরূপ দুর্গতি হইতে পারে না। একদিন তিনি তাঁহার দিদিকে নিজ বাটীতে লইয়া আসিলেন এবং কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, বাস্তবিকই তিনি অনেকদিন হইতে ব্রত করেন না। ঝমুনা অনেক বুঝাইয়া তাঁহাকে ব্রত করিতে সম্মত করাইলেন। যথাসময়ে রাণী ব্রত করিলেন। রাজার দুঃখ-দুর্গতিও ক্রমশঃই দুর হইতে লাগিল। রাজারও সুমতি ফিরিয়া আসিল। বন্ধুর প্রতি ঈর্ষার ভাব আর তাঁহার মনে স্থান পাইল না। তাঁহারা দুই বন্ধুতে পূর্ব্বের ন্যায় আমোদ-আহ্লাদে পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

একদিন রমুনা ঝমুনাকে কথায় কথায় বলিলেন,— "আমরা নিজেরা ত' বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছি; কিন্তু আমাদের পিতৃদেব আর্থিক অভাবে ও বিমাতার কটুবাক্যে না-জানি কত কষ্ট পাইতেছেন! চল না বোন্ একবার তাঁহাকে দেখিয়া আসি!" ঝমুনা দিদির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। উভয়ে উভয়ের পতির অনুমতি লইয়া যথা সত্বর লোক-লস্করাদি সহ উত্তম শকটে আরোহণ করিয়া পিত্রালয়ে গমন করিলেন। যথাসময়ে তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলেন। যাহা তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক। ব্রাহ্মণের দিন চলা ভার হইয়া পড়িয়াছে। গৃহিণীর সে দুর্দ্দান্ত ভাব এখন একরূপ নাই বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে অভ্যাসের দোষে পতিকে বাক্য-বাণে জর্জ্জরিত করিতে ছাড়েন না।

ব্রাহ্মণ বহুকাল পর কন্যাদিগকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। বিমাতা মেয়েদের ঘর-বরের কথা শুনিয়া সুখ অনুভব করিলেন। তিনি তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহারই করিতে লাগিলেন। মেয়েরা তাঁহাকে অনেক বলিয়া কহিয়া ঈড়াব্রলী ব্রত করিতে মত করাইলেন। যথাসময়ে তিনি ব্রত আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণের দুরবস্থা ক্রমেই দূর হইতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার সকল কষ্ট বিদূরিত হইল। দুই ভগ্নী কিছুকাল পিত্রালয়ে বাস করিয়া একদিন পিতা ও বিমাতার নিকট বিদায় লইয়া নিজেদের বাটীতে চলিয়া গেলেন।

ব্রত-মাহাত্ম্য দেশান্তরে প্রচারিত হইল। সকল স্থানের মহিলাগণ ভক্তি-পূত মনে ঈড়াব্রলী ব্রত করিতে লাগিলেন।

লছমিন।

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম-এ, বি-এল]

কমিসারিয়েটের পেনসন্-প্রাপ্ত বড়বাবু বহু বৎসর পরে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। স্বগ্রামে পুরাতন পৈত্রিক ভিটাটি মেরামত ও স্থানে স্থানে নূতন ফ্যাসানের বারাণ্ডা সিঁড়ি কার্ণিশ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া তাহার নাম দিয়াছেন "কমিসারিয়েট্ ক্যাম্প।" পাঁচ মহল বাড়ীখানি কাচ পাথর ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত আসবাবে সুসাজ্জত করিতে যে কত অর্থ ব্যয় হইয়াছিল তাহা হরদয়ালবাবুর ম্যানেজার বোসজা মহাশয় বলিতে পারিবেন। বোসজা চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকায় হরদয়ালবাবুর অধীনে সেনানিবেশে ক্লার্কের কার্য্য করিতেন। তাঁহার তিনকুলে আপনার বলিতে কেহ ছিল না। সেইজন্য তিনিও পেনসন্ লইয়া হরদয়ালবাবুর সঙ্গে দেশে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার পুরাতন মনিব

তাঁহাকে নিজের বিষয়াদির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

সর্ব্ব বিষয়ে সুখ মানুষের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। হরদয়ালবাবু অপুত্রক ছিলেন। তিনি পুত্রের আশায় উপর্য্যুপরি চারিটী বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার চারিটী পত্নীই জীবিতা। উক্ত পাঁচ মহল বাটীতে সদর মহলের পরে প্রত্যেক মহলে তাঁহাদের একজন কর্ত্রীরূপে অবস্থান করিতেন। যদুগোপাল হরদয়ালবাবুর একমাত্র ভাগিনেয়। মাতুলের অবর্ত্তমানে যদুগোপালই তাঁহার বিষয়ের অধিকারী হইবে। যদুগোপাল বিবাহযোগ্য হইলে তাহার মাতুল পাত্রীর অনুসন্ধানে একাধিক ঘটক ও ঘটকী নিযুক্ত করিলেন। বসুজ মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া হরদয়ালবাবু স্থির করিয়াছিলেন যে, কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলের বিবাহ কৌলীন্য প্রথানুযায়ী সম্পন্ন হওয়াই উচিত। রূপ গুণ পর্য্যায় বংশ ধনদৌলত প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পাত্রী যোগাড় করা কিন্তু সহজ ব্যাপার নহে। সেই কারণে যদুগোপালের বিবাহ বাঞ্ছনীয় হইলেও সুপাত্রীর অভাবে তাহাকে বাধ্য হইয়া কৌমার্য্য অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। নানান্ কারণে যদুগোপালের সত্বর বিবাহের জন্য হরদয়ালবাবু উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। বসুজ মহাশয়কে তিনি প্রত্যহই পাত্রীর জন্য এমন বিরক্ত করিতেন যে বৃদ্ধ ম্যানেজার শেষটা কর্ত্তার সঙ্গে প্রতিদিন যাহাতে সাক্ষাত না হয় তাহার বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন।

হরদয়ালবাবু কয়দিন ধরিয়া বোসজার অনুসন্ধান করিতেছেন। চাকর নফরদেরকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিত, ম্যানেজারবাবু আজ অমুক গ্রামে পাত্রীর সন্ধানে গিয়াছেন, গতকল্য তিনি অমুক মহলে খাজনা আদায়ের জন্য রওনা হইয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপে কয়েক দিন গত হইলে একদিন বৈকাল বেলা কর্ত্তা যখন পঞ্চম মহলে কালাচাঁদ বটিকা সেবন করিয়া তাহার অনুপান দুধের সর মিশরি চূর্ণ সহযোগে ভক্ষণ করিতেছেন সেই সময়ে খবর আসিল, বসুজ মহাশয় জরুরি সংবাদ লইয়া সদর মহলে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। হরদয়ালবাবু তাড়াতাড়ি বহির্বাটীতে আসিয়া বোসজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, তোমার জরুরি খবরটা কি শুনি, পাত্রীর সন্ধান হয়েছে না কি ?"

"এক রকম পাত্রীই বটে, কিন্তু সমাজে ত আর চ'লবে না।"

'টাকা থা'কলে সমাজে কি না চলে? সর্ব্বদোষো হরে মুদ্রা।"

"এ ক্ষেত্রে পাত্রী ত সমাজে চলবেই না, অধিকন্তু পাত্রের দোষে আপনাকে মিথ্যা নিন্দার ভাগী হ'তে হবে।"

"ব্যাপারটা কি স্পষ্ট ক'রেই বল না ?"

"কি আর বলব! ছোটবাবু স্ত্রী-ঘটিত একটা অত্যন্ত গর্হিত কায করতে ব'সেছেন। তাতে ক'রে আপনার মাথা সমাজের কাছে হেঁট হয়ে যাবে।"

হরদয়ালের বুকের ভিতরটায় ছাঁৎ করিয়া উঠিল। তাঁহার দৃষ্টি সেই সঙ্গে বাটীর শেষ মহলের দিকে অকস্মাৎ আকৃষ্ট হইল। তাঁহাকে আনমনা দেখিয়া বোসজা বলিলেন, "অত বড় আইবড় ছেলেকে আদর দিয়ে আপনি তার স্বভাব চরিত্র বিগড়িয়ে দিয়েছেন। বাড়ীতে কতকগুলো কুপোষ্য জুটেছে, তাদের সঙ্গে মিশে ছোটবাবু এক ডোমের মেয়ের বাড়ীতে আজ ক'দিন থেকে আনাগোনা করছেন। আমি খবর পেয়েই আপনাকে জানাতে এসেছি।" বোসজার কথা শুনিয়া কর্ত্তার মুখে হাসি ফুটিল। তিনি সহাস্য বদনে বলিলেন, "বোসজা, যদুগোপালের দোষ নয়, তার বয়েসের দোষ।"

"দোষ ত বটে ?"

"কি হয়েছে সব কথা খুলেই বল না। তুমি যে ভয় দেখিয়ে দিয়েছিলে যেন জেতোপাত হয় আর কি !"

"তা হ'লে ত বরং রক্ষা ছিল। এ যে ফৌজদারি হবে, মেয়ে চুরির মকর্দ্দমায় আসামী হয়ে শেষে সেশনে সোপর্দ্দ হ'তে হবে।"

হরদয়ালবাবুর মাথাটা আবার ঘুলিয়ে গেল। "তোমার দোহাই বোসজা, কি হয়েছে ভেঙ্গে বল, আর দগ্ধো না।"

"আমাদের এই সহরের এক ক্রোশ দক্ষিণে আপনার কাজিপুর তালুকে ত্রিশ ঘর ডোমের বাস। তারা সব

আপনার প্রজা। চূড়ামন ডোমের একটা মেয়ে আছে, দেখতে না কি খুব সুন্দরী, বয়েস কুড়ি বৎসর, এখনও বিয়ে হয়নি। আপনার পান্ধী বেহারা মার্কণ্ড বলে, ছোটবাবু তাকে নিয়ে সামনে হপ্তায় রেঙ্গুনে পালাবার বন্দোবস্ত করছেন।"

"কথাটা আমার মনে লাগল না। ডোমের মেয়ে এমন সুন্দরী যে কুলীন বামুনের ছেলে পাঁচ লাখ টাকার বিষয়ের আশা ছেড়ে দিয়ে তাকে নিয়ে দেশ ছাড়া হয়ে যাবে? একথা পাগল না হ'লে কেহ বিশ্বাস করবে না। তুমি কি নিজে মেয়েটাকে দেখেছ?"

"আজ্ঞে না।"

"তা হ'লে কাগের মুখে কথা শুনে একেবারে নেচে উঠেছ! নিজে খবর নিয়ে কালকে আমাকে বলবে, তবে আমি এর বন্দোবস্ত করব। বুঝেছ?"

বোসজা কর্ত্তার কথায় একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সঠিক সংবাদ লইবেন বলিয়া চলিয়া গেলেন। ইহার পর তিন চারিদিন হরদয়ালবাবু বোসজাকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার মনটায় কেমন একটা সন্দেহের আবছায়া পড়িয়া রোমান্সের মত কতকটা কল্পিত ঘটনায় ছাঁচ প্রস্তুত করিতেছিল। তিনি বোসজার জন্ত আর অপেক্ষা না করিয়া তাঁহাকে বাটী হইতে ডাকাইয়া আনিলেন। বোসজা হরদয়ালবাবুকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "না, মেয়েটা তেমন রূপসী নয়, আর সে ছোটবাবুর প্রতি আসক্তা বলিয়া মনে হয় না। তা ছাড়া, এ তল্লাটের পাঁচ সাতখানা গ্রামের কি ভদ্র, কি ছোটলোক সবাই তার উপর নজর রেখেছে, তাকে নিয়ে যে কেহ পালিয়ে যেতে পারে এমন সম্ভাবনা নাই।" বোসজার কথা শুনিয়া হরদয়ালবাবু আশ্চর্য্য হইলেন। বোসজা চলিয়া গেলে তিনি ব্যাপারখানা কি, নিজে তদন্ত করিয়া জানিবার জন্ত তাঁহার বিশ্বাসী কারপরদাজ রামপ্রসাদকে ডাকাইলেন। তাহাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "চূড়ামন ডোমের মেয়েটা কি যথার্থই সুন্দরী?"

"আজ্ঞে, লোকে ত বলে।"

"কেন? তুই ত খাজনা তসিলতে কাজিপুরে রোজ যাস্, তুই কি তাকে দেখিস্ নি?"

"আজ্ঞে, দেখেছি বৈ কি, কথাও কয়েছি।"

"তবে আবার আমার সঙ্গে ন্যাকামি করছিস কেন?"

"বাবু, আপনারা বড়লোক, আর আমরা গরীব, আমাদের নজরে যা' ভাল তা' কি আপনাদের নজরে ভাল লাগবে?"

"সে যাই হ'ক, আমি একবার সেই মেয়েটাকে দেখতে চাই, আমাকে দেখাতে পারিস্?"

"বাবু, অমন কাজ করবেন না, আপনার মাথা ঘুরে যাবে, শেষে কি একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড হবে? আপনি এখানকার রাজা, প্রজার মেয়ে যে আপনার নিজের মেয়ের সমান।"

হরদয়ালবাবু বুঝিলেন যে রামপ্রসাদের ইচ্ছা নয় তিনি চূড়ামনের মেয়েকে দেখেন। তাঁহার কৌতূহল পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইল। তিনি কৃত্রিম কোপ দেখাইয়া বলিলেন, "আমার যাই হ'ক, আমার জন্যে তোর এত মাথা-ব্যথা কেন?"

"আমি আপনার নিমকের চাকর। আপনার সর্ব্বনাশ হয় এটা আমার ইচ্ছে নয়। ছোটবাবু ত তাকে দেখে পাগল হয়েছেন। তিনি নাওয়া-খাওয়া বন্ধ ক'রে কাজিপুরে চন্দন পুকুরের ঘাটে ব'সে থাকেন। কখন লছমিন কলসী নিয়ে ঘাটে আসবে, তাকে দেখেও তাঁর সুখ। তারপর বুড়ো বোসজা এখন সেখানে জুটেছেন। চন্দন পুকুরের পাড়ে চৌকি পেতে তিনি ব'সে থাকেন, জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, সকাল সন্ধ্যা এখানকার হাওয়া খেলে শরীর ভাল থাকে। মাঝে থেকে চূড়ামন বেশ দু' পয়সা হাতাচ্ছে, আর তাড়ি, ধেনো মদ, খাসির মাংসের শ্রাদ্ধ করছে।"

"বটে! ব্যাপার এতটা গড়িয়েছে? চূড়ামনের মতলবটা কি?"

"তার মতলব মেয়েটাকে দিন কতকের জন্যে একজন বাবুকে বিক্রী করবে। তারপর তাই নিয়ে একটা গোলমাল বাধিয়ে মেয়েটাকে বাবুর হাত থেকে ছাড়িয়ে আবার ঘরে আনবে, পঞ্চায়েতকে দাঁড় দিয়ে জাতে উঠাবে, আবার মেয়েটাকে আর একজনকে গছিয়ে দেবে। পঞ্চায়েতের

খরচ, ইজ্জতের দাম, খোর-পোষ, এই সব বাবদে অনেক টাকা হেঁকেছে। যে টাকাটা আগে তার হাতে দেবে, সেই মেয়েটাকে পাবে।"

"মেয়েটার বিয়ে দেয় নি বুঝি এইজন্যে?"

"তা' নয় ত আর কি, বাবু! ছোটলোকে টাকাটাই বোঝে ভাল। তবে, লছমিনকে কেহ যে বশ করতে পারবে ব'লে আমার ত মনে হয় না। সে তার বাপ মাকে স্পষ্ট ব'লেছে, যে তাকে বিয়ে করবে সেই তাকে নিয়ে যাবে, নইলে কেহ তাকে পাবে না। ছেলেবেলা সে গাঁয়ের খৃষ্টানি মেয়ে স্কুলে একটু লেখাপড়া শিখেছিল। ভদ্রলোকের মেয়েদের মত তার জ্ঞান জন্মেছে।"

হরদয়াল বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তুই এত খবর জানলি কি ক'রে?"

"আমি ত তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। তার বাপ মাও বিয়ে দিতে রাজী হয়েছিল, এমন সময় ছোট বাবু গিয়ে পড়লেন, সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। আমি গরীব মানুষ, আমার ত টাকার জোর নাই।"

"বলিস্ কিরে রামপ্রসাদ! তুই গরীব হ'লেও বামুনের ছেলে ত বটে, তুই ডোমনিকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিলি? হিঁদুয়ানি দেখছি দেশ ছেড়ে চ'লে গেছে।"

"দেখুন, আমার তিনকুলে কেহ নাই। ছিলেন এক বুড়ো মা, তাঁকে চোখের জলে ভাসিয়ে বাঙ্গালী নেতাদের বক্তৃতা শুনে নেচে উঠে যুদ্ধে ডুলিবেহারার কায নিয়ে মেসপটে গেলাম। বোগদাদে ত আপনি দেখেছেন, যারা বেঙ্গল রেজিমেণ্টে ছিল তাদের মধ্যে জাত-বিচার আর হিঁদুয়ানি কোথাও ছিল কি? তবু তারা ফাইটিং লাইনে যায়নি। আমরা বোগদাদ থেকে কুটেল-আমারায় গিয়ে আটক পড়লেম। কত কষ্ট সহ্য করেছি; কি না খেয়েছি; কার হাতে না খেয়েছি! কৈ তখন ত কেহ হিঁদুয়ানির কথা তোলেনি? যখন দেশে ফিরে এলেম, বাস্—নেতারা যে যার ঘরে সরে পড়লেন আর আমাদের খোঁজ করলেন না। ভাগ্যিস্ আপনার সঙ্গে জানা শুনা হয়েছিল, তাই আপনি দয়া ক'রে আমাকে চাকুরি দিয়েছেন। যদি মেসপটে ম'রে যেতাম তাহ'লে কি এদেশের হিঁদুয়ানি পরায় আমার পিণ্ডি দিত? দেশে এসে শুনলাম, মা আমার কেঁদে কেঁদে ব্যারামে প'ড়ে মারা গেছেন। নেতারা কি তাঁর খবর রেখেছিলেন? কমিসারিয়েটের কাযে মাথার চুল পাকিয়েছেন, এখন আর আপনার মুখে হিঁদুয়ানির কথা শোভা পায় না। বামুনের ছেলে রাজার যুদ্ধে গিয়ে ডুলি বেহারার কায ক'রেছিলাম ব'লে আমাকে এখানে সকলে ডোম, ডুলি-বেহারা ইত্যাদি বলে। আমি সমাজের চক্ষে ডোমেদের সামিল হয়ে গিছি।"

হরদয়াল বাবু অবাক হইয়া রামপ্রসাদের বক্তৃতা শুনিতেছিলেন। রামপ্রসাদ নিশ্বাস ফেলিয়া আবার আরম্ভ করিল—"হিঁদুয়ানি ত আমাকে রূপসী ব্রাহ্মণ কন্যার সঙ্গে বিয়ে দেবে না? আমার টাকা থাকলে হয়ত ছোটবাবু আর বোসজার মত হিঁদুয়ানি বজায় রেখে গরীবের মেয়ের সর্ব্বনাশ করতেম।"

হরদয়াল বাবুর এইবার চমক ভাঙ্গিল। তিনি রামপ্রসাদের বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে স্থির করিয়া লইয়াছিলেন যে, যদুগোপালকে ডোমনির সৌন্দর্য্যের মোহ হইতে বাঁচাইতে হইলে আর বোসজার মাথাটা ঠাণ্ডা করিতে হইলে রামপ্রসাদ যাহাতে লছমিনকে হস্তগত করিতে পারে সেই রাস্তায় তাঁহাকে চলিতে হইবে। তিনি গম্ভীরভাবে রামপ্রসাদকে বলিলেন, "তুই ঠিক ব'লেছিস, হিঁদুয়ানিটা আমাদের দেশে গরীবের উপর যতটা আইন চালায়, ধনীদের উপর তার দশ ভাগের একভাগও চালায় না। আচ্ছা, আমি যদি তোর সহায় হই, তা হ'লে তুই লছমিনকে বিয়ে করতে পারিস্?"—"নিশ্চয়।"

হরদয়াল বাবু অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পাইয়াছিলেন। তিনি সেই দিনই জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সব কথা বলিলেন। ফৌজদারি আদালতের সুপ্রসিদ্ধ উকিল সুরেশ বাবুর সঙ্গেও তিনি পরামর্শ করিলেন। তারপর তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া রামপ্রসাদকে বলিলেন, "মেয়েটাকে এনে তোর ঘরে রেখে দে, পরে যা হয় তার বন্দোবস্ত আমি করব।" রামপ্রসাদ লছমিনের সঙ্গে গোপনে দেখা ক'রে ভোরের বেলায় তাহাকে কাজিপুর হইতে লইয়া আসিয়া নিজের ঘরে রাখিয়া দিল।

রাস্তায় তাহাদিগকে দুই একজন লোক দেখিয়াছিল। তাহারা মনে করিল, লছমিন বোধ হয় ছোটবাবু আর না হয় বোসজার বৈঠকখানায় চলিয়াছে। একটু বেলা হইলে প্রকৃত কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। ছোটবাবু ও বোসজা রামপ্রসাদের উপর মনে মনে অত্যন্ত চটিয়া গেলেও প্রত্যক্ষ ভাবে তাহার বিরুদ্ধে তাঁহারা কিছু করিতে সাহস করিলেন না। চূড়ামনকে তাঁহারা রামপ্রসাদের বিরুদ্ধে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট নালিশ করিতে উপদেশ ও তজ্জন্য অর্থ প্রদান করিলেন।

মোক্তার চূড়ামনের তরফ হইতে মেয়েচুরির নালিশের আর্জ্জি লিখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট দাখিল করিলে বিচারপতি আর্জ্জি পাঠ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আসামীর পক্ষ হইতে কোনও নালিশ আছে?" সুরেশবাবু উঠিয়া বলিলেন, "হুজুর, রামপ্রসাদ ও লছমিনের পক্ষ হইতে আমি দরখাস্ত দাখিল করিব। দরখাস্তের মুসাবিদা প্রস্তুত হইয়াছে, ফেয়ার-কাপি হইলেই দাখিল করিব।" ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার মক্কেল কোথায়?" সুরেশবাবু বলিলেন, "আমার সেরেস্তায় তাহারা বসিয়া আছে।" ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হুকুম দিলেন, "টিফিনের পর উভয়পক্ষের দরখাস্তের শুনানী হইবে।" টিফিনের পর তিনি যখন এজলাসে বসিলেন, আদালত ঘর দর্শকবৃন্দে তখন ভরিয়া গিয়াছে। বাহুল্যলোক আদালতের উঠানে নালিশের ফল জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া বসিয়াছিল। হাকিম প্রথমে চূড়ামনের এজেহার লইলেন।

"লছমিনের বয়স কত?"

"কুড়ি বছর।"

"তার বিয়ে হয়েছে?"

"না।"

"বিয়ে দাও নি কেন?"

"ভাল বর পাইনি।"

"ভাল বর পেলে বিয়ে দেবে?"

"হাঁ।"

"রামপ্রসাদের সঙ্গে লছমিনের বিয়ের কথা হয়েছিল?"

(উত্তর নাই)।

মোক্তার বলিলেন, "হুজুর, রামপ্রসাদ বামুনের ছেলে, তার সঙ্গে কি ক'রে ডোমের মেয়ের বিয়ে হবে?" হাকিম বলিলেন, "যদি বর ক'নে রাজি হয়, তাহ'লে বৈষ্ণব মতে কিম্বা সিভিল বিবাহ আইনে বিয়ে হ'বার বাধা কোথায়? লছমিন এখন সাবালিকা, সে যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে।" ইহার পর ম্যাজিষ্ট্রেট লছমিনের এজেহার লইলেন।

"তোমাকে রামপ্রসাদ চুরি করিয়া আনিয়াছে?"

"না, আমি স্ব ইচ্ছায় তার সঙ্গে চ'লে এসেছি।"

"কেন?"

"আমাকে সে বিয়ে করবে ব'লেছে।"

"তুমি কার কাছে থাকিতে চাও?"

"রামপ্রসাদের সঙ্গে বিয়ে হ'লে তার কাছে থাকতে চাই।"

"তোমার সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়েছিল?"

"হঁ।"

"বিয়ে হ'ল না কেন?"

"পয়সাওয়ালা লোকে আমার বাপকে তাড়ি মদ খাইয়ে আমাকে কিনতে চায়।"

"ডিস্‌গ্রেসফুল—অত্যন্ত লজ্জার কথা।"

ইহার পর হাকিম রামপ্রসাদের এজেহার লইলেন।

"তুমি কি কায কর?"

"হরদয়াল বাবুর কারপরদাজ।"

"আগে কি কায করতে?"

"ডুলি কোরে মেসপটে গিয়েছিলাম।"

"সার্টিফিকেট পেয়েছ?"

"সার্টিফিকেট ও মেডেল পেয়েছি।"

রামপ্রসাদ হাকিমকে সার্টিফিকেট ও মেডেল দেখাইলে তিনি সেগুলি পরীক্ষা করিলেন।

"তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, ডোমের মেয়েকে বিয়ে করবে?"

"হুজুর, রাজার যুদ্ধে নেতাদের কথায় প্রাণ দিতে গিয়েছিলাম। যুদ্ধে মড়া বহিতাম বলিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলে সমাজে আমাকে ডোমের সামিল ক'রেছে।"

"নেতারা বুঝি এখন গবর্ণমেণ্টের কাছে উপাধি লাভ ক'রে যে যার ঘরে স'রে পড়েছেন?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

হাকিম সুরেশ বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনাদের নেতাদেরকে বাহবা দিতে ইচ্ছা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নালিশি আর্জির পৃষ্ঠে এই হুকুম লিখিলেন,—"লছমিন সাবালিকা। সে আসামী রামপ্রসাদকে বিবাহ করিতে চায়। যাহার সঙ্গে ইচ্ছা সে যাইতে পারে। প্রস্তাবিত বিবাহের জন্য মকদ্দমা এক সপ্তাহ মুলতবী রহিল। ইহার মধ্যে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইলে রামপ্রসাদ ও লছমিন দরখাস্ত দাখিল করিবে।"

এক সপ্তাহের মধ্যে রামপ্রসাদের সঙ্গে লছমিনের সিভিল বিবাহ আইন মতে শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল। অনেক উকিল মোক্তার ও হরদয়াল বাবু নিজে সেই বিবাহ বাসরে উপস্থিত ছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বর ক'নে দরখাস্ত দ্বারা তাহাদের বিবাহের কথা জ্ঞাপন করিলে হাকিম নালিশের কাগজ পত্র আদালতে জমা রাখিবার লিখিত হুকুম দিয়া সুরেশ বাবুকে বলিলেন, "আমি আশা করি এই নালিশের বিবরণ আপনি কোনও বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত করিবেন।"

সংগ্রহ ও সঙ্কলন।

রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা।

আমি সম্প্রতি চীন জাপান ঘুরে এসেছি। সেখানে আমি কি বলেছি এবং করেছি তাই নিয়ে খবরের কাগজে সম্ভব অসম্ভব অনেক আলোচনা হয়েছে। সেই সব পড়ে আপনারা হয়তো নানা রকম কল্পনা করেছেন। সে সব কথা একদিন আমার বন্ধুরা, যাঁরা আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন—ক্ষিতিমোহন সেন ও নন্দলাল বসু—তাঁরা আপনাদের বল্‌বেন। তার আগে আপনারা হয়তো জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, আমি কি উদ্দেশ্য নিয়ে সেখানে গিয়েছিলাম? আমি প্রথমেই আপনাদের বল্‌তে চাই যে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আমি সেখানে যাই নি। সমগ্র এসিয়াকে এক করবার বাণী বহন করে, ভারতের প্রতিনিধি হয়ে আমি সেখানে যাই নি। জগতের সমক্ষে নিজের দেশকে প্রখ্যাত ক'রব বা নিজের দেশের গৌরব বৃদ্ধি ক'রব এরকম কোন উদ্দেশ্য বিদেশযাত্রা কালে আমার মনে ছিল না। আমি যা বলব তা হয়তো আপনাদের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে, ইচ্ছার সঙ্গে মিলবে না। (শ্রোতাদের মধ্যে প্রবল কোলাহল)। আমার কথা হয়তো আপনারা সকলে শুন্‌তে পাবেন না, সেই জন্য আপনাদের ধৈর্য্য প্রার্থনা করি। আমার কণ্ঠ যাতে আপনাদের সকলের কাছে পৌঁছায় আমি তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি। কিন্তু আমি তো আমার শক্তিকে অতিক্রম করতে পারবো না। আমার শরীর অত্যন্ত দুর্বল ও ক্লান্ত, সব কথা হয়তো বলতে পারবো না। আমি আমার বন্ধুদের বিশেষ অনুরোধেই আমার শক্তির সীমা অতিক্রম করে'ই এখানে এসেছি। কোলাহলের মধ্যে বৃথা শক্তি ব্যয় করবার মত শক্তি আমার নেই। আমার ৬৫ বৎসর বয়স হ'ল, সে অপরাধ আমার নয়। এইটা মনে করে আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন।

আমি আপনাদের বলেছি যে আপনার দেশের জয় কীর্ত্তন ক'রে তাঁদের চিত্তজয় ও ভারতের খ্যাতি বৃদ্ধি করবার উদ্দেশ্যে আমি বিদেশে যাই নি। যাঁরা আমাকে ডেকেছিলেন, তাঁরা শ্রদ্ধা ক'রে ভালবেসে ডেকেছিলেন। আমিও মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক সম্বন্ধের আকর্ষণ স্বীকার করে' তাঁদের সঙ্গে সহজভাবে মিলতে গিয়েছিলুম।

এসিয়াকে এক করতে বা এই রকম একটা কিছু প্রচার কার্য্য নিয়ে আমি যদি সেখানে যেতুম, তা হ'লে সেইটাই তাদের সঙ্গে সহজ সম্বন্ধ স্থাপনে বাধা হ'ত। আপনার দেশের মহত্বের অহঙ্কারে কোন Missionary spirit নিয়ে তাঁদের ধন্য করতে, সভ্য করতে আমি যাই নি। বহুদিন হ'তে এই চীনের বিষয়ে আমার একটা কল্পনা ছিল। এতবড় প্রাচীন সভ্যতার প্রাণ শক্তিকে দেখবার, প্রত্যক্ষ করবার ইচ্ছা ছিল। এই দেশের উপর দিয়ে কত বিপ্লব, বিরোধ আক্রমণের ঝড় চলে গেছে, কিন্তু একে মারতে পারে নি। এই সমস্ত বিপদ ও বাধার উপরে থেকে মানুষ আপনার প্রাণকে স্থায়ী করেছে, জয়ী করেছে। এইরকম একটা জাতির প্রাণশক্তি দেখবার জিনিষ। তীর্থযাত্রী তীর্থে যায়, দেবমন্দিরে গিয়ে ভক্তির দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা দেবতাকে প্রত্যক্ষ করতে চায়। সেই রকম আমার উদ্দেশ্য ছিল এ জাতির বিরাট প্রাণশক্তির মন্দিরে, বিপুল

সঞ্জীবনীশক্তির বেদীতলে দাঁড়িয়ে নিজে ধন্য হওয়া, তাদের ধন্য করা নয়।

বিদেশ যাত্রার অনেক বাধা। এই যে জাতি, কত সহস্র বর্ষ ধরে' সাহিত্য, চিত্র, ধর্ম্ম প্রভৃতিতে বিচিত্রভাবে আত্মপ্রকাশ ক'রে চলেছে, সে সমস্তই জানবার জিনিষ। কিন্তু তাদের ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন আচার, দৈনন্দিন ভিন্ন ব্যবহারের বৃহৎ প্রাচীর অতিক্রম করে' সেখানকার মানুষের প্রাণের গভীরতায় প্রবেশ করা কত শক্ত। মানুষের প্রাণের মন্দিরে প্রবেশ করতে হ'লে শ্রদ্ধা নিয়ে প্রবেশ করতে হয়। এটা করে না বলেই Missionaryরা কখনও কোন জাতির অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। তারা আসে নিজেকে বড় মনে ক'রে অপরকে শিক্ষা দিতে, সভ্য করতে, দয়া করতে, একটা বিরাট ঔদ্ধত্য নিয়ে। এই রকম অযাচিত ঔদ্ধত্যের দ্বারা কোন জাতিকে অপমান করবার অধিকার কারও নেই। আমরাও প্রাচীন জাতি, আমাদের প্রাচীন সভ্যতার একটা গৌরব হয়ত থাক্‌তে পারে, ও স্বেচ্ছায় সেই গৌরবের অংশ নিয়ে তাঁরাও হয়ত নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতে পারেন। কিন্তু সেই প্রাচীন জাতির জীবনের মাহাত্ম্য, তাঁদের দেবশক্তি, তাঁদের মধ্যে বহুধা শক্তিতে যাঁর প্রকাশ, তাঁকে ভক্তি করবার মত শক্তিও আমাদের থাকা চাই।

আমি তাই নত হয়ে গিয়েছিলুম, মাথা খাড়া করে সেখানে যাই নি। আমি তাঁদের গোড়াতেই বলেছিলুম যে, আমি তাঁদের কিছু শেখাতে আসি নি, কোন বাণী তাঁদের কাছে বহন করে নিয়ে যাই নি। আমি তাঁদের বন্ধুত্ব চাই। আর তাঁদের আতিথ্য দেখে, সৌহার্দ্দ্য দেখে, প্রাণের পরশ পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলুম। আমি তাঁদের গোড়াতেই বল্লুম, 'তোমরা মনে করেছ আমি একজন ঋষি, prophet, তোমাদের অনেক ভাল ভাল কথা শোনাব; কিন্তু আমার কাছ থেকে সে সব কিছু প্রত্যাশা ক'র না। আমি ঋষি নই, আমি কবি।' তারা বলে, 'তুমি যখন ভারত থেকে আসছ, তখন ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞানের বোঝা।' আমি বল্লাম 'আমি তত্ত্বজ্ঞানী নই। দর্শনশাস্ত্র বা তত্ত্বজ্ঞানে ভগবান আমাকে কোন অধিকার দেন নাই। তিনি যদি কিছু দিয়ে থাকেন, হৃদয় দিয়ে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করবার পাথেয় দিয়েছিলেন। এর জন্য আমাকে যদি শ্রদ্ধা না দাও তো আমার আর কোন সম্বল নেই।'

অনেক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত Bertrand Russel, Dewy প্রভৃতি আমার আগে সেখানে এসেছিলেন। তাঁরা জ্ঞান বিজ্ঞানের নব নব অর্ঘ্য দান করে গেছেন। গুরুগিরি ক'রে, উপদেশ দিয়ে, ভাল কথা বলে', এমন কি হয়ত অনেক গভীর রহস্যময় কথাও বলে গেছেন। আমার ভয় হ'ল। আমি বল্লাম 'সেই আসনে গিয়ে আমি কি দেব? উপদেশ দেবার বা গুরুগিরি করবার শক্তি তো আমার নেই। তার চেয়ে তোমরাও এগিয়ে এস, আমিও এগিয়ে যাই—কবির সঙ্গে মাল্য বিনিময় হোক্।' তারা তাই মেনে নিলে, তাই স্বীকার করলে। তাদের ভয় কেটে গেল। অপরিচিত বিদেশী যখন কোথাও যায় তখন তাকে ভয় হয়; কেমন করে তার সঙ্গে ব্যবহার করবে, কেমন করে কথা বলবে, সে না জানি কি অদ্ভুত লোক, এই সব ভেবে মনে সঙ্কোচ হয়। তাই আমাকে বন্ধুরূপে পেয়ে তারা নিশ্চিন্ত হ'ল। তারা বল্লে 'তুমি আমাদের আপনার লোক'। আমি বল্লুম, "গুরুগিরি আমার ব্যবসা নয়। অতএব আমাকে গুরু ব'লো না। আমি ভারতের কবি, কিন্তু তোমরা যদি বল—"তুমি শুধু ভারতের কবি নও, চীনের কবি, এসিয়ার কবি, সেইটা হ'বে আমার সব চেয়ে বড় পুরস্কার"।

এই হ'ল ভূমিকা। আর এই অনুসারে আমি কাজ করেছি। আপনারা হয়ত বিশ্বাস করবেন না, চীন যুবকেরা আমাকে বয়স্য ব'লেই জানত। আমার পাকা চুল এবং বয়সকে অগ্রাহ্য করে' তারা আমাকে সহজেই ভাল বেসেছিল, আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছিল। সেইটাই আমি আমার পরম সৌভাগ্য ও সফলতা মনে করি।

যাঁরা আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন—তাঁরা ডেকেছিলেন বক্তৃতা দিতে। ভেবেছিলুম যাবার আগে বক্তৃতা লিখে নিয়ে যাব, কিন্তু যাবার পূর্ব্বে একটা মুস্কিল হওয়াতে কিছুতেই মনস্থির হ'ল না। আপনারা হয়ত কারণটা শুনে হাসবেন। আমাকে সেই সময় গানের নেশায় পেয়ে বসেছিল। একটার পর একটা লিখেও গানের বোঝা নামিয়ে যেতে পারলাম না। সেই জন্য বক্তৃতা লেখাও হয়ে উঠল না। জাহাজে মনে হ'ল, কিছু লেখা হাতে ক'রে যেতেই হবে। যাঁরা সমুদ্র যাত্রা করেছেন তাঁরাই জানেন cabinএ বসে লেখা কি কষ্টসাধ্য। আমি সে কৃচ্ছ্রসাধনও করেছি। কিছু লেখা সঙ্গে করে' নিয়ে গিয়েছিলাম।

চীনে যাবার পথে প্রথম ঘাট রেঙ্গুন। Rangoonএ Burmese ছাড়া আর সব জাতই আছে। সেখানে কিছু চীনাবাসীও আছে। চীনের লোকেরা আমাকে নিমন্ত্রণ করলে; আমাকে ডেকেছিল চীনেদের বিদ্যামন্দিরের এক অধ্যক্ষ। চীনের আতিথ্যের সেই প্রথম আস্বাদে আমি পরম আনন্দিত হ'লুম। তারা আমার বক্তৃতা শুনতে চাইলে বললে—সেখানে গিয়ে কি বলবে আমাদের একটু বল। আমি বললাম—কি বলব তা' এখনও ঠিক বলতে পারি নি। তবে মানুষের সংস্পর্শ পাব, শুধু গৃহস্বামীর করতালি নয়, তার কাছ থেকে কোন আর্থিক পুরস্কার নয়, তার হৃদয় লাভ করব, এইটা মনে করে এসেছি। যারা ধর্ম্মে কর্ম্মে পৃথক্ সেইখান থেকে যে আত্মীয়তা আসে সেই পরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। বাইরের আবরণ ভেদ করে' সমস্ত মানুষের অন্তরের জ্যোতি যে ভোগ করে সে ধন্য হয়। দেশবাসীর কাছ থেকে,

আত্মীয়ের কাছ থেকে হয়তো সুখ্যাতি পেয়েছি—নিন্দাও যে পাইনি তা' নয়—কিন্তু পরদেশবাসী আত্মীয় বলে, আপনার লোক বলে জানবে, এর চেয়ে মূল্যবান জিনিষ কিছু হ'তে পারে না। এই শুনে তারা খুসী হ'য়েছে।

তারপর যাই মালয় দ্বীপে। সেখানে আমাদেরই স্বদেশবাসীর সঙ্গে মিলন হ'ল। মালয় উপদ্বীপ একেবারে আনাগোনার পথে, সেখানে তাই নানা জাতির সমাবেশ। কিন্তু একটা জিনিষ দেখে মন খুসী হ'ল যে সেখানে পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষবুদ্ধি জাগেনি। এমন কি সেখানকার ইউরোপীয় পর্য্যন্ত অত্যন্ত নম্র, বিনয়ী। কিন্তু সেখানে একটা ভাববার জিনিষ আছে। সেখানকার দেশবাসী একান্ত শ্রমবিমুখ অত্যন্ত স্বল্পসন্তুষ্ট—তারা বলে পয়সার জন্য কিছুতেই আত্মবিক্রয় করব না। সেইজন্য বিদেশী মহাজনরা বড় রাগ করে। তারা তাদের দিয়ে কাজ পায় না। তাই সেখানে দুই দল কাজ করে—চীনা ও ভারতবাসী। চীনারা—দক্ষিণ চীনবাসী, Cantonese। ভারতবাসীরা—মান্দ্রাজী ও শিখ। এমন কোন চীনা সেখানে নেই যাকে চিরদিনই হেয় কাজ করে' হেয় হ'য়ে থাকতে হয়। সকলেই জমি চাষ করছে, Rubberএর চাষ করছে। অথচ তারা সেখানে এসেছিল অত্যন্ত দীন নিঃসহায় অবস্থায়। আর মান্দ্রাজীরা সকলেরই অবজ্ঞাভাজন। তা'দের জন্য সেখানে ভারতীয়দের নামই হ'য়ে গেছে কুলী। যদি কোন মান্দ্রাজী মজুর কাজ করে, ৭০ সেণ্ট পায়, তার সর্দার নেয় ৪০ সেণ্ট, সে পায় তিরিশ। সেইজন্যে কোন রকমে জীবন ধারণ করে' ছেলেদের শিক্ষা-দীক্ষা দেবার মত উদ্বৃত্ত কিছুই থাকে না। তাই তারা পুরুষানুক্রমে দাস। Andrews সাহেব সেখানে গেছেন। তিনি হয়তো মহাজনদের খুব গাল দেবেন। গাল দিতে সকলেরই বোধ হয় বেশ লাগে আর যাদের পয়সা আছে তাদের উপর আক্রোশ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু গালাগালি দিয়ে তো আর কোন জিনিষের প্রতীকার হয় না। তা হ'লে এর উপায় কি? মহাজনদের দয়া করতে বলাতে মহাজনরা হয়তো দয়া করতে পারে। কিন্তু সে তো আর একটা বোঝা! চীনেদের জন্য তো মহাজনদের কিছু বলতে হয়নি! তাদের জন্য কোন Andrewsএর প্রয়োজন হয়নি তো। অথচ মান্দ্রাজীদের জন্য হয় কেন? মান্দ্রাজীরা পরস্পর মিলিত হ'য়ে পরস্পরকে সম্মানিত করবার চেষ্টা করে না। বরং পরস্পরকে শোষণ করবার জন্যই তাদের চেষ্টা। তাদের দুখের সীমা নেই, তাদের দেখে দয়া হওয়া উচিত। কিন্তু দয়াটা কি রকম করে হ'বে, সেইটা ভাববার কথা। মহাজনদের বলা দয়া করতে, না তাদের বলা একত্র হ'তে, পরস্পরের সঙ্গে প্রেমের মিলনে বদ্ধ হ'তে, না হ'লে তারা চিরদিনই কুলী থাকবে।

আর শিখরা গেছেন রাজশক্তির পিছনে পিছনে দলন করবার হেয় কাজ নিয়ে। যা'রা দাস, যারা পুরুষানুক্রমে দাস্যবৃত্তি করে' আসছে, তারা যখন নিজেদের প্রভু মনে করে, তখন তারা অসহ্য হ'য়ে পড়ে। দাস্যবৃত্তির ক্ষমতাভিমান ভয়ানক বীভৎস দৃশ্য! সেই দৃশ্য দেখেছি। মালয়ে সময় ছিল না, কিন্তু চীন দেশে গিয়ে দেখেছি তারা কি ভয়ানক হেয় কাজ করছে! ইংরেজ কনষ্টেবল যেখানে দয়া করেছে, এরা সেখানে নির্ম্মম। আপনাদের কাছে বলছি—এ আমাদের অত্যন্ত লাঞ্ছনা ও কলঙ্কের কথা। এই রকম করে দিনের পর দিন আমরা তাদের হৃদয় হারাচ্ছি। কোন দিন চীন ও জাপানের সঙ্গে এক হ'য়ে আমরা স্বাধীনতার জন্য লড়ব, অতএব স্বার্থের জন্য তা'দের হাতে রাখা চাই, সন্তুষ্ট করা চাই—এ কথা আমি বলছি না। মানুষের সঙ্গে মানুষের, জাতির সঙ্গে জাতির যে প্রেমের সম্বন্ধ সেইটা বজায় রাখবার জন্যই বিদ্বেষ ভুলতে হ'বে, তাদের ভালবাসতে হ'বে।

চীনে শিখদের গুরুদ্বার থেকে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আমি সেখানে গিয়ে তাঁদেরও এই বলা বলে এসেছি। আমি বল্লাম প্রাচীন কালে যে সব ভারতবাসীরা এখানে এসেছিলেন, তাঁরা এসেছিলেন প্রেম প্রচার কর্ত্তে, সর্ব্বজাতির মধ্যে মৈত্রীভাব প্রচার কর্ত্তে। বাণিজ্যের দ্বারা শোষণের জন্য নয়, রাজ্য জয়ের জন্য বা শাসনের জন্য নয়, অন্তরের প্রেমের টানে মরু-সমুদ্র পার হ'য়ে চীন-জাপানে এসেছিলেন, এদের আত্মীয় করতে। তোমরা তাঁদের বংশধর হ'য়ে কেবল বিদ্বেষ রোপণ করছ? তোমরা বুঝতে পারছ না যে দেশের কি ভয়ানক ক্ষতি করছ? তোমাদের গুরু নানকের মন্ত্রও তো প্রেমের মন্ত্র। এখানে এসেও যদি সকলকে সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করতে না পার, সেই বাণী শোনাতে না পার তো কিসের গুরুদ্বার? তোমাদের বিদ্বেষবুদ্ধির দ্বারা দেশের অতীত ও বর্ত্তমানের সকলকে অপমান করলে। কত দিনের আত্মীয়তা, তোমরা এমন করে' ছিন্ন করলে! প্রভুশক্তি দাসকে দিয়ে যত রকম বীভৎসতা সব সাধন করিয়ে নিচ্ছে, আর দাসশক্তি অন্য দেশের কাছে নিজ কলঙ্ক বাড়াচ্ছে—এটা কি বুঝছ না? আমার যা' বলবার ছিল আমি তাদের তা' স্পষ্ট করে বলে এসেছি। জানিনা তা'দের সে কথা ভাল লাগল কি না, বা তারা সে কথা শুনবে কি না।

মালয় উপদ্বীপে শ্রমজীবীদের যে দৃশ্য দেখেছি চীনে ঠিক তার উল্টা। মালয়বাসীরা যেমন শ্রমবিমুখ, চীনেরা ঠিক তার বিপরীত। এমন শ্রমশীল ও কর্ম্মঠ জাত পৃথিবীতে বোধ হয় আর দুটি নেই। পরিশ্রম বা কৌশলের কাজে তা'দের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কেউ পেরে উঠে না। সেইজন্যই আমেরিকা চীনেদের ঢুকতে দিতে ভয় পায়। তারা ওদের চেপ্টা নাক কি বাঁকা চোখকে ভয় করে না। তারা ভয় করে ওদের প্রতিযোগিতাকে। প্রথমেই মনে হয়, নিরন্ত কাজের বহুযুগসঞ্চিত অভ্যাস দ্বারা এই যে তারা বিপুল কর্ম্মশক্তি

অর্জ্জন করেছে, এই এক আশ্চর্য্য সম্পদ্। কিন্তু কিছু পরেই সন্দেহ হয়। যে জাতি কোন একটা বিশেষত্ব অতিমাত্রায় প্রকাশ করে, সে জাতীয় জীবনের অন্য সব দিক গঠন করবার অবসর পায় না। ফলে সে সামঞ্জস্য হারায়। কয়লা, কেরোসিন তেল, পেট্রল—এই সমস্ত মানুষের কাজে লাগে। যেখানে এই সব খনি আছে, সেখানকার প্রাকৃতিক সম্পদের লোভে ধনীরা এসে হাজির হয়। চীনের মানুষের শ্রমশক্তিও ঠিক তেল, কয়লার মত সঞ্চিত পুঞ্জীভূত জিনিষ, মানুষের লোভের জিনিষ, তাই আমেরিকান ও ইউরোপীয় ধনীরা সব ওখানে এসে জুটেছে। আমেরিকায়, ইউরোপে শ্রমজীবীদের সংঘ আছে, একটা সুগঠিত দাবী আছে—ওখানে তো সে সব কিছু নেই, তাই শোষণের সুবিধা হয়। ওরা জীবনের আর সব দিক অবহেলা করে শ্রমশক্তিকে বাড়িয়ে চলাতে এই কুফল ফলেছে। যেমন গুর্খারা মানুষ মারতে অদ্বিতীয়। জীবনের আর কোন গুণেরই অনুশীলন করেনি, কেবল নরহত্যায় বিশেষত্ব লাভ করেছে। তারা গৌরব করে যে তারা এই রকম নির্ম্মমভাবে মানুষ মারতে পারে। তাই যেখানেই লড়াই হয়, সেখানেই তাদের নিয়ে গিয়ে কামান বন্দুকের মত ব্যবহার করে' মানুষ মারে। সমস্ত মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করে', এক অংশ বিকশিত করে' তারা নিজের এবং পরের সর্ব্বনাশ করে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সঞ্চয় যেখানে হয়, সেখানেই অপরের লোভকে নিমন্ত্রণ করে' আনা হয়। যেমন মৌমাছিরা—যত মধু পান করে, তার অধিক সঞ্চয় করে। সেইজন্যই তারা চিরদিন লুব্ধ মানুষের হাতে পীড়িত হ'য়ে আসছে। চীনেরাও তেমনি যুগ সঞ্চিত শ্রমশক্তির দ্বারা সকল দেশের মহাজনদের প্রলুব্ধ করেছে। অবশ্য ওরা পয়সা পায়, কিন্তু সে মনুষ্যত্ব বিক্রয় করে'। তাদের পল্লী মায়ের কোল থেকে তাদের উপড়ে এনে সব কলে নিযুক্ত করেছে। কিন্তু মালয়ের বেলা তো মহাজনেরা তা' করতে পারলে না। তারা পল্লীতে থাকে, মাছ ধরে। অবশ্য মালয়বাসীদের একান্ত শ্রমবিমুখতা, স্বল্পসন্তুষ্ট ভাব আমি প্রশংসা করছি না। তার মধ্যে একটা দৈন্য, একটা অসম্পূর্ণতা আছে। কিন্তু আমি শুধু ব্যাপারটাকে এই দিক থেকে দেখ্‌তে বল্‌ছি। চীনে বন্ধুদেরও আমি এই কথা বলেছি। তাঁরা আমার অভিযোগ স্বীকার করেছেন এবং এ বিষয়ে ভেবে দেখবেন বলেছেন।

Hongkongএ Dr. Sun Yat Senএর এক দূত আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বলেন, আপনি বিশ্বে একটা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন আর সমগ্র এসিয়ার মধ্যে বর্ত্তমান কালে আপনার দেখা করবার মত লোক একা Sun Yat Sen। আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি বিশেষ আনন্দিত হ'বেন, বিশেষতঃ তিনি এখন দেশের বহু সমস্যার বিষয়ে চিন্তা করছেন, সে সকল বিষয়ে আপনার পরামর্শ এবং উপদেশ তিনি চান। কিন্তু আমি বললাম—আমার তো সময় নাই, আমি অন্যত্র যাবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ফিরবার পথে দেখা হ'বে।

Sanghaiএ পৌঁছিবার আগেই দেখি Dockএ বন্ধুরা দাঁড়িয়ে আছেন আমার অপেক্ষায়। তাঁদের মধ্যে একজন শুভ্র, গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় পুরুষ দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে দূর থেকে দেখে কিছুতেই চীনে বলে মনে হ'চ্ছিল না। তাঁর বিশেষত্বময়, গাম্ভীর্য্য-শ্রী-মণ্ডিত মূর্ত্তি দেখেই হৃদয় মুগ্ধ হ'য়ে গেল। পরে পরিচয় হ'তে জানলাম—তিনিই আমার বক্তৃতার অনুবাদক। তিনি সর্ব্বত্র আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে আমার বক্তৃতার অনুবাদ করেছেন।

সেখানে কি রকম অভ্যর্থনা পেয়েছি তা' আমি বল্‌ব না—আমার বন্ধুরা প্রয়োজন হ'লে সে কথা আপনাদের বল্‌বেন। সেখানকার সকলের হৃদ্যতার প্রাচুর্য্য, ঐশ্বর্য্য বড়ই মনোরম। তাঁরা যেমন আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন, আমেরিকাও সেই রকম আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমেরিকার আতিথ্যের মধ্যে মধুর সখ্যভাব ছিল না, প্রাণের স্পর্শ পাইনি। অবশ্য ব্যক্তি বিশেষের কাছে হৃদ্যতা পাইনি, এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু এমন সাধারণ হৃদ্যতার ভাব সেখানে ছিল না। এখানে সকলেই সাধারণ ভাবে স্বীকার করেছে যে ভারতের অতিথি আসছেন, তাঁকে আমাদের মধ্যে গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হ'তে হ'বে—এটা আমাদের ধর্ম্ম। এইটা হ'ল প্রাচ্য ভাব। আর আমেরিকা ভাবলে যখন টাকা দিলে তখন সে অনেক কিছুই দিলে। সেখানে আমাকে হোটেল খুঁজে নিতে হয়েছে, নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে' নিতে হ'য়েছে। তার সঙ্গে অনেকটা দেনাপাওনার সম্বন্ধ—শুধু আর্থিক নয় সম্মানের দিক থেকেও বটে। আমাকে সম্মান করার মধ্যেও তাদের একটা হিসাব ছিল। তারা জান্‌ত আমি Nobel Prize পেয়েছি, ইউরোপের লোকেরা আমাকে কতটা ভাল বলে, সেখানে আমার প্রতিষ্ঠা কি রকম। কিন্তু চীনেরা ইংরাজী ভাল জানে না, অনেকেই পড়ে না। কারণ ইংরাজী না শিখ্‌লেতো তাদের জাত যায় না। তাই অনেকেরই আমার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে জ্ঞান নেই, থাক্‌লেও অতি সামান্য ও অস্পষ্ট। তারা শুধু জানে আমি অতিথি।

ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু, কালিদাস নাগ—এঁরা তো একেবারে বরযাত্রীর মত আদর আপ্যায়ন পেয়েছেন। যেখানে গেছেন, গাড়ী করে গেছেন, তাও আবার ভাড়া লাগেনি। সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য গিয়েছে। রাত্রে ষ্টেশনে ট্রেণ থামলে সৈন্যরা এসে খবর নিয়েছে কোন কষ্ট হ'চ্ছে কি না—প্রথমে তো সৈন্য দেখে অনেকে ভয়ই পেয়েছিলেন—সেখানকার গভর্ণর খবর নিয়েছেন। তাদের এই আত্মীয়তার আকর্ষণ হৃদয়কে অতিমাত্রায় মুগ্ধ করে।

প্রথমে মনে করেছিলাম তাদের সামনে আমার লেখাটা পড়ব। কিন্তু পরে মনে হ'ল তারা তো লেখা বুঝবে না। কারণ, আগেই

বলেছি, ইংরাজী শেখবারতো কোন গরজ তাদের নেই, ইংরাজী ভাষার সম্বল অতি অল্প। তাই লেখা না পড়ে মুখেই বলেছিলাম।

সেখানে আমি নিছক সুখ্যাতি এবং একটানা অভ্যর্থনা পাইনি। আপনারা শুনে অনেকে সুখী হ'বেন, যে সেখানেও আমার বিরুদ্ধ পক্ষ ছিল, তারা আমাকে আক্রমণও করেছে। তবে আমার পক্ষে সুখের বিষয়, তারা দলে বিশেষ ভারি নয়—নিজের দিকে হ'য়েও দু' একটা কথা বল্‌তে হয়। তারা কমিউনিষ্ট্। সোভিয়েটদের সাথে তা'দের যোগ আছে। তারা বলে—"তুমি কেন এখানে এসেছ—তোমার কথা আমরা এখন শুনতে চাই না। আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ তো বৌদ্ধ-ধর্ম্মই করেছে, এতদিনে আমরা সেই সব শিক্ষা বিশেষ ভাবে ভুলতে চেষ্টা করছি, তুমি আবার সেই সব কথা ব'লে আমাদের যুবক সম্প্রদায়ের মাথা খারাপ করে' দেবে।" যেখানেই আমি বক্তৃতা দিতে গেছি, সেইখানেই তারা আমার আগে আগে গিয়ে আমার বক্তৃতা শোনা থেকে শ্রোতাদের বিরত করবার জন্য Handbill বিলি করেছে। কেন যে তারা আমার লেক্‌চার শুনবে না সেই বিষয়ে তাদের Handbillএ পাঁচটা করে Point থাকৃত।

১। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী।

২। Meterialismএ আমার অশ্রদ্ধা।

৩। প্রাচীন সভ্যতার প্রতি আমি আস্থাবান।

আর দুটো ভুলে গেছি। তবে একটা জিনিষ সেখানে লক্ষ্য করেছি—বিরুদ্ধবাদীরা কেউ বা কোন খবরের কাগজ কখনও আমাকে অসম্মানসূচক কোন কথা বলেনি বা কিছু করেনি। তারা বলেছে আপনি নিমন্ত্রিত হ'য়ে এখানে এসেছেন, অতএব আপনি আমাদের অতিথি। আমাদের যা' মত তা' আমরা জোরের সঙ্গেই বলব, কিন্তু আতিথ্যের বিরুদ্ধে কিছু বল্‌ব না। দেশে অনভ্যাস বশতঃ তাদের এই রকম ব্যবহার আমাকে বিস্মিত করেছে। এ হ'ল তাদের বহু যুগের ভদ্রতার, আতিথ্যের মর্ম্মগত সাধনার ফল। আমার মতে এই হ'ল সভ্যতা। মোটর, এরোপ্লেন, বিজ্ঞানের প্রসার—তাকে উন্নতি বলা যেতে পারে। সে সভ্যতা নয়। সভ্যতা হ'চ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ সত্য করবার জন্য শিক্ষা ও সাধনা।

শাংসির গভর্ণর আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তাঁকে আমাদের আদর্শের কথা বল্‌লাম। বললাম—তাঁদের সঙ্গে আমরা যোগ রাখ্‌তে চাই দুই উপায়ে। প্রথমতঃ বিদ্যার দিকে মিলিত হ'তে চাই। তাঁদের শাস্ত্রের মধ্যে আমাদের প্রচ্ছন্ন বিদ্যাকে উদ্ধার করতে হ'বে, এবং আমাদের শাস্ত্র থেকে তাঁদের লুপ্ত বিদ্যাও উদ্ধার করতে হ'বে। এই জন্য উভয় দিক হ'তে একটা চেষ্টা চাই। শিক্ষিত পণ্ডিত বিনিময় চাই। এক সভ্যতার উপর আর এক সভ্যতার এ দাবী তো আছেই। কিন্তু আমি তাঁর কাছে বিশেষ করে আর একটা প্রস্তাব করতে চাই। তাঁর কাছে প্রার্থনা—এমন ব্যবস্থা করুন যা'তে তাঁদের পল্লীবাসী আমাদের পল্লীবাসীদের মধ্যে আসতে পারে, এবং আমাদের পল্লীবাসী গিয়ে তাঁদের গ্রামে বসতি করতে পারে। এর দ্বারাই তাঁদের সঙ্গে আমাদের প্রকৃত যোগ সাধন হ'তে পারে। তিনি বল্‌লেন—"এ খুব বড় কথা। আমারও মনে হয় এই হবে সব চেয়ে বড় যোগ।" তিনি আমাকে ঝরণার ধারে একখণ্ড জমি দেখিয়ে বল্‌লেন, এইখানে আমি আশ্রম করে' দেব আপনাদের জন্য।

আমি আপনাদের বলছি, যে এই হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্য যোগ। Pan কথাটাকে আমি বড় ভয় করি। পাশ্চাত্যে আজ কাল এই কথাটা খুব চলছে। কিন্তু এরা ভুলে যায় যে দুই মানুষ এক দেহী নয়, একাত্মা। ভারত একদিন চীন জাপানকে এই কথাই বলেছিল। Imperialistরা বলে তাদের এক-দেহী করব, এই উদ্দেশ্যে চাপ দেয় আর দুজনকেই বিকলাঙ্গ করে ফেলে। চীন জাপানের সঙ্গে মিলতে হবে ধর্ম্মগত ভাবে Political strengthএর জন্য নয়। প্রাচীন কালের নিঃস্বার্থ ভালবাসা নিয়ে মিলতে হবে, স্বার্থ থাকলেই বিকৃত হবে; আমি এরি মধ্যে ফল পেয়েছি, তারা হৃদয় দিয়েছে। কত কাছে এসেছে, সে এর পরে টের পাবেন। তারা আসবে—অবশ্য যদি আপনারা দরজা বন্ধ করে না দেন। তারা আসবে বণিক্ সেজে নয়, মিশনারী হয়েও নয়। তারা আসবে দান প্রতিদানের জন্য, মানুষের যা' সত্য সম্বন্ধ তাই স্থাপন করবার জন্য। পারস্য, মেসো-পটেমিয়া, আরব থেকেও নিমন্ত্রণ পেয়েছি। সেখানে গেলেও এই হবে।

Exploitation জিনিষটা ভেদ বুদ্ধিরই প্রকারান্তর। যখন ভাবি ওর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই, ওর ক্ষতিতে আমার লাভ হবে, তখনই ত তাকে শোষণ করি। অতএব কোন রকম লাভের জন্য, কোন রকম শোষণের ইচ্ছা নিয়ে তাদের সঙ্গে মিললে চলবে না। তাদের ভাইয়ের মত ভাবতে পারা চাই; তখন আর Exploitationএর কথা মনেই উঠ্‌বে না।

জাপানেও দেখছি অনেক চিন্তা ও আশার কথা আছে। ভারত-বর্ষের একটা কর্ত্তব্যের ঋণ আছে; প্রাচীনকালে সেই-ই বিশ্বমৈত্রী, মিলনের বৃহৎবাণী প্রচার করেছে। ভগীরথের তপস্যায় যেমন গঙ্গা এনেছে, সেই রকম আমাদের পূর্ব্বপুরুষের চেষ্টায় তাঁদের সঙ্গে সংযোগের একটা পথ তৈরী হয়ে আছে। আমাদের ভুলে, অবহেলায় সে পথ কিছুকিছু লুপ্ত হ'লেও একেবারে লুপ্ত হয়নি। এই এসিয়ার বাণী আমাদেরই পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। এর প্রতি শ্রদ্ধা থাকা চাই। আপনারা জান্‌বেন যে ধনশক্তি সৈন্য শক্তির চেয়ে এর শক্তি কিছু কম নয়। ভারতবর্ষ আজ যে অবস্থায় আছে সে কারও বাঞ্ছিত হ'তে পারে না। তার দুঃখ-দুর্দ্দশা, তার বন্ধন চিরন্তন হোক—এ

আমি বলি না। কিন্তু আজ আপনাদের স্পষ্ট করে' বল্‌ছি যে সে বিষয়ে কোন পন্থা নির্দ্দেশ করতে আমি পারব না। আমি শুধু এই জানি যে ভারতবর্ষ এত বড় হয়েছে এবং এখনও বেঁচে রয়েছে এই তার প্রেম মৈত্রীর মন্ত্র বলে, তার মিলন শক্তির বলে।

জাপানেও সেখানকার মনিষীরা বলেছেন, বুদ্ধদেবের বাণীই আমাদের একমাত্র সম্পদ। আমাদের কৃষি বাণিজ্য, যুদ্ধ বিগ্রহের পিছনে এরই মহিমা উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তোমাদের কাছ থেকে দৈনিক ছোট খাট কাজ-কর্ম্মের মধ্যে কত শিখেছি; ধর্ম্মের কথা তো তোমাদের কাছেই শিখেছি; যে ধর্ম্ম ভক্তিতে সরস, ধ্যানেতে উজ্জ্বল, জ্ঞানে মহীয়ান।

জাপানে বুদ্ধদেবের বাণী যে কতটা দিয়েছে তা' একটা ঘটনা থেকে বেশ বুঝেছিলাম। জাপানের একজন সাধারণ লোকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। ইনি ব্যবসায়ে কিছু টাকা জমিয়ে চাষবাস করছেন। তিনি বল্লেন ভালবাসাই যে প্রাপ্তির উপায় এ কথা তো ভারতের। মাটির কাছ থেকে কিছু নিতে হ'লেও ভালবেসে নিতে হয়। ভালবেসে যত্ন করে' সার দিয়ে সেবা করলে, তবেত' জমি আমায় পুরা ফসল দেবে। Exploit করে, ডাকাতি করে তো' পুরা পাই না।

ধর্ম্মের কথা কর্ম্মের রাজ্যে যে এত গভীর করে' বুঝেছে সে কত পেয়েছে। বুঝলাম বৌদ্ধধর্ম্ম একেবারে মরেনি। জাপান বলেছে, পাশ্চাত্যের অনুকরণ করেছিলাম, ভুল করেছিলাম, সত্য পাই নি। ভারত এস, সত্য দাও।

আমি চীনে যাবার আগে একজন গভীর জ্ঞানী চীনে পণ্ডিত সেখানে একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তা'তে তিনি চীনেদের বলেছিলেন ভারতবর্ষ তোমার জ্যেষ্ঠ ভাই, তুমি ভুলেছ, তাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তিনি শাস্ত্র থেকে উদ্ধার করে' দেখিয়েছেন যে তাঁরা কত সামান্যতম বিষয়েতেও ভারতের কাছে ঋণী! আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করছি, আমরা গিয়ে কি তাঁদের চেনাব না, আত্ম পরিচয় দেব না, যে আমরা সেই প্রাচীন ভারতেরই লোক; সে ভারত এখনও মরেনি? আমার বন্ধুরা তাদের মন্দিরে গিয়ে কি অভ্যর্থনা পেয়েছেন সে একদিন শুনবেন। তারা এঁদের মন্দিরে নিয়ে গিয়ে সমস্ত দেখিয়ে বলেছেন, এই আপনাদেরই দেওয়া জিনিষ কি রকম ভাবে বজায় রেখেছি দেখুন আবার আপনাদের ওখানে গিয়ে আপনাদের মন্দিরও দেখ্‌ব। ক্ষিতিমোহন বাবুর লজ্জায় মাথা হেঁট হ'য়ে গেছে। তা'দের তো তিনি সেখানে বল্‌তে পারেন না যে আমাদের দেশে মন্দিরের ভগবান সকলের নয়, মাত্র দুচারজনের সম্পত্তি!

যাক, আপনাদের বেশী বলে আর ক্লান্ত করতে চাই না। কষ্ট করে এসে এই গরমে—তাও আবার পাখা বন্ধ হয়ে গেল—এতক্ষণ ধৈর্য্য সহকারে আমার কথা যে আপনারা শুনেছেন এর জন্য আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ! আমি শুধু আপনাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, সর্ব্বদেশ সর্ব্বকাল সর্ব্বলোককে দেবার মত ঐশ্বর্য, আর কি আমরা দিতে পারব না? জগৎকে অমৃত-অন্ন পরিবেশন করবার দিন কি আমাদের আসে নি?

আপনাদের একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। এবারে চীনে থাকতেই আমার জন্মদিন পড়ে। তারা বল্লে তোমার এবার চীনে জন্ম হ'ল—তুমি চীনে-শিশু। তাই তারা আমাকে একটী নূতন পরিচ্ছদও দিয়েছে। আমি সেটী ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে এনেছি। ("দেখ্‌তে চাই; দেখ্‌তে চাই" বিরাট কোলাহল এবং জয়ধ্বনির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নূতন চৈনিক পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন।) তারা আমার নূতন নামকরণও করেছেন—চু-চেন-তাং, চু অর্থে—প্রভাত সূর্য্য; চেন্ অর্থে—বজ্র; তাং—ভারতীয়—ভারতীয় সূর্য্য ও বজ্র। সেদিন আমি শিশু সুলভ অনেক খাদ্যও পেয়েছিলাম এবং তারা আমার জন্যে অনেক প্রার্থনাও করেছিলেন যাতে আমি ভাল হই, সুন্দর হই, ভাল কাজ করতে পারি। সেদিন তাদেরও যা' বলেছি, আজ আপনাদেরও তাই বলি। আমি তাঁদের বললাম আপনারা যে নাম আমাকে দিলেন সে নামের যোগ্য আমি নই। তবে দৈবক্রমে আমি একটা নাম পেয়েছি যার মানে সূর্য্য। সূর্য্যের প্রতিদিন নব জন্মলাভ হয়। সে যখন এক দিগন্তে অস্ত যায়, তখনই অন্য দিকে সে নব শক্তি, নব সৌন্দর্য্য নিয়ে উদয় হয়। আমিও যদি তেমনি পৃথিবীর দিকে দিকে নব শক্তিতে ও নবীন গৌরবে উদয় হয়ে নবজাগরণ আনতে পারি, দেশে দেশে নব নব নামে বৃত হ'তে পারি, তাহলেই আমার নামের সার্থকতা হয়।*

—বিজলী, ১৬ই শ্রাবণ, ১৩৩১।

* চীন হইতে প্রত্যাগত হইয়া ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউটে প্রদত্ত বক্তৃতা।

আর্ট ও এ যুগের সাহিত্য।

[শ্রীঅনন্তকুমার সান্যাল]

মনস্বী কার্লাইলের গুরু ছিলেন ফিক্টে। ফিক্টে বলিয়া গিয়াছেন যে, সঙ্গীতের মধ্যেই আমরা ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পারি (It is in music that God is visible)। বাস্তবিক কিন্তু কথাটা সর্ব্বপ্রকার চারুশিল্প সম্বন্ধেই বলা চলে। যে কোন প্রকারের প্রকৃষ্ট শিল্প সৃষ্টিই 'সত্য শিব সুন্দরে'র পরিচয় দান করে। কথাটা একটু খুলিয়া বলি।

এই যে আমাদের চারিদিকে এই বিশ্ব, উপনিষৎকার বলিয়াছেন, ইহার উদ্ভব হইতেছে আনন্দ হইতে। প্রতি অণু, প্রতি পরমাণু, সৃষ্টির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া দৃষ্ট অদৃষ্ট সমুদয় নিখিল বিশ্বের মধ্য দিয়া সুনিভৃতে বহিয়া চলিয়াছে একটা অনাবিল, অফুরন্ত আনন্দধারা; উহার পরিণতি, লয়, সকলই হইতেছে এই অপার অসীম আনন্দে। এখন, যাঁহারা প্রলয় অন্তর্দৃষ্টি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা দ্রষ্টা (seers), তাঁহাদের কাছে এই রস-মধু-ধারা'টী কোনও মতেই প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারিতেছে না, ধরা দিতে হইতেছে। তাঁহারাই প্রথমে উহার রসাস্বাদন করিতেছেন। সৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত এই যে আনন্দ, সকলেই উহা তুল্য রূপে অনুভব করিতে পারিতেছেন। কেহ বা মুগ্ধ হইয়া, আত্মবিস্মৃত হইয়া উহাতে মগ্ন রহিয়াছেন, কেহ বা বাহিরে তাহার মূর্ত্তি দিয়া বিশ্বের নিকট তাহা উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছেন। তবে উহার বহিঃপ্রকাশের প্রকার বিভিন্ন। কাহারও বা রূপে, কাহারও বা ছন্দে, কাহারও বা গতিভঙ্গিমায়। সুতরাং শ্রবণ নয়নের পথ ধরিয়াই উহাকে মনোমোহিনী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে হইতেছে। এমনি করিয়া যাহা এক সময় ছিল অস্ফুট, অব্যক্ত, অপরিজ্ঞাত, তাহাই আবার শিল্পীর সুনিপুণ হস্তে পড়িয়া হইয়া উঠিল পরিস্ফুট, বিকশিত, অভিব্যক্ত। এমন করিয়াই যাহা ছিল মনোলোকে তাহা আসিল বাহিরে; যাহা ছিল একের তাহা হইল বিশ্বের। আর, এই আনন্দানুভূতির এক একটী শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করিল ললিত কলা, কাব্য, সঙ্গীত, স্থাপত্য। সত্য-দ্রষ্টাগণ, এই উদ্দেশ্য লইয়া, যিনি যতদূর অগ্রসর হইতে লাগিলেন তাঁহার সৃষ্টিও তদনুরূপ সার্থকতা লাভ করিল। কালিদাস অমর হইলেন, মাইকেল এঞ্জেলো অমর হইলেন। আপনাদের রসসৃষ্টিতে অমৃতলোকের ইঙ্গিত স্ফুরিত হয় বলিয়াই না ইহারা অমর! কি সঙ্গীত, কি কাব্য, কি অন্যবিধ রসসৃষ্টি, সুবিমল আনন্দ বিধানই হইতেছে ইহাদের একমাত্র নিঃস্বার্থ উদ্দেশ্য। আর এই আনন্দেই আমাদের আত্মা সঞ্জীবিত ও স্বাস্থ্যবান হইয়া উঠে। লোকচক্ষুর অন্তরালে, নিভৃত শুচি মনোমন্দিরে যাহাদের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল, তাহাদের মধ্যে 'রস স্বরূপে'র আভাস পাওয়া কি অস্বাভাবিক?

কিন্তু সে কথা যাক। আমরা দেখিব এই রস-প্রবাহের একটী ধারা কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া এ যুগের সাহিত্যকে পল্লবিত ও পুষ্পিত করিয়া তুলিয়াছে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি দেশেই দেখিতে পাওয়া যায় তাহার সাহিত্যেরও পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। সাহিত্যের অবলম্বন হইতেছে জীবন। বিশেষ বিশেষ কাল ও বিশেষ বিশেষ অবস্থার মধ্য দিয়া মানব জীবন যেমন যেমন বিকশিত হইবে, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া যেমন যেমন ভাবে তাহার সহিত সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস পাইবে তাহারই ত ব্যঞ্জনা হইবে সাহিত্যে। যুগ প্রভাব অতিক্রম করিয়া সমাজ গঠিত হইয়া উঠিতে পারে না, সমাজের মুকুর স্বরূপ যে সাহিত্য সে সাহিত্যেও এই যুগেরই ছায়া সম্পাত দেখিতে পাওয়া যাইবে। জগতের এমন কোনই সাহিত্য নাই যে এই নীতি অনুসরণ করিয়া না চলিয়াছে; না এ দেশে, না বিদেশে।

আমাদের এই যুগে যে দুইটী সম্পদ সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে তাহাদের একটি হইতেছে গীতি-কবিতা, অপরটী কথা-সাহিত্য। হর্ষ, বিষাদ, অনুরাগ, বিস্ময়

প্রভৃতি জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাগুলি প্রতিনিয়ত আমাদের অন্তরে জ্বলিতেছে নিভিতেছে। সুন্দর কুৎসিত, সত্য অসত্য, ন্যায় অন্যায়ও অহোরহঃ গোচরীভূত হইয়া আমাদের চিত্তপটে অগোচরে রেখা-সম্পাত করিয়া একটী একটী মূর্ত্তি রাখিয়া যাইতেছে। এখন, যিনি কবি, যাহার অন্তশ্চক্ষু অসাধারণ, যাহার দিব্য নেত্র হইতেছে কল্পনা, এই সকল ভাবরাজি তাহার অন্তরে অতীব সুনিবিড় হইয়া, প্রগাঢ় হইয়া প্রবেশ করিতেছে। আর তিনি তাহা আপন মনের মাধুরীতে রঞ্জিত করিয়া বিচিত্র রূপে ফুটাইয়া তুলিতেছেন আপনার কবিতায়। হৃদয়েরই ত ছন্দবন্দ ভাষা হইতেছে কবিতা! তাই অন্তরের অন্তস্তল হইতে সিঞ্চিত রসমণ্ডিত যে ছবি তাহারও ধর্ম্ম হইতেছে রসেরই সঞ্চার করা। যেমন হৃদয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কমনীয় ভাবগুলি প্রস্ফুট প্রসুনের ন্যায় হাসিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতি-কবিতায়, তেমন আবার মনোজগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রন্ধ্রগুলির জটিল কার্য্যকলাপ বিশ্লিষ্ট হইয়া চিত্রিত হইয়া উঠিতেছে কথা-সাহিত্যে। বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপক ভাবগুলি সমাজ মন হইতে উৎসারিত হইয়া অসংখ্য সমস্যার রূপ ধরিয়া প্রকটিত হইতেছে উপন্যাসে। সমগ্র মানব জীবনটাকে, ইহার সহস্র বিচিত্র সমস্যাসহ, রূপ পরিগ্রহ করিতে হইলে উহাকে আশ্রয় লইতে হইবে বিস্তৃত পরিসরের কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে; আর কিছু কিছু গীতি-কবিতায়। শুধু মাত্র গীতি-কবিতার এমন সাধ্য নাই যে আপনার ক্ষুদ্র সৌন্দর্য্যের মধ্যে সমগ্র জীবনটা প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিতে পারে। আবার এ দিকে কাব্য বা মহা-কাব্যের উদ্দেশ্য হইতেছে বিরাট বা বিশাল ঘটনা; বা অসামান্য ঘটনাবহুল কীর্ত্তিমান জীবনের চরিত্র ও কার্য্যাবলী চিত্রন। সুতরাং সমস্ত জনসমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও চিত্ত-বৃত্তিগুলির ঘাত প্রতিঘাত, দ্বিধা দ্বন্দ্ব, অবস্থার উত্থান পতন এবং জীবন সংশ্লিষ্ট বহুবিধ কার্য্যাবলীর বাহন হইতে হইবে হয় নাটককে আর না হয় উপন্যাসকে। পরিপূর্ণ লোক-চরিত্র দেখিতে হইলে এই দুইটির একটার মুখাপেক্ষী না হইয়া উপায় নাই। এখন, সাহিত্যের এই পর-নির্ভরতা অনেকটা নির্ভর করে যুগ ধর্ম্মের উপর, পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর। এমন একদিন ছিল যখন নাটককেই এই উদ্দেশ্য সাধন পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে করা হইত। কিন্তু সাধারণতঃ ঘটনা বা কার্য্যকে বাস্তব করিয়া প্রত্যক্ষীভূত করিয়া দেওয়াই হইতেছে নাটকের বিশিষ্টতা। তাই, যে সময়ে কেবল মাত্র ঘটনা বা কার্য্যকেই প্রতিফলিত দেখিতে পাইলেই সমাজ খুসী, সেই সময়েই নাটক বহুবিধ সাজ সজ্জায়, দৃশ্যাবলীতে ভূষিত হইয়া গর্ব্বানুভব করিতে পারে এবং লোকেরও চিত্তরঞ্জনে সমর্থ হয়। কিন্তু যে যুগে মানব মন, বিজ্ঞান, শিল্প, দর্শন প্রভাবে, রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার বৈচিত্র্যে, কল্পনাতীতরূপে প্রসারিত হইয়াছে, যে যুগে মনোরাজ্যের সীমা-রেখা অভাবনীয় রূপে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, মনন-প্রধান সেই যুগের প্রতিচ্ছবি ত আর নাটকের কর্ম্মপ্রধান সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে প্রতিফলিত করা সম্ভা-বিত হইতে পারে না! বিবিধ সমস্যার সমাধান, বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ, গোপন মনোলোকের অদ্ভুত রহস্যো-দ্ঘাটন, সুন্দর অসুন্দরের দ্বন্দ্ব, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ, এ সকলকে আত্মনিবেদন করিতে হইবে কল্পনারাজ্যের সম্রাট উপন্যাস-কারের নিকট। উপন্যাস তাহাদিগকে অপরূপ বর্ণনা-ভঙ্গিতে, সলীল ভাষার কুহেলীতে রঞ্জিত করিয়া, অঙ্কিত করিয়া তুলিবে আপন চিত্তপটে। সুতরাং এ যুগের মনো-রঞ্জন সাহিত্য সাধনা হইতেছে উপন্যাস। আর, এই উপন্যাসেরই একটী কন্যা, আধুনিক ছোট গল্প, গীতি-কবিতার ন্যায়, আপন ক্ষুদ্র সৌন্দর্য্যের মধ্যে চিত্রিত করিয়া তুলিতেছে এক একটা সুষ্ঠু, পেলব, ক্ষণিক ভাবকে। এখন আর সমাজ গুরু গম্ভীর ভাষার প্রাকার উত্তীর্ণ হইয়া মহা-কাব্যের রাজ-প্রাসাদে প্রবেশলাভ আকাঙ্ক্ষা করে না। সে অবসর সে ইচ্ছা এখন তাহার নাই। তাহার আকাঙ্ক্ষা হইতেছে সহজ সরল পথ ধরিয়া বিশ্বের বৈচিত্র্যময় ভাব-রাশির সহিত পরিচিত হইতে, আধুনিক চিন্তাধারার ব্যাপক গতির সহিত সম্বদ্ধ হইতে। আর চাহিতেছে সহজ ও মধুর প্রাণের স্বতঃ উৎসারিত এক একটী ছন্দময় সঙ্গীত-মুখর বাণী শুনিতে। কর্ম্মবহুল অবসর বিরল এ যুগের প্রত্যাশা বুঝি বা ইহার ঊর্দ্ধে নহে। তাই, সাহিত্যের সম্ভার দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে গীতি-কবিতায় ও কথা-সাহিত্যে।

চোখের জল।

[শ্রীবিমলাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

১

"তুমি এখানে কেন?"

"কেন? দোষটা কি?"

"তোমার এখানে আসবার দরকারই বা কি?"

"তুমি যে আমার জীবনের সাথী, পথের সম্বল।"

অজিত বিরক্তভাবে ব'ললেন;—"কথার দ্বারা আমায় ভোলাতে পার্‌বে না।"

"দেখ! তুমি আমায় পা'য়ে না রাখ তাতে দুঃখ নাই, কিন্তু অমন কোরে প্রাণে যাতনা দিও না!"

"কেন?"

"কেন? তুমি যদি আমার প্রাণের এতটুকু যাতনাও অনুভব ক'রতে পারতে তা হ'লে ওরূপ ব'ল্‌তে না।"

"সুরো! তুমি সরে যাও, আমি কখনও তোমায় ভালবাসতে পারব না। একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন কেউ ভালবাসার পাত্র হ'তে পারে না। সরে যাও।"

"আমারও তেমনি ঈশ্বর তুমি, তুমি ভিন্ন আমারও কেউ ভালবাসার পাত্র হ'তে পারে না।"

"তোমার যা ইচ্ছে ক'রো, আমায় বিরক্ত করো না।"

"মনে করি, তোমায় বিরক্ত ক'রবো না, কিন্তু তোমায় দেখলেই সব ভুলে যাই, আর যেতে ইচ্ছে করে না।"

"সুরো! তুমি দেখছি উচ্ছৃঙ্খলা মেয়ের মত আলাপ আরম্ভ ক'র্‌লে।"

সুরো শিউরে উঠল, মুহূর্ত্তের মধ্যে কে যেন তার মুখে খানিকটা আবির মাখিয়ে দিল; দু' চোখ ভ'রে অভিমান বেদনার জলে তার বুক ভেসে গেল, আড়ষ্টকণ্ঠে ডাকিল—"স্বামিন্‌।"

২

"সুরো! কি হ'চ্ছে মা। অমন ধারা ছট্‌ফট্‌ ক'রছ কেন?"

"কই—কিছু ত হয় নি।"

"মা! শরীরটাকে মাটী ক'রে ফেল্‌লে, না খেয়ে, ছেঁড়া কাপড়ে থেকে আর দিন রাত কেঁদে কেঁদে।"

উত্তরে সুরো কাঁদিল। তার চোখের জল হৃদয়ের ভাষা ব্যক্ত করিল।

"মা! তুমি যে সঙ্কট রোগ ধরিয়েছ, কেমন ক'রে ভাল হোয়ে উঠবে, তাই দিন রাত ভাবছি, আর ভগবানের কাছে কামনা কচ্চি তুমি সেরে ওঠো।"

"ভগবানের কাছে ওসব কামনা কোরবেন কেন মা?"

"কি করি মা? না করে যে পারিনি।"

দত্তগৃহিণী আঁচল দিয়ে সুরোর মুখখানি মুছিয়ে ব'ল্‌লেন;—"মা! দিনরাত অমন ক'রে কেঁদনা। ছেলে অবাধ্য—কত বুঝিয়ে কেঁদে বললাম, শুধু মাথা নেড়ে চলে গেল।"

"না, মা! আমি তার জন্য কাঁদিনি, একটা কথা মনে পড়ে গেল তাই—"

ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে সুরোর কণ্ঠস্বর জড়িয়ে গেল, আর কিছু ব'ল্‌তে পারল না। দত্তগৃহিণী বললেন;—"মেয়ে মানুষ কি আর মেয়ে মানুষের ভাব বুঝতে পারে না, মা! সব জানি, কিন্তু উপায় নাই।"

সুরো আর থাকতে পা'রল না, সে শাশুড়ীর কোলে মাথা রেখে, ধরা গলায় ব'ললে;—"মা! আমি তাঁর ভালবাসা চাইনে, চাই তাঁকে পূজা করতে, তাতেও বঞ্চিত আমি!"

দত্তগৃহিণী সুরোকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে ব'ল্‌লেন;—"কি ব'লে এবার তোমায় সান্ত্বনা দিই? আজ তোমার কথার উত্তর দিতে আমি বুদ্ধিহীনা; বৌ, বৌ, চুপ কর।"

দত্তগৃহিণীর বুক খালি ক'রে একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল।

৩

"বাবা, অজু! কোথা যাচ্ছ বাবা?"

"বৈঠকখানায় যাচ্চি মা?"

"অজু! যতই অজ্ঞ হই, যতই দরিদ্রা হই না কেন, তবু ত আমি তোর মা! একটা কথা শোন্ বাবা।"

"কি কথা মা।"

"বৌমা'র আজ ব্যামোটা বেড়েচে, একবার কাছে গিয়ে বসগে বাবা।"

"মা, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে ও বিষয় অনুরোধ ক'রো না।"

"বাবা আমার! লক্ষ্মী বৌটী যে--"

অজিত আর কথার অপেক্ষা ক'রল না, বেরিয়ে প'ড়ল। পরে ভাবল, তাই ত সুরো আমাকে এত ভক্তি করে যে, পতিসেবাই যেন তার জীবনের চরম লক্ষ্য ব'লে মনে হয়; তবে তাকে ভালবাসায় দোষ কি? আবার তখনি মনে ক'রল, ছি! মনে দুর্ব্বলতা কখ'নো আনতে নেই; আমি কিছুতেই সুরোকে ভালবাসতে পারব না। আবার ভাবল বেশ, ভগবানই আমার ভালবাসার পাত্র, কিন্তু মানবাত্মা কি পরমাত্মার অংশ নয়? তবে ত প্রত্যেক মানুষই ভালবাসার পাত্র! সুরো কি মানুষ ছাড়া? আচ্ছা যাই হোক! একবার শেষ সময় আজ সুরোকে দেখবোই দেখবো।

অজিত ছুটে গিয়ে সুরোর ঘরে ঢুকে প'ড়ল।

৪

সুরো যে ঘরে শুয়ে আছে, সেই ঘরের জানালার পাশে একটী আমগাছ। সেই গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্য্যের আলো এসে তার মুখখানি আরও হাসিভরা ক'রে তুলেছে। অজিত ঘরে ঢুকে আস্তে ডাকলে,—"সুরো!"

সুরো উত্তর দিতে পারল না, তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল, দু ফোঁটা চোখের জল বালিসে গড়িয়ে প'ড়ল।

"সুরো আমায় ক্ষমা কর।"

সুরো এইবার ক্ষীণস্বরে ব'ল্লে;—

"স্বামিন্—সাধনা আমার!"

অজিত চোখ মুছ্তে মুছ্তে সুরোর মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ব'ললে;—"সুরো! সত্যই আমি তোমায় ভালবাসি, তুমি বেঁচে ওঠ!"

স্বামীর মুখপানে সুরোর তখন অপলক দৃষ্টি।

বিস্মৃতির পরে পুনর্দর্শনে।

[শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ]

এত দিন পরে এ বেশে এখানে এই কি ওগো সেই—
ঊষার আলোকে মুচকি হাসিয়া নয়ন ভুলাত যেই।
দূর অতীতের জীবন-আকাশে নাচিত পুষ্প তারা
জীবন-ঊষার সঙ্গে সঙ্গে হ'য়েছিনু তায় হারা।
জীবন যখন মরণের কোলে আজি পুনঃ কেন এই
এতদিন পরে এ বেশে এখানে এই কি ওগো সেই?
বালক বালিকা ছুটাছুটি কত রাগ অনুরাগ মাঝে
উভয়ে উভয়ে বাসিতাম ভাল এখনো স্মরণে বাজে।
কখন তাহার চিবুক ধরিয়া সোহাগে আদর ভরে
চুম্বন করি অভিমানী তার সাধনা কাতর স্বরে।
হাসিবার কথা! বালকের ব্যথা বালিকার তরে যেই
এতদিন পরে এ বেশে এখানে এই কি ওগো সেই?
জীবন-সূর্য্য মধ্য গগনে উগারে অনল যবে
সংগ্রামে তবু তাহারে হারায়ে সান্ত্বনা কোথা কবে।
আঁধারে কাড়িয়া লয়েছে সে ধন স্মৃতির যাতনা প্রাণে
নিয়তির খেলা দুঃখের মাঝে ভ্রান্তি হৃদয়ে আনে।
অস্তাচলের চূড়ে আজি পুনঃ দেখিতে হইল এই
বিধবার বেশে অভাগিনী তোরে আদরিণী মোর সেই।

২১শ ভাগ] { আশ্বিন, ১৩৩১। { [৮ম সংখ্যা

টেনিসনের কাব্যে ভারতের কথা।

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম-এ, বি-এল]

ইংরাজ-কবি টেনিসনের (১৮০৯—৯২ খৃঃ অঃ) কাব্যে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ সংক্রান্ত রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক কথা স্থান পাইয়াছে। তাহা হইলেও, টেনিসনের কল্পনা যে রাজনৈতিক ঘটনা ছাড়া ভারতবর্ষের অপর কোনও সংবাদ রাখে নাই এমন কথা বলা যায় না। ভারতবর্ষে প্রচলিত বাঁশীর সহিত কবিদিগের গীতি-মুখর রচনার তুলনা করিয়া টেনিসন্ লিখিয়াছেন,—"Like Indian reeds blown from his silver tongue"—(The Poet) "শিল্প-সৌধ" (The Palace of Art) নামক কবিতায় টেনিসন্ ভারতের তাল ও ধান্যবৃক্ষ সমাকীর্ণ প্রদেশের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—"And many a tract of palm and rice The throne of Indian Cama", ইত্যাদি। প্রেমের দেবতা কামদেবের সিংহাসন যে ভারতবর্ষে অধিষ্ঠিত একথা টেনিসনের পূর্ব্বে একাধিক ইংরাজ-কবি স্বীকার করিয়াছেন। নেপোলিয়ন বোনাপার্টি ইংলণ্ডের অধিকৃত দেশসমূহকে ফ্রান্সের অধীনে আনয়ন করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। টেনিসন্ "বোনাপার্টি" (Buonaparte) নামক কবিতায় ইহার উল্লেখ করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভারতের কথা বলিয়াছেন।

"Madman !—to chain with chains and
bind with bands
That island queen who sways the floods
and lands
From Ind to Ind."—

"এনক্ আর্ডেন্" (Enoch Arden) নামক সুপ্রসিদ্ধ কবিতায় টেনিসন্ নায়কের সমুদ্রযাত্রা বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন যে, এনকের জাহাজ ঝড়ে জলমগ্ন হইলে তিনি দুইজন সহযাত্রীর সহিত ভারতবর্ষের সমুদ্রতীরস্থ পর্ব্বত গুহায় কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করেন।

"There in a seaward-gazing mountain gorge
They built, and thatch'd with leaves of
palm, a hut,
Half hut, half native cavern."—

পাঁচ বৎসর পরে এনকের একজন সঙ্গী একটী বৃক্ষের শুষ্ক কাণ্ড প্রাপ্ত হইয়া, ভারতবাসীরা যে উপায়ে নৌকার গর্ত্ত প্রস্তুত করে সেই উপায় অবলম্বন করিয়া উক্ত কাণ্ডে অগ্নি সংযোগ করেন এবং সূর্য্যের উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

"The two remaining found a fallen stem ;
And Enoch's comrade, careless of himself,

Fire-hollowing this in Indian fashion, fell
Sun-stricken."—

"আয়মার্স ফিল্ড" (Aylmer's Field) নামক কবিতায় টেনিসন্ ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাগত এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যেরূপে সুন্দরী রমণীর পাণিগ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন তাহার একখানি খণ্ড-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। চিত্রের নায়ক কথাবার্ত্তার বড় বেশী ধার ধারেন না, কেবল অজস্র উপহার বর্ষণ করিতে জানেন। এই সকল উপহার তিনি ভারতবর্ষ হইতে আহরণ করিয়াছেন।

—"He spoke not, only shower'd
His Oriental gifts on everyone
And most on Edith :"

উপহারমালার মধ্যে রত্নমণ্ডিত বহুমূল্য খাপে একখানি ছোরা ছিল। ছোরাখানির একটু ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। দস্যুকর্ত্তৃক অধিকৃত এক পার্ব্বত্য দুর্গ আক্রমণ করিবার পর দস্যুপতিকে বধ করিয়া সাহেব এই অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং এক্ষণে তিনি ইহা এডিথ্‌কে অর্পণ করিলেন।

—"Storming a hill-fort of thieves
He got it ; for their captain after fight,
His comrades having fought their last below,
Was climbing up the valley ; at whom he shot ;
Down from the beetling crag to which he clung
Tumbled the tawny rascal at his feet,
This dagger with him, which when now admired
By Edith whom his pleasure was to please
At once the costly Saheb yielded to her."

কবি বলেন, এই সাহেব কবিতায় বর্ণিত লেডি আয়মারের একজন আত্মীয়। "My Lady's Indian kinsman"—টেনিসন্ আলোচ্য কবিতায় এই শ্রেণীর সাহেবদিগের চরিত্রের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়া অনেক কথা বলিয়াছেন। ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটনের মৃত্যুতে টেনিসন্ যে শোক-সঙ্গীত রচনা করেন তাহাতে আসাই (Assaye) রণক্ষেত্রের উল্লেখ আছে।

"This is he that far away
Against the myriads of Assaye
Clash'd with his fiery few and won."—

নিজাম-রাজ্যের সীমান্তে আসাই গ্রামে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। কর্ণেল ওয়েলেশলি (পরে ডিউক অব্ ওয়েলিংটন) ৪৫০০ সৈন্য লইয়া ৫০০০০ মারাঠা সৈন্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে ইংরাজ সৈন্য জয়লাভ করে, কিন্তু ওয়েলেশলির অধীনে খাস য়ুরোপীয় সৈন্যের এক-তৃতীয়াংশ নিহত হইয়াছিল।

"ডিফেন্স অব্ লক্ষ্ণৌ" (The Defence of Lucknow) নামক শতাধিক মাত্র ছত্রে রচিত কবিতায় টেনিসন্ সিপাহি বিদ্রোহের ইতিহাসে লক্ষ্ণৌ সহর অবরোধ ও ইংরাজগণ কর্ত্তৃক ইহার রক্ষার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহ সংক্রান্ত যতগুলি কবিতা ইংরাজি ভাষায় রচিত হইয়াছে তন্মধ্যে আলোচ্য কবিতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কবি সমসাময়িক ইতিহাসকে অনুসরণ করিয়া এই কবিতা রচনা করিয়াছেন। ইহাতে ইংরাজের বীরত্ব জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। ইংরাজি ভাষায় অনেক সাময়িক কবিতা আছে বটে কিন্তু টেনিসনের রচিত এই কবিতা ওজস্বিতায়, বর্ণনার পারিপাট্যে ও যুদ্ধের অব্যক্ত কোলাহলের অনুকরণে অতুল্য। অবরুদ্ধ ইংরাজ সৈন্যের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যে সকল সিপাহি বিদ্রোহীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল তাহাদিগের বীরত্বের প্রশংসা করিয়া কবি লিখিয়াছেন,—

"Praise to our Indian brothers, and let the dark face have his due !
Thanks to the kindly dark faces who fought with us, faithful and few,
Fought with the bravest among us, and drove them, and smote them, and slew,
That ever upon the topmost roof our banner in India blew."

"ষাট বৎসর পরে" (Sixty Years After) নামক কবিতায় টেনিসন্ রুষভীতির উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"Russia bursts our Indian barrier, shall
we fight her ? Shall we yield ?
Pause ! before you sound the trumpet,
hear the voices from the field.
Those three hundred millions under one
Imperial sceptre now,
Shall we hold them ? Shall we loose them ?
take the suffrage of the plow."

"হ্যাণ্ডস্ অল্ রাউণ্ড" (Hands All Round) নামক কবিতায় টেনিসন্ স্বদেশ-প্রীতির পরিচয় দিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে ইংলণ্ডের উদ্দেশে স্বাস্থ্য পান করিতে অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"To England under Indian skies,
To those dark millions of her realm !
*　　*　　*
Whatever statesman hold the helm.
Hands all round !
God the traitor's hope confound !
To this great name of England drink,
my friends ;
And all her glorious empire, round
and round."

টেনিসনের সমকালে ইংলণ্ডে "ভারতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রদর্শনী"র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কবি যুবরাজ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। এই কবিতাতে তিনি ইংরাজাধিকারের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগৃহীত দ্রব্যাদির উল্লেখ করিয়া ভারতবর্ষ ও অন্যান্য স্থানের শিল্পদ্রব্যের প্রদর্শকদিগকে অভ্যর্থনা করিতেছেন কিন্তু সেই সঙ্গে বৃটনদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "দেখো, তোমরা যেন শিল্প-জগতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হটিয়া না যাও।" ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড ডফারিনকে সম্বোধন করিয়া টেনিসন্ যে কবিতা লিখিয়াছিলেন তাহাতে রাজপ্রতিনিধি সম্বন্ধে একটি শ্লোক উল্লেখযোগ্য।

—"Your viceregal days
Have added fulness to the phrase
Of Gauntlet in the velvet glove,"

লর্ড ডফারিন শক্তিশালী শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহার "মখমলের দস্তানা লৌহময় বাহুত্রাণ ঢাকিয়া রাখিয়াছিল।" মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পঞ্চাশবর্ষ-ব্যাপী রাজত্বের শেষে যে আনন্দোৎসব হইয়াছিল টেনিসন্ তদুপলক্ষে একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। এই কবিতায় অন্যান্য জাতির সহিত ভারতবাসীকেও সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়াছেন,—

"You Canadian, Indian,
Australasian, African,
All your hearts be in harmony,
All your voices in unison,
Singing, 'Hail to the glorious
Golden year of her Jubilee' !"
(*On the Jubilee of Queen Victoria*)

"রোমনির পরিতাপ" (Romney's Remorse) নামক কবিতায় টেনিসন্ মুসলমানের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—"The ruthless Mussulman who flings his bowstrung Harem in the sea." এই কবিতার নায়ক রোমনি জীবনের শেষে উন্মাদ হইয়াছিল। কবি তাহাকে এই অবস্থায় বলিতে শুনিয়াছেন,—"কে বাহিরে ডাকিতেছে না ? না ! Will my Indian brother come ?" এই সুন্দর কবিতায় টেনিসন্ আর্টের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন।

"আকবরের স্বপ্ন" (Akbar's Dream) নামক কবিতায় টেনিসন্ স্বনামপ্রসিদ্ধ মোগল সম্রাটের সার্ব্বজনিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন আকবরের জীবনচরিত পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। এস্থলে উক্ত কবিতা হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল। আবুল ফাজলকে সম্বোধন করিয়া আকবর বলিতেছেন,—

—"While thou art one with me,
I am no longer like a lonely man
In the King's garden, gathering here
and there
From each fair plant the blossom
choicest-grown
To wreathe a crown not only for the
king

But in due time for every Mussulman,
Brahmin, and Buddhist, Christian, and Parsee,
Thro' all the warring world of Hindustan."

আকবরের অসাম্প্রদায়িকতা তাঁহার নিজ মুখে ব্যক্ত হইয়াছে।

"I hate the rancour of their castes and creeds,
I let men worship as they will, I reap
No revenue from the field of unbelief.
I cull from every faith and race the best
And bravest soul for counsellor and friend.
I loathe the very name of infidel.
I stagger at the Koran and the sword.
I shudder at the Christian and the stake;
Yet "Alla", says their sacred book, "is Love",
And when the Goan Padre quoting Him,
Issa Ben Mariam, his own prophet cried
"Love one another little ones" and "bless"
Whom? even "your persecutors!" there methought
The cloud was rifted by a purer gleam
Than glances from the sun of our Islam."

স্বপ্নের শেষভাগে আকবর ভারতের ভবিষ্যত সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"From out the sunset pour'd an alien race,
Who fitted stone to stone again, and Truth,
Peace! Love and Justice came and dwelt therein,
Nor in the field without were seen or heard
Fires of Suttee, nor wail of baby-wife,
Or Indian widow; and in sleep I said
"All praise to Alla by whatever hands
My mission he accomplished!"—

টেনিসন্ অন্যান্য কবিতা ছাড়া কয়েকখানি নাট্য-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল কাব্য ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। "কুইন্ মেরি" (Queen Mary) নামক কাব্যে টেনিসন্ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভারতের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—"His sceptre shall go forth from Ind to Ind" উক্ত কাব্যে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও প্রাচ্যের সুগন্ধী দ্রব্যের আবাসভূমি দ্বীপ সকলের কথা কবি বলিয়াছেন। "The Philippines And all the fair spice-islands of the East." এই নাটকে কাউণ্ট ডি ফ্যারিয়া (Count de Faria) ইংলণ্ডের কুমারী রাণী এলিজাবেথকে বলিতেছেন যে, যদি তিনি স্পেনের রাজা ফিলিপকে বিবাহ করেন তাহা হইলে ইংলণ্ড প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (The Indies) ভারতের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিবে। ইহার উত্তরে এলিজাবেথ বলিলেন, "হয়ত ইংলণ্ড স্পেনের সাহায্য না লইয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভারতের অধীশ্বরী হইবে।"

Elisabeth. "It may chance, that England
Will be the mistress of the Indies yet,
Without the help of Spain."

টেনিসনের স্বদেশ-প্রেম ও খৃষ্টধর্ম্মে আস্থা অনেক সময়ে বিধর্ম্মী মুসলমানের বিরুদ্ধে অযথা রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে নাই। "বেকেট" (Becket) নামক নাটকে ইংলণ্ডের রাজা হেনরীর মুখ দিয়া কবি বলিয়াছেন,—

"No! God Forbid! and turn me Mussulman!
No God but one, and Mahound is his prophet."

এই নাটকে ওয়াল্টার ম্যাপ (Walter Map) আর্কবিশপ বেকেটকে বলিতেছেন,—"Nay, my lord, take heart for tho' you suspended ourself, the Pope let you down again; and tho' you suspend Foliot and another, the Pope will not leave them in suspense, for the Pope himself is always in suspense, like Mahound's coffin hung between heaven and Earth."

আলোচ্য নাটকে ইলিনর (Eleanor) রোজামণ্ডকে (Rosamond) বলিতেছেন,—

"Child, I am mine own self
Of and belonging to the King, The King
Hath divers ofs and ons, ofs and belongings,
Almost as many as your true Mussalman—
Belongings, paramours, whom it pleases him
To call his wives ; but as it chances, child,
That I am his main paramour, his Sultana."

শেলি ও কীটসের পরবর্ত্তী যুগে ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যে রোমান্টিসিজমের প্রভাব ক্রমশঃ লোপ পাইয়া যায়। টেনিসন্ নব-রোমান্টিক (Neo Romantic) যুগের সর্ব্বপ্রথম কবি। তাঁহার রচনায় কবি-কল্পনা ষোল কলায় স্ফূর্ত্তি পাইলেও শেলি ও কীটসের ন্যায় তাহা অসংযত নহে। টেনিসন্ সমসাময়িক ইংলণ্ডের ইতিহাসের জীবন্ত ঘটনাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতিভাকে কল্পনার রাজ্যে যদৃচ্ছা বিচরণ করিতে অবসর দেন নাই। আমরা সেই কারণে তাঁহার নাট্য-কাব্যগুলিতে ইংলণ্ডের ইতিহাসের প্রভাব অত্যধিক অনুভব করি। টেনিসনের সমকালে ইংরাজগণ ভারতবর্ষে তাঁহাদের শাসন-লীলার অভিনয় করিতেছিলেন। কবি সেইজন্য একাধিক পদ্যময় রচনায় ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তাদের কার্য্যকলাপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। টেনিসনের কাব্যে ভারতের যে সকল কথা স্থান পাইয়াছে তাহাতে সরকারী রিপোর্টের গন্ধ যতটা পাওয়া যায় কবির কল্পনা-শক্তির পরিচয় ততটা পাওয়া যায় না। অথচ, টেনিসনের জীবদ্দশায় ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী সম্বন্ধে ইংরাজের অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সুবিধা যতটা ছিল তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ইংরাজ কবিদিগের সময়ে তাহার শতাংশের একাংশও ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শেলি ও কীটস ভারত-ললনার যে সকল অতুলনীয় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, টেনিসনের সৌন্দর্য্য-দৃষ্টি সেগুলিকে উপেক্ষা করিয়া ভারতবর্ষে ইংরাজ জাতির কর্ম্মময় জীবনের সাফল্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়াছিল। ভারতবাসীর প্রতি টেনিসনের সহানুভূতি আদৌ ছিল না, এমন কথা বলিবার কোনও কারণ নাই। টেনিসনের কাব্য হইতে উদ্ধৃত একাধিক শ্লোকে ভারতবাসী সম্বন্ধে কবির অভিমত যে ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, রাজনীতির দিক হইতে তিনি ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের হস্তে ন্যস্ত নাবালকের সম্পত্তিস্বরূপ দেখিতেন। শেলি ও কীটস 'ভাব'-জগতের কবি। টেনিসন যুক্তি তর্ক ও রাজনীতির অষ্ট বন্ধনের মধ্যে কাব্য রচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমরা সেই কারণে প্রাচীনতর ইংরাজ কবির কাব্যাধারে সজ্জিত কল্পনা-প্রসূত অসংখ্য সুন্দর চিত্রে ভাবময়ী ভারতমাতার হৃদয়-স্পন্দন স্পষ্ট অনুভব করি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে টেনিসনের মৃত্যু পর্য্যন্ত জড়ভাবাপন্ন পাশ্চাত্য সভ্যতার যে তরঙ্গ ভারতবর্ষের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, ভারতবাসী সে তরঙ্গের বেগ সহ্য করিতে পারে নাই। সুতরাং ইংরাজ কবি টেনিসনের হৃদয়ের উপর দীনা ভারতমাতা আধিপত্য স্থাপন করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। টেনিসনের কাব্যে ভারতের কথার পরিবর্ত্তে বেশীর ভাগ ইঙ্গ-ভারতের কাহিনী স্থান পাইয়াছে বলিলে অসঙ্গত হইবে না।

শিক্ষায় শোরগোল।

[শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায় এম-এ]

(৫)

প্রাথমিক শিক্ষার বাহন পরিবর্ত্তনের ফল-শ্রুতি।

শ্রীযুক্ত বিস মহোদয় বাংলা বর্ণমালার সংস্কার দ্বারা যে সকল সুফলের আশা করেন, তাহার একটু আলোচনা আবশ্যক। তিনি দেখাইয়াছেন যে, বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রথমেই শিশুদিগকে বর্ণের ৫০৭টী ভিন্ন ভিন্ন রূপের সহিত পরিচিত হইতে হয়। ইহাতে অনেক সময়ের অপব্যয় হয়। প্রাথমিক শিক্ষার কাল যখন অল্প, তখন এরূপ অপব্যয়

অমার্জ্জনীয়। রোমাণ অক্ষর ব্যবহার করিলে মাত্র ২৪টী বর্ণ শিখিলেই, বর্ণশিক্ষা সম্পন্ন হইবে, এবং পঠক্রিয়া খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শীঘ্র শীঘ্র অগ্রসর হইতে থাকিবে। বোধ হয় ইহাও তিনি অনুমান করেন যে,বাংলা বর্ণমালা লিখিতেও অনেক কষ্ট পাইতে হয়। নূতন বর্ণমালায় মাত্র ছয়টী মূল চিহ্ন ব্যবহৃত হইবে বলিয়া ইহার লিখন অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ হইবে। সঙ্গে সঙ্গে এক বাংলা ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা দ্বারা ইংরাজি বর্ণমালার সহিতও পরিচয় হইয়া থাকিবে, এবং সেই কারণে যথাসময়ে ইংরাজি শিক্ষাও অনেক সহজ হইয়া দাঁড়াইবে। বাংলা বর্ণমালার এই নূতন পরিবর্ত্তনে আরো একটী বিশেষ সুবিধা হইবে। যদিও অনেক ভাষা লিখনেই টাইপরাইটার ব্যবহার করা সম্ভব হইয়াছে, বাংলা বর্ণমালা সহজে টাইপরাইটারে ব্যবহার করা যায় না। নূতন পরিবর্ত্তনে বাংলা ভাষা লিখনে টাইপরাইটার প্রচলনে কোন প্রকার অসুবিধা থাকিবে না। সুবিধার ফর্দ্দের দীর্ঘতা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, এই সুবিধা প্রত্যাখ্যান করা মূর্খতার পরিচায়ক।

(ক) বর্ণের সংখ্যা।

এক্ষণে কথা উঠিতেছে, যে বাংলা বর্ণমালায় বাস্তবিকই কি ৫০৭টী পৃথক পৃথক অক্ষর? মিঃ বিস যে তালিকাটী দিয়াছেন, তাহাতে অনেক অসম্পূর্ণতা, অনেক কুচিন্তা বর্ত্তমান। কএকটী অক্ষর মুদ্রাকর প্রমাদেই হোক, আর অন্য কারণেই হোক দুইবার করিয়া ধরা হইয়াছে; যথা—৭, র্ঘ, র্গ, হ্ন, শ্ব, হ্ব। 'দ' যে 'য' ফলার দুইটী রূপ দেওয়া হইয়াছে—দ্য ও দয;—কিন্তু 'দয' ত কৈ ছাপার অক্ষরে বড় একটা দেখা যায় না।—'ং' 'ঃ' ও 'ঁ'—এই তিনটী চিহ্ন বর্ণ সহযোগেই ব্যবহৃত হয়। বর্ণ সমষ্টির তালিকায় এগুলির যোগ, যদি পৃথকভাবে প্রদর্শন করান আবশ্যক বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে 'অ' ও '৯' ভিন্ন স্বরবর্ণের যোগে বর্ণের যে পৃথক রূপ হয়, সেগুলি তালিকায় পৃথক ভাবে দেওয়া হয় নাই কেন? হসন্ত চিহ্নেরও পৃথক অস্তিত্ব নাই; কিন্তু একই পদ্ধতির অনুসরণ আবশ্যক বোধ হইলে, ইহাকেও সর্ব্বত্রই বিভিন্ন যুক্ত ও অযুক্ত অক্ষরের সহিত পৃথকভাবে দেখান উচিত ছিল।—'ই'কার, 'ঈ'কার, 'উ'কার, 'ঊ'-কার ও 'ঋ'কার সংযোগে মাত্র কএকটী যুক্ত ও অযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের পৃথক রূপ স্বীকৃত হইয়াছে; কিন্তু কেন কএকটী মাত্র ব্যঞ্জনবর্ণ, এবং কেনই বা 'আ'কার, 'এ'কার, 'ঐ'কার, 'ও'কার ও 'ঔ'কারকে এই পৃথক রূপত্বের কৌলীন্য হইতে নির্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে, এবং কি রীতি অনুসরণ করিয়া এই অভিজাত্যের ব্যবস্থা হইয়াছে,—তাহা একেবারে বুঝা যায় না। 'ঁ' সহযোগে অনেকগুলি অক্ষরের পৃথকত্ব স্বীকৃত হইয়াছে; এমন কি হসন্ত চিহ্নকেও কিছু কিছু সম্মান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু 'ং' ও 'ঃ'কে অনুরূপ মর্য্যাদা একেবারেই প্রদান করা হয় নাই। রেফ্, 'য'ফলা, ও 'র'ফলার ভাগ্যও সর্ব্বত্রই সুপ্রসন্ন হয়। অধিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা অনাবশ্যক। যদি মিঃ বিস একই রীতির অনুসরণ করিয়া অনুস্বার, বিসর্গ, চন্দ্রবিন্দু, হসন্ত, 'অ'কার ও '৯'কার ভিন্ন স্বরবর্ণ, রেফ্, 'র'ফলা, 'য'ফলা, 'ব'ফলা, ইত্যাদির সংযোগের নব নব সৃষ্টিশক্তি স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে বীজগণিতের নিয়ম অনুসারে তিনি বাংলা বর্ণ সমষ্টির সংখ্যাধিক্যের এরূপ উদাহরণ প্রদর্শন করিতে পারিতেন, যে তাহারি তাড়নায়, বোধ হয়, বাংলা ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা ভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিত, এবং মিঃ বিসকে তাঁহার নূতন সংস্কার কার্য্যে পরিণত করিতে বিশেষ কিছু বেগ পাইতে হইত না। মোট কথা, তাঁহার মত বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট অমন একটী ন্যায় শাস্ত্রানুমোদিত, সুচিন্তিত প্রস্তাবেরই আশা করি। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি সম্বন্ধে তিনি এরূপ প্রস্তাবই উপস্থিত করিয়াছেন; এবং বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তাঁহার বর্ণমালার সংস্কারের প্রস্তাবটী অত্যন্ত কুচিন্তিত ও অত্যন্ত উদ্ভট রকমের। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্ণমালা সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটী তাঁহার নিজের নয়। কিন্তু তিনি যখন ইহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তিনিই যখন ইহাকে শিক্ষার একটী অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গে ব্যবহার করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, তখন প্রস্তাবটী সম্বন্ধে তিনি তাঁহার নিজের দায়িত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না। প্রস্তাবটী তাঁহার উপযুক্ত হয় নাই।

বর্ণের আকারের পৃথকত্ব নিরূপণে আমাদের কিরূপ নীতি অবলম্বন করা উচিত? যাহারা শিখিবে, যাঁহারা শিখাইবেন, বা যাঁহারা কেবল দ্রষ্টা ও সমালোচক—কাহার দিক দিয়া বিষয়টীর বিচার করিতে হইবে? শিক্ষ. বিজ্ঞান, শিক্ষা বিজ্ঞান বলিয়া আমরা খুব বড় গলায় চীৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছি; কিন্তু এই বিজ্ঞানের একটী শ্রেষ্ঠ কথা মাত্র কএক বৎসর হইল একটু বিশেষ ভাবে শোনা যাইতেছে। শিক্ষার প্রথম কথা—ছাত্রদের পাঠনার সর্ব্ব প্রথম সূত্র,—শিক্ষার বিষয়টীকে ছাত্রদের দিক দিয়া বিচার করিতে হইবে;—আমাদের পূর্ব্বার্জ্জিত অভ্যাস ও সংস্কারের ভিতর দিয়া বিচার করিলে প্রায় কোন স্থলেই, যাহারা শিখিবে তাহাদের দিক দিয়া বিচার করা হয় না। বিদেশের শিক্ষিত লোকেরা যুক্ত অক্ষরগুলি একটীর পাশে একটীকে দেখিতেই অভ্যস্ত; সেই কারণে লিখন পঠনে এইরূপ অক্ষরই তাঁহাদের নিকট সহজ। টাইপরাইটারে এরূপ অক্ষরের ব্যবহারই সম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়া সকল দেশের, সকল লোকের, বিশেষতঃ সকল শিশুর এইরূপ পাশাপাশি বর্ণ সমাবেশই যে সহজ ও সুখকর, এরূপ অনুমানের কারণ কি? একটীর পর একটি দেখিতে, চিনিতে ও লিখিতে যদি কোন দেশের শিশুর কষ্ট না হয়, তাহার অর্থ এই কি যে অপর দেশের শিশুরাও নিজ নিজ ভাষার বর্ণগুলিকে উপরে নীচে দেখিতে, চিনিতে ও লিখিতে কষ্ট বোধ করিবে? নিজ নিজ দেশগত, জাতিগত এবং ভাষাগত সংস্কার ও অভ্যাস ভিন্ন এরূপ অনুমানের অন্য সার্ব্বভৌমিক কোন যথেষ্ট কারণ আছে কি? অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে যে, ছোট ছোট শিশুদের বিশ্লেষণের শক্তি সুদৃঢ় নয়। তাহারা সমষ্টিকেই দেখে, ও তাহার সহিত পরিচিত হয়, ব্যষ্টিকে বড় একটা দেখে না, এবং পৃথক করিবার শক্তিও তাহাদের সতেজ থাকে না। কিন্তু বিশ্লেষণ ভিন্ন প্রাথমিক ভাষা শিক্ষার অপর কোন উৎকৃষ্টতর উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে কি? পূর্ণ শব্দ (word method) অথবা পূর্ণ বাক্যকে (sentence method অথবা 'look and say' method) ভিত্তি করিয়া প্রাথমিক ভাষা শিক্ষা আরম্ভ হইলেও, যত শীঘ্র সম্ভব হয়, পৃথক অক্ষরে অর্থাৎ বিশ্লেষণে নামিয়া আসিতে হয়। এরূপ পন্থা অনুসরণ না করিলে, প্রাথমিক ভাষা শিক্ষা অনাবশ্যক ভাবে জটিল হইয়া উঠে। আমাদের দেশের ভাষা শিক্ষার বর্ণ ধারা (alphabetic method) অনুসরণ করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পন্থা। বহুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ভূদেব বাবুই এই বর্ণধারার স্বপক্ষে অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বালকেরা যুক্ত বর্ণগুলি সমষ্টি ভাবে দেখিয়া যদি পৃথক বলিয়া মনে করে, বিশ্লেষণ দ্বারা তাহাদের ভুল ভাঙ্গাইয়া দিতে হইবে; এবং শিক্ষার আরম্ভ হইতেই এই কার্য্য চলিতে থাকিবে। এরূপ করিলে যুক্ত বর্ণের পৃথকত্ব প্রথম হইতেই লোপ পাইতে থাকিবে, এবং বিশেষতঃ যে যুক্ত বর্ণগুলিতে পৃথক অযুক্ত বর্ণের আকারের বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয় না, সেগুলিকে আর পৃথক বর্ণ বলিয়া মনে হইবে না। আমাদের শিশুদের প্রাথমিক বর্ণশিক্ষা যাঁহারা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে বর্ণশিক্ষা কষ্টকর হইলেও, মূল বর্ণ ও তাহাদের সংযুক্ত অবস্থার রূপান্তরের সহিত প্রাথমিক পরিচয় হইলেই, সংযোগে যেখানে মূল অক্ষরের বিশেষ কিছু বিকার হয় না, সেখানে তাহারা অনায়াসেই যুক্তবর্ণে পৃথক মূল বর্ণের অস্তিত্ব দেখিতে পায়। ড, ঢ, ন, ব, ও য চিনিলেই যেমন ড়, ঢ়, ণ, র ও য় চিনিতে বেশী দেরী হয় না, সেইরূপ মূলবর্ণ, ং, ঃ, ঁ, এবং অ ও ঌ ভিন্ন অপরাপর স্বরবর্ণের রূপান্তরের সহিত পরিচয় ঘটিলে, মূলবর্ণের সহিত ং, ঃ, ঁ ইত্যাদির সংযোগ চিনিয়া লইতে, তাহাদের বেশী সময়-ক্ষেপ হয় না। মূলবর্ণগুলির পর সেই জন্য আমাদের দেশের বালক বালিকাদিগকে ং — ঃ — ঁ চিনাইয়া লওয়া হয়, এবং তাহার পর ছড়ার সুরে একটী অথবা দুইটী অক্ষরকে অবলম্বন করিয়া স্বর ও ং ইত্যাদির সংযোগ শিক্ষা দেওয়া হয়,—যেমন 'ক'-এ 'আ'-কার দিলে 'কা', 'ক'-এ 'ই'-কার দিলে 'কি', ইত্যাদি ইত্যাদি। পূর্ব্বে পাঠশালাতে ইহার পর 'আঙ্ক', 'আস্ক' প্রভৃতির পরিচয় করাইয়া লওয়া হইত। এখন এ প্রণালীর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু সেটী ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে তাহা পুঁথিগত বিদ্যা ও অনুকরণের গোলামির মোহ বর্জ্জন করিয়া ভাবিয়া

দেখার বিষয়। এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমার মনে হয় ছাত্রদের দিক দিয়া বাংলা ভাষার 'তথা-কথিত' বর্ণ সমষ্টিকে চারভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; প্রথম,—যেগুলি মৌলিক চিহ্ন; দ্বিতীয়,—যেগুলি মৌলিক চিহ্নগুলির যুক্ত অবস্থা হইলেও, যাহাদের প্রত্যেকে পৃথক পৃথক মৌলিক চিহ্নগুলি সহজ বিশ্লেষণে, এমন কি শিশু-শক্তিতেই অনায়াসে ধরা পড়ে; তৃতীয়,—যে যুক্ত অক্ষর-গুলিতে মৌলিক কোন কোন চিহ্নের সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন ঘটে, কিন্তু দুই একটা এরূপ অক্ষর বিশ্লেষণ করিলেই সেগুলি ও অপরগুলির মৌলিক চিহ্ন অনায়াসেই বুঝা যায়; এবং চতুর্থ,—যে যুক্ত অক্ষরগুলিতে মৌলিক চিহ্নগুলির বিশেষ পরিবর্ত্তন হওয়ায়, যুক্ত অক্ষরগুলিকে অন্ততঃ ছাপার অক্ষরে অনেকটা পৃথক বলিয়া ভ্রম হইবার সম্ভাবনাই অধিক। এইরূপে বিচার করিলে, শিশুরা বাস্তবিক যে সকল অক্ষরকে পৃথক বলিয়া মনে করিয়া, অক্ষর পরিচয়ে কষ্ট পায়, এরূপ অক্ষরের সংখ্যা বিস সাহেবের তালিকার ন্যায় গুরু হইবে না। কারণ প্রথম ও চতুর্থ শ্রেণীর অক্ষরগুলিকেই শিশুরা সম্পূর্ণরূপে পৃথক মনে করে। দ্বিতীয় শ্রেণীর অক্ষরগুলিতে খুব নিকৃষ্ট বুদ্ধির শিশু ভিন্ন অন্য কেহ বড় একটা অসুবিধা বোধ করে না। তৃতীয় শ্রেণীর অক্ষরগুলি সম্বন্ধে অনেককে কএকবার বিশেষ একটু সাহায্য করা আবশ্যক হয়। কিন্তু এই শ্রেণীর অক্ষরগুলির অনেকের কাঠিন্য প্রায় একই প্রকার; —যেমন ছাপার 'ম'-ফলার সামান্য পরিবর্ত্তিত রূপটী একই রকমের এবং সেইরূপ ণ, ন, ও স-এর সহিত অন্য বর্ণ সংযুক্ত হইলে, ইহাদের যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহার ভিতর প্রভূত সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকে। চতুর্থ শ্রেণীতেও অনেক সময় বিশেষ পরিবর্ত্তনের এরূপ সাদৃশ্য থাকে;—যেমন 'র'-ফলায় 'র'-য়ের আকার না থাকিলেও ইহার পরিবর্ত্তিত রূপ প্রায় সর্ব্বত্রই একই প্রকার। কিন্তু পৃথক রূপের দিক দিয়া বাংলা অক্ষরের সংখ্যা বিস সাহেবের অনুমান অনুযায়ী না হইলেও, ইহাদের সংখ্যা যে কিছু অধিক তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তথাপি এই বর্ণমালা আয়ত্ত করিয়া ভাষায় প্রাথমিক প্রবেশাধিকার লাভ করিতে শিশুদের দুই বৎসরের অধিক সময় যাপন করা আবশ্যক হয় না। যদি ক্ষেত্রবিশেষে ইহা অপেক্ষা বেশী সময়ের প্রয়োজন হয়, তাহা হয় অভিভাবক ও শিক্ষকদিগের যত্নের অভাব, না হয় অবহেলা, আর না হয় কুপ্রণালীর ফল। মণ্টেসরীর প্রণালী অনুসরণ করিয়া আমি দেখিয়াছি যে, অনেকটা সাধারণ বুদ্ধি বালক বালিকাদিগকে বোধ হয় তিন সপ্তাহের ভিতর অযুক্ত অক্ষরগুলি পরিচয় করান সম্ভব, এবং ছয় মাস অথবা এক বৎসরের মধ্যে তাহাদিগকে তাহাদের শক্তির উপযোগী লিখন ও পঠন আরম্ভ করান যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ অযুক্ত ও যুক্ত বর্ণ শিক্ষার কাল দুই বৎসর ধরিলেও, এই দুই বৎসরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রবেশ লাভের যে শক্তি জন্মে, ইংরাজ শিশুরা কি ঐরূপ কালের ইংরাজি শিক্ষার পর নিজেদের ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনুরূপ শক্তি অর্জ্জন করে?

(খ) রোমাণ বর্ণমালা।

অতঃপর রোমাণ বর্ণমালা প্রচলনের কথা। মাত্র ২৪টী চিহ্ন আবশ্যক হইবে। কিন্তু এই চিহ্নগুলির বেলায় ইহা-দিগকে কম করিয়া ধরা হইয়াছে। এই প্রণালীতে 'হ' ও 'ঃ', 'ই' ও 'ঈ', এবং 'উ' ও 'ঊ'-র রূপভেদ থাকিবে না। কিন্তু 'ঙ', 'ঞ', 'ন' ও 'ণ' এবং 'শ', 'ষ' ও 'স'-র এরূপ রূপভেদ স্বেচ্ছাধীন। এই সকল বর্ণের বা ধ্বনির পার্থক্য নিরাকরণের চেষ্টা কেন হইল, তাহা বেশ বুঝা যায় না! যদি বাংলা ভাষার সমস্ত অক্ষর স্বীকৃত হয় তাহা হইলে, অক্ষর সমষ্টি হইবে নিম্নরূপ :—

a, aa, i, i', (?) u, u', (?), ri, li, e, æ, o, ao, k, kh, g, gh, n, ch, chh, j, jh, n', t', th', d', dh', n', t, th, d, dh, n, p, ph, b, bh, m, jj, r, l, sh, SH, s, h, rr, rh, y, ng, h' (?), ʌ, q,—

অর্থাৎ মোট ৫১টা। ইংরাজি বর্ণমালার ২১টা অক্ষর ও ৬টা (ı,—, o, ', •, ʌ) ছোট ছোট চিহ্নের দ্বারা ৫১টা ধ্বনি প্রকাশের চেষ্টা হইয়াছে। বর্ণ শিক্ষাকে সহজ করা সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য হইলেও, প্রত্যেক বর্ণ চিহ্নের ছাপার ও লিখার রূপ বজায় রাখা হইয়াছে। এইরূপে ইংরাজি বর্ণমালার অনুকরণের মোহে প্রধান উদ্দেশ্যটীকে

মনে রাখা আবশ্যক বোধ করে নাই। কার্যক্ষেত্রে শিশুদের পক্ষে নানা ছোট ছোট চিহ্নের হের-ফের এবং অক্ষরের বড় ছোটোর পার্থক্য কিরূপ গণ্ডগোলের কারণ হইবে, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। তারপর মিশ্র [illegible] বর্ণগুলিকে পাশাপাশি রাখাই সুবিধাজনক অক্ষর সৃষ্টিতে [illegible] উপর নীচুর হাত হইতে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হ[illegible] [illegible]কগুলি অক্ষরের একেবারে অব্যাহতি ঘটে নাই। [illegible] [illegible]কটী মাথায় ছোট ছোট চিহ্ন দিতে হইবে, আর অন্ততঃ এ[illegible] অক্ষরের নীচে একটী চিহ্ন দেওয়া আবশ্যক হইবে (rr)। যদি যুক্ত অক্ষরের উপর নীচুর সমস্যা শিক্ষার পক্ষে বাস্তবিক একটী সমস্যাই হয়, তাহা হইলে প্রচলিত মূল বাংলা বর্ণগুলি পাশাপাশি সাজাইয়া এই কর্ম্ম আরো সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না কি? অবশ্য এরূপ প্রস্তাবও সর্ব্ববাদিসম্মত না হইলে ইহার কোন মূল্যই থাকে না, এবং এরূপ সংস্কার সর্ব্ববাদিসম্মত হওয়াও একরূপ অসম্ভব।

(গ) ধ্বনি ও বানান।

এখন এই নূতন বর্ণমালার সাহায্যে বাংলা সকল শব্দের ধ্বনি যথার্থভাবে প্রকাশ করা যাইবে কি না তাহা একবার বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। বাংলা ভাষা প্রধানতঃ সংস্কৃতমূলক হইলেও, ইহার নিজস্ব অনেক জিনিষ আছে, এবং সর্ব্বদাই মনে রাখা আবশ্যক, যে ইহা একটী জীবিত ভাষা। এই ভাষায় বহু স্থলেই বর্ণের ধ্বনির সহিত সম্মিলিত বর্ণজাত শব্দের ধ্বনির ঐক্য থাকিলেও, অনেক ক্ষেত্রে শব্দে বর্ণের ধ্বনি বিকৃত হইয়াছে। যেমন আমরা লিখি "কেন" (বিস সাহাবী বানান kena), কিন্তু উচ্চারণ করি "ক্যানো" (বিস সাহাবী বানান কি হইবে—kyaano না kjjaano!), লিখি "রাম" (raama) উচ্চারণ করি "রাম্" (raam), লিখি "জিহ্বা" (jihbaa) উচ্চারণ করি বাংলার কোন বিভাগে "জিব্ভা" (jibbhaa) আর কোন বিভাগে "জিউহা" (jiuhaa) ইত্যাদি, ইত্যাদি। সেইজন্য প্রশ্ন উঠিবে নূতন বর্ণমালার ব্যবহার, অর্থাৎ লিখিত শব্দের উচ্চারণ, এবং উচ্চারিত শব্দের লিখন ও বানান বর্ণক্রমিক (alphabetic) অথবা ধ্বনিক্রমিক (phonetic) হইবে? প্রস্তাবটী হইতে ধ্বনিক্রমিক বানান সম্ভব হইবে না। বাংলা ভাষায় ক্ষেত্র বিশেষে 'অ' ও 'আ'র প্রত্যেকের দুইটী ধ্বনি দাঁড়াইয়া গিয়াছে, কোথাও লঘু ও কোথাও গুরু; এবং কোথাও 'অ'-কারের উচ্চারণ 'অ' ও 'ও'-র মাঝামাঝি। 'এ'-কারের একটী বিকৃত উচ্চারণ কোন কোন শব্দে শোনা যায়, এবং পূর্ব্বেই ইহার একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। [illegible]ফলা, 'য'-ফলা, 'ম'-ফলা প্রভৃতি অনেক শব্দে নিজ 'ব'-[illegible] [illegible]গ করিয়া অনেকটা ভিন্ন ধ্বনি গ্রহণ করিয়াছে। নিজ ধ্বনি পরি[illegible] [illegible] পরিবর্ত্তন আছে। এই এইরূপ নানা খুটিনা[illegible] [illegible]শ হয় না; সকল ধ্বনি বাংলা বর্ণমালা দ্বারাই সুপ্রকা[illegible] নূতন বর্ণমালা দ্বারা এই বিপত্তি বর্দ্ধিত হইবে, এবং বোধ হয়, কোন ক্ষেত্রেই বিকৃত ধ্বনি প্রকাশ করা সম্ভব হইবে না। ফলে একই শব্দের নানা বানান সম্ভব হইবে এবং অনেক স্থলে একই বানানে নানা ধ্বনি উৎপন্ন হইবে। 'মা একবার এস' এই বাক্যটী নূতন বর্ণমালায় "Maa ekbar eso" লিখিলে একটী শব্দের বানান এবং একটী শব্দের ধ্বনি ঠিক হইবে না। আরো কএকটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। 'পরিচ্ছদ' কথাটী porichchhad না parichchhad লিখিব, এবং এরূপ লিখিয়া 'পোরিচ্ছদ', 'পোরিচ্ছ্দ' 'পোরিচ্ছ্হদ' ইত্যাদি নানা উচ্চারণে বাধা দিবে কে? 'রুক্মিণী' যদি লিখি Rukmini (রুক্মিনী) শব্দটীর বাংলা উচ্চারণ হইবে না, যদি লিখি rukkʌini (রুক্কিণী) শব্দটীর ব্যাকরণকে নির্ব্বাসন দিতে হইবে। আবার ধ্বনিটী প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ইহাকে ruk knini (রুক্‌ক্নিণী) লিখিতেও কোন আপত্তি থাকিবে না, কিন্তু এই শেষোক্তরূপে লিখিত হইলে, ইহাকে 'রুক্‌ক্নিণী' বা অন্য প্রকারে পড়িতেও কেহ বাধা দিতে পারিবে না। সেইরূপ 'পদ্ম'কে padma লিখিব, না paddʌ লিখিব? 'বাঞ্ছা'কে যদি baanchhaa লিখি, ইহাকে 'বান্‌ছা' পড়িতে বাধা দিবে কে, এবং 'বাঞ্ছা' ও 'বান্‌ছা' কি একই উচ্চারণ? 'সম্ভব্য' কথাটী কিরূপ লিখিব—sambhabya, না sambhobba, না sambhabjjʌ? প্রথম প্রকারে

লিখিয়া পড়িতে বলিলে চাষীর ছেলেটীকে দ্রাবিড়ী পণ্ডিত বলিয়া কেহ ভ্রম করিয়া বসিবেন না ত? তৃতীয় বানানে শব্দটীর অর্থবোধ সহজ হইবে না। অন্বেষণ, হাওয়া, হা হুতাশ, সত্য, পরস্ব, ম্যাজমেজে, পর্য্যন্ত, পরশ্ব, চক্র, সাধারণতঃ, ধর্ম্মহানি, ধর্ম্মশালা, অধিকরণ—মাত্র সামান্য এই কয়টী শব্দ নূতন অক্ষরের সাহায্যে হয় বর্ণনা হয় ধ্বনি অনুসরণ করিয়া লিখিবার চেষ্টা করুন, দেখিবেন একই বানান হইতে কিরূপ রং-বেরংএর ধ্বনি উঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে বানান, ষত্ব, ণত্ব, ই, ঈ প্রভৃতির অত্যাচার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, ভাষা কিরূপ সুন্দরভাবে পরামার্থের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে!

মিল যখন হ্যামিল্টনের মতবাদকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে খুব ভাল করিয়া হ্যামিল্টনের দার্শনিক মতামত আয়ত্ত করিতে হইয়াছিল। বোধ হয় তাঁহার মত হ্যামিল্টনকে তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিবার চেষ্টা কেহই করেন নাই। মিঃ বিসও বোধ হয় বাংলা ভাষাকে নূতন রূপ প্রদানের প্রয়াসী হইয়া, এই বাংলা ভাষা, বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা কোষ, সংস্কৃত ব্যাকরণ, প্রাকৃত ব্যাকরণ ইত্যাদিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াই, ভাষাটীকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এরূপ নূতন আকারে গঠন করার প্রস্তাব করিয়াছেন। কারণ বাংলাভাষার গঠন ও প্রকৃতির সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে, এরূপ একটী গভীর সংস্কারের প্রস্তাব উপস্থিত করিতে, তাঁহার মত পণ্ডিত লোক নিশ্চয়ই লজ্জা বোধ করিতেন। কিন্তু ভাষা সম্বন্ধে মিঃ বিসকে একজন বিশেষজ্ঞ ধরিয়া লইলেও, উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে, বোধ হয় বুঝা যাইবে যে তাঁহার বর্ণমালা হইতে বাংলাভাষার শব্দ লিখাও সহজ হইবে না, পড়াও সহজ হইবে না, এবং অনেক ক্ষেত্রেই শব্দের যথার্থ ধ্বনি প্রকাশ একেবারেই অসম্ভব হইবে।

(ঘ) টাইপরাইটারী যুক্তি।

মিঃ বিসের টাইপরাইটারী যুক্তিটীর সম্বন্ধে যত বলা হয় ততই ভাল। ভবিষ্যতে চাষীর "পোলাপানেরা" প্রত্যেকেই এক একটী টাইপরাইটার লইয়া বসিবে, তিনি যে দেশের এরূপ অর্থনৈতিক উন্নতি কল্পনা করিয়াছেন, অথবা বাঞ্ছা করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র! তাঁহার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, যেন অচিরেই কৃষক সন্তানেরা প্রত্যেকেই বহুবর্ষব্যাপী উপবাস করিয়াও এক একটী টাইপরাইটার ক্রয় করে। দেশের অর্থের এরূপ সদ্ব্যবহারে দেশ শীঘ্রই ধনশালী ও "সব্য" হইয়া উঠিবে। অবশ্য বালক বালিকারা নিজ নিজ পর্ণকুটীরেই টাইপরাইটার চালাইবে এবং নিজেরাই পড়িবে। কারণ নিশ্চয়ই মিঃ বিস্‌ও আশা করেন না যে, মধ্য ও উচ্চশিক্ষায় বাংলা বর্ণমালার পরিবর্ত্তে তাঁহার নূতন বর্ণমালাই প্রচলিত হইবে, এবং এইরূপে টাইপরাইটারের ভিতর দিয়া সামাজিক নানা কর্ম্মে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ঘটিতে থাকিবে। অথবা তাঁহার বর্ণমালার 'টর্পেডো' লইয়া তিনি দেশীয় সকল প্রকার শিক্ষাকেই একবার তোলপাড় করিবার ইচ্ছা রাখেন কি?

(ঙ) লিখন।

লিখনের সুবিধা সম্বন্ধেও অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার ২১টী বর্ণে নাকি ছয়টী 'সরল আকার' (simple forms) বর্ত্তমান, এবং সেই কারণে লিখন অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। বাংলা বর্ণমালায় এরূপ কতগুলি মৌলিক রেখা বিদ্যমান তাহা বিশ্লেষিত হয় নাই। ইহাদের সংখ্যা খুব বেশী হইতে পারে না। তারপর অক্ষরের রেখা বিশ্লেষণ করিয়া লিখন শিক্ষার যুগ শ্রীমতী মন্টেসরীর কল্যাণে পৌরাণিক যুগে পরিণত হইয়াছে। মিঃ বিসের অক্ষরগুলিতে সরল রেখার আধিক্য সত্ত্বেও, সেগুলি যে সহজ হইবে, তাহা বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইতে অনেকেই নারাজ হইবেন। বাংলা বর্ণগুলির আকারে বহু জটিলত্ব ও বহু বৈচিত্র্য বিদ্যমান থাকিলেও, সেগুলি যে সহজে শিক্ষা করা যায় না,—অক্ষরের উপর দাগা বুলাইয়া, বালি কাগজের অক্ষরের উপর অঙ্গুলি চালনা করিয়াও যে বাংলা অক্ষর লিখনে সময়ের অনেক অপব্যয় হয়, তাহা পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে; এবং বাস্তবিকই যদি এরূপ কালক্ষেপ অনিবার্য্য বলিয়া প্রমাণিত

হয়, তাহা হইলেও বাঙ্গালী তাহার পিতৃপিতামহের দেওয়া গৌরব সহজে বিসর্জ্জন দিতে রাজি হইবে বলিয়া মনে হয় না।

(চ) ইংরাজি শিক্ষা।

নূতন অক্ষরমালার স্বপক্ষের শেষ যুক্তি—একটী বর্ণমালা শিক্ষা দ্বারা আর একটী ভাষার বর্ণমালা শিক্ষা অনেক দূর অগ্রসর হইয়া থাকিবে। প্রাথমিক শিক্ষার নব বিধানে শিশুদিগকে এক বা দুই বৎসরের জন্য ইংরাজিভাষা শিক্ষার সুবিধা দেওয়া হইবে। কিন্তু বাংলাভাষা শিক্ষার সময় তাহারা রোমাণ অক্ষরগুলিকে বোধ হয় বাংলা নাম দিয়াই শিখিবে। অর্থাৎ ইংরাজি 'a' কে 'অ' বলিবে, 'b' কে 'ব' বলিবে, 'd' কে 'দ' বলিবে ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি বাংলাভাষা শিক্ষায় অক্ষরগুলি ইংরাজি নামেই ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে রোমাণ বর্ণমালার দ্বারা বাংলাভাষা শিক্ষাকে সহজ করার উদ্দেশ্য পণ্ড হইবে। 'b-aa-l-a-k' লিখিয়া পৃথক পৃথক অক্ষরগুলিকে ইংরাজি নামে 'বি-এ-এ-এল্ এ-কে' পড়িলে, তাহা হইতে 'বালক'-এ উপস্থিত হওয়ায় শিশুদের পক্ষে একেবারে স্বশরীরে স্বর্গলাভের ব্যবস্থা! এই কারণে সর্ব্বত্রই বাংলাভাষা শিক্ষার সময় অক্ষরগুলির বাংলা নাম হইবে। কাজেই ইংরাজি ভাষা শিক্ষার সময় এই পূর্ব্ব পরিচিত অক্ষরগুলিকে নূতন নামে অভিহিত করিতে হইবে। কিন্তু এই অক্ষরগুলি সম্বন্ধে ইংরাজি শিক্ষার সময় পূর্ব্বার্জ্জিত অভ্যাস পরিবর্ত্তন করা শিশুদের পক্ষে বড় সহজ সমস্যা হইবে না। সুতরাং তাহারা অনেক সময় বাংলাভাষার রীতিতে ইংরাজী পড়িবে, এবং বাংলা ও ইংরাজির ভিতর এক মহা গণ্ডগোল বাধাইয়া গুরু-মহাশয়ের সুদীর্ঘ বেত্রদণ্ডের নিম্নে নিজ নিজ পরিধেয় বস্ত্র কলুষিত করিতে থাকিবে! অনেকখানি বিশ্লেষণ এবং অনেক চেষ্টার পর উভয় ভাষার অক্ষর-ধ্বনির পার্থক্য আয়ত্ত হইবে বলিয়া ইংরাজি শিক্ষা সহজ না হইয়া, বোধ হয় অধিকতর কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইবে; এবং একই অক্ষর সমষ্টির সাহায্যে দুইটী পৃথক ভাষা শিক্ষার চেষ্টা দ্বারা উভয় ভাষা শিক্ষাই অত্যন্ত ভ্রমপূর্ণ হইয়া উঠিবে। ইংরাজি 'a' র লঘু উচ্চারণের অনুরূপ ধ্বনি বাংলা বর্ণমালায় নাই। বাংলার কোন কোন বিভাগে কথিত ভাষাতেও প্রাদেশিক উচ্চারণে এই ধ্বনিটীর উচ্চারণ খুব কম। লিখিত ভাষা পড়িবার সময় বালকদিগকে সেখানে এই ধ্বনিটী অনেক সময় অভ্যাস করিয়া লইতে হয়। এই কারণেই বোধ হয় এরূপ একটী বিভাগের বয়স্ক ছাত্রদিগকেও প্রায় 'bat'কে 'bet' এর মত উচ্চারণ করিতে শোনা যায়। 'Is'কে 'ইজ' উচ্চারণ করা, 'mess'কে 'মেছ' বা 'মেচ' উচ্চারণ করা অনুরূপ ভ্রম। বাংলা 'ফ' এবং ইংরাজি 'f' ঠিক একরূপ ধ্বনি প্রকাশ করে না। 'ফ' উচ্চারণ করিতে অধর ও ওষ্ঠ উভয়ই ব্যবহৃত হয়, এবং দন্তের ব্যবহার আবশ্যক হয় না। কিন্তু ইংরাজি 'f' এর উচ্চারণে ওষ্ঠের ব্যবহার হয় না, উপর পাটীর দাঁতগুলি অধরকে লঘুভাবে স্পর্শ করিয়া এই ধ্বনি উৎপাদনের সাহায্য করে। বাংলা 'ফ' এবং ইংরাজি 'f' এইরূপ ভিন্ন ধ্বনি-প্রকাশক বলিয়াই আমাদের দেশের বালকদের পক্ষে যথার্থভাবে 'f' উচ্চারণ করা খুব কষ্টকর। শিক্ষিত লোকেরাও আত্ম-পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন, তাঁহাদের ভিতর কয়জন যথার্থ-ভাবে 'f' উচ্চারণ করেন। এই ভ্রমটীর কারণ, বাংলা 'ফ'-এর সহিত ইংরাজি 'f'-এর ধ্বনির সাদৃশ্য। বাঙ্গালী 'ফ' উচ্চারণে অধিকতর অভ্যস্ত বলিয়া ইংরাজি 'f' ভাল করিয়া উচ্চারণ করিতে পারে না। অধিক দৃষ্টান্ত বাহুল্য মাত্র। বাংলা ও ইংরাজি ভাষার অক্ষর একরূপ হইলে, এই দোষ বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হইবে, অথচ অক্ষর-সাদৃশ্য হইতে বোধ হয়, কোন প্রকার সুফল লাভ হইবে না। এই সকল নানা কারণে নূতন বর্ণমালার স্বপক্ষের শেষ সুবিধা মোটেই সুবিধা বলিয়া বোধ হয় না।

(ছ) কুচিন্তিত প্রস্তাব।

এই আলোচনার আরম্ভেই দেখাইয়াছি, এবং এই দীর্ঘ বিচারের শেষেও আবার বলি, শ্রীযুক্ত বিস সাহেবের বাংলা বর্ণমালা সম্বন্ধীয় এই প্রস্তাবটী অত্যন্ত অসম্পূর্ণ, অত্যন্ত কুচিন্তিত, এবং প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অসম্ভবকে সম্ভব করার একটা ব্যর্থ আয়াসের জোড়াতালিতে পরিপূর্ণ। যাহাদের অর্থ নাই, তাহারা রোগের আক্রমণে বিভ্রান্ত

মতে সাহস সঞ্চয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। মৃদু পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইয়া, তৈলহীন আলোটাকে একটু উজ্জ্বল করিয়া ইন্দিরা মালিসের শিশিটা তুলিয়া লইল।

জননী কন্যার মুখপানে স্নেহের নিবিড় দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া মৃদু স্বরে কহিল,—'আর ওসব কেন মা! আজ একটা বছর ধরে তোর ঐ কচি হাতে এই অভাগী মাকে মালিস কর্‌লি, কোন ফল পেলি কি?'

'আজ সারা রাত যে ঘুমাওনি মা। মালিসটা করে' দিলেই তুমি একটু ঠাণ্ডা হয়ে ঘুমাবে।'

রোগিনীর শুষ্ক বিবর্ণ ওষ্ঠের চারিধারে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ঘিরিয়া ধরিল।—'হ্যাঁ রে,এইবার একেবারেই ঘুমোবো। কিন্তু বল্‌বার অনেক কথা ছিল যে; শীগগীর শুনে নে।'

চিত্রার্পিতার ন্যায়,বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে চকিতা ইন্দিরা মায়ের ক্ষণিক প্রদীপ্ত মুখের পানে চাহিল।

ইন্দিরার মা স্বপ্নময় অতীতকে মনে মনে স্মরণ করিয়া পঞ্জরভেদী একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে কহিল,—'আমার পেটে জন্মালেও তোর গায়ে কাদা মাটি মাখান নেই। এই পাঁকে ডোববার তিন মাস আগেই তুই ফুটে উঠেছিলি!' আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু যন্ত্রণার একটানা কাশি তাহার বাকি কথাটুকু চাপিয়া দিল। সেটুকু সাম্‌লাইয়া আবার অতি কষ্টে বলিতে সুরু করিল,—

'স্বামী কল্‌কাতায় পড়তেন। গরীবের মেয়ে ছিলাম; শাশুড়ী ননদের নিদারুণ নির্য্যাতন ছিল। স্বামীকে জানালেও তিনি বিধবা মা বোনের উপর কোন কথাই বলতে পারতেন না। কতদিন যে আমার অনাহারে, অনিদ্রায়, শীতে ভিজে কাপড়ে কেটে গেছে, তা তোকে কি বলবো! তবু ভাসবার একটা ভেলা ছিল, জানতাম স্বামী আমায় ভালবাসে। কিন্তু মিত্তিরদের মেজ বৌ আমার কাণ দুটা পুড়িয়ে দিয়ে জানিয়ে দিলে আমার দুর্দ্দশার কারণ—কল্‌কাতায় তিনি অধঃপতনের ধাপে ধাপে নেমে যাচ্ছেন। এ কথা অবিশ্বাস করবার যো ছিল না, তার স্বামী ছিল তাঁর সহপাঠী।

"এই কথাগুলা যেন আমার মাথায় আগুন জ্বেলে দিলে। পাগলের মত দিশেহারা আমি প্রতিশোধ নিতে তোকে বুকে করে' আজন্মের মত শ্বশুরের গৃহ ত্যাগ কর্‌লাম।

তারপর তাকে একদিন দেখতে পেয়েছিলাম, বটে, এই পথে পা দেবার পর। তখন সে কত বড়, আর আমি কত ছোট! সেইদিন হ'তে অনুতাপের তুষানলে আমার প্রায়শ্চিত্তের সুরু হ'ল।

কিন্তু আর তো ফেরবার পথ ছিল না। এই পাপ-বৃত্তিই যে তখন তোর আমার মুখের গ্রাস যোগাচ্ছিল।'

কিছুক্ষণ থামিয়া জননী আবার কহিল,—'তাই আজ একটা বরষ ধরে দয়াল ঠাকুরের পায়ের তলায় জানাচ্ছি —আমার পাপের দণ্ড আমাকেই দাও হরি! আমার কর্ম্মফল আমিই নেব! তার জের যেন তোর উপর না টানেন' মাতা নীরব হইল।

মুক্ত বাতায়ন পথে উষার শীতল সমীর ছুটিয়া আসিয়া সারা রজনীর জ্বলন্ত আলোটাকে নিভাইয়া দিল।

ইন্দিরা উঠিয়া দরজা খুলিবামাত্র পূর্ব্বাকাশের এক ঝলক সোনালী আলো তাহার নৈশজাগরণ ক্লান্ত ঘুম চোখে ছড়াইয়া পড়িল। ইন্দিরা মুখ ফিরাইয়া মায়ের শয্যাপানে চাহিয়া দেখিল সেখানেও নবীন আলোর রেখা খানিকটা পড়িয়াছে। রোগিনী শ্রান্ত আঁখি দুটি মুদিয়া আছে।

ইন্দিরা আসিয়া বাতায়ন পথে দাঁড়াইল। সর্ব্বপ্রথমেই মনে পড়িল,—'মায়ের পথ্যের কি ব্যবস্থা আজ সে করিবে। গৃহে আর এমন কোন দ্রব্যই নাই যাহার বিনিময়ে আজ সে পথ্য সংগ্রহ করিবে। অগ্রিম দেয় ভাড়া ছয় মাসেরই বাকী পড়িয়াছে; বাড়ীওয়ালী উঠিয়া যাইবার জন্য এক মাসের নোটিশ দিয়া রাখিয়াছে। আজ তাহার শেষদিন। এই পূর্ব্ব-দোয়ারী গৃহখানি যে তাহার মায়ের বড় প্রিয়, এখানি ছাড়িয়া মাকে সে কেমন করিয়া অন্যত্র লইয়া যাইবে! আর যাইবেই বা কোথায়!'

দুকুলহারা চিন্তার অশান্ত বারিধি বক্ষে পড়িয়া ভয়-ব্যাকুলা বালিকা ইন্দিরা একগাছি তৃণের জন্য চারিদিকে চাহিল, কোথায় কিছু দেখিতে পাইল না। নয়ন সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল—শুধু পাওনাদারদল মুখ ব্যাদন করিয়া

চারিদিক হইতে গ্রাস করিতে আসিতেছে। সভয়ে ইন্দিরা জননীর পাণ্ডুর মুখ পানে চাহিল, সেখানেও নিষ্ঠুর যন্ত্রণার নিবিড় কালো ছায়া পড়িয়াছে।

বাড়ীওয়ালী দ্বারের কাছে আসিয়া কহিল,—'ইন্দু. তোরা ভাড়াও দিবিনি, বাড়ীও ছাড়বিনি, এ তোদের কি মতলব বল্‌তো ?'

ঈষৎ বিরক্ত স্বরে ইন্দিরা কহিল,—'চুপ কর বাড়ী-ওয়ালী মা। মা আমার সারারাত জেগে সবে একটু তন্দ্রা গেছেন।'

'কি আমার মহারাণী তন্দ্রা গেছেন গো, যে তার জন্যে আমি চুপ করব! ভাড়া ফেলে দিয়ে কথা ক, যে ছায়াও মাড়াতে আসব না।'

'বাড়ীওয়ালী মা, তোমার কি একটুও দয়া—' পিছন হইতে ডাক আসিল,—'ইন্দু'।

'যাই মা, আমায় ডাকছ ?' ইন্দু মুখ ফিরাইল।

বাড়ীওয়ালী রোগিনীর দিকে অগ্রসর হইতে হইতে ঝঙ্কার দিয়া কহিল,—'বলি ও ইন্দুর মা! আমার চলে কোথা থেকে বাছা, তোমরা যদি বাড়ীর সেরা ঘর দুখানি আটকে রাখ।'

ইন্দিরার মা ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর করিল,—'কোথা পাব দিদি! পোড়া রোগের পেটে যে সব দিয়েছি। তুমি আমার দিদি সব বোঝ ত।'

জানি না, বাড়ীওয়ালীর কি মতি হইল—তারা হইতে একেবারে খাদে সুর নামাইয়া কহিল,—'তা আর বুঝিনি বোন ; তবে আমার—'

অকস্মাৎ ইন্দিরা ভয়ার্ত্তকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল,—'ও কি, মা অমন করছ কেন ?'

রোগিনীর শ্বাস-ক্রিয়া কেমন ঝটিতি পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহার সারা মুখখানিতে একটা অসহ্য যন্ত্রণার ছবি ফুটাইয়া তুলিল।

বাণবিদ্ধা কুরঙ্গীর মত ইন্দিরা বাড়ীওয়ালীর পাদমূলে আছড়াইয়া পড়িল। আর্ত্তনাদে বলিয়া উঠিল,—'ওগো তোমার পায়ে পড়ি, মার কি হ'ল দেখ।'

'ভয় কি মা! ভয় কি মা' আশ্বাসবাণী বলিতে বলিতে বাড়ীওয়ালী সব ভুলিয়া দ্রুতপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

* * *

সাহেবী বেশভূষায় সুসজ্জিত ডাক্তার শরৎকুমার বসু মোটরে উঠিবার জন্য ফুট-বোর্ডে সবেমাত্র একটী পা দিয়াছেন, হাতে ষ্টেথিস্কোপটা দুলিতেছে, এমন সময় একটী আধাবয়সী রমণী হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া কহিল,—'ডাক্তারবাবু একবার দয়া করে' আমাদের বাড়ী দেখতে আসুন।'

ডাক্তার বসু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন,—'এখনি ? কেন, কি হয়েছে ?'

রমণী মিনতি করিয়া কহিল,—'একটী মেয়ে মরে—বেশী দূর নয়, এই বড় রাস্তার শেষে, গলির মোড়ে। এক-বার আসুন।'

পকেট হইতে রোগীদের নাম ধাম ঠিকানা পূর্ণ নোট বইখানি একবার বাহির করিয়া চক্ষু বুলাইয়া ডাঃ বসু রমণীকে সফারের পার্শ্বে বসিতে বলিলেন।

ডাক্তার লইয়া বাড়ীওয়ালী যখন রোগিনীর কক্ষে প্রবেশ করিল—তখন সাশ্রুনয়না ইন্দিরা মায়ের পার্শ্বে বসিয়া হাতপাখার দ্রুত সঞ্চালনে তাহাকে বাতাস করিতে-ছিল।

ডাক্তার বসু ইন্দিরার পানে চাহিয়া কহিলেন,—'সয়ে বস ত মা।' নিকটে অপর কোন আসন না থাকায় তিনি শয্যার একাংশে রোগিনীর অতি সন্নিকটেই বসিলেন।

কি একটা অজানা আশঙ্কায় তাঁহার সারা হৃদয়খানা কাঁপিয়া উঠিল। তিনি অনেক রোগীর মুমূর্ষু শয্যাপার্শ্বে অনেকবার বসিয়াছেন, কিন্তু হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে এমন ব্যাকুলতা ইতিপূর্ব্বে কখন তিনি অনুভব করেন নাই।

চিকিৎসক ত্বরিত হস্তে আপনার ব্যাগ খুলিয়া আবশ্য-কীয় ঔষধ-পত্র পিচকারী লইয়া রোগিনীর শীতল বাহুখানির উপর ইঞ্জেক্‌সনের সূচীবিদ্ধ করিয়া দিলেন।

চকিতে প্রথম কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া, ডাক্তার বসু একটা প্রেস্ক্রিপসন্ লিখিয়া বাড়ীওয়ালীর হাতে দিয়া কহিলেন,—'এই ঔষধ ক'টা নিয়ে এস।'

ব্যতিব্যস্ত বাড়ীওয়ালী কহিল,—'টাকা—ইন্দু?'

ইন্দিরা কাঁদিয়া কহিল,—'টাকাত আমাদের নেই।'

ডাক্তার বন্ধু রোগিনীর শিয়রে উপবিষ্টা ব্যাকুলা বালিকা মূর্ত্তির পানে বারেক দৃষ্টিপাত করিলেন। পকেট হইতে ক্ষুদ্র ব্যাগটী বাহির করিয়া একখানি নোট বাড়ীওয়ালীর হস্তে দিয়া কহিলেন,—'ছুটে যাও।'

চিকিৎসকের অনেক পরিশ্রমের ফলে রোগিনী একটু যেন প্রকৃতিস্থ হইল।

নির্ব্বাণ-উন্মুখী প্রদীপের শেষ উজ্জ্বলতাটুকুর মতই রোগিনীর নিষ্প্রভ মুখখানিতে কোথা হইতে আবার শোণিত আভা দেখা দিল। স্তিমিত নয়নে ক্ষণেকের জন্য একটা আনন্দের আলো খেলা করিতে লাগিল। হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় আবেগ চাপিবার চেষ্টায় রোরুদ্যমানা শিশুর মতই তাহার ওষ্ঠাধর মৃদু মৃদু কম্পিত হইতে লাগিল।

ডাক্তার বন্ধুর মনে হইল বহুদিন পূর্ব্বে এমনই সুবিস্তৃত কৃষ্ণ ভ্রূতলে ঘন পল্লববিশিষ্ট ও এই রকমই দুটী সুনীল নয়ন তিনি কোথায় দেখিয়াছিলেন। এই ক্ষীণ সন্দেহের ছায়া তাঁহার নিকট স্বচ্ছ হইয়া ফুটিবার আগেই রোগিনী কন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষীণ ভগ্নকণ্ঠে কহিল,—'পায়ের ধূলা নে মা ইন্দু, ইনিই তোর জন্মদাতা। অভাগী আমি পরের কথায় ভুল করে' সাদাকে কালো ভেবেছিলুম, তার শাস্তি আমি পেয়েছি। দেবতা স্পর্শের অধিকার আজ আছে কি না জানি না।'

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ার ন্যায় ইন্দিরা বসিয়া রহিল। মায়ের এই কথাগুলা তাহার শ্রবণ-পথে কি যে ঢালিতেছিল ইন্দিরা তাহা নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না।

বহুমূল্য পোষাক-পরিহিত এই উন্নত সুশ্রী দেবোপম মূর্ত্তি এই অভাগিনী দুঃখিনী ইন্দিরার পিতা।

অভাবনীয় স্বপ্নাতীত কথা শুনিয়া ডাক্তার বন্ধু একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এ ঘরের বায়ুও যেন তাঁহার শ্বাসক্রিয়া প্রতিরোধ করিতেছিল। বিধাতার এ কি বিড়ম্বনা! এ কি নিষ্ঠুর শেষ সন্দর্শন!

ডাক্তার বন্ধুর মনে হইল, তিনি ছুটিয়া পলায়ন করেন, কিন্তু সম্মুখের ভীতি-ব্যাকুলা বালিকার বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্র দুটী তাঁহার গমনের পথ রোধ করিল।

ঝটিকা-ক্ষুব্ধ বারিধির ন্যায় ডাক্তার বন্ধুর বুকের মাঝে অসংখ্য ব্যথা আলোড়িত হইয়া মুখ দিয়া বাহির হইবার জন্য কণ্ঠদ্বারে ভিড় করিয়া ঠেলাঠেলি করিতেছিল।

চিকিৎসক পুনর্ব্বার রোগিনীর শিথিল বাহুখানা আপনার বলিষ্ঠ করপুটে অতি যত্নে অতি সন্তর্পণে তুলিবামাত্রই বাঁধভাঙ্গা বন্যার মত বক্ষ ভেদিয়া বিপুল উচ্ছ্বাসে বাহির হইয়া আসিল,—'শোভা! শোভা!'

স্বামীর কণ্ঠের শেষ আহ্বান শুনিতে শুনিতে ইন্দিরার মার অন্তরাত্মা মুক্তির নিশ্বাসে অসীমের পথে ছুটিয়া গেল।

বিবর্ণ মুখে ডাক্তার বন্ধু সেই নিস্পন্দ বাহুখানা নামাইয়া রাখিলেন। মুহূর্ত্তে ইন্দিরা নিস্পন্দ মাতৃবক্ষে শিশুর মতই আছড়াইয়া পড়িল। বুকফাটা আর্ত্তনাদে চিৎকার করিয়া কহিল,—'মাগো! আমার মা!'

নির্ব্বাক নিস্পন্দ ডাক্তার বন্ধু মৃতার বুকে নীড়ভ্রষ্ট শাবকের হাহাকার শুনিলেন। দুই চক্ষু তাঁহার জলে ভাসিল,—ইন্দিরা তখন হাহাকারে বলিতেছে—'ওগো মাগো, আমায় কার কাছে রেখে গেলে গো—!'

ডাক্তার বন্ধু অগ্রসর হইয়া সদ্য মাতৃ-হারা কন্যাকে তুলিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন,—'আমার কাছে!'

কামরূপের সামাজিক ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা।

[আসাম-পর্য্যটক—শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ-চৌধুরী]

নন্দগ্রামের বরুয়া বংশের ইতিহাস।

চলিত কথায় নন্দগ্রামের নাম নন্গাঁও। তথাকার বরুয়া বংশকে "নন্ গেইয়া বরুয়া" বলা হয়। পুরুষনামা অনুসারে ঐ গ্রামের বরুয়া বংশের আদিপুরুষের নাম "নরোত্তম দেব।" ইনি "আলেম্যান" গোত্রজ ও জাতিতে

কায়স্থ ছিলেন। "নরোত্তম" চণ্ডীবরের আগমনের প্রায় ২৪। ২৫ বৎসর কাল পরে ৪১ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মুসলমানগণের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া গৌড়ে আসিয়া বসবাস করেন (১৩১৭-১৮ খৃঃ অব্দে) চণ্ডীবর, শ্রীহরি, শ্রীপতি, চিদানন্দ প্রভৃতি কায়স্থ এবং কৃষ্ণপণ্ডিত, রঘুপতি, পরম, মথুরা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ যে কারণে * কণৌজ পরিত্যাগ করিয়া গৌড়েশ্বরের (রাজা ধর্ম্মনারায়ণের ?) আশ্রয়ে আসিয়া বাস করেন, ইনিও সেই কারণে কয়েকজন কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ সহ তথায় আসিয়া তাঁহার আশ্রিত হন।

১২৯৮ খ্রীঃ অব্দে "গৌড়েশ্বর" চণ্ডীবর, শ্রীধর, চিদানন্দ প্রভৃতি কায়স্থকে "কামতা"র প্রেরণ করেন। কামতেশ্বর বা কামরূপেশ্বর তাঁহাদের গুণগ্রামে প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রভূত ভূসম্পত্তি ও অনেক দাস দাসী প্রদান করেন। তখন তাঁহারা "ভূঞা" অর্থাৎ ভূস্বামী নামে পরিচিত হইলেন। দরঙ্গ বংশাবলী, কোচরাজ হরেন্দ্রনারায়ণের আদেশে লিখিত "বৃহৎ রাজবংশাবলী", "গন্ধঠা চরিত্র" প্রভৃতি প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে জানা যায়, "চণ্ডীবর প্রভৃতি সাত জন কায়স্থের বংশধরগণই যে কেবল "ভূঞা" হইয়াছিলেন এমন নহে, তাঁহাদিগের মত অনেক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও দৈবজ্ঞ খেইন বংশীয় রাজা নীলাম্বরের মৃত্যুর পর কামতা রাজ্যে ছোট ছোট ভূখণ্ডের মালিক হইয়া "ভূঞা" উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক স্বাধীন হইয়াছিলেন।" কোচরাজ বিশ্বসিংহ কামরূপের যে প্রসিদ্ধ নরনারায়ণ গামঠা (১)র হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন, সেই নারায়ণ গামঠাও স্বতন্ত্র ভূঞা ছিলেন। চণ্ডীবর প্রভৃতি সাত ঘর ভূঞা বংশের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল না। যাহা হউক, উক্ত নরোত্তম দেবের পুত্র বীরনারায়ণ, "চণ্ডীবর প্রভৃতি কায়স্থগণ রাজানুগ্রহে সৌভাগ্যশালী হইয়াছেন" এই সংবাদ অবগত হইবার কিছুকাল পরে (খ্রীঃ অব্দ অজ্ঞাত) স্বীয় ভাগ্য পরীক্ষার্থ ৩৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে কয়েকজন কায়স্থ সহ কামতাপুরে আসিয়াছিলেন। শ্রীশ্রী শঙ্করদেবের ভ্রাতা বনগঞা গিরির বংশীয় ভূঞাগণ উক্ত বীরনারায়ণের বংশকে তাঁহাদের সমকক্ষ বলিয়া স্বীকার করেন। আমরা বিগত ১৯২০ সালে অক্টোবর মাসে গৌহাটী অঞ্চলের কয়েক জন গণ্যমান্য প্রাচীন কায়স্থের ভদ্রলোকের নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে, বীরনারায়ণের বংশধরগণ অন্যতম ভূঞা বংশীয়।

বীরনারায়ণের পুত্র "হরিনারায়ণ" এবং তৎ পুত্র বামদাহ ও ধ্বজনারায়ণ। বামদাহ কোচদিগের নবাধিকৃত বর্ত্তমান দরঙ্গস্থ তৎকালীন রাজ্যে পদস্থ কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত হইবার কিছুকাল পরে স্বীয় কার্য্যকুশলতা হেতু "বরুয়া" উপাধি প্রাপ্ত হন। কোন কারণে ইনি রাজার বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। তৎকালীন রাজবিধি অনুসারে আহোম ও কোচ রাজগণ শিরশ্ছেদের আদেশ দিতেন। বামদাহের উপর তাহাই হইল। তিনি দরঙ্গে আত্মীয়-স্বজন (২) পরিত্যাগপূর্ব্বক কামরূপে পলাইয়া আসেন এবং ছদ্মবেশ ধারণ করত বর্ত্তমান নলবাড়ী হইতে ৪ মাইল দূরে ঈশান কোণে "কেন্দুকুছি" গ্রামের "কেন্দুকুছিয়া বরুয়া"র আশ্রয়ে থাকেন। বামদাহের সৌম্য মূর্ত্তি ও আদর্শ চরিত্র দৃষ্টে কেন্দুকুছিয়া বরুয়া তাঁহাকে জনৈক ছদ্মবেশী পুরুষ বলিয়া সন্দেহ করিলেন, এবং প্রকৃত কথা বলিবার জন্য তাঁহাকে একদিন গোপনে ডাকিয়া বিস্তর অনুরোধ করিলেন। বামদাহ তখন তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। কেন্দুকুছিয়া বরুয়া জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তিনি স্বজাতি বামদাহকে সাদরে ও সসম্মানে নিজ গৃহে স্থান দিলেন। কয়েক মাস পরে বামদাহ ঐ কেন্দুকুছি হইতে ৩ মাইল দক্ষিণে "ভুনকুছি" গ্রামে কিছু ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া সেখানে গৃহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক বসবাস করেন। প্রায় দুই বৎসর পরে তদীয় ভ্রাতা ধ্বজনারায়ণ

* গৌহাটীস্থ আর্য্য কায়স্থ সভা হইতে প্রকাশিত "কায়স্থ ভাস্কর" ২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বঙ্গদেশে এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

(১) নারায়ণ গামঠা—কামরূপের "টীহু" ষ্টেশনের "নাম্নার ভাৰি" গ্রামে ই'হার বাড়ী ছিল। স্থানীয় অসমীয়ারা "নারায়ণ"কে চলিত কথায় "নাম্না" বলেন।

(২) মঙ্গলদৈয়ের মৌজাদার শ্রীযুক্ত চন্দ্রমল চৌধারী বলেন, "দরঙ্গ জেলায় প্রাচীন কায়স্থ বংশ একদে লোপ পাইয়াছে। "মঙ্গলদৈ"এ যে তিন চারি ঘর খাতি (বিশুদ্ধ) কায়স্থ আছেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কামরূপ হইতে আসিয়া এখানে বসবাস করেন।

স্ত্রী-পুত্রসহ দরঙ্গ হইতে উক্ত ভুনকুছি গ্রামে আসিয়া বামদাহের সহিত মিলিত হন। ধ্বজনারায়ণের বংশধরগণ এক্ষণে ভুনকুছি গ্রামে বসবাস করিতেছেন।

বামদাহের পুত্র নিত্যানন্দ আহোম রাজের কাকতি (writer) বিষয় করিতেন। ইনি ভুনকুছি পরিত্যাগপূর্ব্বক তথা হইতে দুই মাইল দক্ষিণে "নন্দগ্রামে" আসিয়া বাস করেন। নিত্যানন্দের পুত্র হলিরাম (নামান্তর কৃষ্ণরাম) পিতার "কাকতি বিষয়" লাভ করেন এবং ১৬৮১ শকে আহোম রাজ রাজেশ্বর সিংহের নিকট হইতে নিষ্কর ভূসম্পত্তি ও ভকট প্রাপ্ত হন। আগামী বারে তৎপ্রদত্ত তাম্রফলকের এবং এই প্রসিদ্ধ বংশের সবিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। আহোম রাজগণের নিকট হইতে যাঁহারা ভূমি ও দাস দাসী লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা সম্ভ্রান্ত ও উচ্চবংশীয় বলিয়া অসমীয়া হিন্দুদিগের নিকট অদ্যাবধি আদৃত।

নিম্নে কাণ্যকুব্জাগত কামরূপের নন্দগ্রামস্থ বরুয়া বংশের পূর্ব্বপুরুষ "নরোত্তম দেব" ও তাঁহার কয়েক জন বংশধরের ধারাবাহিক নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

- নরোত্তম দেব
  - বীরনারায়ণ
    - হরিনারায়ণ
      - ধ্বজনারায়ণ
      - বামদাহ
        - নিত্যানন্দ কাকতি
          - হলিরাম কাকতি
            - শ্যামনারায়ণ চৌধুরী
              - মধুনারায়ণ দলৈ
                - নরহরি মজুমদার
                  - শ্রীশ্রীহরি দত্ত বরুয়া
            - খড়্গেশ্বর চৌধুরী
              - ধর্ম্মনারায়ণ
                - রামনারায়ণ
                - চন্দ্রনারায়ণ
                - বলিনারায়ণ
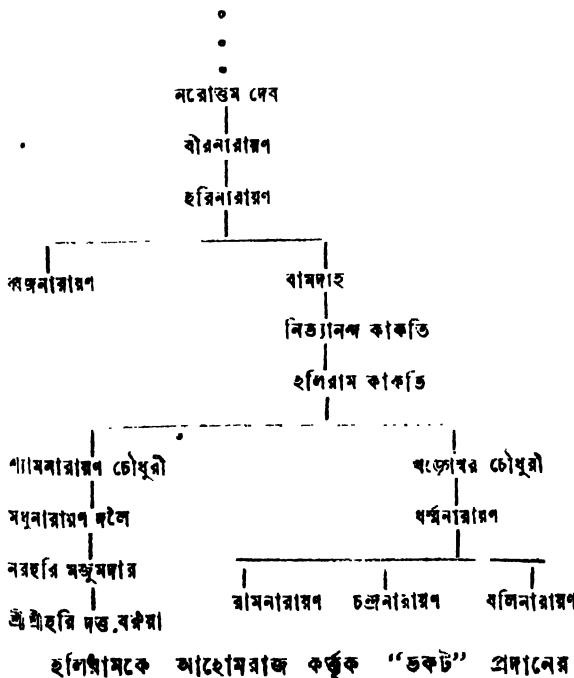
হলিরামকে আহোমরাজ কর্ত্তৃক "ভকট" প্রদানের কথা পূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি। এই "ভকট" শব্দ বঙ্গদেশে অজ্ঞাত। প্রধানতঃ ইহা দুইটী অর্থে ব্যবহৃত হয়, যথা :—(১) বৈষ্ণব ও (২) বিগ্রহের পূজার জন্য আতপ চাউল, ফুল, জল প্রভৃতি এবং দেবমন্দির ও ভোগ-নৈবিদ্যের পাত্র পরিষ্কার করিবার জন্য আহোমরাজ-প্রদত্ত দাস দাসী। সাধারণতঃ "ভকট" অর্থে সেবায়েৎ বুঝায়। এতদ্ব্যতীত সত্রের পূজাদি কার্য্যের জন্য নিযুক্ত লোকদিগকেও ভকট বলা হয়। আহোম রাজারা তাঁহাদের ধর্ম্মার্থ দেবমন্দিরের সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া গোস্বামী ব্যতীত কায়স্থ ও কলিতাদি কায়স্থের জাতিকেও জমি ও ভকট প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত তাম্র শাসনই তাহার নিদর্শন। বরুয়া ও চৌধুরীদিগের কাজ-কর্ম্ম চালাইবার জন্য রাজসরকার হইতে যে-সকল লোক নিযুক্ত হইত তাহারাও "ভকট" নামে অভিহিত হইত। পূর্ব্বে আহোমরাজগণ বিষয়াদিগকে (কর্ম্মচারীদিগকে) পারিশ্রমিক-স্বরূপ কচিৎ নগদ টাকা দিতেন—তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা জমী ও "ভকট" প্রদান করিতেন।

হলিরামের খড়্গেশ্বর ও শ্যামনারায়ণ (৩) নামে দুই পুত্র ছিলেন। উভয়েই "চৌধুরী বিষয়" করিতেন। খড়্গেশ্বরের পুত্র ধর্ম্মনারায়ণ (নামান্তর চানাবাপু) আহোমরাজ চন্দ্রকান্তের (৪) রাজত্বকালে "বুঝর বরুয়া" পদে নিযুক্ত হন। ইহা তৎকালে একটী সম্মানজনক উচ্চ পদ। আহোম ব্যতীত অন্য কোন জাতির লোকেরা "বুঝর বরুয়া"র উপরীস্থ পদ পাইতেন না। আহোমদিগের রাজত্বকালে বুঝর বরুয়া ইংরাজ আমলের কলেক্টরের (collector) সমতুল্য। দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজস্ব বিষয়ের ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত ছিল। বিশেষতঃ শেষোক্ত বিষয়ের জন্য তিনি সম্পূর্ণ দায়ী ছিলেন। "চৌধুরী"রা তাঁহার অধীনে থাকিয়া রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে

(৩) শ্যামনারায়ণ—অসমীয়ারা শ্যামনারায়ণকে "চামনারায়ণ" বলেন।

(৪) চন্দ্রকান্ত—ইঁহার রাজত্বকালে (১৮০৯-১০ খ্রীঃ অব্দে) "বড়ফুকণ" ব্রহ্মরাজের শরণাপন্ন হইয়া চন্দ্রকান্তের বিরুদ্ধে ৬০০০ হাজার ব্রহ্ম সৈন্য লইয়া আসামে আসে।

দিতেন। তিনি তাহা বড় ফুকণ (Governor General) কে প্রদান করিতেন অথবা রাজকোষাগারে জমা দিতেন। ধর্ম্মনারায়ণ "বুঝর বরুয়া" হইয়া তৎকালীন কামরূপের জনসাধারণের সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র হওয়া ব্যতীত "নন্দ-গ্রামের বরুয়া" নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। সাধারণ লোকে উহার পরিবর্ত্তে গ্রাম্য ভাষায় তাঁহাকে "ননুগেইয়া বরুয়া" বলিতেন। অদ্যাবধি এই ধর্ম্মনারায়ণের বংশধারা চলিয়া আসিতেছে।

কোচরাজ বিশু বা বিশ্বসিংহ বর্ত্তমান গোয়ালপাড়া হইতে আধুনিক দরঙ্গ জেলা পর্য্যন্ত ভূঞাগণের সমুদয় রাজ্য ক্রমে ক্রমে আত্মসাৎ করিলে কায়স্থগণ কোচরাজগণের অধীনে বড় বড় বিষয় (service) করিতেন। বরুয়া, চৌধুরী, কাকতি প্রভৃতি পদ অধিকাংশ কায়স্থরাই পাইতেন। তৎকালে কায়স্থ "বুঝর বরুয়া"ও ছিলেন। কোচরাজ-শক্তির লাঘব হেতু কামরূপে আহোমরাজগণ যখন হইতে পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন তখন হইতে অন্যান্য জাতির লোকেরা ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের সরকারে ঐ সকল পদে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। তথাপি চৌধুরী ও পাটোয়ারী পদ উচ্চ বংশীয় কায়স্থগণই আসামের ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভকাল পর্য্যন্তও প্রায় পাইতেন। আহোম রাজগণের আমলে বুঝর বরুয়া পদ বহুকাল যাবৎ অন্য জাতির ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বশেষে ধর্ম্মনারায়ণই এই পদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুতরাং ইনিই কামরূপের আহোম রাজত্বের শেষ বুঝর বরুয়া।

ধর্ম্মনারায়ণের পুত্র "রামনারায়ণ" মানের (Burmeese) আমলে পিতার ঐ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক মাস পরে ইংরাজেরা তাহাদের নবাধিকৃত রাজ্য অধিকার করেন এবং আপনাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার কিছুকাল পরে ঐ উপাধিটী উঠাইয়া দেন। ইংরাজেরা তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাকে চৌধুরী পদ দিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যাখ্যানান্তর বলিয়াছিলেন, "আমি বুঝর বরুয়া হইয়া চৌধুরী পদ গ্রহণ করিলে আমার সম্মানের লাঘব হইবে।" রামনারায়ণের দুই ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহাদের নাম—চন্দ্র-নারায়ণ ও বলিনারায়ণ। চন্দ্রনারায়ণের পুত্র পদ্মনারায়ণ ইংরাজ আমলে "চৌধুরী"র কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

আহোমরাজ রাজেশ্বর সিংহ পুণ্য সঞ্চয়ার্থ মঠঘর (সত্র) বাঁধিয়া ভূসম্পত্তি দান করিতেন। সত্রের গোস্বামীগণ এই প্রকার দান বরাবর প্রাপ্ত হইতেন। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য উচ্চবংশীয় লোকেরাও মধ্যে মধ্যে তৎপ্রদত্ত মঠঘরের কর্ত্তৃত্বভার ও জায়গা-জমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত ধর্ম্ম-নারায়ণের ভ্রাতা মধুনারায়ণ রাজদত্ত মঠের দলই হইয়া তাহার পরিচালনা করিয়াছিলেন। তিনি শিষ্য ভজাইয়া গুরুগিরি করিতেন। সমীপবর্ত্তী গ্রামের অধিবাসীগণ তদীয় বংশধর নরহরিকে গুরুবংশীয় বলিয়া সম্মান করিতেন। মধু-নারায়ণের ভ্রাতা কুহিরাম ও তৎপুত্র যজ্ঞরাম গুরুগিরি করিয়া সেই সম্মান অনেকটা বজায় রাখিয়া গিয়াছেন। যজ্ঞরামের দেহত্যাগের পর তদীয় বংশের আর কেহ গুরু-গিরি করিতে অগ্রসর হন নাই। কারণ শিষ্যদিগের ভক্তি কমিয়া গিয়াছে; তাহার উপর পাওনা-গণ্ডাও তথৈবচ। যাহা হউক, দত্ত বরুয়া শ্রীযুক্ত শ্রীহরির কৌলিক উপাধি নহে।

বহুরূপী।

[শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

১

সেদিন পহেলা বৈশাখ। কলিকাতা সহরে অত্যন্ত গরম পড়িয়াছে। শীঘ্র যে একটা বৃষ্টি হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন, এমন সমালোচনা যেখানে-সেখানে সুরু হইয়া গিয়াছে। তাহাদের ভবিষ্যৎ বাণী যে অচিরে সফল হইতে পারে এমন কতকগুলি মেঘ আকাশে জমিয়া আশ্বাস দিতেছিল। বেলা ১১টা বাজিয়া গিয়াছে, ইতিমধ্যেই রৌদ্রের প্রখর উত্তাপ অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে। মোড়ে

মোড়ে সরবতের দোকানগুলি মৌমাছির চাকের মত ক্রেতার ভিড়ে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ঘরের গাড়ীর আরোহীগণ সমস্ত দায়িত্ব কোচম্যানের হস্তে নির্ভাবনায় সমর্পণ করিয়া মাতালের মত গাড়ীর ভিতর নিদ্রালসনেত্রে ঢুলিতেছে এবং এক একবার গাড়ীর গাত্রের সহিত মস্তকের অকস্মাৎ নিষ্ঠুর পরিচয়ে চমকিয়া উঠিয়া মাথায় হস্ত বুলাইয়া বেদনার শান্তি করিতে প্রয়াস পাইতেছে; কিন্তু মার্জ্জারের মত গাড়ীর চক্র আড়াই পাক ঘুরিতে না ঘুরিতে পুনরায় নিদ্রার প্রিয় সম্ভাষণে ভুলিয়া পূর্ব্ববৎ ঢুলিতেছে। সিঁদুরিয়াপটীর চৌমাথায় সেদিন যেন গাড়ীর একটা লড়াই লাগিয়া গেছে। পা বাড়াইবার স্থান নাই। মটর, ঘোড়ারগাড়ী, গরুরগাড়ী, বাইসিকিল প্রভৃতির পেঁচ লাগিয়া গিয়াছে। পরস্পর যেন কাটিয়া বাহির হইবার পথ খুঁজিতেছে। এদিকে হাঁটা যাত্রীর দল মহা গোলে পড়িয়া একবার ফুটপাথ হইতে রাস্তায় আসিয়া অর্দ্ধপথ হইতে মটরের আস্ফালনে পুনরায় যেখান হইতে যাত্রা করিয়াছিল, সেখানে ফিরিয়া আসিয়া হাঁপ ছাড়িতেছে। কেবল কি ইহা? ইহার ভিতর পকেটমারার দল নূতন বৎসরে প্রথম মহরৎ করিবার আশায় অনেকের অসাবধান পকেটের প্রতি অনন্য লক্ষ্য হইয়া অপেক্ষা করিতেছে।

অনেক কষ্টে পোল হইতে চিৎপুরের মোড় পর্য্যন্ত আসিয়া ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। ট্রামের জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। ইতিপূর্ব্বে তিনখানি ট্রাম ছাড়িয়া গিয়াছে। সবগুলিতেই কালীঘাট হইতে যাত্রা পূজা করাইয়া লোক ঝুলিতে ঝুলিতে ফিরিতেছিল। সুতরাং সহস্র চেষ্টা করিয়া সেদিন ব্যূহ ভেদ করিতে পারি নাই। এক একবার ঘড়ির দিকে দেখিতেছি আর ট্রাম আসিলেই ছুটিয়া যাইতেছি। কিন্তু ফল পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের চেষ্টার মতই দাঁড়াইতেছে। শেষে অত্যন্ত উতলা হইয়া পড়িলাম। একখানি খালি ট্যাক্সি দেখিয়া ভাড়া যাইবে কি না জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সেখানির ভাড়া আছে। কি করা যায়? মনের মধ্যে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে লাগিল। সেদিন ১লা বৈশাখ, পূর্ব্ব হইতে সব গাড়ী ভাড়া হইয়া আছে। একখানিও খালি গাড়ীর দর্শন পাইলাম না। এমন করিয়া এক ঘণ্টা প্রায় অতিবাহিত হইতে চলিল। ট্রাম কোম্পানীর প্রচুর পরিমাণে গাড়ী সরবরাহ করার অক্ষমতার উপর যথেষ্ট রাগ হইল। আর মূঢ় দোকানদার-গুলোর অনর্থক কালীঘাটে গিয়া খাতায় অকারণ সিন্দূর মাখাইয়া আনা কুসংস্কারের উপর ঘোরতর বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছিল। তাঁহাদের মূঢ়তার জন্যই ত আজ ট্রামে উঠিবার যো নাই। বেলা ১২টার ভিতর আমার বন্ধু কিরণবাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণ। অনেক করিয়া বলিয়া গিয়াছিল, যে বেলা ১২টার ভিতর যেন গিয়া পৌঁছাই। আমি তার স্ত্রীর ব্রতের "গোনা বামুন।" আমাকে না খাওয়াইয়া, তার স্ত্রী জল খাইতে পারিবে না। কিন্তু উপায় কি? এখান হইতে হাঁটিয়া শোভাবাজার—এই দুপুর রৌদ্র; গাড়ী ঘোড়া ও লোকের ভিড় ঠেলিয়া যাওয়া বড় সহজ ব্যাপার নয়। আর কোন দিন এমন বাঁধা-ধরা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিব না বলিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম। নানারূপ চিন্তা মনে হইতে লাগিল। মনে হইল কিরণের স্ত্রী হয় ত পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া এক বিন্দু জল পান করিতে পারিতেছে না। হয় ত কিরণ এতক্ষণ আমার অনুসন্ধানে আমার বাড়ী লোক পাঠাইয়া দিয়াছে। শেষে ব্রতের উপর অত্যন্ত রাগ হইল। যে ব্রত করিলে ব্রাহ্মণ খাওয়াইয়া জল খাইতে হয়, সে ব্রতগুলিকে আইন করিয়া উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

ঠিক এই সময় মনে হইল যেন কোনো একখানি ঘরের গাড়ীর ভিতর হইতে কে যেন ডাকিল, "কি হে শশাঙ্ক যে, অনেক দিন পরে তোমায় দেখলাম। তোমার সঙ্গে ঢের কথা আছে, গাড়ীতে এস না?" অনেক গাড়ী তখন ভাড়া হইয়া গিয়াছিল। একটি পাহারওয়ালা চৌরাস্তার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া ঠিক যেন পুতুলনাচের পুতুলের মত একবার বামে, একবার দক্ষিণে, একবার সম্মুখে, একবার পশ্চাতে ঘুরিয়া ফিরিয়া একরূপ নৃত্য করিতেছিল। তাহার হস্ত সঞ্চালন ও মুখাভিনয় ভঙ্গীর অদ্ভুত কৌশল দেখিলে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন। তাহার এই অখণ্ড প্রতাপ, তাহার অঙ্গুলিহেলনে মটর প্রভৃতি গাড়ীর স্থগিত অবস্থার কথা বোধ হয় পাহার-ওয়ালা সাহেব অন্তরের ভিতর একটা স্বপ্নরাজ্যের মায়াজাল

বুনিয়া তাহাকে সসাগরা ধরণীর অধীশ্বরের সিংহাসনের পার্শ্বেই স্থান দিতেছিল। মাঝে মাঝে সে গর্ব্ব-বিস্ফারিত নয়নে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল, তাহার দেশবাসী যদি কেহ এই সময় তাহার শক্তি এবং কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া ধন্য ধন্য করিতে থাকে। আমার নাম শুনিয়া এদিক ওদিক চাহিতেই পুনরায় শুনিতে পাইলাম, "শশাঙ্ক এ দিকে?" শব্দ লক্ষ্য করিয়া চাহিতেই দেখিলাম একখানি ঘরের গাড়ীর ভিতর, আমার আপিস-বন্ধু হরেন্দ্র বসিয়া আছে। চকোচোকী হইবা মাত্র সে বলিল, "গাড়ীতে উঠে এসো।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কোন্ দিকে যাবে?"

সে উত্তর করিল, "বাগবাজার।" অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নাই, শুনলাম তুমি না কি চাকরী ছেড়ে দিয়েছ? বেশ করেছ! গোলামী যত ছাড়তে পারা যায় ততই দেশের মঙ্গল।" গড় গড় করে' নিমিষের মধ্যে হরেন্দ্র অনেক কথাই বলে ফেল্‌লে। আমার জবাবের প্রতীক্ষা করলে না। আমি ত তার সকল কথা মনে রাখতে পারলাম না। কারণ তখন আমার মনের ভিতর তুমুল চিন্তার প্রবাহ চলেছিল। আমি হাঁ, না, কোন উত্তর না দিয়া হরেন্দ্রের গাড়ীর ভিতর উঠে বস্‌লাম। যদিও গাড়ীর ভিতর অপর কেহ ছিল না। সে অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়ে আমাকে তার পার্শ্বেই বসাইল। বলিল, "তুমি কোথায় যাবে?" আমি কহিলাম, "শোভাবাজার।"

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "সেখানে কি কোন বিশেষ কাজ আছে? নইলে আমার আপিসে চল। অনেক দিন পরে দেখা। কত দিন হবে বল ত? প্রায় দুই বৎসর তোমার সঙ্গে দেখা হয় নাই, কেমন?"

আমি বলিলাম, "তা হবে বৈকি। কিন্তু আজ আর ভাই তোমার আপিসে যেতে পারব না, আমার একটী বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ আছে। এখন সেখানে যাব। তার পর কখন যে তার ওখান হ'তে বেরুতে পারব তা ঠিক জানি না। ভাল কথা, তোমার আপিসের ঠিকানাটী আমায় দাও, আমি একদিন এর মধ্যে যাব এখন।"

হরেন্দ্র বলিল, "আমি আপিস খুলেছি, তুমি কি জান না? Hallow! খুব আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। আমি আজ চার বৎসর চাকরী ছেড়ে দিয়ে নিজে গ্যাঙ্গুলী এণ্ড কোং নামে প্রকাণ্ড আপিস খুলেছি। এ সংবাদ ত অনেকেই জানে; তুমি জান না কেমন? তা কেমন করে জানবে বল? ব্যবসা-লাইনে ত আর তোমরা বড় একটা ঘোর না। আমি এখন একজন বড় দরের পাটের দালাল। তা, মাসে হাজার দুই হাজার টাকা রোজকার করচি।" বলিয়া খুব হাসিতে লাগিল। আমি অবাক হইয়া তাহার কথা শুনিতেছিলাম দেখিয়া হরেন্দ্র হাত নাড়িয়া পুনরায় বলিল, "আচ্ছা শশাঙ্ক, আমাকে সাহেবের পোষাকে তুমি নিশ্চয় প্রথমটা চিন্‌তে পার নাই কেমন? তুমি কেন, অনেকেই আমাকে বাঙ্গালী ব'লে মোটেই ধর্‌তে পারে না। গাড়ী ঘোড়া না হ'লে আজকালের দিনে মান সম্ভ্রম রক্ষা হয় না। সেজন্য গাড়ী রাখতে হয়েছে।"

আমি হরেন্দ্রের কথার বহর দেখিয়াই সত্য সত্যই একরূপ নির্ব্বাক হইয়া শুনিতেছিলাম এবং সেও আমার নিকট হইতে কোন উত্তর পাওয়ার যে প্রয়োজন আছে এমন ভাব বা অবসরটুকু পর্য্যন্ত দিতে ছিল না।

আমি বলিলাম, "তুমি চাকরী ছাড়িয়া খুব উন্নতি করেছ ত?"

এ কথায় সে যেন আমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইল। আমার হাতটী তাহার হাতের ভিতর তুলিয়া লইয়া চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "গত বৎসর বিশ হাজার টাকা লাভ করেছি; আমার মত কেরাণীর বিদ্যায় আর কত আশা করা যায় বল?"

এতক্ষণে আমি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। হরেন্দ্র যে তাহার পূর্ব্ব অবস্থাটা মনে করতে পেরেছে এবং নিজে যে একজন কেরাণী ছিল, এ কথাটা তার স্মরণ আছে, এ খবরটা পেয়ে আমি অনেকখানি আশ্বস্ত হ'লাম।

আমি বল্লাম, "ভগবান যখন যাহার উপর প্রসন্ন হন তখন, কেরাণী, বিদ্বান বা মূর্খ বলে' কোন কথাই থাকে না। কেরাণীগিরি কল্লে যে সে আর কিছু কোন দিন করবে না এমন কোন আইন নাই। অনেক দেশের অনেক কেরাণীরাই ত বড় বড় লেখক, দেশনায়ক, এমন

কি পার্লামেন্টের সভ্য পর্য্যন্ত হয়েছে তারও ত রাশি রাশি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এই যে মাড়োয়ারী ও দিল্লীওয়ালাগণ কি এমন লেখাপড়ার ধার ধারে, কিন্তু আজ তাহারাই কলিকাতার সমস্ত ব্যবসার স্তম্ভ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।" এ জবাবটা তার কতখানি মনোমত হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। তবে তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিলাম যে, সে উৎসাহের স্রোতে একটা ধাধা পাইয়াছে। সে যেন আমার নিকট হইতে একটা খুব বড় রকমের প্রশংসা শোনবার প্রত্যাশাই করেছিল।

দুইজনে অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলাম। হরেন্দ্র বলিল, "তুমি বল্লে কোথায় শোভাবাজারে নামবে না?"

আমি কহিলাম, "হ্যাঁ।"

আমি দেখিলাম, হরেন্দ্র যেন মনে মনে একটুখানি অপ্রতিভ হইতেছে। সেজন্য এবার কথার সূত্রটা আমি ধরাইয়া দিলাম। বলিলাম, "তোমার আপিসের ঠিকানা কি বল। পারি ত দুই এক দিনের ভিতর দেখা করব।"

হরেন্দ্র দ্বিগুণ আগ্রহ প্রকাশ করে' বলিল, "এই দেখ তোমাকে দেখা করতে বলেচি, কিন্তু ঠিকানা দিতেই ভুল। ব্যবসায় অত্যন্ত চিন্তা করতে হয়। সব সময় মনের ঠিক থাকে না।" বলিয়া কোটের পকেট হইতে একটী নোটকেশ বাহির করিয়া তাহা এমন ভাবে খুলিল যাহাতে ব্যাগটার অভ্যন্তরস্থিত সমস্ত জিনিসে আমার দৃষ্টি পড়ে। ব্যাগের ভিতর একতাড়া নোট ছিল, সেগুলি একবার অকারণ টানিয়া বাহির করিল। আবার যথাস্থানে রাখিয়া দিল। এবং অপর পার্শ্ব হইতে একখানি কার্ড বাহির করিয়া আমার হাতে দিল। কার্ডের উপর ইংরাজিতে ছাপা আছে "হরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী, প্রোপ্রাইটার গাঙ্গুলী এণ্ড কোং, ৪নং হেয়ার ষ্ট্রীট্।" আমি যত্ন সহকারে কার্ডখানি পকেটের মধ্যে রাখিলাম।

হরেন্দ্র বলিল, "কেমন কার্ডের ছাপা? ঠিক সাহেব কোম্পানীর মত হয় নি? এবার কিন্তু আমি আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। সুতরাং হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলাম, "তোমাকেই যখন সহজে বাঙ্গালী বলে' চিন্তে পারা যায় না, তখন তোমার কার্ডখানি চেনা বড় শক্ত কথা।"

হরেন্দ্র এ কথা শুনিয়া একগাল হাসিয়া একটী বর্ম্মা চুরুট ধরাইতে ধরাইতে বলিল, "কিন্তু এ সব যে সাজ দেখ্‌ছ, সব দোকানদারী। নইলে বাড়ীতে দুই বেলা রীতিমত দুইটী ঘণ্টা পাকা সন্ধ্যা আহ্নিক চলে। সে দিকে বাবা ঠিক আছি। হাজার হৌক হিঁদুর ছেলে ত বটে!"

আমি বলিলাম, "তাই ত চাই। ইংরাজের যেটুকু ভাল সেইটুকু নিলে ত কোন দোষ দাঁড়ায় না। আমাদের যে পেন্‌টুলন কোট পরিলেই কেমন হাত পা ছুড়তে ইচ্ছা হয়। গলায় বগলস থাকার জন্য মেজাজটা একটু উঁচু হ'য়ে যায় কি না, কাজেই আর নীচে আসন পেতে বসতে ইচ্ছা করে না। তুমি যে ভাই দুই বেলা এখন সন্ধ্যা আহ্নিক কর, শুনে বড়ই আনন্দ হ'লো।"

হরেন্দ্র এ কথা শুনিয়া অত্যন্ত আগ্রহ দেখাইয়া কণ্ঠস্বর একটু নম্র করিয়া বলিল, "সবই মার দেওয়া। তাঁর দয়া না হ'লে কি একজন সামান্য কেরাণী হ'য়ে আজ কি না গাড়ী ঘোড়া চেপে বেড়াচ্ছি। মাস গেলে সংসার খরচ খুব কম-পক্ষে সাত আট শো টাকা। দেখ ভাই শশাঙ্ক, আহ্নিক করতে করতে, যেন মাকে সাক্ষাৎ দেখতে পাই। এক একদিন মা যেন আমার সঙ্গে কথা কন।" বলিতে বলিতে হরেন্দ্রের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। কণ্ঠস্বর যেন ধরিয়া আসিল। সে ভাবে গদগদ হইয়া আমার স্কন্ধে মাথা দিয়া ঢলিয়া পড়িল। মুহূর্ত্তের ভিতর এই দুই ভাবের অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে কেবল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। মনে হইল যেন কোন নাট্যশালায় একসঙ্গে রুদ্র ও করুণ রসের অভিনয় দেখিতেছি। কিন্তু শেষের অভিনয়টী সত্য সত্যই আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাহার অগাধ ভক্তি দেখিয়া মনে হইল, তাহা না হইলে লোকটীর এত শীঘ্র উন্নতি হইবে কেন? ভগবানের নাম স্মরণ করিতে যাহার নয়ন দিয়া অশ্রুধারা বিগলিত হয়, সে হাজার সাহেব সাজুক, হাজার তাহার ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব করুক, সে যে ভাল লোক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমি বলিলাম, "হরেন্দ্র! তোমার ভাই ভগবানে যেরূপ প্রীতি

ও শ্রদ্ধা তাহা সকলের শিক্ষার বিষয়—তোমাকে আর কি বল্‌বো, তোমার দিন দিন আরো উন্নতি হোক।

হরেন্দ্র এবার কোন উত্তর দিল না। তাহার সজল আঁখি দুইটী আমার মুখের পানে রাখিয়া তখনই নামাইয়া লইল। এবার যেন হরেন্দ্র একমনে অনেকক্ষণ কি ভাবিতে লাগিল। আমি তাহার চিন্তাস্রোতে কোন বাধা না দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ পরে হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যে বন্ধুর বাড়ী যাইতেছ, তিনি কি করেন?"

আমি বলিলাম, তাঁর পাটের কাজ আছে, বড়বাজারে দুইখানি কাপড়ের দোকান আছে। এ কথায় সে যেন একটু চমকিয়া উঠিল।

হরেন্দ্রের যেন এ কথা শুনিয়া খুব আগ্রহ বাড়িয়া গেল। বলিল, "কি বল্লে, পাটের কাজ আছে? কোথায়? কি নাম বল দেখি?"

হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "তাঁহার নাম কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কারবার হাটখোলায়।"

নাম শুনিয়া হরেন্দ্র উৎসাহভরে একরূপ যেন লাফাইয়া উঠিল। বলিল, "কিরণবাবু! তাঁর সঙ্গে যদিও বিশেষ আলাপ নাই, তবে দুই চারবার কারবার নিয়ে—দু-পাঁচ মিনিটের আলাপ হ'য়েছে। লোকটা অত্যন্ত ধনী। বাজারে খুব সুনাম আছে। কিন্তু খুব মোটা চালেই চলে। ইচ্ছা করলে দশখানা মটর গাড়ী রাখতে পারে, কিন্তু সে সব সখ নাই। খুব সাদাসিদে চলে। বড় বেশী কথা কন না—কেমন?"

আমি বলিলাম, "তুমি যেরূপ বল্‌লে ঠিক সেই প্রকৃতির লোক। খুব ভাল মানুষ ও ধার্ম্মিক।" এই সময় গাড়ী শোভাবাজার আসিয়া পৌঁছিল। আমি বলিলাম, "আমি এখানেই নামিব।" গাড়ী দাঁড়াইল। হরেন্দ্র বলিল, "কথায় কথায় তুমি কি করচ কিছু জিজ্ঞাসা করা হ'লো না। কাল কিন্তু ভাই তোমার আমার আপিসে আসা চাই! বল ত আমি গাড়ী পাঠিয়ে দিতে পারি। কোন্ ঠিকানায়, কোথায় কখন গাড়ী পাঠাব বল।"

আমি বলিলাম, "তোমাকে গাড়ী পাঠাতে হবে না, সব দিন ত আর পহেলা বৈশাখ নয় যে গাড়ীর দুর্ভিক্ষ হবে। ট্রাম আছে, আর পায়ের জোর এখনো যথেষ্ট আছে। নিজেই যাব এখন" বলিয়া নমস্কার করিলাম।

হরেন্দ্র গাড়ীর ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "তোমার সঙ্গে বিশেষ কাজের কথা আছে; যেতে কোন মতে ভুল করোনা। ভাল কথা; আমি আপিসে বেলা ১২টা থেকে ৩টা পর্য্যন্ত থাকি, এর মধ্যে যেও।"

আমি ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিলাম, "তাই হবে।"

ক্রমশঃ।

পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর।*

[অধ্যাপক শ্রীহরিহর শাস্ত্রী]

রংপুর জেলার ইটাকুমারী গ্রামের ভট্টাচার্য্যবংশ, বঙ্গদেশে সুপ্রসিদ্ধ। 'অধিকরণ কৌমুদী' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা মহামহোপাধ্যায় উদীচ্য ভট্টাচার্য্য রামকৃষ্ণ, এই বংশের বীজপুরুষ। দেবানুগৃহীত বলিয়া রামকৃষ্ণের প্রসিদ্ধি ছিল। নবদ্বীপ ভট্টপল্লীর ন্যায় উত্তরবঙ্গে ইটাকুমারীর সম্মান। এই বংশের প্রায় সকলেই প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন। নবদ্বীপের শ্রীরাম শিরোমণির প্রধান ছাত্র রুদ্রমঙ্গল, এই বংশেরই দৌহিত্র। এই বংশে আনন্দেশ্বর ভট্টাচার্য্য, অল্প বয়সে দুইটী পুত্র ও গর্ভবতী পত্নী রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। পিতৃবিয়োগ কালে জ্যেষ্ঠের বয়স পাঁচ বৎসর ও কনিষ্ঠের বয়স আড়াই বৎসর ছিল। এই জ্যেষ্ঠ পুত্রই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট্

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্—বারাণসী শাখার বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

যাদবেশ্বর তর্করত্ন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বরের জন্ম হয়।

পিতৃবিয়োগের বৎসরেই দেশীয় প্রথাক্রমে যাদবেশ্বরের বিদ্যারম্ভ হয়। গ্রামের বৈয়াকরণ-শ্রেষ্ঠ হরগোবিন্দ সিদ্ধান্ত-বাগীশের নিকটে তিনি কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। ইটাকুমারীর ভট্টাচার্য্যবংশের অলঙ্কার শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার, তখন বঙ্গদেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া সম্মানিত। ইঁহারই কাছে যাদবেশ্বর সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র পড়েন। স্ব-বংশের কমলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, যাদবেশ্বরের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক। উনিশ বৎসর বয়সে শ্রীযুক্তা জগদীশ্বরী দেবীর সহিত যাদবেশ্বরের বিবাহ হয়।

কাব্য, ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়নের পর যাদবেশ্বর কাশীতে আসিয়া কাশীর সংস্কৃত কলেজের প্রধান ন্যায়শাস্ত্রা-ধ্যাপক কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের নিকটে ন্যায়শাস্ত্র এবং সর্ব্বজন-বিখ্যাত পরমহংস বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর নিকটে বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। যাদবেশ্বর নবদ্বীপের ভুবনমোহন বিদ্যারত্নের কাছে ন্যায়শাস্ত্রের ও ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের কাছে স্মৃতিশাস্ত্রের উপদেশ লইয়াছিলেন। তিনি স্মৃতিশাস্ত্রের উপদেশ লইবার পূর্ব্বে একটী ব্যবস্থা লইয়া মতবিরোধ হওয়ায় ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের সিদ্ধান্তের প্রাতি-কূল্যে "সংশয় নিরসন" নামে ক্রমশঃ তিনখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তখন ইঁহার বয়স ২১ বৎসর। ঐ বয়সেই যাদবেশ্বর "প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি," "চন্দ্রদূত," "প্রশান্ত কুসুম"—এই তিনখানি সংস্কৃত কাব্য প্রণয়ন করেন।

সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, যাদবেশ্বরের বিশেষ হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। গিরিশ-চন্দ্র বিদ্যারত্ন সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে ন্যায়রত্ন মহাশয় ইঁহাকে সেই পদ গ্রহণ করিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু স্বদেশের রাজা ও ভূম্যধি-কারিগণ তাঁহাকে দেশে থাকিয়া অধ্যাপনা করিবার জন্য সানির্ব্বন্ধ অনুরোধ করায় যাদবেশ্বর সংস্কৃত কলেজের অধ্যা-পকতা গ্রহণ করেন নাই। রংপুর সহরের উপর স্বয়ং চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। অবশ্য এই চতুষ্পাঠীতে গভর্ণমেণ্ট, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপালিটী ও রংপুর জেলার ভূস্বামিবৃন্দ অদ্যাপি প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতেছেন। জানি না, এখন তাঁহার মৃত্যুতে রংপুর জেলার এই একমাত্র চতুষ্পাঠী উঠিয়া যাইবে কি না।

যাদবেশ্বরের অদ্ভুত কবিত্বশক্তি, তাঁহার বলবৎ প্রাক্তন সংস্কারের পরিচয় দিত। বার বৎসর বয়সে প্রথম সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়া তিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রভূত উৎ-সাহ লাভ করেন। যাদবেশ্বরের শব্দগাম্ভীর্য্য ও ভাবমাধুর্য্যে অনুপ্রাণিত গদ্য ও পদ্যের ভাষা দেখিলে মনে হয়—সংস্কৃত যেন তাঁহার মাতৃভাষা। বহু বিদ্বৎসভায় তিনি নানা কঠিন সমস্যা, তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় তিনি প্রায় ২০ খানি কাব্য লিখিয়াছেন। তাঁহার শেষ কাব্য "সুভদ্রা হরণ" পড়িলে কালিদাসের 'রঘুবংশে'র স্মৃতি জাগরূক হয়। তিনি অতি দ্রুত সংস্কৃত কবিতা লিখিতে পারিতেন। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ-তম বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় টাউন হলে অভিনন্দন উপলক্ষে তিনি ও আমি একত্র কাশী হইতে কলিকাতায় যাই। সেই অধিবেশনে তাঁহার সংস্কৃত কবিতা পাঠ করিবার কথা ছিল। তিনি ট্রেনে অল্প সময়ের মধ্যে এমন সুন্দর কতকগুলি কবিতা রচনা করিলেন যে, দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তাহার একটী শ্লোক এখনও আমার মনে আছে;—

"চন্দ্রশ্চন্দ্রিকয়া চ চন্দনতরুঃ সৌগন্ধমন্দানিলৈ
র্মন্দারো লসদিন্দিরাকর চিত্তাৎ পুষ্পাঞ্জলেবিচ্যুতৈঃ।
নীরব্রৈর্ম করন্দ সান্দ্রবুচির প্রস্যন্দনৈর্নন্দনে
যত্তানন্দময়াং তনুং বিতনুতে সোঽব্যাদ্ ভবন্তং ভবঃ॥"

আমার পরম পূজ্যপাদ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় ন্যায়শাস্ত্রে সর্ব্ববরেণ্য হইলেও কবিত্ব-শক্তিতেও অতুলনীয় ছিলেন। কিন্তু তিনি যাদবে-শ্বরকে অসঙ্কোচে বলিয়াছেন, "প্রকৃত কবিত্বশক্তি তোমারই আছে, আমরা কখনও কখনও দুই একটা কবিতা করি।" ন্যায়রত্ন মহাশয়, যাদবেশ্বরের কবিতা এত ভালবাসিতেন যে, মৃত্যুশয্যায় যাদবেশ্বর তাঁহাকে দেখিতে আসিলে ভগ্ন-কণ্ঠে আমাকে বলিয়াছিলেন, "ভায়ার সেই কবিতাটী পড়ত।" আমি আবৃত্তি করিলাম—

"আবৃণু কুচগিরিমুচ্চৈঃ পশ্চাদাগচ্ছতীহ গিরিধারী।
ইতি সখ্যা ভণিতেন স্মেরমুখী জয়তি সা রাধা॥"

—(রত্নকোষ কাব্য)

ন্যায়রত্ন মহাশয়, যাদবেশ্বরের কবিত্ব-শক্তিতে এতই মুগ্ধ ছিলেন যে, তাঁহার নিজ বাটীতে মহামহোপাধ্যায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী প্রমুখ খ্যাতনামা পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া এক সভা করেন ও সেই সভায় যাদবেশ্বরকে 'কবি-সম্রাট্' উপাধি দেন। এই উপলক্ষে ন্যায়রত্ন মহাশয় নিম্নলিখিত শ্লোকটী রচনা করিয়াছিলেন,—

"নবকাব্যচয়ঃ কৃতস্ত্বয়া
দ্বিজ বিদ্বদ্বর যাদবেশ্বর।
ইতি সৎসমিতৌ ময়াহপ্ত তে
কবিসম্রাড়ুপনাম দীয়তে॥"

যাদবেশ্বর, নানা শাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত ও সংস্কৃত ভাষায় অনন্যসাফল্য কবিত্বশক্তি সম্পন্ন হইলেও মাতৃভাষাকে বিস্মৃত হন নাই। তিনি বঙ্কিম যুগ হইতে চিরকাল বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়াছেন। "আর্য্যদর্শন," "বেদব্যাস," "পারিজাত," "সাহিত্য," "সাহিত্য-সংহিতা," "রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা," "অর্চ্চনা," "প্রবাসী," "ভারতবর্ষ," "মানসী ও মর্ম্মবাণী", "নারায়ণ" প্রভৃতি পত্রিকায় নানা বিষয়ে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার "তন্ত্রের প্রাচীনত্ব" প্রবন্ধ এতই উপাদেয় হইয়াছিল যে, কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি উড্রফ সাহেব তাহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাদবেশ্বর দুই বার সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন। প্রথম বার ১৩১৫ বঙ্গাব্দে বগুড়ায় আহুত উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের, দ্বিতীয় বার ১৩২০ বঙ্গাব্দে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কলিকাতার সম্মিলনে দ্বিতীয় দিন মূল সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপস্থিতিতে তিনি প্রধান সভাপতির কার্য্যও করিয়াছিলেন। এই উভয় সম্মিলনের অভিভাষণেই যাদবেশ্বরের অপূর্ব্ব চিন্তাশীলতা ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণে তিনি লিখিয়াছিলেন,—

"ভারতেও এক দিন বিজ্ঞানের সমধিক চর্চ্চা ছিল, ইহার নিদর্শন বেদে আছে, উপনিষদে আছে, স্মৃতিতে আছে, কাব্য পুরাণে আছে। দুর্ভাগ্যের পেষণে আমরা আজ বিজ্ঞানহীন হইয়া পড়িয়াছি। তান্ত্রিক যোগে সম্মোহন-বিদ্যার প্রাদুর্ভাব ছিল, মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাজাধিরাজকে পর্য্যন্ত যথেচ্ছ কার্য্য করাইতে কাপালিকের সামর্থ্য ছিল, অলৌকিক ব্যাপার সম্পাদন করিয়া, তান্ত্রিক যোগী জগৎকে বিস্মিত ও বিমোহিত করিতেন। আজিও যখন আয়ুর্ব্বেদ মতে "মকরধ্বজে"র মত রাসায়নিক ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভস্ম করা যাইতেছে, এখনও যখন লৌহবিষ্ঠায় ব্যবহৃত "মণ্ডুর" শব্দ, কাচ অর্থে "ক্ষারক" শব্দ ও ব্যোমযান বুঝাইতে "বিমান" শব্দ এবং এইরূপ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমর্থক অন্যান্য শব্দ সংস্কৃতকোষে ও সাহিত্যে দেখিতে পাই, তখন কি করিয়া বলিব, ভারতে বিজ্ঞানের উপাসনা হয় নাই? গ্রীক ভ্রমণকারীরাও এ বিষয়ে অনেকটা সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। কিন্তু "কবে ঘি খাইয়াছে, এক্ষণে হাতে ঘিয়ের গন্ধ দেখাইয়া লাভ কি" এই আভাণকের উল্লেখ করিয়া বলিতেছি, এক্ষণে রসায়ন বিজ্ঞানের প্রভাবে যখন সত্য সত্যই ইয়ুরোপ সমুন্নত, তাঁহাদিগের সাহিত্য সমধিক স্ফীত, তখন তাহা হইতে গ্রহণ করিয়া আমাদের সাহিত্যে—বঙ্গসাহিত্যে সেই রসায়ন, সেই বিজ্ঞান নিবেশিত করা কর্ত্তব্য।"

আজ কাল বঙ্গসাহিত্যের ভাষা লইয়া নানা আলোচনা হইতেছে। যাদবেশ্বর বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য-শাখার অভিভাষণে লিখিয়াছিলেন,—

"বৈষ্ণব সাহিত্য এক সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া উৎকল, বিহার ও কামরূপকে বাঙ্গালার ভিতরে টানিয়া আনিয়াছিল। আজ ২।১ জন গ্রন্থকারের প্রাদেশিক ভাষায় রচিত গ্রন্থ দেখিয়া তাহারা পৃথক্ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা দেশের সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য, চিন্তা করিবার বিষয়। প্রাচীন ভারতেও প্রাদেশিক কথ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত ভাষা ছিল। তৎসত্ত্বেও সম্রাট্ অশোক ভিন্ন তৎ তৎ দেশের নৃপবৃন্দ রাজকীয় কার্য্যে সেই সেই ভাষার ব্যবহার করিতেন

না। করিতেন না বলিয়া আজ আমরা তাঁহাদিগের প্রদত্ত তাম্রশাসন দেখিয়া মন্দিরে, স্তম্ভে, গিরিগাত্রে ও গিরি-গুহায় উৎকীর্ণ শ্লোকমালা বিলোকন করিয়া প্রত্নতত্ত্বাবধারণে সাহসী ও সমর্থ হইতেছি।

"পঠদ্দশায় প্রখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় অধ্যাপক বাল শাস্ত্রীর সহিত আমি সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তিনি সংস্কৃতে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন, "আপনার সংস্কৃতে বলিতে হইবে না। বাঙ্গলায় বলিলেই আমি বুঝিব। অন্য প্রাদেশিক ভাষার মত বাঙ্গলা ভাষা দুর্বোধ্য নহে। সংস্কৃত শব্দ বহুল বাঙ্গালা ভাষা সুখবোধ্য। বাঙ্গালা ভাষায় কেবল সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত বিভক্তি কয়েকটি নাই; আর সমস্ত আছে।" সেই মহাপণ্ডিতের মুখে এই ভাবে বাঙ্গালা ভাষার প্রশংসা শুনিয়া তদবধি আমার বাঙ্গালা ভাষার উপরে শ্রদ্ধা ভক্তি জন্মে। তদবধি আমি বাঙ্গালা ভাষার যথাশক্তি সেবা করিবার জন্য আত্মোৎসর্গ করি।"

যাদবেশ্বর বঙ্গভাষায় একজন উচ্চ শ্রেণীর বাগ্মী ছিলেন। তিনি নানা দেশে নানা সভায় বহু বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহার কণ্ঠধ্বনিও ছিল জলদনির্ঘোষের ন্যায়। কেবল বাঙ্গালা গদ্যে নহে,—বাঙ্গালা কবিতা রচনায়ও তাঁহার অদ্ভুত শক্তি ছিল। তাঁহার অন্তরঙ্গ মাত্রেই বোধ হয় জানেন যে, তাঁহার পত্নীর নামে প্রচারিত "দ্রৌপদী" কাব্যের রচয়িতা যাদবেশ্বর স্বয়ং। এই কাব্য আগাগোড়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। প্রসিদ্ধ সমালোচক কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখ সাহিত্যিকগণ এই কাব্য পাঠ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, "মেঘনাদ বধে"র পর এইরূপ প্রসন্ন গম্ভীর কাব্য আর বাহির হয় নাই। বিখ্যাত কবি, জজ বরদাচরণ মিত্রের সহিত তিনি বিদ্যাপতির ভাষা ও ছন্দে পরস্পর বহু পত্র-ব্যবহার করিয়াছিলেন।

কথা-সাহিত্য রচনায়ও আমরা যাদবেশ্বরের শক্তির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি "ভারতবর্ষ" পত্রে একাদশী-তত্ত্ব" নামে যে গল্প লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া বঙ্গের সর্ব্ব প্রধান গল্পলেখক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে পত্র লেখেন যে, "আপনার গল্পে স্নানের ঘাটে' পরিচ্ছেদ পড়িয়া হাত কামড়াইতে ইচ্ছা করে।" মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি আমার অত্যন্ত অনুরোধে "বঙ্গসাহিত্য" পত্রে প্রকাশের জন্য "অশোক" উপন্যাস লিখিতেছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, তিনি আর সে উপন্যাস সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই।

বঙ্গসাহিত্যে সমালোচনা-ক্ষেত্রেও তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। তিনি নাম না দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসিদ্ধ উপন্যাস "মৃণালিনী"র এক সুবিস্তৃত সমালোচনা-পুস্তক প্রকাশ করেন। এই সমালোচনায় তাঁহার অদ্ভুত অন্ত-র্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। "প্রবাসী"তে "দেশী ও বিলাতী"র সমালোচনায়—"সাহিত্যে" "ব্যাকরণ-বিভী-ষিকা"র সমালোচনায় যাদবেশ্বর প্রভূত বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন।

যাদবেশ্বর কেবল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বা শক্তিশালী সাহি-ত্যিক ছিলেন না—তিনি স্বাদেশিকতাতেও অদ্বিতীয় ছিলেন। এই স্বাদেশিকতা তাঁহার স্বধর্ম্মপরায়ণতারই বিকাশ বলিয়া মনে হয়। যাদবেশ্বর, প্রথম স্বদেশী যুগে বক্তৃতাদির জন্য কোনও কোনও রাজপুরুষের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার নাম রংপুরের স্পেশাল কনষ্টেবল রূপে ঘোষিত হয়। কিন্তু গ্রিয়ার্সন, বিভারিজ, স্ক্রাইন, মেরেডিথ, বোর্ডিলন প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজ-পুরুষগণের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। স্বর্ণ জুবিলীর সময় ভাইসরয়ের দরবারে তিনি মহামহোপাধ্যায় না হইলেও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের সহিত তুল্য আসনে বসিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক-কালে তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে Certificate of honour পাইয়াছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যাদবেশ্বর 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হন।

রংপুরের জনহিতকর নানা কার্য্যে তিনি জড়িত ছিলেন। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইবার পূর্ব্বে তিনি স্কুল কমিটীর মেম্বার। যাদবেশ্বর রংপুরের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ডের মেম্বর, মিউনিসিপালিটীর কমিশনার ও প্রথম শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ প্রত্যেক কার্য্যে ইঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে ও মিউনিসিপালিটীতে তিনি বহুবার নিরপেক্ষ স্বাধীন মত

প্রচার করিতে ভীত হন নাই। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি জয়ী হইতেন।

কলিকাতা সংস্কৃত পরীক্ষা বোর্ডের সৃষ্টি অবধি যাদবেশ্বর উপাধি-পরীক্ষায় পরীক্ষক ছিলেন। তিনি ঢাকা বিভাগের টেক্সট্ বুক কমিটীরও মেম্বর ছিলেন। ফলতঃ দেশের প্রত্যেক হিতানুষ্ঠানের সহিতই তাঁহার সম্বন্ধ ছিল। রংপুর-শাখা-সাহিত্য-পরিষদ্‌ও তাঁহারই সভাপতিত্ব কালে মূল পরিষদ্ হইতেও যশস্বী হইতে সমর্থ হইয়াছিল।

গত ৭ই ভাদ্র শনিবার বেলা ১১৷৷৹ টার সময়ে সর্ব্বতোবিসারি-প্রতিভাসম্পন্ন এই মহাসত্ত্ব পণ্ডিতপ্রকাণ্ড কাশীতে দেহত্যাগ করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আজ তাঁহার অভাবে দেশ যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইল, জানি না তাহার আর পূরণ হইবে কি না।

বাঙ্গালা কথা-সাহিত্য ও বঙ্কিমচন্দ্র।

[শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল বি-এল]

আজ কাল অনেককেই কথায় কথায় বলিতে শুনা যায়, আমাদের দেশে প্রকৃত সমালোচক নাই। বাস্তবিক, কথাটার ভিতর যে যথেষ্ট পরিমাণে সত্য আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার উপায় নাই। প্রায়ই দেখা যায়, কোন সমালোচক কোন একজন লেখক বা লেখিকার প্রশংসা করিতে বসিয়া অপর দুই চারি জনের মুণ্ডপাত করিবেনই। কিছুদিন আগে বোধ করি 'মাসিক বসুমতী'তে ধ্রুবতারা প্রভৃতির খ্যাতনামা লেখক শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সিংহ কর্ত্তৃক শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর 'মা' উপন্যাস খানির সমালোচনা দেখিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি আসল কথা বলিবার অনেক আগেই প্রায় দেড় কলম ধরিয়া শুধু শরৎ বাবু প্রমুখ অনেক লেখকের মুণ্ডপাত করিয়া গিয়াছেন। এ দোষটা আমাদের সমালোচক সম্প্রদায়ের যেন একেবারেই মজ্জাগত হইয়া পড়িতেছে।

গত শ্রাবণ মাসের 'অর্চ্চনা'য় একটী প্রবন্ধ পড়িলাম; শ্রীযুত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন কবিরাজ মহাশয় লিখিত 'বাঙ্গালা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র'। লেখক মহাশয় স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের নানা গুণরাশির ব্যাখ্যা করিতে করিতে হঠাৎ এতই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন যে, তাঁহার তুলনায় আধুনিক উপন্যাস লেখকদের গালি পাড়িয়াও তৃপ্ত হন নাই; বেচারাদের অন্ন মারিবার সঙ্কল্প করিয়া বলিতেছেন,—"বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেরই ইহা মনে করিয়া ঐ সকল গ্রন্থ দূরে পরিহার করা কর্ত্তব্য।" হয়ত কবিরঞ্জন মহাশয় মনে করিতেছিলেন, বঙ্কিম বাবুর লেখার আলোচনা করিতে করিতে যদি দুই চারিটি বাণ আধুনিক নবেলিষ্টদের উপর নিক্ষেপ করা না গেল, তবে ত' তাঁহার সকল আলোচনাই ব্যর্থ হইল! তাই তিনি এইটুকু করিয়া তাঁহার লেখার সম্পূর্ণতা বজায় রাখিলেন।

সমালোচক মহাশয় এক স্থানে বলিতেছেন,—"ভারতচন্দ্র যে সময় বিদ্যাসুন্দর লিখিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর স্ত্রীজাতি তখন লেখা পড়ার ধার ধারিতেন না, কাজেই বিদ্যাসুন্দরের শ্লীলতা বিগর্হিত কবিতাগুলি তাঁহাদের কোমল প্রাণে একটা বিকট উন্মাদনাও আনিয়া দিত না।" সুন্দর যুক্তি! কবিরঞ্জন মহাশয়কে এইখানে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, তখন স্ত্রীজাতি লেখা পড়ার ধার না ধারিলেও অর্দ্ধশিক্ষিত অপরিণতবুদ্ধি তরুণ যুবকও কি তখন দেশে ছিল না? না, তাহারা সকলে এতই রুচিবাগীশ ছিল যে, বিদ্যাসুন্দরের মত অশ্লীল রচনার কাছেও ঘেঁসিত না? তা ছাড়া, ঐ বিদ্যাসুন্দরের যাত্রাভিনয় করিয়া অশিক্ষিতা মেয়েদের যে শোনানো হইত, তাহার জবাবদিহি করিবার কিছু আছে কি? তারপর, আর একটা নূতন কথা লেখক মহাশয় শুনাইয়াছেন,—"বাঙ্গালী রমণীর স্বাস্থ্যহানি, বাঙ্গালী যুবক-দলের স্বাস্থ্যের অপচয়—বাঙ্গালী জাতির অকালমৃত্যু—এখন যতগুলি কারণে ঘটিতেছে—বাঙ্গালা সাহিত্যের কণ্টক স্বরূপ এখনকার বাঙ্গালা নবেলগুলি যে তাহার অন্যতম কারণ—ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।" কিন্তু লেখকমহাশয়ের মুক্তকণ্ঠের সহিত দেশের আর কয়জন চিন্তাশীল ব্যক্তি কণ্ঠ মিলাইতে পারেন, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এদিক্ দিয়া দেখিলে বলিতে হয়, আজকাল তরুণ যুবকেরা যখন স্কুল ছাড়িয়া প্রথমে কলেজে প্রবেশ

করে, তখন তাহাদের পাঠ্যপুস্তকরূপে যে সমস্ত সংস্কৃত এবং ইংরাজী কাব্য পড়িতে দেওয়া হয়, তাহাও উঠাইয়া দেওয়া উচিত। কবিরঞ্জন মহাশয় কি বলেন?

লেখক এক স্থানে বলিতেছেন,—"বঙ্কিম বাবু যাহা বাঙ্গালীকে দিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার খাঁটী জিনিষ—সমাজের নিখুঁত চিত্র।" বেশ কথা! কিন্তু বঙ্কিম বাবুর সময়ের সমাজ ও আজ-কালকার সমাজে যথেষ্ট প্রভেদ হইয়াছে। অথচ, মজার কথা এইটুকু যে, আজ যদি কোন নবেলিষ্ট ইংরাজী শিক্ষিতা ইংরাজী আদব-কায়দায় গঠিতা এমন এক নারীর প্রেম-চিত্র আঁকেন, অমনি এই শ্রেণীর সমালোচকবৃন্দ সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিবেন,—ঐ দেখ, বাঙ্গালা সাহিত্যের ভিতর ইংরাজী কামের উন্মাদনা! তা ছাড়া, নবেল লেখার অর্থ যে শুধু আদর্শ পুরুষ এবং আদর্শ নারীর চরিত্র আঁকিয়া যাওয়া নহে, এই সহজ এবং পরম সত্য কথাটা আজও পর্য্যন্ত ইঁহাদিগকে বুঝান গেল না। ভাষার ভিতর দিয়া যদি একটী রক্ত-মাংসে-গড়া মানুষকে পাঠক-পাঠিকার চোখের সামনে ধরিতে পারা যায়, তাহা হইলে আর্টের দিক দিয়া তাহা যতটা সফল হয়, একটা আদর্শ পুরুষ বা নারীর চরিত্র কিছুতেই তত হয় না। এই সত্যটী সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অধিকাংশ চরিত্রের ভিতর দেখাইয়া গিয়াছেন। সেই জন্যই তিনি স্বামীগতপ্রাণা সূর্য্যমুখীকে স্বামীর সহিত কুন্দর বিবাহ দিবার পর গৃহত্যাগ করাইয়াছেন; এবং এইজন্যই ভ্রমরের দুর্জ্জয় মানের চিত্র আঁকিয়াছেন। এই দুটী শ্রেষ্ঠ নারী-চরিত্রের ভিতর ঐ একটু করিয়া কালো ছায়া টানিয়া না দিলে কখনই তাহা আর্ট হিসাবে উপভোগ্য হইত না। কেন না, কালোর পাশে যে আলো, তাহার সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না। হুবহু দেব-দেবীর চিত্র ও অনর্গল উপদেশাবলী সমাজের পক্ষে যত হিতকর হোক বা না হোক, আর্টের আসরে তাহাদের স্থান যে অনেক নীচে, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

লেখক বলিতেছেন,—"বঙ্কিমচন্দ্রের 'শৈবলিনী' খুব স্বাভাবিক চিত্র।" এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমাদের মত-ভেদ ত নাই-ই, বরং আমার মনে হয়, আর্ট হিসাবে এক কপালকুণ্ডলা ছাড়া বঙ্কিম বাবুর কোন নারী-চরিত্রই শৈবলিনীর সমকক্ষ নহে। কিন্তু, একথাও বোধ হয় জোর করিয়া বলা যাইতে পারে, যদি আধুনিক নবেলিষ্টদের ভিতর কেহ শৈবলিনীর মত অমনি একটি চরিত্র আঁকিয়া যান, এবং বঙ্কিম বাবুর মত তাহাকে পাপীয়সী বা পাপিষ্ঠা আখ্যা না দেন, তাহা হইলেই কবিরঞ্জনের মত সমালোচকগণ সেই নবেলিষ্টের মাথায় লাঠিবাজি করিতে এতটুকু 'কিন্তু' করেন না। যদি কেবল পতিপরায়ণা সতী এবং আদর্শ প্রেমিকার চিত্র আঁকার নাম উপন্যাস-কলা হয়, তাহা হইলে বঙ্কিম বাবু যত বড়ই হোন, তাঁহার এই 'শৈবলিনী' চিত্রকে কোন মতেই সমর্থন করা চলে না। লেখক বলিতেছেন,—শৈবলিনী যে "প্রতাপের জন্য কলঙ্কের পসরা মাথায় লইতে কুণ্ঠিতা হয় নাই, তাহাও কিন্তু প্রেমের প্রকারভেদ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। শৈবলিনীর সেই অবস্থা, ব্রজাঙ্গনাগণের ভাবেরই অভিব্যক্তি মাত্র।" অগত্যা তাহা না বলিয়া আর উপায় কি! শৈবলিনীর এই পাপ-প্রেম যখন কোন মতেই সমর্থন করা গেল না, তখন ব্রজাঙ্গনা-গণের প্রেমের দোহাই পাড়িয়া লেখক মহাশয় সকলের মুখ বন্ধ করিতে চেষ্টা করিবেন বৈ কি! কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, এই সঙ্কোচ—এই যুক্তি হাতড়াইয়া বেড়াইবার কিছু প্রয়োজন আছে কি? এইটুকু বলিলেই কি যথেষ্ট হয় না যে, শৈবলিনী দেবী নহে, সে বাঙ্গালী সমাজের এক হত-ভাগিনী দুর্ব্বলা রমণী মাত্র!

অবশ্য, একথা বলিতে চাহি না যে, অধুনা বাঙ্গালা ভাষায় যত উপন্যাস বাহির হইতেছে, তাহাদের কাহারো বিরুদ্ধে কিছুই বলিবার নাই। এ কথাও স্বীকার করি না যে, আধুনিক বস্তু-তন্ত্রের যুগে শুধু ঐ Realism-এর দোহাই দিয়া যাহা কিছু লেখা হইবে, তাহাই মস্ত আর্ট। রাজনৈতিক-ক্ষেত্রের মত আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রেও আজ-কাল দুই চরমপন্থী দলের সৃষ্টি হইয়াছে। একদল যেমন আদর্শ আর সমাজ শিক্ষা করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন, অপর পক্ষও তেমনি বিশ্ব-সাহিত্যের ধুয়া ধরিয়াছেন। দু'য়ের চাপে পড়িয়া প্রকৃত নিরপেক্ষ সমালোচনা জিনিষটা ক্রমেই বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে উঠিয়া যাইতেছে। কিন্তু, আর যিনি যাহাই বলুন, বাঙ্গালা সাহিত্যের এই উন্নতির দিনে

যদি এ কথাটাও সাহিত্যিকদের বুঝাইয়া দিতে হয় যে, কেবল মাত্র সমাজের উন্নতি এবং নীতির উপদেশ আওড়ান ছাড়াও কথা-সাহিত্যের ভিতর আর্টের একটা বিশিষ্ট সত্ত্বা আছে, তাহা হইলে সেটা আমাদের সাহিত্যেরই কলঙ্ক নহে কি? প্রত্যেক লেখার ভিতর যে একটা moral, একটা বাঁধাবাঁধি উদ্দেশ্য থাকিবে, তার কোন লেখা পড়া নাই, বরং না-থাকাটাই ভাল বলিয়া মনে হয়। যেহেতু শরৎ বাবু তাঁহার উপন্যাসে একজন পতিতা নারীর হৃদয়ের কতকগুলি গুণের পরিচয় দিয়া একটী চিত্র আঁকিয়াছেন, সুতরাং তিনি যে গণিকা-সম্প্রদায়কে মনোরম করিয়া দেখাইয়া সমাজের অধঃপতনের সূচনা করিতেছেন, এরূপ মনে করার মত ভুল যুক্তি আমি খুঁজিয়া পাই না। পতিতার পঙ্কিল হৃদয়ের এক কোণে যে আলোকের বিকাশ, আর্টের বাজারে তাহার দাম অনেক। শরৎবাবুর আগেও দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার 'পরপারে' নাটকে এবং তৎপূর্ব্বে গিরিশচন্দ্রও তাঁহার 'সৎনামে' এই চিত্র দেখাইয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে। গণিকার প্রেমের কথা পড়িয়া যদি কোনও যুবক গণিকা-ভক্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সে দোষ লেখকের নহে; তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সেই ধরণের যুবকবৃন্দ সংসারের এই ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝে দাঁড়াইয়া মানুষ হইবার একান্ত অনুপযুক্ত; সে সকল হীনবুদ্ধি ছেলে-দের জন্য হা-হুতাশ করিতে হইবে, আশা করি বাঙ্গালী সমাজ এখনো ততটা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে নাই। শুনিতে পাওয়া যায়, খ্যাতনামা অভিনেত্রী 'সুশীলা'র অভিনয় দেখিয়া একবার কোন ছেলে হতাশায় গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিয়াছিল; তাহার জন্য বাঙ্গলা হইতে অভিনয়-কলাকে নির্ব্বাসিত করা হইল কি? না, করিলেই ভাল হইত? দোষটা কাহার? আর্টের, না, যে সমস্ত নির্ব্বোধ ছেলে-মেয়ে সেই আর্টের অপব্যবহার করে, তাহাদের?

মোট কথা, চারিদিক হইতে সমাজ এবং নীতির কঠিন বাঁধনের চাপে সাহিত্য কখনই বড় হইতে পারে না। বঙ্কিম বাবু যাহা দিয়াছেন, তাহা বঙ্কিম বাবুর বিশেষত্বই থাকিবে; সকলেই যদি বঙ্কিম বাবুর মত চিত্র আঁকিবার প্রয়াস করিত, তাহা হইলে তাহা ক্রমশঃ অনুকরণের ব্যাপার হইয়া উঠিত। এই অত্যধিক পুরাতন-প্রীতি এবং একগুঁয়েমির ভিতর বিশেষ কোন তফাৎ দেখি না। লেখককে আপন কল্পনারাজ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে ও আপন ভাবরাশি স্বাধীন ভাবে ব্যক্ত করিতে দেওয়া চাই; অবশ্য, তাহারও একটা সীমা থাকা দরকার। তবে, সে সীমার গণ্ডী যে কত দূরে টানা হইবে, সে সম্বন্ধে রীতিমত মতভেদ চলিতেছে। সে আলোচনার স্থান এখানে নয়।

পার্ব্বণ।

[শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়]

পর্ব্বদিনে যে সকল ব্রত পূজাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহার নাম পার্ব্বণ। 'পর্ব্ব' শব্দ পৃ ধাতু (পূরণ করা) হইতে নিষ্পন্ন (পৃ + বন্)। যাহা কাল বিশেষ সম্বন্ধে পূরণ করে অর্থাৎ সন্ধি—সম পদার্থদ্বয়ের যোগস্থল তাহার নাম পর্ব্ব। দুই চান্দ্র মাসের সংযোগ দিন অমাবস্যা ও পূর্ণিমা, সুতরাং ইহারা এক একটি পর্ব্ব। এইরূপ দুই যুগের সংযোগ দিন, মন্বন্তরার সংযোগ দিন, দুই বৎসর, ঋতু, অয়ন প্রভৃতির সংযোগ দিন, সকলই এক একটি পর্ব্ব। বৈদিক যুগে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবার জন্য বৎসরাদি কাল গণনার সূত্রপাত হইয়াছিল, অথবা কাল গণনা করিবার জন্য যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা হইত, তাহা নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না বটে; তবে দেখা যায়, বৎসরাদি গণনার একটা হিসাব রাখিবার জন্য প্রতি পর্ব্ব দিনে যজ্ঞ বিশেষের অনুষ্ঠান করা হইত। যাগকারী পুরোহিতগণের নাম ঋত্বিক। 'ঋত্বিক' শব্দ 'ঋতু' শব্দ হইতে উৎপন্ন (ঋতু + যজ্ + ক্বিপ) অর্থাৎ যিনি প্রতি ঋতুতে (পর্ব্ব দিনে) যাগ

করেন। তৈত্তিরীয় সংহিতায় যজ্ঞ ও সম্বৎসর একার্থ-বাচক।—"যজ্ঞো বৈ প্রজাপতিঃ"—"সম্বৎসরঃ প্রজাপতিঃ।" পর্ব্ব দিনে অর্থাৎ প্রতি মাস, বৎসর, ঋতু প্রভৃতির আরম্ভ দিনে যজ্ঞ-বিশেষের অনুষ্ঠান করা ব্যতীত তখনকার যুগে আর্য্য ঋষিগণের মাস বৎসরাদির হিসাব রাখিবার অন্য উপায়ও বিদ্যমান ছিল না। কাজেই এই পার্ব্বণের সূত্রপাত। মনুর সময়েও দেখা যায়, পর্ব্ব দিনেই যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা হইত। মনুসংহিতায় কথিত আছে;—

"অগ্নিহোত্রঞ্চ জুহুয়াদাদ্যন্তে দ্যুনিশোঃ সদা।
দর্শেন চার্দ্ধমাসান্তে পৌর্ণমাসেন চৈব হি॥
শস্যান্তে নবশস্যেষ্ট্যা তথর্ত্ত্বন্তে দ্বিজোঽধ্বরৈঃ।
পশুনাত্বয়নস্যাদৌ মাসান্তে সৌমিকৈর্মখৈঃ॥"

অর্থাৎ দিবা ও রাত্রির প্রথমে ও শেষে অগ্নিহোত্র যাগ করিবে। কৃষ্ণপক্ষ পূর্ণ হইলে দর্শ নামক এবং পূর্ণিমাতে পৌর্ণমাস নামক যজ্ঞ করিবে। নূতন শস্য প্রস্তুত হইলে আগ্রয়ণ, ঋতু পূর্ণ হইলে চাতুর্ম্মাস্য, অয়নের প্রথমে পশু যাগ এবং বৎসর পূর্ণ হইলে সোমরস সাধ্য অগ্নিষ্টোমাদি যাগ করিবে।

অধুনা আমাদের সেই বৈদিক যাগ তপাদি আর নাই, এখন আমরা পৌরাণিক ব্রত পূজাদিরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। কথায় আছে,—"বার মাসে তের পার্ব্বণ" অর্থাৎ আমাদের ব্রত পূজাদির সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। এই বহু-সংখ্যক ব্রত পূজাদির সকলগুলিই যে পর্ব্ব দিনে অনুষ্ঠিত এমন কথা বলা যায় না বটে; তবে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, ব্রত পূজাদির অধিকাংশ পার্ব্বণ অর্থাৎ পর্ব্ব দিনকে লক্ষ্য করিয়া অনুষ্ঠিত। বৈদিক যুগে কাল গণনা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে পূর্ণিমান্ত চান্দ্রমাস গণনার সূত্রপাত হয়। তারপর বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সময় হইতে অমান্ত চান্দ্রমাস গণনা করা হইতে থাকে; এবং অধুনা আমরা সৌর মাস গণনা করিয়া থাকি। সূর্য্যের গতি অনুসারে এখন আমরা মাস বৎসরাদি গণনা করি বটে; কিন্তু সেই বৈদিক চান্দ্রমাস গণনাকে এখনও আমরা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। পূর্ণিমান্ত চান্দ্রমাসে এখন আমরা যাবতীয় ব্রত পূজাদি এবং অমান্ত চান্দ্রমাসে শ্রাদ্ধাদি পিতৃকৃত্য করিয়া থাকি। আবার অয়ন বিন্দুর পরিবর্ত্তন হেতু বৈদিক যুগ হইতে একাল পর্য্যন্ত কয়েকবার বৎসরাদি গণনার পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, ফলে পর্ব্ব দিন গুলিও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা কিন্তু যেমন প্রাচীন চান্দ্রমাস গণনাকে পরিত্যাগ করি নাই, সেইরূপ প্রত্যেক পরিবর্ত্তনের পর্ব্বদিনগুলিকেও বজায় রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছি; ফলে আমাদের 'বার মাসে তের পার্ব্বণ' হইয়া পড়িয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বৈদিক যুগে পূর্ণিমান্ত চান্দ্রমাস গণনার রীতি ছিল, এবং অধুনা আমরা এই পূর্ণিমান্ত মাসেই ব্রত পূজাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। সুতরাং এই প্রাচীন পর্ব্বদিন সম্বন্ধে আলোচনায় যে সকল মাসের উল্লেখ করা হইবে, সেগুলি পূর্ণিমান্ত চান্দ্রমাস বলিয়াই বুঝিতে হইবে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে চৈত্র পূর্ণিমাতে বৎসরারম্ভ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ দিন ঐ যুগের উত্তরায়ন দিন। চৈত্র মাসে উত্তরায়ন হইলে আশ্বিন মাসে দক্ষিণায়ন হয় এবং আষাঢ় ও পৌষ মাসে বিষুব সংক্রমণ ঘটিয়া থাকে। এই কয়টিই তখনকার সময়ের পর্ব্ব দিন। এই পর্ব্বদিনগুলির স্মৃতি রক্ষার্থ অধুনা আমরা চৈত্র শুক্লপক্ষে বসন্তোৎসব বা বাসন্তী পূজা এবং উহার বিপরীত অয়ন অর্থাৎ দক্ষিণায়ন আশ্বিন শুক্লপক্ষে শরদোৎসব বা শারদীয়া পূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। বিষুব-সংক্রমণ দিন-দ্বয়ে অর্থাৎ আষাঢ় ও পৌষ মাসের পূর্ণিমায় আমাদের যথাক্রমে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত ও শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক পার্ব্বণের অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে। আবার যখন অয়ন বিন্দু পিছাইয়া পড়ায় ফাল্গুনী পৌর্ণমাসীতে উত্তরায়ন হইতে থাকে, তখন ফাল্গুন মাস বৎসরের আদি মাস বলিয়া পরিগণিত হয়; এবং ইহারই স্মৃতি রক্ষার্থে বোধ হয় আজও পর্য্যন্ত আমরা ফাল্গুন-পূর্ণিমায় বহ্ন্যুৎসব, ও হোলি বা শ্রীকৃষ্ণের দোল-যাত্রায় উৎসব করিয়া থাকি। ফাল্গুন মাসে উত্তরায়ন হইলে ভাদ্র মাসে দক্ষিণায়ন হইয়া থাকে। সুতরাং দক্ষিণায়ন আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ ভাদ্র পৌর্ণমাসী দিনের ঠিক পর দিন হইতে এক পক্ষ কালকে আমরা পিতৃ বা অপর পক্ষ নামে অভিহিত করিয়া প্রতিদিন পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের

অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। অধুনা প্রতিদিন পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া প্রায় সকলেই প্রত্যহ তিল তর্পণ ও কেবল অমাবস্যার দিন মহালয়া পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ পৌর্ণমাসী „এই সময়ের বিষুব সংক্রমণ,—এ কারণ ঐ দিন আমাদের জগন্নাথদেবের স্নান-যাত্রা। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সময়ে দেখা যায়, মাঘ মাসের শুক্ল প্রতিপদে উত্তরায়ন বা বৎসরারম্ভের দিন পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল। এই সময় অমান্ত মাস গণনার রীতি প্রচলিত হয় বলিয়া শুক্ল প্রতিপদ হইতে বৎসর গণনা হইতে থাকে। আজ কাল মাঘ মাসে আমাদের যে বসন্তোৎসব করা হয়, তাহা এই যুগেরই বসন্তোৎসব ;—বাসন্তী পঞ্চমী বা শ্রীপঞ্চমী। আবার এই হিসাবে মাঘী পূর্ণিমা যেমন একটি পার্ব্বণ, অপর পক্ষে দক্ষিণায়ন শ্রাবণ পূর্ণিমায় তেমনি রাখি-বন্ধন ; মাঘ শুক্লষষ্ঠীতে শীতলা ষষ্ঠী অপর দিকে শ্রাবণ শুক্ল ষষ্ঠীতে লুণ্ঠন ষষ্ঠী। ইহা আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া মনে করা যায় না। বৈদিক যুগে প্রধানতঃ উত্তরায়ন হইতেই বৎসর গণনা করা হইত বটে, তবে আর্য্য ঋষিগণ মধ্যে অন্য রূপে বৎসর গণনা করিবারও যে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এরূপও উল্লেখ পাওয়া যায় ; কিন্তু সেরূপ গণনা অধিক দিন স্থায়ী হইতে পায় নাই। বিশ্বামিত্র নাকি কিছু দিনের জন্য দক্ষিণায়ন কার্ত্তিক অমাবস্যা হইতে বৎসর গণনা আরম্ভ করেন। একারণ কার্ত্তিক অমাবস্যা একটি পর্ব্ব ;—আমরা দীপান্বিতা লক্ষ্মী পূজা, পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ ও গৃহ-প্রাঙ্গণাদি আলোকমালায় সজ্জিত করিয়া এই নূতন বৎসরেরই উৎসব করিয়া থাকি। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মতে এক কালে জ্যৈষ্ঠ শুক্ল দশমী বৎসরের আরম্ভ দিন ছিল। "জ্যৈষ্ঠস্য শুক্ল দশমী সম্বৎসরমুখী স্মৃতা। তস্যাং স্নানং প্রকুর্ব্বীত দানঞ্চৈব বিশেষতঃ।" বিষুব সংক্রমণ দিন অনুসারে এই বৎসর গণনা। ইহাও অধিক দিন স্থায়ী হইতে না পারিলেও, ইহা আমাদের এখন দশহরা পার্ব্বণ ;—এই দিন আমরা গঙ্গা ও মনসা পূজার অনুষ্ঠান করিয়া স্নান দানাদি কার্য্য করিয়া থাকি।

বৎসর ও অয়নারম্ভ দিনের ন্যায় মন্বন্তরা ও যুগোৎপত্তি দিনগুলিও এক একটি পার্ব্বণ। মন্বন্তরার দিন চৌদ্দটি। যথা,—

"অশ্বযুক শুক্ল নবমী দ্বাদশী কার্ত্তিকী তথা।
তৃতীয়া চৈত্রমাসস্য তথা ভাদ্র পদস্য চ॥
ফাল্গুনস্যাপ্যমাবস্যা পৌষস্যৈকাদশী তথা।
আষাঢ়স্যাপি দশমী তথা মাঘস্য সপ্তমী॥
শ্রাবণস্যাষ্টমী কৃষ্ণা তথাষাঢ়স্য পূর্ণিমা।
কার্ত্তিকী ফাল্গুনী চৈত্রী জ্যৈষ্ঠী পঞ্চদশী সিতা।
মন্বন্তরাদয়স্ত্বেতা দত্তস্যাক্ষয় কারিকাঃ॥"

আশ্বিন শুক্ল নবমী, কার্ত্তিক শুক্ল দ্বাদশী, চৈত্র ও ভাদ্র মাসের শুক্ল তৃতীয়া, ফাল্গুনের অমাবস্যা, পৌষের শুক্ল একাদশী, আষাঢ়ের শুক্ল দশমী, মাঘের শুক্ল সপ্তমী, শ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমী এবং আষাঢ়, কার্ত্তিক, ফাল্গুন, চৈত্র ও জ্যৈষ্ঠের পূর্ণিমা মন্বন্তরা। প্রত্যেক মন্বন্তরার দিনগুলি এখনও আমাদের পার্ব্বণ,—আমরা ঐ দিনে স্নান দানাদি ধর্ম্ম-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। তারপর যুগাদ্যার কথা।—

"বৈশাখ শুক্লপক্ষীয়াক্ষয়তৃতীয়ায়াং রবিবারে
সত্যযুগোৎপত্তিঃ।
কার্ত্তিকস্য শুক্লপক্ষে নবম্যাস্তিথৌ সোমবারে
ত্রেতাযুগোৎপত্তিঃ॥
ভাদ্র কৃষ্ণ ত্রয়োদশ্যাং বৃহস্পতিবারে
দ্বাপরযুগোৎপত্তিঃ।
মাঘীপূর্ণিমায়াং শুক্রবারে কলিযুগোৎপত্তিঃ॥"

বৈশাখ শুক্ল তৃতীয়ায় সত্যযুগ, কার্ত্তিক শুক্ল নবমীতে ত্রেতাযুগ, ভাদ্র কৃষ্ণ ত্রয়োদশীতে দ্বাপরযুগ এবং মাঘী পূর্ণিমায় কলিযুগ আরম্ভ হয়। মন্বন্তরার ন্যায় এই সকল দিন গুলিও পার্ব্বণ,—এই চারি দিনেও স্নান দানাদি ধর্ম্ম-কার্য্যানুষ্ঠান করা হইয়া থাকে। উপরন্তু বৈশাখ শুক্ল তৃতীয়ায় আমাদের অক্ষয় তৃতীয়ার ব্রত, জলপূর্ণ ঘটাদি দান, এবং কার্ত্তিক শুক্ল নবমীতে দুর্গা নবমী ব্রত, বঙ্গদেশে প্রচলিত জগদ্ধাত্রী পূজা।

যুগ বৎসরাদির আরম্ভ দিন যেমন এক একটি পর্ব্ব, মাস পক্ষাদির আরম্ভ দিনও সেইরূপ পর্ব্ব। যখন পূর্ণিমান্ত মাস গণনার রীতি ছিল, তখন প্রতি পূর্ণিমা এক একটি পর্ব্ব, তারপর যখন অমান্ত মাস গণনা করা হয়, তখন অমাবস্যাও

একটি পর্ব্ব। পূর্ণিমা ও অমাবস্যা এক হিসাবে যেমন মাসান্ত, অপর হিসাবে উহারা পক্ষান্ত; সুতরাং যে হিসাবেই ধরা হউক না কেন,—উহারা পর্ব্ব। মনুর সময়ে প্রতি পূর্ণিমায় পৌর্ণমাস এবং অমাবস্যায় দর্শ নামক যজ্ঞ করা হইত। অধুনা আমরা কয়েকটি পূর্ণিমায় রাস, ঝুলোন, স্নান,দোল প্রভৃতি উৎসব, এবং প্রত্যেক পূর্ণিমাকে পর্ব্ব হিসাবে পুণ্যাহ বিবেচনা করিয়া সত্যনারায়ণ পূজা ও বিবিধ স্নান পূজাদি ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। কৃষ্ণ পক্ষ পিতৃযজ্ঞের কাল, এ কারণ প্রতি অমাবস্যায় পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবার জন্য স্মৃতির আদেশ। ভবিষ্যপুরাণে কথিত আছে,—

"অমাবস্যাং যৎ ক্রিয়তে তৎ পার্ব্বণমুদাহৃতম্।
ক্রিয়তে বা পর্ব্বণি যৎ তৎ পার্ব্বণমিতি স্মৃতিঃ॥"

অমাবস্যা পর্ব্ব বা অপর পর্ব্ব দিনে এই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠেয় বলিয়াই ইহার নাম পার্ব্বণ। কৃষ্ণপক্ষ পিতৃযজ্ঞের কাল বলিয়া যে আমরা এই পক্ষে কোন দেবার্চ্চনা করি না, এমন নহে। জন্মাষ্টমী, সাবিত্রী চতুর্দ্দশী, শিবরাত্রি প্রভৃতি ব্রত কৃষ্ণপক্ষেই করা হইয়া থাকে। তন্ত্রের মতে অমাবস্যা শক্তিপূজার একটি প্রকৃষ্ট দিন। একারণ পর্ব্ব হিসাবেও বটে আর তন্ত্রের বিধি অনুসারেও বটে, প্রতি অমাবস্যায় আমরা কালী পূজা করিয়া থাকি। পুরাকালে আমাদের সপ্তাহ গণনার রীতি ছিল না,—পক্ষার্দ্ধই তখনকার দিনের সপ্তাহ। এ কারণ পক্ষার্দ্ধ অষ্টমী তিথিও একটি পর্ব্ব। অধুনা আমরা পূর্ণিমা অমাবস্যার ন্যায় প্রতি অষ্টমী তিথিতে ব্রত পূজাদির অনুষ্ঠান করি না বটে, কিন্তু স্মৃতির বিধি অনুসারে অষ্টমী একটি পর্ব্ব, সুতরাং পুণ্যাহ। শ্রাদ্ধ বিষয়েও অমাবস্যার ন্যায় অষ্টমী তিথিও একটি পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ কাল।

এত দূর কেবল প্রাচীন পর্ব্ব দিন সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল; এইবার আধুনিক পার্ব্বণ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। অধুনা বঙ্গ দেশে আর চান্দ্রমাস অনুসারে বৎসরাদি গণনা করা হয় না,—সৌর মাস অর্থাৎ সূর্য্যের এক এক রাশি ভোগ কাল লইয়া কাল গণনা করা হইয়া থাকে। সুতরাং সৌর মাসের পার্ব্বণ বঙ্গদেশের আধুনিক পার্ব্বণ। সূর্য্য এক রাশি হইতে অপর রাশিতে যেদিন গমন করেন, সেই দিনকে সংক্রান্তি বলা হয়। উহা একটি পার্ব্বণ। চৈত্র সংক্রান্তির দিন সূর্য্যের বিষুব সংক্রমণ,—ঐ দিন বঙ্গদেশের বৎসরারম্ভ; সুতরাং এই চৈত্র সংক্রান্তির দিন জলপূর্ণ ঘট দান, চড়ক পূজা প্রভৃতি পর্ব্বানুষ্ঠান; এবং বৎসরের আদি মাস বৈশাখের প্রত্যেক দিনই পুণ্যাহ বলিয়া বিবেচিত,—প্রতি দিনই স্নান দানাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা হয়। কেবল ইহাই নহে, প্রাচীন বহ্ন্যুৎসবের অনুকরণে বাঙ্গালার অনেক স্থলে ১লা বৈশাখ প্রভাতে গৃহ প্রাঙ্গণাদিতে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইয়া থাকে। চৈত্র সংক্রান্তিতে বিষুব সংক্রমণ হইলে আশ্বিন সংক্রান্তিতে অপর বিষুব সংক্রমণ ঘটিয়া থাকে। একারণ আশ্বিন সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিক মাসের প্রত্যেক দিন পুণ্যাহ বলিয়া গণ্য,—প্রত্যহই আমরা আকাশে দীপ দান ও বহুবিধ পুণ্যকার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকি। আষাঢ় সংক্রান্তি দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি; কাজেই ঐ দিন আমাদের চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ; এবং পৌষ সংক্রান্তি উত্তরায়ন সংক্রান্তি, এজন্য ঐ দিন আমাদের পায়স পিষ্টকাদি দ্বারা পৌষ পার্ব্বণের অনুষ্ঠান। এই চারিটি বিশেষ সংক্রান্তি ব্যতীত, প্রতি সংক্রান্তি দিনই মাসান্ত হিসাবে পর্ব্ব দিন; একারণ পূর্ণিমার ন্যায় সংক্রান্তির দিনগুলিও পুণ্যাহ,—প্রতি সংক্রান্তিতে আমরা সত্যনারায়ণ ব্রত পূজা ও স্নান দানাদি পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। কেবল ইহাই নহে, কোনও কোনও সংক্রান্তিতে আমরা বিশেষ বিশেষ ব্রত পূজাদিরও অনুষ্ঠান করিয়া থাকি; যেমন ভাদ্র সংক্রান্তিতে অরন্ধন ও বিশ্বকর্ম্মা পূজা, কার্ত্তিক সংক্রান্তিতে কার্ত্তিকেয় পূজা, ফাল্গুন সংক্রান্তিতে ঘণ্টাকর্ণ পূজা ইত্যাদি। ইহারা সকলই এক একটি পার্ব্বণ।

এত দূর পর্য্যন্ত যতগুলি পর্ব্বদিনে অনুষ্ঠেয় ব্রত পূজাদি উল্লেখ করা হইল, তদ্ব্যতীত আমরা আরও অনেকানেক ব্রত পূজাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। ইহাদের সকলগুলিকে কোনও না কোন হিসাবে পর্ব্ব দিনের মধ্যে ফেলিতে পারা যায় বটে; কিন্তু তাহা বিশেষ কষ্ট কল্পিত হয় বলিয়া উহাদিগকে পার্ব্বণ নামে অভিহিত করিলাম না। আমাদের

যাবতীয় তিথিকৃত্য ব্রত পূজাদির দিনগুলির পর্ব্বই একমাত্র হেতু নহে; একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, ইহার মধ্যে সময়োচিত অনুষ্ঠান, স্বাস্থ্যরক্ষা, পৌরাণিক ব্যক্তিগণের জন্মোৎসব ইত্যাদি বহুবিধ কারণ বিদ্যমান আছে। উদাহরণ স্বরূপ যেমন,—পিনীতকী দ্বাদশী, চম্পক চতুর্দ্দশী, তাল নবমী; ইহারা সময়োচিত অনুষ্ঠান, কেননা বৈশাখ মাসে জল দান, জ্যৈষ্ঠ মাসে চাঁপা ফুল, ভাদ্র মাসে তাল ইত্যাদি কালোপযোগী ব্যবস্থা। একাদশী, ষষ্ঠী প্রভৃতি ব্রতকে স্বাস্থ্য রক্ষার্থ বলা যাইতে পারে, যদিও কালের বিচিত্র গতিতে এখন বালবিধবাদের পক্ষে একাদশী অনেকটা স্বাস্থ্যহানীকারক বা বিভীষিকাপ্রদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জন্মাষ্টমী, সীতানবমী ইত্যাদি জন্মতিথি সম্বন্ধীয়। যে কারণেই যে ব্রতানুষ্ঠান হউক না কেন, পর্ব্ব দিনের জন্যই যে আমাদের অধিকাংশ ব্রত পূজাদি করা হইয়া থাকে; সে বিষয়ে সন্দেহ করা যাইতে পারে না।

পূর্ব্ব কালে বৎসরাদি কাল গণনা করিবার জন্য পর্ব্বদিনে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল অধুনা পার্ব্বণ দ্বারা আমাদের কাল গণনা করিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না বটে; কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, দেখা যায়, পার্ব্বণ প্রত্যক্ষ ভাবে না হউক, পরোক্ষ ভাবে এখনও বৎসরাদি কাল গণনায় অনেকটা সহায়তা করিতেছে। আজ কাল যাঁহারা আফিসে চাকরী করেন, আফিসের কাজের অনুরোধে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইংরাজি মাসের তারিখের হিসাব রাখিতে বাধ্য হন। কিন্তু যাঁহাদের এরূপ তারিখ হিসাব রাখিবার প্রয়োজন হয় না, তাঁহাদের পক্ষে মাসের ১লা তারিখ একটি পর্ব্ব দিন। কেবল তাঁহাদের কথাই বা বলি কেন, চাকরীজীবী মাত্রেরই মাস কাবারের দিন একটা পার্ব্বণ। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে অনেকে, দেখা যায়, বাঙ্গালা মাসের কোনও হিসাব রাখেন না; যখন গাজনের ঢাক বাজিতে থাকে, তখন ইঁহারা বুঝিতে পারেন, বাঙ্গালায় নূতন বৎসর আরম্ভ হইল। যদি নিজের বাটিতে বা গ্রামে কোনরূপ পার্ব্বণের ব্যবস্থা না থাকে, তাহা হইলে এই শ্রেণীর লোকেরা কালক্রমে ভুলিয়া যান, যে, দেশে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠাদি এক প্রকার কাল গণনার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। চাকরীজীবীদের পক্ষে মাস কাবারের দিনের ন্যায় রবিবার দিনও একটি পর্ব্ব। কিন্তু এমনও দেখা যায়, যাঁহাদের আফিস রবিবার দিনে ছুটির কোনও ব্যবস্থা নাই, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কোন্ দিন যে কি বার তাহার সম্যক হিসাব রাখিতে পারেন না, —কার্য্য বিশেষে প্রয়োজন হইলে অপরকে জিজ্ঞাসা করিয়া লন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কার্য্যাদি অনুষ্ঠানের জন্য যেমন কাল গণনার প্রয়োজন, অপর পক্ষে তেমনি কার্য্যানুষ্ঠান ব্যতীত কাল গণনা সম্ভব নহে। উভয় উভয়েরই অপেক্ষা রাখে।

আয় মা!

[শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি, এ, কবিগুণাকর]

আয় মা আনন্দময়ি, আয় তবে আয়!
আমাদের ম্লান মুখে হাসিটী ফুটাতে
তিনটী দিনের তরে! খেটে খেটে হায়
আমরা যে দুই মুঠা পারি না জুটাতে।

এদিকেতে ঘরে নাই শান্তি এক তিল,
স্বামী স্ত্রীতে, ভায়ে ভায়ে মায়ে ও বেটায়
কলহ বিবাদ নিত্য! পরস্পরে মিল
নাহি একটুকু! সব অভাবে ঘটায়!

অতঃপর কি বলিব? দেনায় দেনায়
মস্তকের চুলগুলি আছে বিকাইয়ে,
উপরন্তু কন্যাদের বিবাহের দায়—
"গণ্ডোপরে বিস্ফোটক"—রয়েছি মরিয়ে!

তবু তোর পাদপদ্ম পূজিব আমরা—
বহিবে এ মৃত প্রাণে অমৃতের ঝরা!

শ্রীশ্রীঠাকুর হরনাথের অমিয় বাণী

[ভিষগ্‌রত্ন কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী এচ-এম-বি, এল-এ-এম-এস্ সংগৃহীত]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

(৪২) যাহারা পাপকে পাপ জানিয়া করে, তাহারা কৃষ্ণের নিকট ক্ষমা পায়,—যাহারা প্রভুর নাম লইয়া, ধর্ম্মের ভাণ করিয়া পাপ করে,—তাহাদের উদ্ধার কোথায়?

(৪৩) ভালবাসার চক্ষু পৃথক্‌। "Lover sees angel's beauty in Egyptian brow."

(৪৪) গত কর্ম্ম ভুলিয়া যান, তার জন্য দুঃখ করিবেন না। পাপিগণ যেদিন কৃষ্ণনামে দীক্ষিত হয়, সেই দিন হইতে তাহার পূর্ব্ব পাপ ধ্বংস হইয়া নবজীবন হয়।

(৪৫) কৃষ্ণ নাম হইতে মহামন্ত্র আর নাই; নামই ভবরোগের একমাত্র মহৌষধ। নাম করিলে ইহ-পরকালে অবিশ্রান্ত আনন্দ ও শান্তি পাওয়া যায়। নাম ভুলিবেন না। নাম করিতে সময় অসময়, স্থান অস্থান, পবিত্রতা অপবিত্রতা কিছুই বিচার নাই, ইহাতে আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি নাই, যখন তখন লইলেই উপকার ও আনন্দ।

(৪৬) জীবের দুঃখে কাতর হইয়া দয়াময় হরি শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে আসিয়া আচণ্ডালে নাম বিলাইয়া জগৎ ধন্য করিয়াছেন, এই জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গ সর্ব্বপ্রধান বলিয়া মনে হয়।

(৪৭) শরীর ভাল রাখার জন্য ব্রহ্মচর্য্যই সর্ব্ব প্রথম ও প্রধান উপায়। বীর্য্যই জীবন; বীর্য্যই শরীর রক্ষার মূল কারণ, বীর্য্য ধারণই প্রধান ব্রহ্মচর্য্য, এটি যেন সর্ব্বদা মনে থাকে।

(৪৮) যদি কৃষ্ণপ্রেমে প্রেমী হইতে চাও তাহা হইলে স্ত্রীরূপিণী, কন্যারূপিণী, মাতৃ ও ভগিনী রূপিণী অধিকারিণিগণের আশ্রয় লও। তাঁ'রাই কৃষ্ণ-প্রেমদাত্রী। কন্যাকে কন্যা মনে করিয়া ক্ষুদ্র জ্ঞান করিও না। এ রাজ্যের পথপ্রদর্শক একমাত্র প্রেমময়ীরা; তবে কি জান, তাঁদের সঙ্গে চতুরতা করিতে গেলেই প্রেমময় রাধাকুণ্ড দেখাইবার ছলে, ভয়ানক নরককুণ্ড দেখাইয়া দেন। আমরা ভ্রান্ত, চিনি না, তাই রাধাকুণ্ড ভ্রমে নরককুণ্ডকে আশ্রয় করিয়া মহা দুঃখকে পরম সুখ জ্ঞানে তাতেই ডুবে থাকি।

(৪৯) স্ত্রীকে খেলিবার জন্য সহযোগিনী মনে করিয়া ইহ পরকালের সকল শক্তি হারান কোন রকমে উচিত নয়। স্ত্রীকে ইহ পরকালের প্রধান সঙ্গিনী মনে করিতে হয়, সামান্য পার্থিব খেলার সঙ্গিনী স্ত্রী নন্‌। তাঁকে চিরসঙ্গিনী মনে করিয়া তাহার মত ব্যবহার করা উচিত। তাঁকে তাঁর উপযুক্ত মান্য দিয়া সকল অবস্থায় সহযোগিনী করা কর্ত্তব্য। তাঁদের গুণগুলি লইয়া নিজের গুণ তাঁহাদিগকে দিতে হয়; এই রকম আদান-প্রদানে ঘনিষ্টতা বাড়িয়া ক্রমে দু'টিতে একটি হইতে হয়। তা'তেই আনন্দ, তা'তেই মজা। যদি ভাল বাসিয়াছ, যাহাতে দু'দিনে সে ভালবাসা ভুলিতে না হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত। নিকৃষ্ট কামের বশবর্ত্তী হইয়া চির সুখ বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত নয়। তাঁদের উপযুক্ত মান্য করিবে। জগতের স্ত্রী মাত্রেরই উপযুক্ত মান্য করিবে। কুকুর বিড়ালের স্ত্রীকেও সেই মহাশক্তি মনে করিয়া মান্য করিবে। তাঁহাদের মর্য্যাদার অতিক্রম করিবে না। তাঁহারাই বল দিবার ও হরিবার একমাত্র মালিক।

(৫০) স্ত্রী আদরের ও ভালবাসার ধন। অনেক কর্ম্মে শক্তি নাই বলিয়া তাঁ'র সাহায্যে সশক্তি হইয়া এ জগতে কার্য্য করিতে পারি বলিয়াই তাঁ'র নাম শক্তি। তিনি ধর্ম্ম কর্ম্মে সহায়তা করেন বলিয়াই তাঁ'র নাম সহধর্ম্মিণী, আমাদের সন্তানকে গর্ভধারণ করেন বলিয়া তাঁ'র নাম জায়া। তাই বলি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সকল অবস্থাতে স্ত্রী আমাদের প্রধান সহায়, আমি যদি নরকে যাইতে চাই তিনিই লইয়া যাইবেন, আর স্বর্গের পথও তিনি দেখাইয়া দেন, বৈরাগ্য ও মোক্ষপদ তাঁরাই দেখাইতে

পারেন। এই কারণেই তাঁদের অবমাননা করিতে ইচ্ছা কখনও করিতে নাই।

(৫১) স্ত্রী বিলাসের দ্রব্য নন্। স্ত্রীগণই জগজ্জীবন, তাঁরাই প্রেম ভক্তির আধার! আবার অসদ্ব্যবহার করিলেই তাঁহারাই ঘোর কালরূপিণী পিশাচী ও রাক্ষসী হইয়া সকলকে গ্রাস করেন। বেশ্যাগণ সেই কালান্তক মূর্ত্তির সামান্য ছবি মাত্র।

(৫২) কদাচ কাম নয়নে স্ত্রীগণকে দেখিও না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেবের সম্মিলন এক স্ত্রীতেই দেখিতে পাইবে। স্ত্রীর অবমাননা আত্ম-ধ্বংসের কারণ মাত্র।

(৫৩) মাকে রক্ত মাংসের শরীরধারী কৃষ্ণ মনে করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যে মা এই শরীর ধারণ, প্রসব, পালন ও পুষ্টি করিয়াছেন তাঁকেই সাক্ষাৎ ঈশ্বর মনে করিবে না তো আর ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব কিসে? তিনি জগৎ ধারণ, প্রসব, পালন ও পুষ্টি করিতেছেন, মাও তেমনি এই শরীরের সম্বন্ধে! তবে মা আমার পক্ষে কেন ঈশ্বর হইবেন না?

(৫৪) পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিতে হয়, তবে সেই দয়াময় হরির দয়া পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি নিজের জন্মদাতা মা বাপকে যত্ন করিতে জানে না, সে কেমন করিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে মা-বাপ সম্বন্ধ পাতাইয়া তাঁর সেবা করিতে সক্ষম হইবে? জানত "Charity begins at home;" সেই রকম সকলই begins at home; এক্ষণে মন না দিলে চিরদিন Negligent student-এর মত গলদ Spelling করিতে হইবে। তাই বলি প্রথম পাঠ বেশ মন দিয়া করিতে চেষ্টা করা উচিত। মা বাপের সেবা আমাদের প্রথম পাঠ, এটিতে মন না লাগাইলে চিরদিন Careless থাকিয়া যাইতে হইবে; আর তাহা হইলে শেষ পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইতে বড় বিপদ হইয়া দাঁড়াইবে।

(৫৫) পিতা মাতাকে মনুষ্য দেহে সাক্ষাৎ ঈশ্বর মনে করিয়া সেবা ভক্তি করিবে। যদি কেহ ঈশ্বরকে চর্ম্ম চক্ষে in flesh and blood দেখিতে চান তিনি মা বাপকে দেখুন। Entrance Examination-এ Pass না হইলে কেহ কখনও Graduate হইবার ইচ্ছা করিতে পারে না, তেমনি এই পিতা মাতার সেবারূপ Entrance পরীক্ষা না দিতে পারিলে আর College এ থাকার ইচ্ছা বাতুলের কর্ম্ম।

(৫৬) নিজের ছেলের মত পরকেও ভালবাসিতে চেষ্টা করা উচিত। এই রকম করিতে করিতে তবে সংসার ছেড়ে সেই কৃষ্ণকে ভালবাসিতে পারা যায়। আপনার না ভুলিলে পরকে ভালবাসা, আর পরকে না ভালবাসিলে কৃষ্ণপ্রেম আসে না।

(৫৭) "কানুর সহিতে পিরীত করিতে
অধিক চাতুরী চাই।"

আর এটিও মনে রাখিও—

"চিতে অতি ব্যাকুল হইলে ধরম সরম যায়।"

তাই বলি ধীরের মত চলিলেই কানু-প্রেম অনুভব হয় নচেৎ বড় কষ্টকর হ'য়ে উঠে। পূর্ব্বরাগ সত্যই বড় কষ্টকর, এক রকম অসহ্য হয়, কিন্তু তা ব'লে অস্থির হ'লে চ'লবে না—ধীর হ'তে হ'বে। মহাজনেরা ব'লে গিয়েছেন—

"হরি হীরের গিরে, স্থিরে কি অস্থিরে,
জানে ধীবে।"

তাই বলি, এত উতলা হলে ত চলবে না। স্বামীর জন্য স্বামী সোহাগিনী সদাই কাঁদে, কিন্তু তাই বলে' কি গুরু-গঞ্জনাকে ভয় করে না? লোকের উপহাসকে ভয় করে না? এই সব ভয়ে প্রাণের অত্যন্ত ব্যাকুলতাকে গোপন করিতে বাধ্য হয়। তাই বলি, গোপন কর। ঢেকে রাখলেই শীঘ্র সিদ্ধ হয়, এটি—দিন দেখতে পাও। তবে কেন না ঢেকে রাখছ? গোপন কর। ঢেকে রাখলে কাঁচাও সময়ে সময়ে পেকে উঠেও সুমিষ্ট হয়।

(৫৮) কাহারও জন্য বেশী ভাবিবে না, কোন জিনিবেই বেশী মুগ্ধ হইবে না। বেশী ভালবাসিতে চাও, বেশী আদর করিতে চাও তাহা হইলে কৃষ্ণ নাম ও কৃষ্ণকে আদর কর, চির সুখে থাকিবে। মানুষকে মানুষ মনে করিয়া ভালবাসিতে শিক্ষা কর; তবে বেশী ভালবাসিয়া প্রতারিত হইবে না। বর্ত্তমানে সন্তুষ্ট থাক, ভবিষ্য চিন্তাতে বৃথা কাতর হইবে না।

(৫৯) মুখ লুকাইবার কাজে হাত দিও না। যে কাজটি করা হ'লে, পরে চিন্তা করিলে মন প্রফুল্ল হয়, সেইটিই পুণ্য কার্য্য; আর যাহার চিন্তাতে শরীর শিহরিয়া উঠে, সেইটি পাপ কার্য্য। সেই কাজটি করিতে হয়, যাহা পাঁচ জনের কাছে বলিতে ভয় ও লজ্জা না হয়।

(৬০) পাপী তাপীর নিকট কৃষ্ণ অপেক্ষা কৃষ্ণ নামের অধিক আদর। পাপ পুণ্য ততক্ষণ জীবকে ভয় দেখাইতে পারে যতক্ষণ তাহারা এই অমোঘ অস্ত্র নামের আশ্রয় না লয়। নামের মত নিরাপদ ও সুদৃঢ় আশ্রয় স্থল ত্রিতাপ-তাড়িত জীবের নিকট আর দ্বিতীয় নাই। মহাপাতকী অজামীলকে স্বয়ং কৃষ্ণ কোন রকমে উদ্ধার করিতে পারিতেন না, কিন্তু সামান্য নামাভাসে সেই অজামীল পরম পবিত্র হইয়া সকল ভয় হইতে ত্রাণ পাইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

শান্তিপুরের কথা।

[কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন]

বর্ত্তমান শান্তিপুর হইতে চারি মাইল পশ্চিমে অবস্থিত বাণিজ্য-বহুলা হরি নদী। গ্রামখানি যখন গঙ্গাগর্ভে মজ্জমান হইয়া পড়িল, সমৃদ্ধি-সম্পন্না হরি নদীর বহু সংখ্যক অধিবাসী যখন মা জাহ্নবীর উত্তাল তরঙ্গমালার প্রচণ্ড প্রকোপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্ম নানাস্থানে দেশান্তরী হইতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা বাস্তুর মায়া বিসর্জ্জন দিলেও পিতৃপুরুষদিগের ভিটার অতি নিকটে থাকিবার কামনা ছাড়িতে পারিলেন না, তাঁহারাই দল-বদ্ধ হইয়া প্রথম শান্তিপুরে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ স্থানভ্রষ্ট জনসঙ্ঘের সর্ব্বপ্রধান হইয়াছিলেন কাঁসারি জাতি। গঙ্গাতীরে অবস্থিত হরি নদীর তখন বাণিজ্যবহুল স্থানগুলির মধ্যে বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল। এখনকার শান্তিপুরের অভিধান সহর হইলেও তখন কিন্তু শান্তিপুর বনাকীর্ণ হিংস্র জন্তুর লীলানিকেতন ভিন্ন লোকের বসতি স্থান ছিল না। হরি নদীর সমগ্র অধিবাসী দেশদেশান্তরে চলিয়া গিয়া যখন নানা স্থানের জন সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন, শান্তিপুরে তখন এক হাজার কাঁসারি জাতি আসিয়া বাস করিলেন। এজন্য কাঁসারি জাতিকেই শান্তিপুরের আদিম অধিবাসী বলা যাইতে পারে। তাঁহাদের দেখা দেখি তাঁহাদের পন্থানুসরণ করিলেন তন্তুবায় ও গোয়ালা সম্প্রদায়। শান্তিপুরের চতুঃসীমা নির্ণয় করিতে হইলে শান্তিপুরের উত্তরে বাউই-গাছি, দক্ষিণে ত্রিলোক উদ্ধারকারিণী মা জাহ্নবী, পূর্ব্বে মহাকবি কৃত্তিবাসের পুণ্যপীঠ ফুলিয়া এবং পশ্চিমে গড় হইয়া হরিপুরের নাম উল্লেখ করিতে হয়। হরি নদী, হরিপুর হইতে প্রায় ২ মাইল আরও পূর্ব্বে অবস্থিত। এখনকার হরি নদী দেখিলে হরি নদীতে যে এক সময়ে এক সহস্র কাঁসারি এবং বহু সংখ্যক হিন্দুজাতি বাস করিত, তাহা বিশ্বাস করিতেই প্রবৃত্তি হইবে না। এখন হরি নদীতে হিন্দুজাতির চিহ্ন মাত্র নাই; সামান্য কয়েক ঘর মাত্র মুসলমান জাতি এখন হরি নদীতে বাস করিয়া হরি নদীর প্রাচীন কাহিনীর সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন।

শান্তিপুরের ঔপনিবেশিক কালে কাঁসারি জাতির দেখা-দেখি যে গোপজাতির আগমনের কথা বলিয়াছি, সে গোপ-জাতির আবাস স্থান হইয়াছিল শান্তিপুরের পশ্চিমে গড়ে বা এখনকার সুতরা গড়ে। বাঙ্গালা দেশের অনেক স্থানেই 'গোড়ো গোয়ালা'র নাম যাহা চলিয়া আসিতেছে, সকলের জানিয়া রাখা উচিত, এই 'গড়ে'র গোয়ালার নামান্তরেই 'গোড়ো গোয়ালা'র সৃষ্টি হইয়াছে। কৃষ্ণনগরের মহা-রাজাদিগের রাজ্যের গড় এই স্থানেই নির্দ্দিষ্ট ছিল বলিয়াই ইহার নামকরণ হইয়াছিল গড়। এখনো এখানে কৃষ্ণ-নগরের মহারাজার কাছারী আছে। গড়ের অন্য চিহ্ন নাই—শুধু নাম আছে গড়, কিন্তু তাহাও এখন ডাক বিভাগের কৃপায় 'সুতরা গড়' ধারণ করিয়াছে।

শান্তিপুরে কাঁসারিদিগের দেখাদেখি গোয়ালারা তো আসিলেনই, তা' ছাড়া আরও আসিলেন বাণিজ্যগত প্রাণ নানা সম্প্রদায়ের শূদ্রজাতি। তন্তুবায়, একাদশ তিলি, মোদক জাতির বহু ব্যক্তিই হরিনদী ছাড়িয়া শান্তিপুরে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণজাতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল শান্তিপুরে। নবশাক জাতির অভ্যুদয়ের বহুকাল পরে শান্তিপুরে বহু গোস্বামী এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের এক্ষণে বাস হইলেও গৌরাঙ্গ অবতারে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন শান্তিপুর হইয়া উৎকলে গমন পূর্ব্বক বাঙ্গালাদেশ ও উড়িষ্যায় এক নূতন আলোক সমুজ্জ্বল ভাবে বিস্তার করিলেন, যখন—

"ভজ [illegible] লহ গৌরাঙ্গ,
জপ' গৌরাঙ্গ নাম রে।"—

এই মধুমাখা ধ্বনি কাণের ভিতর দিয়া বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যার অধিবাসীদিগের মরমে প্রবেশ করিল, যখন বাঙ্গালী ও উড়িষ্যাবাসীর ঐ নাম শ্রবণে প্রাণ আকুল হইয়া সেই মধু পানে বদন ছাড়িতে পারিল না, শান্তিপুরে সেই সময় ব্রাহ্মণ জাতির অভ্যুদয় কাল। সেই সময়ই উৎকল হইতে ও বাঙ্গালার নানাস্থান হইতে গোস্বামীরা শান্তিপুরে আসিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। গোস্বামীদিগের মত বরেন্দ্র ভূমি হইতে অনেক ব্রাহ্মণই পুণ্যভূমি জ্ঞানে শান্তিপুরে আগমন করিলেন এবং বহু ব্রাহ্মণের বাসের ফলে শান্তিপুর শূদ্রশাসিত দেশের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণ-শাসিত পল্লী বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে লাগিল।

এই ব্রাহ্মণ-শাসিত কালে শান্তিপুরের সার্ব্বজনীন অবস্থারই সমুন্নতি ঘটিল। মহাপ্রভু তো শ্রীশ্রীভগবানের ভাবাবেশে শান্তিপুরকে ধর্ম্ম কর্ম্মে উন্মত্ত করিয়া তুলিলেনই, শান্তিপুরের অধিবাসীদিগের সে উন্মাদনায় "শান্তিপুর ডুবু ডুবু ন'দে ভেসে যায়"—এইরূপ অবস্থা তো হইয়া উঠিলই, তা' ছাড়া এই সময়ই শান্তিপুরের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় সাহিত্য, দর্শন, ন্যায়, জ্যোতিষ—সকল বিষয়ের সাধনাতেই সমগ্র বাঙ্গালার শীর্ষস্থান অধিকারে সমর্থ হইলেন। শান্তিপুরে সংস্কৃত চর্চ্চা সেই সময় বহুল পরিমাণে হইতে লাগিল। এখন শান্তিপুরে চতুষ্পাঠী নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু তৎকালে শান্তিপুরে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাটীতে টোল ছিল। বাঙ্গালার বহু দূর দূরান্তর স্থানের অধিবাসিগণ শান্তিপুরের সেই সকল টোলে আসিয়া নানা শাস্ত্রের শিক্ষালাভ করিত। শুধু বাঙ্গালা দেশ কেন, ভারতবর্ষের তাৎকালীন শাস্ত্র শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র সুদূর কাশী কাঞ্চী, দ্রাবিড় হইতেও বহু শাস্ত্র সুপণ্ডিত ব্যক্তি শিক্ষা সমাপ্তির পূর্ব্বে শান্তিপুরে আসিয়া কোনো পণ্ডিতের টোলে গবেষণা পূর্ব্বক কিছুদিন পড়িয়া তবে অধ্যয়নের পরিসমাপ্তি করিতেন। বাঙ্গালা দেশে এ গৌরব নবদ্বীপের পর শান্তিপুর ভিন্ন আর কোনো স্থানই অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই। এখন ভট্টপল্লীতে অনেক পণ্ডিত আছেন, শাস্ত্রচর্চ্চার জন্য এখন ভট্টপল্লী বিখ্যাতও বটে, কিন্তু শান্তিপুরের সমুন্নতি কালে বাঙ্গালা দেশের নবদ্বীপ ভিন্ন আর কোনো স্থানই এ বিষয়ে শান্তিপুরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে সমর্থ হয় না।

ইংরাজী শিক্ষার সূচনাকালে বাঙ্গালা জাতি বাঙ্গালা ভাষার উপরে বীতশ্রদ্ধ হইতে লাগিলেন। সংস্কৃতের চর্চ্চা তো সে সময় হ্রাস পাইতে লাগিলই, বাঙ্গালীর নিকট তাহার মাতৃভাষাও জঘন্য ভাষা বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। অবশ্য সাধারণ লোকে বাঙ্গালা ভাষাকে অবজ্ঞা করিলেও দেশের জন কয়েক ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিই বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিসাধনে যত্নবান হইলেন। কয়েকজন মহাপুরুষ বাঙ্গালা ভাষার ধ্বংসের আশঙ্কা করিয়া বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের প্রচারে চেষ্টাশীল হইলেন। কেহ কেহ নাটক নভেল কবিতা লিখিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে জীবিত রাখিতে চেষ্টা করিলেন। সেই চেষ্টার ফলে বঙ্কিমবাবুর তিলোত্তমাকে আমরা দেখিতে পাইলাম; 'মৃণালিনী'র

"সিন্ধু কূলে রই, নূতন তরী বই,
পারে তোরা কে যাবি গো আয়"—

শুনিতে পাইলাম, 'সূর্য্যমুখী'র ছায়া শীতল সুমধুর আলেখ্যের পার্শ্বে 'কুন্দনন্দিনী'র দৈন্য-ব্যথিত চিত্র দেখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস না ফেলিয়া থাকিতে পারিলাম না। বঙ্কিম বাবু যখন এই সকল উপন্যাস বঙ্গভাষাকে পরিপুষ্ট করিতে লাগিলেন, শান্তিপুরের দামোদর মুখোপাধ্যায় তখন তাঁহার পন্থানুসরণে বাঙ্গালীর নিকট বঙ্গভাষাকে রক্ষা করিবার জন্য

'মা ও মেয়ে' বাহির করিলেন। ক্রমশঃ 'কমলকুমারী', 'শুক্লবসনা সুন্দরী' প্রভৃতি অনেকগুলি উপন্যাস প্রণয়নে বাঙ্গালী পাঠককে বঙ্গভাষার প্রতি আকৃষ্ট করিতে প্রয়াসী হইলেন। শান্তিপুরের আর কেহ উপন্যাস লিখিয়াছেন কি না ঠিক মনে করিতে পারিতেছি না, কিন্তু আর কেহ না লিখিলেও এক দামোদর বাবুই যে কয়খানি উপন্যাস বাঙ্গালীকে প্রদান করিয়াছেন, তাহা চিরকালই অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

শান্তিপুরে বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিকল্পে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন বহু ব্যক্তি। যে সময় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ' বাঙ্গালীর নিকট বাঙ্গালা ভাষার দীপ প্রকাশক রূপে মাতৃভাষাকে রক্ষা করিতেছিল, কলিকাতা ডিক্সন্ লেন হইতে 'সহচর' যে সময় বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের অন্যতর, বঙ্গবাসী'র যে সময় সবেমাত্র সূচনা হইতেছে, শান্তিপুরের শ্যামাচরণ সান্যাল সেই সময়ে 'ভারতভূমি' নামে এক প্রকাণ্ড সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশে শান্তিপুরকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। 'মুদ্গার', 'ভারতভূমি' প্রকাশকের মাসিক সংস্করণ। সে দুইখানি 'কাগজ' যেরূপ নির্ভীকতার সহিত মাতৃভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছিল, এখনকার দিনে জীবিত থাকিলে তাহাদের দ্বারা দেশের যে এক যুগান্তর উপস্থিত হইত—ইহা অন্ততঃ আমি তো বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত। 'কাগজ' দুইখানি শান্তিপুরের লোকের দলাদলির ফলে উঠিয়া যায়।

গ্রন্থকারও শান্তিপুরে অনেক দেখা দিয়াছিলেন। পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামীর ব্যাকরণ, নিত্যানন্দ গোস্বামীর ব্যাকরণ শান্তিপুরের উজ্জ্বল রত্ন। এখন সে সকল ব্যাকরণের প্রচলন উঠিয়া গিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম শিক্ষালাভ করিয়াও লোকে ব্যাকরণ-বর্জ্জিত ভাষা বলিতে লজ্জিত হইতেছেন না।

বর্ত্তমান সময়ে শ্রীযুক্ত করুণানিধান বাঙ্গালী জাতির নিকট করুণ রাগিনী লইয়া শান্তিপুরের আসর রাখিতেছেন, কিন্তু আর বড় একটা কেহ সে চেষ্টা করিতেছেন না। আমাদের মুসলমান বন্ধু শ্রীযুক্ত মোজাম্মেল হক্ নানা প্রকারে বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, শান্তিপুরের বাঙ্গালী মুসলমানের নিকট বাঙ্গালী হিন্দুকে কিন্তু এ বিষয়ের জন্য পরাজয় স্বীকার করিতে হয়।

শান্তিপুরের প্রাচীন কাহিনী মনে করিয়া ব্যথা পাইতে হয় বলিয়াই আজি এত কথা বলিতেছি। এক সময়ে সকল বিষয়ে বাঙ্গালা দেশের গর্ব্ব-স্থল ছিল শান্তিপুর। ঢাকা ও ফরাসডাঙ্গা বস্ত্র শিল্পের চরম উন্নতি করিলেও শান্তিপুরের বস্ত্রশিল্প সকলের অপেক্ষা আদর পাইত। এখন ক্রেতার অভাবে সে শিল্প লুপ্তপ্রায়।

ধর্ম্মকর্ম্মে শান্তিপুরের যে গৌরব ছিল, তাহারই বা পুনরুদ্ধারের জন্য কয়জন চেষ্টা করিতেছেন? শুধু তিলক কাটিয়া, কৌপীন পরিয়া, জপের মালা হস্তে লইয়া ধর্ম্মকর্ম্মের পুনরুন্নতির কথা আমি বলিতেছি না, সেরূপ ব্যবস্থায় ধর্ম্ম অর্জ্জন হয় কি না—তাহারও আমি মীমাংসা করিতে চাহিতেছি না,—আমি বলিতেছি, আগে যে শান্তিপুরে বহু সংখ্যক বিদেশাগত ব্যক্তি অদ্বৈতের পুণ্যভূমি দর্শনে আগমন করিতেন, তাঁহাদের সেবার ব্যবস্থা হইত শান্তিপুরের ঠাকুর বাড়ীর প্রসাদ; এখন সে ব্যবস্থা শান্তিপুরে হ্রাস পাইল কেন? শান্তিপুরে যে কীর্ত্তনীয়া ছিল, যাহারা নিত্য প্রভাতে শ্রীগৌরাঙ্গের—তথা শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার—মধুমাখা সঙ্গীত গাহিয়া শান্তিপুর হইতেই জীবিকানির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিতে পারিত, তাহা হ্রাস পাইল কেন? ব্রাহ্মণদিগের অনুসরণ করিয়া শান্তিপুরের বেজপাড়ায় যে অনেকগুলি বৈদ্য চিকিৎসক বাস করিয়া আতুর রক্ষায় অর্থোপার্জ্জন অপেক্ষা সামর্থ্য প্রকাশে অধিক তৃপ্তি লাভ করিতেন, তাঁহাদের সে প্রবৃত্তি কমিল কেন? শান্তিপুরের অধিবাসিগণ এ সকল কথা চিন্তা করিয়াছেন কি?

আগে খুব কম বাড়ীই ছিল যে বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসব প্রভৃতি বার মাসে তের পার্ব্বণ হইত না। ঐ সকল ব্যবস্থায় দেবতার পূজা তো করা হইতই, তা' ছাড়া কত জাতির উহা দ্বারা আয়ের ব্যবস্থা হইত। পূজক পূজা করিতেন, তন্ত্রধারক চণ্ডী পাঠ করিতেন, মুচী বাদ্য বাজাইত, মজুরেরা পটমণ্ডপ নির্ম্মাণ করিত, কুম্ভকার প্রতিমা গঠন করিত। এ সকল ব্যবস্থা এখন শান্তিপুরে আর পূর্ব্বের মত নাই কেন? স্বীকার করি, বর্ত্তমান সময়ে ব্যয়

বাহুল্যের দিন, কিন্তু আয়ও তো পূর্ব্বাপেক্ষা লোকের বহুল বাড়িয়া গিয়াছে, তবে আর এ সকল ব্যবস্থা হয় না কেন? ইহার একমাত্র উত্তর, লোকের প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এখনকার লোকে মার্জ্জিত শিক্ষায় পূর্ব্বপুরুষের সরণী অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক নহে। অবশ্য এ দোষটা শুধু শান্তিপুরের নহে, বাঙ্গালার সকল পল্লীই এইভাবে গঠিত হইয়াছে, কিন্তু শান্তিপুর সকল বিষয়েই বাঙ্গালা দেশের আদর্শ স্থান ছিল বলিয়া শান্তিপুরের প্রসঙ্গে শান্তিপুরের অধিবাসীদিগের সম্বন্ধেই এ দোষ অর্পণ করিলাম।

বাঙ্গালী ভীরু হউক, কাপুরুষ হউক, বঙ্গ জননী যে একেবারে বীরশূন্যা ছিলেন না—ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। বাঙ্গালীর সেই—

"যশোর নগর ধাম প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজা প্রতাপ আদিত্য।"

—ইহা ভীরু বাঙ্গালীর বীরত্ব কাহিনী চিরকালই স্মরণ করাইয়া দিবে। শান্তিপুরেও এরূপ বীর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শান্তিপুরে আশানন্দ ঢেঁকীর কীর্ত্তিকলাপ বাঙ্গালীর সাহস ও বীরত্বের কথা চিরদিনই স্মরণ করাইয়া দিবে। বৈদ্যনাথ, বিশ্বনাথ দস্যুবৃত্তি করিলেও তাঁহাদের দস্যুতা ছিল বীরত্বব্যঞ্জক এবং উহার ফল পরোপকারেই ব্যয়িত হইত। যাহা হউক, শান্তিপুরে আগে যে সকল বলশালী লোকের নাম শুনা যাইত, এখনকার শান্তিপুরকে দেখিলে তাহা কখনো সত্য বলিয়া অনুমিত হইবে না।

বর্ত্তমান সময়ে শান্তিপুরের ম্যালেরিয়া এ কথা আরও বদ্ধমূল করিয়া দিতেছে। এখনকার শান্তিপুর অর্থ সম্পদে উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু আগে যেমন শান্তিপুরের ব্রাহ্মণ পল্লীগুলি সকালে বৈকালে কালিদাসের কবিত্বে, ভবভূতির পাণ্ডিত্যে, সাংখ্যের বিচারে, জৈমিনীর মীমাংসায়, উপনিষদের গবেষণায়, বেদের ঝঙ্কারে মুখরিত হইয়া উঠিত, প্রভাতে সায়াহ্নে শ্যামচাঁদ, গোকুলচাঁদ প্রভৃতি দেবালয়গুলিতে শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসরের নিনাদে শান্তিপুরের অস্তিত্ব জাগাইয়া তুলিত, বৈষ্ণব ভিখারীর দল পূর্ব্বাকাশে বালার্ক-কিরণ-সম্পাত হইতে না হইতে পল্লীবাসী দিগকে জাগাইবার জন্য "আর রাতি নাই, উঠরে কানাই, বেলা হ'ল চল চল গোঠে যাই" বলিয়া যে করতাল খঞ্জনী বাজাইয়া গান গাহিয়া বেড়াইত, তাহা শান্তিপুর হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে। শান্তিপুরের আসে পাশে যে বহু বিস্তৃত গোচারণের পতিত মাঠ সকল ছিল, প্রভাত কালে পালে পালে সেই সকল মাঠে যে হৃষ্টপুষ্ট গাভীর দল শ্যামল শস্য অন্বেষণে ধাবমান হইত, সেই সকল গাভীজাত দুগ্ধে দেবভোগ্য খাদ্য ক্ষীর, সর, নবনী, ছানা, মাখন শান্তিপুরের লোকে যে যথেষ্ট পরিমাণে খাইতে পাইত, কাল মাহাত্ম্যে যে কারণেই হউক শান্তিপুরে এখন তাহার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। শান্তিপুরের সর্ব্বপ্রধান গৌরব বস্ত্র শিল্প এক প্রকার লুপ্ত। এক কথায় অন্যান্য দেশেরই মত শান্তিপুরের লোকের শরীরে বল নাই, মনে স্ফূর্ত্তি নাই, হৃদয়ে শান্তি নাই। রথের সময় শান্তিপুরে আর সে উৎসব হয় না, রাসের সময় একশত ঢাক বাহির করিবার প্রথা এখনো লোপ না পাইলেও সে আনন্দ—সে উৎসব—সে প্রবাসী শান্তিপুরবাসী—শান্তিপুরে ফিরিয়া যাইবার জন্য রাসের ছয় মাস পূর্ব্ব হইতে আর ব্যগ্র হয় না। সুতরাং বাঙ্গালার অন্যান্য দেশের সহিত শান্তিপুরের যে এখন আর বড় একটা পার্থক্য নাই—ইহা ভাবিয়াই প্রাণের আবেগে এত কথা ব্যক্ত করিলাম। এই প্রসঙ্গে আমার যদি কোনো অপরাধ হইয়া থাকে, সমবেত সভামণ্ডলী তাহা ক্ষমা করিবেন। *

---

* শান্তিপুর সাহিত্য সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

কবিতা-কুঞ্জ।

অপ্রার্থিত।

[শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায় এম-এ]

আমি ত বলিনি তোমা' বাসিতে ভাল,
চাহিনি আঁধার মম করিতে আলো,
আমি ও আলোর পানে
আছিনু নীরব ধ্যানে,
আঁধার হৃদয় মম, আছিল কালো,
আমি ত বলিনি তোমা' বাসিতে ভাল।

তুমি আকাশের চাঁদ অমরাবাসী,
আমি ধরণীর জীব সুধাপিয়াসী,
আমি ও রূপের লাগি'
উদাসী আছিনু জাগি,
কাছে পাব এতখানি নাছিনু আশী,
তুমি আকাশের চাঁদ অমরাবাসী।

কেন তুমি নেমে এলে, হৃদয়হরা!
উজল করিলে মোর আঁধার ধরা,
এমনি কেন গো এসে
মধুর মধুর হেসে
ঢেলে দিলে ভালবাসা আপন করা,
আমি ত চাহিনি তোমা' হৃদয়হরা!

স্বরগ ছাড়িয়া এলে ধরণী 'পরে,
ফুটালে সোণার আলো আঁধার ঘরে,
পথের ভিখারিটীরে
তুলিলে প্রাসাদ শিরে,
মাটিকে করিলে সোণা নব আদরে,
স্বরগ ছাড়িয়া এলে ধরণী 'পরে।

সব চেয়ে আপনার, হে দূরবাসি!
তুমি মোর, ডেকে বলে তোমারি বাঁশী;
এ কোন্ অদ্ভুত ছন্দে
এ কোন্ মিলনানন্দে
আমার হৃদয়ে পশি হাসিছ হাসি,
হে মোর নিকটতম, হে দূরবাসী!

—•—

"জীবন-আঁধারে"।

[শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু, বিদ্যাভূষণ, সাহিত্য-রত্ন]

১

দেখাও আলোক মোরে,
তামস আঁধারে, গৃহহীন হ'য়ে,
কত মরি ঘুরে ফিরে;
দেখাও আলোক মোরে।

২

ধর গো প্রদীপ করে
চিরদিন নয়, বহু দূরে নয়
শুধু ক্ষণিকের তরে;
ধর গো প্রদীপ করে।

৩

বিজলী চমক সম,
সুপ্ত হিয়ার গভীর তামসে,
উজলিবে অনুপম;
বিজলী চমক সম।

৪

ধর একবার ধর,
আলোক-সলিলে, ভাসিয়া ছুটিবে
জীবন-তরণী মোর;
ধর একবার ধর।

---

* Cardinal Newman-এর "Lead kindly light lea[d] Thou me on"—কবিতার ভাবাবলম্বনে।

৫

নিভে যায় যাক্ ঝড়ে,
জ্বলুক প্রদীপ, প্রথম সোপানে,
কেঁপে গিয়ে বায়ুভরে ;
নিভে যায় যাক্ ঝড়ে।

৬

একবার আলো পেলে,
নাহি পড়ে' রব, গৃহে চলে যাব,
জনক জননী কোলে ;
একবার আলো পেলে।

—•—

সাঁঝের গান।

[শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্]

চল্ ভাই ঘরে ফিরে যাই !
ঐ যে রবি অস্তে গেল
সাঁঝের ছায়া নেমে এল
দিনের আলো ঐ মিলালো
বেলা তো আর নাই !
থাক্‌তে বেলা না ফিরিলে
ভাস্‌তে হবে আঁখিজলে
আঁধার হবে ধরণী এই
পথ যে জানা নাই !
কুলায় পানে চল্‌চে পাখী
ফির্‌চে ধেনু হাম্বা ডাকি'
দিনের শেষে চলে কৃষক
আপন মনে গাই !
শেষ হ'ল দিন চল্ না ও ভাই
কি হবে আর পিছে তাকাই
মিছে ভেবে আর কি হবে
চল্‌রে গৃহে ধাই॥

—•—

প্রেমের ধারা।

[শ্রীভক্তিসুধা হার]

আমারি লাগি গেয়েছে পাখী
ঝরেছে সুধাধারা—
আমারি লাগি মলয় বহে
নিশীথে চাঁদ জাগিয়া রহে
বিতান ভরা পুষ্প যত
হাসিয়া হ'ল সারা !
আমারি লাগি তোমার স্নেহ
বহিছে ধরা প'রে—
ছয় ঋতুরে সাজা'য়ে শুধু
পাঠাও মোরই তরে।
আমি যে আছি, তারই লাগি
নিত্য দেখি উঠে'
তোমারি শত রূপের রাশি
কালিমা যত ফেলিছে নাশি'
দীপ্ত করি' ভুবন খানি
আলোর রেখা ফুটে।
আমারে তুমি বেসেছ ভাল
তাই গো প্রেমের মায়া—
জগৎ জুড়ি' রয়েছে জেগে
নিবিড় প্রীতি-ছায়া।
আমারি ঘরে তোমার হবে
নিত্য আসা যাওয়া,
চিত্ত-বীণা গভীর রবে
বলিছে তুমি আমারি হবে
সফল করি' জীবন-ভরা
তোমারি পথ-চাওয়া।
মোর যে জনম তোমারি তরে
তাই বুঝায়ে দিয়ো
আমি যে শুধু তোমারি ওগো
তুমিই প্রাণের প্রিয় !

কলিকাতা, ৩০এ রামপ্রসাদ লেনে মণিকা প্রেসে শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক ৩০ বি পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেনে অর্চ্চনা কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২১শ ভাগ] { কার্ত্তিক, ১৩৩১ । { [৯ম সংখ্যা

কপালকুণ্ডলা।

(সমালোচনা)

[শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী]

কপালকুণ্ডলা দুর্গার একটি নাম। ভবানীর কন্যা, ভবানীর সেবিকা, ভবানীর পাদপদ্মে সমর্পিতা, তাই কপাল-কুণ্ডলা নাম। ভবভূতির "মালতীমাধবে" অঘোর ঘণ্টের শয্যা এক ভীষণ ভৈরবী কপালকুণ্ডলার পরিচয় আছে। স ভৈরবী, পিশাচিনী; এ যোগিনী দেবী। সে ভীষণ প্রকৃতি; এ দয়াবতী। ভবানীর আমরণ উপাসিকা লিয়াই হউক, ভৈরবীরূপ কল্পিতা বলিয়াই হউক, আর াক্তিপূজার বলি রূপে রক্ষিতই হউক—এ নাম সার্থক। লা বাহুল্য, তান্ত্রিকের পালিতা কন্যা বলিয়া তান্ত্রিকের প্রদত্ত কপালকুণ্ডলা নাম—ইহা সাধারণ কথা।

কপালকুণ্ডলা মহাকবি বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি কথা, উপাখ্যান, কাব্য বা উপন্যাস। ইহা নায়িকা-প্রধান। কপালকুণ্ডলা গ্রন্থের নায়িকা। অলঙ্কার শাস্ত্রের লক্ষণ-গুলি ঠিক না মিলিলেও ইহাকে মুগ্ধা নায়িকার মধ্যেই ফেলিতে হয়। বাস্তবিকই প্রথমাবতীর্ণ যৌবনা, এমন সরলা মুগ্ধা বালা, মুগ্ধা নায়িকা বলিয়া না—এ এক অপূর্ব্ব নূতন রকমের মুগ্ধা নায়িকা। এই অপূর্ব্ব মুগ্ধা নায়িকাকে সৃষ্টি করা, এই অত্যাশ্চর্য্য অসংসারিণী প্রকৃতি শিশুটির চিত্র প্রদর্শন করাই এই কথা রচনার প্রধান উদ্দেশ্য—তজ্জন্যই নায়িকার নামে এই কথা-গ্রন্থখানির নামকরণ করা হইয়াছে।

সংস্কৃত কথা-গ্রন্থও "কাদম্বরী ও বাসবদত্তা" এই নায়িকার নামেই পরিচিতা। সংস্কৃত নাট্য গ্রন্থ ও রত্নাবলী, অভিজ্ঞান শকুন্তল, "প্রভাবতী", "কর্পূরমঞ্জরী", "চন্দ্রকলা" ও "কুন্দমালা" পরে বর্ত্তমান গ্রন্থকারেরও "দুর্গেশনন্দিনী", "মৃণালিনী", "দেবীচৌধুরাণী", "ইন্দিরা", "রজনী", "রাধারাণী", "ভ্রমর", এই কপাল-কুণ্ডলা প্রভৃতি পুস্তক নায়িকার নামেই প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালা কাব্যে "পদ্মিনী", "রঙ্গমতী", (নবীন সেনের) "ব্রজা-ঙ্গনা", "চিত্রাঙ্গদা", (নাটক হইলেও কাব্য) প্রভৃতি কাব্য নায়িকার নামেই অভিহিত। কপালকুণ্ডলা এই নায়িকাকে অবলম্বন করিয়া প্রধানভাবে রসটিকে ফুটান হইয়াছে বলিয়া কপালকুণ্ডলা নামে ইহার পরিচয় সার্থক। "কপালকুণ্ডলামধিকৃত্য যা কথা প্রবর্ত্ততে সা কথা কপাল-কুণ্ডলা" কপালকুণ্ডলাকে অধিকার করিয়া যে কথা প্রস্তা-বিত—তাহাই কপালকুণ্ডলা গ্রন্থ। এখানে গ্রন্থের সহিত ঐকাত্ম্য হইয়াছে।

কাহারও কাহারও মতে এই গ্রন্থখানি কবির শ্রেষ্ঠ

গ্রহ। "ভিন্ন রুচিহিলোকঃ" যাহার যেমন রুচি, তিনি সেই মতই বলিবেন। তবে ইহা সত্য কপালকুণ্ডলা চরিত্রটি কবির এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এ যেন স্বপ্ন গঠিত, স্মৃতি দিয়া নির্ম্মিত, চন্দ্রকিরণ নিংড়িয়া রচিত। এ যেন শিশুর হাস্য, বালিকার স্নেহ, পূজারিণীর অহেতুকী ভক্তি, এ যেন স্বর্গের পারিজাত, দেবতার অমৃত, গোলকের প্রেম। ইহা বুদ্বুদের মত ফুটে, যূথিকার মত দুলে; আর শেফালিকার মত ঝরিয়া পড়ে। এ এক সঞ্চারিণী জীবন্ত জ্যোতি—যেথান দিয়া যায়—সেইখানটি আলোকময় হইয়া উঠে। ইহার স্বাভাবিক দাহিকা শক্তি নাই—কিন্তু যেই ইহার অপব্যবহার করে, ইহার দ্বারা নিজ লালসার তৃপ্তি করিতে চাহে, ইহাকে রঙ্গিণীরূপে আয়ত্ত করিতে চাহে—অথচ সেই পুড়িয়া মরে, তা সে ভীমকায় কাপালিকই হউক আর সৌম্যদর্শন সাংসারিকই হউক। স্পর্শের যে সামগ্রী নহে, সে কেবল দূর হইতে দেখিবারই বস্তু—তাহাকে স্পর্শ করা, দলিত করা, চক্ষুর উপর দাঁড় করাইয়া রাখা অমার্জ্জনীয় অপরাধ। ফল, তার কখনই শুভ হয় না, হইলেও তাই। দর্শনে যে কুষ্ঠিত হয়, স্পর্শে যে মুইয়া পড়ে—সে ফুলটি অতলে ভাসিয়া গেল। অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কাপালিক ভগ্নহস্ত, ব্যর্থকাম, পরিশেষে জীবন্মৃত হইয়া রহিল। আর সঙ্গে সঙ্গে নবকুমারও অতৃপ্ত বাসনারাশি বুকে করিয়া উন্মত্তের মত সেই অতলে ঝাঁপ দিল।

নায়ক নবকুমার দয়াবৃত্তির অনুপ্রেরণায় কাঠাহরণ করিতে গেল; ফলস্বরূপ দয়াময়ী বনদেবীর সাক্ষাৎ মিলিল। কপালকুণ্ডলাই সেই বনদেবী "গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণী মূর্ত্তি।" সে যেন সাগর-হৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণ রেখা, সে যেন বিপন্ন উদ্ধারের জন্য সমাগতা মূর্ত্তিমতী করুণা! বিপন্নের প্রতি করুণা রমণীর একটি বিশেষ গুণ। বিশেষতঃ কাপালিকের নৃশংস কার্য্যের মধ্যে থাকিয়া, সংসারের উপল-বিষম পথের সঙ্গে পরিচিত না হইয়া এই স্বভাবগুণ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

করুণাময়ী কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে বিপন্নের প্রতি প্রথম সহানুভূতি জাগিল। "পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ।" তার পরেই সেই সহানুভূতিটি দয়ারূপে ফুটিয়া উঠিল। "আইস" বলিয়া সেই মন্দানিল সঞ্চালিতা শুভ্র মেঘমালা নবকুমারকে কুটীরে পৌঁছাইয়া দিল। সে দয়ার সঙ্গে একটি উদ্বেগও ছিল;—নতুবা কপালকুণ্ডলার সেই নবকুমারের মুখে ন্যস্ত অনিমেষ দৃষ্টি দেখিয়া আমরাও বলিতে পারিতাম—

নিবারিতনিমেষাভিনেত্রপঙ্‌ক্তিভিরুন্মুখঃ।
নবামিন্দুকলাং লোকঃ কেন ভাবেন পশ্যতি॥

নবকুমারের মনে হইল—এ যেন তারই হৃদয়ের বীণা বাজিয়া উঠিয়াছে। এ যেন সুখময় সঙ্গীত প্রবাহ সংসার সাগরের মাঝখান দিয়া বহিয়া যাইতেছে। এ যেন হর্ষ বিকম্পিত পরিচিত ধ্বনি বাতাসে সাগরনাদে ভাসিয়া চলিয়াছে। সে বীণা থামিয়া গেল, সে সঙ্গীত, সে ধ্বনি আর শ্রুত হইতেছিল না; তখন নবকুমার করতলে মস্তক রাখিয়া ভাবিতে লাগিল—একি দেবী—মানবী না কাপালিকের মায়া।

তখন সন্ধ্যালোক অন্তর্হিত হয় নাই—কাপালিক অগ্রে অগ্রে, নবকুমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুবর্ত্তী। বিপন্নের প্রতি দয়া এইবার ব্যাকুলতায় পরিণত হইল। সে আকুলতা ভরা বাণী—"যাইও না—ফিরিয়া যাও—পলায়ন কর"—এই কথা বার বার তিনবার উক্তি অন্তরের ব্যাকুলতারই সূচক।

নবকুমার ফিরিল না—পলায়ন করিল না—তখন সেই ব্যাকুলতা কপালকুণ্ডলাকে উদ্ভ্রান্তা করিয়া তুলিল। কাপালিক পার্শ্বে আছে, সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া, কাপালিককে অত ভয়—তাহাও তুচ্ছ করিয়া উদ্ভ্রান্তা বালা তীরের মত বেগে ছুটিয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল—"এখনও পলাও, নরমাংস না হইলে তান্ত্রিকের পূজা হয় না, তুমি কি জান না?"

কি ক্রোধাদি কুবৃত্তির দ্বারা, কি দয়াদি সুবৃত্তির দ্বারা মানব অসম সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে যে বীরত্ব প্রদর্শন করে, সে যুদ্ধবীর; দয়ার ক্ষেত্রে যে বীরোচিত ভাব দেখাইতে পারে, সে দয়াবীর। কাপালিকের অজ্ঞাতসারে খড়্গ লইয়া পলায়ন, প্রাণভয় তুচ্ছ করিয়া

নবকুমারের বন্ধন মোচন—এখানে দয়া বীরত্বের কার্য্য। দয়াবীর ব্যতীত এই কার্য্য কেহ করিতে পারে না। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে বীররসের প্রস্তাবে দয়াবীর, দানবীর, ধর্ম্মবীর ও যুদ্ধবীর, এই চারি প্রকার বীরের কথা বলা হইয়াছে। অমাবস্যার ঘোরান্ধকার যামিনীতে উর্দ্ধশ্বাসে বনমধ্যে প্রবেশ—এখানে বীররসের স্থায়ীভাব উৎসাহেরই কার্য্য। বড় রকমের একটি উৎসাহের প্রেরণায় তাই সে আজ নবকুমারকে লইয়া গভীর বনপথে ধাবমানা, তাই সে আজ অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্তা। এই উৎসাহ স্থায়ীভাব, ক্ষণিক বা ব্যভিচারী ভাব নহে। স্থায়ী বলিয়াই নবকুমারকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া তাহার কোন অবসাদ আসিল না। তাই সে নবকুমারকে রাখিয়া সমুদ্রতীরে কাপালিকের নিকট ফিরিবার সঙ্কল্প করিল। উৎসাহটি ক্ষণিক বা ব্যভিচারী হইলে অধিকারী গৃহে আসার পরই সে উৎসাহ তাহার নিভিয়া যাইত। কপালকুণ্ডলা নির্ভীক, আপনার প্রাণের ভয় সে আদৌ করে নাই। নচেৎ সে কাপালিকের নিকট প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ করিত না। অথচ কাপালিকের নিকট ফিরিয়া গেলে তাহার রক্ষা নাই, তাহাও সে বিলক্ষণ জানিত। উপায় কি ?

কালিকার উপর কপালকুণ্ডলার বড় ভক্তি। পূজক অধিকারী "এই পথিকের সঙ্গে দেশান্তরে যাও" এই বলিয়া মায়ের অনুমতি আনিতে গেলেন। পুষ্পপাত্র হইতে একটি অচ্ছিদ্র বিল্বপত্র মন্ত্রপূত করিয়া মায়ের পাদপদ্মে অর্পণ করিলেন। ভক্তের প্রদত্ত সেই অর্ঘ্য মা গ্রহণ করিলেন। অর্ঘ্য গ্রহণ মঙ্গলেরই সূচক। কপালকুণ্ডলাও বুঝিল, ইহাতেই তাহার মঙ্গল। জগন্মাতা শিবের বিবাহিতা—আর বিবাহ—স্ত্রীলোকের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য! পক্ষান্তরে কাপালিকের নিকট প্রত্যাবর্ত্তনও বিপজ্জনক। নানাদিক ভাবিয়া অধিকারীর কথায় কপালকুণ্ডলা স্বীকৃতা হইল। আর নবকুমারের প্রাণরক্ষা করিয়া তাহার উপর একটি করুণা এবং সমবেদনার ভাবও জাগিয়াছে। সেটিও একটি আকর্ষণ। হউক সূক্ষ্ম, হউক অব্যক্ত, তথাপি ইহা আকর্ষণ।

কপালকুণ্ডলা প্রকৃতির দুহিতা। যদি সে অরণ্যবাসিনী কালীভক্তা অসংসারিণী না হইত কিম্বা যদি সে রক্তমাংসময় হৃদয়সমন্বিতা যৌবনবতী সাধারণ রমণীর মতন হইত; তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারিতাম, নবকুমারের মত সুপুরুষ সংস্পর্শে তাহার নারী হৃদয় নিশ্চয়ই স্পন্দিত হইয়া উঠিত; এবং সে নিশ্চয়ই আপনার প্রাণ মন নবকুমারের পদে অবশ্যই অর্ঘ্যস্বরূপ অর্পণ করিত! কপালকুণ্ডলা—কপালকুণ্ডলা বলিয়াই রমণীর হৃদয়ের স্বাভাবিক ভাবটি তাহাতে দেখা গেল না। শকুন্তলা, মিরাণ্ডা, মহাশ্বেতা প্রভৃতিতে যাহা দেখা গিয়াছিল, কপালকুণ্ডলায় তাহা দেখা গেল না। রমণীর হৃদয়ের স্বাভাবিক ভাব এখানে ফুটিল না। নবানুরাগই এখানে স্বাভাবিক ভাব। যৌবনের দুরতিক্রম প্রভাব যাহাতে দেখা গেল না—সে কেমন নারী? এ যেন মর্ত্ত্যের নারী নহে, এ যেন এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। পরে মন্ত্রের শক্তিতে একত্র বসবাস করিয়াও কপালকুণ্ডলার হৃদয়-দর্পণে নবকুমারের ছায়াপাত দেখা যায় না। কাজেই সাংসারিক দৃষ্টিতে সাধারণ বিচারে—সে যেন প্রেমহীনা, হৃদয়হীনা পক্ষিণী। কিন্তু বস্তুত তাহাও নহে। নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া যে বিপন্নকে উদ্ধার করে, একাকিনী রাত্রে ঔষধ আনিয়া পতি-বিরহিতার সুখের জন্য স্বামীর অসন্তোষকে যে অগ্রাহ্য করে, পরিশেষে অপরিচিতার (পদ্মাবতীর) প্রার্থনায় যে পরের জন্য পতি, সংসার বর্ত্তমান আশ্রয় পতিত্যাগ করিতে স্বীকৃতা হয়, তাহাকে হৃদয়হীনা পাষাণী বলিব কিরূপে? এ যে চাঁদের আলো; প্রদীপের আলোর মত সাংসারিক কার্য্যে আইসে না বলিয়া ইহার উপযোগিতা কম কিসে? এ বন্য শিশুটি বিশ্বের উন্মুক্ত ময়দানেই ছুটাছুটি করিবে। বাঁধিয়া রাখিবার জিনিষই নহে। পিঞ্জরেই হউক আর বড় করিয়া বেড়ার মধ্যেই হউক, ইহাকে বাঁধিয়া রাখিলে সে সুখী হইতে পারিবে না। মায়ের পাদপদ্মের ফুল পাদপদ্মেই থাক্, তাহাকে তুমি নিজের শোভার জন্য লইবে কেন? প্রকৃতির অকৃত্রিম শিশুটি, তুমি তাহাকে কৃত্রিম আবহাওয়ার মধ্যে আনিয়া গৃহাঙ্গণে রোপন করিয়া রাখিবে কেন? যিনি ক্লান্ত সহযাত্রীদিগের জন্য মাথায়

কাষ্ঠভার বহিয়াছিলেন, তিনি যে কৃতোপকারিণী সন্ন্যাসিনীর জন্য অতুল রূপরাশি হৃদয়ে বহিতে চাহিবেন, তাহাতে বৈচিত্র্য কি? গোধূলি লগ্নে নবকুমারের সহিত কাপালিক-পালিতা সন্ন্যাসিনীর বিবাহ হইয়া গেল। যাত্রাকালেও কপালকুণ্ডলা একটি বিল্বপত্র মাতৃ পাদপদ্মে অর্পণ করিল, কিন্তু সে বিল্বপত্রটি পড়িয়া গেল; ভক্তিপরায়ণা নিতান্ত ভীতা হইল। অধিকারী বুঝাইলেন, "পতি মাত্রই তোমার ধর্ম্ম।" পতি শ্মশানে গেলে তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইবে। কপালকুণ্ডলা কিন্তু ভয় ও ভাবনা লইয়া পতিসহ যাত্রা করিল। এই বিল্বপত্রচ্যুতি ব্যাপারটি কালছায়ার মত কপালকুণ্ডলার চিত্তে চির অঙ্কিত রহিল। পরে ননদ শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে কথোপকথনে তাহা পরিস্ফুট হইল।

পথিমধ্যে চটিতে দোকান-ঘরের আর্দ্র মৃত্তিকায় কপালকুণ্ডলাকে একা বসিয়া থাকিতে দেখিলাম। নিবিড় কেশরাশি পশ্চাদভাগ অন্ধকার করিয়া আছে। চঞ্চলা হরিণীর মত সে সমুদ্রের তীরে তীরে ছুটাছুটি করিয়া আসিয়াছে। দোকান-ঘরের আর্দ্র মৃত্তিকার উপর বসিয়া থাকিতে আর তাহার ভাল লাগিবে কেন? সাগর জলে জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকিতে যে অভ্যস্ত, এই প্রদীপের মিটমিটে আলো তাহার মনে ধরিবে কেন? কপালকুণ্ডলা দেখিতে পাইতেছিল না যে, সংসারের কালিমারাশি পশ্চাদ্দিক হইতে তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে।

মতিবিবি যখন প্রদীপটি তুলিয়া কপালকুণ্ডলাকে অনিমেষলোচনে দেখিতেছিল, তখন কপালকুণ্ডলা মাত্র বিকম্পিতা হইল। মানুষ যখন কোন বিষয় বুঝিতে পারে না কার্য্য দেখিয়া তাহার কারণ বা উদ্দেশ্য ধরিতে পারে না, তখন সে বিস্ময় মাত্রই প্রকাশ মাত্র। মতিবিবি যখন আপনার শরীর অলঙ্কাররাশি মুক্ত করিয়া একে একে কপালকুণ্ডলাকে পরাইতে লাগিল, তখনও কপালকুণ্ডলা নির্ব্বাক। বিস্ময়ের উপর বিস্ময় আসিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। ঐরূপ ভাবে দেখেই বা কেন? ঐ মহামূল্য অলঙ্কাররাশি পরাইয়াই বা এ দিতেছে কেন? এই সমস্যার মীমাংসা প্রখর বুদ্ধিশালিনী রমণীই পারে না; কপালকুণ্ডলার ত কথাই নাই। তবে সাধারণ স্ত্রীলোকে অলঙ্কার বোঝে, তাহার মর্য্যাদা জানে, কপালকুণ্ডলা সে বিষয়ে সম্পূর্ণই অজ্ঞ, কাজেই অলঙ্কার পাইয়া তাহার তজ্জন্য কোন আনন্দের উদয় হইল না। বিধাতা তাহাকে বয়সই দিয়াছেন, বয়সের সঙ্গে অবয়বের পরিপূর্ণতা মাত্রই দিয়াছেন কিন্তু সেই মানসিক ভাব নিচয়ের পূর্ণতা প্রদান করেন নাই।

কপালকুণ্ডলা সংসার অনভিজ্ঞা নিতান্ত বালিকা। নচেৎ অকপট হৃদয়ে কৌটাসমেত সকল গহনাও ভিক্ষুকের হস্তে দেয়? বিহ্বল ভিক্ষুক এদিক-ওদিক চাহিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে গহনা লইয়া পলায়ন করিল। ক্ষুদ্রবুদ্ধি বালিকা ভাবিল "ভিক্ষুক দৌড়াইল কেন?"

এইবার সংসার বুদ্ধি, এইবার সাধারণ জ্ঞানের পরিচয়। এই সেই মুগ্ধা প্রকৃতির কন্যা আজ সংসারের ঘরণী গৃহিণী হইবে, যুবক নবকুমারের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি করিবে। নবকুমারের গৃহে আসিয়া কপালকুণ্ডলা সংসারিণী হইল। সেই এলায়িত কেশ-তরঙ্গমালা ননদ শ্যামা জোর করিয়া কখন কখন খোঁপা বাঁধিবার চেষ্টা করিত। সেই যোগিনীকে বসনে সাজাইতে যত্ন পাইত। তথাপি মৃন্ময়ীর মুখখানি অবিন্যস্ত কেশভারে অর্দ্ধ লুকাইতই থাকিত। অন্তরে সে যোগিনী, প্রকৃতিতে, রুচিতে, কার্য্যে ও ব্যবহারে তাহার একটা ঔদাসীন্য, অনাসক্তি ও অবহেলা প্রকাশ পাইত। এজন্য ননদ শ্যামা যোগিনী ও তপস্বিনী বলিয়া অনুযোগ করিত। শ্যামা ভাবিত পরশ পাথরের স্পর্শে রঙ্ (রাঙ্) ও যখন সোনা হয়, পুরুষ প্রণয়ে যোগিনীই বা সংসারী হইবে না কেন? বাস্তবিক অনেক বুনো স্বভাবের মেয়ে মানুষ এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গৃহিণী-পদবাচ্য হয়। সংসারে এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

মৃন্ময়ী অন্তরে এখনও সেই কপালকুণ্ডলাই আছে, স্বভাবের প্রভাব তাহার মনের উপর সেরূপ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। তাই সে স্বামীকে "ব্রাহ্মণ কুমার" বলিয়া নির্দ্দেশিত করিত। শ্যামা দেখিল, মৃন্ময়ী যে নবকুমারের প্রাণঢালা ভালবাসায় একটু আকৃষ্টা হয় নাই; শ্যামা প্রভৃতির যত্নে একটুও কৃতজ্ঞা পর্য্যন্ত হয় নাই, তাহা নিজের কথাটিতেই প্রকাশ পাইয়াছে।

"বোধ করি সমুদ্রের তীরে সেই বনে বনে বেড়াতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।"

মৃন্ময়ীর অবস্থা আদৌ সুখের নহে। সংসারে তাহার সুখ বোধ হয় না, আবার সমুদ্রতীরে বনে বনে বেড়াইতে পারিলে সুখ জন্মিবে—এ সম্বন্ধেও স্থির বিশ্বাস নাই। অথচ মৃন্ময়ী সেই সংসারেই থাকিবে; সমুদ্রতীরে ফিরিয়া যাইতে চাহে না। আবার অবস্থাচক্রে তাহার উপর যাহা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা সে অবলম্বন করিতে বাধ্য। জগন্মাতা শিবের সহধর্ম্মিণী "পতি ব্যতীত স্ত্রীলোকের অন্য গতি নাই।" অধিকারীর এ কথাটি সে বিশ্বাস করিয়া আছে। সমুদ্রতীর হইতে যাত্রার সময়ে "ত্রিপত্র মা ধারণ করিলেন না—অতএব কপালে কি আছে জানি না।" এই ঘটনাটি তাহার চিত্তে এমনই একটি আশঙ্কা জাগাইয়া রাখিয়াছে, যাহা সে এক্ষণের জন্যও ভুলে না। ঐ ভয়টি না জাগরূক থাকিলে ভালই হইত, মৃন্ময়ীর হয়ত কিছু পরিবর্ত্তন দেখা যাইতে পারিত। কিন্তু মৃন্ময়ীকে যোগিনী ও তপস্বিনী রাখাই যখন বিধাতার অভিপ্রায়, তখন অবশ্য ঐ পরিবর্ত্তন না হওয়াই স্বাভাবিক হইয়াছে।

"মা ত্রিপত্র গ্রহণ করিলেন না" সংসারিণী শ্যামা ইহা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। কোন্ হিন্দুনারী না শিহরিয়া উঠে? কপালকুণ্ডলা ত ভবানীভক্তা! সে ত ইহা অশুভ-জনক ভাবিবেই। ত্রিপত্রচ্যুতি কালে সেও ভীতা হইয়াছিল এবং অধিকারীকে সে ঘটনার কথা না বলিয়া থাকিতে পারে নাই। শ্যামাকে ঘটনাটি বলিয়া এক্ষণে কেবল নীরব হইল। কপালকুণ্ডলা যদি সংসারিণী হইত, শ্যামার মত পতিপ্রেমই নারীজীবনের সার ভাবিত, পুত্র—সংসারের সোনার পুত্তলি ছেলে কোলে করাই সংসারের পরম সুখ মনে করিত, তাহা হইলে শ্যামার মত শিহরিয়া উঠিত।

সংসারিণী পতিপ্রেমাকাঙ্ক্ষিনী শ্যামার পার্শ্বেই এই উদাসিনীর চিত্রটি সুন্দর ফুটিয়াছে। একজন বলে, "ফুলটি ফুটিলে ফুলেরও সুখ, লোকের দেখিয়াও সুখ" অপর জন বলে "ফুলেরই সুখ, লোকের কি?" একজন ভাবে "প্রমোদ কাননে মাধবীর মত সহকারকে আলিঙ্গন করিয়া থাকাই সুখ!" অন্য জন ভাবে "সমুদ্রতীরে বনে বনে বন্য হরিণীর মত ছুটিয়া বেড়াইলেই সুখ" আসক্তির পার্শ্বে অনাসক্তি ফুটে ভাল। আকুলতার হাত ধরিয়া উদাসীনতা দাঁড়াইলে দেখায় সুন্দর।

সমুদ্রতীরের সেই ভূষণহীনা আলুলায়িত-কুন্তলা কপাল-কুণ্ডলা আর সে কপালকুণ্ডলা নহে। স্পর্শমণির স্পর্শে যোগিনী বাহ্যত গৃহিণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই কৃষ্ণোজ্জ্বল আগুল্ফলম্বিত কেশরাশি স্থূল বেণীরূপে পরিণত হইয়াছে। মুখমণ্ডল আর অবিন্যস্ত কেশভারে অর্দ্ধলুক্কায়িত থাকে না। কর্ণে হেমকর্ণ ভূষণ, কণ্ঠে হিরন্ময় কণ্ঠমালা দোলে, পরিধানে শুক্লাম্বর, অর্দ্ধচন্দ্র-দীপ্ত আকাশ মণ্ডলে শুক্ল মেঘের ন্যায় শোভা পায়।

মৃন্ময়ী বাহ্যতঃ গৃহিণী বটে, অন্তরে কিন্তু এখনও অর্দ্ধ যোগিনী। সংসার এখনও তাহাকে বাঁধিতে পারে নাই। প্রণয় এখনও তাহাকে অন্তরের সংসারিণী করে নাই। স্পর্শমণি স্পর্শে এখনও তাহার ভিতরটি সোনা হইয়া উঠে নাই। হৃদয়ে অদম্য বন্য স্বভাবটি সামান্য আঘাতেই মাথা খাড়া দিয়া উঠে।

শ্যামার জন্য ঔষধ আনিতে যাইব, একজনের জীবনের সুখ শান্তি আনয়ন করিব, তাহাতে লোকে অন্যায় বলিবে কেন? স্বামীই বা অসুখী হইবে কেন? কপালকুণ্ডলা ইহা ভাবিয়া পায় না। আর লোকে অন্যায় যদি বলে, স্বামীই যদি অসুখী হন, তাহাতে কপালকুণ্ডলা পশ্চাৎপদ নহে। তার সেই দুদ্দমনীয় যে অরণ্য স্বভাবটি ক্রমে ক্রমে চাপা পড়িতে-ছিল, তাহা আজ দ্বিগুণ বিক্রমে চাড়া দিয়া উঠিল। ইহাতে তিনি অসুখী হন, আমি কি করিব? যদি জানিতাম যে বিবাহ স্ত্রীলোকের দাসীত্ব,তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না। বুঝা গেল এ বন্য মৃগী বনেই রহিবে, সংসারে বাঁধা থাকিবে না। এ সিংহীকে পিঞ্জরে বাঁধিয়া রাখে, এমন পিঞ্জর আজিও প্রস্তুত হয় নাই। সংসারে আত্মসম্মান আহত হইলে, নারী-হৃদয় অপমানিত হইলে ক্রুদ্ধা নারী এমন কথা বলে। অভিমান বশে দারুণ অভিমানিনী রমণীও এমন কথা বলিয়া থাকে। উহা সচরাচর ক্রোধোত্তেজিত বা অভিমানোদ্বেলিত হৃদয়ের একটি ক্ষণিক উচ্ছ্বাস মাত্র। কিন্তু কপালকুণ্ডলার একথা তাহার নিরুদ্ধপ্রায় স্বভাবেরই অভিব্যক্তি। ক্ষণিক উচ্ছ্বাস মাত্র নহে।

তারপর জ্যোৎস্না নিশিতে একাকিনী নির্ভীক নারী ঔষধ আনিতে গেল। ননদ শ্যামার কথাতে তাহার সেই দুর্দ্দমনীয় আরণ্য স্বভাবটি এমনই মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে যে পতির অমন স্নেহ পূর্ণ কোমল স্বরেও সে অপ্রসন্না হইয়া উঠিল। "আমি তোমার সঙ্গে যাইব" এই কথাটিতেই, সেই উত্তেজিতপ্রায় অপ্রসন্না কপালকুণ্ডলা গর্ব্বিত বচনে বলিল, "আমি অবিশ্বাসিনী কি না স্বচক্ষে দেখিয়া যাও" ইহাও প্রণয়িনী রমণীর অভিমানের বাণী নহে। তবে বাধা প্রাপ্ত হইলে দুর্দ্দমনীয় চিত্তে যেমন একটি ক্রোধের ভাব দেখা যায়, সেই স্বাভাবিক ক্রোধের ভাবই এই কথাটির মধ্যে মিশ্রিত ছিল।

কপালকুণ্ডলা নিবিড়তর বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। পথ ক্রমে অগম্য হইতে লাগিল, মাথার উপর বৃক্ষের ঘনচ্ছায়ার চন্দ্রালোক একেবারে রুদ্ধ হইয়া আসিল। শৈশব হইতে স্বভাবতঃ সে ভয়শূন্যা, কিন্তু রমণী স্বভাব-সুলভ কৌতূহল বশে তবু আলোক লক্ষ্যে অগ্রসর হইল। "নিশীথ রাত্রে ভগ্নগৃহেব মধ্যে দুইজন কি কুপরামর্শ করিতেছে—" এই ভাবিয়া তাহার মনে একটি আগ্রহের ভাবও জাগিয়া উঠিল। সংসারের আবহাওয়ার মধ্যে আসার ফলে সঙ্গে সঙ্গে একটি শঙ্কার ভাবও ফুটিয়া উঠিতেছিল।

অকস্মাৎ ব্রাহ্মণবেশী পদ্মাবতী আসিয়া কপালকুণ্ডলার হস্ত ধরিল। কপালকুণ্ডলাও তৎক্ষণাৎ অতি ক্রোধে সে হস্ত মুক্ত করিয়া লইল। পরপুরুষে আসিয়া হস্ত ধরিলে সতী নারী তড়িচ্ছটার মত অবস্থা প্রাপ্ত হয় কিম্বা অগ্নি-শিখার মত জ্বলিয়া উঠে, অথবা লজ্জাবতী লতার মত মরমে মরিয়া যায়। পরপুরুষের স্পর্শে কপালকুণ্ডলার ঠিক সে ভাব হইল না। তবে পরপুরুষের অনধিকাব স্পর্শ যে অত্যন্ত অন্যায়, আর কুলবতী নারীর প্রতি এই স্পর্শ যে অমর্য্যাদাকর, এ ধারণা অবশ্য তাহার ছিল। ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্ব্বক এই হস্ত গ্রহণে ভয় হওয়া দূরে থাক্, ইহাতে কপালকুণ্ডলার দৈহিক ও মানসিক বল যেন বর্দ্ধিতই হইল। তারপর রমণী-পরিচয় দিয়া ব্রাহ্মণবেশী তাহাকে বহির্দ্বারে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া গেল। "নিজের সম্বন্ধে কথা" এই ভাবিয়া কৌতূহলময়ী রমণী সেই গভীর রাত্রে একাকিনী সাগ্রহে ব্রাহ্মণবেশীর প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

"কি জানি কি ঘটিবে" এই ভাবিয়া এদিকে ব্রাহ্মণ-বেশীও অত্যধিক বিলম্ব করিতেছে, আর ওদিকে আকাশ-মণ্ডলও ঘনঘটায় মসীময় হইয়া আসিতেছে দেখিয়া কপালকুণ্ডলা গৃহে ফিরিতে মনস্থ করিল। বনভাগের সামান্য আলোকও তখন নির্ব্বাপিত। কপালকুণ্ডলার তখন মনে হইতেছিল, কে যেন পশ্চাতে অনুসরণ করিতেছে; ইহা ভীরু হৃদয়ের কল্পনামাত্র নহে। আকাশ নীল মেঘ-মালায় ভীষণতর হইল। ভীষণ ঝটিকা বৃষ্টি মাথার উপর দিয়া বহিতে লাগিল। ঘন গম্ভীর মেঘধ্বনি, বজ্রের কড় কড় রব, আর বিদ্যুতের ঘন চমকানির মধ্য দিয়া কপাল-কুণ্ডলা কোন মতে বাটী আসিয়া পৌঁছিল। দ্বার বন্ধ করিতে গিয়া দেখে, অদূরে ভীষণ-দর্শন দীর্ঘকায় কাপালিক দণ্ডায়মান।

ক্লান্তি, উৎকণ্ঠা এবং দুশ্চিন্তায় কপালকুণ্ডলা শয়ন করিল। তখন তাহার হৃদয়-সাগরে কত তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, কে গণনা করে? কপালকুণ্ডলার মানস-পটে তখন ফুটিয়া উঠিল—কাপালিকের সেই জটাজূট ভীষণ মুখশ্রী, সেই নরমাংসে ভৈরবীর পূজা, আর সেই নব-কুমারের সুকঠিন হস্তপদবন্ধন।

অতীতের যবনিকা সরিয়া গেল। তখন তাহার সম্মুখে বর্ত্তমানের ছবি আসিয়া দাঁড়াইল। নবকুমারকে তিরস্কার করিয়া রাত্রিকালে একাকিনী অরণ্যে গমন, ব্রাহ্মণবেশী কর্ত্তৃক সহসা তাহার হস্ত ধারণ, ঝড় বৃষ্টির মধ্য দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন, আর সর্ব্বশেষে গৃহদ্বারে কাপালিকের ছায়া দর্শন, এই সমস্ত চিন্তা আসিয়া কপালকুণ্ডলাকে অভিভূত করিয়া দিল।

কপালকুণ্ডলা স্বপ্ন দেখিল। সংসার-সিন্ধুতে ভাসমান তাহার জীবন-নৌকাখানিকে ডুবাইয়া দিবার জন্য কাপালিক অগ্রসর। ব্রাহ্মণবেশী আসিয়া উদ্ধার করত জিজ্ঞাসা করিল, "রাখিব, না ডুবাইয়া দিব?" বলিয়াই নৌকাখানিকে ভাসাইয়া দিল। শেষে সেই নৌকাই শব্দময়ী হইয়া "আমি আর এ ভার সহিতে পারি না" বলিয়া নিজেই পাতালে প্রবেশ করিল। কপালকুণ্ডলা নিজের ভবিষ্যৎই স্বপ্নে দেখিল। নিষ্পাপ অকলুষ সম্ভ্রম মনে

ভবিষ্যতের ছায়াপাত সহজেই ঘটে। তাহার নিয়তিই এই। প্রকৃতির নিষ্পাপ শিশুটিকে কে মারে? প্রকৃতি আপনিই তাহাকে ক্রোড়ে স্থান দিল। শুনিয়াছি, একদিন ধরিত্রী জনকনন্দিনী সীতাকেও এইরূপে বক্ষে তুলিয়া লইয়াছিল। কাপালিকের সাধ্য কি ডুবায়? ব্রাহ্মণবেশী পদ্মাবতীর শক্তি কি, রক্ষা করে? আর নবকুমারেরই বা সামর্থ্য কোথা, বলি দেয়? সাগর-গর্ভেই তাহার আবির্ভাব, সাগর-গর্ভেই তাহার বিলয়।

ব্রাহ্মণবেশী পদ্মাবতীর পত্র পাইয়া কপালকুণ্ডলা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করাই মনস্থ করিল। কবিই বলিয়া দিয়াছেন—কপালকুণ্ডলা কৌতূহলপরবশ রমণীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিল, নৈশভ্রমণ-বিলাসিনী সন্ন্যাসী পালিতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিল, জলন্ত বহ্নিশিখার পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিল। গভীর রাত্রে বনাভিমুখে কপাল-কুণ্ডলা প্রস্থিতা হইল, সঙ্গে সঙ্গে গৃহের প্রদীপও অমনি নিভিয়া গেল। সংসার সুখের আজ সমাপ্তি, জীবন-দীপের আজ নির্ব্বাণ, গৃহের প্রদীপই বা জ্বলিবে কেন? পতির প্রাণে এত বড় আঘাত দেওয়ার ফলে কপালকুণ্ডলার এই মৃত্যু-পরিণাম—ইহা প্রকৃতির নিষ্পাপ শিশুটির পক্ষে খাটে না।

ব্রাহ্মণবেশী আপনাকে নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতী-রূপে পরিচয় দিল; এবং কপালকুণ্ডলার নিকট যাচিকার ভাবে পতি-ভিক্ষা চাহিল। তারপর "প্রাণদান দাও, স্বামী ত্যাগ কর" বলিয়া অট্টালিকা ধন দাস দাসীর প্রলোভন দেখাইল। মূর্খ পদ্মাবতী! পরের মঙ্গলের জন্য স্বামীর বারণ অগ্রাহ্য করিয়া যে রাত্রিকালে অরণ্যে একাকিনী ঔষধ আনিতে যায়, সে এক পরের মঙ্গলের জন্যই সমস্তই পতি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারে; সহস্র প্রলোভন নহে।

কপালকুণ্ডলা অন্তঃকরণ মধ্যে দৃষ্টি করিল, তথায় সংসার সুখের কোন প্রলোভন নাই, নবকুমারকেও সেখানে দেখিতে পাইল না। তবে কেন সে অপরের সুখের পথ রুদ্ধ করিয়া থাকিবে? পদ্মাবতীর কাছে প্রতিশ্রুত হইল "আমি তোমার সুখের পথ রোধ করিব না।" "তোমার মানস সিদ্ধ হউক— ... বিঘ্নকারিণী কোন সংবাদ পাইবে না।" "আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব।" এও দয়াময়ীর দয়া, পরার্থপরার আত্ম-ত্যাগ।

এই সরল নিষ্পাপ বালা যদি পদ্মাবতীর নিকট এই সত্য না করিত, তবে কাহারও সাধ্য ছিল না যে, বলপূর্ব্বক তাহাকে পতিত্যাগে বা সংসার পরিহারে স্বীকৃত করিতে পারিত। প্রকৃতির নিষ্পাপ শিশুর এমন কর্ম্মফল জন্মে নাই, যাহা তাহাকে অবশ করিয়া ফলাফলের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে।

কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে পতিপ্রেমের মুকুল ফুটিল না, সংসার-সুখের তরঙ্গ খেলিল না। তাহার উপর অতীত এবং বর্ত্তমানের ঘটনাপুঞ্জে তাহাকে এমন অসম্ভব রকমে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল, যাহাতে সে পদ্মাবতীর নিকট সহজেই পতিত্যাগ করিতে স্বীকার করিল। নিষ্পাপ পবিত্র প্রাণের আকাঙ্ক্ষা কখনও অপূর্ণ থাকে না, সেই স্বতঃ পবিত্র আত্মার বাণী কখনও অপূর্ণ থাকে না। "পদ্মাবতীর সুখের পথে বিঘ্নস্বরূপ থাকিব না।" এই প্রতিশ্রুত বাণীটি সফল হওয়া চাই; অথচ সংসারে থাকাও এখন আর চলে না। এখন তাহার অবস্থা ত্রিশঙ্কুর মত। আর বনবাসে সেই বনে বনে বেড়ান অর্দ্ধ মৃন্ময়ী কপালকুণ্ডলার পক্ষে অধুনা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে যে এখন, মনে না হউক, শিক্ষা এবং সংসর্গ গুণে কতকটা গৃহস্থভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সে যুবতী কুল-কামিনী, এখানে-ওখানে বেড়ান তাহার ভাল দেখায় না, ইহাও সে বুঝিতে শিখিয়াছে। বাহ্য দৃষ্টিতে সে যেমন আর বনচারিণী বালিকামাত্র নহে, মনে প্রাণে সে এখন আর আপনাকে তাহা ভাবিতেও পারে না; কাজেই কপালকুণ্ডলার আর বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব, সমুদ্রে ভাসিয়া যাওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। প্রকৃতির দুহিতা সংসারের তাপে জলিয়া পুড়িয়া জলময়ী প্রকৃতির স্নিগ্ধ বক্ষেই স্থান লাভ করিল। সমুদ্র-বসনা প্রকৃতি আপনার কন্যাকে স্বীয় অঙ্কে বিলীন করিয়া লইল। কপালকুণ্ডলা যেমন নিজে রহস্যময়ী—এই কারণে তাহার জন্ম রহস্যময়, চরিত্র

রহস্যময় এবং তাহার সংসার ... রহস্যময়, এমন কি তাহার সহসা অন্তর্দ্ধান পর্য্যন্ত রহস্যময়।

প্রকৃতির নবশিশুটি কোথা হইতে আসিল, কোথায় গিয়া মিশিল, এই তত্ত্বটি অজ্ঞেয় আবরণে আবৃত করিয়া রাখাই মহাকবি ভাল বুঝিয়াছিলেন। যে অপূর্ব্ব আশ্চর্য্যময়ী, তাহার সমস্তই অপূর্ব্ব ও আশ্চর্য্যময় করাই চরিত্র রচনার কৌশল। এই নিষ্পাপ কোরকটিকে সংসারের উদ্যানে সম্পূর্ণরূপে ফুটাইয়া কাজ নাই, বিলাসী যুবকের বিলাস সামগ্রী হইবার জন্য সে ত সৃষ্টা নহে। আর অরণ্যে ফুটাইয়াও ফল নাই, ফুটিলেই মধু জন্মিবে, ভ্রমর আসিয়া জ্বালাতন করিবে, বাতাসে কোন দিন হয়ত ভূমিসাৎ করিয়া দিবে, নয় ত তার সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত দলগুলি শুষ্ক হইয়া আপনা আপনি ঝরিয়া পড়িবে, ইহার কোনটিই অভিপ্রেত নহে। কপালকুণ্ডলার পরিণতি কপালকুণ্ডলার যোগ্যই হইয়াছে।

দেরাহুন।

[শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য]

দেরাহুন উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রান্ত সীমায় হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত। ইহা কলিকাতা হইতে সহস্রাধিক মাইল দূর। কলিকাতা হইতে দেরাহুন যাইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লাইনে মোগলসরাই পর্য্যন্ত আসিয়া সেখান হইতে আউধ এণ্ড রোহিলখণ্ড লাইনে যাইতে হয়। এই লাইন হরিদ্বার হইয়া দেরাহুন পর্য্যন্ত গিয়াছে। হরিদ্বার হইতে দেরাহুন লাইন খুলিবার পূর্ব্বে আউধ এণ্ড রোহিলখণ্ড লাইনের সাহারাণপুর ষ্টেসনে নামিতে হইত এবং তথা হইতে একা, ডাকগাড়ী বা টঙ্গা করিয়া যাইবার নিয়ম ছিল। একায় ১২।১৩ ঘণ্টা সময় লাগিত, ডাকগাড়ী বা টঙ্গায় ৭।৮ ঘণ্টা সময় লাগিত। ভাড়া একাতে ৪।৫ টাকা, এবং গাড়ীতে ২৫৲ টাকা দিতে হইত। টঙ্গায় তিন জন লোকের যাইবার ব্যবস্থা ছিল, তদনুসারে প্রত্যেক আরোহীর নিমিত্ত ১০৲ টাকা হিসাবে মূল্য নির্দ্ধারিত ছিল; একত্র তিন জনে সম্পূর্ণ টঙ্গা ভাড়া করিলে ২৫৲ টাকাতেই হইত। এখন রেলের রাস্তা হইয়া আর পূর্ব্বের ন্যায় ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না।

দেরাহুনের চতুর্দ্দিকেই পর্ব্বত সমূহে আবৃত। এই স্থানের চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বত হইতে কতিপয় নদী উৎপন্ন হইয়া দেরাহুনকে সজলা করিয়াছে। দেরাহুন ভেদ করিয়া যে সকল নদী গিয়াছে তাহা হিমোৎপন্ন নদী। দেরাহুনের পূর্ব্ব দিকে যমুনা, পশ্চিম দিকে গঙ্গা। উত্তর দিকে গুচ্ছপানি বা গুহ্যপানি। এই নদী দুইটী পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া প্রবাহিত। ইহার জলরাশি লোকলোচনের গোচর নহে, এই জন্যই কি ইহার নাম গুহ্যপানি অর্থাৎ গুপ্ত জলরাশি,অথবা অন্য কোন কারণ আছে বলিতে পারা যায় না। উত্তর দিকে আরও কতকগুলি নদী মসুরী হইতে নির্গত হইয়া দেরাহুন অতিক্রম পূর্ব্বক কোন নদী গঙ্গাতে, কোন নদী বা যমুনাতে পড়িয়াছে। দেরাহুনের দক্ষিণ সীমা হিমালয়ের শাখা শিবালিখ পর্ব্বত শ্রেণী। সমুদ্র সমতল ভূমি হইতে শিবালিখের উচ্চতা ৩০৬৫ ফীট। ইহার ঊর্দ্ধ দেশে একটি সুড়ঙ্গ আছে। পূর্ব্বে যখন সাহারাণপুর হইতে একা বা গাড়ী করিয়া যাইবার ব্যবস্থা ছিল, তখন এই সুড়ঙ্গ ভেদ করিয়াই যাইবার রাস্তা ছিল। ইহার উত্তর সীমা মসুরী এবং ল্যাণ্ডোর। এই ল্যাণ্ডোর পর্য্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের সীমা ইহার পরই স্বাধীন গড়বাল। দেরাহুন এরূপ ভাবে পর্ব্বত প্রাকারে বেষ্টিত যে দেখিলেই মনে হয় যেন হিমালয় এই সুদৃশ্য দেশকে গুপ্ত রাখিবার জন্য শিবালিখ রূপ বাহু দ্বারায় ইহাকে বক্ষে চাপিয়া রাখিয়াছেন। অন্যে যেন এই শোভা না দেখে, নিজের শোভা নিজেই দেখিবেন।

এখানে কুরুকুলগুরু দ্রোণাচার্য্যের আশ্রম ছিল। সেই দ্রোণের নাম অনুসারে এই স্থানের নাম দেরাহুন হইয়াছে। দ্রোণ শব্দের অপভ্রংশ দুন, দেরা = আশ্রম। দেরাহুনের

প্রকৃত নাম দ্রোণাশ্রম। এই স্থানকে আমরা দ্রোণাশ্রম বলিয়া উল্লেখ করিব। দ্রোণাশ্রমের উত্তর দিকে এখন নূতন সেনা নিবাস। সেনা নিবাসের নিকটেই দুইটী প্রকাণ্ড চম্পক বৃক্ষ আছে। এত বড় চম্পক বৃক্ষ আর কোথাও দেখা যায় না। এই চম্পক বৃক্ষের মধ্যে একটীর পরিধি ২৬ ফিট, অপরটীর পরিধি ২৩ ফিট। লোক-প্রবাদ এই যে, এই চম্পক বৃক্ষের নিম্নে বসিয়া আচার্য্য কুরু পাণ্ডবদিগকে বাণ শিক্ষা দিতেন। এই চম্পক বৃক্ষের নিম্নেই গুচ্ছপানীর নদী। এই নদীর তীরে বৃহৎ বৃহৎ অসংখ্য গুহা আছে। এই সকল গুহার মধ্যে একটী গুহা উল্লেখযোগ্য। সেই গুহার নাম টপকেশ্বর। টপকেশ্বর গুহার মধ্যে মহাদেবের একটী লিঙ্গ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। প্রবাদ এই যে, টপকেশ্বর গুহার উর্দ্ধদিক ভেদ করিয়া টপকেশ্বর বাবার মস্তকে দুগ্ধবিন্দু পড়িত। এখন দুগ্ধবিন্দু অদৃশ্য হইয়াছে, কিন্তু টপ্ টপ্ করিয়া শিব-মস্তকে নিয়ত জল পড়িতে থাকে। শিবের মস্তকের উপর টপ্ টপ্ করিয়া জলবিন্দু পতিত হয় বলিয়া ইহার নাম টপকেশ্বর হইয়াছে অথবা তাপস দ্রোণের উপাস্য দেবতা, বলিয়া এই শিবলিঙ্গের নাম তাপকেশ্বর ক্রমে অপভ্রংশ হইয়া তপকেশ্বর বা টপকেশ্বর হইয়াছে নির্ণয় করা সহজ নহে। এই বিষয়ে অনুমান ভিন্ন কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারা যায় না। টপকেশ্বর গুহাটী অতীব মনোহর। নিম্নে নদী উর্দ্ধে পর্ব্বত। পর্ব্বতের কোলে গুহা। হিমালয় যোগী-জীবন। তাহার জন্যই নিজের হৃদয়ে গহ্বর করিয়া যোগীদিগকে স্থান দিয়াছেন। যোগীদিগের পান করিবার জন্য প্রস্রবণ রূপ স্তন্য দিয়া যোগীর আশ্রয় স্বরূপ হইয়াছেন। এই গুহার উর্দ্ধদেশে সাধুদিগের সমাধিক্ষেত্র। সেই সমাধিক্ষেত্রের পূর্ব্ব দিকে পুরী নামা সন্ন্যাসীদিগের আশ্রম। এই পুরী নামা সন্ন্যাসীই এই টপকেশ্বরের মহন্ত বা সেবক। টপকেশ্বরের গুহার নিম্নে যে নদী সেই নদীর উত্তর তটে শ্মশানভূমি। সেখানেও অনতি-বৃহৎ দুইটী গুহা আছে, তন্মধ্যে একটীর নাম নারায়ণ গিরির গুহা, অপরটীর কোন নাম নাই।

টপকেশ্বরের গুহাটী কমলাগির ও গরহী গ্রামের সীমা হইতে, অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত। এই গুহাতে নামিবার সময় মনে হয় যেন পৃথিবী হইতে পাতাল পুরীতে প্রবেশ করিতেছি। তখন মনে কিঞ্চিৎ ভয়েরও সঞ্চার হয়, কিন্তু গুহাতে প্রবেশ করিলে সে ভাব দূর হইয়া প্রাণ মন বিমোহিত হইয়া যায়। মনুষ্যের সাড়া শব্দ নাই, নদী কল্লোলে প্রাণ শীতল হইতেছে, চারিদিকেই প্রকৃতির বিচিত্র শোভা। নদীর উভয় পার্শ্বে উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত, উর্দ্ধে আকাশ ভিন্ন আর কিছু দেখিবার উপায় নাই। নদী যেন কল কল শব্দে বলিয়া দিতেছে—আর দেখিতে চাও কি, আকাশ দেখ, আমাকে দেখ এবং আমার উভয় পার্শ্বস্থ পর্ব্বত দেখ, আমার প্রবলবেগের শব্দের যে প্রতিধ্বনি উঠিতেছে তাহা শুন এবং এই প্রকৃতির বিচিত্রতা হইতে যে অসীম গাম্ভীর্য্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা অনুভব কর, আর গুহাতে প্রবেশ করিয়া স্বীয় ইষ্টদেবতার ধ্যানে নিযুক্ত হও।

এই গুহাটী পূর্ব্বে এত মনোহর ছিল না। ঠাকুর বংশের অলঙ্কার স্বরূপ দেব-প্রকৃতি ঠাকুর কালীকৃষ্ণ অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া এই গুহাটী প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। এখন এই গুহার মধ্যে ২০।২৫ জন লোক অনায়াসে বাস করিতে পারে। টপকেশ্বরে কখন কখন ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও সর্পাদি হিংস্র জন্তুর দর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু বাবা টপকেশ্বরের কৃপায় এখন পর্য্যন্ত কাহারও কোন অনিষ্ট হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই।

পূর্ব্বে যখন এই স্থান দ্রোণাশ্রম নামে প্রসিদ্ধ ছিল তখন নগরের কোন চিহ্ন ছিল না, বিলাসের রেখা ছিল না, সাংসারিকতার লেশ ছিল না, বিকারের গন্ধ মাত্র ছিল না। ১১৯৯ বর্গ মাইল আয়তন ক্ষেত্র হিমালয় প্রাকারে বেষ্টিত মহা অরণ্য ছিল, গুহা ছিল, প্রস্রবণ ছিল, নানাবিধ পশু পক্ষীর ত অভাবই ছিল না। গিরি গুহাতে যোগীরা সমাধিমগ্ন থাকিতেন, প্রস্রবণ তীরে উপাসকেরা সন্ধ্যা ও পূজা করিতেন, বৃক্ষমূলে যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া এই পবিত্র স্থানকে আরও পবিত্র করিতেন। ব্রহ্মচারীরা উচ্চৈঃস্বরে বেদ পাঠ করিয়া বেদনিরত থাকিতেন। তখনকার শ্রোতা ছিল বন্য বিহঙ্গকুল, ধারক ছিল বৃক্ষ ও পর্ব্বত। এখন আর সেদিন নাই। দ্রোণাচার্য্যও নাই, তাঁহার আশ্রমের শোভাও নাই। এখনকার দ্রোণাশ্রম অন্যাকার ধারণ

করিয়াছে। একেবারেই যে দ্রোণাশ্রমের বর্ত্তমান অবস্থা হইয়াছে তাহা নহে। এই দেরাদুনের প্রাচীন নাম দ্রোণাশ্রম, তার পরের নাম গুরুদ্বারা বা গুরু রামরায়ের স্থান, বর্ত্তমান নাম দেরাদুন।

অনেকেই জিজ্ঞাসা করিবেন, উক্ত স্থানের নাম রাম রায়ের স্থান হইল কেন, আর রামরায়ই বা কে? রামরায় শিখ সম্প্রদায়ের একজন সিদ্ধ গুরু। গুরু-পরম্পরায় রামরায় শিখদিগের ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের পৌত্র হররায়ের পুত্র। যখন মোগল সম্রাট আউরঙ্গজীবের সহিত সম্রাটের জ্যেষ্ঠ সহোদর দারা যুদ্ধ করেন সেই সময় হররায় দারার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কোন কারণ বশতঃ রাম রায়কে দারার নিকট প্রতিভূ স্বরূপ রাখিতে হইয়াছিল। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে রামরায় পিতৃ-মাতৃহীন হন, তখন তাঁহার বয়স ১৫ বৎসর। রামরায় সুজাত ছিলেন না বলিয়াই হউক অথবা অন্য কারণেই হউক, তিনি তাঁহার পিতার গদী প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহার কনিষ্ঠ হরকৃষ্ণ গদী প্রাপ্ত হন। ইহার অল্প দিন পরই হরকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন। তখন রামরায় আবার পিতৃ-গদীর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইহাতেও রাম রায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। হরগোবিন্দের অন্যতম পুত্র তেগবাহাদুর শিখদিগের গুরুর স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইহাতে রামরায় অতি ক্ষুণ্ণ হইয়া নিজ বাসভবন কয়তারপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিল্লী হইয়া আগ্রা গমন করেন। পরে তেগবাহাদুরের ফাঁসী হইলে রামরায় আর একবার গদী পাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু এবারেও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে ডেরাতে আসিয়া রামরায় স্বীয় আশ্রম সংস্থাপন করেন।

মহাত্মা রামরায় যখন আগ্রা হইতে দেরাদুন আসেন তখন সম্রাট আউরঙ্গজীবের নিকট হইতে টিহরী রাজের নিকট একখানি অনুরোধ-পত্র লইয়া আসেন। টিহরীরাজ রামরায়কে কয়েকখানি গ্রাম প্রদান করেন। রামরায় প্রথমতঃ কান্তলীক গ্রামে অবস্থান করিতেন পরে খুড়বুড়া গ্রামে আপন বাসভবন নির্ম্মাণ করেন। এবং খুড়বুড়ার পার্শ্ববর্ত্তী ধামাওয়ালা গ্রামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দির প্রতিষ্ঠা বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, বর্ত্তমান রামরায়ের মন্দির তাঁহার পত্নী পঞ্জারকুমারী দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। এখানকার অধিবাসীর মধ্যে অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। শিষ্যেরা সাধুদিগের বাসের জন্য বর্ত্তমান গুরুদেরা নির্ম্মাণ করিলেন। এই অবধি এই স্থানের নাম পরিবর্ত্তিত হইল। স্থানীয় অধিবাসীরা এই স্থানকে গুরুদ্বারা বলিতে লাগিল এবং পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা এই স্থানকে রামরায়ের স্থান বলিয়া উল্লেখ করিতে লাগিল। অদ্যাপি পার্শ্বস্থ পার্ব্বতীয় জাতিরা দেরাদুনকে রামরায়ের স্থান বলিয়া উল্লেখ করে। মহাত্মা রামরায়ের প্রতিষ্ঠিত দেবসেবা যাহাতে সুশৃঙ্খল রূপে চলে তাহার জন্য রাজা ফতেসাহ খুড়বুড়া, রাজপুর ও চামাসুরী নামক তিন খানি গ্রাম রামরায়কে দেবোত্তর দান করেন। এবং তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা ধামাওয়ালা, মিয়াওয়ালা, পণ্ডিতওয়ালা ও ধুতরাওয়ালা এই গ্রামচতুষ্টয় দেবসেবার জন্য দান করেন।

গুরু রামরায় সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার যোগ বিভূতি ছিল এবং তিনি অন্তর্যামিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এক দিবস তাঁহার কোন প্রধান শিষ্য সমুদ্রে বাণিজ্য যাত্রাতে গিয়াছিলেন। তাহাতে সমুদ্র মধ্যে তিনি ঝড়ে নিপতিত হন, অর্ণবযান যখন সমুদ্রে ডুবু ডুবু, তখন উক্ত শিষ্য কাতর প্রাণে তাহার উদ্ধারকর্ত্তা গুরুদেবকে স্মরণ করিল। রামরায় তখন বসিয়াছিলেন, তিনি শিষ্যের ডাক শুনিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার মাতৃদেবীকে বলিলেন "মা, আমি গৃহ মধ্যে কপাট বন্ধ করিয়া সপ্তাহকাল থাকিব, তোমরা আমার সমাধি ভঙ্গ করিও না, ও কোন প্রকার গোলমাল করিও না।" এই বলিয়া সিদ্ধযোগী গৃহে গেলেন ও সমাধিস্থ হইলেন। তাঁহার মাতা, স্ত্রী ও শিষ্যেরা পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াছিলেন, তৎপরে আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া গৃহদ্বার ভঙ্গ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রামরায় মৃতবৎ শয্যার উপর পড়িয়া আছেন। এই দৃশ্য দেখিয়া রামরায়ের আত্মীয়েরা মনে করিলেন এই দেহে আর প্রাণ নাই, এখন দেহ সৎকার করা যাউক। যখন চিতাকাষ্ঠে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল তখন কোন কোন শিষ্য দেখিতে পাইলেন, রামরায়ের সূক্ষ্ম দেহ বলিল—"তোমরা কি করিলে,

আমার দেহভোগ এখনও শেষ হয় নাই, ভোগ শেষের জন্ত আমাকে আবার জন্ম লইতে হইবে। মহাত্মা যোগী স্থূল শরীর পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম শরীরে শিষ্য রক্ষার জন্য সমুদ্র মধ্যে শিষ্যের নিকট গিয়াছিলেন। তাঁহার অত্রস্থ শিষ্যেরা এমনই মূর্খ ছিল যে তিনি শিষ্যকে উদ্ধার করিয়া আসিতে না আসিতেই তাঁহার দেহটীকে ভস্মসাৎ করিল। শিষ্য রক্ষার জন্ত রামরায় আর দেহে ফিরিয়া আসিতে পারিলেন না। এইখানেই তাঁহার দেহের শেষ হইল।

যোগীরা নানাবিধ আসনে সমাধি লইয়া থাকেন। কেহ পদ্মাসনে, কেহবা অর্দ্ধ পদ্মাসনে, কেহবা স্বস্তিক আসনে সমাধিস্থ থাকিতেন। শিখগুরু রামরায় এই সব আসন করিতেন না। তিনি শবাসনে সমাধিস্থ থাকিতেন। তাহার জন্ত তাঁহার দেহ শয্যায় পতিত ছিল এবং তাহার জন্যই সময় পূর্ণ হইতে না হইতেই দেহ গেল। তিনি যদি পূর্ব্বোক্ত পদ্ম প্রভৃতি আসনস্থ হইয়া সমাধি লইতেন তাহা হইলে মূর্খেরা কিছুতেই তাঁহাকে মৃত মনে করিতে পারিত না। এইটী হইল তাঁহার যোগী শিষ্যদিগের মত। আর তাঁহার উদাসী * সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী শিষ্যদের মত এই যে, রামরায় সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি যখন ইচ্ছা দেহত্যাগ করিতে পারিতেন। এক দিবস মহাত্মা তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন—"তুমি তিন দিন আমার নিকট আসিও না, আমি সমাধি লইব।" তিন দিনের পর তাঁহার স্ত্রী ঘর খুলিয়া দেখেন তাঁহার দেহ প্রাণশূন্য। যে শয্যাতে তাঁহার দেহান্ত হইয়াছিল সেই শয্যা এখনও গুরুদ্বারায় রক্ষিত আছে। শিখসম্প্রদায়স্থ লোকেরা বহু অর্থব্যয় করিয়া এই স্থানে আগমন করেন এবং গুরুর শয্যা দেখিয়া যান।

এই মহাপুরুষের সম্মানার্থ প্রতি বৎসর ১লা চৈত্র একটী মেলা আরম্ভ হয়। উহা ১০ দিন কাল স্থায়ী। ৬ই চৈত্র একটী ঝাণ্ডা অথবা নিশান উঠান হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই ইহাকে ঝাণ্ডার মেলা বলে। শত শত লোক ঝাণ্ডা উঠাইতে এবং নামাইতে নিযুক্ত হন। পূর্ব্ব বৎসরের পুরাতন ঝাণ্ডাটী নামাইয়া উহার পরিবর্ত্তে একটী নূতন ঝাণ্ডা খাড়া করা হয়। শিষ্যেরা নিজ নিজ সাধ্যানুসারে ঐ ঝাণ্ডার উপর এক একটী আবরণ দিয়া থাকেন। মোহন্তের আবরণটী সর্ব্বোপরি থাকে।

এই স্থানটী উদাসী সম্প্রদায় শিখদিগের একটী প্রধান তীর্থ। গুরুর মৃত্যুর পর তাঁহার মাতা ও স্ত্রী পঞ্জাবকুমারী হরপ্রসাদ নামক জনৈক শিষ্যের সাহায্যে বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করেন। এই হরপ্রসাদই সর্ব্ব প্রথম ২৫ বৎসরের জন্ত রামরায়ের মঠের মহন্ত নিযুক্ত হন। হরপ্রসাদের মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্য হরসেবক গদী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ গুরুপরম্পরায় পঞ্জাবিতগণ মঠের মহন্ত নিযুক্ত করিয়া থাকেন।

দেরাদুনের প্রথম ম্যাজিষ্ট্রেট শোরসাহেব ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে মঠের জমী সকলের আয় বাৎসরিক ১৬০০৲ টাকা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। ইহাতে দান স্বরূপও বাৎসরিক ৩।৪ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়া থাকে।

এই মঠে ৫টী মন্দির আছে; মধ্যের মন্দিরটীতে গুরুর সমাধি এবং চারি কোণে গুরুর চারি জন প্রিয়তমা পত্নীর সমাধি মন্দির। এগুলিকে সকলেই মন্দির বলিয়া থাকে, সুতরাং আমরাও তাহাই বলিলাম। বাস্তবিক পক্ষে ইহা মুসলমানদিগের মসজিদের আকারে নির্ম্মিত। গুরুর সমাধি মন্দিরটী জাহাঙ্গীর বাদশাহের সমাধি মন্দিরের আকারে গঠিত।

ইহাই মাধ্যমিক দেরাদুনের ইতিবৃত্ত। অতঃপর ইংরাজ অধিকৃত দেরাদুনের কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

দেরাদুন এক সময়ে মুসলমান অধিকৃত ছিল, তাহার পর গড়ওয়ালের রাজার অধিকারভুক্ত হয়, পরে কিছু দিন নেপালের অধীনস্থ ছিল। যখন দেরাদুন নেপালীদিগের হস্তগত, তখন এইখানে একটী ছোট-খাট যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই সময়ের ইতিহাস এইরূপ। ১৮১৪ সালের ২৯শে মে তারিখে গুরখাগণ কর্ত্তৃক ইংরাজরাজের ১৮ জন পুলিস হত ও ৬ জন আহত হয়। পরে আর একটী পুলিস ষ্টেসন আক্রান্ত ও অধিকসংখ্যক লোক নিহত হয়। এই কারণেই যুদ্ধের সূচনা।

---

* শিখদিগের মধ্যে উদাসী ও নির্ম্মলা দুই প্রকার সন্ন্যাসী সম্প্রদায় আছে; তন্মধ্যে প্রথম গুরু নানকের পুত্র শ্রীচন্দের প্রবর্ত্তিত ও দ্বিতীয় গুরু গোবিন্দের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়।

মীরাট হইতে এক ডিবিসন সৈন্য জেনারেল জিলেস-পাইর অধীনে আইসে। প্রথমে তাহাতে ৫৫০৩ জন সৈনিক ও ১৪টী কামান থাকে, পরে আরও বর্দ্ধিত হয়। ১৪ই অক্টোবর মীরাট হইতে যুদ্ধযাত্রা করিয়া ৪ দিনে সাহারানপুরে পৌছে। ১৯শে তারিখে দুই দলে তথা হইতে যাত্রা করিয়া একদল টিমলিপাশ ও অপর দল মোহন-পাশ দিয়া দেরাদুনে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং ২৪শে তারিখ উভয় দল একত্র মিলিত হয়।

কাপ্তেন বলভদ্রসিংহের অধীনে ৩০০'৪০০ মাত্র গুরখা সৈন্য ছিল। ইহারা দেরার ৩॥ সাড়ে তিন মাইল উত্তর পূর্ব্বদিকে কালঙ্গা বা নালাপাণি পাহাড়ের উপর যাইয়া ছোট ছোট পাথর ও কাঠের খুটা দিয়া একটী কেল্লা প্রস্তুত করে। ২৭৩৭ জন সেনানী ও সৈনিক ৩১শে অক্টোবর প্রাতে প্রথম আক্রমণ করে, কিন্তু পরাস্ত হইয়া দেরায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই যুদ্ধে জেনেরাল জিলেসপাই এবং ৪ জন সৈন্যাধ্যক্ষ হত এবং ১৫ জন আহত হয় (তন্মধ্যে অনেকে পরে মৃত হয়)। ২৭ জন সেনা হত ও ২১৩ জন আহত হয়। এতদ্ব্যতীত আরও ৫০ জনের উপর হতাহত হয়। প্রায় একমাস অপেক্ষা করিবার পর আরও সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র আসিয়া পৌছিল। ২৭শে নভেম্বর দ্বিতীয়বার আক্রমণ করে, এবারেও পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। ইহাতে ১৮ জন সৈন্যাধ্যক্ষ হতাহত, ৩৩ জন সেনা হত এবং ৬৩৬ জন আহত হয়। সরকারি কাগজ পত্রে দেখা যায় যে, ৩ জন সৈন্যাধ্যক্ষ হত, ৮ জন আহত, ৩৩ জন সৈন্য মৃত এবং ৪৪০ জনের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ইংরাজ ও গোরখা সৈন্যের অনুপাতে দেখা যায় যে, এক একজন গুরখা সৈন্যের সহিত চারি জনের অধিক ইংরাজ সেনা যুদ্ধ করে। তৃতীয়বার আক্রমণে গুরখাগণ দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া যায়। তখন দেখা গেল যে, তাহারা প্রায় ৭০ জন হইবে, ৮০ জন কিম্বা ঊর্দ্ধসংখ্যা ১০০ জনের অনধিক দুর্গমধ্যে হতাহত হইতে পারে। এই ৭০ জন গুরখা ইংরাজ শিবির ভেদ করিয়া ৩০শে নভেম্বর রাত্রিতে চলিয়া যায়, যাইবার সময় বলভদ্রসিংহ ইংরাজ কাপ্তেনকে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া যান "আমি স্বইচ্ছায় দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি, নচেৎ দুর্গ দমন করা তোমাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব ছিল"। মেজর লডলো ৪০০ সৈন্যসহ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হন বটে, কিন্তু সফল মনোরথ হইতে পারেন নাই। *

এই স্থানে দুইটী কবর প্রস্তুত হইয়াছে; একটীতে যাঁহারা মারা পড়িয়াছেন তাঁহাদের নাম লেখা, অপরটী বীরকুল চূড়ামণি বলভদ্রসিংহ ও তাঁহার অনুচরবর্গের সম্মানার্থে প্রস্তুত।

দক্ষিণ দিকের স্তম্ভের পশ্চিম পার্শ্বে লিখিত

To the memory of
Major General Sir Robert Rollo Gillespie
K. C. B.

Lieutenant O' Hara 6th N. J.
Lieutenant Gosling, Light Battalion.
Ensign Fothergill 17th N. J.
Ensign Ellis Pioneers
killed on the 31st October 1814.
Captain Campbell 6th N. J. Lieutenant
Luxford

Horse artillery
Lieutenant Harrington H. M. 53 Regt.
Lieutenant Cunningham 13th N. J.
killed on the 27th November
And of the non-commissioned officers & men
who fell at the assault.

এই স্তম্ভের পূর্ব্ব পার্শ্বে কোন্ কোন্ সৈন্যদল যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাদের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

---

* Memoirs of Dehradun প্রণেতা Mr. R C. Williams B.A.,C.S. লিখিয়াছেন "On the night of the 30th November Balbhadra Thapa with 70 men, all that remained of his garrison, evacuated Kalanga. The Gorkhas cut their way through the chain of post placed to intercept them and escaped to a neighbouring hill closely pursued by Colonel Ludlow.

Such was the conclusion of the defence of Kalanga, a feat of arms worthy of the best of chivalry conducted with a heroism almost sufficient to palliate the disgrace of our own resources.

অপর স্তম্ভের পূর্ব্ব পার্শ্বে লিখিত—

As a tribute of Respect for our adversary
Bulbudder
Commander of the Fort
And his brave Gorkhas
who were afterwards
while in the service of Ranjit Singh
shot down in their ranks to the last man
By Afghan Artillery

এই স্তম্ভের পশ্চিম পার্শ্বে লিখিত—

On the highest point
of the hill above this Tomb
stood the Fort of Kalanga
After two assaults
On the 31st October and 29th November
It was captured by the British troops
on the 30th November 1814
And completely razed to the ground.

ইহাই পুরাতন দেরাদুনের ইতিবৃত্ত। বর্ত্তমান দেরাদুন একটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহর। রাস্তা ঘাট, পয়ঃপ্রণালী চিত্তাকর্ষক। ইংরাজ অধিবাসীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে, দেরাদুন মিউনিসিপ্যাল ও ক্যাণ্টনমেণ্ট, উভয় স্থান মিলাইয়া প্রায় ৩০০০ তিন হাজার লোকের বাস, তন্মধ্যে ইংরাজ অধিবাসীই প্রায় তৃতীয়াংশ হইবে। এখানে অনেকগুলি বাঙ্গালীও কার্য্য উপলক্ষে বাস করিতেছেন। করণপুর (কর্ণপুর) বাঙ্গালীদের প্রধান বাসস্থান। প্রবাদ এই যে, আচার্য্য দ্রোণ যে সময়ে কুরু পাণ্ডবদিগকে অস্ত্র-শিক্ষা দিতেন, সেই সময় দাতাকর্ণ এই স্থানে বাস করিয়া আয়ুধ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে এই স্থানের নাম কর্ণপুর হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ইহা গাড়বালের রাজপ্রতিনিধি অজ্ঞা-কুমারের সহধর্ম্মিণী রাণী করুণাবতী প্রতিষ্ঠিত গ্রাম বলিয়া ইহার নাম করুণাপুর অথবা করণপুর হইয়াছে।

ক্রমশঃ।

জ্যোতিষী।

[শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত এম-এ]

কুমার বীরেন্দ্র সেদিন মহাসমারোহে পার্টি দিতেছিল। নাচ, গান ও মজলিসী আলাপে সকলের প্রাণ কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল।

বীরেন্দ্রের একটা বাতিক ছিল ভাল জ্যোতিষী দিয়া হাত দেখান। তখনকার দিনে ভবানী জ্যোতিষীকে সমস্ত ভারতবর্ষে সকলেই জানিত, আর তাহার গণনা একেবারে ঠিকঠাক মিলিয়া যাইত। সেই ভবানীকেই বীরেন্দ্র মাহিনা করিয়া রাখিয়াছিল, আর সে মজলিসেও বন্ধু-বান্ধবের হাত দেখাইবার জন্য তাহাকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। দেখিতে ভবানী নেহাৎ মন্দ ছিল না—বেশ নাদুস্-নুদুস্. বেঁটে, ঘাড় ছোট,. পেট মোটা, পা সরু, রং কালো চেহারা। মাথাটাও দিব্যি বুলেটের মত, আর দেখিলেও মনে হইত বুলেটের মতই শক্ত।

বীরেন পরেশকে ডাকিয়া কহিল—"দাঁড়াও, তোমায় হাত দেখিয়ে দিচ্ছি। জান, ভবানী আমাকে কি বলেছে? আমার বুড়ো আঙ্গুলটা যদি আর আধ ইঞ্চি ছোট হোত, আমি একটা প্রকাণ্ড ইডিয়ট্ হতুম। আর যদি সিকি ইঞ্চি বড় হোত তা হ'লে আমার বিদ্যা বুদ্ধি ও প্রশংসায় সমস্ত দেশ ভরে' উঠতো।"

এমন সময় ভবানী আসিয়া উপস্থিত হইল আর সঙ্গে সঙ্গে চার পাঁচখানা হাত টেবিলের উপর স্থাপিত হইল।

সরল বলিল, "দেখুন ত আমার ক'টা বিয়ে।" মতি কহিল, "দেখুন ত আমার হবে ক'টা।" সতীশ বলিল, "আমিই আগে মরব না বৌ আগে মরবে?" পুলিশ কোর্টে যে ওকালতি করে সে বলিল, "দেখুন দেখি আমার অদৃষ্টে গাড়ী আর বাড়ী আছে কি না।"—ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন হইল।

ভবানী কহিল, "আপনাদের হাতে ভালও দেখতে পারি, মন্দও দেখতে পারি। দুটোই বোলব, না মন্দটা বাদ দিয়ে শুধু ভালটাই বোলব?"

সবাই তখন একসঙ্গে চেঁচাইয়া কহিল, "ভাল মন্দ সবই বোলতে হবে।"

ভবানী তখন পুলিশকোর্টের উকিলের হাতটা টানিয়া লইয়া কহিল, "আপনার উপর দেখ্‌ছি লক্ষ্মী চটা। বৌ-এর গায় কাল চড় দেওয়াটা ছেড়ে দিন। আর যে মানুষটার নামের আদ্য অক্ষর 'ক' তার ওখানটায় যাওয়া ছেড়ে দিয়ে নিজের পায় দাঁড়াতে একটু চেষ্টা করুন। নিজস্ব বাড়ী ও গাড়ী হওয়ার এই কয়টি প্রতিবন্ধক আছে।"

যারা উকিলকে জানিত তাহারা বলিল, "ঠিক বলেছে ত! ওর যেমন দক্ষতা তাতে দালালের তোলা ওকে খেতে হবে না। তবুও আশ্চর্য্যি ও ভাবে কি না দালালই সব। দালাল যদি রুখে দাঁড়ায় তবে সব দেবতাই রুখে দাঁড়ায়। তাই ও বেচারীকে দালাল বেটারা দেয় এক ভাগ আর তারা নেয় তিন ভাগ।"

তখন উকীলটি কহিল, "তোমরা জান না হে। পুলিশ কোর্টের দস্তরটা জান না। দালাল হাতে না থাকলে কিছুই সেখানে হ'বার জো নাই। শুধু আমার দোষ নয়। ওখানে সব শেয়ালেরই এক রা—তবে ভাগের যা কম বেশী।"

"রেখে দাও তোমার পুলিশ কোর্ট" এই বলিয়া সরল তাহার হাতখানি বাড়াইয়া দিয়া কহিল, "দেখুন দেখি আমার হাতটা।" ভবানী বলিল, "আপনার মনে বড় একটা অহঙ্কার আছে। আপনি মনে করেন সকলের চেয়ে আপনি বেশী বোঝেন ও জানেন। বিয়ে আপনি করেন নাই বলেছেন, তা ঠিক নয়। তবে বৌএর সঙ্গে যে বনিবনাও হচ্ছে না তাই ঠিক। আপনি ভাবেন গিন্নি ঠাকরুণ একেবারে বোকা, পুরাণো ধরণের conservative, বেজায় পর্দ্দা-ভক্ত। এই অহঙ্কারের জন্যই আপনার দাম্পত্য প্রণয় হওয়া কঠিন হবে। নিজের স্ত্রীকে দেখ্‌চি বড়ই অবিশ্বাস করেন। তবে একটা শুভ চিহ্ন আছে তাতে যদি সব বদলে যায়।"

সরল মুখটি ভার করিয়া এক কোণে গিয়া বসিল। ভবানী যে সত্য বলিয়াছে সে বিষয়ে কাহারও আর সন্দেহ র'হিল না। ভবানী তখন মন্তির হাত দেখিয়া কহিল, "আপনার দেখ্‌ছি, ব্যক্তিত্ব বলিয়া কিছুই নাই। লটারীতে আপনি টাকা দিয়া থাকেন। কিন্তু পাওয়ার আশা নাই-ই একরকম। তবে একবার শ পাঁচেক পেতে পারেন বোধ হয়।"

এইরূপ নানা জনের হাত দেখিয়া ভবানী নানারকম বলিতে লাগিল। বড় বেশী সাহস করিয়া তখন আর কেউ হাত বাড়াইয়া দিল না। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কোণ হইতে উঠিয়া আসিয়া হেমাঙ্গ বীরেন্দ্রের কাছে দাঁড়াইল, ইচ্ছা, হাতটা একবার দেখাইয়া লয়। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কেউ তাহার দিকে জ্যোতিষীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করাইল না। তখন সে বীরেন্দ্রকে এক টিপুনী দিয়া কহিল, "কেমন, হাত দেখাচ্ছ বুঝি?" বীরেন্দ্র তখনই হেমাঙ্গের হাতটা টানিয়া লইয়া জ্যোতিষীর সম্মুখে রাখিয়া কহিল, "দেখুন দেখি এই হাতটা। কিন্তু খবরদার, ও যে এই একমাসের মধ্যেই এখানকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুশিক্ষিতা সুন্দরী নীলাকে বিয়ে করবে সে কথা যেন না বলেন—কারণ ও খবরটা যে না জানে এমন মানুষ এ সহরে খুঁজে পাবেন না।"

ভবানী হেমাঙ্গের হাতটা মিনিট তিনেক ধরিয়া দেখিল। তারপর গম্ভীরস্বরে কহিল, "দেখি আপনার বাঁ হাতটা।" সেখানিও ভবানী মিনিট পাঁচেক ধরিয়া দেখিল। ভবানীর মুখ দিয়া কথা না বাহির হইলেও তাহার মুখ চোখ ভয়ানক অন্ধকার হইয়া উঠিল। ভ্রু-যুগল ভয়ানক কুঞ্চিত হইল। বীরেন্দ্র বলিল, "আরে, বলেই ফেলুন না, কি দেখ্‌ছেন।" এদিকে হেমাঙ্গের প্রাণ দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। অবশেষে ভবানী বলিল, "দেখুন, আপনার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেউ মরবেন, আর আপনাকে সমুদ্র যাত্রা করতে হবে।"

সকলেই জ্যোতিষীর কথায় বিশ্বাস করিল। বিশ্বাস করিল না শুধু হেমাঙ্গ। সে ভাবিল ভবানী কি যেন গোপন করিয়া গেল। তারপর খাইবার ডাক পড়িলে সবাই যখন উঠিয়া চলিল, তখন হেমাঙ্গ ভবানীকে কহিল, "একটা কথা আছে, একটু অপেক্ষা করে যাবেন।"

সবাই চলিয়া গেলে হেমাঙ্গ তাহাকে কহিল, "আচ্ছা, এখন বলুন দেখি তখন কি কথাটা গোপন করে' গেলেন?"

ভবানী কহিল, "দেখুন, আমাদের ত ভুলচুক হ'তে পারে। আপনি ধরুন, আমার কার্ড নিন্। কাল সকালে যাবেন আমার ওখানে, খুব ভাল করে' দেখে দেব। আমি সাধারণতঃ একটা কেসের জন্য একশো এক টাকা নিয়ে থাকি। আপনি বীরেন বাবুর বন্ধু, তা' আপনাকে অর্দ্ধেক ফীতেই দেখব এখন।"

কার্ডখানি পকেটে পুরিয়া হেমাঙ্গ কহিল, "আপনার ফীর জন্য ভাববেন না। কাল সকালে আপনার বাসায় পাঠিয়ে দেব এখন। যা' বলতে হয়, এখনই ব'লে ফেলুন।"

ভবানী পকেট হইতে একখানি ম্যাগনিফাইং গ্লাস বাহির করিয়া হেমাঙ্গের দুই হাতটা ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল—"দেখুন, খুব খারাপ একটা জিনিষ দেখ্‌ছি। আপনার পক্ষে না শুনাই ভাল।"

হেমাঙ্গ কহিল, "কি ছেলেমী কচ্ছেন! ব'লে ফেলুন না।"

তখন খুব গম্ভীর হইয়া ভবানী কহিল—"আপনি খুন করবেন।"

হেমাঙ্গ জ্যোতিষীকে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়া কোচে গিয়া বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল। ভবানী আর অপেক্ষা না করিয়া খাইতে চলিয়া গেল। তার পর বীরেন্দ্র আসিয়া যখন হেমাঙ্গকে ডাকিয়া লইয়া গেল, তখন সকলে দেখিল তাহার গোলাপী মুখখানি পাংশু বর্ণ ধারণ করিয়াছে।

প্রায় বারটার সময় বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে হেমাঙ্গ ভাবিল—"আমি যখন অদৃষ্টের দাস, তখন আমাকে ত খুন করতেই হবে। কিছুতেই আমি খুন না ক'রে থাকতে পারব না। যদি নীলাকে বিয়ে করার তিন দিন পরেই খুন করে বসি, তাহ'লে আমাকে নিয়ে যাবে ফাঁসি কাঠে ঝুলাতে, আর নির্দ্দোষী নীলা পড়ে থাকবে সারা জীবন বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করতে। আমার জন্য তার গায় কলঙ্ক লেপা থাকবে। এ আমি কিছুতেই হ'তে দেব না। খুন যখন করতেই হবে তখন খুন ক'রে তার পর নিশ্চিন্ত মনে বিয়ে করবো। খুন না ক'রে নীলাকে ডুবাবার জন্য বিয়ে করতে পারবো না।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া হেমাঙ্গ শুইয়া পড়িল। কিন্তু ঘুম আর কিছুতেই আসে না। তাই বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া মনে মনে হিসাব করিতে লাগিল, তাহার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কাহাকে সে খুন করিতে পারে। সহসা তাহার এক দূর সম্পর্কীয়া অতি বৃদ্ধা একটা খুড়ীর কথা মনে পড়িয়া গেল। মৃত্যু হইলে হেমাঙ্গ সেই বৃদ্ধার সম্পত্তির এক কাণাকড়িও পাইবে না। কারণ বৃদ্ধার নিকটতর আত্মীয় স্বজন আরও অনেক ছিল। তবুও বৃদ্ধা সকলের চাইতে হেমাঙ্গকেই বেশী ভাল বাসিতেন। সিগারেটের পর সিগারেট ধ্বংস করিয়া অবশেষে হেমাঙ্গ স্থির করিল, কোন প্রকারে বিষ দিয়া এই বৃদ্ধা খুড়াকেই হত্যা করিতে হইবে।

পরদিন হেমাঙ্গ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে যাইয়া যত সব ডাক্তারী বই ঘাঁটিয়া একটা বাছিয়া বাছিয়া বিষ ঠিক করিয়া লইল। দেখিল, এই বিষ খাইলে মৃত্যু অনিবার্য্য। আর জ্বালা যন্ত্রণাও কিছু হয় না। হেমাঙ্গ তাহার সার্টের হাতায় বিষের নামটা লিখিয়া লইয়া একটা ঔষধের দোকানে উপস্থিত হইল। সেই দোকানের সহিত হেমাঙ্গের পরিচয় ছিল। তবুও তাহারা বিষটার নাম শুনিয়া আপত্তি সুরু করিয়া দিল। ডাক্তারের সার্টিফিকেট না হইলে তাহারা দিতে পারিবে না বলিল। হেমাঙ্গ কহিল, "দেখুন আমার বড় কুকুরটা ক্ষেপিয়া গিয়াছে—কোচওয়ানকে কামড়াইয়াছে। এই বিষ দিয়ে সেই কুকুরটাকে মেরে ফেলতে চাই। এর জন্য যদি ডাক্তারের কাছে ছুটতে হয় তবে ত মারা পড়ব।"

দোকানীর তখন বিশ্বাস হইল। হেমাঙ্গকে বসিতে বলিয়া সে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া তাহার হাতে একটা কাগজের কৌটা দিয়া বলিল, "দেখ্‌বেন, খুব সাবধানে নাড়বেন চাড়বেন। খুব তীব্র বিষ কিন্তু।"

"সে আমি জানি" বলিয়া হেমাঙ্গ বাহির হইয়া আসিল।

সেখান হইতে বসা—টে গিয়া হেমাঙ্গ ছোট্ট বাক্সে-ভরা একটা সুন্দর বন্-বন্ কিনিল। তারপর বিষের কৌটা বাহির করিয়া বিষের ক্যাপ্সুলটা বন্-বনের বুক চিরিয়া তাহার মধ্যে ভরিয়া দিল। তারপর বন্বন্টা আবার যথাস্থানে রাখিয়া তাহার বৃদ্ধা খুড়ীর গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।

বৃদ্ধা গৃহেই ছিলেন। হেমাঙ্গ আসিয়া বলিল, "খুড়ী, কেমন আছ?" বৃদ্ধা কহিলেন, "সেই বুক জ্বালাটা আবার হয়ে গেল। এই আধ ঘণ্টা হ'লো সেরে গেছে। তোর খবর কি? নীলা ভাল আছে ত? বিয়ে হ'লে আমার এখানে নিয়ে আসিস্ কিন্তু।"

হেমাঙ্গ বলিল, "তা নিয়ে আসব। তোমার বুক জ্বলুনীর আজ একটা ওষুধ নিয়ে এসেছি। আমেরিকার একটি বিখ্যাত ডাক্তার এসেছিলেন, তাঁর কাছ থেকে নিয়েছি তোমার জন্য।"

বৃদ্ধা কহিলেন, "দে বাবা, তুই আমাকে বাঁচালি! কি কষ্টটাই না পেলুম আমি এই ব্যথাটার জন্য। ঐ কুঁজোটা থেকে এক গ্লাস জল নিয়ে আয়, আমি ঢক্ ক'রে খেয়ে ফেলি।"

হেমাঙ্গ বাধা দিয়া কহিল, "না—না—না, এখন খেতে হবে না। এটা হচ্ছে হোমিওপ্যাথিক কি না, তাই যখন জ্বলুনীটা উঠবে তখন খেতে হবে। জ্বলুনী যখন থাকবে না তখন খেলে ফল পাবে না, হয়ত অপকারই হবে। ক'দিন পর আবার জ্বলুনীটা উঠবে বল দেখিন?"

বৃদ্ধা কহিলেন, "তার ঠিক নাই। এই সাত দিন পরেও হ'তে পারে, একমাস পরেও হ'তে পারে।"

হেমাঙ্গ বলিল, "তা' ওষুধটা রেখে দাও। যখন হবে খেয়ে নিও। দেখো, খুব ভাল ওষুধ, খেতে কিন্তু ভুল করো না।"

হেমাঙ্গ বাড়ী আসিয়া তাহার মাকে বলিল, "খুব একটা জরুরী কাজ আছে। কালই আমাকে রেঙ্গুন যেতে হবে। আর বিয়ের দিন যা' ঠিক করেছ তা' বদলে দাও। আমি নীলাকে বলে আসচি। যখন আবার দিন ঠিক করতে হবে, তখন আমি বলে দেব। আমার হাতে একটা কাজ আছে সেটা না ফুরুলে বিয়ে হ'তে পারবে না।"

সুতরাং বিয়েটা স্থগিত হয়ে গেল। আর হেমাঙ্গ রেঙ্গুন যাত্রা করিল।

রেঙ্গুন আসিয়া হেমাঙ্গ উদ্‌গ্রীব হইয়া চিঠি-পত্র ও খবরের কাগজ পড়িতে লাগিল। কিন্তু খুড়ীর মৃত্যু সংবাদ সে সকলের মধ্যে না থাকায় তাহার মনে একটা আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল। এমন সময় এক বন্ধু আসিয়া তাহাকে এক রকম জোর করিয়া মান্দালে লইয়া গেল। সেখান হইতে হেমাঙ্গ ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, রাশীকৃত চিঠি ও টেলিগ্রাম আসিয়া জড় হইয়া রহিয়াছে। টেলিগ্রাম খুলিতেই তাহার মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। দেখিল সত্য সত্যই তাহার খুড়ীমার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি একটা নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলেই বুকের জ্বালা আরম্ভ হয়। তার এক ঘণ্টা পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ডাক্তার আসিয়া বলিয়াছে—স্বাভাবিক মৃত্যু।

হেমাঙ্গ ভাবিল—বেশ হইয়াছে। এইবার সে নিশ্চিন্ত মনে নীলাকে বিবাহ করিতে পারিবে।

একখানি এটর্ণির চিঠিও ছিল। তাহাতে দেখিল খুড়ী তাহাকে একটা বাড়ী আর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন। আর তাহার ভাবী পত্নী নীলাকে একটা খুব দামী হারও দিয়াছেন। হেমাঙ্গের উপস্থিতি নিতান্ত প্রয়োজন। সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া সে দেশে ফিরিল।

দেশে ফিরিয়া হেমাঙ্গ নীলাকে কহিল—"এইবার বিয়ের দিনটা ঠিক ক'রে ফেলব এখন। চল, তোমার হারটা নিয়ে আসি গিয়ে।" মাতা ও নীলাকে লইয়া হেমাঙ্গ খুড়ীর বাড়ী আসিয়া দেখিল এটর্ণি সাক্ষী সাবুদ লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। নীলাকে হার দিয়া তিনি একটা রসীদ লেখাইয়া লইলেন, আর অবশিষ্ট জিনিষের একটা লিষ্ট তৈয়ার করিতে লাগিলেন। এদিকে নীলাকে লইয়া হেমাঙ্গ সমস্ত জিনিষ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিল। একটা ছোট বাক্স হাতে লইয়া নীলা কহিল, "দেখ, খুড়ী কেমন বন্‌বন্ ভাল বাসতো! বেশ সুন্দর বন্‌বন্‌টা। আমার খেতে খুব লোভ হচ্ছে।"

আর এক সেকেণ্ড দেরী হইলেই নীলা বন্‌বন্‌টা খাইয়া ফেলিত। হেমাঙ্গ বন্‌বন্‌টা চিনিতে পারিয়াই সাঁ করিয়া নীলার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া ছেঁড়া কাগজপত্র যেখানে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল তাহার মধ্যে ফেলিয়া দিল। নীলা অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল। হেমাঙ্গ কহিল—"ছি! এই সব যা' তা' খেতে আছে! দেখলে না, ওটার মধ্যে কি যেন জ্বল জ্বল করচে? বন্‌বনের মত দেখলেও ওটা বন্‌বন্ নয়।"

হেমাঙ্গের মুখখানি আবার বিমর্ষ হইয়া উঠিল। অদৃষ্টে খুন লেখা আছে। সে চেষ্টা করিয়া দেখিল তবুও খুন করিতে পারিল না। খুড়ী ত বন্‌বন্‌টা খায় নাই। তাঁর মৃত্যু ত স্বাভাবিকই হইয়াছে। বিষ দিয়া আর চলিবে না। এবার আর একবার ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। হেমাঙ্গ এইরূপ অনেক ভাবিল। সুতরাং বিবাহটা আবার স্থগিত হইয়া গেল।

হেমাঙ্গ জানিত, তাহাদের সুরেন বোমার দল ও বিশ্ব-বিপ্লববাদীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে। সে বরাবর তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। হেমাঙ্গের এক কাকা ছিলেন। প্রায় ৫৫ বৎসর তাঁর বয়স। তিনি নানারকমের ঘড়ি সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন আর কলেজে ছেলে পড়াইতেন। তাঁহার মেয়ে দুইটি বেথুন কলেজের স্কুল বিভাগে পড়িত। হেমাঙ্গ স্থির করিল একটা বোমাওয়ালা ঘড়ি পাঠাইয়া এই কাকাটিকে সে হত্যা করিবে।

সুরেন্দ্রকে কথাটা বলিতেই সে বলিল—"দেখ, তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে সমস্ত কথা জানাব তার ঘুণাক্ষরও কাহাকে বলতে পারবে না। যদি বল তবে তার দণ্ড কি তাত জানই—শুধু জেল নয়—অন্য কোন শাস্তি নয়—একদম মৃত্যু। গীতা আছে, শালগ্রাম আছে, কোরাণ বাইবেল আছে, যা খুসী তাই নিয়ে তুমি প্রতিজ্ঞা কর।"

হেমাঙ্গ গীতা লইয়া প্রতিজ্ঞা করিল। তারপর সুরেন বলিল, "দেখ, আমি তোমাকে একটা জায়গার ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি। সেখানে গেলেই তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে। কিন্তু খবরদার, দিনের আলোতে এই ঠিকানা বের করো না। এখান থেকে দেখে শুনে মুখস্থ করে নিও। তারপর বাড়ী যেয়ে বরাবর হগসাহেবের বাজারে যেও। সেখান থেকে বের হয়ে গাড়ী করে সোনাপুকুরের ধার পর্য্যন্ত যেও। সেখানে গাড়ী বিদায় দিয়ে বরাবর পূবে হেঁটে যাবে। বাঁ দিকে যে তৃতীয় গলীটা দেখবে সেই গলীটায় ঢুকে পড়বে। সেই গলী ধরে কিছুদূর গেলেই আর একটা গলী বাঁ দিকে গিয়েছে দেখবে। সেই গলী ধরে এগুলেই ডান দিকে বীনা লেন দেখতে পাবে। সেই গলীতে দেখবে বাঁ দিকে ১০নং বাড়ীর সামনে একটা ধোবা কাপড় শুকুতে দিয়েছে। তারই পাশের দরজায় তিনবার জোরে জোরে ধাক্কা দিও। সেই খানেই তোমার মনের মত জিনিষ পাবে। তাদের কাছে সব খুলে বলো। কর্ণান্তর হ'বার কোন ভয় নাই।"

সুরেন্দ্র একটা কাগজে ১০নং বীনা লেন লিখিয়া তাহার নাম দস্তখত করিয়া হেমাঙ্গের হাতে দিয়া কহিল, "দেখ, খুব সাবধান! এই ঠিকানার জন্য পুলিশ তোমাকে লাখো টাকা পর্য্যন্ত দিতে পারে। মনে রেখো, অনেক লোকের জীবন-মরণ এর উপর।"

হেমাঙ্গ কহিল—"সেজন্য তোমাকে এক বিন্দুও ভাবতে হবে না।"

সুরেন্দ্রের নির্দ্দেশ মত নানাস্থান ঘুরিয়া হেমাঙ্গ বীনা লেনে আসিয়া ১০নং বাড়ীর দরজায় তিনবার জোরে জোরে আঘাত করিল, আর অমনই দেখিল অনেকগুলা লোক দোতলা, তেতালার ছোট ছোট জানালা দিয়া উঁকি দিয়া তাহাকে দেখিতেছে। এক মিনিট পরে একটি অর্দ্ধ বয়সী মানুষ বাহির হইয়া রুক্ষস্বরে কহিল, "মশায়ের কি প্রয়োজন?" হেমাঙ্গ তাহাকে সুরেন্দ্রের লিখিত ঠিকানাটা দিয়া বলিল—"যে কাজ তা একটু গোপনে না হলে বলা যায় না।"

লোকটি সেই কাগজে সুরেন্দ্রের দস্তখত দেখিয়া বলিল—"আসুন, ভিতরে আসুন।" হেমাঙ্গ তাহার সহিত তখন ভিতরে গিয়া বসিল।

হেমাঙ্গের কথাটা শুনিয়া লোকটি বলিল—"দেখুন এই সব পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে আমরা কখনও মাথা ঘামাই না। তবে আপনি যখন সুরেন বাবুর কাছ থেকে এসেছেন তখন আপনার কাজটা করে দেব এখন।"

তারপর আধ ঘণ্টা পরে একটা অদ্ভুত রকমের ঘড়ির মধ্যে বোমা পুরিয়া লোকটি হেমাঙ্গকে দেখাইয়া কহিল, উহাতে হইবে কি না। হেমাঙ্গ কহিল—"খুব হইবে। একটা মিথ্যা নাম দিয়ে কাকার নিকট পার্শেল করে' পাঠিয়ে দিবেন। আর বোমাটা যেন তিন দিন পরে রাত্রি সাড়ে আটটার সময় ফেটে যায়।"

সময়টা আর ঠিকানাটা নোট করিয়া লইয়া লোকটি কহিল, "সেজন্য ভাবতে হবে না।" তারপর ৩০॥/০ সেই ঘড়িটার খরচ স্বরূপ দিয়া হেমাঙ্গ যে ভাবে আসিয়াছিল ঠিক সেই ভাবেই ঘরে ফিরিল।

চতুর্থ দিবসে হেমাঙ্গ সকাল সন্ধ্যায় কোন খবরের কাগজেই বোমার খবর দেখিতে পাইল না। পরের দিনও সে খবরের কাগজ তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়া দেখিল। তবুও কোন খবর পাইল না। এইরূপে দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল। পোনর দিনের দিন সেই লোকটির একটি বেনামী চিঠি আসিল। সে লিখিয়াছিল—"ঘড়িটা ঠিক মতই পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু উহা খারাপ হইয়া গিয়াছে। আর আপনার কোন উপকার দেয় নাই তজ্জন্য দুঃখিত হইলাম। আমরা নূতন এক প্রকার বোমাওয়ালা ছাতা তৈয়ার করিয়াছি। আপনার খুব কাজে আসিবে। খোলামাত্রই বোমাটা ফাটিয়া যাইবে, আর যিনি খুলিবেন তিনি চিরজীবনের জন্য এ সংসার হইতে বিদায় লইবেন।"

হেমাঙ্গের মন হইতে এই সকল বোমার উপর বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছিল, তাই সে চিঠিখানিকে আগুনে ফেলিয়া দিল। তার এ কয়দিন কেবল মনে হইতেছিল ঘড়িটা না জানি কখন ফাটিয়া ঝি, চাকর, মেয়েটেয়ের ঘাড় ভাঙ্গিয়া বসে। পরদিন সকালবেলা হেমাঙ্গের মাতা তাহাকে বলিলেন—"দেখ, মিনির আজ চিঠি পেলুম—ঠিক একখানি নভেল। এই নে, একবার পড়ে দেখ।" হেমাঙ্গ দেখিল লেখা আছে—

"খুড়ী মা! তুমি শুনে অবাক হবে। কে একজন বাবাকে একটা বড়ই মজার ঘড়ি পাঠিয়েছে। জিনিষটা খুব নূতন রকমের। সম্মুখে তার একটি স্ত্রীমূর্ত্তি। হাতের নিশান দেখে বোধ হলো স্বাধীনতা দেবী। মূর্ত্তিটা বেশ হেলিত দুলিত আর মিট্ মিট্ করে চাইত, আর নিশান নেড়ে যেন লোক ডাকত। বাবা বললেন, পাছে তিনি ঘড়িটার দাম পাঠিয়ে দেন সেইজন্য যে পাঠিয়েছে সে তার ঠিক নাম দেয় নাই। বাবার চোখে ঘড়িটা খুব ভাল লাগায় তাঁর টেবিলের উপর রেখে দিলেন। তারপর শুক্রবার দিন সাড়ে আটটার সময় আমরা সেই ঘরে যেই তাস খেলতে বসতে যাচ্ছি অমনই সেই ঘড়িটা কেড়াং কেড়াং করিয়া বাজিয়া উঠিল, আর তার মাঝ থেকে ধূম বের হয়ে এক সেকেণ্ডের মধ্যে স্বাধীনতা দেবীর মূর্ত্তিটা চূর্ণ বিচূর্ণ করে' ফেলল। আর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক একটা শব্দ হলো। ঘড়িটা আর কোন অনিষ্ট করে নাই। বাবা ঘড়িটা ভাল করে' দেখে বললেন—ঘড়িটা বাস্তবিক মজারই বটে। উহার মধ্যে একস্থানে একটু বারুদ রেখে দিলে এলার্মিংএর কাঁটা যেখানে থাকে ঠিক সেই সময়ে একটা হাতুড়ী বারুদের উপর এসে পড়ে আর তখনই বারুদ জ্বলে উঠে আর বেশ একটা আওয়াজ হয়। ঘড়িটা কদাকার হওয়ায় আমরা সেটাকে ছাদের উপর যে ছোট্ট ঘরটা আছে সেখানে এনে রেখেছি। আর বাজার থেকে কয়েকটা তুবড়ী বাজী কিনে এনে বারুদ বের করে, ঐ ঘড়িটা দিয়ে খুব মজা দেখাচ্ছি। আমাদের বন্ধুবান্ধব যে যেখানে আছে তাদের সবাইকে দেখিয়েছি। তুমি অবসর মত এসে একবার দেখে যেও। ইতি—

তোমার মিনু।"

চিঠি পড়িয়া হেমাঙ্গের মনটা বড়ই ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িল। তবুও সে জোর করিয়া কহিল, "তা বেশ, তুমি যেয়ে দেখে এসো। আমি এখন যেতে পারব না।"

হেমাঙ্গ ভাবিয়াছিল এইবার অদৃষ্ট-দেবী সুপ্রসন্ন হইয়া তাহার বিবাহের পথ সুগম করিয়া দিবে। কিন্তু হইয়া পড়িল অন্য রকম। তাই নীলাকে যাইয়া হেমাঙ্গ কহিল—"দেখ, আমার হাত নাই, নইলে কালই বিয়েটা ঠিক করে' ফেলতুম। আরও কয়েকটা দিন সবুর কর।"

বাড়ী ফিরিয়া হেমাঙ্গ ভাবিল—"না, আর অদৃষ্টকে নিয়ে খেলব না। নিজে ইচ্ছা করে' আর অদৃষ্টের হাতে ধরা দিতে যাব না। অদৃষ্টের যখন খুসী সে আমাকে দিয়ে খুন করিয়ে নিক্।"—এইরূপে মনটাকে শান্ত করিয়া সে খুব ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সেদিন ঘুরিতে ঘুরিতে হেমাঙ্গ গঙ্গার উপরে আমেরিকান কোম্পানীর জেটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে জেটিটা ছিল দ্বিতল আর খুব উঁচু। মনের অশান্তি মিটাইবার জন্য সে একেবারে উপরে উঠিয়া একটি কোণে বসিয়া গঙ্গা দেখিতে লাগিল। পশ্চাৎ ভাগে শব্দ হওয়ায় হেমাঙ্গ দেখিল আরও একটি মানুষ নিকটেই বসিয়া রহিয়াছে। হেমাঙ্গ উঠিয়া তাহার কাছে গিয়া দেখিল সে আর কেউ নয়—সেই ভবিষ্যদ্বক্তা জ্যোতিষী ভবানীপ্রসাদ।

হেমাঙ্গকে দেখিতে পাইয়া ভবানী দাঁড়াইয়া বলিল—"হেমাঙ্গ বাবু যে! ভাল আছেন ত?"

হেমাঙ্গ একটু হাসিয়া বলিল—"হুঁ, নিশ্চয়ই।" আর সঙ্গে সঙ্গে একটা ধাক্কা দিয়া ভবানীকে গঙ্গার মধ্যে ফেলিয়া দিল। ভবানী সাঁতার জানিত না। সুতরাং অল্প একটু খল্‌বল্ করিয়াই সে একেবারে ডুবিয়া গেল। হেমাঙ্গের সৌভাগ্য, নিকটে তখন একটা প্রাণীও ছিল না।

বাড়ী ফিরিয়া হেমাঙ্গ মনটা বড়ই হাল্কা বোধ করিল, আর ভাবিল—এইবার অদৃষ্টদেবী সুপ্রসন্ন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। তিন চার দিন কোনমতে কাটিয়া গেল। চতুর্থ দিবসে হেমাঙ্গ খবরের কাগজে দেখিল, কলিকাতার সুবিখ্যাত জ্যোতিষী ভবানীপ্রসাদের দেহ গঙ্গার কিনারায় পাওয়া গিয়াছে। দুই দিন পরে হেমাঙ্গ আবার খবরের কাগজে দেখিল, করোনার সাহেব সাক্ষী সাবুদ লইয়া ঠিক করিয়াছেন ভবানীপ্রসাদ আত্মহত্যা করিয়াছে।

হেমাঙ্গ তখন মহা উল্লাসে তাহার মাকে কহিল—"দেখ ত বিয়ের দিন কোন্ তারিখে আছে?"

সাতদিন পরেই একটা দিন ছিল। হেমাঙ্গ বলিল,—"মা, আর দেরী করা ভাল নয়, ঐ দিনটাই ঠিক করে ফেল।"

বলা বাহুল্য, ঐ দিনেই বিবাহ হইয়া গেল।

মাস দুয়েক পরে বীরেন্দ্রের স্ত্রী বেড়াইতে আসিয়া নীলাকে কহিল, "দিদি, বল দেখিন, হেমাঙ্গ বাবু জ্যোতিষ বিশ্বাস করেন কি না?" নীলা কহিল, "মাপ করো দিদি, জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় কোন কথাই উনি শুনতে পারেন না। তাই এ বাড়ীতে ঐ সব কথা বারণ হয়ে গেছে।"

ইহার কয়েক দিন পরে নীলা হেমাঙ্গকে কহিল, "আচ্ছা, সত্য করে' বল দেখি, তুমি জ্যোতিষ মান কি না?"

হেমাঙ্গ অনেকক্ষণ বড় বড় চোখ করিয়া নীলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর ফিক্ করিয়া হাসিয়া কহিল—"আমি জ্যোতিষ বিশ্বাস করিনে! জ্যোতিষ বিশ্বাস করি বলেই ত তোমাকে পেয়েছি।" আর অমনই চুম্বনপালা আরম্ভ করায় নীলা তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া কহিল—

আমার হাতে আছে অনেক কাজ
করবো না আর আনাগোনা। *

---

* Oscar Wilde এর গল্পানুসরণে।

নীলিমা।

[শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু বিদ্যাভূষণ, সাহিত্যরত্ন]

আকাশ নিঙাড়ি, চাঁদিমা বিদারি,
কে তুমি তরুণ বালা?
চকিত লাস্যে, বিমল হাস্যে,
সাজায়ে বরণ-ডালা?
সাঁজের মাঝারে রঙিন্ আঁধারে
কে তুমি কনকলতা?

নূপুর ঝিনিনি, কঙ্কন কিনি
তুমি কি বাজালে সেথা?
ওড়না দুলায়ে চিকুর মেলায়ে
কে তুমি দেবের মেয়ে?
কোন্ সুদূরের, কোন্ সে অজানা
রয়েছ নিরালা গেহে?

প্যারীচাঁদ মিত্র।

[শ্রীবিহারীলাল সরকার, রায় সাহেব]

"শ্যামের নাগাল পালাম না গো সই!-ওগো! মরমেতে মরে রই—টক্—টক্—টক্—পটাস্—পটাস্—মিয়াজান গাড়োয়ান এক একবার গান করিতেছে—টিটকারি দিতেছে, ও শালার গরু চল্‌তে পারে না বলে লেজ মুচড়াইয়া সপাৎ সপাৎ মারিতেছে। একটু একটু মেঘ হইয়াছে—একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে—গরু ছুটা হন্ হন্ করিয়া চলিয়া একখানা ছকড়া গাড়ীকে পিছে ফেলিয়া গেল। * * গাড়ীখানা বাতাসে দোলে—ঘোড়া দুটো বেটো ঘোড়ার বাবা—পক্ষীরাজের বংশ—টংয়স্—টংয়স্—ডংয়স্—ডংয়স্ করিয়া চলিতেছে,—পটাপট্ পটাপট্ চাবুক পড়িতেছে, কিন্তু কোন ক্রমেই চাল বেগড়ায় না।"

টিপি-টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে; এমনই সময়ে পাড়াগাঁয়ের মেঠো পথে একজন গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকিয়া চলিয়াছে। এই বর্ণনায় সেই ছবিখানি কি প্রতিভাত! আর একটু দেখুন;—

"বৃষ্টি খুব এক পসলা হইয়া গিয়াছে—পথ ঘাট পেঁচ—পেঁচ, সেঁৎ—সেঁৎ করিতেছে—আকাশ নীল মেঘে ভরা—মধ্যে মধ্যে হড়মড় হড়মড় শব্দ হইতেছে। বেংগুলা আশে পাশে ঘাঁওকোঁ ঘাঁওকোঁ করিয়া ডাকিতেছে। দোকানি পসারিরা ঝাঁপ খুলিয়া তামাক খাইতেছে; বাদলার জন্যে লোকের গমনাগমন প্রায় বন্ধ—কেবল গাড়োয়ান চীৎকার করিয়া গাইতে গাইতে যাইতেছে ও দাসো কাঁধে ভার লইয়া—'হাগো বিসখা সে যিবে মথুরা" গানে মত্ত হইয়া চলিয়াছে। বৈদ্যবাটীর বাজারের পশ্চিমে কয়েক ঘর নাপিত বাস করিত। তাহাদিগের মধ্যে একজন বৃষ্টির জন্যে আপন দাওয়াতে বসিয়া আছে। এক একবার আকাশের দিকে দেখিতেছে ও এক একবার গুন্ গুন্ করিতেছে; তাহার স্ত্রী কোলের ছেলেটি আনিয়া বলিল—"ঘরকন্নার কর্ম্ম কিছু থা পাই নে—হেদে! ছেলেটাকে একবার কাঁকে কর—এদিকে বাসন মাজা হয় নি—ও দিকে ঘর নিকন হয় নি, তারপর রাঁধা বাড়া আছে; আমি একলা মেয়ে মানুষ; এ সব কি করে করব, আর কোন্ দিকে যাব? আমার কি চাট্টে হাত—চাট্টে পা?"

ঘোরতর বাদলার দিনে পাড়াগাঁয়ের দৃশ্য হুবহু এইরূপ নহে কি? নাপিত নাপিতানির কথাবার্ত্তাটুকু কেমন ষড় রসে মনোহর!

যে অপূর্ব্ব গ্রন্থ হইতে আমরা এই দুই চিত্র দেখাইলাম, তাহার নাম "আলালের ঘরের দুলাল।" গুণগ্রাহী বাঙ্গালী পাঠকের নিকট আলালের ঘরের দুলাল সবিশেষ পরিচিত। এক্ষণে এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের যেরূপ সমধিক প্রচার হইয়াছে, তাহাতে সহস্র সহস্র বাঙ্গালী পাঠক এ মধুর গ্রন্থের মধুর রসাস্বাদে পরমানন্দ লাভ করিতেছেন। গ্রন্থ ত এখন অনেকেই দেখিতেছেন; কিন্তু গ্রন্থকারের পরিচয় কয়জনের জানা আছে? মনোমোহন চিত্র দেখিলেই, সে চিত্রের সুনিপুণ শিল্পীর পরিচয় জানিতে ইচ্ছা হয় না কি? তাই আজ "আলালের ঘরের দুলাল"—রচয়িতা প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুরের এই পরিচয়—প্রস্তাবনা।

কলিকাতা নিমতলার মিত্র বংশে ১২২১ সালে ৮ই শ্রাবণ প্যারীচাঁদ মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামনারায়ণ মিত্র। রামনারায়ণ,—রাজা রামমোহন রায়ের পরম বন্ধু ছিলেন। সঙ্গীত শাস্ত্রে রামনারায়ণের বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইহাঁরই যত্নাতিশয্যে, ইহাঁরই উদ্যোগ পরিশ্রমে, কলিকাতার কাঁসারিপাড়ায় সঙ্গীত-রসিক রাধামোহন সেন মহাশয় "সঙ্গীত তরঙ্গ" নামক উৎকৃষ্ট সঙ্গীত বিজ্ঞান গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত সুমধুর কবিতায় রচিত। এক্ষণে 'বঙ্গবাসী' অফিস হইতে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে।

বাল্যে প্যারীচাঁদ, গুরু মহাশয়ের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। বাঙ্গলা ভাষায় যখন প্যারীচাঁদের কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি হইল, তখন তাঁহার পিতা,—পুত্রের জন্ম পারসী শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। প্যারীচাঁদকে পড়াইবার জন্ম একজন মুন্সী নিযুক্ত হইলেন। বাঙ্গালা ও পারসী ভাষায় প্যারীচাঁদের অভিজ্ঞতা জন্মিল; তখন প্যারীচাঁদ ১৮২৯ সালের ৭ জুলাই হিন্দু কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন। এ সময়ে তিনি ইংরেজি শব্দ যথারীতি উচ্চারণ করিতে পারিতেন না; তাঁহার কদর্য্য উচ্চারণ শুনিয়া সহপাঠী ছাত্রগণ হো–হো করিয়া হাসিয়া উঠিত;—প্যারীচাঁদের মুখে ইংরেজী বুলি শুনিয়া, আমোদ করিবার জন্ম, অনেকে নানারূপ প্রয়াস পাইত।

কিন্তু এ ভাবটী বেশী দিন রহিল না। মেধাবী প্যারীচাঁদ, অতি অল্পদিনেই ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করিয়া লইলেন; ফলে, অন্যান্য বালকগণ যে সময়ে কলেজের সমগ্র পাঠ শেষ করেন, তাহারও অল্প সময়ে প্যারীচাঁদ কলেজে অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করিলেন। তিনি গণিত-প্রিয় ছিলেন না,—সাহিত্যেই তাঁহার সমধিক অনুরাগ ছিল। সুপ্রীম কোর্টের জজ গ্রাণ্ট সাহেব একবার একটি প্রবন্ধ লিখিতে দেন। প্রবন্ধের জন্ম পুরস্কার নির্দ্দেশ থাকে। প্যারীচাঁদ এই প্রবন্ধ লেখেন; রাজা দিগম্বর মিত্রও প্রবন্ধ লেখেন, কিন্তু প্যারীচাঁদই জয়লাভ করেন,—পুরস্কার পান। প্যারীচাঁদ গণিতে অনুরাগী ছিলেন না বটে; কিন্তু ইহার জন্ম কলেজের গণিতাধ্যাপক টাইটলার সাহেব তাঁহার উপর কখন বিরক্ত হন নাই,—বরং তাঁহাকেই বড় ভালবাসিতেন। প্যারীচাঁদ বড়ই চিন্তাশীল ছিলেন,—এইজন্ম টাইটলার সাহেব তাঁহাকে "দার্শনিক" বলিয়া ডাকিতেন। ইহা বাৎসল্যের সম্বোধন।

কলেজ ত্যাগের পর প্যারীচাঁদ ১৮৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা পাবলিক্ লাইব্রেরীর ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান পদে নিযুক্ত হইলেন। পাঠানুরাগী প্যারীচাঁদের বড়ই সুবিধা হইল। আফিসের কাজ কর্ম্ম সারিয়া, তিনি প্রাণ পুরিয়া লাইব্রেরীর নানারূপ গ্রন্থ পড়িতে থাকিলেন। তাঁহার কার্য্যে অতিমাত্র পরিতুষ্ট হইয়া, লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষ অবিলম্বে তাঁহাকে সেক্রেটারী এবং লাইব্রেরীয়ানের পদে উন্নীত করিলেন। ইহা ১৮৬৭ সালের কথা। কিন্তু এ কর্ম্ম ইনি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিলেন। চাকুরী করা তাঁহার এই স্থানেই শেষ হইল। ইতিপূর্ব্বেই প্যারীচাঁদ,—কালাচাঁদ শেঠ এবং তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর সহিত অংশিদাররূপে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। চাকরী ছাড়িয়া, এইবার তিনি ব্যবসায়ে অধিকতর মনোনিবেশ করিলেন। ফলে, তাঁহার প্রভূত আয় হইতে লাগিল। অতঃপর তিনি স্বয়ং পৃথক ব্যবসায় খুলিলেন; কালাচাঁদ এবং তারাচাঁদের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেন, অবিলম্বেই তাঁহার ভাণ্ডার রজত কাঞ্চনে পূরিয়া উঠিল।

ধনাগমের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার যশোরাশিও চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। প্যারীচাঁদ একাধিক টি-কোম্পানি ও যৌথ কোম্পানির ডিরেক্টর হইলেন। লর্ড ডালহৌসি তখন এদেশের বড় লাট। পুলিশ সংস্কার উদ্দেশে তিনি এক কমিশন বসান। কলভিন ও ডামপির নামক দুই জন সাহেব কমিশনের কার্য্য করেন। অনেক সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় এবং এদেশীয় লোকে এই কমিশনে সাক্ষ্য দেন। প্যারীচাঁদকেও সাক্ষী দিতে হইয়াছিল। তিনি কমিশনের নিকট পুলিশের নানারূপ দোষের কথা নির্ভীক চিত্তে খ্যাপন করেন। ফলে, পুলিশের অনেক অপরাধী কর্ম্মচারীর কর্ম্ম যায়। কলিকাতায় তৎকালে যত বড় বড় সামাজিক সভা সমিতি ছিল, প্যারীচাঁদের সহিত ইহার প্রায় সকল সভারই সম্পর্ক থাকিত। প্যারীচাঁদ বেথুন সোসাইটির সেক্রেটারী,—প্যারীচাঁদ জীব-নিষ্ঠুরতা-নিবারণী সভার সম্পাদক, প্যারীচাঁদ বেঙ্গল সোশিয়েল সায়েন্স এসোশিয়েশনের অবৈতনিক সেক্রেটারী, প্যারীচাঁদ কৃষি সভার অবৈতনিক সভ্য ও সহকারী সভাপতি, প্যারীচাঁদ বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের আদি সদস্য। পূর্ব্বে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ছিল না, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি। মিঃ জর্জ্জ টমসন ছিলেন ইহার প্রেসিডেণ্ট এবং প্যারীচাঁদ সেক্রেটারী। প্যারীচাঁদ হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড কমিটির সেক্রেটারী, প্যারীচাঁদ ডিষ্ট্রিক্ট চেরিটেবল সোসাইটির এবং কলিকাতা পাবলিক্ লাইব্রেরীর সদস্য। ১৮৬৮ সালের ১৮ই জানুয়ারী

হইতে ১৮৭০, ১৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত প্যারীচাঁদ বেঙ্গল কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। এই সময়ে তিনি এই ব্যবস্থাপক সভায় জীব-নিষ্ঠুরতা-নিবারণ উদ্দেশে দুই খানি বিল পাশ করেন। ইহা এক্ষণে ১৮৬৮ সালের প্রথম এবং তৃতীয় আইন নামে অভিহিত। প্যারীচাঁদ অনরবি ম্যাজিষ্ট্রেট; প্যারীচাঁদ জষ্টিস্ অব্ দি পিস্;—প্যারীচাঁদ কলিকাতা সিনেটের সদস্য। প্রতিষ্ঠার কথা আর কত বলিব?

যেমন সমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা, তেমনি ইংরাজি সাহিত্যে। প্যারীচাঁদ 'কলিকাতা রিভিউ' নামক ইংরাজী পত্রে জমিদার এবং প্রজা সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লেখেন, বিলাতে এই প্রবন্ধ লইয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। পার্লামেণ্টের লর্ড সভাতেও এই প্রবন্ধের কথা উঠে। কলিকাতা রিভিউ পত্রে তিনি অন্যান্য বিস্তর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার সকল প্রবন্ধই গবেষণামূলক এবং সবিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচায়ক।

ইংরাজী সাহিত্যে প্যারীচাঁদের প্রতিষ্ঠা যে পরিমাণ, বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। প্যারীচাঁদই বাঙ্গলাভাষার সুচিক্কণ রং ফলাইয়াছেন। প্যারীচাঁদই বাঙ্গলাভাষার সজীবতা সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহার প্রকাশিত "মাসিক পত্রিকা" নাম্নী মাসিক পত্রিকায় সে সাধনায় আরম্ভ; তাঁহার বামাতোষিণীতে তাঁহার পরিণতি। তাঁহার অভেদী—তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ—তাঁহার আধ্যাত্মিকা, তাঁহার বামা রঞ্জিকা;—তাঁহার ভাষা সৌন্দর্য্যের কমলকানন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রত্ন—আলালের ঘরের দুলাল। এ গ্রন্থের তুলনা সম্ভবে না। বঙ্কিমচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে লিখিয়াছেন,—"আলালের ঘরের দুলাল বাঙ্গলাভাষায় চিরস্থায়ী হইবে।" অনেক সম্ভ্রান্ত সুশিক্ষিত ইউরোপীয় ব্যক্তিও এ গ্রন্থের প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। ভাব এবং রসিকতা তাঁহার গ্রন্থে ভরপুর। পড়িতে পড়িতে হাসিয়া ঢুলিয়া পড়িবে, কিন্তু বুঝিতে পারিলে মর্ম্মগ্রন্থি ছিঁড়িয়া যাইবে। পাদরী লং সাহেব প্যারীচাঁদের বিশেষণ দিয়াছিলেন,—"বঙ্গের ডিকেন্স"। তাঁহার অন্যান্য কোন কোন মতবাদে বিতর্ক চলিতে পারে; কিন্তু তাঁহার সাহিত্য প্রতিষ্ঠার কথা সর্ব্ববাদীসম্মত।

সাহিত্যে যেমন, চরিত্রেও তেমনি। প্যারীচাঁদ যেমন রসিক তেমনি ভাবুক। তিনি হাসিতেন, হাসাইতেন; ভাবিতেন,ভাবাইতেন। শক্তি বস্তুতই অপরিমেয়। সঙ্গীতেও তাঁহার অনুরাগ খুবই ছিল।

২৪ পরগণা খড়দহ-নিবাসী বিখ্যাত প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের কন্যার সহিত প্যারীচাঁদের বিবাহ হয়। প্রাণকৃষ্ণ ভক্ত তান্ত্রিক ছিলেন; ইনি অনেক তন্ত্র গ্রন্থের সঙ্কলন করেন। ইনিই সত্তর সহস্র শালগ্রামের সংগ্রাহক। প্যারীচাঁদের পত্নীও সুশিক্ষিতা ছিলেন; পড়া শুনা করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। তাঁহারই যত্নে প্যারীচাঁদ আলালের ঘরের দুলাল রচনা করেন। ১৮৬০ সালে প্যারীচাঁদের পত্নী-বিয়োগ ঘটে। প্যারীচাঁদ বড় ব্যথা পান। তিনি প্রেততত্ত্ব আলোচনায় মনোনিবেশ করেন; ইংলণ্ড এবং আমেরিকার সংবাদপত্রে প্রেতবাদ সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ লেখেন। আমেরিকার বোষ্টন সহরস্থ থিওসফি সোসাইটির সদস্য হন। প্রেততত্ত্বে মন দিয়া তিনি পত্নীশোকে অনেক সান্ত্বনা পাইলেন।

কিন্তু ভাঙ্গা বুক,—কালের ভর আর বেশী সহিতে পারিল না,—তাঁহার নশ্বর দেহের বিনাশ হইল।

নশ্বর দেহের বিনাশ হয়; অবিনশ্বর কীর্ত্তি চিরদীপ্ত রহে। বাঙ্গলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদের কীর্ত্তি—প্রতিষ্ঠা—অনন্তকাল স্থায়ী—অবিচল।

[১৯০৪ খৃষ্টাব্দে 'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয় হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলালের এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সময়ে ৩০শে এপ্রিল তারিখে প্যারীচাঁদের জীবন-কথা আলোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার একটি প্রবন্ধ বঙ্গবাসীতে লিখিয়াছিলেন। বিহারী বাবু অপর কোনও প্রবন্ধে প্যারীচাঁদ সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই, সুতরাং আমরা প্রবন্ধটি স্থায়ীভাবে রক্ষা করিবার জন্য এইখানে প্রকাশ করিলাম।]

বহুরূপী।

[শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

২.

শোভাবাজারের নিকটেই একটী গলির ভিতর কিরণের বাড়ী। তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিলাম। হরেন্দ্রের কথা কিন্তু তখনো আমার মনটী ঘেরিয়া রাখিয়াছিল। এক সঙ্গে —সে আজ পনর বৎসর পূর্ব্বে—একই অপিসে কাজ করতাম। হরেন্দ্রের চাকরী আমার চাকরী হইবার অনেক অগ্রে কিন্তু, সেখানে তার ৩৫৲ টাকার বেশী মাহিনা হয় নাই। তারপর একটী সত্য মিথ্যা অপবাদে হরেন্দ্রের চাকরী যায়। কিন্তু লোকটী নিজেকে তখন ব্রাহ্মণ বলিয়া, এবং তাহাদের বংশ, সিদ্ধ-বংশ ইত্যাদি বলিয়া জলখাবারের ঘরে অনেক কথা বলিত। অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প করিত। তখন পেনটুলান বা হ্যাট পরিত না। এর পর শেষ দেখা একদিন মিণ্ট স্ট্রেটে। তখন বলেছিল কোন একটা অপিসের কর্ম্ম করে। আমার কিন্তু লোকটীর ধর্ম্মভাব দেখে গোড়া থেকেই তার উপর কেমন একটা শ্রদ্ধা ছিল। আজ গাড়িতে যখন সে ক্রমাগত তার ঐশ্বর্য্য ও সম্পদের গর্ব্ব কর্‌ছিল, তখন বড় বিরক্তকর বলিয়া মনে হচ্ছিল। ভাবছিলাম, লোকটীর অর্থের সমাগমের সহিত, পূর্ব্বের সে সব ধর্ম্ম কথা লোপ পাইয়াছে, কিন্তু যখন দুই বেলা দুই ঘণ্টা সন্ধ্যা আহ্নিকের কথা ইত্যাদি বলিতে বলিতে তাহার দুই চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিল, তখন বর্ত্তমান হরেন্দ্রের মধ্যে পনর বৎসর পূর্ব্বের হরেন্দ্রের অনুসন্ধান পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। ভাবিলাম হাজার অর্থ পাইলেও মানুষের স্বাভাবটা কি কখনো সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইতে পারে? কাল একবার হরেন্দ্রের আপিসে যাইব। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, কিরণের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিরণ সদর দরজার নিকট অপেক্ষা করিতেছিল। আমাকে আসিতে দেখিয়া মনে হইল যেন সে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিল। বলিল, আচ্ছা যাহা হৌক, নিমন্ত্রণের কথাটা বুঝি একবারে বিস্মরণ হ'য়েছিলে? আমি বলিলাম "ব্রাহ্মণের ছেলে নেমন্তন্ন ভুলব কি বল? কিন্তু তুমি যে এমন বেছে বেছে দিন ঠিক করে নেমন্তন্ন করবে তা কে জানে বাবা! যে সেদিন একখানি গাড়ী পাবার উপায় পর্য্যন্ত থাকবে না।"

কিরণ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেন হে? আজ কি, যে গাড়ী নেই?"

আমি হাসিয়া বলিলাম "কেবল পাটের দর উঠিল কি পড়িল, এই সংবাদ রাখ, আর অন্য সংবাদ রাখ্‌বার সময় পাবে কখন? আজ যে শুভ পহেলা, বৎসরের প্রথম দিন, তা বুঝি মহাশয়ের একেবারেই বেমালুম হজম।"

কিরণ বলিল, "এখন আর তর্ক করবার সময় নেই, মার্ত্তণ্ডদেব শিগ্‌গিরই আজকের মত বিদায় নেবার জোগাড় কর্‌চেন, চল, আমাদের কিছু পেটে দিয়ে গিন্নিকে নেমন্তন্ন করার হাত থেকে অব্যাহতি দিইগে।"

এদিকে যেমন অত্যন্ত বেলা হইয়াছিল, অপর দিকে তেমন অগ্নিদেব অত্যন্ত জলিয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং ব্রতচারিণী ব্রাহ্মণীর সেদিন ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া যথেষ্ট আনন্দ হইয়াছিল নিশ্চয়—কারণ দুর্ভিক্ষ পীড়িতের মত পাতে কিছু ফেলিয়া রাখিনি।

বাহিরের ঘরে যখন আসিয়া উপস্থিত হইলাম তখন আর বসিবার শক্তি ছিল না। ফ্যানটা খুলিয়া দিয়া আর পপাত শয্যাতলে। মনে হইল ছেলেগুলিকে সর্ব্বদা নিষেধ করি, খবরদার একেবারে পেট পুরিয়া খাসনি, কিন্তু আজ পহেলা 'বউনি'টা যে পেট ছাড়িয়া কণ্ঠ পর্য্যন্ত ভরিয়া গিয়াছে তাহার কি?

এই সময় কিরণ আসিয়া বলিল, "গাড়ি পাওনি, রৌদ্রে বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছ শুনে পর্য্যন্ত গিন্নী আমার উপর ভারী

রাগ করছেন, বলছেন, তোমার জন্তই ত শশাঙ্ক বাবুর এত কষ্ট। জান আজ পহেলা বৈশাখ, গাড়ি পাওয়া দুষ্কর। সকালে গাড়ী পাঠিয়ে দিলে আর এতটা কষ্ট পেতেন না। ব্রাহ্মণকে এমন করে কষ্ট দিয়ে আজকের দিন খুব অন্যায় হয়েছে। এই রৌদ্রে সারা পথ হেঁটে এসে কি আর মানুষ খেতে পারে, না খেতে ভাল লাগে ?"

আমি বলিলাম, "সে কি হে! আমি আজ এমন খেয়েছি, যে শয্যা নিতে হ'য়েছে। তোমার স্ত্রী খুব সুন্দর রাঁধেন। তুমি বল গে যে তাঁর পুণ্যে আমাকে হেঁটে আসতে হয় নাই। হঠাৎ আজ একটী বন্ধুর সঙ্গে পনর বৎসর পরে দেখা, সে তার ঘরের গাড়ী করে বাগবাজার যাচ্ছিল, আমাকে দেখতে পেয়ে এখানে নামিয়ে দিয়ে গেছে।"

কিরণ আমার হাতে পান দিয়া আমারই পাশে শুইয়া পড়িল, বলিল "তুমি যে দেখচি উপন্যাস ক'রে ফে'ল্লে। পনর বৎসরের পর বন্ধুর সঙ্গে দেখা এবং তার গাড়ীতে চেপে আসা। তোমারই দেখ্‌চি শুভ-পহেলা বৈশাখ লেগেছে।"

আমি বলিলাম—"সেটা আমার পুণ্যে নয়, তোমার স্ত্রীর ভক্তিতে।"

এই সময় ঝি আসিয়া বলিল "মা ঠাকরুণ ডাকছেন।"

কিরণ বলিল "আবার কি হুকুম? দেখি বলিয়া সে বাড়ীর ভিতর যাইতেছে দেখিয়া আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া দিলাম, "দেখ ভাই, আর কোন রকম কিছু পেটে ধরবার জায়গা নাই—সেটা কাটিয়ে এসো। যদি কিছু বাকী থাকে তবে আর একদিনের জন্য মুলতবী রেখে এসো।"

আমি ধীরে ধীরে চক্ষু বুজিলাম। কিরণ আসিয়া ডাকিল—"শশাঙ্ক, তুমি ঘুমোলে নাকি? আসল কাজই যে বাকি।"

আমি গুরু আহার-পীড়িত, অলস নেত্র! অতি কষ্টে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া বলিলাম, "মাপ কর ভাই, আমার দ্বারা আজ আর কিছু হওয়া একবারে সম্ভবপর নয়।"

কিরণ বলিল "তা অপরের দ্বারা বা Proxy দ্বারা হবার একবারে আইন নাই। আমি তোমার অবস্থা দেখে অনেক লড়াই করে তবে দূত-স্বরূপ সংবাদ দিতে এসেছি, যে তোমাকে একবার গিন্নির সম্মুখে গিয়ে হাজির হ'তে হবে, এবং তিনি স্বয়ং তোমার হাতে কি দেবেন, নতুবা তাঁর ব্রত না-মঞ্জুর বা পণ্ড হবে। এতখানি দায়িত্ব কে নেবে ভাই?"

আমি হতাশ দৃষ্টিতে কিরণের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "এখন কি আবার আমাকে দোতলা উঠতে হবে?"

কিরণ বলিল "না, অতখানি কষ্ট স্বীকার আর করতে হবে না, সে বিষয়ে তিনি খুব বিবেচনাই করেছেন। অন্দরের দরজা পর্য্যন্ত এসে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। সে পর্য্যন্ত তোমাকে পৌঁছতে হবে।"

অগত্যা অতি কষ্টে কিরণের সহিত একরূপ ময়াল সাপের মত নিজেকে টানিয়া লইয়া চলিলাম। কিরণের স্ত্রী একটী পৈতা, একখানি গিনি, একটী ডাব, একটী সন্দেশ আমার হাতে দিয়া গললগ্ন-কৃতবাসে ভূমিষ্ঠা হইয়া আমাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। আমার সেগুলির ভার বহন করিয়া আনিবার সামর্থ্য ছিল না। সুতরাং কিরণের হাতে দিয়া বলিলাম—ভাই তুমি নিয়ে এস। আমি আসিয়া পূর্ব্ববৎ শুইয়া পড়িলাম। কিরণ পৈতা ও গিনিখানি আমার পকেটের ভিতর দিয়া ডাবটী সেলপের উপর রাখিয়া আমারই পার্শ্বে আমার অনুষ্ঠিত পথ অবলম্বন করিল।

আমি চোখ বুজিয়া বুজিয়া বলিলাম—"আমার শুভ পহেলাটা মন্দ হলো না! এমন খাওয়া, তার উপর নগদ একখানি স্বর্ণমুদ্রা। এবার একবার কোষ্টিটা দেখালে মন্দ হয় না।"

কিরণ সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল "তখন যে তুমি বলছিলে পনর বৎসর পরে একটী বন্ধুর সঙ্গে আজ দেখা হ'লো, এটা অবিশ্যি একটা শুভ-চিহ্ন বলতে পারা যায়। তিনি কি করেন?"

আমি বলিলাম "এই দেখ এমনি খেয়েছি যে সব কথা ভুলে গেছি, সেই কথাই তোমাকে বলব বলে এতক্ষণ মনে করছিলাম।"

কিরণ জিজ্ঞাসা করিল "ব্যাপার কি ?"

আমি উত্তর করিলাম, "তোমার কি মনে পড়ে, অনেকবার তোমার নিকট আমাদের অফিসের একটী বাবুর বিষয় গল্প করেছি—তার নাম হরেন্দ্র।"

কিরণ কিছুক্ষণ মনে মনে চিন্তা করিয়া বলিল "না, ঠিক মনে পড়ছে না। তবে নামটা যেন শোনা শোনা বলে মনে হচ্ছে। কি বিষয় নিয়ে কথা হয়েছিল বল দেখি ?'

আমি কহিলাম "তোমার মনে আছে কি বেলগেছের একটী বাগানে একজন খুব বড়দরের সাধু এসেছিলেন। খবরের কাগজে তাঁর সংবাদ পেয়ে একদিন তাঁকে দেখ্‌তে দুজনে যাই ?"

কিরণ অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করিয়া বলিল, "যোগানন্দ পরমহংসের কথাই খুব মনে আছে। সেদিন বাড়ী ফিরতে প্রায় রাত্রি ১টা বেজে গিয়েছিল। তার একজন প্রধান ভক্ত আমাদের গাড়ীতে এলো ; এবং পরমহংস সম্বন্ধে সে কত সব আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয় বলতে লাগল। সে কথা খুব মনে আছে। কেন, কি হয়েছে ? তিনি আবার এসেছেন নাকি ?"

আমি বলিলাম "এইবার তাহা হ'লে তোমার সব কথা স্মরণ হ'তে পারে। সেই অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনে আমি বলেছিলাম আমাদের আপিসের হরেন্দ্র বাবুর নিকট শুনেছি, যে তাঁহার পিতামহ সিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন। তিনি নাকি শূন্যের উপর দিয়ে খড়ম পায়ে দিয়ে সর্ব্বত্র যাতায়াত করতেন।"

কিরণ আগ্রহভরে হাততালি দিয়া বলিল, "ও সব কথা মনে পড়ে গেছে,—ইনি সেই হরেন্দ্র বাবু নাকি ?"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ। এখন আর চাকরী করেন না। নিজে আপিস করেছেন। পাটের দালালি করেন। বললেন মাসে প্রায় দুই হাজার টাকা রোজকার করেন। নিজের গাড়ী ঘোড়া রেখেছেন। শুনলাম, তোমার সঙ্গে নাকি তোমার আড়তে তাঁর দুই একবার আলাপ হয়েছে।"

কিরণ বলিল, "লোকটকে না দেখ্‌লে ঠিক বল্‌তে পারি না, কোন দিন আলাপ হয়েছিল কি না। তা তিনও কি আজ কাল শূন্যে যাতায়াত সুরু করেছেন নাকি ?"

আমি একটু রাগিয়া বলিলাম "তোমার ওই এক কথা, এসব ঠাট্টা নয় হে।"

কিরণ মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমি ঠাট্টার কথা মোটেই বলি নি। তোমার মনে এ ভাব আসে কেন ? লোকটী ৩৫৲ টাকার চাকরী ছেড়ে, মাসে দুহাজার টাকা রোজগার করছে, এটা ত তাহলে ঠাট্টা বল ?"

আমি বলিলাম "এটা কি খুব অসম্ভব ব্যাপার মনে কর না কি ?"

কিরণ হাসিয়া বলিল, "আর শূন্যে যাতায়াত করাটাই কি খুব আশ্চর্য্য কীর্ত্তি না কি ?"

আমি বলিলাম "আশ্চর্য্য নয়ই ত।"

কিরণ কহিল, "তবে আমার কোন্‌ খানটায় বলা অন্যায় হ'য়েছে ধরিয়ে দাও। এখন মোদ্দা কথাটা কি বল দেখি শুনি।"

আমি বলিলাম "সে আমাকে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেছে।"

কিরণ অনেকক্ষণ নীরবে কি চিন্তা করিয়া বলিল "তিনি কি শুনেছেন যে তুমি চাকরী ছেড়ে কারবার করছ ? পাটের দালালি করেন, মাসে দুই হাজার টাকা উপার্জ্জন করেন এমন লোক অতি অল্প। তাদের সকলকেই ত চিনি।" তার পর অর্দ্ধ নিমীলিত নয়নে ঘরের কড়ির দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া যেন কি মনে করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। শেষে আপনা-আপনি মাথা নাড়িয়া বলিল, "না ভাই, তেমন লোক ত কেউ চক্ষে পড়ে না। কারণ এঁদের সবাইকে ত চিনি। তুমিও ত তাঁদের অনেকবার আমার বাড়ীতে আসতে দেখেছ এবং চেন।"

আমি বলিলাম, "আমি যে চাকরী ছেড়ে দিয়েছি একথা সে নিজেই উত্থাপন করলে এবং সে কাজটা যে খুব ভাল কাজ করা হ'য়েছে সেজন্য ধন্যবাদ দিল। কিন্তু আমি যে কি করচি না করচি সেটা সারা পথের মধ্যে জিজ্ঞাসা করে নাই, তবে যখন গাড়ি থেকে নামে তখন ভুল হয়েছে বলে আপশোষ করতে করতে বল্লে, কাল

আমার আপিসে আসতে চাও। লোকটার কিন্তু খুব ধর্ম্মভাব!"

কিরণ মৃদু হাসিয়া বলিল "আজকাল অর্থাভাব না থাকলে ঐ ভাবটার কিছু প্রাবল্যও ছড়াছড়ি দেখা যায়। ওটাত শেষে বড়মানুষির অঙ্গ হ'য়ে পড়ছে দেখ্‌ছ না?"

আমি একটু উত্তেজিত হয়ে বল্লাম "তুমি কি বলতে চাও যে, যাদের টাকা আছে, তারাই খুব ধার্ম্মিক?"

কিরণ বলিল "তুমি ভুল কচ্চ কেন? আমি ত ঠিক ওকথা বলি নাই। আমি বল্‌ছি, যাঁদের টাকা আছে তাঁরাই আজকাল সাধু সন্ন্যাসীর সেবা, কথায় কথায় ধর্ম্মভাবের বিকাশ দেখাইয়া থাকেন। আর সাধু সন্ন্যাসী, মহাপুরুষও প্রায়ই তাঁদের বাগান-বাড়ী বা বৈঠকখানা ঘরে আসিয়া অবস্থান করেন।"

আমি বলিলাম "একথার তাৎপর্য্য কি? যেখানে অর্থ সেইখানে ধর্ম্ম?"

কিরণ হাসিয়া বলিল "অনেকটা কাছে পৌঁছেছ বটে তবে, আর একটু বিলম্ব আছে। যেখানে অর্থ সেইখানে যে ধর্ম্ম তার অকাট্য প্রমাণ হচ্ছে মন্দির প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মশালা সংস্থাপন, চাঁদার খাতায় সই করা, ভাণ্ডারা দেওয়া; এসব ত টাকার কাজ ভাই, টাকা না হ'লে ত আর এসব ধর্ম্ম করা যায় না।"

আমি বলিলাম "তোমার কথায় বোঝাচ্ছে যে যাহারা এসব কাজ করতে পারে না, যাহারা কোন গতিকে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে, তারা সব অধার্ম্মিক—কেমন?"

কিরণ বলিল "ছি! অমনি করিয়া অর্থ করলে চলবে কেন ভাই? যাদের টাকা নাই তাদের বড় ধার্ম্মিক হ'তে হ'লে আগে টাকা রোজগার করতে হবে। ধার্ম্মিক ব'লে পরিচয় না দিলে এই সব বড় বড় ধার্ম্মিকেরা কোন দিন তাদের বিশ্বাস করবে না, চুপ চাপ ঘরে খিল দিয়ে সন্ধ্যে করলে বা লুকিয়ে দুই একটা দরিদ্র সাধুর সেবা করলে কে তাদের চিনবে? কে তাদের বিশ্বাস করবে? আর কথায় কথায় অনিচ্ছাবশে যেন এমন কথা বেরিয়ে পড়ে যে, ভগবান যদি আমায় একবার টাকা দেন তবে ধর্ম্ম যে কেমন করে করতে হয় একবার দেখিয়ে দিই। সন্ধ্যা আহ্নিক করতে করতে মাঝে মাঝে যে অজ্ঞান হয়ে পড় একথাটাও কৌশলে কথা-প্রসঙ্গে প্রকাশ পাওয়া চাই। তবে ভাই ধার্ম্মিক হ'বার মত অধিকার থাকে। এসব বিদ্যে না থাকলে এসংসারে দাঁড়াতে পারবে না। লোকের গাড়ী, ঘোড়া, মটর, বাড়ী সবই যে পরমার্থের দেওয় একথা তুমি সবাইয়ের মুখে শুনতে পাবে। পরের দুঃ দেখে সহানুভূতি করবার আকাঙ্ক্ষাটা তাদের ভিতর এ অধিক যে, কেবল টাকার সঙ্কুলন করতে পারে না বলে এই সব সদিচ্ছা দমন করে রাখতে হয়েছে।"

আমি বলিলাম "কিরণ, তুমি আজ এসব কি ক বলছ?"

কিরণ এবার দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিল "নির্জ্জলা সত্যকথা ইংরাজীতে যাহাকে 'naked truth' বলে। যে ক লোকের মুখের উপর বলে লোকের বন্ধু বিগ্‌ড়ে যা বড় দুঃখ হচ্ছে তুমি যাকে বন্ধু ব'লে, যার ধর্ম্মভাব দে এতদূর মুগ্ধ, সে আজ কালকার দুর্দ্দিনে তোমার চাক ছাড়ার কথা জেনেও কেবল ছাড়ার বাহবা দিয়ে নি গাড়ি-ঘোড়া ঐশ্বর্য্যের গল্প শুনিয়ে গেল। আবার ধ নামে অশ্রু বিসর্জ্জন করতে কিছুমাত্র লজ্জা অনুভব ক না। এমন কি, তুমি কি করছ জিজ্ঞাসা করবা অবকাশ পর্য্যন্ত পেলে না। শশাঙ্ক, আমাকে মাপ্‌ ক এসব আমার মোটেই পছন্দ হয় না; সহও করতে প না।"

আমি বলিলাম, "না হে, তুমি যা মনে করচ তা ন এত টাকা রোজকার করেও তার ধর্ম্ম ভাবটি পুরা বজায় আছে।"

কিরণ বোধ হয় একটু বিরক্ত হয়েছিল, সুতরা আর কোন উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ পরে কিরণ ব "দিন কতকের জন্য একবার বাহিরে যাব মনে করে রবিবার দিন একবার এস, পরামর্শ আছে।"

ক্রমশঃ।

স্বদেশ ।

[শ্রীভক্তিসুধা হার]

ভূষণ বিহীনা, মলিনা জননী
রূপসী শ্যামল-বসনে
ভুবন-মোহিনী, হৃদয়-হরণী
করুণা-কাজল নয়নে।
কবে কোন্ শুভ দিবসের প্রাতে
সৃজনের ধাতা দুটি রাঙা হাতে
মোরে দিল দান নিয়তির সনে
তোমারে, বিজনে, গোপনে—
তুলি' নিলে সুখে আপনার জনে
কোমল বক্ষ-শয়নে।

কতবার আমি ফুল বীথিকায়
আপনারে ল'য়ে মগনা
ফুলমালা আর প্রেম-গীতিকায়
করেছি কাহার সাধনা ;
তুমি সযতনে মোর ধূলিরাশি,
অঞ্চলে মুছি লয়েছিলে হাসি
কল্যাণি, তব স্নেহের বাঁধনে
টুটিয়া, করেছি ছলনা,
মোর প্রীতিহারে করিনি যতনে
তব কেশ-পাশ রচনা।

অজনে তব জোনাকীর মেলা
হে মোর দুখিনি জননি !
মন্দির ছাড়ি' দূরে দূরে খেলা
কাটায়েছি সুখে রজনী।
আমার দুঃখ-আলস-জড়িমা
ঢেকেছে তোমার অমল গরিমা
তবু বসন্ত বর্ষা শরতে
নব রূপে চির-তরুণী
শোভিতা শোভন-শ্যাম-মেখলায়
ভুলায়েছ প্রেমে অবনী।

অম্বর-বীণে রণি' রণি' আজি
কি রাগিণী করে আরতি
বাঁশরীর তান বেদনায় বাজি'
গাহিছে, লক্ষ্মি, ভারতি !
তোমা' লাগি আজ করেছি রচনা
হৃদয়-পদ্মে অশ্রুর কণা
শোভিত-শিশির শতদল হ'তে
শুভ্র, অমল মিনতি—
ঢাকি' লাঞ্ছনা-বঞ্চনা-ক্ষতে
অধমের প্রাণ-প্রণতি।

তসবির।

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম-এ, বি-ল]

সে আজ অনেক দিনের কথা। সন—না, তারিখটা এখানে লিখে কাজ নাই। তের সংখ্যাটা অনেকে বলে দুর্ভাগ্য নিয়ে আসে। সেবার বড়দিনের ছুটিতে দেওঘরে আমার ছাত্র-জীবনের বন্ধু জগদীশের সঙ্গে গিয়েছিলাম। একে শীতকাল, তাতে আবার আকাশটা মেঘে ছেয়ে রয়েছে। বাইরে দেখলে মনে হয় যেন ধরিত্রীদেবী শীতে জড়-সড় হয়ে গেছেন, তাই তেপান্তরের মাঠ-জোড়া এক-খানা কালো কম্বল গায়ে জড়িয়ে জুজুর মত দশদিক চেপে

ব'সে রয়েছেন। এমন সময়, বিশেষতঃ বিকেল বেলায়, কে আর অলষ্টার-ঢাকা পঞ্জর সার দেহটীকে তুষার শীতল বায়ুর অনিশ্চিত গতির মুখে এগিয়ে দিতে সাহসী হয়? জগদীশ বাইকে চ'ড়ে ষ্টেশনের দিকে গিয়েছিল। বাড়ী থেকে রোজ একখানি ক'রে চিঠি না পেলে তার মন স্থির হ'ত না। পিয়নের অপেক্ষায় ব'সে থাকা তার পক্ষে কষ্টকর। আমি এর ঠিক উল্টো ধাতের লোক। চোখের বাইরে গেলেই, আমার মনের বাইরে চ'লে যায়।

জগদীশ দু-ঘণ্টার ছুটি নিয়ে রওনা হ'লে আমি মনে করলেম পাশের ঘরে দেয়াল-আলমারি দুইটিতে যে বইগুলি আছে তার মধ্যে যদি কোনও কবি আশ্রয় নিয়ে থাকেন তাহ'লে তাঁকে হল-ঘরে আনব। দেয়াল-আলমারির চাবি মুন্নার মা'র নিকট ছিল। মুন্নার মা জগদীশদের দেওঘরের ধাই। বাড়ীখানি পূর্ব্বে তার স্বামীর ও পরে তার তত্ত্বাবধানে ছিল। মুন্নার মা এখন আর সেখানে নাই। আমরা কল্‌কেতায় ফিরে আসবার পর সে একদিন দেওঘর ছেড়ে পঞ্চভূতের দেশে চ'লে গেল। আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন মুন্নার মা'র বয়স আন্দাজ চল্লিশ বৎসর। ধাই আমাকে চাবি দিয়ে বল্লে, "বাবু, দেখবেন কিতাব সব মাটি হয়ে গেছে। জগ্‌দীশ বাবুকে আমি কতবার বলেছি, এ সব কলকত্তা লিয়ে যান। আমার কথা শুনেই না।" আমি তাহাকে বলিলাম, "আচ্ছা ধাই, আমি জগদীশ বাবুকে বুঝিয়ে বলব, বইগুলি যেন কলকেতায় নিয়ে যায়।"

মুন্নার মা চ'লে গেলে আমি একটা আলমারি খুলে দেখি তার ভেতর আরসুল্লা আর মাকড়সার উৎপাতে স্তূপীকৃত আবর্জ্জনার সৃষ্টি হয়েছে। একটা কেমন উৎকট ভ্যাপ্‌সানি গন্ধও বেরচ্ছে। নানান রকম লেখকেরই গ্রন্থ দেখলাম। তার মধ্যে বেশীর ভাগ ইংরাজিতে লেখা ভ্রমণ বৃত্তান্ত। মলাটের উপরে সোণালী রঙে কয়েকজন গ্রন্থকারের চেহারা নূতন সংস্করণের সঙ্গেই বহু বৎসর পূর্ব্বে মুদ্রিত হয়েছিল। আমি যদি কোনও ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষা করাইতাম তাহা হইলে তিনি বলিতেন, শ্যাতানে ঘরে বন্ধ থাকাতে কোনও লেখকের বুকে ডবল নিউমনি-য়ার দাগ প'ড়েছে, এনিমিয়াতে কাহারও মুখটা ফুলিয়া গিয়াছে, আবার কেহ বা চক্ষু কর্ণ হারাইয়া চিরকালের তরে অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছেন। চিত্র-সম্বলিত অনেকগুলি পুস্তকে চিত্র-তস্করের ক্ষিপ্রহস্তের নমুনা দেখিলাম। একখানি সেক্সপীয়রের মূল্যবান শোভন-সংস্করণ যাহা বহু সুন্দর প্লেটে সজ্জিত ও তদ্দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, এক্ষণে সমুদয় চিত্রের অভাবে শ্রীহীন হইয়া সেলফের উপর একধারে আহত বীর পুরুষের ন্যায় কাত হইয়া রহিয়াছে। লিপি-তস্কর পেটের দায়ে তাহার ঘৃণ্য ব্যবসা অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু চিত্র-তস্কর শুধু বর্ব্বর অভিলাষ চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত কবিদের মানস-কন্যাগণকে এইরূপে অপহরণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। অনেকগুলি পুস্তকের অবয়ব বার্দ্ধক্য বশতঃ এমন শিথিল হইয়া গিয়াছিল যে তাহারা সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে এমন শক্তি তাহাদের ছিল না। কিণাঙ্কিত হস্তের নিষ্ঠুর তাড়নায় অনেক পুস্তকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জর্জ্জরিত। তাহারা শুইয়া থাকিলেও সর্ব্বাঙ্গ খসিয়া পড়িতেছে। অনেকগুলি জগদ্বিখ্যাত কবি, নাট্যকার ইতিহাস-লেখকের এই প্রকার দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার মনটায় তখন একটু আঘাত লেগেছিল। আনমনে পিছন ফিরিয়া সামনের দেয়ালে গাঁথা আর একটি আলমারির দিকে আমার নজর পড়িল।

সেই আলমারিটি খুলে দেখি অনেকগুলি বাঙ্গালা গ্রন্থ তার মধ্যে এমন ভাবে সাজান রয়েছে যে মনে হয় বুঝি বইগুলি জ'মে গিয়ে একখানা দেড়গজ লম্বা কাগজের একটা কিছুর মত সেলফের উপর জাঁকিয়া বসিয়াছে। বাস্তবিক কিন্তু তা নয়। বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণ বহু বৎসর একান্নবর্ত্তী বল্মীক-সংসারে বসবাস করবার ফলে একতার বন্ধনে জমাট বেঁধে গিয়েছেন। জাতীয় কলঙ্কের রেখাগুলি তাঁহাদের ললাট হইতে মুছিয়া গিয়াছে দেখিয়া আমার মনটা একটু প্রফুল্ল হয়েছিল। এই সকল লেখক ও তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক কত প্রকাশক জীবদ্দশায় কত না আত্ম প্রশংসার ঢক্কা-নিনাদে নিজেদেরকে বঙ্গভাষার সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সমালোচনা-ক্ষেত্রে প্রত্যেক লেখকের মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব

প্রমাণের জন্ম কত না রক্তপাত হইয়াছিল। কালের অতি ক্ষুদ্র কীট এক্ষণে সকলকেই সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে। বল্মীক-রাজ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্র, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, সম্রাট দরিদ্র, পরিচিত অপরিচিতের পৃথক আসন নাই। পুস্তক-গুলির অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম, বহুকাল আমার মত কোনও অলস কৌতূহলপ্রিয় ব্যক্তি তাহাদিগকে স্থানভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করে নাই। একবার মনে হ'ল, বল্মীক-জগত হইতে বাঙ্গালী গ্রন্থকারগণকে টানিয়া বাহির করি। তাঁহাদের মধ্যে কেহ হয় ত আমাকে প্রাচীন ইতিহাসের একটা অজ্ঞাত সূত্রের খবর দিতে পারিবেন। কোন্ দিক দিয়ে গলিতদেহ বাঙ্গালী মনস্বীগণকে আক্রমণ করিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে কি একটা তাঁহাদের পেছনে সশব্দে চলিয়া যাইতেছে মনে হইল। সাপ ও বিচ্ছুর ভয়ে আমি একটু পিছু হাঁটিয়া হস্তস্থিত লাঠির বক্রভাগটি সেইখানে চালাইয়া দিলাম। কয়েকটা আরসুল্লা দ্রুতপদ সঞ্চারে বাহির হইয়া আসিল। আমার মনে হইল যেন তাহারা এক্‌গুনা কাগজের উপরে জমিয়াছিল। লাঠির মাথাটি আরও একটু প্রবেশ করাইয়া দিয়া সেই স্থানটিকে আলোড়িত করিতে কয়েকখানা কাগজ ওলট-পালট হইয়া গেল। তখন আমি সভয়ে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম দুইখানি খামে ভরা কি রয়েছে। খাম দু'খানা টানিয়া বাহির করিলাম। একখানি খামের মধ্যে একটি যুবতীর ফটো আর একখানির মধ্যে কাগজে লেখা একটি কবিতা। কবিতার হস্তাক্ষর আমার সম্পূর্ণ অচেনা। ফটোখানির দিকে এক দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে মনে হইল যেন চেনা মুখ। সেই যুবতী-টির সঙ্গে কোথায় যেন পরিচয় হইয়াছিল। বিস্মৃতির আবছায়ায় আমি মানস ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছি এমন সময় জানালার ফাঁক দিয়ে দেখিতে পাইলাম জগদীশ বাইকে বসিয়া বাংলার দিকে আসিতেছে। আমি তাড়াতাড়ি খাম দু'খানি অলষ্টারের পকেটে রাখিয়া হল-ঘরে প্রবেশ করিলাম।

(২)

কাহার ফটো? এই প্রশ্ন যেন আমাকে কেহ কাণের কাছে জিজ্ঞাসা করিতেছে। আমি আনমনে প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতেছিলাম। জগদীশ আমার ভাব গতিক দেখিয়া সন্ধ্যার পর যখন হারমনিয়মে গান ধরিল তখন আমার বাহিরের মানুষটি প্রবুদ্ধ হইল বটে কিন্তু সেই সঙ্গে আমার মনের অন্দর-মহলে ভিতরের মানুষটি সেই ফটোখানাকে সামনে রেখে তার জীবন্ত আদর্শের অনুসন্ধান করতে লাগল। যৌবনের উন্মেষ হইতে যেখানে যত পদ্মফুল দেখিয়াছি তাহার সঙ্গে ফটোর মুখখানি মানস-নেত্রের পথে মিলাইয়া দেখিলাম, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না, অথচ সর্ব্বক্ষণ মনে হইতেছিল, সেই মুখখানি খুব চেনা। রাত্রে আমার কামরায় শয়ন করিতে গেলাম বটে, কিন্তু দরজা জানালা বন্ধ করিয়া বাতির আলোয় ফটোখানি রাখিয়া তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া কতক্ষণ যে কাটাইয়া দিলাম তাহা মনে নাই। নিদ্রাতুর চক্ষু অনেকক্ষণ পরে মনকে বুঝি ইসারা করিয়া কিছু বলিয়াছিল, আমি তাই সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দেখিলাম, ফটোখানি আমার পার্শ্বে সমস্ত রাত্রি অনাবৃত অবস্থায় সেই শীতে রাগের উপর শুইয়াছিল। জানালার ফাঁক দিয়ে তখন উষার আলো ঘরে ঢুকে চারিদিকের জিনিষ-গুলিকে পালিশ করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ফটোখানি সেই সঙ্গে উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল। জগদীশ হলের ওপাশের ঘরে জেগে উঠে গান ধ'রেছে। আমি তাড়াতাড়ি ফটোখানি আমার ট্রাঙ্কে রেখে দিলাম। অলষ্টারের পকেটে হাত দু'খানি মোড়ক করিয়া কামরা হইতে বাহির হইব, ঠিক সেই সময়ে ডানদিকের পকেটে সেই কবিতা-টিকে স্পর্শ করিলাম। খাম হইতে লেখাটি বাহির করিয়া পড়িলাম—

অনন্তের অতি এক আঁধার নিভৃত কোণে,
নীরব নির্জ্জনে এসে ব'সে আছি সঙ্গোপনে।
মরমে লুকায়ে রেখে লুকান মরম-ব্যথা,
নিথর নিঝুম স্তব্ধ—বুকভরা কাতরতা।
আত্মহারা মহাশূন্যে—মরণের প্রতীক্ষায়,
জাগিয়ে চাহিয়ে শুধু অবসাদে দিন যায়।
সংসারের খেলা-ধুলা, ঝঞ্ঝাবাত কোলাহল,
কর্ম্মভার বহিবার ভাঙ্গা প্রাণে নাহি-বল।

সুখ সাধ আশা শান্তি কামনার নাহি লেশ,
পুড়ে ঝুরে গেছে সব আছে ভস্ম অবশেষ।
চাহি না খুঁজি না আর কাজ নাই কোন কিছু,
আকুলি ব্যাকুলী প্রাণ ছুটাছুটি পিছু পিছু।
ফুরায়ে গিয়েছে অশ্রু নাহি তার তপ্ত ধারা,
কেঁদে কেঁদে ভেবে ভেবে হয়েছি সকলি হারা।
অবিদ্যা অপরা মায়া—হাসি কান্না মিছে ছল,
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ মধুমাখা হলাহল।
দয়া মায়া স্নেহ প্রীতি ভালবাসা মমতায়,
কর্ম্মনাশা জলে দিছি বিসর্জ্জন বাসনায়।
জীবনের প্রিয় সঙ্গী—কিন্তু স্মৃতি বিষময়,
পরিপূর্ণ চিরদিন—নিরাশেও নাহি ক্ষয়।
অনন্ত আঁধারে তাই সততই ডুবে যাই,
অনন্ত আঁধার শুধু যখন যেদিকে চাই।
ডুবে আছি ডুবে যাব ডুবে থাকি অবিরাম,
ত্রিদিবে ডুবিয়ে যদি পূর্ণ হয় মনস্কাম।
সেথা ত ফুটে না ফুল—গায় না বনের পাখি,
মধুর বসন্ত নাই—জোছনার মাখা মাখি।
সুকোমল ফুলশয্যা, স্নিগ্ধ মলয় বায়,
উষার মাধুরি চুমি সৌরভ ছোটে না তায়।
ছিঁড়ে গেছে তারগুলি, বীণা ত বাজে না আর,
নির্ঝর শুকায়ে গেছে ধারা ত বহে না তার।
তাম্বুরা সারঙ্গ সঙ্গে পড়ে না মৃদঙ্গে চাঁটি,
তা ধাঁ না তাধিন্ শব্দে আবেশে কাঁপেনা মাটি।
তবে কেন, কেন তুমি আঁধারে জ্বালিতে আলো,
কি সাধে গো ভাঙ্গা প্রাণে এসেছ বাসাতে ভালো।
ছি ছি ফিরে যাও—আর হেথা এস নাক',
মিছে কেন পাবে ব্যথা, যেথা ছিলে সেথা থাক।
ভ্রূকুটি দংশিত ভালে, আধ অধর ঢেকে,
চেওনা অমন ক'রে—সুধামাখা হাসি মেখে।
দুর্গম পথেতে এসে, হয়ে মিছে দিশাহারা,
কেঁদে কেঁদে কেন শেষে প্রাণে প্রাণে হবে সারা।
তাই বলি কাজ নাই, যাও যাও ফিরে যাও,
এসনা কিশোরী আর, পায়ে পড়ি মাথা খাও।

কবিতাটি দুইবার পাঠ করিয়া আমার মনে হইল, লেখক কঠোর আদর্শের উদ্দেশে ইহা রচনা করিয়াছে। কবিতার লিখিত "কর্ম্মনাশা"র উল্লেখ হইতে স্থির করিলাম, দেওঘরের কোনও স্থানে কর্ম্মনাশা নদীর তীরে কবিতাটি রচিত হইয়াছিল। তা-ই বা কেন, এই বাংলায় বসিয়া কোনও দগ্ধ-হৃদয় প্রেমিক কিশোরী নামে কোনও রমণীকে এই কবিতা পাঠাইয়াছিলেন। কবিতার মুখাবিদাটি এখানে রহিয়া গিয়াছে। এই কিশোরী কে? জগদীশ আমার নাম ধরিয়া ডাক দিল। আমি চিন্তার খেইগুলিকে সেই অবস্থায় রাখিয়া কবিতাটিকে ট্রাঙ্কজাত করিলাম। কবি ও ছবির কথা সেদিন আমার মনে সমস্তক্ষণ নানা প্রকার কল্পিত গল্পের নক্সা প্রস্তুত করিয়াছিল। জগদীশকে আমি কোনও কথা বলি নাই। মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম, মুন্নার মাকে গোপনে প্রশ্ন করিয়া রহস্য উদ্ঘাটন করিব।

(৩)

সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে জগদীশ ও আমি বেড়াইতে বাহির হইলাম। সুন্দর বায়ু সুন্দরতর পারিপার্শ্বিক জগতকে কি একটা শান্তির বার্ত্তা শুনাইয়া চারিদিকে বহিতেছিল, বাসায় ফিরিবার সময় আমি সেই অজ্ঞাত কবি ও সেই ছবিখানির কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সূর্য্যদেব তখন পাটে বসিয়াছেন। হঠাৎ শীতের হাওয়া পশ্চিম গগনের কোণ হইতে রক্তবর্ণ একটা আলোর প্রবাহ টানিয়া লইয়া দেওঘরকে ডুবাইয়া দিল। গাছের মাথায়, বাংলাগুলির বাহিরের দেয়ালে রক্ত মাখা সূর্য্যালোক যেন জমিয়া গিয়াছে। কিছুদূর হইতে আমাদের বাংলা যেমন আমার নয়ন-পথে প্রকাশিত হইল অমনি আমার সর্ব্ব শরীর যেন কাঁপিয়া উঠিল। ছাদের উপরে কাহার মূর্ত্তি দেখা যাইতেছে। আলোক-চিত্রের জীবন্ত আদর্শ! জগদীশ দ্রুতপদে ভ্রমণ করিতে পারে। সে ইতিপূর্ব্বে বাড়ীর নিকটে পঁহুছিয়াছে। আমার মনে হইল যেন সেই মূর্ত্তি জগদীশকে দেখিয়া ছাদ হইতে নিচে নামিয়া গেল। আমি চলিতেছি। কতকগুলি গাছের আড়াল পড়াতে বাংলা ঘরটি খানিকটা সময়ের জন্য আমি দেখিতে পাইলাম না। আমার মনে নানান রকম চিন্তা সেই মুহূর্ত্তে জন্মলাভ করিয়া বিষম কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

জগদীশ কি সেই যুবতীর প্রণয়ী? সে কি সেইজন্য দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া বাটিতে ফিরিল? কবিতাটা লিখেছে কে? ছবির জীবন্ত আদর্শের নাম কি কিশোরী? সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে। আমি বাটিতে প্রবেশ না করিয়া কিছু দূরে একটা সাঁকোর উপর বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। না,—জগদীশ আমাকে দেওঘরে তাদের নিজের বাড়ীতে আনিয়া আমার পশ্চাতে প্রণয়ের অভিনয় করিবে না। যাহা হউক, ইহার ভিতর যে রহস্য আছে আবরণ খুলিয়া সেটাকে বাহির করিতে হইবে।

কতক্ষণ সাঁকোর উপর বসিয়াছিলাম জানি না। বাসায় ফিরিলে মুন্নার মা বলিল, "জগদীশ বাবু ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরে নেওতা খেতে গিয়েছেন। আপনার খানা পাঁড়ে পাকাচ্ছে।" এ কি হ'ল! প্লট যে ক্রমে জটিল হয়ে পড়ছে! জগদীশ যে ছাদের সেই যুবতীর সহিত কোথাও গিয়াছে ইহাই আমার মনে হইল। ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরে নিমন্ত্রণ বাজে কথা। সেখানে নিমন্ত্রণ হইলে আমাকে সে বলিত। আমি ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য মুন্নার মাকে জেরা আরম্ভ করিলাম। মুন্নার মা ইংরাজিতে লেখা একখানা চিঠি দিয়া বলিল, "ষ্টেশন মাষ্টার এই চিঠি আপনারা বেরিয়ে গেলে খালাসীর হাতে পাঠিয়েছিল।" চিঠি পড়িয়া জগদীশের সম্বন্ধে যে সন্দেহ প্রধুমিত হইয়া উঠিতেছিল তখনকার মত তাহা দূর হইল বটে, কিন্তু ছাদের সেই মূর্ত্তি কোথায় গেল? আমার কি চোখের ভ্রম হয়েছিল? এইবার অবসর পেয়েছি, মুন্নার মাকে সব কথা জিজ্ঞাসা করিব।

হল-ঘরের মাঝখানে মর্ম্মর পাথরের টেবিলের উপর বড় ডোমযুক্ত ল্যাম্প জ্বলিতেছে। আমি সোফায় শুইলাম। পাঁড়ে আমার খানা প্রস্তুত করিয়া আনিল। রাত্রি ন'টার সময় খাইব শুনিয়া পাঁড়ে ও মুন্নার মা আমার সোফার সামনে একটু তফাতে বারাণ্ডা হইতে খাটিয়াখানি আনিয়া তাহাতে বসিল। জগদীশ রাত্রে বাসায় ফিরিবে না। আমরা গল্প আরম্ভ করিলাম। দেওঘরের সব কথাই তারা জানত। পাঁড়ে একটা গল্প বা কোনও কিম্বদন্তী বলিতে আরম্ভ করে, মুন্নার মা তার উপর টিপ্পনী করিয়া নিজের অভিজ্ঞতার পরিচয় দেয়। আমি সোফায় শুইয়া চুপ করিয়া শুনিতেছি আর মাঝে মাঝে দু' একটা প্রশ্ন করিয়া তাদের গল্প-প্রিয়তাকে উৎসাহিত করিতেছি। খানিক পরে আমি জগদীশদের বাংলা ঘরের কথা তুলিলাম। মুন্নার মা পাঁড়েকে বলিল, "তুমি ত পাঁচ বছর এখানে আছ, আমি বিশ বছর কাটিয়ে দিয়েছি। বাবু আমার মুন্নার বিয়ে এই হল-ঘরে হয়েছিল। আমার স্বামী ঐ বাইরের ঘরে মারা গিয়েছে। আমি বুড়ো হয়েছি আমার মরণ নাই।"

আমি। মুন্নার মা, এখানে ত তুমি বেশ আছ কলকেতা থেকে কত লোক এখানে জল হাওয়া ভাল ব'লে আসে, আর তুমি মরতে চাইছ?

মুন্নার মা। বাবু মরণের কি দিন ক্ষেণ, ভাল ম... জায়গা আছে। এই এখানে আজ দশ বরষ আগে আহা! এক বাবু একটি কেমন বৌ নিয়ে এসেছিল বৌ, কি না, তা আমি জানি না। দু'জনে কত ভা... আবার মাঝে মাঝে ঝগড়াও হ'ত। বৌ একদিন জ্ব... পড়ল, তিন দিন পরে মারা গেল।

মুন্নার মা'র কথা শুনে আমার মাথার ভেতর ফটো... খানা জেগে উঠল। আমি আগ্রহের সহিত চক্ষুদ্বয় বিস্ফা...রিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কত বয়েস?" মুন্...মা বলিল, "বছর কুড়ি হবে। আমার মুন্নার বয়স ত... দশ বরষ।" ফটোখানা তবে কি সেই বৌয়ে... কবিতাটিও কি তারই উদ্দেশে রচিত? সন্ধ্যার সময় ছ... যে মূর্ত্তি দেখিলাম সেটা কি তারই? প্রেতাত্মারা সূ... দেহ ধারণ ক'রে কখনও কখনও পৃথিবীতে আসে, তা... ছায়া-শরীর লোকে দেখতে পায়। আমাকে অন্যম... দেখিয়া মুন্নার মা বলিল, "না বাবু, বাড়ীটা খুব ভ... এখানে ভয় ডর নাই। আমি তারপর এখানে দশ... কাটিয়ে দিয়েছি, একদিনও ছায়া দেখিনি।" পাঁ... আমাকে সাহস দিবার জন্য বলিল, "জগদীশ বাবু ... আমাকে বাংলায় শু'তে বলেছেন, আপনি ভয় কর... না।"

ভূতের ভয় তা হ'লে ত এখানে আছে দেখছি।

ত সেই মূর্ত্তি কবিতায় ৩৬ ... শোরীর হইতে পারে? না, তা নয়। দশ বৎসর পরে কি মরা মানুষ ভূত হ'য়ে ছাদের উপর সন্ধ্যার সময় ব'সে থাকে? আমার মাথাটা গুলিয়ে গিয়েছিল। পাঁড়ে বলিল, "বাবু, খানা গরম আছে, এখন খেয়ে নিয়ে ঘুমতে যান। আজ খুব শীত লাগছে।" আমি আহারান্তে নিজের শয়ন-ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। আধ ঘণ্টা পরে পাঁড়ে হল-ঘরে নাক ডাকাইয়া তার ঘুমকে মুখর করিয়া তুলিল। ফটোখানা কার? মূর্ত্তিটির রহস্যই বা কিরূপে উদ্ঘাটিত হইবে? জগদীশ কি কোনও সুন্দরীকে লইয়া অন্যত্র রাত্রিযাপন করছে? অনেকক্ষণ চিন্তা করিবার পর কবিতাটি আর একবার পড়িলাম। প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে এত গবেষণা ক'রেছি কিন্তু এ রকম একটা সামান্য বিষয়ের সমাধান করতে এত ভাবনা চিন্তা ত কোনও কালে হয় নি। গভীর রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িলাম। পরদিন প্রাতে যখন ঘুম ভাঙ্গিল জগদীশ তখন হল-ঘরে গান জুড়ে দিয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে তাকে ফটোখানা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেম, "এ কার ছবি?" জগদীশ ফটোটি টেবিলের উপর রাখিয়া চেয়ারে বসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল, "চিন্‌তে পারছি না ত।"

মুন্নার মা চায়ের সরঞ্জাম টেবিলের উপর সাজিয়ে দিচ্ছিল। সে ছবিখানার দিকে তাকিয়ে দেখে বল্লে, "বাবু, এ তসবির আমার। বিশ বরষ আগে আমি ও আমার স্বামী যখন এখানে আসি তার কিছুদিন পরে এক বাবু এই বাংলায় এসেছিলেন। সেই বাবু এই তসবির উঠিয়েছিলেন। আমি দেয়াল-আলমারিতে কিতাবের পেছনে একটা খামে রেখেছিলাম।" মুন্নার মা'র কথা শুনে আমার তিন দিনকার পরিশ্রমে সংগৃহীত তাসের বাড়ীখানার মাল মশলাগুলি অব্যবহার্য্য হইল ভাবিয়া হতাশ হইয়া পড়িলাম। মুন্নার মা বলিল, "বাবু, আমার মুন্নার চেহারা আর আমার চেহারা এক রকম। মুন্নার এখন যে বয়েস আমার তখন সেই বয়েস ছিল।" জগদীশ বলিল, "মুন্নাকে অনেক দিন দেখিনি। সে ভাল আছে ত?" মুন্নার মা বলিল, "সে এত কাছে থাকে, তবু তার শাশুড়ী তাকে রোজ একবার আমার কাছে আসতে দেয় না। মুন্না কাল বিকেলে এখানে এসেছিল। কুয়ার জলে স্নান ক'রে ছাদে উঠে চুল শুকিয়ে বাড়ী ফিরে গেছে।"

গান।

[শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল]

(খাম্বাজ—মিশ্র ঠুংরী)

ওহে সুন্দর! ওহে সুন্দর!
এসেছ তুমি আকাশে
এসেছ কুসুমে শ্যাম পল্লবে
স্থলে জলে তৃণে বাতাসে।
এসেছ আমার মরমে
কত সুখে দুখে করমে
কত স্নেহ-প্রীতি ধরমে
তব প্রীতি হৃদি বিকাশে।

গভীর নিশায় গোপনে
এলে প্রিয়জন হরণে
ব্যথা দিয়ে গেলে মরমে
সেও তব কৃপা প্রকাশে।
তব পায়ে সদা প্রণমি
তুমি সখা বড় মরমী
স্বরগের তুমি সরণী, কৃপা-
বঞ্চিত রেখো না এ দাসে

প্রয়াগে কুম্ভমেলা।

[শ্রীরত্নমালা দেবী]

আমরা ২২শে মাঘ শনিবার রাত্রি ৪ টার সময় কুম্ভস্নান করিবার ইচ্ছায় প্রয়াগ যাইবার জন্য শিকরোল বি-এন-ডব্লিউ রেলের ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। আমরা নয় জন স্ত্রীলোক ও একটী যুবক একত্র ষ্টেসনে পৌছিলাম। তখন ভোর ৫টা বাজিল। কিন্তু অন্ধকারের ঘোর তখন কাটে নাই। ষ্টেসনে আসিয়া দেখি বিপুল জনতা; দুই হাজার যাত্রী টিকিটের জন্য মারামারি করিতেছে। কেহ দুই দিন ধরিয়া টিকিটের জন্য পড়িয়া আছে। টিকিটের ঘণ্টা হইল। অসংখ্য যাত্রীদল টিকিট ঘরের দিকে ছুটিল। যাত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছে, টিকিটের জন্য দুই দিন ধরিয়া পড়িয়া আছি, তবু টিকিট পাইতেছি না। এই কথা শুনিয়াই আমাদের চক্ষুস্থির হইল, আমরা প্রয়াগ যাইবার আশা একেবারে ত্যাগ করিলাম। আমাদের সঙ্গে যে ছোকরাটি গিয়াছিল সে আমাদের নিকট হইতে টিকিটের টাকা লইয়া টিকিট করিতে গেল। কিন্তু বিষম ভিড় ঠেলিয়া টিকিট করা তাহার পক্ষে অসাধ্য হইলেও সে প্রাণপণে জনস্রোত ঠেলিয়া টিকিট করিতে গেল। কিন্তু টিকিট-বাবু টিকিট দিলেন না, অধিকন্তু "হিঁয়াসে ভাগো, সরকারিকে হুকুম নেই; টিকট্ নেই মিলেগী।" বলিয়া অধিকাংশ যাত্রীদের তাড়াইয়া দিল। সে ছোকরা দুই তিনবার টিকিট-বাবুর নিকট তাড়া খাইয়া মুখখানি চুণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'মা টিকিট ত দেবে না, সরকারের হুকুম নাই, টিকিট বন্ধ হইয়াছে।' আমি একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম, 'তুমি বাবা আর একটু কষ্ট করিয়া দেখ ও-আর-আর রেলে টিকিট প্রয়াগের দেবে কি না?' তখন সে ছেলেটি ও-আর-আর টিকিট ঘরে গিয়া দশখানি প্রয়াগের টিকিট চাহিল। টিকিট-বাবু বলিলেন, টিকিট দিব তবে কিছু কিছু প্রণামী চাই। তখন ছেলেটী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'মা টিকিট পাওয়া যাবে, তবে প্রত্যেকের আট আনা করিয়া বেশী লাগিবে।' অগত্যা তাই দিয়া সে টিকিট কিনিতে গেল। কাশী-বাসিনী ক একটা বাঙ্গালী স্ত্রীলোক একটী বালক সঙ্গে কাল সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি টিকিটের জন্য বসিয়াছিলেন, আমাদের টিকিট দিবে শুনিয়া তাঁহারাও এই ছোকরার সহ ও-আর-আর গাড়ীর টিকিট করিতে পাঠাইলেন। একত্রে ১৯ খানা টিকিট হইল। তবে টিকিটের মূল্য ছাড়া কিছু কিছু প্রণামীও দিতে হইল। তারপর ট্রেণ কখন ছাড়িবে জানিয়া আসিয়া আমাদের বলিল, দশটার সময় ও-আর-আরের গাড়ী প্রয়াগ যাইবে। এ ট্রেন আর কোথাও বদলী হইবে না। টিকিট পাইয়া আমাদের হৃদয়ে প্রয়াগ স্নানের আশা আবার জাগরিত হইল। আমরা মোট-ঘাট কুলীর মাথায় দিয়া ওভার ব্রিজ দিয়া ও-আর-আর রেলষ্টেসনে বেনারস ছাউনীতে আসিয়া বসিলাম। ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল; নয়টা বাজিল দেখিয়া সেইখানে সন্ধ্যা জপ করিয়া কিছু জলযোগ করা গেল। দশটার সময় ধীরে ধীরে মন্থর গতিতে ট্রেনখানি আসিয়া দাঁড়াইল, দেখিলাম এ লাইনে জনতা কম। ট্রেনে অনেক ঘর খালি রহিয়াছে; যত যাত্রীর ভিড় ছোট লাইনের দিকে। সকলেই ঊর্দ্ধশ্বাসে সেইদিকে ছুটিতেছে। বেলা নয়টার সময় ছোট লাইনের গাড়ীখানা গরু গাধার মত যাত্রী বোঝাই করিয়া মন্থরগামিনী রমণীর ন্যায় প্রয়াগ অভিমুখে চলিল। আমরা তখন ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম যে, আমাদের ছোট লাইনের টিকিট দেয় নাই, ইহা ভালই হইয়াছে। নতুবা আমাদের এইরূপ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইত। ক্রমে সাড়ে দশটা হইল। গাড়ির ঘণ্টা হইল। আমরা আনন্দে 'জয় বেণীমাধব' বলিয়া ট্রেনে গিয়া বসিলাম। ষ্টেশনে বেশী ভিড় ছিল না। দুই জন ভদ্রলোক তাঁহাদের পরিবার লইয়া কুম্ভ স্নানের ইচ্ছায় যাইতেছেন। ট্রেনে উঠিয়া দেখিলাম ও-আর-আরের গাড়িগুলি ভাল। বড় গাড়ী। গাড়ীও দ্রুত চলি-

য়াছে। অবশ্য এখানি এক্সপ্রেস। তখন আমরা মহা আনন্দে চলিলাম। ট্রেনও চঞ্চলা সৌদামিনীর মত ছুটিল। মধ্যে মধ্যে ষ্টেসনে প্রয়াগ যাত্রীদল উঠিতে লাগিল। কিন্তু ছোট লাইনের যাত্রীর ভিড়ের তুলনায় এ কিছুই নয়। আমরা পরম আনন্দে মন্দানিল সেবন করিতে করিতে আরামে গল্প করিতে করিতে চলিলাম। একটা ষ্টেসনে একজন প্রয়াগের পাণ্ডা-প্রভু পঁচিশ জন যাত্রীকে লইয়া বিনা টিকিটে উঠিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী ষ্টেসনে টিকিট চেক করিবার জন্য একজন টিকিট কালেক্টর আসিয়া তাঁহাদের নিকট টিকিটের ডবল চার্জ্জ করিলেন। পাণ্ডাপ্রভু তখন করযোড়ে মাপ চাহিলেন এবং রেহাই পাইলেন। ঐ ২৫ জন যাত্রীর ডবল ভাড়া দিতে হইল। গরীব যাত্রীদল কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু টিকিট কালেক্টারটি অতি দয়ালু ছিলেন। অনেকগুলি সাধু সন্ন্যাসী ও নিঃস্বকে বিনা টিকিটেও ছাড়িয়া দিলেন। আমরা নদ নদী প্রান্তর ভূধর দেখিতে দেখিতে বেলা সাড়ে তিনটার সময় প্রয়াগ ঘাটে আসিয়া পৌছিলাম। এখানে নামিয়া দেখি লোকারণ্য, বিপুল জনস্রোত চলিয়াছে। আমরা দারাগঞ্জের একটী ধর্ম্মশালায় গিয়া একটী কুঠারিতে মোট ঘাট রাখিতে বলিলাম, ও কলের জলে মুখ হাত ধুইয়া একটু শ্রান্তি দূর হইলে কাশিবাসিনী সাধুমার কুটীর খুঁজিবার জন্য বেণীতীরে গমন করিলাম। প্রয়াগে আত্মীয় স্বজন অনেকে আছেন, কিন্তু আমি কাহারও আশ্রয়ে না গিয়া ধর্ম্মশালায় থাকাই ভাল বোধ করিলাম। তখন বেলা অপরাহ্ণ হইয়াছে। কাহার সাধ্য এই জনতাস্রোত ঠেলিয়া যাইতে পারে। তখন অস্তাচলগামী দিনকর পশ্চিম গগন সুরঞ্জিত করিয়া ধীরে ধীরে অস্তাচলে গমন করিতেছেন। সন্ধ্যা আগত দেখিয়া ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যা বন্দনা করিয়া গরম পুরি ও দুধ কিনিয়া জলযোগ করিয়া শয়ন করা গেল।

পরদিন ভোরে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া কাপড় গামছা লইয়া আমরা সকলেই ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নানার্থে বাহির হইলাম। পথে আসিয়া দেখি, পথে বিপুল জনতা। স্নানার্থি যাত্রীদল স্রোতের ন্যায় চলিয়াছে। অসংখ্য জনমণ্ডলী উর্দ্ধশ্বাসে ত্রিবেণী ঘাট অভিমুখে ছুটিয়াছে। তাহার মধ্যে শিশু, বালক, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবা সকলেই একলক্ষ্য হইয়া কুম্ভস্নানের জন্য ধাবিত হইতেছেন। এই যাত্রীদলের মধ্যে বার আনা লোক হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, মারহাট্টি, গুজরাটি, সিন্ধি, নেপালি আছেন, বাঙ্গালীর সংখ্যা খুব কম। কতক রাস্তা গিয়া দেখি, আমার সঙ্গী একটী স্ত্রীলোক পথ হারাইয়া অন্যত্র গিয়াছে। তখন সেই বিরাট জনতা স্রোত হইতে ফিরিয়া তাহার যে অনুসন্ধান করিব, তাহার উপায় নাই। অগত্যা ঐ জনস্রোতের সহ ত্রিবেণী ঘাটে আসিলাম। যাত্রীগণের রক্ষার জন্য সদাশয় গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর যতদূর সম্ভব সুবন্দোবস্ত ও সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছেন। যাত্রীদের সাবধান লইবার জন্য পথের মধ্যে পুলিস সার্জ্জন ঘোড়ায় করিয়া পাহারা দিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে গোরা সার্জ্জনও আছেন। প্রয়াগ ঘাট ষ্টেসনের পথগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুপরিষ্কৃত রাখিয়াছেন এবং দারাগঞ্জ হইতে বা সিটি হইতে যে পথ দিয়া যাত্রীরা স্নান করিতে যাইবে, সেই পথটি খুব প্রশস্ত করিয়া ত্রিবেণীঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাস্তা বাঁধিয়া দিয়াছেন। অন্য সময় রাস্তার দুই ধারে দড়ির লাইন বাঁধা হইত, এবার খুব ভাল বন্দোবস্ত হইয়াছে। দারাগঞ্জের নীচে ত্রিবেণীঘাট যাইবার ঐ বিস্তৃত রাস্তা কাঠ দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ত্রিবেণী ঘাটের দশ বার হাত জল হইতে দৃঢ় কাঠ পুঁতিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে যাত্রীরা জলমগ্ন না হয়, তাহার সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। পথের পার্শ্বে প্রস্রাবের স্থান ও পায়খানা প্রস্তুত হইয়াছে ও মেথরেরা নিরন্তর পরিষ্কার রাখিতেছে। কিন্তু এত সুবন্দোবস্ত থাকাতেও এই ভীষণ জনপ্রবাহে কয়েকটি লোক মারা গিয়াছে ও কয়েকজন হাত পা ভাঙ্গিয়াছে। এই বিপুল জনতার মধ্য দিয়া যখন ত্রিবেণী ঘাটে স্নানার্থে উপস্থিত হইলাম, তখন এই ভীষণ জনস্রোত দেখিয়া মনে হইল, এখনও ভারতে হিন্দুর ধর্ম্ম-প্রাণতা যে কতদূর, তাহা এই স্নানার্থি যাত্রীদের দেখিয়াই স্পষ্ট বুঝা যায়। যেরূপ জনপ্রবাহ চলিয়াছে, তাহাতে স্নান করিয়া প্রাণটি লইয়া ফিরিতে পারিলেই বাঁচা যায়। এক্ষেত্রে কেহ কাহাকে দেখিবার অবসর নাই, সকলেই স্ব স্ব প্রাণরক্ষার্থে ব্যস্ত। আমাদের সঙ্গে যাহারা গিয়া-

ছিলেন, তাঁহাদের যে আমি স্নান করাইব, তাহাও অসম্ভব বোধ হইল। এই বিপুল জনস্রোতের মধ্যে পড়িয়া অনেকে আত্মীয়-স্বজন হারাইয়াছে। কে কাহাকে দেখিবে, সকলেই পুত্রকন্যা হারাইতেছে। কিন্তু পুলিস অনুসন্ধান দ্বারা খুঁজিয়া দিতেছে। এই স্নানার্থি যাত্রীদলের সর্ব্বতোভাবে পুলিস সাহায্য করিতেছেন এবং স্বদেশী ভলান্টিয়ার দল বিশেষ দক্ষতার সহিত এই সমস্ত যাত্রীগণকে সতর্কতার সহিত স্নান করাইতেছে ও কেহ পথ হারাইলে অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে আনিয়া দিতেছে। কেহ হাত পা ভাঙ্গিলে এ্যাম্বুলেন্স্‌ কারে তুলিয়া হাঁসপাতাল ক্যাম্পে লইয়া যাইতেছে। জলে নামিয়া হাত ধরিয়া যাত্রীদের স্নান করাইয়া তুলিয়া দিতেছে।

এই স্বদেশী ভলন্টিয়ারগণের দয়ায় যাত্রীদের অনেক সাহায্য হইয়াছে। ইহাঁদের কর্ম্মকুশলতা প্রশংসনীয়। আমরা ত্রিবেণীঘাটে স্নান করিতে নামিলে ভলন্টিয়াররা হাত ধরিয়া স্নান করাইয়া তীরে তুলিয়া দিল। ঘাটে যেরূপ জনতা ও পিচ্ছিল কর্দ্দমাক্ত ঘাটের সিঁড়ির যেরূপ অবস্থা তাহাতে ভলন্টিয়াররা যাত্রীদের সাহায্য না করিলে স্নান করা অসম্ভব হইত। যা হোক কোন প্রকারে স্নান করিয়া ঘাটে পাণ্ডাকে সাধ্যমত কিছু দান করিয়া অন্য পথ দিয়া ফিরিলাম। পাছে এক পথে যাতায়াত করিলে উভয়পক্ষের সংঘর্ষণে লোকসমূহ দলিত হইয়া ও নিষ্পেষিত মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এজন্য পুলিশ বিশেষ সতর্কভাবে যাত্রীদের এক পথ দিয়া স্নান করাইয়া অপর রাস্তা দিয়া প্রত্যাগমনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শুনিলাম এই কুম্ভ মেলায় ৬ লক্ষ লোক একত্র সমবেত হইয়াছে। আমরা স্নান করিয়া ফিরিবার সময় কাশীবাসিনী সাধুমার দর্শন পাইলাম। তিনি আমাদের তাঁহার তাম্বুতে যাইতে বলিলে আমরা পরিশ্রান্ত হইয়া কিছুক্ষণ তাঁহার তাম্বুতে গিয়া বসিলাম। তাহার পর ধর্ম্মশালায় পাকাদি করিয়া আহার করা গেল। যাত্রীদের জন্য রামকৃষ্ণ সেবকগণ ক্যাম্প করিয়াছেন। সেখানে বিপদক্লিষ্ট জনগণের রক্ষার জন্য ডাক্তার ঔষধ ও সেবকগণ সর্ব্বদা প্রস্তুত রহিয়াছেন। আমরা আহার আদির পর সাধুগণের দর্শনের জন্য আখড়ায় চলিলাম, তখন জনতাস্রোত পূর্ব্বের মতই চলিয়াছে। ত্রিবেণী তীরে সর্ব্বশুদ্ধ সাধু সন্ন্যাসীগণের ১৭টি আখড়া হইয়াছে। প্রত্যেক আখড়ায় বিভিন্ন শ্রেণীর সাধুগণ অবস্থান করিতেছেন। নির্ব্বাণী আখড়া, নিরঞ্জনী আখড়া, জুনা আখড়া, দর্শনামি আখড়া, পাঞ্জাবি আখড়া, বৈরাগী আখড়া, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেকগুলি আখড়া দেখিলাম। তাহার মধ্যে প্রশান্ত বদন সাধুরা বসিয়া শাস্ত্রালাপ করিতেছেন, ও রাস্তার দুই পার্শ্বে অসংখ্য সাধু সন্ন্যাসীর দল ধুনী জ্বালাইয়া বসিয়া আছেন। সমস্ত যাত্রী স্নানান্তে সাধুসন্দর্শন করিতেছেন। অনেক সাধুর রামকৃষ্ণ প্রভৃতি বিগ্রহ মূর্ত্তিও আছে। আমরা সাধুদের চরণে প্রণাম করিয়া ফিরিবার পথে আমাদের সেই হারান লোকটিকে পাইলাম। একজন ভলন্টিয়ার তাহাকে বসাইয়া রাখিয়াছিলেন।

পরদিন মঙ্গলবার প্রাতে ৭টা পর্য্যন্ত অমাবস্যার যোগ ছিল। ভোর হইতেই সাধুরা ঝণ্টা নিশান লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া ডঙ্কা বাজাইয়া ধ্বজা পতাকা হাতি ঘোড়া তুরি ভেরী প্রভৃতি বাদ্যদলসহ ত্রিবেণী স্নানে চলিতে লাগিলেন। এই সাধুগণের শোভাযাত্রা দেখিতে বড় সুন্দর। কেহ বা সুসজ্জিত হস্তীর উপর রূপার হাওদায় বসিয়া চলিয়াছেন, কেহ বা সজ্জিত শিবিকা মধ্যে চামর দ্বারা বীজিত হইয়া যাইতেছেন। কেহ বা চতুর্দ্দোলের বিগ্রহ মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া ধ্বজা নিশান বাদ্যরোলে দিক কাঁপাইয়া স্নানে যাইতেছেন। সমস্ত সাধুদল এইরূপ শোভাযাত্রা করিয়া স্নানে চলিলে তাঁহাদের সঙ্গে পুলিশদল ও ঘোড়সোয়ার সিপাহীরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের স্নান করাইতে গেল। এবং নগ্নকায় নাগা সাধু বোধ হয় সংখ্যায় অনেকে আসিয়াছেন। এই শোভাযাত্রার সময় নাগা সাধুগণ ও নির্ব্বাণীদল ও জুনাদলসহ নগ্নকায় হইয়া পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া হর হর গঙ্গা শব্দে দিগন্ত মুখরিত করিয়া গম্ভীর পাদবিক্ষেপে গমন করিতেছেন। তাঁহাদের ভস্মাচ্ছন্ন উন্নত নগ্নদেহ, প্রশান্ত মুখমণ্ডল, সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনে হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়। সেই সকল মুক্ত পুরুষের সন্দর্শনে জীবের পাপ তাপ মলিনতা দূর হয়। এই সমস্ত সাধু সন্ন্যাসীগণ পুণ্যক্ষেত্রে প্রয়াগে ত্রিবেণীতীরে একমাস কাল

বাস করিলেন। জগতের বড় বড় ধনী রাজা মহারাজা ও বড় শেঠেরা এই একমাস কাল সাধুদের ভোজন করাইয়া কৃতার্থ হইলেন। প্রত্যহ এক একটি আখড়ায় ভাণ্ডারা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, রাজা মহারাজা ও ধনী শেঠেরাই সাধুদের ভাণ্ডারা দিয়া থাকেন। প্রত্যহ ঐ সকল মহৎ ব্যক্তির অর্থানুকূল্যে সাধুদের প্রচুর পরিমাণে ভোজন দেওয়া হয়। লুচি পুরী পকান্ন মিষ্টান্ন মালপোয়া মেঠাই স্তূপাকারে প্রস্তুত করিয়া সাধুদের ভোজন দেওয়া হয়। আমরা বেলা ২টার সময় গিয়া দেখিলাম পাঞ্জাবি আখড়ায় প্রায় ৭।৮ শত সাধুদের ভোজন করান হইতেছে। উৎকৃষ্ট রাজভোগ্য আহার প্রস্তুত করিয়া সাধুদের ভোজন করাইতেছে। আবার কেহ প্রচুর কম্বল ও বস্ত্র সাধুদের বিতরণ করিতেছেন। সাধুরা আনন্দ করিয়া ভোজন করিতেছেন। সাধুদের স্নানে পবিত্রা সলিলা জাহ্নবী যমুনাও আজ যেন কৃতার্থা হইয়াছেন। সাধু স্নানের পরই সমস্ত জনমণ্ডলী ত্রিবেণী স্নান করিয়া ধন্য হইলেন।

প্রতি বার বৎসর পূর্ণ হইলে পূর্ণকুম্ভ হইয়া থাকে। কুম্ভ মেলার জন্য ভারতবর্ষে চারিটি স্থান নির্দ্দেশ আছে; যথা—হরিদ্বার,প্রয়াগ, উজ্জয়িনী ও নর্ম্মদা। এই চারি স্থানে প্রত্যেক ছয় বৎসর পূর্ণ হইলে অর্দ্ধকুম্ভ হইয়া থাকে; এবার অর্দ্ধকুম্ভই হইয়াছিল। এই কুম্ভ মেলায় চারি ধামের সাধু সন্ন্যাসীগণ একত্র সম্মিলিত হইয়া থাকেন। ইহার মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় আছেন;—যথা গিরি পুরী ভারতী নির্ব্বাণী নিরঞ্জনী শৈব শাক্ত বৈষ্ণব ও বৈরাগী প্রভৃতি আছেন।

এই উপলক্ষে পরস্পরের সাক্ষাৎকার হইয়া ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আলোচনা বক্তৃতা হইয়া থাকে। এবারও কুম্ভ মেলায় চারি ধামের ও চারি মঠের সাধু সন্ন্যাসীদল ত্রিবেণীতীর্থে একত্র মিলিত হইয়া ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আলোচনা ও বক্তৃতাদি দিয়াছিলেন। ঝুসি হইতে বেণীতীর গঙ্গার উভয় কূল সাধু সন্ন্যাসীদিগের গৈরিক বস্ত্রে সুরঞ্জিত হইয়া মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছিল। শত শত সাধু সন্ন্যাসীগণ উন্মুক্ত আকাশতলে ধুনী জ্বালিয়া শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা উপেক্ষা করিয়া আনন্দ বিকসিত বদনে বসিয়া আছেন। ভগবানের জন্য ইহাঁদের আত্মত্যাগের জ্বলন্ত আদর্শ দেখিলে হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয় ও নয়নে জল আসে।

পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট, মহামহোপাধ্যায়
যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের শিবত্ব-প্রাপ্তিতে

শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি-গীতি।

ভৈরবী—একতালা।

(১)

বিশ্বেশ্বর! ধ্বংসেশ্বর! কি কর্ম্ম করিলে!
প্রতিভা-প্রতিমাখানি, যেন ধরাতলে
মহামহোপাধ্যায় সে ছিল তব স্থলে
বার্দ্ধক্য বয়সে সেই যাদবে গ্রাসিলে!!!

(২)

বঙ্গের নিজস্ব জ্ঞানে ছাত্রে শিক্ষাদানে
অন্নদানে স্থানদানে—সর্ব্বথা পালনে,
আবরিয়া পক্ষপুটে শত বাধা ঠেলে
ব্রত ছিল জীবনের—তাঁরে হরে নিলে!!!

(৩)

হে সুধী যাদবেশ্বর! তর্করত্নাধার!
হে কবি-সম্রাট! নব-সন্ধান-তৎপর!
আজি নন্দোৎসব-দিনে শিবত্ব পাইলে.
কাশীবাস ত্যাগ করে কৈলাসে যাইলে!!!

(৪)

হে মহান্! করুণা রেখো সেথা রহি নিতি
প্রার্থনা করিছে যত কালিদাস-ব্রতী!
অকারণ হিতকামী যাহাদের ছিলে
কাঁদিছে তোমার তরে হেথা যে সকলে॥

কন্যা-বিয়োগে।

[কবিগুণাকর শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ]

মা আমার, মা আমার, কোথা গেলি বল্‌?
কিছুতে মানে না মানা চক্ষের জল।
হায় চারিদিকে চাই, তোরে না দেখিতে পাই,
খুঁজিয়া বেড়াই তোরে সারা ধরাতল—
মা আমার, মা আমার, কোথা গেলি বল্‌?

মা আমার, মা আমার, কোথা গেলি বল্‌?
তোর শোকে আজ্‌ আমি হয়েছি পাগল।
শূন্য বিছানা তোর— ডাকে পাখী, হয় ভোর,
আর না উঠিস্‌ তুই করি কোলাহল—
মা আমার, মা আমার, কোথা গেলি বল্‌?

মা আমার, মা আমার, কোথা গেলি বল্‌?
লুকায়ে আছিস্‌ কোথা—বল্‌ রে চপল্‌!
তুই কি মা ছিলি অরি? তাই ক'বছর ধরি'
জড়াইয়ে গলে মোর মায়ার শিকল
ভাল দাগা দিয়ে গেলি বল্‌ কোথা বল্‌!

মা আমার, মা আমার, কোথা গেলি বল্‌?
তুই মোর ছিলি আশা, ভরসার স্থল!
পুত্র-স্নেহে তোরে যে রে করেছি পালন ওরে
তাহারো অধিক ছিলি মায়ার পুতুল—
মা আমার, মা আমার, কোথা গেলি বল্‌?

মা আমার, মা আমার, কোথা গেলি বল্‌?
সদা প্রাণ ছটফট, আঁখি ছলছল।
লয়ে এই ভাঙ্গা বুক চেয়ে আর কার মুখ
খাটি দিনরাত—ধরি অসুরের বল?—
মা আমার, মা আমার, কোথা গেলি বল্‌?

মা আমার, মা আমার, কোথা গেলি বল্‌—
চখের আড়াল তুই হ'লে এক পল
কি মহা বিপদ গণি' ডাকিতাম—'তনি', 'তনি'—
অমনি "কি বাবা" বলি' দুলায়ে আঁচল
ছুটে এসে দাঁড়াতিস্‌—আজ কোথা বল্‌।

মা আমার, মা আমার, কোথা গেলি বল্‌—
আজ তোরে ডেকে ডেকে হই বিহ্বল!
তবু তোর সাড়া নাই, কি যে করি কোথা যাই?
কে মোরে বলিয়া দেয়? সব নিষ্ফল—
মা আমার, মা আমার, কোথা গেলি বল্‌?

মা আমার, মা আমার, কোথা গেলি বল্‌—
তোরে ভুলে যাব? একি সহজ সরল!
তোর কবিতার বই অই হোথা পড়ে' অই—
তোর শত স্মৃতি বুকে করে জ্বল্‌ জ্বল্‌—
মা আমার, মা আমার, কোথা গেলি বল্‌?

মা আমার, মা আমার, কোথা গেলি বল্‌—
বারেক মুদিলে আঁখি—তোবি ঢল ঢল
মূর্ত্তি জাগিয়া উঠে— নিদ্রা অমনি টুটে
আহারে নাহিক রুচি—দেহ টলমল—
মা আমার, মা আমার, কোথা গেলি বল্‌?

মা আমার, মা আমার, কোথা গেলি বল্‌—
কে আর মায়ের মত স্নেহে গল' গল্‌
তাকাবে এ দেহ পানে গলা ধরি, চুমা দানে
বলিবে—"তুমিই বাবা খাটিবে কেবল"—
মা আমার, মা আমার, কোথা গেলি বল্‌?

মা আমার, মা আমার, কোথা গেলি বল্‌—
আজ যেন মনে হয় খাই হলাহল!
হেথা হোথা ছুটে যাই— তোরে না দেখিতে পাই—
আর যাহা আছে মোর যাক্‌ রসাতল—
মা আমার, মা আমার, কোথা গেলি বল্‌!

সংগ্রহ ও সঙ্কলন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

(চিত্তরঞ্জনের কথা)

গত রবিবার ৪ঠা শ্রাবণ অপরাহ্নে কলিকাতা সাঁতার সভার উদ্যোগে হেদুয়া পুষ্করিণীর কূলে সভার সদস্য পরলোকগত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের চিত্র প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাসের প্রস্তাবে কলিকাতার মেয়র শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ সভাপতি হইয়া শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ বসুর প্রদত্ত চিত্রের আবরণ উন্মোচিত করেন।

সেই কবির চিত্র-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে চিত্তরঞ্জন যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের চিত্র-প্রতিষ্ঠার জন্য আপনারা আমার নেতৃত্ব চাহিয়াছেন। আমি আপনাদের নিমন্ত্রণ পাইয়া অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করিয়াছি। প্রতিভার বরপুত্র এই তরুণ কবির অকাল-মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্য এবং বাঙ্গালী জাতি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সে দিন কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম-স্মৃতি বাসরে আমি যে কথা বলিয়াছিলাম, আজও সেই কথা বলিতে চাই। কবি রবীন্দ্রনাথ অদ্যকার এই অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব করিলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুসঙ্গত হইত। যদিও রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভাকে তাঁহার অনুপম ছন্দে বন্দনাগীতি দ্বারা অভিবাদন করিয়াছেন, তথাপি সত্যেন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণমূলক লেখনীর নিকট আমরা আরও বেশী প্রত্যাশা করি। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভাকে সম্মান করিবার জন্য আপনারা আমাকে যে আজ এই সুযোগ দিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি।

কবির মৃত্যুর পর হইতেই এইরূপ একটি সুযোগ আমি খুঁজিতেছিলাম। কেন না, এই কবি-প্রতিভাকে সম্মান করিবার জন্য একটা দায়িত্ব আমি নিজেই অনুভব করিয়া থাকি। কারণ অনেকের বিশ্বাস, এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস এই যে, কেবল সত্যেন্দ্রনাথ কেন, এমন কি রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভাকেও সম্মান করিতে আমি কুণ্ঠিত হইব। আমার অন্য যতই অখ্যাতি থাকুক, আমি কোন দিনই কৃপণ ছিলাম না। কবিযশঃপ্রার্থী হইয়া যাঁহারা দেশে বরেণ্য ও জগদ্‌বরেণ্য হইয়াছেন, যাঁহারা বাঙ্গালী জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, আমার নিকট হইতে তাঁহারা নিশ্চয়ই তাঁহাদের প্রাপ্য সম্মান পাইবেন। কেন না, আমি বাঙ্গালী এবং আপনারা হয় ত শুনিয়া থাকিবেন যে, একদিন আমিও কবিতা লিখিতাম। সেই সমস্ত কবিতা গ্রন্থের দুই একখানি ছিন্ন পত্র—আপনারা ইচ্ছা করিয়া না পোড়াইয়া থাকিলে, সম্ভবতঃ আপনাদের মধ্যে কাহারও না কাহারও গ্রন্থাগারে অদ্যাপিও থাকিতে পারে।

ক্ষুদ্র একটি প্রবন্ধে সত্যেন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার সমালোচনা হয় না এবং আমি আশা করি যে, নিশ্চয়ই আমার নিকট আপনারা তাহা প্রত্যাশাও করেন না। বাঙ্গালার গীতি-কবিতার ধারাবাহিক সমালোচনা করিবার অবকাশ যদি আমার জীবনে আবার আমি পাই, তবে আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি যে, সত্যেন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা তাহাতে স্থান পাইবে—এবং উচ্চস্থান পাইবে। যে মহাপ্রাণ কবি তাঁহার অকাল মৃত্যু দ্বারা আমাদিগকে এমন ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া গেলেন, তাঁহাকে আমরা এত সহজে ভুলিতে পারি না। কাজি নজরুল ইসলামের অভ্যুদয়েও আমরা সত্যেন্দ্রনাথকে ভুলিতে পারি না। কেন না, স্বতন্ত্র গৌরবে বাঙ্গালা সাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে এবং থাকিবে। আমি সমস্ত দিক হইতে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য সমালোচনা এইক্ষণে করিয়া উঠিতে না পারিলেও তাঁহার কোন কোন কবিতার

কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার কবিত্বের দুই একটা বিশেষ দিক্ এবং তাঁহার মহাপ্রাণতার কথঞ্চিৎ পরিচয় আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিব। আপনারা শুনিয়া থাকিবেন যে, আমি বাঙ্গালী সভ্যতার কথঞ্চিৎ পক্ষপাতী বলিয়া এমন কি সাহিত্যেও আমার একটা দুর্নাম আছে। আমি আগেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, চিরকাল বলিব—যে বাঙ্গালার জল, বাঙ্গালার মাটির মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য নিহিত আছে। যেই সত্য যুগে যুগে আপনাকে নব নব রূপে, নব নব ভাবে প্রকাশিত করিতেছে। শত সহস্র পরিবর্ত্তন, আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই চিরন্তন সত্যই ফুটিয়া উঠিতেছে। সত্যেন্দ্রনাথের 'মধ্যেও আমি দেখিয়াছি যে, সেই সত্যই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সত্যেন্দ্রনাথ গাহিয়া গিয়াছেন ;—

"বিফল নহে এ বাঙ্গালী জনম, বিফল নহে এ প্রাণ"
আমাদের বাঙ্গালী জনম বিফল নয়।

আমার বাঙ্গালা মায়ের যে বন্দনা-গীতি এই বাঙ্গালার কবি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। সমুদ্র যেমন শত তরঙ্গ ভঙ্গীতে আমার এই বঙ্গ জননীর চরণ প্রান্তে অশ্রান্ত অনন্ত কলরবে নিরন্তর বন্দনা-গীতি গাহিতেছে, সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-সমুদ্র হইতেও এই বন্দনা গীতিধ্বনি আমার কর্ণে বাজিতেছে। আমি বলিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিতেছি না যে, এই বন্দনা-গীতি—কাণের ভিতর দিয়া আমার মরমে পশিতেছে। জীবনে আমার এমন প্রহর আছে, যখন এই বন্দনা-গীতি আমাকে প্রায় পাগল করিয়াছে। আপনারা কি তাহা শুনিবেন ?

"মুক্ত বেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই তীর্থে—বরদ বঙ্গে ;"

*　*　*

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাচি।
আমাদের সেনা যুদ্ধ ক'রেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে,
দশানন জয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে।
আমাদের ছেলে বিজয় সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্য্যের পরিচয়।
এক হাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে
চাঁদ প্রতাপের হুকুমে হঠিতে হয়েছে দিল্লীনাথে।
জ্ঞানের নিধান আদি বিদ্বান্ কপিল সাঙ্খ্যকার
এই বাঙ্গালার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরক-হার।
বাঙ্গালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙ্গালী দীপঙ্কর।
কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষ শাসন করি,
বাঙ্গালীর ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি।
বাঙ্গালার রবি জয়দেব কবি কান্তকোমল পদে
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন কোকনদে।

*　*　*

আর এক স্থানে এই কবি লিখিয়াছেন—

চরণ তলে সপ্ত কোটি সন্তান তোর মাগেরে—
বাঘেরে তোর জাগিয়ে দেগো,
রাগিয়ে দে তোর নাগেরে।

বন্ধুগণ,—সমস্ত বঙ্গদেশে মানুষ খুঁজিতে গিয়া আমি হয়রাণ হইয়াছি। আমার পক্ষে দুঃখের কথা এবং আপনাদের পক্ষে লজ্জার কথা যে, আমি নিরাশ হইয়াছি। "লাখে না মিলিল এক" ; বাঙ্গালা দেশে আমি মানুষ পাইতেছি না। আপনাদের মধ্যে কি "মানুষ" আছে ? বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা কেহই অনুকরণ করিতে পারে না—তথাপি তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, বাঙ্গালার মনুষ্যত্ব কোথায়,কাহার কাছে, কোন্ "সন্তানের" কাছে ? বঙ্গজননী তাহা গচ্ছিত রাখিয়াছে আমি তাহা চাই। আমার জন্য, আপনাদের জন্য এমন কি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বের জন্য ও বাঙ্গালীর মনুষ্যত্বের আজ বড়ই প্রয়োজন, যদি না পাই,—আমি এই মহাকবির সঙ্কেত অনুসরণ করিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিব। বাঙ্গলার জঙ্গলে বাঘ আছে, বাঙ্গলার জঙ্গলে সাপ আছে—আমার চক্ষেও অশ্রু আছে, এই পরিণত বয়সে আমার বক্ষে শোণিতেরও কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে, আমি সমস্তই দিব, দিতে আমার আর বিশেষ কিছু বাকী নাই। আমি সত্যেন্দ্রনাথের বাণী—কবির আদেশ অনুযায়ী বাঙ্গলার জঙ্গলের বাঘকে জাগাইয়া দিব, সাপকে রাগাইয়া দিব, কেন না কবি বলিয়াছেন—

"বাঁধে রে তোর জাগিয়ে দেগো,
রাগিয়ে দে তোর নাগেরে।"

দৈব দুর্ব্বিপাকে আমি বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালার,—তথা ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে আসিয়া পৌছিয়াছি। এ ক্ষেত্রে যাহা ঘটিতেছে আপনারা তাহার সমালোচনা—তীব্র এমন কি নিষ্ঠুর সমালোচনাও করিতেছেন। আমি আশা করি, অনুরোধ করি, ইহাতে আপনারা ক্ষান্ত হইবেন না। আমি জানি—"গুণইতে দোষ গুণলেশ না পাওবি, যব তুহু করবি বিচার" তথাপি ইহা আমায় করিতে হইতেছে; দুর্ভাগ্য আমার কি আপনাদের—জানি না।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা—দুরবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে তাঁহার পরিণত মনের ভাব তাঁহারই অনুপম ছন্দে বঙ্গসাহিত্যকে উপঢৌকন দিয়া গিয়াছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঐ সমস্ত কবিতায় কোন বিশেষ সম্মান, তাঁহার সত্যেন্দ্র প্রতিভার বন্দনা-গীতিতে করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বর্ষা ও শরতের আবির্ভাবে সত্যেন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা যেরূপে বিকাশিত হইয়াছে, তাহারই অভিবাদনের জন্য তিনি তাঁহার উদার হস্ত সম্প্রসারণ করিয়াছেন, কিন্তু যে বিরাট মনুষ্যত্ব—বজ্রের নির্ঘোষে "কোন নেতার প্রতি" বিদ্যুৎ ভরা কটাক্ষ বর্ষণ করিয়া গিয়াছে—দুঃখের বিষয় তাহা তাঁহার বন্দনা-গীতিতে স্থান পায় নাই।

"বিদেশীর দরজায় পেয়ে উঞ্ছ উচ্ছিষ্টের কণা—
থেমে গেল অকস্মাৎ তুণ্ড-পুটে সিংহের গর্জ্জন!
স্বদেশ একদা যারে দিয়েছিল ফুলের মুকুট,
এ কি হায় সেই তুমি? মর্য্যাদায় রাজার অধিক—
ছিল যেই? এ কি ভিক্ষাবৃত্তি আজ? এ কি ঝুটমুট
ঝুটা সম্মানের লাগি সম্মানীর লাঞ্ছনা, হা ধিক্!
জীয়ন্তে জালিয়াবাগে পুঁতে ফেলে ভারত মাতায়,
শ্রাদ্ধে দেবে স্বর্ণ ধেনু; অগ্রাহ্য সে অমানুষ দান;
ভাটেরা আসুক ছুটে, দলে দলে ক্ষতি নাই তায়,
তুমি যে ভিড়েছ সঙ্গে, এই দাগা, এই অপমান।
না লুকাতে রক্তচিহ্ন না শুকাতে নয়নের পানি,
প্রবীণ স্বদেশভক্ত! যেচে গিয়ে হ'লে অগ্রদানী!"

তার পর লোকমান্য তিলকের তিরোভাবের পর এই মহাকবি সমস্ত বাঙ্গালীজাতির প্রতিনিধিস্বরূপ যে শ্লোক রচনা করিয়া গিয়াছেন; তাহা শুধু কবিত্ব নয়! আমি নিজে কবিতা লিখিয়াও বলিতেছি যে, ইহা কবিতা অপেক্ষা বেশী। বাঙ্গলার অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারাঠা বর্গী বাঙ্গলাকে যে অপমান করিয়াছে, কাব্যে ও সাহিত্যে যাহা স্থান পাইয়াছে, সেই সমস্ত বর্গীকে—মারহাটা আজ বাঙ্গলার অনুকূল হইলেও কবি সত্যেন্দ্রনাথ ক্ষমা করেন নাই। বাঙ্গলার পক্ষ হইতে তিনি কেবল একজন বর্গীকেই শ্রদ্ধা দিয়াছেন, তাঁহার নাম তিলক—লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক।

"মারাঠা যার চরণ-পীড়ি কীর্ত্তি দিগ্বিদিকে
দৃষ্টিতে যার উঙ্ক কমল ফুটে,
বাংলা মুলুক সত্যি ভালো বাস্ত যে বর্গীকে,
নেই রে সে আর হৃদয় নিতে লুটে!"

ইহার পর শুধু প্রহ্লাদ-জননী রাক্ষস রাজরাণীর মুখে কবি সত্যেন্দ্রনাথ যে কথা বলিয়াছেন, তাহাই উল্লেখ করিয়া আপনাদের নিকট হইতে বিদায় লইব—

"আত্মা চাহে শিশুরূপে প্রাপ্য যাহা তার,
বিদ্রোহ নয়, বিপ্লবও নয়, ন্যায্য অধিকার।
উচিত ব'লে দণ্ড নেবার দিন এসেছে আজ,
উচিত কয়ে পরতে হবে চোর ডাকাতের সাজ,
চিত্ত বলের লড়াই সুরু পশু বলের সাথ,
বন্যাবেগের হানার মুখে কিশোর তনুর বাঁধ!
প্রলয় জলে বটের পাতা! চিত্ত চমৎকার!
তীর্থ হ'ল বন্দীশালা, শিকল অলঙ্কার!"

"দৈনিক বসুমতী" ৬ই শ্রাবণ, ১৩৩১।

কলিকাতা, ৩এ রাধাপ্রসাদ লেনে মণিকা প্রেসে শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক ৩০ বি পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেনে অর্চনা-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

২১শ ভাগ] অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ । [১০ম সংখ্যা

কালী গৌরী।

[শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ]

মহাদেব আদ্যাশক্তি কালীদেবীর প্রেমে নিরতিশয় আকৃষ্ট হইয়া বহুকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা পূর্ণ করিতে শঙ্কর সর্ব্বদাই ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেন। সুতরাং কালীও শঙ্করের প্রতি অতীব অনুরাগবতী হইয়াছিলেন। শঙ্কর কখনও কোকিলকাকলিপূর্ণ ভ্রমরগুঞ্জন মুখরিত মন্দানিল চালিত লতালাস্য মনোহর বিবিধ কুসুমসুরভি বন মধ্যে প্রিয়তমার সহিত প্রবেশপূর্ব্বক,তাঁহার কপোলে পুষ্পপরাগের দ্বারা নানাপ্রকার পত্র লতা অঙ্কিত করিতেন, কখনও শ্বেত রক্ত প্রভৃতি বিবিধবর্ণ কুসুমের বিচিত্র-মাল্য নির্ম্মাণ করিয়া প্রিয়তমার গলে অর্পণ করিতেন। কখন'ও হংসকারণ্ডবাদি কেলিকোলাহল পূর্ণ পদ্মগন্ধ মনোহর স্বচ্ছতোয় জলাশয়ে অবতরণ করিয়া, বিচিত্র জলকেলির দ্বারা প্রেয়সীর চিত্তরঞ্জন করিতেন। শঙ্করের আদরাতিশয় দর্শনে শঙ্করীর আর আনন্দের পরিসীমা ছিল না। ক্ষণকাল অদর্শন হইলেও উভয়েই অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিতেন। এইভাবে কত যুগ যুগান্তকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু দেবলীলা মানব-বুদ্ধির বিষয় নহে। সুতরাং তাহার কারণ নির্ণয় অসম্ভব। মানবের কোন ভাল মন্দ ঘটিলে অদৃষ্টের ফল কল্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বরচরিত্রে সে কল্পনার অবসর নাই। অতএব, কেন এমন ঘটিয়াছিল, তাহা নির্ণয়ের উপায় নাই। কেবল ঘটনা মাত্রই উল্লেখযোগ্য।

একদিবস নবনীরদবর্ণা জগদ্ধাত্রী বিবিধ বসন-ভূষণে সমলঙ্কৃতা হইয়া কৈলাস পর্ব্বতের শিখরভাগে শঙ্করের সহিত প্রফুল্ল চিত্তে ক্রীড়া করিতেছিলেন। এমন সময় অপ্সরোগণের সহিত উর্ব্বশী সেখানে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া হরপার্ব্বতী দর্শনে ভয়ে অভিভূত হইয়াছিল। অপ্সরোগণ রক্তগৌরবর্ণ এবং বিচিত্র বসন ভূষণে অলঙ্কৃত, নবযৌবনশালী, তাহারা মুনিদিগেরও মন হরণ করিতে সমর্থ।

তাহারা প্রণামপূর্ব্বক হর-দুর্গার সম্মুখে অবনত মস্তকে অবস্থিত হইলে, মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিলেন—হে দলিতাঞ্জন সদৃশবর্ণে! কালি! উর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্সরোগণ তোমার এখানে আসিয়াছে। অতএব স্ত্রীলোকের রীতি অনুসারে তুমি ইহাদের সহিত কথাবার্ত্তা বল। গৌরবর্ণ অপ্সরাদিগের সম্মুখে কালি ভিন্নাঞ্জনশ্যামে! ইত্যাকার বর্ণোদ্দেশ পূর্ব্বক অপ্রিয় সম্বোধনে পার্ব্বতী মনে নিতান্তই আঘাত পাইলেন। তিনি উর্ব্বশী প্রভৃতির সহিত আর কথা কহিলেন না। অপ্রিয় বাক্য-শ্রবণ-জনিত ক্রোধে পর্ব্বতের গুহা মধ্যে অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইলেন।

তখন শঙ্কর প্রিয়তমার আকস্মিক অদর্শনে নিরতিশয়

ব্যাকুল চিত্তে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতী শঙ্করের উদ্বেগ দর্শনে কাতরা হইয়া গুহা মধ্যে মহাদেবের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিলেন। তখন শঙ্কর বলিলেন,—"প্রিয়ে! তুমি কেন হঠাৎ অভিমান করিলে? পতির অপরাধ, কুলকামিনীদিগের ক্রোধের কারণ। আমি ত কোনও অপরাধ করি নাই। তথাপি ক্রোধে তোমার মুখ কেন অগ্নিবর্ণ হইয়াছে?" এই বলিয়া শঙ্কর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন। তখন কালী তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন,—"শঙ্কর! তুমি কি পূর্ব্বে কখনও আমাকে ভিন্নাঞ্জনের মত কৃষ্ণবর্ণা দেখ নাই? তবে গৌরবর্ণ অপ্সরাদিগের কাছে কেন আমাকে এইরূপ সম্বোধন করিলে? ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, রূপবতী-দিগের সমীপে আমার কাল বর্ণের উল্লেখ করিয়া উপহাস করাই তোমার অভিপ্রায়। তুমি জান, ব্রহ্মা পূর্ব্বকালে সমস্ত বেদের সারার্থ সঙ্কলন করিয়া এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে—হীন জাতি ব্যক্তিকে তাহার জাতির উল্লেখ করিয়া উপহাস করিবে না। এইরূপ নিকৃষ্ট বৃত্তিকে, রূপহীন ব্যক্তিকে, অনুদার ব্যক্তিকে, অঙ্গহীন এবং অতি-রিক্তাঙ্গ ব্যক্তিকে তত্তৎ দোষ উল্লেখ দ্বারা তিরস্কার করিবে না। তুমি আজ সেই নীতির অন্যথা করিয়াছ। অতএব, যে পর্য্যন্ত আমার এই শরীরের বর্ণ সোনার মত না হইবে, তাবৎকাল আমি আর তোমার সহিত মিলিত হইব না।" এই বলিয়া জগদম্বা "মহাকৌষীপ্রপাত" নামক হিমালয়ের সানুমধ্যে তপস্যার্থ প্রবেশ করিলেন। অতীব কঠোরতার সহিত তিনি শত বর্ষ পর্য্যন্ত শঙ্করের আরাধনা করিলেন। তাঁহার দীর্ঘকালীন তপস্যাতে সন্তুষ্ট হইয়া শঙ্কর সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। শঙ্করী ভক্তিপূর্ণচিত্তে হর্ষগদ্গদবাক্যে অনেক সময় পর্য্যন্ত মহাদেবের স্তব করিলেন। তখন শঙ্কর বলিলেন,—"তোমার তপস্যায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি,অতএব অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" অনন্তর পার্ব্বতী মায়ায় মোহিত হইয়া বলিলেন,—"হে শঙ্কর! আমার দেহ এখন হইতে স্বর্ণের মত গৌরবর্ণ হউক। আর তুমিও এখন হইতে অনন্যকান্ত হও, অর্থাৎ আমি ছাড়া অন্য রমণীতে তোমার মন যেন কখনও আকৃষ্ট হয় না।" অনন্তর শঙ্কর পার্ব্বতীকে আকাশগঙ্গার জলে স্নান করাইলেন। ডুব দিয়া উঠিয়া পার্ব্বতী দেখিলেন যে, তাঁহার দেহ বিদ্যুতের মত গৌরবর্ণ হইয়াছে।

শঙ্কর প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন—"প্রিয়ে! আমি অন্য রমণীকে কখন মনেও করিব না।" শঙ্করের এই বাক্য শ্রবণে পার্ব্বতী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তখন শঙ্কর পার্ব্বতী সমভি-ব্যাহারে কৈলাসে গমন করিলেন। নানাপ্রকার ক্রীড়া কৌতুকে তাঁহাদের অনেক সময় অতিবাহিত হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র।

[শ্রীকুমুদনাথ দাস]

স্বভাবের সুরম্য নিকেতন ভক্তকবি চণ্ডীদাসের নিবাস-ভূমি পবিত্র নান্নর পল্লী; "দুগ্ধ স্রোতোরূপী" কলস্বনা কপোতাক্ষের শ্যামল পুলিনে পিক-পাপিয়া-গীতি-মুখরিতা মহাকবি মধুসূদনের জন্মভূমি সাগরদাঁড়ি; পুণ্যপ্রবাহিনী অনন্ত বীচিমালিনী কলগীতি-মুখরা ভাগীরথীর শ্যামল সৈকতে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ বিটপীমণ্ডিত পল্লীভূমি কাঁঠালপাড়া; হুগলী জেলায় হেমচন্দ্রের জন্মপল্লী গুলিটা; চট্টলে নবীনচন্দ্রের পার্ব্বত্য পল্লী নয়াপাড়া ও রবীন্দ্র-নাথের কলিকাতা জোড়াসাঁকোস্থ ভবন ও বীরভূমে বিশ্ব-বিখ্যাত শান্তিনিকেতন—বঙ্গদেশে সাহিত্যিকগণের প্রধান প্রধান তীর্থস্থান। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমিতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বর্ত্তমান অধিবেশন অতিশয় সমীচীন হইয়াছে। যে মহাপুরুষ বঙ্গসাহিত্যে নূতন শক্তি ও নূতন প্রাণ দিয়া গিয়াছেন, যাঁহার পদরেণু বক্ষে ধরিয়া স্থানটী পূত, তাঁহার

পুণ্যময়ী স্মৃতি বঙ্গবাণীর উন্নতি কল্পে আমাদিগকে মহান্ কর্ম্মের পথে উদ্বুদ্ধ করুক।

১২৪৫ সালে ১৩ই আষাঢ় বঙ্কিমচন্দ্র কাঁঠালপাড়ায় পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ও কুড়ি বৎসর বয়সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হন। রাজকীয় কর্ম্মে তিনি বিপুল সৎসাহস ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন; এবং ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি যখন বিদ্যালয়ের ছাত্র, তখন গুপ্তকবির 'সংবাদপ্রভাকরে' কবিতা লিখিতেন। দীনবন্ধু মিত্র ও দ্বারকানাথ অধিকারীও সে সময়ে "সংবাদ প্রভাকরে" কবিতা লিখিতেন এবং সেকালের Grand Nepoleon in the realm of rhyme এই তিন জনের কবিতা আদর সহকারে ছাপিতেন। কিন্তু কবিতায় যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার সম্যক স্ফুরণ হইতেছে না তাহা তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। অতঃপর খুলনায় যখন তিনি ডেপুটী, তখন Indian field-এ Rajmohan's wife নাম দিয়া একখানি ইংরেজী উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু উহাতে তাঁহার খ্যাতি কিম্বা প্রীতিলাভ হয় নাই। বিদেশী ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া যে অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করা সুদূরপরাহত, তাহা তাঁহার সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম হইল। ইহার পর হইতে তিনি তাঁহার সমস্ত প্রতিভা ও সমস্ত শক্তি মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে নিয়োজিত করিলেন এবং তাহার ফলে শীঘ্রই বাংলার সাহিত্যরাজ্যে এক নবযুগের আবির্ভাব হইল, এবং তাঁহার (এবং সেই সঙ্গে বঙ্গবাণীর) নাম দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে যে বাংলা গদ্য লিখিত হইত, তাহার পনর আনা উৎকট সংস্কৃত যুক্ত—পদবিন্যাস—words of learned length and thundering sound—এবং এক আনা বিশুদ্ধ বাংলা শব্দে পরিপূর্ণ। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের "প্রবোধ চন্দ্রিকা"র এক জায়গায় আছে—"কোকিল কলালাপ-বাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছী করাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।"

এরূপ উৎকট পদবিন্যাস এবং উপমার আতিশয্য সে সময়কার গদ্য-গ্রন্থে প্রায়ই দৃষ্ট হয়।

সংস্কৃত গদ্য-সাহিত্যে যুক্তপদ ও উপমার প্রাচুর্য্য (অনেক সময় অতিমাত্রা) লক্ষিত হয়। বঙ্গভাষার প্রথম গদ্য লেখকগণ এইরূপ রচনাভঙ্গীকে সাহিত্যের আদর্শ ধরিয়া লইয়াছিলেন এবং সেই আদর্শ অনুকরণ করিতে গিয়া জটিল সমাসবদ্ধ পদের একটু আতিশয্য দেখাইয়াছেন। মহাত্মা রামমোহন রায়ের ভাষা অপেক্ষাকৃত সহজ ও সরল, কিন্তু সে ভাষায় লালিত্য বা মাধুর্য্য নাই—আছে শুধু ধর্ম্ম সম্বন্ধে যুক্তি ও তর্কের ক্ষুরধার। এরূপ ভাষা উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের আদর্শ হইতে পারে না। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই প্রথম তদীয় "শকুন্তলা", "সীতার বনবাস" প্রভৃতি গ্রন্থে অনেকটা সহজ সরল অথচ ললিত শ্রুতিমধুর বাক্যবিন্যাসের প্রয়োগ করিয়াছেন এবং অক্ষয়কুমার দত্তও এইরূপ ভাষায় উচ্চাঙ্গের দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ও অন্যবিধ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কিন্তু বহুল পরিমাণে সংস্কৃত শব্দের বিশেষতঃ দীর্ঘ দীর্ঘ সমাস-ঘটিত শব্দমালার সমাবেশ হওয়াতে তাঁহাদের ভাষা মধ্যে মধ্যে শ্রুতিকঠোর হইয়াছে। প্যারীচাঁদ মিত্র সংস্কৃত পদ-বহুল সাধুভাষায় বিরক্ত হইয়া কথিত ভাষায় "আলালের ঘরের দুলাল" ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সে ভাষা খুব সহজবোধ্য বটে, কিন্তু উহাতে লালিত্যের অভাব। বঙ্কিমচন্দ্র এই সাধু ও কথিত ভাষার সংমিশ্রণে এক অপূর্ব্ব কোমলকান্ত পদলহরী সৃষ্টি করেন।

"তাঁহার প্রবর্ত্তিত ভাষা গম্ভীর হইয়াও কোমল; সংস্কৃত শব্দাবলীতে গ্রথিত হইয়াও প্রাঞ্জল; নিত্যব্যবহার্য্য চিরপ্রচলিত কথার আশ্রয়স্থল হইয়াও গ্রাম্যতাহীন। রবারকে টানিলে ইচ্ছামত বাড়াইতে পারা যায়, ছাড়িয়া দিলেই উহা আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। রবারের স্থিতিস্থাপকতায় লোকের অনেক প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে। ভাষাও স্থিতিস্থাপক হইলে লেখকের বিভিন্ন প্রকার বর্ণনায় পক্ষে অনুকূল হইয়া থাকে। লেখক যখন ইচ্ছা করেন তখন ভাষাকে প্রসারিত করিয়া বর্ণনা-বৈচিত্র্য প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়েন এবং ইচ্ছামত ভাষাকে সঙ্কুচিত করিয়া, সামান্য সামান্য বিষয় বিবৃত করিতে পারেন। ভাষায় এইরূপ

স্থিতিস্থাপকতা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাবলে সম্বটিত হইয়াছে—নৈসর্গিক দৃশ্য প্রভৃতির বর্ণনায় তাঁহার ভাষা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, হাস্যরস প্রভৃতির বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁহার ভাষা সঙ্কুচিত হইয়া, সেই রসে মাধুর্য্য বৃদ্ধির সহায় হইয়াছে।" * তাঁহার ভাষা গদ্য ও পদ্যের, সাধু ও কথিত ভাষার অপূর্ব্ব সম্মিলন-স্থল। প্রসন্নসলিলা জাহ্নবীর জলপ্রবাহের ন্যায় ইহার গতি গীতি কমনীয়তা, পবিত্রতা ও জীবনদায়িনী শক্তি আছে।

জানি না, ফরাসী কবি Victor Hugo ছাড়া বিশ্ব-সাহিত্যে কোন গদ্য লেখক এরূপ সুন্দর অনবদ্য কবিত্বময় ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন কি না। বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" ও "কমলাকান্তের দপ্তরে" এই ভাষার চরম বিকাশ। কালীপ্রসন্ন ঘোষের শ্রেষ্ঠ সন্দর্ভাবলী, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের "উদ্ভ্রান্ত প্রেম" ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের "গল্পগুচ্ছ" ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ রচনার ভাষাও এইরূপ। জাতীয় ভাষার অপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন বঙ্কিমচন্দ্রের এক মহতী কীর্ত্তি।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা সর্ব্বব্যাপিনী। তিনি একাধারে কবি,উপন্যাসকার, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, সমাজতত্ত্ববিদ্ ও ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্ ছিলেন। তিনিই বঙ্গোপন্যাসের স্রষ্টা এবং বঙ্গভাষায় উচ্চাঙ্গের দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ তিনিই প্রথম রচনা করেন। বঙ্কিমের পূর্ব্বে বাঙ্গালী ইংরেজী ভাষার প্রাধান্য দেখিয়া এমনই আত্মহারা হইয়াছিল যে, মাতৃভাষাকে সেকালের শিক্ষিত সম্প্রদায় অনেকটা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। বঙ্কিমের "দুর্গেশনন্দিনী" প্রভৃতি উপন্যাস, ও প্রসিদ্ধ মাসিক পত্র "বঙ্গদর্শন" বাহির হইলে তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধি দেখিয়া চমকিত হন, ও অনেকে মাতৃভাষার সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন। বঙ্কিমের "বঙ্গদর্শন" এক সময়ে বঙ্গ সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টিকল্পে যে কিরূপ সাহায্য করিয়াছে তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বুঝান দুষ্কর। হায়! উপযুক্ত চেষ্টা, উদ্যম ও দেশ-প্রীতির অভাবে "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের ঋষি, বাঙ্গলার জাতীয় ভাবের স্রষ্টা সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয় পত্রিকাখানি বিলুপ্ত হইয়াছে।

বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী"। এই উপন্যাসখানির উপর Scottএর Ivanhoeর একটু ছায়া পড়িয়াছে, কিন্তু ইহার ভাব ভাষা চরিত্রাঙ্কণে—বিশেষতঃ মোগল পাঠান যুগে রাজদরবার ও সমাজের যে ছবি ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে এমন নূতনত্ব, এমন Romance, এমন কল্পনা ও সত্যের সমাবেশ আছে, যাহা গ্রন্থখানিকে চিরকাল সুখপাঠ্য করিবে। বঙ্কিমের দ্বিতীয় উপন্যাস "কপালকুণ্ডলা"। এই উপন্যাসখানি বাহির হওয়ামাত্র বঙ্কিমের যশোরাশি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল এবং ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা বাংলা গ্রন্থকার বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই যশোজ্যোতিঃ হীনপ্রভ হইয়া পড়িল। এই গ্রন্থখানির বিস্তৃত সমালোচনা আমি "Rabindranath : His Mind and Art and Other Essays" গ্রন্থে করিয়াছি। এখানে শুধু এই বলিতে চাই যে, সাহিত্যরাজ্যে ইহার মূল সুরটী (Key-note) সম্পূর্ণরূপে নূতন, এবং Literature of Power হিসাবে, Poetic fancy ও Spiritual mysticismএর সহিত Objective realismএর মধুর সমাবেশে গ্রন্থখানি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসাবলীর পাশে স্থান পাইবার যোগ্য। এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ার কিছুকাল পরে ইংরেজী ও জার্ম্মাণ ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। বঙ্কিম আরও কয়েকখানি উপন্যাস লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে "চন্দ্রশেখর", "বিষবৃক্ষ", "কৃষ্ণকান্তের উইল", "আনন্দমঠ" ও "রাজসিংহ" প্রধান। চন্দ্রশেখরের বিস্তৃত সমালোচনা "Rabindranath : His Mind and Art and Other Essays" গ্রন্থে করিয়াছি। ভাবের গাম্ভীর্য্যে, ভাষার লালিত্যে ও Creative and Reproductive Imaginationএর মধুর মিলনে উপন্যাসখানি বিশ্বসাহিত্যে এক অমূল্য রত্ন। পাঠকগণকে এই উপন্যাসখানি Tolstoiএর Anna Kareninaর সহিত তুলনা করিয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি। "বিষবৃক্ষ" ও "কৃষ্ণকান্তের উইল" অতি উচ্চাঙ্গের দুইখানি গার্হস্থ্য ও সামাজিক চিত্র। অন্য রমণীর রূপের মোহে মানবের কিরূপে অধঃপতন হয়, এবং সে অধঃপতনের ফলে যে তাহার সাধ্বী স্ত্রীর কি ভীষণ

* রজনীকান্ত গুপ্তের "প্রতিভা"।

মর্ম্মবেদনা হইয়া থাকে, এই উপন্যাস দুইখানিতে তাহা সুস্পষ্টভাবে দেখান হইয়াছে। কুন্দনন্দিনীর সহিত নগেন্দ্রনাথের বিবাহের পর পতিপ্রাণা সূর্য্যমুখীর যে কিরূপ দুঃসহ মনঃকষ্ট হইয়াছিল, এবং রোহিণীর সহিত গোবিন্দলালের প্রণয়ে যে পতিগতপ্রাণা বালিকা ভ্রমর কিরূপ পলে পলে তিল তিল করিয়া পুড়িয়া মরিল—সে কাহিনী পাঠ করিলে খুব অল্প পাঠকই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন। আর্টের দিক দিয়াও এই উপন্যাস দুইখানি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। আনন্দমঠের মূল সুর (Key-note)—

"বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং, মাতরম্।"

দেশমাতৃকার উন্নতিকল্পে যে নিঃস্বার্থ ত্যাগের জ্বলন্ত ছবি, কবি এই উপন্যাসে আঁকিয়াছেন, তাহা আজ ভারতে আদর্শস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশে এখন এমন এক শ্রেণীর লোক দেখা যায়, যাঁহারা দেশহিতের জন্য ঐহিক সমস্ত সুখ, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেছেন ও সর্ব্বদা দিতে প্রস্তুত। "আনন্দমঠ" ভারতবাসীর জাতীয় গীতা স্বরূপ। নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রেমের আদর্শ লইয়া অঙ্কিত এরূপ জ্বলন্ত ছবি খুব কমই দেখা যায়। রাজসিংহ বঙ্গভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস। ঔরঙ্গজীবের সময় মোগল-রাজপুতের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন গ্রন্থখানিতে সুপরিস্ফুটভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা-পদ্ধতির এক প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তিনি অল্পের মধ্যে সমস্ত কথা বেশ সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন—পড়িতে কোন ক্লান্তিবোধ হয় না। য়ুরোপের অনেক প্রসিদ্ধ উপন্যাসে ও অন্যান্য গ্রন্থে ফেনাইয়া ফেনাইয়া লেখা ও অনেক অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিবার একটা ঝোঁক দেখা যায়। এমন কি কবিবর Victor Hugoর অমর কাব্য Les Miserablesএ এ দোষটা দৃষ্ট হয়। গ্রন্থখানির মধ্যভাগে Battles of Waterlooর এক দুই তিনশত পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। বর্ণনাটী হৃদয়গ্রাহী বটে, কিন্তু উপন্যাসের প্রধান Plotএর সহিত উহার কোন নিকট সম্বন্ধ নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসই প্রায় দুই শত আড়াইশত পৃষ্ঠা মধ্যে লেখা, কিন্তু তাই বলিয়া চরিত্রাঙ্কণ বা অন্য কোন হিসাবে যে তাহাদের কোনরূপ ক্রটী হইয়াছে তাহা নহে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় উপন্যাসই বিদেশী ভাষায় অনূদিত ও নাটকাকারে পরিণত হইয়াছে। অভিনয়কালে ঐ নাটকগুলি বাস্তবিকই অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়। ইহা হইতে বেশ অনুমিত হয় যে, উপন্যাসগুলিতে সত্য সৌন্দর্য্য ও প্রাণ আছে।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র অন্যতম। তাঁহার "কপালকুণ্ডলা", "চন্দ্রশেখর", "বিষবৃক্ষ", "কৃষ্ণকান্তের উইল", "আনন্দমঠ" ও "রাজসিংহ" পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির পাশে স্থান পাইবার যোগ্য। Scottএর ন্যায় ঐতিহাসিক চিত্রাঙ্কণ, George Eliotএর ন্যায় নায়ক নায়িকার মনস্তত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ, Victor Hugoর ভাষা মাধুর্য্য ও মহান্ আদর্শ সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা, Tolstoi, Dickens ও Balzacএর বাস্তবতা ও ধর্ম্মভাব এবং প্রাচ্যের অতীন্দ্রিয়তা (Oriental mysticism) বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসসমূহে দৃষ্ট হয়। তাঁহার ভ্রমর-রোহিণী-গোবিন্দলাল, সূর্য্যমুখী-কুন্দ-নগেন্দ্র, প্রতাপ-শৈবলিনী-চন্দ্রশেখর, মৃণালিনী-আয়েসা-কপালকুণ্ডলা, জগৎসিংহ-রাজসিংহ, সত্যানন্দ-ভবানন্দ-মহেন্দ্র-কল্যাণী সাহিত্য জগতে অমর সৃষ্টি। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু বাংলার নন—সমস্ত বিশ্বের।

উপন্যাস ব্যতীত অন্য নানা দিক দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভূত সমৃদ্ধিসাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার "কমলাকান্তের দপ্তর" Literature of Confessionsএ এক অপূর্ব্ব জিনিস। Dickensএর "Confessions of An Opium Eater"এর সহিত "কমলাকান্তের দপ্তর" তুলনা করিয়া পড়ুন, দেখিবেন কবিত্ব, মধুর হাস্যরস ও গভীর চিন্তাশীলতায় বঙ্কিমের গ্রন্থখানি De Quincyর গ্রন্থ হইতে কত অধিকতর উপাদেয়। কৃষ্ণচরিত, ধর্ম্মদর্শন পুরাণ ও সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রভূত স্বাধীন গভীর গবেষণার

ফল। "লোক রহস্যে" বঙ্কিমচন্দ্রই বঙ্গসাহিত্যের প্রথম পবিত্র হাস্যরসের অবতারণা করেন এবং গীতার প্রথম কয়েকটী অধ্যায়ের যে বিস্তৃত ভাষ্য লিখিয়াছেন, সেরূপ উচ্চাঙ্গের সুখবোধ্য ভাষা খুব কমই দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র যদি আরও দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া গীতার সমস্ত অধ্যায়ের গূঢ় রহস্য এইরূপ বিস্তৃতভাবে বাহির করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার গীতা রহস্যও তাঁহার এক কীর্ত্তিস্তম্ভ হইত।

বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম বাঙ্গলার ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করেন এবং বিজ্ঞান, সমাজ ও ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার অনেকগুলি সুলিখিত সন্দর্ভ আছে। ভবভূতির "উত্তর রামচরিত", প্যারীচাঁদের "আলালের ঘরের দুলাল" দীনবন্ধু মিত্রের ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্বন্ধে বঙ্কিমের প্রবন্ধাবলী বাংলার সমালোচনার সাহিত্যে সমাদরের জিনিস।

বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমের স্থান কোথায়, এ সম্বন্ধে অনেক সময় অনেক কথা হইয়া থাকে। কাহারও মতে মাইকেল, কাহারও মতে বঙ্কিমচন্দ্র ও কাহারও মতে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক। কিন্তু এ বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কোনও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা হয় নাই। মাইকেল বাংলা ভাষায় প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তন করেন, প্রথম মহাকাব্য সনেট ও বীরাঙ্গনালিপি (Heroic Epistoles) লেখেন এবং আধুনিক বঙ্গনাট্যের তিনিই ভিত্তিস্থাপয়িতা। তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্য ভাষার সৌন্দর্য্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যগুলির পাশে স্থান পাইবার যোগ্য *। তাঁহার সনেটগুলি সেক্সপীয়ার, মিল্টন্ ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (Wordsworth)-এর সনেটগুলি হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। তাঁহার "ব্রজাঙ্গনা" এক সুললিত গীতিকাব্য। মধুসূদন বঙ্গসাহিত্যে এরূপ অপূর্ব্ব শক্তি ও সৌন্দর্য্য প্রদর্শন না করিয়া গেলে বঙ্গভাষার এত অল্পদিনের মধ্যে এরূপ অভিনব বিকাশ কোন ক্রমেই হইত না। বঙ্কিম যে শুধু বঙ্গোপন্যাসের স্রষ্টা তাহা নহে; তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে অন্যতম, এবং তিনিই প্রথমে বঙ্গভাষায় উচ্চাঙ্গের দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও অন্যবিধ প্রবন্ধ লেখেন। লিখিত ভাষার অনুপম শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনও বঙ্কিমের এক অক্ষয় কীর্ত্তি। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় গীতিকাব্য ও ছোট গল্পলেখক বোধ হয় বিশ্বসাহিত্যে নাই। এ সম্বন্ধে আমি বিস্তৃত সমালোচনা আমার "Robindranath: His Mind and Art" প্রবন্ধে করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে নিখিল বিশ্বে বঙ্গবাণীর বিশেষ সমাদর হইয়াছে। সাহিত্যের এক এক দিক দিয়া মাইকেল, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন, তথাপি সাহিত্য সৃষ্টিকল্পে কে কিরূপ সাহায্য করিয়াছেন, সেভাবে প্রশ্নটী বিচার করিতে গেলে বোধ হয় ইহাই বলিতে হইবে যে, বঙ্কিমের অনেক পূর্ব্বে মাইকেল অসামান্য শক্তি প্রদান করিয়া বঙ্গভাষাকে পরিপুষ্ট করিয়া গিয়াছেন বলিয়া বঙ্কিম হইতে মাইকেলের, এবং সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ হইতে বঙ্কিমের স্থান উচ্চে। ইহাই আমার নিজের ব্যক্তিগত মত। এ সম্বন্ধে তুলনামূলক যতই সমালোচনা হয় ততই ভাল।

সাহিত্যরাজ্যে Creative age—সৃষ্টির যুগের পর Critical age—সমালোচনার যুগ আসিয়া থাকে। Mathew Arnoldএর মতে সমালোচনাও এক প্রকার Creative art. ইংরাজী সাহিত্যে Shakespeare, Milton-এর সৃষ্টির যুগের পর Dryden, Pope, Dr. Johnson ও Addisonএর সময়ে যে যুগ আসিয়াছিল, তাহা প্রধানতঃ সমালোচনার যুগ এবং Tennysonএর পর যে যুগ আসিয়াছে, তাহাও প্রকৃতপক্ষে সমালোচনার যুগ। মাইকেল হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত যে যুগ গেল বা যাইতেছে, সে যুগ সৃষ্টির যুগ এবং এখন যে যুগ আসিতেছে তাহা সমালোচনার যুগ। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অনুরূপা ও নিরুপমা দেবীর কয়েকখানি উপন্যাস ছাড়া এখনকার সাহিত্য-গ্রন্থে সেরূপ লিপিচাতুর্য্য দেখা যায় না। আধুনিক অধিকাংশ কবিতা, নাটক, নভেল ও ছোট গল্প অপাঠ্য বা কুপাঠ্য। এই বাঙ্গলা সমালোচনা সাহিত্য পরিপুষ্টির

* দুঃখের বিষয় উপযুক্ত সমালোচনার অভাবে এই মহাকাব্যখানি সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্তমত এখনও দূরীভূত হয় নাই এবং Homer, Dante ও Miltonএর মহাকাব্যগুলির সহিত তুলনামূলক সমালোচনা না হওয়াতে ইহার অনেক সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে নাই।

সময়। বঙ্গসাহিত্যে উচ্চাঙ্গ সমালোচনার বড়ই অভাব। বঙ্কিমচন্দ্রের মত প্রতিভাবান্ লেখকের একখানি সুন্দর সমালোচনা গ্রন্থ নাই। ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। এ অভাবটী অচিরে যাহাতে দূরীভূত হয়, প্রত্যেক বঙ্গবাসীর —বিশেষতঃ সাহিত্য পরিষদের দেখা দরকার। এ যুগে সমালোচনা তুলনামূলক (Comparative) না হইলে শিক্ষিত পাঠকমণ্ডলীর প্রীতিপ্রদ হইবে না। বঙ্কিমের ভবিষ্যৎ সমালোচকের এদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এবং বঙ্কিমের গ্রন্থসমূহের যাহাতে Critical ও Annotated edition বাহির হয়, তাহারও একটা বন্দোবস্ত হওয়া দরকার। ইংরেজী সাহিত্যে প্রায় প্রসিদ্ধ গ্রন্থের এরূপ edition বাহির হইয়াছে। ইহাতে সাধারণ পাঠক-মণ্ডলীর গ্রন্থখানির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে বিশেষ সুবিধা হয়। আশা করি, বঙ্গীয় সুধীসমাজের দৃষ্টি এদিকেও আকৃষ্ট হইবে। *

* বঙ্কিম সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

বহুরূপী।

[শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

৩

বারটার একটু পূর্ব্বেই হরেন্দ্রের আপিসে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দরজায় বেশ বড় একখানি পাথরের উপর "গাঙ্গুলী এণ্ড কোং" লেখা। তিতলের উপর আপিস। একটী ঘর, মাঝে কাটের ফ্রেমে চটের পর্দ্দা দিয়া বিভাগ করা। একটী ঘরে হরেন্দ্র বসে, অপর একটী ঘর কর্ম্মচারী বসিবার ঘর বলিয়া বোধ হইল। অন্যটী বোধ হয় ম্যানেজারের ঘর হইবে। আমি নিজে নিজেই এইরূপ বিচার করিয়া লইলাম, কারণ তখনো আপিসে জন মানবের সম্বন্ধ ছিল না। একটা বেহারা আপিস খুলিয়া বসিয়া ঢুলিতেছিল। আমাকে দেখিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবু কখন আসবেন?" সে উত্তর করিল "এক বাজেকে ভিতর আউঙ্গে।" আমি বলিলাম, "আউর সব বাবুলোক কব্ আসেগা?"

ইহাতে বেহারা যেন কিছু বিস্ময়ান্বিত হইল। খানিকক্ষণ অবাক হইয়া আমার মুখের প্রতি খুব ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। তাহার দৃষ্টির অর্থ বুঝিলাম, আমাকে আর কখনও এখানে দেখিয়াছে কি না তাহাই ভাবিতেছিল। পুরাতন লোক হইলে এরূপ প্রশ্ন করিতে পারে না, ইহা তাহার মনোগত ভাব। সে বলিল, "বাবুলোক ত আজকাল কৈ নেহি হ্যায়।"

বুঝিলাম বেহারাটী নিতান্ত বোকা নয়। বাবু যে কেহ নাই, সেকথা তার যতদূর বুদ্ধিতে কুলায় ততদূর আমার নিকট হইতে সামলাইয়া লইতে প্রয়াস পাইল। আমি আর বেশী কিছু প্রশ্ন না করিয়া, পাখাটী খুলিয়া দিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িলাম। আপিসের সরঞ্জাম তত কিছু ছিল না। মনে মনে ভাবিলাম, দালালী আপিসে অধিক আসবাবের প্রয়োজন কি? এমন সময় হরেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিল, "কতক্ষণ এসেচ ভাই?"

আমি বলিলাম, "আধঘণ্টাটাক হবে।"

হরেন্দ্রের সহিত আর দুই জন ব্যক্তি আসিয়াছিলেন,—তাঁহাদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি অনুসন্ধানোৎসুক দৃষ্টিতে হরেন্দ্রের মুখের প্রতি চাহিতেছিলেন। হরেন্দ্র তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "গুণেন বুঝি শশাঙ্ককে কখন দেখ নাই? ইনি আমার অনেক দিনের বন্ধু। কাল রাত্রে তোমাকে শশাঙ্কেরই কথা বলছিলাম।" তারপর আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল, "গুণেন হচ্চে আমার ছোট ভাই। এঁর হিসাব পত্রে অদ্ভুত জ্ঞান। আরও একটা অসাধারণ ক্ষমতা—রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ সব মুখস্থ; তুমি যেখান থেকে গুণেনকে প্রশ্ন কর না, সঙ্গে সঙ্গে সে উত্তর দেবে। আশ্চর্য্য স্মরণ শক্তি!"

গুণেন দেখিলাম, অনেক কষ্ট করিয়া হাসিয়া দুইটা হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিলেন। বলিলেন,—"কাল অনেক রাত পর্য্যন্ত দাদা আপনার গল্প করছিলেন। আপনাকে আমি কই কখন দেখি নাই। আপনি কি আমাদের ভবানীপুরের বাড়ীতে কখনও যান নাই?"

আমি প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলাম, "না। যাবার তেমন সুযোগ ঘটে নাই।"

তিনি বলিলেন, "দাদার অনেক বন্ধু গিয়াছেন কি না, সেইজন্য জিজ্ঞাসা করছি, একবার দেখলে আর ভুলতাম না।"

হরেন্দ্র বলিল, "এ কথা ঠিক, গুণেন একবার দেখলে স্মরণ ক'রে রাখত।"

আমি দেখিলাম, হরেন্দ্র সত্য সত্যই অনেক দিন পরে আমার সহিত সাক্ষাত হওয়ায় বিশেষ আনন্দিত হইয়াছে। লোকটীর যে প্রাণ আছে তাহা ভাবিয়া খুব একটা বন্ধু-প্রীতি অনুভব করিলাম। হরেন্দ্র বাড়ী গিয়া তাহার ভাইয়ের সহিত আমার বিষয় আলোচনা করিয়াছে। ইহার ভিতর হইতে হরেন্দ্রের আন্তরিকতারই প্রমাণ হইতেছে। হরেন্দ্র বলিল, "এ সময়টা পাটের কাজ কিছু নরম, সেজন্য লোকজনদের সব ছুটি দিয়েছি। আমরা দুই ভাই আর নবকৃষ্ণ, এটী আমার শালা, তিন জনেই আপিস করছি।" বলিয়া নবকৃষ্ণকে বলিল, "তুমি সেই কালকেকার চিঠিখানি টাইপ করে ফেল।"

আমি বলিলাম, "যখন কাজ কর্ম্ম কম, তখন অনর্থক লোক রাখিয়া মাহিনা গুনিবার প্রয়োজন কি?"

গুণেন অত্যন্ত উৎসাহ ভরে বলিলেন, "বলুন ত মহাশয়! অনর্থক লোকগুলিকে বসাইয়া বসাইয়া মাহিনা দিবার কি এমন দরকার পড়ে গিয়েছে? সেই টাকাটা গরীব দুঃখীদের সাহায্য করলে বরং দেশের উপকার করা হয়।"

গুণেন বাবুর কথায় বুঝিলাম, লোকটী ধার্ম্মিক। গরীব দুঃখীর দুঃখ ইঁহার প্রাণে আঘাত করে।

হরেন্দ্র বলিল, "গুণেনের জন্যই আমার আসতে বিলম্ব হয়ে গেল। ওর সন্ধ্যা আহ্নিক সারতেই প্রায় তিন ঘণ্টা লাগে।"

গুণেন দাদার মুখে নিজের কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিনয়ের ভাব দেখাইয়া বলিলেন, "একটু সময় লাগে সত্য শশাঙ্ক বাবু, কিন্তু পুরা তিন ঘণ্টা নয়। আর তাঁর জন্য একটু বেগার না দিলে মনটা কেমন কস কস করে।"

আমি কহিলাম, "হরেন্দ্র, তোমার কি প্রতিদিন আপিসে আসতে এমনই দেরী হয় নাকি?"

হরেন্দ্র বলিল, "তা, সন্ধ্যে আহ্নিক সারতে ১০॥০ টা বাজে, তারপর আহারাদি সেরে আসতে ১২ টার কম হয় না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এত বেলায় এলে কাজের কোন ক্ষতি হয় না?"

হরেন্দ্র বলিল, "একটু ক্ষতি যে না হয়, তা নয়, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও এর চেয়ে শীগগির ক'রে উঠতে পারি কই ভাই? পেটের ধান্ধা করতে করতেই ত চব্বিশ ঘণ্টা কেটে যায়, এর মধ্যে যদি দু ঘণ্টা ভগবানের নাম করবার মত সময় না পাই, তবে মনুষ্য জন্ম যে মিথ্যা—এমনি ক'রে যতদূর হয় হোক! ব্রাহ্মণের ছেলে সব ত ভাসিয়ে দিয়ে কেবল টাকা, টাকা ক'রে ছুটতে পারি না। তাহ'লে দাসত্বে আর স্বাধীনতায় প্রভেদ রইল কি?"

অনেক দিন পরে আজও হরেন্দ্রের নিকট সেই ব্রাহ্মণের ছেলে বলিয়া গৌরব করিবার অধিকারটা ঠিক আছে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। এত পরিবর্ত্তনের ভিতরে যে ইহার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, ইহা হরেন্দ্রের চরিত্রকে আমার নিকট একটি আদর্শ চরিত্র বলিয়া মনে হইল। সব চেয়ে বড় করিয়া মনে হইতে লাগিল হরেন্দ্রের সন্ধ্যা-আহ্নিকের জন্য সহস্র লোকসানকে অবহেলা করিয়া বেলা বারটার সময় আপিস করা। যাহাদের ভাল হয় তাহাদের কি সবই ভগবান সুন্দর করেন! ভাইটীও ঠিক বড় ভাইএর মত ধর্ম্মপরায়ণ। আমি বলিলাম, "তুমি ঠিক বলিয়াছ, স্বাধীন কাজ করতে এসেও যদি সেই চাকরের মত নাকে মুখে গুঁজিয়া বেলা ১০ টার সময় ছুটতে হয়, তবে স্বাধীন হ'লেম কোন্ জায়গাটায়?"

হরেন্দ্র বলিল, "এই কয়েক বছরে অনেক টাকা উপার্জ্জন করলাম, কিন্তু শশাঙ্ক, তোমায় শপথ করে বলছি,

টাকায় কোন সুখ নাই, কেবল দুঃখ কষ্ট,বড়মানুষি বাড়ায়। এর ভিতরে দূর থেকে মজা অনেকের মনে হয়, কিন্তু এ দিল্লীকা লাড্ডু! আমার আর এসব মোটেই ভাল লাগে না। মনে হয় বেশ একটা শান্তিময় স্থানে গিয়ে দুইটী খাই আর দয়াময়ের নাম করে' যে ক'টা দিন বাঁচি কাটিয়ে দিই। কিসের সংসার? কিসের স্ত্রী পুত্র? সব মায়া, সব মিথ্যা, সব অনিত্য! তবে যদি বল করচ কেন? কর্ত্তব্য জ্ঞান আছে বলে এখন করতে বাধ্য হয়ে আছি। সে ত মায়া ছাড়া আর কিছু নয়।"

আমি হরেন্দ্রের কথা যত শুনিতেছিলাম ততই যেন তার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছিলাম। হরেন্দ্রের প্রত্যেক কথাই যে বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ, তার মন যে সংসার আসক্তি ছাড়িয়া একমাত্র ভগবানের দিকে ধাবিত হইয়াছে, ইহা ভাবিতে আমার মনের ভিতর একটা অনির্ব্বচনীয় সুধা স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। হরেন্দ্র যে ধর্ম্মজীবনের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তাহার গত কল্যকার সমস্ত কথাগুলিই যে কিছু নয়, এবং বাহিরের কথা, তাহা ভাবিয়া তাঁহার সম্বন্ধে হয়ত কিরূপ মনে মনে অন্যায় করিয়াছেন এবং এইরূপ আলোচনা করার ভিতর দিয়া যে যথেষ্ট অপরাধ করা হইয়াছে, সেজন্য আমার মনের মধ্যে হরেন্দ্রের নিকট একটা ক্ষমা ভিক্ষা করার আবেগ খুবই অধীর করিয়া তুলিতেছিল।

আমি বলিলাম, "হরেন্দ্র তুমি অনেক উন্নতি করেছ। আমরা তোমার কাছে বসবার যোগ্যই নই। যে টাকার লোভ কাটাতে পেরেছে, সে যে বাকীগুলোকে হাসতে হাসতে ত্যাগ করবার মত শক্তি লাভ করেছে, সে বিষয় বুঝতে বেশী বিলম্ব হয় না।"

হরেন্দ্র উত্তেজিত ভাবে আমার হাতটী তার হাতের ভিতর অত্যন্ত আগ্রহ ভরে চাপিয়া ধরিয়া বল্লে, "শশাঙ্ক! তা কৈ পেরেছি ভাই? তা যদি পারতাম তা' হ'লে আজ পর্য্যন্ত ম্লেচ্ছের পোষাক পরে টাকা উপার্জ্জনের জন্য দোরে দোরে ঘুরে বেড়াই?" বলিতে বলিতে হরেন্দ্রের কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া আসিল। তাহার নয়ন বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "টাকা হাতের ময়লা, এর জন্য মানুষ না করছে কি? চুরি, ডাকাতি, বিশ্বাসঘাতকতা, এমন কি সহোদর ভাইএর গলায় ছুরী পর্য্যন্ত দিতে বাকী রাখছে না! কিন্তু শেষে যাবার দিন একটী টাকাও কি সঙ্গে দিলেও নিয়ে যাবার সামর্থ্য আছে? নাই! একথা সবাই জানে, শুধু জানে না, খুব ভালরূপ জানে, কিন্তু জানিয়াও কি তাহার মায়া কাটাইতে পারিয়াছে? পারে নাই। যাহা খুব বেশী করেই মানুষের জানা থাকে, সেইখানটাই মানুষ অত্যন্ত অধিক করিয়াই প্রতারিত হইয়া আসিতেছে, ইহাই প্রকৃতির চিরন্তন নিয়ম নয় কি? আমার ঠিক তাই হয়েছে শশাঙ্ক! জানিয়া শুনিয়াও পায়ের বেড়ী ভাঙ্গিতে বড়ই মায়া হয়।"

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত হরেন্দ্রের কথাগুলি গিলিতেছিলাম বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হরেন্দ্রের প্রত্যেক কথাটাই আমার নিকট অত্যন্ত মূল্যবান বলিয়া মনে হইতেছিল। আমি বলিলাম, "তোমার মনের যেরূপ গতি দেখিতেছি, তাহাতে তোমার সব নির্লিপ্ত ভাব। তোমার দ্বারা দেশের অনেক উপকার হবে আমার খুব বিশ্বাস।"

হরেন্দ্র চেয়ারখানি আমার খুব কাছে টানিয়া নিয়া অত্যন্ত ধীরে ধীরে বলিল, "দেখ শশাঙ্ক, ভগবান আমাকে একটী বিষয়ে বড় অনুগ্রহ করেছেন, সে তোমাকে কি বলবো! সহস্রের মধ্যে একটা পাওয়া যায় কি না। আমার যা কিছু—আমার স্ত্রী হ'তে। অমন গুণবতী স্ত্রী না দিলে আমি এতদিন যে কোথায় ভেসে যেতাম তা বলতে পারি না। স্ত্রীর যে যে গুণের কথা বঙ্কিমবাবু একমাত্র সূর্য্যমুখীকে দিয়ে দেখিয়েছেন, আমার স্ত্রীতে সেই সব গুণগুলি বিদ্যমান। একটা ছেলে মরেছে, আমি হা হুতাশ করছি, কাঁদছি, কেউ সান্ত্বনা দিতে পারছেন না, এমন সময় আমার স্ত্রী এসে বল্লেন, "তোমার মত লোকের কি শোক করা উচিত? তুমি যদি এমন কর তা হ'লে আমি কেমন করে দাঁড়াব বল? দুঃখ কিসের? যিনি দিয়াছিলেন, তাঁর জিনিষ, আমাদের কাছে যতটুকু রাখবার দরকার ছিল ততটুকু রেখে ফিরিয়ে নিয়েছেন;

এর জন্য কষ্ট কিসের? এই যে তোমার কাছে পাড়ার কত বিধবা লুকিয়ে বিনা লেখা পড়ায়—টাকা খাটাবার জন্য জমা দিয়ে যায়, আবার তাদের আবশ্যক পড়লে হঠাৎ এসে চেয়ে নিয়ে যায়, তখন ত কৈ দুঃখ কর না?" তার এই সব কথা শুনে আমার জ্ঞান হয়েছে। বুঝেছি এসব তাঁর। আমরা কেবল অভিনয় করতে এসেছি। অনেক দিন পরে তোমাকে পেয়ে যে কি পর্য্যন্ত আমার আনন্দ হয়েছে তা আর কি বলবো। তোমার সঙ্গে কথা বলে যেন কথা বলার সাধ মিটছে না। আমি তোমাকে প্রথম থেকেই জানি, তোমার হৃদয় ও মন বড় ও সরল।"

আমি বলিলাম, "এখন তোমার আপিস দেখে গেলাম। এদিকে এলেই তোমার সঙ্গে দেখা করে যাব।"

হরেন্দ্র বলিল, "চা-টা খাওয়া অভ্যাস আছে? আনিয়ে দেব?"

আমি বলিলাম, "চা খাই, সে সকালে একবার, এখন আর প্রয়োজন নাই।"

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল কথা, তুমি ত চাকরী ছেড়ে দিয়েছ, কি করচ?"

আমি হাসিয়া উত্তর করিলাম—"করছিলাম একটা ব্যবসা, উপস্থিত সেটাও ত্যাগ করেছি।"

হরেন্দ্র অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে তুমি বেকার বসে আছ? কিসের ব্যবসা করেছিলে? করেছিলে যদি তবে ছাড়লে কেন? যে দিন কাল পড়েছে, একদিন বসে থাকলে বিপদ! সংসার চলা দায়!"

আমি বলিলাম, "একটী বন্ধুর সহিত লোহার দোকান করেছিলাম। লোকটী খুব ধার্ম্মিক বলেই আমার ধারণা ছিল—কিন্তু বাহির ও ভিতর দুইটী দিক যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তা ধত্তে অনেক বিলম্ব হয়েছে। এই কারবারটী উপলক্ষ করেই বাইশ বৎসরের চাকরী ত্যাগ করি।"

হরেন্দ্র বলিল, "এটা তোমার ঠিক বুদ্ধিমানের মত কাজ হয় নাই। কারবার কিছুদিন চালিয়ে, তারপর বুঝে সুঝে ছাড়া উচিত ছিল।"

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, "উচিত অনেক ছিল, এখনো আছে, এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন্ উচিতটা মানিয়া চলিয়াছি, বা চলিব, তাহার কোন আশা দেখিতেছি না। বন্ধুর কথায় বিশ্বাস করা একটা বড় উচিত—আমি সেই উচিতটা করতে গিয়ে চাকরী ছাড়া উচিত কি না সেটা ভাবতে পারি নাই, এই না আমার মূর্খতা? আর আমার বন্ধুর আমাকে এইরূপ ব্যবসায় নামান উচিত ছিল কি না, সেটাও তিনি ভাবা উচিত মনে করেন নাই। সুতরাং অনেক উচিত এ সংসারে চিৎ হইয়াই গড়াগড়ি যায়। কোন দিন কেহ তাহার দিকে তাকাইয়া দেখে না, দেখা মোটেই প্রয়োজন মনে করেন না।"

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কারবার কি চল্লো না? না লোকসান হ'তে লাগল?"

আমি উত্তর করিলাম, "ন্যায় পথে থাকিয়া কারবার করলে কারবার কোন দিন অচল হয় না, একথা আমার সামান্য দিনের অভিজ্ঞতা হইলেও স্পর্দ্ধা করে বলতে পারি। কারবার বেশ চলেছিল, এক বৎসরের ভিতর যথেষ্ট লাভের আশা হয়েছিল—এত অল্প দিনে এত অধিক লাভের আশা করা যায় না। এই অধিক লাভই কাল হয়ে দাঁড়াল।"

হরেন্দ্র অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিল, "ব্যাপারটী খুব রহস্য পূর্ণ দেখচি। তারপর?"

আমি বলিলাম, "তারপর আমার যিনি বন্ধু ও অংশীদার ছিলেন, তাঁহার সহসা বন্ধুত্বটা কুইনাইনের বড়ীর মত তিক্ত হয়ে উঠতে সুরু করলো। এত অধিক লাভ যদি একলার হতো, তবে এতদিনে একখানি মটর গাড়ী কিনতে পারতাম। বোধ হয় এইরূপ একটা প্রকাণ্ড লোভ তার চারিদিকে শিকড় গজিয়ে উঠতে যখন সুরু করেছে, তখন একদিন সন্ধ্যার সময় দুই বন্ধুতে বসে দোকানে চা খাচ্ছি, অন্য কর্ম্মচারী কেউ উপস্থিত নেই। এমন সময় কথায় কথায় তার মুখ দিয়ে বেড়িয়ে পড়ল "এই ব্যবসাটী এক জনের হ'লে তবে তার স্বচ্ছন্দে সংসার চলতে পারে।" কথাটা তড়িৎবেগে আমার অন্তরের ভিতর গিয়া আঘাত করিল ও সঙ্গে সঙ্গে সুদূর ভবিষ্যতের একখানি মসীবর্ণ চিত্র আমার নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠিল। তাহার অচিন্তনীয়

দৃশ্য দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। সেদিন আর কোন উত্তর দিলাম না। যথারীতি দোকান বন্ধ করিয়া গৃহে ফিরিলাম। মনে মনে নানারূপ ভাল মন্দের বিচার চলতে লাগলো। আজ অজয় কেন এমন কথা বল্লে? কথাটা কি সে অনেক ভেবে চিন্তে বলেছে? না, একটা ভাসা কথা বলেছে? এই নিয়ে যত দিক দিয়ে ভাবা যায় আমি ভাবতে লাগলাম। কিন্তু আমাকে বড় বেশী দিন এই চিন্তার ভার বহন করতে হলো না। একদিন অজয় বল্লে, "শশাঙ্ক,আমি যতদূর বুঝছি, এ কারবার কিছুতেই চলতে পারে না। ভবিষ্যতে আরও অনেক টাকা মূলধন প্রয়োজন। তত টাকা কোথায় পাওয়া যাবে?" আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কোন উত্তর দিলাম না।

ইহার পর অজয়ের অন্তরের কথা বুঝিতে বাকি রহিল না। ভবিষ্যতে যে কারবারটী একটী বিবাদে পরিণত হইবে, এমন বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ়ভাবে বসিয়া গেল। আমি কাহাকেও কোন কিছু না বলিয়া একদিন কারবারটী তাঁহার নামে বিক্রী-কওলা করিয়া দিলাম।

হরেন্দ্র খুব একটী গভীর দুঃখ ও উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলিল, "ইহাতে অজয় বাবু কিছু আপত্তি করিলেন না? হঠাৎ তোমার ছাড়িয়া দেওয়াটা, তাহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিল না?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "সে একবার বলিয়াছিল বটে যে তোমার কিরূপ করিয়া চলিবে? সেটার উপর কোন জোর দিয়া বলে নাই, বরং এতটুকু বলিয়া নিশ্চয় মনে মনে ভাবিয়াছিল, যদি না ছাড়ে। তাহ'লে যে তার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না।"

হরেন্দ্র বলিল, "কলির চূড়ান্ত হয়ে এসেছে। এতখানি নিমকহারামি ভগবান কোন দিন সহ্য করেন না। আমি কিন্তু ভাই এমন সহজে এই কাজটা হতে দিতাম না।"

গুণেন এতক্ষণ চুপ করিয়া সকল কথা শুনিতেছিলেন, তিনি আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন, "এ কাজটা করা আপনার খুব ছেলেমানুষী হয়েছে, একথা একশ বার বলব। আমি বিনা আদালত এক ইঞ্চি হটতাম না।"

হরেন্দ্র যেন এই অবসরে নিজেকে সামলাইয়া লইল। বলিল, "তবে কাজটা একদিক হতে দেখলে খুব ভালই হয়েছে। এ সংসারই হচ্ছে মিথ্যা, দু'দিনের জন্য আসা, কে কার অদৃষ্ট কেড়ে নিতে পারে বল? যা হ'বার তা হয়ে আছে। আমরা কেবল পরের পর দেখে যাচ্ছি আর সেই সব কর্ম্মের কর্ত্তা নিজেদের ভেবে নিয়ে সুখ দুঃখ ভোগ করচি। তোমার এইরূপ ত্যাগ আমার নিকট অত্যন্ত গৌরবজনক ও মনুষ্যোচিত বলিয়া যথেষ্ট আনন্দ দিতেছে। এর জন্য তুমি কিছুমাত্র চিন্তিত হয়ো না। ভগবান তোমার মঙ্গল নিশ্চয় করবেন।"

আমি আর কোন উত্তর না দিয়া বলিলাম, "আজ আসি। পারি ত আর একদিন দেখা করব এখন।" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে হরেন্দ্র আমার হাত ধরিয়া বলিল, "সংসার ত চালাতে হবে, কাল থেকে কেন তুমি আমার আপিসে এস না? একটা পরামর্শ করে দেখা যাক, কতটা কি তোমার সম্বন্ধে করতে পারা যায়। শুধু বসে থাকলে ত আর চলবে না?"

আমার সম্বন্ধে হরেন্দ্রের এতখানি উদ্বেগ ও চিন্তা,সেদিন হরেন্দ্রকে আমার কাছে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বড় করিয়া ধরিল। মনে হইল হরেন্দ্রের অন্তঃকরণ কি কোমল ও পর-দুঃখকাতর! এতখানি উদার ও ধর্ম্মপ্রাণ না হইলে এত উন্নতি কি করিতে পারিত? মনে মনে হরেন্দ্রকে অনেক ধন্যবাদ দিতে দিতে সেদিন চলিয়া আসিলাম।

২

হরেন্দ্র চলিয়া যাইলে কিরণ বলিল, "বাহির হইতে যতদূর বোঝা যায় লোকটী হয় খুব সরল প্রকৃতির লোক ধর্ম্ম-ভীরু এবং কাজের লোক। আর নয়ত অত্যন্ত দোকানদার। ব্যবহার না করলে ত ভাই সংসারে মানুষ চেনা দায়। মানুষ যত বেশী লেখা পড়া শিখছে, যত বেশী ভদ্রলোক বলে পরিচয় দিচ্ছে, এটা নিশ্চয় যেন ততই সরলতা, সততা, সব দূরে চলে যাচ্ছে। দিন দিন মিথ্যার জাল এমন সুন্দর ভাবে বুনছে যে আর কিছু দিন পরে, সত্যের পদে পদে অপমান ও গ্লানি ঘটবে। সেদিকে লোকের দৃষ্টি একদম থাকবে না। মিথ্যার টানা জালের ভিতর পড়ে সবই এক যোগে সত্যের গলা টিপে মেরে ফেলবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে।

নাম হবে বর্ত্তমান যুগের সভ্যতা! এই সভ্যতার ঘোড়াই দিয়ে যে এগিয়ে আসতে পারবে তার জিৎ হয়ে যাবে।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু এতটা ভবিষ্যৎ ভাবাই বোধ হয় আমাদের অন্যায়। কি হবে, কি হতে পারে, সেই চিন্তার পেছনে ছুটতে ছুটতে যে ক্লান্ত হয়ে পড়ে যেতে পারি, এবং সেই পড়ে-যাওয়ার ভিতর কে বলতে পারে যে সমস্তটাই কল্পনা নয়? মন্দ দিকটা সকল সময় ভাবলে মানুষের পক্ষে কোন কাজ করা সম্ভবপর হয় না। কাল রং-এর চশমা যখনি চোখে দেওয়া যাক না কেন, তার ভিতর দিয়ে কাল ছাড়া শাদা বা অন্য রং দেখা অসম্ভব। বেশীর ভাগ মানুষের মনের শিক্ষা মোটে নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং একবার তাকে যদি মন্দের দিকে ছেড়ে দাও তবে সে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত সমস্ত ভালকে পশ্চাতে ফেলে এগিয়ে যাবার জন্য এমন ছুট মারবে যে তখন হয়ত "জকী" কোথায় পড়ে যাবে তার ঠিক-ঠিকানা থাকবে না। হরেন্দ্রকে যতখানি আমি জানি, আজ কাল এমন লোক খুব কম আছে বলতে পারি।"

কিরণ হাসিয়া বলিল, "ভাল লোক নন একথা আমি বলি নাই। তিনি নিশ্চয় আমাদের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ ও উন্নত হতে পারেন, একথায় কোন তর্কও নেই। তবে তোমার কথায় বলতে হলে বলতে হয় তোমার চোখে এখন হরেন্দ্রকে দেখবার যে চশমা আছে, সেখানি যতক্ষণ আমি চোখে না দিচ্ছি ততক্ষণ তোমার মতন জোর করে বলবার অধিকার আমার কই?"

আমি বলিলাম, "একথা খুব সত্য। তোমার সঙ্গে হরেন্দ্রের পরিচয় যত ঘনিষ্ঠ হয়ে আসবে, ততই তুমি তার গুণে মুগ্ধ হবে।"

সেদিন হরেন্দ্র কিরণের নিকট হইতে একটী বড় কাজ পাইয়াছিলেন। এ কাজটী হরেন্দ্র করিতে পারিলে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা লাভ করিতে পারিবেন। কিরণ শশাঙ্কের বন্ধু বলিয়া হরেন্দ্রকে এই কাজটী দিয়াছিল।

কিরণ বলিল, "তুমি হরেন্দ্রের আপিসে রীতিমত রোজ একবার করিয়া যাইতেছ ত? কোন একটা কাজের কিছু বন্দোবস্ত শীঘ্র করা প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে।"

আমি বলিলাম, "হরেন্দ্র বলেছে কাল তার একটী উকিল বন্ধু আসবেন, তার হাতে কি একটা কাজ আছে সে সম্বন্ধে কথা হবে।"

কিরণ বলিল, "আমার ইচ্ছা নয় যে আর কারো সঙ্গে বখরায় কিছু করা। পারত হাজার ছোট হলেও নিজে একটা কিছু কর। তাতে কাজে উৎসাহ হবে, মনে শান্তি পাবে।"

আমি বলিলাম, "দেখা যাক।"

ক্রমশঃ।

দেরাডুন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য]

এখানে শিখদিগের উপাসনা মন্দির আছে, খৃষ্টানদিগের ভজনালয় আছে, মুসলমানদিগের মসজিদ আছে, আর্য্যসমাজীদিগের প্রার্থনা-গৃহ আছে এবং হিন্দুদিগের দেবালয় আছে। এই দেবালয়টী একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ দ্বারায় প্রতিষ্ঠিত। এই দেবালয়টীকে লোকে কালীবাড়ী বলে বটে কিন্তু মন্দিরাভ্যন্তরে জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এখানে যে সমস্ত নবাগত বাঙ্গালী আসেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কালীবাড়ী গিয়া থাকেন, কেহ বা করণপুরে গিয়া থাকেন। যেখানেই যান অভ্যাগত বাঙ্গালীদিগের বাসের বিশেষ অসুবিধা হয় না। করণপুরের বাবুরা অতি সজ্জন। তাঁহার

বাঙ্গালী মাত্রকেই সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। এখানে প্রতি গলিতেই প্রায় শিবালয় দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত শিবালয় সাধুদিগের বাসের উপযুক্ত স্থান। প্রত্যেক স্থানেই ২।৪ জন সাধু বাস করিয়া থাকেন। শিখদিগের বাসের জন্য ত গুরুদ্বারা উন্মুক্তই আছে। এখানে কেবলই যে শিখ সন্ন্যাসী আশ্রয় পাইয়া থাকেন তাহা নহে, যে কোন সম্প্রদায়ের লোক হউন এখানে বাস করিবার কোন আপত্তি নাই, তবে আগার শিখ সন্ন্যাসীরাই পাইয়া থাকেন। হিন্দুদিগের বাসের ব্যবস্থা এইরূপ; মুসলমানদিগের জন্য দুইটী সরাই আছে। কেরায়া স্বরূপ কিছু দিলেই যে কেহ এখানে বাস করিতে পারেন। ইংরাজদের বাসের জন্য হোটেল আছে।

দেরাদুন সহর সজলা নহে। যে সমস্ত হিমোৎপন্ন নদীর বিষয় ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি উহা বৃষ্টির সময়েই জলে পরিপূর্ণ, বৃষ্টির অন্তেই শুষ্ক বালুকা ও প্রস্তর রাশিতে পরিব্যাপ্ত হয়। এই সমস্ত নদী অনায়াসেই পার হওয়া যায় কিন্তু বৃষ্টি হইলে উহার জলে নামিতে ভয় করে। অনেক সময় গো মেষাদি পশুগণ স্রোতোবেগে প্রবাহিত হইয়া যায়। মনুষ্যেরাও অসমসাহসিকতা করিতে গেলে বিপদগ্রস্ত হয়েন। এখানে কূপ বা পুষ্করিণী নাই। গুরুদ্বারায় দুইটী পুষ্করিণী আছে। কিন্তু উহার জল দিয়া পাক করিবার কায চলে না। ঐ স্থানে অপর একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে তদ্দ্বারা পানীয় জলের কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং ডাইল সিদ্ধ হয়। এই প্রকার জলের অপ্রতুলতা পূর্ণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ৬.৭ মাইল ব্যবধান হইতে পয়ঃপ্রণালীর দ্বারায় মিউনিসিপ্যালিটীর সর্ব্বত্রই জল সরবরাহ করিয়া থাকেন। এই জলের দ্বারায় স্নানাদি অন্যান্য সকল কার্য্য সম্পন্ন হইলেও পান করা কিম্বা পাক করার কার্য্য চলে না। এই নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট পৃথক বন্দোবস্ত করিয়াছেন। সহরের ৩ মাইল উত্তরে নালা পানী নামক একটী প্রস্রবণ আছে। সেই প্রস্রবণ হইতে ড্রেণ করিয়া সহরে ও ক্যাণ্টনমেণ্টে জল আনিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উপরে যে গোরখাদিগের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহা এই নালাপানী নামক স্থানেই ঘটিয়াছিল। ইতিহাসে ইহার নাম কলঙ্গার যুদ্ধ। এখন এখানে যুদ্ধের আর কোন চিহ্ন নাই। যেখানে বলভদ্র সিংহের দুর্গ ছিল এখন সেখানে একজন সন্ন্যাসী বাস করেন। তাঁহার কুটির প্রাঙ্গণে একটি রুদ্রাক্ষ বৃক্ষ বিরাজ করিতেছে। এই নির্জ্জন শান্ত প্রদেশে উপস্থিত হইলেই মনে আপনিই সাত্বিক ভাবের উদয় হইয়া থাকে। রুদ্রাক্ষ বৃক্ষটি পথিকদিগকে সন্ন্যাসীর আশ্রম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। এখানকার জল অতি সুপেয় ও স্বাস্থ্যপ্রদ। এই জল পান করিলে অতি দুরারোগ্য ব্যাধিও আরোগ্য হইয়া যায়। এই জলই লোকে পান করিবার জন্য ও রন্ধনকার্য্যে ব্যবহার করিয়া থাকে।

এখানে একটি কুষ্ঠাশ্রম আছে। এই কুষ্ঠাশ্রমে প্রায় ৪০০।৫০০ রোগী আশ্রয় পাইয়া থাকে। ডাক্তার বার্চ্চ সাহেব কর্ত্তৃক এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়।

এখানকার জাতি ও বর্ণগত আচার ব্যবহার সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করিতেছি। এখানকার ব্রাহ্মণগণ দুইভাগে বিভক্ত (১) সরলা, (২) জিনগারী। এই উভয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু শাস্ত্রোক্ত আচারগত কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। ইহারা সকল প্রকার মাংসই ভক্ষণ করিয়া থাকে। দেরাদুন পাহাড় হইতে সরলা ও জিনগারী এবং নিম্ন প্রদেশ হইতে গৌড় ও সারস্বত ব্রাহ্মণগণ নানাপ্রকারে একত্র হইয়াছে। যদিও গৌড় ও সারস্বত ব্রাহ্মণদিগের পার্ব্বত্য ব্রাহ্মণদিগের সংস্রব অতি বিরল তথাপি এই গৌড় ও সারস্বত ব্রাহ্মণদিগের অনুকরণে পার্ব্বত্য ব্রাহ্মণেরা এখন অপবিত্র মাংসাহার পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই পার্ব্বত্য ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সরলাই প্রধান; ইহাঁরা জিনগারী ব্রাহ্মণদিগের উপর একটু আধিপত্য দেখাইয়া থাকেন। ইহাঁরা জিনগারী ব্রাহ্মণদিগের প্রস্তুত অন্নাদি ভক্ষণ করেন না, এমন কি অনেকে ইহাদের স্পৃষ্ট জল পর্য্যন্ত ব্যবহার করেন না। এখানকার ব্রাহ্মণদিগের রাজপুত কন্যার সহিত বিবাহ হয়। রাজপুত কন্যারা ঘৃত সংযুক্ত রুটী তরকারী প্রস্তুত করিয়া দিলে ব্রাহ্মণেরা আহার করিতে পারে কিন্তু তাহাদের প্রস্তুত ডাল ভাত খাওয়া নিষিদ্ধ। এই রাজপুত কন্যার গর্ভজাত পুত্র কন্যাগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া গৃহীত হয় ও ব্রাহ্মণের সম্মান পাইয়া থাকে। জিনগারী ব্রাহ্ম-

েরা প্রকাশ্যেই মদ্যপান করিয়া থাকে কিন্তু সরলা ব্রাহ্মণগণ সুরা স্পর্শও করে না। দেরাডুনে সরলা ব্রাহ্মণের সংখ্যা অতি বিরল, বোধ হয় ২৫।৩০ ঘর হইবে, কিন্তু জিনগারী ব্রাহ্মণের সংখ্যা খুব অধিক। ইহারা প্রায়ই কৃষিজীবী, অনেকে চাকরীও করিয়া থাকে। এই চাকরীর অর্থ জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ। অর্থাৎ ইহারা তোমার পাচক ব্রাহ্মণেরও কাজ করিবে, উচ্ছিষ্ট ভাণ্ডও মাজিবে, স্নান করাইয়া দিবে, কাপড় কাচিবে, জুতা বুরুস করিয়া দিবে। মোট কথা, একজন লোকই গৃহের যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করে।

এখানকার রাজপুত জাতি তিন ভাগে বিভক্ত (১) রাণঘর, (২) রাউৎ, (৩) নেগী। গড়বাল রাজের অবনতির সময় পুণ্ডীর নামক কোন বিদেশীয় জাতি দূনে * আসিয়া অধিকার লাভ করে। উক্ত পুণ্ডীর জাতি হইতেই রাণঘর রাজপুতের উৎপত্তি। রাণঘরগণ প্রকৃত পক্ষে রাজপুত কি না তাহাতেও বিশেষ সন্দেহ আছে। ইহাদের সংখ্যা অতি অল্প,তাহাও আবার পাহাড়ীদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ দ্বারা ক্রমশঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। পশ্চিম দূনে এই সম্প্রদায়ের কতক লোক বাস করে। নোয়াধার † নিকটও কতক আছে। রাউৎগণ পর্ব্বতবাসী। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষের বিবরণ এইরূপ,—প্রায় ১২০০ কি ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে কানপুরের নিকটবর্ত্তী স্বরাজপুর, রাউৎপুর, মুসলপুর এবং কচোদ প্রভৃতি স্থান হইতে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আলমোরার রাজার কার্য্য লইয়া এদেশে আইসে। আলমোরার রাজা নিঃসন্তান হইয়া মারা গেলে তাঁহার বিধবা পত্নী স্বরাজপুরের রাজার একটী পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করেন। স্বরাজপুরের রাজা তাঁহার পুত্রের সঙ্গে আরও ৪ জন আত্মীয় প্রেরণ করেন। উক্ত ৪ জন আত্মীয় কুঁমাউনেই বাস করেন। এই ৪ জন আত্মীয়ের মধ্যে একজনের নাম যমীভান। পরে রাজার সহিত মতান্তর হওয়ায় উক্ত যমীভান শ্রীনগর যাইয়া বাস করেন এবং গাড়বালের রাজার সুনজরে পড়েন। মহারাজের সুনজরে তাহার পরবর্ত্তী পুরুষগণ অতি সমৃদ্ধ হইয়াছিল এবং শেষ সময়ে অবজা কুমার ও রাণী করুণাবতী মহারাজের প্রতিনিধি স্বরূপ এই প্রদেশে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। নোয়াধাতে ইহাঁদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি অজাপুর, করণপুর ও উদ্দিওয়ালা রাউৎদিগের বাসস্থান. নির্দ্ধারণ করিয়া দেন, সুতরাং এই স্থান গুলিতেই তাহাদের দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতি অন্যান্য পাহাড়ী রাজপুতদের সহিত বিবাহ কার্য্যাদি করিয়া থাকে, তাহাতে তাহাদের জাতি নষ্ট হয় না। এই কারণের জন্যই স্পষ্টতঃ ইহাদিগকে রাণঘর ও পুণ্ডীর সম্প্রদায় হইতে বিভিন্ন করা হইয়াছে। ইহাদের গোত্র "অঙ্গিরা"।

নেগীগণ যদিও পর্ব্বতবাসী তথাপি ইহারা সাধারণ পাহাড়ী রাজপুতদিগের উপর আধিপত্য করিয়া থাকে। নেগী আমাদের দেশের তালুকদার প্রভৃতির ন্যায় পদবী বিশেষ বলিয়া অনুমিত হয়। ইহাদের নামের অন্তে "নেগী" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই নেগী শব্দের সহিত নাগা শব্দের কোন প্রকার সংস্রব আছে কি না জানি না।

এই তিন প্রকার প্রধান রাজপুত জাতি ভিন্ন আরও কয়েক প্রকার পাহাড়ী রাজপুত নামে অভিহিত। তাহাদের নাম ও বাসস্থান নিম্নে প্রদত্ত হইল। টুয়ার নামক জাতি সাহসপুরে বাস করে। গুজর সম্প্রদায় গত শতাব্দীতে সাহারানপুর হইতে টিমলিপাসের মোহানায় আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। সংপ্রতি মথুরাওয়ালা ও ভারুওয়ালা নামক দুইটী সমৃদ্ধিশালী গ্রাম গুজর সম্প্রদায়ের আবাসভূমি। কাজিচোহান নামক এক জাতি মাজরা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করে। মেহরা নামক এক সম্প্রদায় আছে ইহারা রায়ওয়ালা ও যোগীওয়ালা প্রভৃতি গ্রামে বাস করে। ইহারা অত্যন্ত মদ্যপায়ী এবং ভীরু স্বভাব। হেরিস নামক আর এক সম্প্রদায় মেহরা জাতির তুল্য মদ্যপ ও ভীরু। এই হেরিস সম্প্রদায় সংখ্যায় অতি অল্প। ধুম নামক এক সম্প্রদায় সাধারণতঃ হিমালয়ের পাদদেশে বাস করে। ইহাদের বর্ণ কাল ও চুল কোঁকড়ান দেখিয়া ইহাদিগকে হীন জাতীয় বলিয়াই অনুমান হয়।

* দূণ—Valley.

† দেরাদুনের ৫ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে একটী পাহাড় আছে, ইহারই নাম নোয়াধা অথবা নাগসিদ্ধ। পূর্ব্বকালে গাড়বালের রাজার প্রতিনিধি এইস্থানে বাস করিতেন।

পাহাড়ীদের পরিচ্ছদ একখানি কম্বল। কম্বলখানির একদেশ পরিধান করে অপর অংশ গাত্রবেষ্টন করিয়া রাখে। উহা এরূপ ভাবে জড়াইয়া রাখে যে সহজে খুলিয়া যায় না। প্রান্তভাগে একটি কাঠের সূচী দ্বারা আটকান থাকে। ইহারা প্রাণান্তেও স্নান করিতে চাহে না, তজ্জন্য গাত্রে এক প্রকার দুর্গন্ধ হয় ও বস্ত্রে চীলু নামক এক প্রকার কীট জন্মায়।

ইহাদের বাসস্থান খড়ের ঘর। পাকা ঘর প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। শতাব্দ পূর্ব্বে সমস্ত দেরাদুন অঞ্চলে ৮।৯ খান পাকা বাড়ী ছিল কি না সন্দেহ।

ইহারা ভাতই খাইয়া থাকে। মাতুয়া নামক এক প্রকার শস্যও প্রধান খাদ্য স্বরূপ গৃহীত হয়। টোর নামক এক প্রকার ডাইল পাওয়া যায়। ইহা পাহাড়ীদিগের অতি প্রিয় সামগ্রী। ইহা অত্যন্ত গরম এবং দুষ্পাচ্য।

ইহাদের বিবাহ সংস্কারে যৌতুকের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। যাহার যেমন অবস্থা সে সেইরূপই দিয়া থাকে। কেহবা ১০৲ কেহবা ২০৲ কেহবা ৫০ টাকা। ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার অধিক যৌতুকের কথা শুনি নাই। এই যৌতুকের কিয়দংশ নগদ ও বক্রী বস্ত্রালঙ্কার তৈজসাদিতে ব্যয়িত হয়।

এখানকার চলিত ভাষা হিন্দি, অনেকে উর্দ্দুও ব্যবহার করিয়া থাকেন। পাহাড়ীরা পরস্পরে পাহাড়ী ভাষাতেই কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। তাহা আমাদের অবোধ্য। আমাদের সহিত কথাবার্ত্তার সময় পাহাড়ীরা হিন্দী ভাষাই ব্যবহার করিয়া থাকে।

এখানে মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত একটী হাই স্কুল আছে। অনেক বাঙ্গালী বাবু একটী হাইস্কুল স্থাপনা করিয়াছিলেন, অর্থাভাবেই উহা উঠিয়া গেল। এখানে একটী বালিকা বিদ্যালয় আছে, ইহাও মিশনারীদের দ্বারাই স্থাপিত। এখানে একটী ফরেষ্ট স্কুল আছে। এই স্কুলে বন্য বৃক্ষাদির বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

আফিসের মধ্যে ট্রিগনোমেট্রিকেল সর্ভে আফিসই প্রধান; ইহার পরই ফরেষ্ট আফিস ও ক্যানাল আফিসের নাম করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত ম্যাজিষ্ট্রেট আফিস, মিউনিসিপাল আফিস প্রভৃতি ২।৪টী আফিস আছে।

দেরাদুন পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত। এই সহরটী সমুদ্র সমতল ভূমি হইতে ২২০৫ ফীট উচ্চ। ইহার চারিদিকেই শাল বৃক্ষের বন। এখানকার জল বায়ু অনেকটা বঙ্গদেশের অনুরূপ। গ্রীষ্মের প্রকোপ বড় বেশী নাই, তবে শীতের আধিক্য আছে। যে সময়ে পাহাড়ে বরফ গলিতে আরম্ভ হয়, সেই সময় অসম্ভব শীত পড়ে। এখানকার বৃষ্টির পরিমাণ ৮০ ইঞ্চি। ইহার জল বায়ু বঙ্গদেশের অনুরূপ হইলেও সেইরূপ অস্বাস্থ্যকর বা ম্যালেরিয়ার জর্জ্জরিত নহে, প্রত্যুত ইহা যুক্ত প্রদেশের মধ্যে একটী স্বাস্থ্যনিবাস বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

পুনর্মিলন।

[প্রতিভাময়ী]

সুলতা ধীরে ধীরে আসিয়া চারুর পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া বলিল, "শোন চারু, সতীত্বই স্ত্রীলোকের একমাত্র রত্ন, নারীর নিকট স্বামীই শ্রেষ্ঠ দেবতা; এক স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষের চিন্তাও সতীত্বের বিঘ্ন; এখন হইতে সাবধান হও।"

চারু কাতর চক্ষে সুলতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "দিদি,"—

"আমি সব জানি চারু, কার কণ্ঠস্বর শোনবার জন্যে সর্ব্বদা তুমি উদ্গ্রীব হয়ে থাক, কার পায়ের শব্দ শোনবার জন্যে সর্ব্বদা উৎকর্ণ হয়ে অবস্থান কর, কার দেবমূর্ত্তি দেখবার জন্যে সর্ব্বদা ব্যাকুল হও, আবার দেখবামাত্র লজ্জা ও সঙ্কোচে আরক্তিম মুখ নত করে থাক। আমি সব লক্ষ্য করেছি চারু। যেদিন তোমাকে প্রথম পেয়েছিলুম, বড় আদরেই নিজের বোনের মত

ভালবেসেছিলুম, কিন্তু পরে যে এ রকম দাঁড়াবে তা একদিনও ভাবিনি।"

"দিদি ক্ষমা করো"—বাধা দিয়া সুলতা বলিল, "শুধু তোমার একলার দোষ দিচ্ছি না চারু, আমার স্বামীরও যথেষ্ট দোষ আছে। আজকাল অন্যমনস্ক,অস্থিরতা, অসহিষ্ণুতা, সর্ব্বদা চিন্তা, বিমর্ষ বদন সবই লক্ষ্য করেছি। কিন্তু তবুও তোমায় বলি, তুমি অন্যের পরিণীতা। কেঁদোনা চারু, আমি তোমার ভালর জন্যই বলছি।"

চারু নীরবে চক্ষু মুছিয়া নতমুখে বলিল, "ক্ষমা করো দিদি।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সুলতা গৃহান্তরে চলিয়া গেল।

নরেশ বাড়ী আসিতেই সুলতা স্বহস্তে চায়ের টেবিল প্রস্তুত করিতে লাগিল দেখিয়া নরেশ বলিল, "তুমি আজ এ সব কচ্ছ কেন? চারু কোথায় গেল?"

সুলতা বিরক্ত ভাবে কহিল, "কেন, চারুকে কি সবই করতে হয়?"

নরেশ অপ্রতিভ ভাবে কহিল, "না, তাই বলছি।"

সুলতা আর কোন কথা না কহিয়া একমনে চা প্রস্তুত করিতে লাগিল। চা প্রস্তুত শেষ হইলে একটা কাপ্ নরেশের দিকে ঠেলিয়া দিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত নিজে খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। নরেশ দু এক চুমুক পান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চারু চা খাবে না?"

ক্রুদ্ধ স্বরে সুলতা বলিল, "চারু খাক বা না খাক তাতে তোমার কি? তুমি নিজে খাচ্ছ খাও।"

নরেশ চা পান শেষ করিয়া নীরবে অন্য ঘরে চলিয়া গেল। সুলতা এক কাপ চা লইয়া চারুর ঘরে গিয়া দেখিল চারু একটি জানালার গরাদ ধরিয়া নীরবে বাগানের দিকে চাহিয়া আছে। সুলতা ডাকিল—"চারু"। চারু ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার হাত হইতে কাপটি লইতেই সে চলিয়া গেল। চারু কাপটি নীচে রাখিয়া দিল এবং ধীরে ধীরে জানালার নিকট বসিয়া ভাবিতে লাগিল —"হায়! আমি কি কাজ করতে বসেছি! যে আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, যে আমাকে নিজের বোনের চেয়েও বেশী স্নেহ করে, তারই মনে আমি কষ্ট দিতে আরম্ভ করেছি, আমি তার কষ্টের একমাত্র কারন হলুম। না না, আর আমি এখানে থাকব না, যে দিকে হয় চলে যাব, কিন্তু কোথায় যাব, অভাগিনীর কেউ যে ত্রিসংসারে নেই। না না, কেউ নেই বলতে পারবো না, আমি কোথাও যেতে পারবো না, তবুও একবার দেখতে পাব আমার ইহকালের সর্ব্বস্ব, আমার পরকালের স্বর্গ, আমার জীবন-মরুভূমের ওয়েসিস্, আমার হৃদয়-নিকুঞ্জের চির বসন্ত, আমার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যে এখানে, আমি যেতে পারবো না, আমারও এতে কোন দোষ নেই, আমি আর কিছু চাই না, শুধু একবার দেখা, কিন্তু তিনি, তিনিও যে আজকাল কি এক রকম হয়েছেন। আচ্ছা, তিনি কি আমায় চিন্তে পেরেছেন? না না, কি করে চিন্তে পারবেন? তার ত কোন সম্ভাবনা নেই। সেই নয় বৎসরের বালিকা দেখিয়াছিলেন, তবে আমায় পরস্ত্রী জেনেও কি—না না, সে দেবোপম চরিত্রে আমি দোষ দিতে পারবো না, দূর হক্ গে ছাই, ও সব ভাব্ব না। আচ্ছা দিদি আমাকে কি মনে করেছে, সেদিন বিকালে তাঁকে দেখে হঠাৎ কি রকম হয়ে গিছলুম, আর তিনিও চারু বলে কি বলতে এসেছিলেন। তাই কি দিদি দেখেছিল, দিদিকে যদি সব কথা বলি, তবে কি দিদি বিশ্বাস করবে না? না না, আমি বলতে পারবো না, শুধু দিনান্তে একবার দেখে এ নারী-জন্ম সার্থক করবো, ভগবান মনে আমার বল দাও।"

এমন সময় সুলতা আসিয়া বলিল, "চারু, একবার এস, একি, এখনও তোমার চা পড়ে রয়েছে?"

চারু মৃদু হাসিয়া "এই যে খাচ্ছি" বলিয়া চা পান করিয়া সুলতার সহিত চলিয়া গেল।

২

চারু বীণাকে লইয়া বাগানে বেড়াইতেছিল, সুলতা আসিয়া বলিল, "সন্ধ্যে হয়ে গেল, চারু বাড়ী এস"।

চারু বলিল, "তুমি একে নিয়ে যাও দিদি, আমি একটু পরে যাচ্ছি।"

"পরে নয় এখনি চল, সন্ধ্যে হয়ে গেল, এখনো কি বাগানে থাকে?"

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চারু ধীরে ধীরে সুলতার সহিত চলিল। যাইতে যাইতে সুলতা বলিল, "চারু, আমার উপর রাগ করেছিস্?"

চারু সংক্ষেপে না বলিয়া চুপ করিল। "না, তবে বল আজ কদিন ধরে কেন এ রকম করে রয়েছিস্? তোরা সকলে মিলে যদি এ রকম করিস্ তবে আমি কি করে বাঁচব বল?"

সুলতার কণ্ঠস্বর ও কথা শুনিয়া চারু চমকিয়া উঠিল, কহিল, "কেন, দিদি তুমি আজ একথা বলছ? আমিত তোমার উপর রাগ করি নি, তুমি আমার যা করেছ সারা জীবনে তা ভুলতে পারবো না। মা যখন আমাকে অসহায় ফেলে অনন্ত পথে যাত্রা করলেন, তখন তুমিই দিদি একমাত্র মূর্ত্তিমতী করুণারূপিণী দেবী-রূপে আমায় তুলে নিলে। তোমার স্নেহের ঋণ এ জীবনে শোধ দিতে পারবো না। কিন্তু কেন দিদি তুমি আমাকে এখনো এত স্নেহ কর, আমি তা পাবার উপযুক্ত নই, আমারই জন্য তিনি তোমাকে এত অযত্ন করছেন।"

"ওকথা বলিস নি চারু। তোকে পেয়ে যে আমি কি পেয়েছি তা তুই জানিস না। শোন, আমার পিতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ছিলেন, পরে এলাহাবাদে বেড়াতে গেছলেন, সঙ্গে আমি ও আমার ছোট বোন সুচারু। আমার বিয়ে হয়নি। একদিন বাবার শরীরটা হঠাৎ অসুস্থ হলে আমি ব্যস্ত হয়ে বেয়ারাকে ডাক্তার আনতে পাঠালুম, ইনি তখন সেখানে ডাক্তারী করেন, বেয়ারা ওঁকে ডেকে নিয়ে এল, উনি বাবাকে দেখে বল্লেন, ভয় নাই। ওষুধ দিলেন, ক্রমে রোজ বাবাকে দেখতে আসতেন, বাবার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হল, কোনদিন আধঘণ্টা কোনদিন এক ঘণ্টা বসে বসে গল্প করতেন, শুনলাম ওঁর কেউ নেই, পরে বাবায় অবস্থা ভয়ানক খারাপ হতে লাগল। শেষে একদিন তিনি আমাকে এঁর হাতে দিয়ে সুচারু ও আমাকে ছেড়ে কোন্ অজানা পথের পথিক হলেন। সুচারু বাবার জন্তে বড়ই কাতর হয়ে পড়ল, আমরা দুজনে ক্রমাগত তাকে বোঝাতে লাগলুম, সে মুখে কিছু বলত না বটে কিন্তু ক্রমে ক্রমে ভয়ানক শীর্ণ হয়ে যেতে লাগল। দুমাস পরে একেবারে শয্যাগত হয়ে পড়ল, কিছুতেই তাকে রাখতে পারলুম না; সেও কোন্ অনন্ত পথে চলে গেল। আমি বড়ই কাতর হয়ে পড়লুম, তিনি আমাকে নিয়ে দেশ বিদেশে বেড়াতে লাগলেন। দু বছর অতীত হয়ে গেল তারপর আমরা কাশীধামে গেলুম, সেখানে প্রায় ছমাস বাস করছি এমন সময় একদিন হঠাৎ রাত ৯টার সময় একটি অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী এসে আমায় ডাকলে —"দিদি"—তার সেই ডাক শুনে আমি চমকে উঠে চেয়ে দেখলুম সে আমার চারু নয় তবে চারুর মত অনেকটা। আমি তার হাত দুটি ধরে কাছে টেনে নিয়ে সমস্ত জিজ্ঞেস করে জানলুম তার আর কেউ নেই, একমাত্র মা, তাও দুমাস শয্যাগত; ডাক্তার দেখাবারও ক্ষমতা নেই; আজ অবস্থা নিতান্ত খারাপ হয়ে পড়েছে, তাই সে অত্যন্ত ভয় পেয়ে ছুটে এসেছে তিনি যদি একবার দয়া করে যান। আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে তখনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাড়ী গেলুম, গিয়া দেখি বৃদ্ধা শেষ শয্যায় শুয়েছেন। তিনি নাড়ী পরীক্ষার জন্তে হাত দিয়েই দেখেন সব শেষ। তারপর তোকে নিয়ে আবার কত দেশ বেড়ালুম, আমার সেই চারু আবার ফিরে পেয়েছি"। বলিতে বলিতে সুলতা অত্যন্ত স্নেহের সহিত চারুকে বুকের কাছে টানিয়া লইল।

৩

জানালার নিকট বসিয়া সুলতা একটা টুপি বুনিতেছিল, এমন সময় নরেশ আরক্তিম মুখে আসিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল। স্বামীকে পরস্ত্রীতে আসক্ত মনে করিয়া নরেশের চরিত্র সংশোধনের নিমিত্ত সুলতা কয়েক দিবস হইতে তাহার সহিত কথা বন্ধ করিয়াছে; কিন্তু আজ অসময়ে তাঁহাকে ওরূপ ভাবে শয্যা গ্রহণ করিতে দেখিয়া একটু ব্যস্ত হইয়া নিকটে আসিয়া দেখিল, তাঁহার গা অতিশয় গরম। নরেশ নীরবে চোখ বুজিয়া শুইয়াছিল। সুলতা গায়ে হাত দিতেই বলিল—"সুলতা! কাছে এস।"

সুলতা নিকটে যাইয়া বলিল—"কখন জ্বর হ'ল? বড্ড কি যন্ত্রণা হচ্ছে?"

"যন্ত্রণা—না, তুমি আর একটু সরে এস।"

সুলতা ভীত হইয়া চারুকে ডাকিল। চারু আসিতেই বলিল—"চারু, এঁর বড্ড জ্বর হয়েছে, একটা কাগজে লিখে মনিয়ার হাত দিয়ে জগদীশ বাবুর কাছে এখনি পাঠিয়ে দাও।"

চারু চলিয়া গেল। নরেশ সুলতার হাতটি লইয়া নিজের বুকের উপর রাখিয়া বলিল, "সু, তোমার উপর বড় অন্যায় করেছি"—

বাধা দিয়া সুলতা নরেশের দিকে কাতর চক্ষে চাহিয়া বলিল, "আমি তোমার উপর বড় অন্যায় করেছি, তুমি আমাকে মাপ কর" বলিতে বলিতে সুলতার দুই চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। নরেশ বলিল, "না সু, তোমার দোষ নেই, আমার সব দোষ, আমাকে ক্ষমা করতে পারবে?"

"না না, ওকথা বলো না, আমিই তোমার উপর অন্যায় সন্দেহ করে তোমাকে কত কষ্ট দিয়েছি আর নিজেও মনে মনে দগ্ধ হয়েছি, আমায় মাপ কর।"

"তোমার কিছু দোষ নেই সু; সমস্ত বুদ্ধিমতী রমণী এ অবস্থায় যা করে তুমিও তাই করেছ, নিজের স্বামীকে অন্য স্ত্রীতে আসক্ত জানতে পেরে প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর মত তাকে প্রাণপণে ফেরাতে চেষ্টা করেছ,কিন্তু শোন সু,আজ তোমায় আমার সব কথা বলব। যখন আমি ডাক্তারী পড়ি, আমার মা বিয়ে দিয়েছিলেন একটি ন বছরের বালিকার সঙ্গে। ছোট মেয়ে আমি মোটেই পছন্দ করতাম না, আপত্তিও অনেক করেছিলুম; কিন্তু মা শোনেন নি, বিয়ের পরদিন আমাদের বাড়ী এসে যখন সেই বালিকা অবিশ্রান্ত কাঁদতে লাগল তখন আমি আরও চটে গেলাম; তারপর দুদিন রেখেই মা তাকে পাঠিয়ে দিলেন, আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম আর তাকে জীবনে আনব না। তারপর আমিও ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম মাও মারা গেলেন। আমি তার খোঁজ খবর নিলাম না; মা থাকতে তাকে দু চারবার আনবার চেষ্টা করেছিলেন আমি আনতে দিই নি। তারপর পাছে তারা আমার খোঁজ করে, আমার কাছে তাকে দিয়ে যায়, সেইজন্যে বিদেশে চাকরী নিলাম, তারপর যা যা হয়েছে সব তুমি জান।"

সুলতা সবিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে নরেশের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তাঁদের বাড়ী কোথায়, ঠিকানা কি বল, আমি তাঁকে আনাব।"

নরেশ একটু থামিয়া বলিল, "সু, তোমার মনে আছে বোধ হয় একদিন চারুকে তুমি বলেছিলে 'এমন লক্ষ্মী প্রতিমা যে ত্যাগ করেছে তার মত পাষণ্ড আর নেই, সেই পাষণ্ড আমি সু, তোমার স্বামী।"

"কি করে তুমি জানলে বল? কেন আমাকে এতদিন লুকোলে?"

"যেদিন চারুর মার মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিলেম, প্রতিবেশীরা অন্তিম কাজ শেষ করে পরস্পর বলাবলি কচ্ছিল। তারপর একদিন নিরিবিলিতে চারু একখানি ফটো একমনে দেখছিল, হঠাৎ আমি সেখানে গিয়ে পড়ি,কিন্তু সে ফটোখানি দেখতে এত তন্ময় হয়ে গিয়েছিল যে আমার আগমন জানতে পারে নি, দেখলাম সেখানি তারই পাষণ্ড স্বামীর প্রতিমূর্ত্তি। তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আসতে মা তাদের দেখবার জন্য দিয়েছিলেন। এখন বল সু আমাকে ক্ষমা করতে পারবে কি? আমি তোমার অযোগ্য স্বামী, তোমার অটল গভীর প্রেমের কাছে প্রবঞ্চনা করেছি।"

"ওগো আর বলো না, আমি যে পাপ করেছি তার তুলনা নেই, বিনা দোষে সতীলক্ষ্মীর মনে কষ্ট দিয়েছি,তাকে ভৎসনা করেছি, স্বামী দর্শন থেকে বঞ্চিত করেছি।" বলিতে বলিতে সুলতা দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল, "চারু, চারু, দিদি আমার, আমাকে মাপ কর" বলিয়া চারুর দুটি হাত আপন হাতে লইয়া কাতর স্বরে বলিল, "চল্ দিদি চল, তোর স্বামী তুই নিবি চল, অজ্ঞানতাবশতঃ তোর মনে যে কষ্ট দিয়েছি সেই পাপে বুঝি আজ স্বামী হারাতে বসেছি, মাপ কর ভাই দিদি আমার।"

"দিদি, স্বামী তোমার, আমি তোমাদের দাসী হয়ে—"

বাধা দিয়া সুলতা ব্যাকুল ভাবে বলিল, "না না চারু, স্বামী তোর। আমার একার সাধ্য নয় ওকে বাঁচাতে। আমরা দুটি বোনে পাশাপাশি বসে সেবা করবো". বলিয়া সুলতা তাহার হাত ধরিয়া গৃহের মধ্যে লইয়া গেল, "নরেশ

অচৈতন্য অবস্থায় বিছানার উপর পড়িয়াছিল ; চারু ও সুলতা অত্যন্ত যত্নের সহিত তাহার জ্ঞান সম্পাদন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। যথা সময়ে ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া গেলেন, বলিলেন "অত্যন্ত মানসিক চিন্তায় এই রোগ হয়েছে, ভয় নেই তবে সারতে একটু সময় লাগবে।"

৪

একচল্লিশ দিনের পর নরেশ সম্পূর্ণ সুস্থ হইল। ডাক্তার জগদীশ বাবু আসিয়া বলিলেন, "আর ভয় নেই, আজ আপনি পথ্য করতে পারেন।"

সুলতা ধন্যবাদ দিয়া বলিল, "আপনার অনুগ্রহেই এবার ইনি জীবন পেয়েছেন।"

নরেশ ঈষৎ হাসিয়া সুলতার পক্ষ সমর্থন করিল।

ডাক্তার চৌধুরী হাসিয়া বলিলেন, "না ডাক্তার রায়, আপনাদের ধন্যবাদ আমি পেতে পারি না, যদি কারুর অধিকার থাকে ত ইনি, এঁরই অত্যধিক যত্ন ও অবিশ্রান্ত সেবায় আপনি জীবন লাভ করেছেন।"

চারুর দিকে চাহিয়া সুলতার দুই চক্ষু কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। চারু আরক্ত বদন নত করিল।

*   *   *

ডাক্তার চৌধুরীর পরামর্শানুসারে নরেশ সকলকে লইয়া ওয়াল্টেয়ারে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আজ পাঁচ দিন হইল আসিয়াছে। চারু ও সুলতাকে লইয়া দুবেলা প্রাতঃভ্রমণ ও বৈকালিক ভ্রমণে বেশ আনন্দের সহিত তাহার দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছে ; সহসা সুলতা আসিয়া বলিল, "আজ আমার শরীরটা ভাল নেই চারু, আজ তুই একলা ওঁর সঙ্গে যা, আমি যাব না।"

ব্যস্ত হইয়া চারু বলিল, "কেন যাবে না দিদি, কি অসুখ হচ্ছে ?"

সুলতা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "না অসুখ কিছু হয়নি, শরীরটা একটু ভার ভার মনে হচ্ছে।"

"তবে উনি আজ একলাই একটু বেড়িয়ে আসুন, বেশী দূরে যেতে বারণ করে দাও দিদি, আমি তোমার কাছে থাকি।"

"তা কি হয় চারু, ওঁর দুর্ব্বল শরীর, একলা কি যাওয়া ভাল, আর আমার তেমন কিছু হয় নি, তোর কিছু ভয় নেই।"

অনেক বাদানুবাদের পর শেষে চারু চুপ করিয়া রহিল কিন্তু তবুও তাহার ভিতর কেমন একটা সঙ্কোচ, লজ্জা, ভয় আসিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। তাহার জীবনে সে মোটে দুই দিন মাত্র নরেশের সঙ্গ লাভ করিয়াছিল, তাহাও তখন সে নিতান্ত বালিকা ; নরেশের দিকে ভয়ে চাহিতেই পারে নাই। তারপর দীর্ঘ বার বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে সে স্বামী কেমন তাও দেখে নাই, তার কৈশোর যৌবনের সন্ধিস্থলে যখন মনোবৃত্তিগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল তখন সে একটা কিসের বেদনা অনুভব করিল। এক দারিদ্রতার অভাব ও মাতার রোগের সেবায় আপনাকে ব্যাপৃত রাখিল, তবুও মাতার দীর্ঘশ্বাস তাহাকে মধ্যে মধ্যে ব্যাকুল করিয়া তুলিত, তখন সে নির্জ্জনে নিভৃতে গিয়া নরেশের ছবিখানি দেখিত, আর মনে মনে ভাবিত "আমি ত এঁর যোগ্য নই, ভগবান তাঁকে সুখী করো"—আবার অতি সন্তর্পণে ছবিখানি একবার আপন মাথায় ঠেকাইয়া অতি যত্নের সহিত তুলিয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে রুগ্ন মায়ের সেবায় আপনাকে নিয়োজিত করিত। শেষদিন—যেদিন চারু এখনও ভাবিতে পারে না—ধীরে ধীরে যখন সেই দিন আসিয়া পড়িল, তখন সে আর আপনাকে স্থির রাখিতে না পারিয়া, সুলতার নিকট ছুটিয়া গিয়াছিল, কারণ সে এক মাস ধরিয়া ফেলির মার মুখে শুনিতেছিল তাদের বাড়ীর নিকটেই না কি একজন ভাল ডাক্তার সস্ত্রীক আসিয়া বাস করিতেছেন, সে শত চেষ্টা করিয়াও মাকে ভাল ডাক্তার দেখাইতে পারে নাই।

সংসারের সকল কর্ম্ম সারিয়া রুগ্ন মায়ের সেবা করিয়া যেটুকু সময় পাইত তাহাতে সে যা তু একটা শিল্প তৈয়ার করিত, তাহা ফেলির মাকে দিয়া বিক্রয় করিয়া এবং মধ্যে মধ্যে ঘটি বাটি বিক্রয় করিয়া যাহা পাইত তাহাতে কায়-ক্লেশে পীড়িতা মায়ের পথ্য করিয়া নিজে কোনদিন এক-বেলা অর্দ্ধাহারে বা অনাহারে থাকিয়া যাহা কিছু বাঁচাইত তাহাতে নিকটের একটি কম্পাউণ্ডার কালীবাবুকে ডাকিয়া মায়ের চিকিৎসার খরচ চালাইত।

শেষদিন মায়ের সংজ্ঞাশূন্য অবস্থা দেখিয়া সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া বড় আশাতেই সুলতার নিকট ছুটিয়া গিয়াছিল।

তারপর যখন সুলতা তাকে আপন স্নেহের নীড়ে টানিয়া লইল এবং দেশ বিদেশে তাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য লইয়া ফিরিতেছিল সেই সময় একদিন হঠাৎ নরেশের মুখের দিকে চাহিয়া তার সেই পূর্ব্ব স্মৃতি জাগরিত হইয়া উঠিল, সমস্ত জীবন ধরিয়া যে অভাব তার প্রাণে জাগিতেছিল হঠাৎ যেন তাহা পূর্ণ হইয়া উঠিল, যে বৃক্ষ এতাবৎকাল শুষ্ক নিষ্প্রভ হইতেছিল হঠাৎ যেন তাতে নবীন পল্লবে মুকুলে সুশোভিত হইয়া উঠিল, অনুকূল পবন বহিতে লাগিল। প্রকৃতি আবার তার চক্ষে নূতন বেশ ধারণ করিল। কিন্তু সুলতা কি নরেশ পাছে কিছু মনে করে সেইজন্য সে কখনও ভাল করিয়া নরেশের মুখের দিকে চাহিত না, সর্ব্বদা দেখিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইত, তবুও সে ভাল করিয়া দেখিতে সাহস করিত না, আর যেদিন হইতে সে নরেশকে চিনিল সেইদিন হইতে আর অবাধে মিশিতে পারিল না, কেমন একটা লজ্জা, সঙ্কোচ ও ভয় আসিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল; মধ্যে মধ্যে নির্জ্জনে নরেশের পানে চাহিয়া দেখিত।

তারপর ক্রমে ক্রমে সে দেখিল নরেশেরও সর্ব্বদা কেমন একটা চিন্তান্বিত ভাব ও অন্যমনা, সুলতার সে সদানন্দ মুখে কি যেন একটা কাল রেখা পড়িয়াছে। সে আপনাকে সাবধান করিতে চাহিল কিন্তু কিছুতেই পারিল না, চাহিব না মনে করিয়াও সে আপনাকে স্থির রাখিতে পারিল না। নরেশের পদশব্দ শুনিবা মাত্র তাহার আয়ত চক্ষু যেন অভিপ্সীত দর্শনাশে আপনিই ছুটিয়া যায়, শত চেষ্টাতেও তাহাকে আয়ত্বে আনিতে পারিত না, আবার দেখিবামাত্রই আপনি নত হইয়া পড়িত।

তারপর একদিন যখন নরেশ তাহাকে নির্জ্জনে দেখিয়া চারু বলিয়া কি বলিতে গিয়াছিল, তখন সে যেন কি এক রকম হইয়া গিয়াছিল; নরেশের কথা এতটুকুও তাহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। সহসা সুলতাকে সেই গৃহে আসিতে দেখিয়া তাহার চমক ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। নরেশ কি রকম হইয়া হাতের নিকট হইতে কি একটা টানিয়া লইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

তারপর যখন সে সুলতার নিকট তিরস্কৃত হইল, তখন লজ্জিত হইয়া সর্ব্বদা নরেশের সঙ্গ হইতে আপনাকে যথাসাধ্য লুকাইয়া চলিত, কিন্তু তবুও যেন তার অবাধ্য মন বুঝিতে চাহিত না, চঞ্চল চক্ষু কি যেন খুঁজিত, সে প্রাণপণে সবলে আপনার সহিত যুদ্ধ করিয়া আপনি ক্ষত বিক্ষত হইত। নরেশের অসুখের সময় সুলতার সহিত তাহার সেবা করিতে পাইয়া আপনার ক্ষুধিত জীবন ধন্য মনে করিল, কিন্তু আজ আবার তাহার একি পরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত হইল! যখন সে সুলতার মুখে নরেশের সহিত একা বৈকালিক ভ্রমণের কথা শুনিল, কেমন একটা ভয় ও সঙ্কোচ আসিয়া তাহাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। সে একটা কি ভাবিতে ভাবিতে নিজ গৃহে চলিয়া গেল।

সুলতা চারুর দিকে চাহিয়া সস্নেহে মনে মনে বলিল, "অনেক দুঃখ পেয়েছ দিদি, তোমার স্বামী তোমাকে দেবো, একা আমি কখনই দখল করব না।"

৩

ভ্রমণ-বেশে সজ্জিত হইয়া নরেশ সুলতার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, "একি, অসময়ে শুয়ে আছ যে? কোন অসুখ করেনি ত?"

সুলতা বলিল, "আজ আমার শরীরটা তত ভাল নেই, তুমি চারুকে নিয়ে বেড়িয়ে এস।"

নরেশ সুলতার বিছানায় বসিয়া ব্যস্ত ভাবে বলিল, "কিছু অসুখ করে নি ত?" বলিয়া কপালে হাত দিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল।

সুলতা হাসিয়া বলিল, "কি রকম দেখলে?"

নরেশ গম্ভীর মুখে বলিল, "বোধ হয় জ্বর আসছে।"

সুলতা হাসিয়া বলিল, "না না ভয় নেই, জ্বর হবে না, তবে মাথাটা একটু ধরেছে। তুমি একটু বেড়িয়ে এস, ভাল হয়ে যাবে।"

নরেশ চিন্তিত মুখে বলিল, "না, আজ থাক।"

"না থাক নয়, চল আমিও যাই।" বলিয়া সুলতা শয্যা হইতে উঠিয়া পড়িল।

নরেশ ব্যস্ত ভাবে বলিল, "ওকি, উঠে পড়লে যে; না, না তুমি শুয়ে থাক।" খানিক পরে এক শিশি ঔষধ লইয়া আসিয়া কহিল, "এটা খেয়ে ফেল সু।"

সুলতা নরেশের দিকে চাহিয়া তাহার হাতে ঔষধ দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "বেশ, এর মধ্যেই যে অসুধ এসে পড়েছে।"

নরেশ গম্ভীর মুখে কহিল, "এটা আগে খেয়ে ফেল, তোমার জ্বর আসছে বেশ বুঝতে পাচ্ছি।"

সুলতা হাসিয়া বলিল, "না না, জ্বর হয়নি; আমার একটু কিছু হ'লে অমন ব্যস্ত কেন হও বল দেখি? অসুধটা আমার হাতে দিয়ে তুমি একটু বেড়িয়ে এস।"

"আগে খেয়ে ফেল আমি দেখি।"

সুলতা নরেশের হাত হইতে অসুধ লইয়া বলিল, "যাও, আর দেরী করো না।"

নরেশ চিন্তিত মনে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল। সুলতা বলিল, "চারুকে নিয়ে যাও।"

নরেশের প্রতি চাহিয়া সুলতা মনে মনে বলিল, "সর্ব্বস্ব আমার! আজ হতে আর আমি তোমায় একা অধিকার করব না, চারু ও আমি যেন পাশাপাশি তোমার চরণ সেবা করতে পাই, এই আশীর্ব্বাদ করো।"

নরেশ চারুর গৃহের সম্মুখে আসিয়া দেখিল চারু একটি কোণে বসিয়া কি ভাবিতেছে। নরেশ ডাকিল, "চারু এস একটু বেড়িয়ে আসি।"

লজ্জিত মুখে ধীরে ধীরে চারু বাহিরে আসিল।

দুই জনে পাশাপাশি চলিয়াছে, অথচ কাহারও মুখে কথা নাই। নীরব নিস্তব্ধ প্রকৃতি। নীরব দম্পতী যুগল আপন আপন চিন্তা করিতে করিতে চলিয়াছে, অনন্ত খোলা মাঠ—তার মাঝখানে আসিয়া নরেশ বলিল, "চারু আমার সে অপরাধটা ক্ষমা করেছ ত" বলিয়া চারুর একখানি হাত আপন হাতে টানিয়া লইল।

চারুর হৃদয় মধ্যে একটা তড়িৎ প্রবাহ ছুটিয়া গেল, সে আরক্ত মুখ নত করিল।

অস্তমিত সূর্য্যের অরুণ কিরণ আসিয়া চারুর মুখের উপর পড়িয়া বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। নরেশ তাহাকে আরও একটু নিকটে টানিয়া লইল ও আপনার একটি কম্পিত বাহু দিয়া তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিল। চারুর মাথা আপনি নত হইয়া নরেশের বক্ষের উপর পড়িয়া অজস্র অশ্রুধারে তাহা সিক্ত করিতে লাগিল।

অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় যাহা এতদিন ভিতরে ভিতরে প্রবাহিত হইতেছিল তাহা আজ একটুখানি খুঁড়িতেই বেগবতী রূপে নরেশের বক্ষস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল। নরেশ তাহার অশ্রুসিক্ত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া তাহার কুসুম তুল্য ওষ্ঠাধরে একবার চুম্বন করিয়া আপন বস্ত্র দিয়া তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিল। জীবনে এই আজ সে স্বামীর স্পর্শ পাইল।

ঝর্ণাধারার গান।

[শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্]

চল্ চল্ ও ভাই বেরিয়ে চল্!
ঝর্ণাধারার মতন ও তুই বেরিয়ে চল্।
ওরে যাত্রী! ঝর্ণাধারার মতন ও তুই বেরিয়ে চল্!
বাঁধন কেটে বাধা ঠেলে
সাগর পানেই বেরিয়ে চল্!
বহু দূরে যেতে হবে
মিল্‌বে তবে সাগর জল
ও তুই বেরিয়ে চল্
পথের মাঝেই কর্‌লে দেরী
ফল্‌বে কি রে কোনই ফল
দূরেই রবে সাগর জল!
সাগর জলেই আনন্দ তোর
নাইকো সেথায় কোথাও তল
চির-সুধার ধারা যে বয়
গভীর অচপল!
সেথায় ও তুই বেরিয়ে চল্
বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে চল্
তোর চলার পথে একুল ওকুল হোক শ্যামল
ওরে যাত্রী! সাগর পানে যাত্রা এ তোর হোক্ সফল॥

।

"মেঘনাদ বধ" কাব্যের সূচনা।

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম-এ, বি-এল]

মধুসূদন দত্ত যে কত বড় কবি 'মেঘনাদ বধ" কাব্যের প্রথম শ্লোক পাঠ করিলেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই কাব্য যে আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ্যময় রচনা তাহা সকলেই স্বীকার করেন। ইহার প্রথম শ্লোকে কবি যেরূপ শিল্প নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন তাহার তুলনা বঙ্গভাষার প্রাচীন বা আধুনিক কোনও কাব্যে পাওয়া যায় না। "মেঘনাদ বধ" কাব্য নাটকীয় ঘটনায় পূর্ণ। মধুসূদন প্রথম শ্লোকে তাঁহার কাব্যের প্রধান পাত্র-পাত্রীদের নাম সন্নিবেশিত করিয়াছেন। নামের তালিকা কবি সুন্দর ভাবে কাব্যের সূচনাতে বুনিয়া দিয়াছেন। বীরবাহু, রাঘবারি রাবণ, রাক্ষস-ভরসা ইন্দ্রজিত মেঘনাদ, উর্ম্মিলা বিলাসী লক্ষ্মণ ও দেবরাজ ইন্দ্র, এই কয়জনের সহিত পাঠকের পরিচয় করিয়া দিবার কারণ আছে। এতদ্দ্বারা কবি তাঁহার সুদীর্ঘ কাব্যের প্লট আভাসে আমাদিগকে জানাইয়া দিলেন। এতদ্ব্যতীত "মেঘনাদ বধ" কাব্যে বর্ণিত ঘটনাবলীর কাল নির্ণয় ও যে উপলক্ষে অভিনেতৃগণ কাব্যের আসরে দেখা দিতেছেন, তৎসম্বন্ধে পাঠককে অন্ধকারে রাখিয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। উচ্চ অঙ্গের কাব্য-রচয়িতারা যখন পৌরাণিক ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করেন, তখন তাঁহারা রোমান্টিকের আশ্রয় লইয়া পাঠককে কাব্যের শেষভাগে ঘটনাবলীর অকস্মাৎ বিকাশ দেখাইয়া বিস্ময়াভিভূত করিবার চেষ্টা করেন না। মধুসূদন যদি "মেঘনাদ বধ" কাব্যে রোমান্সকে প্রাধান্য দিতেন তাহা হইলে তাঁহার এই অমর কাব্যে সরলতা ও গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা দুরূহ হইত। যে কবি স্বর্গ ও নরকের চিত্র অঙ্কিত করিতে বসিয়াছেন, যিনি বীরত্বের স্বাধীনতার স্বদেশ-প্রিয়তার বার্ত্তা তাঁহার কাব্যের ছত্রে ছত্রে প্রচার করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছেন, দেবচরিত্র, মানবচরিত্র, রাক্ষসচরিত্র লইয়া যাঁহাকে কাব্যের নাটকীয় ঘটনাবলীর ক্রমবিকাশ দেখাইতে হইবে, তিনি রোমান্স লিখিবার প্রথা অনুসরণ করিলে "মেঘনাদ বধ" কাব্যকে মহাকাব্য রচনার প্রথানুযায়ী উৎকৃষ্ট শিল্পকলার আদর্শ রূপে কিছুতেই গড়িয়া তুলিতে পারিতেন না। শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেই যখন "মেঘনাদ বধ" কাব্যের আখ্যান ভাগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ তখন কাব্যের সূচনাতে সরল ভাবে ইহার বস্তু নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়াই উচিত। মধুসূদন এস্থলে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, অমর কবি কালিদাসও তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ মহাকাব্য "রঘুবংশ" লিখিবার সময় সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। "রঘুবংশে"র প্রথম কয়েকটী শ্লোকে কালিদাস সরল ভাবে বলিয়াছেন যে তিনি সূর্য্যবংশের নরপতিগণের বিবরণ তাঁহার কাব্যে লিপিবদ্ধ করিতেছেন। কালিদাস "রঘুবংশে" যে বাল্মীকিকে অনুকরণ করিয়া তাঁহার প্রতিভার বিকাশ দেখাইয়াছিলেন তাহা নহে। মধুসূদনও বাল্মীকিকে অনুকরণ করিয়া "মেঘনাদ বধ" কাব্য রচনা করেন নাই। অথচ মূল ঘটনা উভয়েই সংস্কৃত রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। বাল্মীকির উপর কলম ধরিয়া যুগে যুগে অসংখ্য কবি সংখ্যাতীত কাব্য ও নাটকাদিতে তাঁহাদিগের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন। দেশ কাল পাত্রভেদে, পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়া কবিরা মূল আদর্শকে নূতন পরিচ্ছদে কাব্যের আসরে অনেকবার খাড়া করিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা কাব্য-শিল্পে উৎকর্ষতা সম্পাদন করিয়াছেন তাঁহারা প্লট ও চরিত্র-চিত্রণের ভিতর দিয়া তাঁহাদের শিল্পের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন মাত্র কিন্তু মূল আদর্শকে মুছিয়া ফেলিয়া, অথবা রোমান্সের ছাঁচে ঢালিয়া তাহাকে সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করেন নাই। মধুকবি "মেঘনাদ বধ" কাব্যের অনেক স্থানে পাশ্চাত্য আদর্শকে অনুসরণ করিলেও এবং এই কাব্যের সূচনাতে তিনি আংশিক ভাবে সেই আদর্শে বন্দনাদির কারুকার্য্যে কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করিলেও তিনি প্রাচ্য কাব্যকলাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া প্রথম ও তৎপরবর্ত্তী শ্লোক-

গুলি রচনা করিয়াছেন, এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। সুবিখ্যাত সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র "সাহিত্য দর্পণে"র মতে বন্দনা ও বস্তু নির্দ্দেশ মহাকাব্যের সূচনাতে থাকা উচিত। মধুসূদন যে "সাহিত্য দর্পণে"র পক্ষপাতী ছিলেন তাহা তাঁহার একখানি পত্র হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসুকে তিনি লিখিয়াছিলেন,—"I wish you would take up the subject of criticism. Aristotle, Longinus, Quintilian, the Sahitya Darpan, Burke, Kames, Alison, Addison, Dryden, and a host of others, not forgetting old Blair's lectures or the German Schlegel." মধুসূদন যে "মেঘনাদ বধ" কাব্যের সূচনায় সাহিত্য দর্পণের উপদেশ পালন করিয়াছেন, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। তবে, তিনি যে মিল্টনকে অনুসরণ করেন নাই, এমন কথা আমরা বলি না। অমিত্র ছন্দের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট তাহার সন্ধান যে তিনি মিল্টনের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই, কিন্তু তাই বলিয়া যে তিনি মিল্টনের "প্যারাডাইজ লষ্ট" সম্মুখে রাখিয়া "মেঘনাদ বধ" কাব্যের সূচনা লিখিয়াছিলেন, একথা বলিবার কোনও কারণ নাই, এবং ইহার বিরুদ্ধে যে যথেষ্ট প্রমাণ আছে তদ্বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাইবে। এক্ষণে মধুসূদনের বিরুদ্ধে পুচ্ছগ্রাহিতা অভিযোগ সম্বন্ধে আরও কয়েকটী অসার যুক্তির উল্লেখ করা যাইতেছে।

কোনও কোনও সমালোচক বলেন যে মধুসূদনের উপর দান্তে ও ট্যাসো নামধারী দুই জন সুবিখ্যাত ইতালিয়ান কবির প্রভাব সমধিক। কাহারও মতে মিল্টনের "প্যারাডাইজ লষ্টে"র প্রতিধ্বনি "মেঘনাদ বধ" কাব্যের সর্ব্বত্র শুনিতে পাওয়া যায়। এমন কথাও অনেকে বলেন যে, মধুসূদন "মেঘনাদ বধ" কাব্যের কলেবর প্রস্তুত করিতে গ্রীক কবি হোমর ও লাটিন ভাষার অমর কবি ভার্জ্জিলের শিল্পকলার যতটা আশ্রয় লইয়াছেন তাহার তুলনায় তিনি মিল্টন, দান্তে ও ট্যাসোর নিকট যৎসামান্য ঋণী। মধুসূদন যে একাধিক পাশ্চাত্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনচরিত লেখকগণ সপ্রমাণ করিয়াছেন। গ্রীক ও লাটিন ভাষার উৎকৃষ্ট মূল কাব্যগুলিকে তিনি উত্তম রূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। দান্তের "ডিভাইনা কমেডিয়া" ও ট্যাসোর "জেরুসালেম লিব্রাটা" তিনি "মেঘনাদ বধ" লিখিবার পূর্ব্বে মূল ইতালিয়ান ভাষায় পাঠ করেন নাই; তাহাদের ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বাবুকে মধুসূদন একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—"I never read any poetry except that of Valmiki, Homer, Vyasa, Virgil, Kalidas, Dante (in translation), Tasso, (Do) and Milton. These কবিকুলগুরুs ought to make a fellow a first rate poet—if nature has been gracious to him." ইহা "মেঘনাদ বধ" কাব্য রচনার পূর্ব্ব সময়ের কথা। তাহা হইলে "মেঘনাদ বধ" কাব্যের সর্ব্ব প্রথম শ্লোক রচনা করিতে বসিয়া মধুসূদন কেবল মাত্র মিল্টনের আদর্শকে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার বিশেষ কোনও কারণ দেখা যায় না। এপিক বা মহাকাব্য শ্রেণীর কাব্য রচনার বিধি য়ুরোপীয় সাহিত্য-জগতে আরিষ্টটল সর্ব্ব প্রথম আবিষ্কার করেন। ইলিয়ড ও অডিসি প্রভৃতি প্রাচীনতম গ্রীক এপিক রচনার প্রণালী বিশ্লেষণ করিয়া আরিষ্টটল কাব্যালঙ্কার সম্বন্ধে উক্ত বিধি আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং "পোয়েটিকস্" নামক গ্রন্থে তাহা লিপিবদ্ধ করেন। আরিষ্টটলের ন্যায় লংগাইনাস ও কুইণ্টিলিয়ান কাব্যালঙ্কার শাস্ত্র-প্রণেতা। ভার্জ্জিল, দান্তে, ট্যাসো, মিল্টন, ইঁহারা সকলেই আরিষ্টটলকে কাব্য-রচনাক্ষেত্রে গুরুপদে বরণ করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া "ইনিড" "ডিভাইনা কমেডিয়া" "জেরুসালেম লিব্রাটা" ও "প্যারাডাইজ লষ্ট" যথাক্রমে রচনা করিয়াছিলেন। ইংরাজ সমালোচকগণের মতে মিল্টন নিজে গ্রীক কবি হোমর, লাটিন কবি ভার্জ্জিল, ইতালিয়ান কবি ট্যাসোর অনুকরণে "প্যারাডাইজ লষ্টে"র প্রথম শ্লোকগুলি রচনা করিয়াছিলেন। মধুসূদন যদি গ্রীক ও লাটিন সাহিত্যে পারদর্শিতা লাভ না করিতেন তাহা হইলে তিনি হয়ত 'প্যারাডাইজ লষ্টে"র রচনা-কৌশল অবলম্বন করিয়া "মেঘনাদ বধ" কাব্যের

সূচনা লিখিতে বাধ্য হইতেন। মধুসূদনের পত্র হইতে উদ্ধৃত ছত্রগুলি পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি যখন হোমর ভার্জ্জিল আরিষ্টটল লংগাইনাস ও কুইণ্টিলিয়ানের লিখিত মূল গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন, তখন কেবল মাত্র মিল্টনের "প্যারাডাইজ লষ্টে"র অনুকরণে তিনি "মেঘনাদ বধ" কাব্যের সূচনা লিখিয়াছিলেন, এই অনুমান সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এস্থলে হোমর ভার্জ্জিল মিল্টনের রচিত কয়েকখানি মহাকাব্যের সূচনা হইতে প্রথম শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিলে মধুসূদন কাহার নিকট কোন্ বিষয়ের জন্য কতটা ঋণী, অথবা সমালোচকগণের তথাকথিত অভিযোগের কোনও বিশেষ কারণ আছে কি না, তৎসম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ হইবে।

হোমরের "ইলিয়ড"

"Achilles' wrath to Greece the direful spring,
Of woes unnumber'd, heavenly goddess, sing!
That wrath which hurl'd to Pluto's gloomy reign
The Souls of mighty chiefs untimely slain,
Whose limbs, unburied on the naked shore,
Devouring dogs and hungry vultures tore;
Since great Achilles and Atrides strove,
Such was the sovereign doom, and such the will of Jove!
Declare, O Muse! in what ill-fated hour
Sprung the strife, from what offended power,
Latona's son a dire contagion spread;
And heep'd the camp with mountains of the dead.
The king of men his reverened priest defied;
And for the king's offence, the people died."

(কবি পোপ কর্ত্তৃক অনুদিত)

হোমরের "অডেসি"।

"The man for wisdom's various acts renown'd,
Long exercised in woes, O Muse, resound;
Who, when his arms had wrought the destined fall
Of sacred Troy, and razed her heaven-built wall,
Wandering from clime to clime, observant stray'd,
Their manners noted, and their states survey'd,
On stormy seas unnumber'd toils he bore,
Safe with his friends to gain his natal shore:
Vain toils! their impious folly dared to prey
On herds devoted to the god of day;
The god vindictive doom'd them never more
(Ah, men unbless'd!) to touch that natal shore.
Oh, snatch some portion of these acts from fate,
Celestial Muse! and to our world relate."

(কবি পোপ কর্ত্তৃক অনুদিত)

ভার্জ্জিলের "ইনিড্"।

"Arms and the Man I sing, who, forced by Fate,
And haughty Juno's unrelenting hate,
Expelled and exiled, left the Trojan shore:
Long labours, both by sea and land, he bore,
And in the doubtful war, before he won
The hatian realm, and built the destined town,
His banished Gods restored to rites divine,
And settled sure succession in his line,
From whence the race of Alban fathers come,
And the long glories of majestic Rome.
O Muse! the causes and the crimes relate,
What Goddess was provoked, and whence her hate:
For what offence the Queen of Heaven began
To persecute so brave, so just a man,
Involved his anxious life in endless cares,
Exposed to wants, and hurried into wars!

Can heavenly minds such high resentment show,
Or exercise their spite in human woe ?"

(কবি ড্রাইডেন কর্ত্তৃক অনূদিত)

মিল্টনের "প্যারাডাইজ লষ্ট"।

"Of man's first disobedience, and the fruit
Of that forbidden tree, whose mortal taste
Brought death into the world, and all our woe,
With loss of Eden till one greater Man
Restore us, and regain the blissful seat,
Sing, heavenly Muse, that on the secret top
Of Oreb or of Sinai, didst inspire
That shepherd, who first taught the chosen seed
In the beginning how the heavens and Earth
Rose out of chaos :"—

মিল্টনের "প্যারাডাইজ রিগেণ্ড"।

"I who erewhile the happy Garden sung
By one man's disobedience lost, now sing
Recovered Paradise to all mankind,
By one man's firm obedience fully tried
Through all temptation, and the Tempter foiled
In all his wins, defeated and repulsed,
And Eden raised in the waste wilderness."

"প্যারাডাইজ রিগেণ্ডে"র এই শ্লোকের প্রথম ছত্রে মিল্টন "প্যারাডাইজ লষ্টে"র বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। কোনও কোনও সমালোচকের মতে ভার্জিল "ইনিডে"র সূচনায় উদ্ধৃত শ্লোকের পূর্ব্বে তাঁহার রচিত "বিউ-কলিক্স" ও "জর্জ্জিক্স" নামক দুইটী রচনার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন,—

"I, who before, with shepherds in the groves,
Sung to my oaten pipe their rural loves,
And issuing thence, compelled the neighbouring field
A plenteous crop of rising corn to yield,
Manured the glebe, and stocked the fruitful plain
(A poem grateful to the greedy swain)"—

(অনুবাদ)

মিল্টন "প্যারাডাইজ লষ্টে"র তৃতীয় সর্গে 'মিউজ' বা বাগ্দেবীর পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। সপ্তম সর্গের সূচনায় তিনি ইউরেনিয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—

"Descend from Heaven, Urania, by that name
If rightly thou art called, whose voice divine
Following, above the Olympian hill I soar,
Above the flight of Pegasean wing !"

এইবার "মেঘনাদ বধ" কাব্যের সূচনায় মধুসূদন যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

প্রথম সর্গ।

"সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি,
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি ? কি কৌশলে, রাক্ষস-ভরসা
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে—অজেয় জগতে—
ঊর্ম্মিলা-বিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা ?
বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি ! যেমতি মাতঃ বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে, গহন কাননে,
ক্রৌঞ্চবধূ-সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি !
কে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে ?
নরাধম আছিল যে নর নরকুলে
চৌর্য্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে,
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি !
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর

কাব্য-রত্নাকর কবি! তোমার পরশে,
সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে!
হায়, মা, এহেন পুণ্য আছে কি এ দাসে?
কিন্তু যে গো গুণহীন, সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক। উর তবে, উর দয়াময়ি,
বিশ্বরমে! গাইব, মা, বীররসে ভাসি,
মহাগীত; উরি, দাসে দেহ পদছায়া।
—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

চতুর্থ সর্গ।

"নমি আমি, কবি-গুরু, তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি! হে ভারতের শিরঃ-চূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস;—রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে!
তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করি' দিবানিশি,
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে,
দমনিয়া ভব-দম দুরন্ত শমনে—
অমর! শ্রীভর্তৃহরি; সুরী ভবভূতি
শ্রীকণ্ঠ; ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি
ভারতীর, কালিদাস—সুমধুর-ভাষী;
মুরারি-মুরলী-ধ্বনি-সদৃশ মুরারি
মনোহর; কৰ্ত্তিবাস কৃত্তিবাস কবি,
এ বঙ্গের অলঙ্কার! হে পিতঃ, কেমনে
কবিতা রসের সরে রাজহংস-কুলে
মিলি' করি কেলি আমি, না শিখালে তুমি?
গাঁথিব নূতন মালা, তুলি' সযতনে
তব কাব্যোদ্যান-ফুল, ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা; কিন্তু কোথা পাব
(দীন আমি!) রত্নরাজী; তুমি নাহি দিলে,
রত্নাকর? কৃপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে।"

সাধারণভাবে তুলনা করিতে গেলে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি পাঠে মনে হয় যে, মধুসূদন পাশ্চাত্য কাব্যালঙ্কার শাস্ত্রের বিধি অনুসরণ করিয়া ভার্জ্জিল ও মিল্টনের ন্যায় হোমরের আদর্শে "মেঘনাদ বধ" কাব্যের সূচনা লিখিয়াছেন। আরিষ্টটলের প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে এপিক শ্রেণীর রচনা কাব্যের প্রারম্ভেই must plunge into *medias res* অর্থাৎ কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়ের অন্তরতম স্থানে প্রবেশ করিবে। হোমর হইতে আরম্ভ করিয়া মধুসূদন পর্য্যন্ত সকল কবিই এই নিয়ম রক্ষা করিয়াছেন। ইহাকে ক্লাসিক্যাল বা প্রাচীন ধরণের রচনা বলে। আধুনিক রোমাণ্টিক রচনায় ইহার বিপরীত পন্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে। মধুসূদনের "মেঘনাদ বধ" কাব্য পাশ্চাত্য হিসাবে এপিক কি না তদ্বিষয়ে অনেকে নানাপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে পাশ্চাত্যেরা কোন্ কাব্যকে এপিক বলেন, তাহার আলোচনা করা দরকার। তাঁহাদের মতে দুই শ্রেণীর এপিক য়ুরোপীয় কাব্য-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে—Epic of growth ও Epic of art. এই শ্রেণীবিভাগ দ্বারা বাল্মীকি ও হোমরকে প্রথম শ্রেণীর এপিক-লেখক বলা যাইতে পারে। এই হিসাবে ভার্জ্জিল ও মধুসূদন দ্বিতীয় শ্রেণীর এপিক লেখক। বাল্মীকি ও হোমরের যুগে প্রাচীনতম কাহিনীগুলি যাহা মুখে মুখে বা গায়কদিগের দ্বারা বহুকাল ধরিয়া প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল, সেগুলি অমিত প্রতিভাশালী কবিবিশেষ একত্র করিয়া একটি অখণ্ড সুবৃহৎ কাব্যের আকারে রচনা করিয়া দিলেন। সেইজন্য "রামায়ণ" ও "ইলিয়ড" Epic of growth.—ভার্জ্জিল ও মধুসূদন যথাক্রমে হোমর ও বাল্মীকির এপিক হইতে ঘটনাবিশেষ গ্রহণ করিয়া তাহাকে শিল্পনৈপুণ্যের সাহায্যে নূতন এপিকের আকারে সৃষ্টি করিলেন। সেইজন্য তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর এপিক-লেখক। তাহা হইলেও তাঁহারা পাশ্চাত্য এপিক রচনার নিয়মানুসারে তাঁহাদের রচিত কাব্যের পাত্র-পাত্রীদের মুখ দিয়া উক্ত গৃহীত ঘটনাবিশেষের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মধুসূদন সীতা ও সরমার কথোপকথনে মেঘনাদ বধের পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই

বিধি পালন করিয়াছেন। আরিষ্টটলের মতে এপিক শ্রেণীর কাব্যের আদি, মধ্য ও অন্ত সরলভাবে কাব্যের উদ্দেশ্য ও ঘটনাবলীর বর্ণন করিবে। মধুসূদন "মেঘনাদ বধ" কাব্যে এই নিয়ম বর্ণে বর্ণে রক্ষা করিয়াছেন। বাস্তবিক, সমগ্র "মেঘনাদ বধ" কাব্যখানি যেন এই নিয়মে এক সুরে বাঁধা হইয়াছে। ইতরতা ও হালকা ভাবব্যঞ্জক কথা আরিষ্টটলের প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে আলোচ্য কাব্যের কোনও স্থানে প্রকাশ পায় নাই। আরিষ্টটলের লিখিত পাশ্চাত্য কাব্যালঙ্কার শাস্ত্রের মতে মিল্টনের "প্যারাডাইজ লষ্ট" ও "প্যারাডাইজ রিগেণ্ড" ও দান্তের "ডিভাইনা কমেডিয়া" উক্ত দুইটী শ্রেণীর এপিকের কোনও শ্রেণীতে যে স্থান পাইতে পারে না তাহা একাধিক পাশ্চাত্য সমালোচক সপ্রমাণ করিয়াছেন। সুতরাং "মেঘনাদ বধ" কাব্যের প্রারম্ভে মধুসূদন "মিল্টনের আদর্শে বাগ্দেবীর বর্ণনা করিয়া তাঁহার কাব্যের বস্তু নির্দ্দেশ করিয়াছেন", মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত লেখক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। হোমর, ভার্জ্জিল, মিল্টন ও মধুসূদনের কাব্য হইতে উদ্ধৃত প্রথম শ্লোকগুলি মিলাইয়া পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, মধুকবি পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকদিগের বিধি অনুসরণ করিলেও তাহার অনুকরণে "মেঘনাদ বধ" কাব্যের সূচনা লেখেন নাই। সাহিত্য দর্পণের অনুজ্ঞার কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তাহা হইলেও, মধুসূদন যে সাহিত্য দর্পণের উপদেশ ষোল আনা অনুসরণ করিয়াছিলেন, এমন কথা বলিবারও বিশেষ কোন কারণ নাই। মধুসূদনের দিগ্বারণ সদৃশ অমিত শক্তিশালী প্রতিভা অন্ধের ন্যায় অনুসরণ বা অনুকরণ করিতে শিখে নাই। মধু-কবি পাশ্চাত্য ও সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য হইতে মাল-মসলা সংগ্রহ করিয়া "মেঘনাদ বধ" কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য অলঙ্কার শাস্ত্রের কথা ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার কবিরা কাব্যের প্রারম্ভে যে বন্দনা ও বস্তু-নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহা সকলেই জানেন। মধুসূদনের পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গভাষার কবি মুকুন্দরাম ও মাধবাচার্য্য প্রভৃতি চণ্ডীকাব্য রচয়িতারাও তাঁহাদের কাব্যের প্রারম্ভে বন্দনা ও বস্তু-নির্দ্দেশ করিয়া সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। মধুসূদন "মেঘনাদ বধ" কাব্য রচনা করিবার পূর্ব্বে হোমর, ভার্জ্জিল, ট্যাসো, দান্তে প্রভৃতি সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য এপিক কবিদিগের রচিত গ্রন্থ ও বাল্মীকি, কালিদাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম ও কবিকঙ্কণ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষার কবিদিগের গ্রন্থও পাঠ করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় "মেঘনাদ বধ" কাব্যের প্রারম্ভে মধুসূদন যে কোনও কবিবিশেষের আদর্শে বাগ্দেবীর বন্দনা ও বস্তু-নির্দ্দেশ করেন নাই, এই অনুমান সমীচীন বলিয়া মনে হয়!

এক্ষণে "মেঘনাদ বধ" কাব্যের সূচনা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা যাক। ছন্দ, ভাষা ও অলঙ্কারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া "মেঘনাদ বধ" কাব্যের সহিত মিল্টনের "প্যারাডাইজ লষ্টে"র তুলনা করিলে দেখা যায় যে, অমিত্র ছন্দের আদর্শের জন্য মধুসূদন মিল্টনের নিকট সর্ব্বতোভাবে ঋণী, কিন্তু যে ভাষায় "মেঘনাদ বধ" কাব্য রচিত তাহার সহিত "প্যারাডাইজ লষ্টে"র ভাষার তুলনা করা অসম্ভব। তবে, স্থূলভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, মিল্টনের ভাষায় গাম্ভীর্য্যের আধিক্য আছে। মিষ্টতায় মধুসূদনের ভাষা অতুল্য। গম্ভীরে-মধুরে "মেঘনাদ বধ" কাব্যের ভাষা বীর ও করুণ রসের আধার। মৌলিকতার হিসাবে মিল্টন ইংরাজি ভাষায় অমিত্র ছন্দের উৎকর্ষতা সম্পাদন করিয়াছেন মাত্র। মধুসূদন বঙ্গভাষায় অমিত্র ছন্দের প্রবর্ত্তক। মধুসূদন বঙ্গভাষার কাব্য-জগতে যে ছন্দের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সঙ্গীতে সমগ্র বঙ্গদেশের নাট্যশালা আজ মুখরিত। "মেঘনাদ বধ" কাব্যের সূচনায় শব্দ ও অর্থালঙ্কারের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, ভাবের পরিস্ফুটন ও রস সৃষ্টিতে মধুসূদনের শব্দগুচ্ছের তুলনা কাব্য-জগতে বিরল। "মেঘনাদ বধ" কাব্যের সূচনায় মধুসূদন একটীবার মাত্র পাশ্চাত্য অলঙ্কার শাস্ত্রের আশ্রয় লইয়া তৃতীয় ছত্রে লিখিয়াছেন, "কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি।" প্রথম ছত্রের প্রারম্ভে "হে দেবি অমৃতভাষিণি" না লিখিয়া কবি পাশ্চাত্য কাব্যকলার আদর্শে এস্থলে আনাষ্ট্রফি (Anastrophe) নামক বাক্যালঙ্কারবিশেষ প্রয়োগ করিয়াছেন। হোমর, ভার্জ্জিল ও মিল্টন এই বাক্যালঙ্কারবিশেষের পক্ষপাতী। তাঁহাদিগের

কাব্য হইতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মধুসূদন এই বাক্যালঙ্কারের জন্য কেবলমাত্র মিল্টনের নিকট ঋণী, একথা বলিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। মিল্টনের "প্যারাডাইজ লষ্টে"র সর্ব্বপ্রথম শব্দ অব্ (of) সম্বন্ধে ইংরাজ শব্দশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন যে, ইহা সম্বন্ধ-বাচক অব্যয় (preposition) কি ক্রিয়ার বিশেষণ (adverb) তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ("There has been some dispute among grammarians as to what part of speech *of* (the first word of the poem) ought to be considered. Some calling it a preposition, some considering it an adverb, being used to qualify the verb "sing" in l. 6. Some again make *sing of* a preposition verb governing *disobedience*"). এই শব্দের যে সার্থকতা আদৌ নাই তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বীররস-প্রধান "মেঘনাদ বধ" কাব্যের প্রথম শব্দ "সম্মুখ-সমরে" পাঠকের মানস-নেত্রের অদূরে একখানি জীবন্ত চিত্রের নক্সা অকস্মাৎ প্রকাশিত করিল। ইহার পরেই কবির অত্যাশ্চর্য্য শিল্প-কৌশলে নক্সা কত দ্রুত পরিস্ফুট হইয়া উঠিল! "পড়ি বীর চূড়ামণি" এই সুন্দর শব্দ-বিন্যাস পাঠকের চক্ষু ও কর্ণকে যুগপৎ অনুভূতিময় করিয়া ফেলে। মধুসূদনের অনুপ্রাস নিরর্থক নহে। "ড়" বর্ণের পুনরুক্তি বর্ম্মাচ্ছাদিত রাক্ষস বীরের প্রকাণ্ড মৃতদেহের পতন শব্দ অনুকরণ করিতেছে। দ্বিতীয় ছত্রে "চলি যবে গেলা যমপুরে" ছত্রের প্রথম শব্দ "বীরবাহু"র উচ্চারণ শেষ হইবার পর সামান্য বিরাম লইয়া এই বাক্যটী পাঠক ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিয়া থাকেন এবং তদ্দ্বারা ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে যে দীর্ঘ ব্যবধান আছে তাহার কথা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠে। "যমপুরে" শব্দটীতে কাব্যের শেষ ভাগে কবি যমপুরীর যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার বিষয় আমাদিগকে ইসারায় জানাইয়া দিলেন। বাস্তবিক, মধুসূদন "মেঘনাদ বধ" কাব্যে শব্দের পর শব্দ, বাক্যের পর বাক্য ও অনুপ্রাস-গুচ্ছ এমন নিপুণতার সহিত সাজাইয়াছেন যে, পাঠক আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলে সেগুলি আতসবাজীর ন্যায় একটির পর একটি ফাটিয়া গিয়া সুমধুর শব্দ-প্রবাহ ও মনোহর আলোকের ফোয়ারা ছুটাইয়া কবির চিত্রাবলীকে কর্ম্মময় জীবন্ত ইতিহাসে পরিণত করে।

"হে দেবি অমৃতভাষিণি"—কবি হিন্দুর বাগ্দেবী সরস্বতীকে সম্বোধন করিতেছেন। হোমর ও ভার্জ্জিল যে গ্রীক বাগ্দেবীকে সম্বোধন করিয়াছেন তাঁহার নাম মিউজ (Muse). গ্রীক পুরাবৃত্তে নয় জন মিউজ ভগ্নির কথা লিখিত আছে। তাঁহারা কাব্য, ইতিহাস ও বিভিন্ন কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। গ্রীক ও লাটিন কবিরা ইহাঁদের মধ্যে এপিক কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ক্যালিওপির (Calleope) উদ্দেশে তাঁহাদের রচিত মহাকাব্যের সূচনায় বন্দনা করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। মিল্টনের "প্যারাডাইজ লষ্টে"র মিউজের সহিত এই গ্রীক দেবীদের কোনও সম্পর্ক নাই। মিল্টনের মিউজ বাগ্দেবী নহেন। মিল্টন মিউজ শব্দটী গ্রীক পুরাবৃত্ত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। মিল্টন যে মিউজকে "প্যারাডাইজ লষ্টে"র সূচনায় বন্দনা করিয়াছেন তিনি খৃষ্টধর্ম্মের ঈশ্বর বা পবিত্র আত্মা (Holy Spirit) এবং তিনি বাইবেলের যুগে মুশা (Moses) ও দাউদকে (David) দৈববাণী শুনাইয়াছিলেন। মিল্টন তাঁহার মিউজকে মধুসূদন ও গ্রীক কবিদের ন্যায় দেবীরূপে কল্পনা করেন নাই। এরূপ অবস্থায় "মেঘনাদ বধ" কাব্যের কবি মিল্টনের আদর্শে বাগ্দেবীর বন্দনা করিয়াছেন, এমন একটা সিদ্ধান্ত কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না। মধুসূদন প্রতিভার বলে নিজের কল্পনাকে পাশ্চাত্যের পাঠশালার শিক্ষা হইতে বিচ্যুত না করিয়াও তাহাকে হিন্দু ভাবসিক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি মিল্টনের মিউজকে উপেক্ষা করিয়া, গ্রীক, লাটিন ও ইতালিয়ান কবিদিগের মিউজের প্রতি বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া হিন্দুর বাগ্দেবী সরস্বতীর বন্দনা করিয়াছেন। হোমর, ভার্জ্জিল, মিল্টন, ইহাঁরা কেহই ভাষার দিক হইতে বাগ্দেবীর কল্পনা করেন নাই। মধুসূদনের বাগ্দেবী "অমৃতভাষিণী।" মিত্রাক্ষরের চির-পরিচিত, চির-অভ্যস্ত সঙ্গীতের আসরে কবিকে নূতন ছন্দে সঙ্গীত রচনা করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইবে। এই নূতন সঙ্গীত যাহাতে শ্রুতিসুখকর হয়, যে ভাষায় এই সঙ্গীত রচিত হইলে পাঠক ও শ্রোতার অন্তর বাহির সুমধুর কাব্যরসে ভরিয়া যায়

তাহাই কবি "অমৃতভাষিণী" বাগ্দেবীর নিকট যাচিয়াছেন। "অমৃতভাষিণী" শব্দটীর সার্থকতার বিষয় চিন্তা করিলে কাব্য-রসগ্রাহী পাঠকের মন বিস্ময় ও আনন্দে ভরিয়া উঠে। এমন সুন্দর ভাবে আর কোনও কবি কি বাগ্দেবীকে সম্বোধন করিয়াছেন ?

"কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে, ইত্যাদি"—ইহাই প্রথম সর্গের বর্ণনীয় বিষয়। "ইতি শ্রীমেঘনাদ বধ কাব্যে অভিষেকো নাম প্রথমঃ সর্গঃ।" রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বি-এ, এম-বি, কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত, সমালোচিত ও সম্পাদিত "মেঘনাদ বধ" কাব্যের টীকায় লিখিত আছে—"সংস্কৃত কাব্যাদির অনুকরণে কোন কোন প্রাচীন বঙ্গীয় কবিদিগের কাব্যেও সর্গশেষে সংস্কৃতে এইরূপ নামকরণ-প্রথা দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাব্য রাম-রসায়নেও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে এইরূপে নামকরণ করিয়া অধ্যায় শেষ করা হইয়াছে। আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে পুরুষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সেইজন্য "শ্রী" শব্দের ব্যবহার সার্থক। এই সর্গের নাম "অভিষেকঃ"—কারণ, মেঘনাদকে সেনাপতিত্বে অভিষেক করাই এই সর্গের মুখ্য উদ্দেশ্য।" "মেঘনাদ বধ" কাব্যের প্রথম সর্গের সূচনা ও শেষ যদি সংস্কৃত ভাষার আলঙ্কারিকদিগের অনুমোদিতই হয়, তাহা হইলে কেন যে মধুসূদনের অমর কাব্যকে পাশ্চাত্য এপিকের ছায়ারূপে সমালোচকগণ কল্পনা করিয়া থাকেন তাহার উত্তর দেওয়া কঠিন ব্যাপার। মধুসূদন "মেঘনাদ বধ" কাব্যের প্রথম সর্গ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বাবুকে লিখিয়াছিলেন,—"I have finished the First Book of Meghnad.......you shan't have to complain again of the un-Hindu character of the Poem." "রাঘবারি"=রাবণ। কবি প্রকারান্তরে রামচন্দ্র যে এই কাব্যের একজন পাত্র তাহা পাঠককে জানাইয়া দিলেন। তবে, কাব্যের নায়ক মেঘনাদ ও লক্ষ্মণের ন্যায় তিনি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নহেন। "কি কৌশলে"—এস্থলে কবি তাঁহার কাব্যের দ্বিতীয় বিশিষ্ট ঘটনার উল্লেখ করিয়া বাগ্দেবীর সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। যে কৌশলে লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ করিয়াছিলেন তাহার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের প্লট্ ঘনাইয়া উঠিয়াছে। "রাক্ষস-ভরসা"—সান্যাল মহাশয় টীকায় লিখিয়াছেন,—"'রাক্ষস-ভরসা' Iliad কাব্যের Hope of Troyএর সুন্দর অনুকরণ।" কেন ? যে কবি বঙ্গভাষার শব্দ-সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য শত প্রকারে শব্দ গঠন করিয়াছেন, তিনি কি হোমরের সাহায্য না লইয়া বহু প্রচলিত "ভরসা" শব্দটী "রাক্ষস" শব্দটীর সহিত জুড়িয়া দিতে পারিতেন না ? Hope of Troy-এর অনুকরণে লিখিত হইলে "লঙ্কার ভরসা" ইতি। ইন্দ্রকে জয় করিয়া মেঘনাদ রাক্ষসদিগের ভরসাস্বরূপ হইয়াছিলেন। সেইজন্য কবি লিখিয়াছেন, "রাক্ষস-ভরসা ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে।" ইহা আলোচ্য কাব্যের সূচনার বহু পূর্ব্বের কথা। হেক্টর অপর সকল বীরের মৃত্যুর পর Hope of Troy হইয়াছিলেন, কারণ তাঁহার পিতা প্রায়াম (Priam) বার্দ্ধক্য বশতঃ সে সময়ে যুদ্ধকার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বীরবাহুর মৃত্যুর পর লঙ্কার অবস্থা ট্রয়ের মত হয় নাই, কারণ ইন্দ্রজিৎ ব্যতীত স্বয়ং রাবণ তখনও জীবিত। মেঘনাদ রাবণ ব্যতীত লঙ্কার শেষ বীর বলিয়া কবি তাঁহাকে যে "রাক্ষস-ভরসা" বিশেষণে বিশেষিত করেন নাই, তাহার প্রমাণ কবির কথাতেই পাওয়া যায়। মেঘনাদ যে "অজেয় জগতে।" সেইজন্য তিনি লঙ্কার শেষ বীর না হইলেও চিরকাল রাক্ষসকুলের ভরসাস্বরূপ।

"ডাকি আবার তোমায়"—সমালোচকগণ বলেন যে, "তিলোত্তমাসম্ভব" কাব্যের সূচনায় কবি ইতিপূর্ব্বে সরস্বতীকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেইজন্য তিনি পরবর্ত্তী কাব্যে এই বাক্য লিখিয়াছেন। ভার্জ্জিলের "ইনিড্" ও মিল্টনের "প্যারাডাইস রিগেণ্ড" হইতে উদ্ধৃত শ্লোকেও উক্ত কবিদ্বয় এইরূপে মিউজকে দ্বিতীয়বার আহ্বান করিয়াছেন। যাঁহারা মধুসূদনের লেখনীর অনুকরণপ্রিয়তা দোষ খুঁজিয়া বেড়ান, তাঁহারা হয় ত বলিবেন যে বাঙ্গালী কবি এস্থলেও পাশ্চাত্য কবিদিগকে অনুকরণ, আর না হয় ত অনুসরণ করিয়াছেন। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, "তিলোত্তমাসম্ভব" কাব্যের কথা স্মরণ করিয়া মধুসূদন

এস্থলে "আবার" শব্দটী ব্যবহার করুন আর নাই করুন কিন্তু তিনি সরস্বতীকে সর্ব্বপ্রথমে "মেঘনাদ বধ" কাব্যে "অমৃতভাষিণী" বলিয়া সম্বোধন করিয়া কাব্যের আখ্যানভাগ সম্বন্ধে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিবার পর পুনরায় বিনয়সহকারে তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিয়াছেন, এই ব্যাখ্যা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কবি দেবীকে মাতৃ সম্বোধনে সরল-স্বভাব বালকের ন্যায় যে প্রকার আন্তরিকতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতে হয়। মধুসূদন নিপুণ শিল্পীর ন্যায় এস্থলে অবসর বুঝিয়া পৌরাণিক জগৎ হইতে বাল্মিকীর বরলাভের ঘটনাটী নিজের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত মিলাইয়া তাঁহার সানুনয় নিবেদন কবিত্ব-মণ্ডিত ভাষায় বাগ্দেবীকে জ্ঞাপন করিলেন। গুণহীন সন্তানের প্রতি জননীর স্নেহের উল্লেখ অতীব মনোহর। হোমর, ভার্জ্জিল, মিল্টন, ইহাঁদের কেহই বাগ্দেবীকে মা বলিয়া ডাকেন নাই। মধুসূদন খাঁটী বাঙ্গালী কবির হৃদয় এই কয় ছত্রের বর্ণে বর্ণে ঢালিয়া দিয়াছেন। আমরা "মেঘনাদ বধ" কাব্যের সূচনার প্রথম শব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া কবির সহিত যতই অগ্রসর হইতে থাকি ততই তাঁহার মনস্তত্বের সংবাদ লাভ করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হই। পাশ্চাত্য কাব্য-জগতের প্রসর ও নূতন ক্ষেত্রে মধুসূদন যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার মন রসিয়া উঠে। যাহার প্রতিভা আছে সে কখনও জ্ঞানের বোঝা লইয়া ঘরের কোণে বসিয়া মানব-জীবন কাটাইয়া দেয় না। মধুসূদনের প্রতিভা যখন কাব্যরসে-ভরা কবির মনকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময়ে বঙ্গভাষা পাশ্চাত্য জ্ঞানের আলোকে জাগিয়া উঠিয়া বঙ্গমাতার কৃতী সন্তানদিগের গদ্য ও পদ্যময় রচনায় নিজের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ভাণ্ডারটীকে পরিপূর্ণ করিতেছিলেন। মধুসূদনের কবিত্ব-প্রতিভা এই মাহেন্দ্র সুযোগে তাঁহার সংগৃহীত অমূল্য জ্ঞানরাশিকে বঙ্গবাণীর মন্দিরে কাব্যাকারে অর্পণ করিয়াছে। "মেঘনাদ বধ" কবির রচিত শেষ উৎকৃষ্ট কাব্য। ইতিপূর্ব্বে তিনি অমিত্র ছন্দে "তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য" রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্যে পাশ্চাত্যের প্রভাব অত্যধিক। কবির বন্ধুবর্গ ও সমালোচকগণ "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে"র দোষগুলি বাছিয়া বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। "মেঘনাদ বধ" কাব্য রচনা করিবার সময় মধুসূদনের বিচারশক্তি বৃদ্ধি পাওয়াতে, এই কাব্যের সূচনায় তিনি হিন্দুকবির ন্যায় বাগ্দেবীকে বন্দনা করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, স্বদেশ-প্রেমের যে স্বাস্থ্যকর হাওয়া এই সময়ে বঙ্গদেশে বহিতেছিল তাহার প্রভাব তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। বাস্তবিক, মধুসূদন এখন নিজের দেশকে, নিজের মাতৃ-ভাষাকে ও স্বদেশবাসীকে তাঁহার কবি-হৃদয়ের উচ্চতম আদর্শে প্রস্তুত "মেঘনাদ বধ" কাব্য অর্পণ করিয়া তাঁহার বৈচিত্র্যময় কবি-জীবনকে সার্থক করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি "মেঘনাদ বধ" কাব্যের সূচনায় শেষ শ্লোকে কল্পনা-দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—

> —"তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
> কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
> লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
> আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

মধুতে যেমন কোনও ফুলবিশেষের সৌরভ পাওয়া যায় না, মধুসূদনের আলোচ্য কাব্যেও সেইরূপ অপর কোনও কবির রচনার প্রভাব উপলব্ধি করা যায় না। অথচ, আমরা জানি মধুকরী সংখ্যাতীত ফুলবন হইতে বিন্দু বিন্দু করিয়া মধু সঞ্চয় করিয়াছে, মধুসূদনও অসংখ্য কবির পদ্যময় রচনা পাঠ করিয়া তাহা হইতে "মেঘনাদ বধ" কাব্য রূপ মধুচক্র রচনা করিয়াছেন। মধুসূদনের এই অত্যাশ্চর্য্য সৃষ্টিতে তিনি যে কল্পনা-দেবীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন তাঁহাকে হোমর, ভার্জ্জিল ও মিল্টন স্বপ্নেও দেখেন নাই। শেষোক্ত পাশ্চাত্য কবিত্রয়ের কোনও মহাকাব্যে কল্পনাদেবীর নাম গন্ধ নাই। এই সকল কারণে "মেঘনাদ বধ" কাব্যের সূচনা যে মধুসূদনের নিজস্ব তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

মধুসূদনের এই 'কল্পনা' ফ্যান্সি (Fancy) নয়। ফ্যান্সি অকিঞ্চিৎকর, অস্বাভাবিক ও ক্ষণস্থায়ী চিত্রাবলী প্রস্তুত করে। ফ্যান্সির কবি নিশ্চেষ্ট হইয়া যখন বসিয়া থাকেন তখন তাঁহার কল্পনা আপন মনে নাচিয়া কুঁদিয়া, গান গাইয়া,

উড়িয়া ফিরিয়া কবির চারিদিকে স্বপ্নময় দৃশ্য অঙ্কিত করিতে থাকে। এই দৃশ্যের মাঝে যে সকল নায়ক নায়িকা আবির্ভূত হয় তাহারা ফ্যান্সি-দূতীর কৃপায় নাচের পুতুলের ন্যায় অঙ্গচালনা করে। স্বপ্নরাজ্যের এই অলীক চিত্র ছায়াবাজীর ন্যায় পাঠকের মানস-পটে রেখাপাত না করিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। মধুসূদনের কল্পনার নাম ইমাজিনেসন (Imagination) এই শ্রেণীর কল্পনা অতি উচ্চদরের কবিতেই সম্ভবপর। ইহা কবিকে ইমেজেস্ (Images) বা সজীব চিত্র সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে। পাঠক কবির ইমাজিনেসন-প্রসূত জীবন্ত চিত্রের কার্য্যাবলী দেখিতে দেখিতে "আরব্য উপন্যাসে"র রাজ্যে উপস্থিত হয় না। "মেঘনাদ বধ" কাব্যের ঘটনা ও চিত্রাবলীতে কবির সৃষ্টি-ক্ষমতাই প্রকাশ পাইতেছে। এই সৃষ্টি-ক্ষমতা লাভ করিবার জন্যই মধুসূদন কল্পনাদেবীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। অলীক কল্পনার ন্যায় প্রজাপতি নানা ফুলের আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়ায় বটে, কিন্তু মধু আহরণ করিয়া মধুচক্র রচনা করিতে পারে না। যথার্থ কবি-কল্পনা মধুকরীর ন্যায় কবিকে জীবন্ত চিত্র প্রস্তুত করিতে সাহায্য করে। মধুসূদনের রচিত মধুচক্র আবার এক বিরাট ব্যাপার! কবি বাঙ্গালী জাতিকে তাঁহার রচিত মধুচক্রের সুধা "নিরবধি" পান করাইতে অভিলাষ করিয়াছেন। সেইজন্য তিনি "মেঘনাদ বধ" কাব্যের সূচনায় কল্পনা-দেবীকে এই বৃহৎ কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। মধুসূদনের চরিত্রে যে আন্তরিকতা ও বিনয় তাঁহার জীবন-চরিত লেখকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ এই সূচনায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। এতটা কবিত্ব-শক্তির অধিকারী হইয়া, এমন উচ্চাভিলাষ হৃদয়ের মধ্যে পোষণ করিয়া মধুসূদন "মেঘনাদ বধ" কাব্য লিখিতে বসিলেও কবিযশঃ-প্রার্থী অন্যান্য কবিদের ন্যায় তাঁহার অমর কাব্যের সূচনায় দাম্ভিকতাপূর্ণ আমিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। মধুসূদন বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার আশানুরূপ কাব্য রচনা করা একটুখানি ব্যাপার নহে। বাস্তবিক, "মেঘনাদ বধ" কাব্যে মধুসূদন যে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তাহা তিনি একদিনে লাভ করেন নাই। এমন কি, এই কাব্যের সূচনায় তাঁহার শিল্পের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহারও একটু ইতিহাস আছে। ক্রমশঃ।

প্রত্যাবর্ত্তন।

[শ্রীআশুতোষ ঘোষ]

"যাক্, আজ সমস্ত রেজেষ্ট্রী হয়ে গেল," বলে নবেন্দু তার আরাম-কেদারায় শুয়ে গড়গড়ার নলটা মুখে পুরে দিলে। তার স্ত্রী হেমলতা পাশেই একটা টেবিলে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে; তার সঙ্গেই নবেন্দুশেখরের কথা হচ্ছে।

হেমলতা—তা হ'লে প্রথম অভিনয় কবে হবে?

নবেন্দু—সে এখনও ৩।৪ মাস লাগবে। সরস্বতী পূজার দিন প্রথম অভিনয় হবে এই ঠিক হয়েছে।

শ্রীমান নবেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় পিতার অতুল সম্পত্তি এবং কয়লার খনির অধিকারী। পিতার মৃত্যুর পর সমস্ত কার্য্যই সে নিজে তত্ত্বাবধান করে, এবং এত অর্থের মালিক হইয়াও সে তাহার চরিত্র ও স্বভাব অটুট রাখিয়াছে। তবে, সখের মধ্যে শিক্ষিত বন্ধুদের লইয়া একটি সভা স্থাপন করে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে নাটক অভিনয় হইত। তাও খুব বাছা বাছা বই লইয়া, এবং বইয়ের ভাষা কাটিবার সময় সে যে সুরুচি সম্বন্ধে স্বায় গুরুদাসের প্রধান শিষ্য, সে বিষয়ে কাহারও মতভেদ ছিল না। সভা-গৃহে পাশা, তাস বা সঙ্গীত আলোচনাই হইত।

ছেলেবেলা থেকে পৈত্রিক কার্য্য তত্ত্বাবধান হেতু নবেন্দু যে খুব হিসাবী ও পাকা ব্যবসায়-বুদ্ধিযুক্ত তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিত। যখন ৪০ এর উপর বয়স হইল, তখন নবেন্দু মনে মনে স্থির জানে যে এতদিন

প্রলোভনের হাত এড়িয়ে মনটা এরকম শক্ত হয়ে গেছে যে, সে এখন স্বচ্ছন্দে আগুনের ভিতর দিয়ে যেতে পারবে।

ভগবান তৈলাক্ত মস্তকেই তৈল প্রদান কর্ত্তে ভাল বাসেন। নবেন্দুর স্ত্রী হেমলতা ও তার ভগ্নী স্নেহলতা দুজনে পিতার জমিদারীর অধিকারিণী, কারণ ভগবান তাহাদিগকে ভাই দেন নাই। পিতার জীবদ্দশায় হেমলতার পিসেমশায় এবং পরে ও এখন তার পিসতুতো ভাই গঙ্গাধর বিষয়ের তত্ত্বাবধান করে ও মাঝে মাঝে নবেন্দু পর্য্যবেক্ষণ ক'রে আসে। গঙ্গাধর অঙ্ক শাস্ত্রে এম, এ পাশ করার পর, তার মামা তাকে বিলাত পাঠাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু যখন কিছুতেই রাজি করতে পারেন নাই, তখন তাকে তাঁহার জমিদারীর কার্য্যেই বাহাল করেন ও তার মনের মতন পাঠাগার ক'রে দিয়ে তার পড়াশুনার সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন।

নবেন্দু কয়েকজন বন্ধু বান্ধবের উৎসাহে স্থির কল্লে যে লিমিটেড কোম্পানী ক'রে নূতন কায়দায় অনেক অর্থ লাগিয়ে যদি একটা থিয়েটার করা যায়, তা হ'লে লাভজনক হতেই পারে এবং দেশীয় নাট্যকলা সম্যক উৎকর্ষ লাভ করবে।

থিয়েটারের নাম হ'লো সেঞ্চুরী থিয়েটার লিমিটেড, ও তার মূলধন আপাততঃ দশ লক্ষ টাকা; ম্যানেজিং ডিরেক্‌টার মিঃ এন, বোনারজি। নবেন্দু একাই লক্ষাধিক টাকার সেয়ার কিন্‌লে।

পূজার কিছু পূর্ব্বেই কোম্পানী রেজেষ্টারী হ'য়ে গেল। সেয়ার সমস্তই ভিতরে ভিতরে বন্ধু বান্ধব ও জানাশুনা বড়লোকেরা কিনে নিলে। সেই রেজেষ্টারীর দিন রাত্রে স্ত্রীর সঙ্গে নবেন্দুর ঐ কথা হচ্ছিল।

হেমলতা জিজ্ঞাসা করলে—"নূতন রকম কায়দা ও অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারটা কি হবে শুনি। আমাদের জন্ত কিন্তু একটি ফিমেল বক্স রিজার্ভ থাকবে ও তার চাবী থাকবে আমার কাছে, তা বলছি কিন্তু।"

নবেন্দু—ওঃ এই শুধু! বন্দোবস্ত কি রকম হচ্ছে জান? শুনলে অবাক হয়ে যাবে। একাধারে থিয়েটার, বায়স্কোপ, সার্কাস, ম্যাজিক, জিমন্তাষ্টিক সব রকম থাকবে। থিয়েটারের সঙ্গে বায়স্কোপ মিশে যাবে। এই দেখনা আমাদের প্রথম বই হবে "মহম্মদ সা" একখানি ঐতিহাসিক নাটক।

মহম্মদ সা দিল্লীর সম্রাট ছিলেন জান বোধ হয়?

হেম—তা আমি কি করে জানবো?

নবেন্দু—আচ্ছা বেশ, তিনি একজন খুব বিলাসী ও সঙ্গীতপ্রিয় সম্রাট ছিলেন এবং সদারঙ্গ যিনি খেয়াল গানের সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি মহম্মদ সার সভার গায়ক ছিলেন। তা এই "মহম্মদ সা" বইখানিতে সদারঙ্গ সেজে পুরুষবেশে নামবে একজন বিখ্যাত ইংরাজ অভিনেত্রী ও গায়িকা। তাঁকে অনেক কষ্ট করে দেশী খেয়াল গান সেখান হচ্ছে। দেখবে, যে এই থিয়েটারে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমাবেশ হবে।

থিয়েটারের পাশে প্রকাণ্ড মাঠে একেবারে পাকা বাঁধান যায়গায় শীতকালে হবে সার্কাস, আর হবে স্কেটিং বা ম্যাজিক বা বক্সিং অর্থাৎ ঘুষোঘুসি খেলবার বন্দোবস্ত। কুস্তী প্রদর্শনীও প্রায়ই হইবে। আবার যখন কিছুই থাকবে না তখন স্বদেশী মেলা বসিয়ে দেওয়া হবে।

তারপরে কয়েকখান ট্যাক্সি গাড়ী থাকবে; দর্শকদের নিয়ে যাবে ও থিয়েটারের কাজে লাগবে ও অন্ত সময় ভাড়াও খাটবে।

মোটর গাড়ী থাক্‌লেই তার ঘন ঘন মেরামত দরকার, সেটা অন্ত জায়গায় না দিয়ে আমরাই মোটর মেরামতের কারখানা খুলছি, নিজেদের গাড়ী ত মেরামত হবেই ও অন্ত লোকের গাড়ীও মেরামত হবে।

তারপর থিয়েটার, সার্কাস বা বায়স্কোপের বিজ্ঞাপন; প্রোগ্রাম ইত্যাদিতে এত ছাপার খরচ হয় যে আমরা নিজেরাই একটা ছাপাখানা খুলবো। তাতে অন্ত কাজও পাওয়া যাবে, এবং যে সকল লেখকের বই থিয়েটারে প্লে হবে, তাদের সমস্ত বই আমাদের ছাপাখানায় ছাপাবার বন্দোবস্ত; বন্দোবস্ত কেন, একরকম বাধ্যই করা হবে। তারপর, থিয়েটার বা বায়স্কোপ ছবি তোলবার জন্ত যে রকম পোষাকের দরকার হয় তাতে একটা টেলারিং শাখা চমৎকার রকম চলে যাবে। নিজেদের পোষাক ছাড়া,

অভিনেতা অভিনেত্রী, লোকজন, বিশেষতঃ নাট্যকার বা লেখকদিগকে আমাদের টেলারিং দোকানে পোষাক পরিচ্ছদ করাতে বাধ্য করা হবে।

টাকা আদায় সম্বন্ধে কোন চিন্তাই নেই। অভিনেতাদের মাইনে থেকে কেটে নিলেই হবে, আর লেখকদের বই প্রে ও ফ্রি পাস, টাকা না দিলে বন্ধ।

এখন তোমাদের কি রকম মনে হলো? এর মধ্যে স্নেহ কখন ঘরে এসে গেছে ও মন দিয়ে সব শুনছে। সে মাঝে মাঝে কলিকাতায় তার দিদির কাছে বেড়াতে আসে।

নবেন্দু বল্লে—বিলাতী মেরিঅনেট্ দলটা কি বৎসর আসবে ব'লে লিখেছে।

হেমলতা—সেটা আবার কি?

নবেন্দু—সেটা হচ্ছে বিলাতী পুতুল নাচ; এমন চমৎকার যে একেবারে সজীব বলে মনে হয়, আবার তার ওপর গ্রামোফোনে কথা ও গানের দ্বারা এমন চমৎকার করেছে যে মনে হয় যেন পুতুলগুলো গান করছে ও কথা বলছে। তাদের সঙ্গে একটা বাৎসরিক বন্দোবস্ত করা হবে।

স্নেহ—সে আর কি দরকার ছিল, আপনারাই যে রকম নেচেছেন—

নবেন্দু—হ্যাঁ, এখন ঠাট্টা করছো, আর তখন রোজ দেখবার জন্য আমার খোষামোদ করতে হবে।

স্নেহ—ইস্, একটা ফিমেল বক্সের চাবী ত আমাদের কাছেই থাকবে।

নবেন্দু—শোন, আমাদের থিয়েটারটি হবে চারতোলা, সব উপরের তোলায় গ্যালারী, তিন তোলায় পুরুষদের বক্স ও দোতালায় মেয়েদের জায়গা, একতলায় বাকী সব সিট। উপরে উঠিবার জন্য আটটি লিফ্ট থাকবে। নীচে প্রত্যেক গদি-মোড়া চেয়ারের পেছনে ছোট ইলেক্‌ট্রিক আলো থাকবে, টিপ্‌লে বেয়ারা এসে যার যা দরকার তা দিয়ে যাবে।

এই রকম করে সরস্বতী পূজার দিন উপস্থিত। টিকিট ত বিক্রী হয়েছেই, তার উপরে এত ফ্রি পাশ দেওয়া হয়েছে যে লোকে লোকারণ্য। রীতিমত পুলিশ বন্দোবস্ত করতে হয়েছে। টিকিট ঘরের এমনি মজা যে রেলিংএর মধ্য দিয়ে একটি লোক যেতে পারে এবং টিকিট যন্ত্রে ১৲ টাকা ২৲ টাকা বা ৩৲ টাকা দিয়ে একটা হাণ্ডেল ঘুরিয়ে দিলেই যে শ্রেণীর দরকার সেই শ্রেণীর টিকিট বেরিয়ে আসবে। তবে যাদের ১৲ টাকার নোট বা ১০৲ টাকার নোট তাহাদিগকে বদল করে টাকা নিতে হবে। এ ছাড়া প্রোগ্রাম বিক্রী, অভিনেত্রীদের ছবি বিক্রী, থিয়েটারের নিজেদের দোকান থেকে, পান, চুরুট ইত্যাদি সব রকম জিনিসই বাজারের চাইতে চড়া দরে বিক্রী করা হইতেছে। সকল শ্রেণীর টিকিটেরই দাম বাড়ান হয়েছে। তবে সকল রকম আরামের উপর, চা এবং বরফ জল একেবারে ফ্রি। এতদ্ভিন্ন স্পেশ্যাল টিকিট করা হয়েছে সাজ ঘরের নিকট বা ষ্টেজের ভিতরে যাইবার জন্য, তার দাম প্রত্যেক খানি ৫৲ টাকা,—প্রথম রাত্রে এত স্পেশ্যাল টিকিট বিক্রী হয়েছিল যে তারপর ১০৲ টাকা দাম ধার্য্য করা হইবে স্থির হইল। প্রধান অভিনেত্রী সেজেছিল, মিস্ কিরণবালা। তার অভিনয়ের সময় ম্যানেজিং ডাইরেক্টর স্বয়ং পাশথেকে প্রম্পট্ (prompt) করিতেছিলেন, যাহাতে একটুও ত্রুটি না হয়।

সেদিন একাধারে থিয়েটার, বায়স্কোপ, ষ্টেজের উপর হাতী—তাহার সার্কাস ও মহম্মদ সার সভায় ম্যাজিক, পুরুষবেশে ইংরাজ অভিনেত্রী, লোকে কাণ্ড দেখে অবাক। আর কনসার্টের কোন বালাই নেই। শুধু মধ্যে মধ্যে যেখানে যেরূপ ভাব ও ভাষা তাহারি সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া মৃদু পিয়ানো বা অরগ্যান বা বেহালার বাজনা। বইখানি তিন অঙ্কে সমাপ্ত। প্রত্যেক অঙ্ক একখানি দৃশ্য-পটের সম্মুখে অভিনয় হইয়া গেল। বক্তৃতা খুবই কম। সব কথা দর্শককে চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে, তাঁদের বুদ্ধি বৃত্তিকে অপমান করবার ব্যবস্থা মোটেই নাই।

খবরের কাগজওয়ালাদের জন্য যেরূপ সুচারু ভোজ্য ও পেয় বন্দোবস্ত করা হয়েছিল এবং ডিস ভরা গোল্ডটিপ সিগারেট, তাহাতে তারা সকলেই যে এক কলম ভক্তি করে তার পরদিন থিয়েটারের জয় গান করবে তা জানাই ছিল,

এবং হলোও তাই। যদিও কাগজে লেখা হয়েছিল যে স্বয়ং লাট সাহেবের আসিবার সম্ভাবনা আছে কিন্তু তাঁর বদলে এসেছিলেন তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীর আফিসের দ্বিতীয় সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। তবে জম-জমাট রেখেছিল, পুলিশ, উকিল, ডাক্তার ও সাহিত্যিকের দল। অবশ্য সকলেই ফ্রি পাশে। প্রথম রাত্রে এঁদের আনাও দরকার, কারণ এঁরা রসজ্ঞ সুধী!

এই ভাবে কয়েক মাস থিয়েটার চলার পর নবেন্দুর প্রত্যেক রাত্রিতেই বিশেষ দেরী হইতে লাগিল। যদিও নবেন্দু তার মনটাকে অটুট বর্ম্মের আচ্ছাদনে আবৃত ভেবেছিল এবং হেমলতারও তাই ধারণা ছিল, কিন্তু নানারূপ অছিলার অবতারণায় দুই বোনে বিশেষ চিন্তান্বিতা হয়ে পড়লো। স্নেহ একটু অভিমানের স্বরেই বললে, দেখলে দিদি খোকার ভাতের দিন রাত্রে তোমার কর্ত্তাটী একটু সকাল সকাল আসতেই পা লেন না, তাঁর বন্ধুরা কত কি বলতে লাগলো। যতই তুমি বলতে লাগলে যে নিশ্চয়ই বিশেষ কাজে পড়ে গেছেন, ততই আমার রাগ হ'তে লাগলো।

হেম—তুই যা' মনে করিস, তা' কিন্তু আমার একটুও মনে হয় না, সে বিষয়ে আমি খুব নিশ্চিন্ত আছি।

স্নেহ—দেখে নিয়ো তুমি কিন্তু শেষে—নাট্যকলা, তার বিকাশ ইত্যাদি নিয়ে ঐসব দলের সঙ্গে মেলামেশা, প্রধান অভিনেত্রীর অত সুখ্যাতি, এসব আমার একটুও ভাল লাগে না।

তার পর দিন তারা গঙ্গাধরের স্মরণাপন্ন হইল। গঙ্গাধর তার বন্ধু সদানন্দকে গোয়েন্দার কাজে ব্রতী করলে।

দিন কয়েক পরে সদানন্দ খবর দিল যে, নবেন্দু বাবু ভয়ানক রকম মেতে গেছেন। ললিত-কলার উন্নতি কল্পে তিনি মিস্ কিরণকে এলেন্ টেরী করে তুলবেন ইহা তাঁহার স্থির বিশ্বাস এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি তার জন্য জলের ন্যায় অর্থ ব্যয় করিতেছেন, এবং ও অঞ্চলে বিশেষ রূপ সুনাম অর্জ্জন করা সত্ত্বেও তিনি পশ্চাৎপদ হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমাগত অনেকটা অগ্রসরই হইতেছেন, এবং মিস্ কিরণের শিক্ষাকল্পে, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী ও তার জন্য তিন তোলা বাড়ীর শেষ হ'তে আর বড় বেশী বিলম্ব নাই।

পরামর্শ-সভার প্রধান মন্ত্রী গঙ্গাধর সদানন্দের সাহায্যে যে মন্ত্রণা স্থির করলে, তাহা গ'ড়ে তুলতে ১০।১৫ দিনের বেশী সময় লাগেনি। মোট কথা, ব্যাপারটা যখন হেমলতা ও স্নেহলতাকে খুলে বলা হ'লো এবং বোঝান হলো যে এ কার্য্যের জন্য আপাততঃ হেমলতার বিশেষরূপ অর্থ ব্যয় সম্ভাবনা, তখন হেমলতা তাতেও সম্পূর্ণ রাজী হয়ে গেল। সদানন্দের এক বন্ধু ছিল সেয়ারের বাজারে একজন মস্ত দালাল। তাকে দিয়ে ঠিক করলে যে সেয়ারের বাজারে দিন কতক সেঞ্চুরী থিয়েটারের সেয়ারের খেলা করে তার দর বিশেষ রকম চড়িয়ে দেওয়া হবে।

কার্য্যেও করা হইল তাই। রোজই বাজারে সেঞ্চুরীর ক্রেতা প্রভৃত। ১০৲ টাকার সেয়ার চড়ে চড়ে ১৮৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠলো।

তখন ক্রমাগত সেয়ারের দালালেরা সেঞ্চুরী থিয়েটারের ডাইরেক্টার, ম্যানেজিং এজেণ্টকে ছেঁকে ধরলে, ক্রমাগত তাদের লোভ দেখাতে আরম্ভ কল্লে, শেষে সেয়ারের দাম যখন ২১৲ টাকায় গিয়ে উঠ্‌লো—তখন আর ডাইরেক্টার ও নবেন্দু লোভ সাম্‌লাতে পারলে না, তারাও সেয়ারের খেলা সুরু করে দিয়ে সেয়ার বেচতে আরম্ভ করলে। ক্রমাগত সেয়ারের ডিলিভারীও দিতে হ'লো। এই রকম করে এইচ্, এল, ব্যানার্জ্জী নামধারী একজন ক্রেতা অর্দ্ধেকেরও উপর অংশীদার অর্থাৎ সেয়ারের অধিকারী হয়ে দাঁড়ালো। থিয়েটারের কর্ত্তাদের বা নবেন্দুর সেয়ারের খেলার উন্মত্ততায়, কত সেয়ার যে বেরিয়ে গেছে, তার নিছক হিসাব দেখিবার অবসরই নাই।

এমন সময় একদিন থিয়েটারের অংশীদারগণের সাধারণ অধিবেশন। সমস্ত অংশীদারগণকে আহ্বান করা হয়েছে, কেউ বা নিজে এসেছে, কেউ বা আইন অনুসারে বদলী (proxy) এবং ভোট দিবার অধিকারযুক্ত লোক পাঠিয়েছে। অধিবেশনের একটি বিশেষ প্রস্তাব ছিল যে, ম্যানেজিং এজেণ্ট ৭৫,০০০ টাকা হিসাব দিতে পারিতেছেন না, সে টাকাটা একদিনের মধ্যে তাঁকে দিতেই হবে, কারণ তার দুই দিন পরেই হিসাব-পরীক্ষক হিসাব নিকাশ কর্ত্তে আস্‌বেন। হিসাব গোলমাল দেখ্‌লে

ডাইরেক্টর, ম্যানেজিং এজেণ্ট বা নবেন্দু কার হাতে যে দড়ি পড়বে তার ঠিক নেই। অতএব ডিরেক্টাররা নবেন্দুকে চেপে ধরলে যে তাঁকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৭৫,০০০ টাকা পূরণ কর্ত্তেই হবে।

তার পরই কথা উঠলো যে, নবেন্দুকে আর ম্যানেজিং এজেণ্ট রাখা হইতেই পারে না, এসম্বন্ধে সমস্ত অংশীদারের মত ও ভোট নেওয়া হউক। ভোট নেবার সময় দেখা গেল যে এইচ, এল, ব্যানার্জ্জীর অর্দ্ধেকের বেশী ভোট, কারণ তিনি অর্দ্ধেকের বেশী অংশের অংশীদার। তাঁরই proxy বা ভোট দিবার অধিকার প্রাপ্ত লোক প্রস্তাব করলে যে এইচ, এল, ব্যানার্জ্জীই ম্যানেজিং এজেণ্ট হইতে প্রস্তুত আছেন। তখন সেদিনকার সভায় নবেন্দুর হাত হইতে ম্যানেজিং এজেন্সী এইচ, এল, ব্যানার্জ্জীর হাতে চলে গেলো, এবং স্থির হ'লো যে, কালকের মধ্যে নবেন্দুকে ৭৫,০০০৲ টাকা দিতেই হবে।

সেদিন সভাভঙ্গের পর, রাত্রি ১১টার সময়ে নবেন্দু নেশাভিভূতের ন্যায় বাড়ীতে ফিরে এলো। অন্য স্থানে মুখ দেখান বা যাবার মত তার মনের অবস্থা একেবারেই নাই। সকাল সকাল সে আজ ৯ মাসের মধ্যে এক রাত্রিও আসতে পারেনি। এমন কি, নিজের ব্যবসায়ও ভাল করিয়া দেখিতে পারে নাই।

স্নেহর সঙ্গে প্রথমে দেখা হতেই সে জিজ্ঞাসা করলে—"কি রকম, আজ যে নটরাজের সকাল সকাল উদয়"।

নবেন্দু রসিকতা উপভোগ না ক'রে বল্লে, ডাকতো হেমকে শীঘ্রই। বলতে বলতে হেমের ঘরে গিয়ে উপস্থিত।

নবেন্দু—"ভয়ানক গোলমাল হয়েছে, হিসেব পত্র না দেখাতে, ৭৫,০০০৲ টাকার দাবী আমার উপরেই পড়েছে এবং সে টাকা কালকের মধ্যে না দিলে, জেল অবশ্যম্ভাবী। আজ অপমানের চূড়ান্ত হয়েছে। এজেন্সীটাও আজ ছেড়ে দিয়ে এলাম। যাক্‌গে, ওসব কি আর আমাদের পোষায়। কোন্ দিক দিয়ে কি যে লোকসান হ'তে আরম্ভ হ'লো তার ঠিক নেই। দেশের লোকগুলোও কি নেমকহারাম, বিপদের সময় বেশ করে আমার গলাটি চেপে ধরলে। যাক্, টাকাটার একটা কিনারা তোমাদের ত করতেই হবে।"

হেম বিশেষ কোন কথা, যেন চেষ্টা করেও কইতে পারলে না।

স্নেহ বল্লে, "এই কথা,—যে রকম মুখখানা ক'রে এসেছিলেন, আমার ত খুব ভয় হয়ে গিছ্‌লো।"

নবেন্দু—ক'দিন ধরে তোমাদের যে রকম ভাবগতিক দেখ্‌ছি, তাতে আমার বেশ মনে হয় তোমরা সকলেই আমাকে সন্দেহ করছ। বাস্তবিক, যে রকম ব্যাপার দাঁড়িয়েছে, তাতে এমন লোক নেই যে সন্দেহ করবে না। নাট্যকলার উন্নতিকল্পে মরীচিকার পিছনে পিছনে এতদূর গিয়ে পড়েছিলাম যে, মনে হ'ত মিস্ কিরণবালা আমাদের নাট্যমঞ্চের এলেন্ টেরী,—তাকে নিজে মহলা না দিলে কিছুতেই আমার মন উঠ্‌তো না, তার গান শিক্ষার সময় এমন কি তার বাড়ীতে পর্য্যন্ত গিয়ে বসে থাক্‌তে হ'তো। কি যে মায়ার জাল ফেলে অতগুলো টাকা তার বাড়ীর জন্য ক্রমে ক্রমে ধার করে নিলে, তা এখন বেশ বুঝ্‌তে পারছি। বেশ বুঝ্‌ছি যে কতদূর এগিয়ে পড়েছিলাম, যার জন্য আর্টের খাতিরে আমাকে বিশেষ অখ্যাতি নিতে হয়েছে।

স্নেহর ছেলের ভাতের রাত্রিতে, সেদিন শুক্রবার, পূর্ণ মহলা ছিল একখানা নূতন বইয়ের। তার পরদিনই প্রথম অভিনয় রজনী, কোন মতেই সকাল সকাল আস্‌তে পারলুম না। স্নেহ ত অভিমানে আমাকে কিছু বল্‌লেই না, কিন্তু হেম, তুমি কি রকম শুনিয়ে দিয়েছিলে মনে নেই?

হেম—'শুধু দেরী হওয়ার সম্বন্ধে ছাড়া আর কিছু কি বলেছিলাম?' বলতে বলতে মুখ নীচু ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

স্নেহ—'আপনার সম্বন্ধে বরাবর দিদিরও ঐ ধারণা যে নাট্যকলার খাতিরে আপনি অনর্থক অখ্যাতি অর্জ্জন করছেন, যা মনে করেন, তা হয়ওনি আর হবেও না, তখন বল্‌লেও বোঝেন নি, চোখ-বাঁধা ঘোড়ার মত ছুটেছিলেন। টাকার যে আপনার দরকার হবে এবং মেঘ ঘনিয়ে আস্‌ছে, তা আমরা জান্‌তে পেরেছিলুম। এই নিন্ ঐ সিন্দুকটার চাবী, দেখুন দিকি খুলে হয়তো কিছু

বেশী টাকাও হ'তে পারে। একখানা হ্যাণ্ডনোট লিখে টাকাটা নেবেন কিন্তু' ব'লে খুব একচোট হেসে নিলে।

নিতান্ত অপরাধীর মত নবেন্দু সিন্ধুকটা খুলে ক্রমাগত নোটগুলো গুণে নিতে লাগ্‌লো। গোণা শেষ হয়ে গেলে দেখ্‌লে নোটের থাকের নীচেই তার থিয়েটারের সেয়ার বাণ্ডিল করা রয়েছে। আলোতে পড়ে দেখলে যে, প্রত্যেকটাতেই নাম লেখা—এইচ, এল, ব্যানার্জ্জী। ইতি-মধ্যে হেম ও স্নেহ যে কখন ঘর থেকে সরে গেছে, নবেন্দু তাহা দেখিতেই পায় নাই। সে চেঁচিয়ে মুখ না ফিরিয়েই বলে উঠ্‌লো, "আমাদের থিয়েটারের এত সেয়ার এখানে কেন? আর এইচ, এল, ব্যানার্জ্জীর সেয়ারই বা এখানে কেন?"

যখন সে ফিরে তাকালে, দেখ্‌লে, যে হেম ও স্নেহর পরিবর্ত্তে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে গঙ্গাধর ও সদানন্দ মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্‌ছে। আর পাশের ঘর থেকে স্নেহ গান ধরেছে

"এস এস ফিরে এস, বঁধু হে ফিরে এস,
ওহে চঞ্চল, হে চিরন্তন, ভুজবন্ধনে ফিরে এস।"

ভুল-ভাঙা।

[শ্রীভক্তিসুধা হার]

সুন্দর মোর মন্দিরখানি
দেবতা সেথায় রাজে
কত শুচি প্রাণ নিত্য প্রভাতে
তুলি' ফুলদল আপনার হাতে
সাজাই তাঁহারে অতুল শোভায়
নিতি নব ফুল সাজে।

নিশীথ-স্বপনে তাঁহারি মূরতি
আমার নয়নে ভাসে
দিন কেটে যায় শুধু তাঁর ধ্যানে
তাঁরি গান গাই ব্যাকুল পরাণে
স্নিগ্ধ, মধুর, রূপের আলোক,
মনের আঁধার নাশে।

আজিও প্রভাতে উলসিত চিতে
গাঁথিয়া নূতন মালা
স্নান শেষ করি' সরোবর হ'তে
চলেছিনু এক নিরজন পথে
শুদ্ধ হৃদয়ে বহি' সযতনে
হস্তে পূজার থালা।

সেথা গিয়ে দেখি মন্দির মোর
অশুচি করিয়া হায়—
নীচ জাতি এক বিভোর পরাণে
রয়েছে মগন দেবতার ধ্যানে
তুলি' ফুলদল আপনার মনে
অর্পিছে দেব-পায়।

চমকিয়া উঠি চীৎকার করি'
কহিনু 'মূর্খ ওরে—
কি সাহসে তুই করিলি এ কাজ
অশুচি করিলি মন্দির আজ
বিঘ্ন ঘটালি পবিত্র পূজায়
পশি' দেবতার ঘরে।'

ভক্ত চাহিল উদার নয়ন
তুলিয়া আমার পানে
ললাটে তাহার দীপ্ত গরিমা
আননে নাহিক সরম-জড়িমা
ফুলের মতন শুভ্র পরাণ
ভীতি কভু নাহি জানে।

গম্ভীর স্বরে কহিল ভক্ত
মুগ্ধ করিয়া মন—
'পূজায় তোমার করিনি আঘাত
আমার পূজায় ঘটালে ব্যাঘাত
ভাব একবার, দেবতা কি শুধু
তোমারি পূজার ধন?'

নয়নে তাহার প্রশান্ত জ্যোতি
স্বর্গীয় প্রেমময়—
দেখিয়াছি যাহা পলকে পলকে
দেবতার ওই রূপের ঝলকে
আজি হেরি তাহা ভকত-নয়নে
গাহে হৃদি তাঁরি জয়।

নিমেষে টুটিল মিথ্যা-গরব
শিহরিল সারা মন
অন্তর মোর উঠে উথলিয়া
আঁখি আবরণ পড়িল খসিয়া
সত্য-আলোকে তারি মাঝে হেরি
আজিকে হৃদয়-ধন!

দেবতার লাগি গেঁথেছিনু মালা
পরানু কণ্ঠে তার—
কহিনু 'বন্ধু, লহ হৃদি মন
ভাঙিলে আমার মোহের স্বপন
ধ্যানের দেবতা পাইনু তোমাতে
লহ এ পূজার ভার।'

সংগ্রহ ও সঙ্কলন।

সর্পদংশনের ঔষধ।

একটী কিংবা দুইটী কলাগাছের মধ্যাংশটি (মাজ) পেষণ করিয়া, এক বাটি কিংবা দুই বাটি রস সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে সেবন করাইলে ঐ ব্যক্তি মৃত্যুমুখ হইতে অব্যাহতি পায়। সিংহলে এই ঔষধটি বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে এবং শতকরা ৯৪ জন তাহাতে আরোগ্য হয়। অধিকাংশ সর্প কলাগাছের তলায় থাকে না কিম্বা কলাগাছ দংশন করে না, এই তথ্যটি লক্ষ্য করিবার বিষয়।

গাঁজার কলিকাতে যে শক্ত কাল পদার্থ নীচে জমিয়া থাকে, তাহা জলে গুলিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তির দষ্ট স্থানের সমীপে চর্ম্ম ছিন্ন করিয়া টাট্‌কা লাল রক্তের সঙ্গে মিশাইয়া দিলেও ঐ ব্যক্তিকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করা যায়। দংশনের পর যত বিলম্ব হইবে, ততই দষ্ট স্থানের নিকট টাট্‌কা রক্ত পাওয়া যাইবে না; সে ক্ষেত্রে একটু দূরে চর্ম্ম ছিন্ন করিয়া ঐ পদার্থ রক্তে মিশাইয়া দিতে হইবে। হাজারীবাগের কোন বৈজ্ঞানিক, দংশনের বহুক্ষণ পরে এক নারীর সর্ব্ব-দেহে লাল রক্ত খুঁজিয়া না পাইয়া অবশেষে তাহার চোখের পাতার নীচে ঐ ঔষধ রক্তে মিশাইয়া দেন। তাহার পর দুই ঘণ্টার মধ্যেই ঐ নারীর চেতনা সঞ্চার হয়, সে এখনও সুস্থ দেহে বাঁচিয়া আছে। তৎপরে ঐ ঔষধটি আরও অনেক স্থানে পরীক্ষা করিয়া সাফল্য লাভ করা গিয়াছে।

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

—•—

দেহের দৈর্ঘ্য।

ব্যায়ামের অভাবে, দারিদ্র্যতার পীড়নে, জীবন সংগ্রামে ও বিশেষতঃ সামাজিক কারণে বাঙ্গালী জাতি দিন দিন বামন অবতার হইয়া যাইতেছে। সজীব জাতির ইহা লক্ষণ নহে, মরণোন্মুখ জাতিরই এই লক্ষণ। অপর দিকে দেখা যায় ইজিপ্টে তথাকার জাতি প৺৬ সহস্র বৎসর ধরিয়া একই অবস্থায় আছে, তাহাদের শরীরের গঠনের পরিবর্ত্তন হয় নাই কিম্বা তাহাদের দৈর্ঘ্যেরও পরিবর্ত্তন হয় নাই। অর্থাৎ এই জাতির এই দীর্ঘকালের মধ্যে শরীরের উন্নতি বা অবনতি হয় নাই। ইংরাজ জাতির শরীরে,

মুখের চেহারায় ও মস্তকের আকারে গত শতাব্দীর মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে। হলাণ্ড ও স্কাণ্ডিনেভিয়া দেশে দেখা যায় যে তথাকার লোকসকল দৈর্ঘ্যে বাড়িয়াছে। পুরাকালের লোকের কঙ্কালের দৈর্ঘ্যের সহিত তুলনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে তাঁহারা উপনীত হইয়াছেন। ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডবাসিগণেরও দৈর্ঘ্য গত চারি সহস্র বৎসর মধ্যে বাড়ে নাই।

—সঞ্জীবনী।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র।—জীবনচরিত—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, এম্-এ, F.S.S., F.R.E.S. বিরচিত।

অতীত ও বিস্মৃতির গর্ভে বঙ্গজননীর কত সুসন্তান ও একনিষ্ঠ সাধকের নাম যে প্রচ্ছন্ন আছে আমরা অনেকেই সে সংবাদ রাখি না। দুঃখের বিষয়, আমরা অনেকে সেই রথীদের নামও জানি না, যাঁহাদের আত্মশক্তি-নিয়োগের ফলস্বরূপ আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও রাজনীতি-ক্ষেত্রে এতটা অগ্রসর হইতে পারিয়াছি।

সেই নীরব কর্ম্মীদের অন্যতম পরলোকগত ভোলানাথ চন্দ্র। জীবনচরিতে আমরা তাঁহাকে আদর্শ পুরুষ বা মহাপুরুষরূপে চিত্রিত দেখিতে পাই না। তিনি একান্ত সাধারণ ভাবে, সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় দিনযাপন করিয়া গিয়াছেন। শুধু আত্মতৃপ্তির জন্য লোকনয়নের অন্তরালে, নির্জ্জনে বসিয়া জ্ঞানচর্চ্চা, সাহিত্য গঠন ও পাঠে তিনি নিমগ্ন থাকিতেন।

ভোলানাথ তদীয় সতীর্থ মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও রাজনারায়ণ বসুর ন্যায় বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করেন নাই—ইংরাজীতেই প্রবন্ধাদি রচনা করিতেন। বাঙ্গালা রচনায় তাঁহার অনুরাগ দৃষ্ট না হইলেও পাঠে তাঁহার অনুরাগ ছিল। কৃষ্ণকান্তের উইল ও মেঘনাদ বধ পুস্তকদ্বয় পাঠ করিয়া তিনি কোন নূতন জিনিষ শিক্ষা করিতে পারেন নাই, এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ভ্রমণবৃত্তান্ত ও জীবনচরিত রচনায় ভোলানাথ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। Englishman, Statesman, Calcutta Review, Mukerjee's Magazine, National Magazine, University Magazine প্রভৃতি নানা সংবাদ ও সাময়িক পত্র তাঁহার নানা বিষয়ের রচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিত। শেষোক্ত পত্রদ্বয়ে তিনি 'কলিকাতার ইতিহাস' ও 'সেকালের শিক্ষা প্রণালী' সম্বন্ধে যে বহুতথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত করেন তাহার বিশেষ মূল্য আছে। তিনি ৺দিগম্বর মিত্র মহাশয়ের জীবনচরিত রচনা করিয়া ৫০০০৲ টাকা পারিশ্রমিক পাইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত "ভারতবর্ষে শিল্প ও বাণিজ্য অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ" শীর্ষক প্রবন্ধটী Mukerjee's Magazineএ ধারাবাহিক পত্রস্থ হয়। এই যুক্তিতর্কপূর্ণ মনোজ্ঞ প্রবন্ধটী দেশে বিদেশে আন্দোলনের সৃজন করে এবং মনে হয় উহা হইতেই সর্ব্ব প্রথমে স্বদেশী-আন্দোলন ও বিদেশী সামগ্রী বর্জ্জনের বীজ উপ্ত হয়। গ্রন্থকার এই প্রবন্ধের উপসংহারের কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহা পাঠ করিলে মনে হয় কোনও আধুনিক Nationalist লেখক প্রবন্ধটী রচনা করিয়া মৃত মনীষীর নামে চালাইয়াছেন। দাসত্বের প্রতি বীতস্পৃহ হইলেও শুধু সাহিত্য-সাধনা তাঁহাকে অভাবের নিষ্পীড়ন হইতে অব্যাহতি দিতে পারে নাই। তাঁহাকে Union Bankএ চাকুরী লইতে হইয়াছিল। ১৮৪৭ খ্রীঃ অঃ ঐ ব্যাঙ্কটী ফেল হইবার পর কাশীপ্রসাদ ঘোষ-সম্পাদিত "হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার" পত্রে একটী গান প্রকাশিত হয়। পুরাতন সাহিত্য-হিসাবে গানটীর কিছু মূল্য আছে বলিয়া গ্রন্থকারের মত আমরাও উহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

(১)

"বিলাতে সিটন সাহেব যাইয়ে, কুইনের প্রতি ক্ষেদে কয়।
চৌনে এক্ষণে, হয়েছে ক্লাইন সমুদয়॥
শুন গো মহারাণী।
ইণ্ডিয়ার যে নিউস জানি।
লেটর খানি করে এনেছি ॥
চেতলার হাট, কেল্লার মাঠ।
চানকের মাঠ, চাঁদপালের ঘাট।
ওয়াক করেছি।
যত কলিকাতার ধনিগণ।
কাহার নাহিক ধন।
প্রায় সকলে ইন্সালবেণ্ট নিতেছে।
কুইন ভিক্টোরিয়া।
তোমার ইণ্ডিয়া।
কেবল নাম আছে।

(২)

সেতা ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক নাই।
কাকরেল নাই টালা নাই।
জলে জাহাজ নাই।
কেবল ছাতু নাটু ধুলায় পড়ে কাঁদতেছে।
নরসিংহ রাজা মাধব বাবু, হাপু গণ্‌তেছে।
ইন্সালবেণ্ট আদালতে।
গিস সাহেবের বিচারমতে।
সবাই তাতে ভর্ত্তি হতেছে॥
সুপ্রিম কোর্ট ব্যাঙ্ক নোট।
কেবল লোট লেগেছে চোট।
ওলট পালোট সহর হয়েছে।
যাদের আছে কিছু বিষয়।
তারা সব পেয়ে ভয়।
দেখে ডামা ডোল, বেনামী সব করতেছে।
কুইন বিক্টোরিয়া।
তোমার ইণ্ডিয়া।
কেবল নাম আছে।

(৩)

তোমার কলিকাতা মহারাণী গো, দেখে এলেম প্রতি স্থানে স্থানে
সাধের শ্যামবাজার, বড়বাজার।
চাঁদ্‌নির চক্, বহুবাজার আর শোভাবাজার।
দিনে অন্ধকার বেচা কেনা বিহীনে॥

(৪)

কার ঠাকুর বারলি করি আদি সব, সকলে দেউলে পড়েছে।
হাহাকার কলিকাতায়, প্রায় সব করতে লেগেছে।
ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক গেলো।
গুডোভা কতুর হলো।
পেঁচে পড়্‌ল কলিকাতারি লোক॥
অকস্মাৎ, কি আঘাৎ, বজ্রাঘাৎ।
ছাতুবাবু হলো কাবু, পেলে পুত্রশোক॥
একে প্রাণের শোক বড় শোক।
তায় আবার ধনের শোক।
রসের আশুতোষ নীরস হয়ে রয়েছে॥
কুইন বিক্‌টোরিয়া।
তোমার ইণ্ডিয়া।
কেবল নাম আছে॥"

৺ভোলানাথ ধর্ম্মপ্রাণও ছিলেন। তিনি বলিতেন,—"আমার বিশ্বাস, একজন স্রষ্টা আছেন, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন—এবং যাঁহার ইচ্ছা—আমরা চর্ম্ম চক্ষুতে তাঁহাকে দেখিতে পাইব না। তাঁহার কতকগুলি বিধি আছে, সেই বিধি-পালন করাই তাঁহার উপাসনা। এবং মানব হৃদয়ই তাঁহার প্রকৃত মন্দির। তাঁহার সৃষ্ট জীবগণকে ভালবাসাই তাঁহার পূজা করা। আমাদিগের আত্মা সেই পরমাত্মার একটী স্ফুলিঙ্গ মাত্র এবং তাঁহাতেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে।"

শেষ জীবনে ইংরাজী ভাষায় তিনি নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই:—(১) বঙ্গদেশের ইতিবৃত্ত (২) শেঠবংশের ইতিহাস (৩) রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত (৪) মহাপুরুষ প্রসঙ্গ—শিবাজী, নানক, রাণা সঙ্গ, প্রতাপাদিত্য, ভারতচন্দ্র ইত্যাদি (৫) ভারতীয় সংবাদ পত্রের ইতিহাস (৬) ভারতবর্ষের রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের ইতিহাস। ১৯১০ খ্রীঃ অঃ ৮৮ বৎসর বয়সে ভোলানাথ চন্দ্র পরলোকে গমন করেন।

এই গ্রন্থখানিকে শুধু জীবনচরিত মনে করিলে ভুল করা হইবে। ইহা ৺ভোলানাথ চন্দ্রের সমসাময়িক জীবনের বাঙ্গালাদেশের একখানি ক্ষুদ্র ইতিহাস। এই সময়ের রাজনীতি, শিক্ষার এবং সাহিত্যের প্রচার এবং তদানীন্তন শিক্ষিত ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তির অসংখ্য চিত্র সহ সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রন্থখানির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। কতকগুলি চিত্র, যথা, ভারতবর্ষের প্রথম ব্যারিষ্টার জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, তরুদত্তর পিতা গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, হিন্দুকলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডি. এল. রিচার্ডসনের হস্তাক্ষর প্রভৃতি পূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হইতে আমরা দেখি নাই।

যাঁহারা লঘু সাহিত্য পাঠ করিতে ভালবাসেন, গ্রন্থখানি তাঁহাদেরও ভাল লাগিবে। গ্রন্থকার যে অধ্যবসায়, পরিশ্রম, যত্ন ও অর্থ-ব্যয়ে গ্রন্থখানি রচনা ও প্রকাশ করিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস, সাধারণে তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া গ্রন্থকারের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন।

মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা।

কল্লোল। কার্ত্তিক—প্রথমই শ্রীযুক্ত সান্ত্বনা বসাকের 'ভাই-ফোঁটা' নামক গল্প। আখ্যানভাগ মামুলী, বিশেষত্ব বর্জ্জিত। বাঙ্গালী যুবকের সহিত বাঙ্গালী কিশোরীর বিবাহের সম্বন্ধ হয়। কুমারী নায়িকা তাহাতে অসম্মত! নায়ক অন্যত্র বিবাহ করেন এবং বিপত্নীকও হন। ফলে মনের দুঃখে সনাতন পথে অর্থাৎ দেশত্যাগে উদ্যত হইলে কুমারী-নায়িকা তাহার কপালে "ভাই-ফোঁটা" দিয়া কষ্টে সৃষ্টে তাহাকে দেশে আটকাইয়া রাখে। লেখক কল্পনার মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া এই সময়োচিত গল্প রচনা করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বিজয় সেনগুপ্তের 'আঁধি' গল্পে একরাশি অন্ধকারের মধ্যে একটী আলোর রেখা ফুটাইয়া একটী অনন্তের গোপন কথা বেশ নিপুণতার সহিত ফুটাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুকুমার ভাদুড়ীর 'রূপট' গল্প হিসাবে ব্যর্থ রচনা। শ্রীযুক্ত ভূপতি চৌধুরীর "মরুতৃষা" গল্পটী মোপাসার অনুবাদ। মন্দ নহে।

শ্রীযুক্ত প্রমথচৌধুরীর 'বীর পুরুষের লাঞ্ছনা' আখ্যায়িকা—উপভোগ্য।

'বেদের মেয়ে' একটি বেদের মেয়ের সহিত বাদশাহের পুত্রের প্রণয়-কাহিনী বিষয়ক গ্রাম্য কবিতা অবলম্বনে লিখিত। অতি সুন্দর রচনা।

"কল্লোল"—গল্পপ্রধান মাসিকপত্র। শুধু বাজে গল্পে কলেবর পূর্ণ করিয়া, বাজে কলরবে 'কল্লোল' সাহিত্যের কি কাজ করিবে ভাবিয়া পাইতেছি না। যদি ইহা গল্পপ্রধানই করিতে হয়, তাহা হইলে প্রতিমাসে অন্ততঃ ২।১টী প্রথম শ্রেণীর ছোট গল্প দিলে সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করা হইবে এবং পত্রেরও গৌরববৃদ্ধি হইবে।

মাতৃমন্দির—কার্ত্তিক। 'বিজয়া' আকারে কবিতা, প্রকারে কষ্ট কল্পনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

"ভারতের নারী" প্রবন্ধটী সকলেরই পাঠ করা উচিত।

'সাধের সাধনা' কবিতায় 'সুর' 'বাণী' 'মুক্তি' 'অসীম' ইত্যাদি কতকগুলি কাব্যগন্ধি বাক্য আছে মাত্র।

'পথনির্ণয়' গল্পটী প্লট হিসাবে ছোট গল্প একেবারেই নয়।

শ্রীমতী ভক্তিসুধা হারের 'নিবেদন' কবিতায় ভাবের মাধুর্য্য আছে। তবে 'শুধু'র সঙ্গে 'বঁধু'র মিল নিখুঁত নহে। "ভারতের নারী ও লর্ড লিটন" সাময়িক প্রবন্ধ।

'প্রফুল্ল'—নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল নাটকের সমালোচনা। সুখের বিষয় আজকাল গিরিশচন্দ্রকে লইয়া আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কিন্তু সমালোচনায় বিশেষ সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেন নাই। আদর্শের দিকে তাঁহার ঝোঁকটা কিছু বেশী।

'বঙ্গবধূ' কবিতা—মোটের উপর ভালই হইয়াছে। "প্রত্যাবৃত্ত" ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাস। 'নারী নির্য্যাতন' সম্বন্ধে লেখক যাহা

বলিয়াছেন তাহা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। দেশের এই গুরুতর সমস্যাটির সমাধান আবশ্যক।

'বিচুলা'র কাহিনীটুকু স্ত্রীপাঠ্য। বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক মাতারই পাঠ করা উচিত। 'বাগ্‌দেবীর প্রতি' কবিতায় কবি কালিদাস রায় নিজের জীবনের দুঃখ নিবেদন করিয়াছেন। যাঁহারা কালিদাস বাবুর কবিতা ভালবাসেন তাঁহাদের এই ছোট কবিতাটী পড়া উচিত। ইহাতে কবির মনের একদিককার পরিচয় একটু মিলিতে পারে।

'আছুরী' গল্পে কোনও পদার্থ নাই, আছে শুধু ছুৎমার্গ মূলক সমস্যাটার কথা। 'পূজার শেষে' কবিতা, মন্দ নহে।

পল্লীশ্রী—ভাদ্র। 'জ্ঞানমার্গ ও যোগমার্গ—শঙ্কর ও গোরক্ষ-নাথ' অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এর তথ্যবহুল সুরচিত প্রবন্ধ। তবে বিষয় ও ভাষার গুরুত্ব নিবন্ধন সাধারণ পাঠকের উপযোগী না হইতে পারে।

'বউকথা কও' ও 'যূথিকা' কবিতাদ্বয় কোন রকমে চলনসই হইয়াছে। 'সেকালে' কবিতাটীর নামকরণ ও রচনা উভয়ই ব্যর্থ হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত ভক্তিসুধা হারের 'সার্থক মিলন' কবিতা ভাব ছন্দের সাহচর্য্যে হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

'বনের পাখী' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য অনেক কাজের কথা বলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সান্যাল শাস্ত্রীর 'নূতন বাসর' গল্পের নামে একটী কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যাপার।

'পথিকের অন্বেষণে' এব্রাহিম খাঁ এম-এ, বি-এল রচিত। আধুনিক ভাষায় এটিকে 'কথিকা' বলা যাইতে পারে। নওরোজের উৎসবপূর্ণ সন্ধ্যায় এক ফকিরের কথায় অকস্মাৎ বাদশাহের জ্ঞানের উদয় হইল; প্রভাতে ফকিরী নিয়ে রাজ্যত্যাগ করে চলে গেলেন। রচনা বেশ সুপাঠ্য হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সরোজকুমার সেনের 'বর্ষার ব্যথা' প্রভাতে মেঘের আড়ম্বরের ন্যায় প্রায় সবটাই অকারণ ভণিতায় পরিপূর্ণ; আসল ভাবটী একান্ত অস্পষ্ট।

বাণী—আশ্বিন। এই পত্রিকাখানি কাশিডি জেমসেদপুর হইতে প্রকাশিত।

'আগমনী' কবিতা—মন্দ হয় নাই।

"শঙ্করের মত কি নাস্তিকতা?" প্রবন্ধে লেখক মহাশয় প্রশ্নের কোনও সমাধান করেন নাই। দু' চারিটী আনুসঙ্গিক কথা বলিয়া উপসংহারে পাঠককে খুব এক ধমক দিয়া বলিয়াছেন, সাবধান, "'অসমদীয়' ব্যক্তির পক্ষে এই প্রশ্নের সম্যক উত্তর দিবার চেষ্টা ধৃষ্টতা!"

'বাল্মীকির তপোবনে' ভ্রমণবৃত্তান্তটি সরল সহজ ঝরঝরে ভাষার গুণে বেশ সুখপাঠ্য হইয়াছে।

'শেষপূজা' কবিতাটি বিশেষত্ব বৰ্জ্জিত। 'কলিকাতা হইতে রামেশ্বর' ও 'অমরনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ের কয়েক ছত্র করিয়া ছাপা হইয়াছে। শুনিয়াছি, হোমিওপ্যাথি ঔষধের ক্রম বৃদ্ধির সহিত শক্তিরও বৃদ্ধি হয়। সুতরাং বলিতে হয়, প্রবন্ধদ্বয়ও খুব সরল ও সবল হইয়াছে। পাঠকের সুবিধা ও অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিবার অক্ষমতা লইয়া, সম্পাদক সাজিবার স্পৃহা হয় কেন বুঝি না।

'বিষ্ণুপুরের মদনমোহন' শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু বিদ্যাবিনোদ। ক্রমশঃ প্রকাশ্য ঐতিহাসিক কাহিনী। আরম্ভ আশাপ্রদ নহে। 'আগের সিক্‌টের' কবিতা। প্রসিক জীবনের কৌতুকভরা এক অংশের চিত্র—ইংরাজীর অনুবাদ হইলেও বেশ জমিয়াছে। কবি পাঠককে একটি নূতন রসের সন্ধান দিয়াছেন। প্রেমের কবিতার প্রতি আমাদের বিদ্বেষ নাই। তথাপি মনে হয় কবিতায় স্থান যে মানুষের জীবনের মধ্যে বহুব্যাপী, তাহা বাংলার লোক আমরা—সকল সময় ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। 'সুরের নেশা'—ব্যর্থ রচনা।

সুবর্ণবণিক্‌ সমাচার—আশ্বিন। "বংশী শ্রবণে" ভক্তি-মূলক কবিতা। 'ভক্তিতে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর'। সুতরাং কবিতার সম্বন্ধে অভিমত অব্যক্ত রাখিলাম।

"বঙ্গসাহিত্যে নবীনচন্দ্রের দান" শ্রীদয়ানন্দ চৌধুরী এম-এ লিখিত ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি ভালই হইবে মনে হয়।

শ্রীমন্মথনাথ দে লিখিত "দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ" সচিত্র ভ্রমণ বৃত্তান্ত। উপভোগ্য।

'প্রেমমঙ্গল' অমরু শতকম্‌ হইতে অনূদিত, কবিতা মন্দ হয় নাই।

'বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতি' প্রবন্ধে লেখক বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর সমালোচনা করিয়াছেন।

'গায়ে হলুদ' গল্পটী বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। এইরূপ রচনায় Shylock বরকর্ত্তার অত্যাচার চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইলে যদি দেশের দুর্দ্দিন দূর হয়। 'সমীরণ' কবিতা, মামুলী; ছন্দদোষও আছে। 'রসাতল বা অধোভুবন' ক্রমপ্রকাশ্য প্রবন্ধ, বিশেষ তথ্য পূর্ণ।

গন্ধবণিক—আশ্বিন। 'আগমনী' কবিতা—নির্গন্ধমপি নির্মাল্যম্‌। সুতরাং কিছু বলা বৃথা। 'শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব' প্রবন্ধ মন্দ নয় নাই। 'হিন্দু সমাজের পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান অবস্থা' ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে কয়েকটি অপ্রিয় সত্য আছে। তবে যাঁহারা সত্যান্বেষী, তাঁহাদের একবার পড়িয়া দেখা উচিত। শ্রীবসন্তবিহারী চন্দ্রের ৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশে লিখিত চতুর্দ্দশপদী কবিতাটি শুধু সাময়িক বলিয়া নয়, কবিতা হিসাবেও বেশ হইয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত বণিকের 'সঙ্গীতে ভবানী বণিক্‌' ও শ্রীনৃত্যগোপাল রুদ্রের 'প্রাচীন মিশর' দুইটি ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধ। দুইজন লেখকই তাঁহাদের প্রবন্ধ লইয়া বিশেষ পরিশ্রম করিতেছেন। এইরূপ লেখাই মাসিক পত্রিকার সম্পদ।

শ্রীসীতানাথ কাব্যবিনোদের 'ধর্ম্মসেন' ও শ্রীবসন্তবিহারী চন্দ্রের 'চাঁদসদাগর' ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস ও নাটক—শেষ না হইলে কিছু বলা যায় না। শ্রীআশুতোষ দত্তের 'বিশাখার উপাখ্যান'ও ক্রমশঃ প্রকাশ্য। শ্রীচন্দ্রকুমার দাসের 'জংলা মুলুক' কবিতায় ছন্দের দোষ অনেক। শ্রীযুক্ত বলরাম সাধুর 'দুর্গোৎসব-তত্ত্বকথা' সুলিখিত প্রবন্ধ। শ্রীমতী মলিনাবালা সাহার 'কালস্রোত' কবিতার আড়ষ্ট ভাবটুকু না থাকিলে কবিতাটি ভাল হইত। ভাবের গাড়ত্ব আছে। লেখিকা নবীনা। অভ্যাস রাখিলে তিনি সুলেখিকা হইবেন, আশা করা যায়। ডাক্তার শ্রীযুক্ত মদনমোহন বণিক্‌ এম-বি এর 'গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যনীতি' সকলেরই পড়া উচিত।

কলিকাতা, ৩।এ রাধাপ্রসাদ লেনে বর্ণিকা প্রেসে শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক ৩০ বি পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেনে অর্চনা কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

২১শ ভাগ] পৌষ, ১৩৩১। [১১শ সংখ্যা

"মেঘনাদবধ" কাব্যের সূচনা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম-এ, বি-এল]

"তিলোত্তমাসম্ভব" কাব্যের কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এই কাব্য মধুসূদনের অমিত্র ছন্দে লিখিত সর্ব্ব প্রথম রচনা। ইহার সূচনাতে কবি হিমালয় পর্ব্বতের শৃঙ্গবিশেষ ধবলগিরির কবিত্বময় বর্ণনা করিবার পর লিখিতেছেন,—

"এহেন নির্জ্জন স্থানে দেব পুরন্দর
কেন গো বসিয়া আজি, কহ পদ্মাসনা
বীণাপাণি? কবি, দেবি, তব পদাম্বুজে
প্রণমি, জিজ্ঞাসে তোমা, কহ দয়াময়ি!
তব কৃপা—মন্দার দানব দেব বল,
শেষের অশেষ দেহ—দেহ এ দাসেরে;
এ বাক্‌সাগর আমি মথি সযতনে,
লভি, মা, কবিতামৃত—নিরুপম সুধা!
অকিঞ্চনে কর দয়া, বিশ্ববিনোদিনি!
যে শশীর সুধা, মাতঃ স্থাণুর ললাটে,
তাঁহারি আভার শোভে ফুলকুল দলে
নিশার শিশির বিন্দু, মুক্তাফল রূপে!
কহ, সতি;—কি না তুমি জান, জ্ঞানময়ি?
কোথা সে ত্রিদিব," ইত্যাদি—

ইহার পর কবি সুন্দ উপসুন্দাসুর কর্ত্তৃক পরাজিত পুরন্দরের স্বর্গরাজ্যের শোচনীয় অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন। সর্গারম্ভে মধুসূদন ধবলগিরির সুদীর্ঘ মনোরম বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া উদ্ধৃত শ্লোকে সরস্বতীর বন্দনা করিয়াছেন। "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে"র দ্বিতীয় সর্গের সূচনায় কবি লিখিয়াছেন,—

"কোথা ব্রহ্মলোক? কোথা আমি মন্দমতি
অকিঞ্চন? যে দুর্ল্লভ লোক লভিবারে
যুগে যুগে যোগীন্দ্র করেন মহাযোগ,
কেমনে, মানব আমি, ভব মায়াজালে
আবৃত, পিঞ্জরাবৃত বিহঙ্গ যেমতি,
যাইব সে মোক্ষধামে? ভেলায় চড়িয়া
কে পারে হইতে পার অপার সাগর?
কিন্তু, হে সারদে, দেবি বিশ্ববিনোদিনি,
তব বলে বলী যে, মা, কি অসাধ্য তার
এ জগতে? উর তবে, উর পদ্মালয়া
বীণাপাণি! কবির হৃদয়-পদ্মাসনে
অধিষ্ঠান কর উরি! কল্পনা-সুন্দরী—
হৈমবতী কিঙ্করী তোমার, শ্বেতভুজে,

আন সঙ্গে, শশীকলা কৌমুদী যেমতি।
এ দাসেরে বর যদি দেহ গো, বরদে,
তোমার প্রসাদে, মাতঃ, এ ভারতভূমি
শুনিবে, আনন্দার্ণবে ভাসি নিরবধি,
এ মম সঙ্গীত ধ্বনি মধু হেন মানি!"

এই বন্দনায় কালিদাসের "রঘুবংশে"র প্রারম্ভে রচিত একটি শ্লোকের প্রতিধ্বনি শুনা যাইতেছে। 'ক সূর্য্য প্রভবো বংশঃ কচাল্পবিষয়ামতিঃ। তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্॥" তাহা হইলেও মধুসূদনের এই বন্দনায় কল্পনা-সুন্দরীর উল্লেখ আছে ও ভারতভূমির কথা স্থান পাইয়াছে। "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে"র চতুর্থ সর্গের সূচনাতে কবি আবার একটী বন্দনা লিখিয়াছেন।

"সুবর্ণ বিহঙ্গী যথা, আদরে বিস্তারি
পাখা, শক্র ধনু-কান্তি আভায় যাহার
মলিন—যতনে ধনী শিখায় শাবকে
উড়িতে, হে জগদম্বে, অম্বর প্রদেশে;—
দাসেরে করিয়া সঙ্গে রঙ্গে আজি তুমি
ভ্রমিয়াছ নানাস্থানে; কাতর সে এবে,
কুলায়ে লয়ে তাহারে চল, গো জননি!
সফল জনম মম ও পদ প্রসাদে,
দয়াময়ি! যথা কুন্তী-নন্দন পৌরব,
ধীর যুধিষ্ঠির, সশরীরে মহাবলী
ধর্ম্ম বলে প্রবেশিলা স্বর্গ, তব বরে
দীন আমি দেখিনু, মানব আঁখি কভু
নাহি দেখিয়াছে যাহা; শুনিনু ভারতী,
তব বীণা-ধ্বনি বিনা অতুলা জগতে!
চল ফিরে যাই যথা কুসুম-কুন্তলা
বসুধা। কল্পনা,—তব হেমাঙ্গী সঙ্গিনী,
দান করিয়াছে যারে তোমার আদেশে
দিব্য-চক্ষু, ভুল না, হে কমল-বাসিনি,
রসিতে রসনা তার তব সুধা রসে!
বরষি সঙ্গীতামৃত মনীষী তুষিবে,—
এই ভিক্ষা করে দাস, এই দীক্ষা মাগে।
যদি গুণগ্রাহী যে, নিদাঘ-রূপ ধরি,
আশার মুকুল নাশে এ চিত্ত-কাননে
সেও ভাল; অধমে, মা, অধমের গতি!—
ধিক্ সে যাচ্ঞা,—ফলবতী নীচ কাছে!"

"তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে" বাগ্দেবীর বন্দনার সহিত "মেঘনাদবধ" কাব্যের বাগ্দেবীর বন্দনা মিলাইয়া পাঠ করিলে মধুসূদনের প্রতিভার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। মধুকবি অমিত্র ছন্দে রচিত তাঁহার প্রথম কাব্যে বাগ্দেবীর বন্দনা লিখিবার পদ্ধতি অভ্যাস করিতেছেন। "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে"র প্রথম সর্গের সূচনায় তিনি ত্রিংশ ছত্রে ধবলগিরির বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিবার পর বাগ্দেবীর বন্দনা আরম্ভ করিয়াছেন। এই বন্দনাতে কাব্যের বস্তু-নির্দ্দেশ নাই। কবি বন্দনা শেষ করিয়া বিংশাধিক প্রশ্ন করিয়া তাহার উত্তর বাগ্দেবীর নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। এই কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের সূচনায় কবি পুনরায় বাগ্দেবীর বন্দনা করিয়াছেন ও বর্ণনার শেষে কল্পনা-সুন্দরীর উল্লেখ করিয়াছেন। চতুর্থ সর্গের সূচনায় কবি আবার যে বন্দনাটি লিখিয়াছেন তাহাতেও কল্পনার কথা স্থান পাইয়াছে। "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে"র "কল্পনা" বাগ্দেবীর হৈমবতী কিঙ্করী বা "হেমাঙ্গী সঙ্গিনী"। এই কাব্যে কবি ভারতভূমি-ব্যাপী যশের আশা করিতেছেন। ইহাতে মধুসূদন কালিদাসকে একস্থানে স্পষ্ট অনুকরণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এই অনুকরণেও তিনি তাঁহার প্রতিভার ছাপ দাগিয়া দিয়াছেন। "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে"র বাগ্দেবীকে মধুসূদন "বীণাপাণি", "দেবি", "দয়াময়ি", "মা", "বিশ্ববিনোদিনি", "সতি", "জ্ঞানময়ি", "সারদে", "পদ্মালয়া", "শ্বেতভুজে", "জগদম্বে", "জননি", ও "কমলবাসিনি" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। "মেঘনাদবধ" কাব্যের বাগ্দেবীকে কবি, "অমৃতভাষিণি", "শ্বেতভুজে", "ভারতি", "মাতঃ", "সতি", "বরদে", "মা", "দয়াময়ি", ও "বিশ্বরমে", বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে"র তিনটী বিভিন্ন সর্গে মধুসূদন বাগ্দেবীর বন্দনা করিয়াছেন। "মেঘনাদবধ" কাব্যের কেবলমাত্র সূচনায় কবি বাগ্দেবীর বন্দনা করিয়াছেন। "মেঘনাদবধ" কাব্য রচনা করিবার

সময় মধুসূদন যে বন্দনা লিখিবার রীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। সেইজন্য এই কাব্যের চতুর্থ সর্গে বাল্মীকির বন্দনাতে বাগ্দেবীর উল্লেখ নাই। মধুসূদন বুঝিয়াছিলেন যে, কাব্যের সূচনাতেই বাগ্দেবীর বন্দনা তুলিয়া দেওয়া উচিত। বন্দনার পর বন্দনা "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে"র সৌষ্ঠব নষ্ট করিয়াছে। বাগ্দেবীর যে নামগুলির সার্থকতা কাব্যের সূচনায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় সেইগুলি মধুসূদন বাছিয়া লইয়া "মেঘনাদবধ" কাব্যে ব্যবহার করিয়াছেন। "মেঘনাদবধ" কাব্যে কবিকল্পনাকে দেবীরূপে কল্পিত হইয়াছে। কবির বিচারশক্তি বৃদ্ধি পাওয়াতে, তিনি ভারতভূমি পর্য্যটন করিয়া বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ফল কথা, "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে" সূচনা লিখিবার রীতি সম্বন্ধে মধুসূদনের প্রথম উদ্যম দেখা যায়। "মেঘনাদবধ" কাব্যের কবি পাঠশালার বাঁধা-বাঁধি নিয়মকে সম্পূর্ণরূপে ছাঁটিয়া ফেলিয়া তাঁহার কবিত্ব-শক্তিকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন। কবির কল্পনা এখন আর সরস্বতীর কিঙ্করী নহে।

"মেঘনাদবধ" কাব্যের দিগন্তব্যাপী বিরাট রঙ্গমঞ্চে মধুসূদনের কল্পনা যে অদ্ভুত লীলাভিনয় দেখাইয়াছে তাহার উপযোগী দৃশ্যপট সংগ্রহ করিতে কবিকে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আলোড়িত করিতে হইয়াছিল। যে কবি Epic of art রচনা করেন, কল্পনা বলিয়া জিনিষটী তাঁহার নিজস্ব। মধুসূদন সেইজন্য "মেঘনাদবধ" কাব্যের সূচনায় কল্পনা-দেবীকে আহ্বান করিয়াছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, কবির প্রতিভা কোন্ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া "মেঘনাদবধ" কাব্য রচনা করিয়াছিল? সূচনায় তিনি সর্ব্বপ্রথমে অমৃতভাষিণী শ্বেতভুজা ভারতীকে বন্দনা করিয়াছেন এবং শেষে কল্পনাদেবীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, মধুসূদন তাঁহার কল্পনা-শক্তির উপর যতটা নির্ভর করিয়াছেন তাহা হইতেও বেশী নির্ভর করিয়াছেন দৈব শক্তির উপর। পাশ্চাত্যের কাব্য-সমালোচকেরা বলেন যে, মহাকাব্যের সূচনায় বাগ্দেবীর বন্দনা convention মাত্র। মধুসূদন তবে কি অন্ধ প্রথার খেই ধরিয়া তাঁহাদের অমর কাব্যের সূচনায় বাগ্দেবীর বন্দনা করিয়াছেন? যেরূপ আন্তরিকতার সহিত তিনি দেবীকে ডাকিয়াছেন তাহাতে ত মনে হয় না যে প্রাচ্য বা প্রতীচ্য কাব্যালঙ্কার শাস্ত্রের খাতিরে তিনি "মেঘনাদবধ" কাব্যের সূচনায় এই মনোহর বন্দনা জুড়িয়া দিয়াছেন। "মেঘনাদবধ" কাব্যের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত দৈবশক্তির প্রভাব যখন বর্ত্তমান রহিয়াছে তখন কবির বন্দনা যে উদ্দেশ্যহীন, ইহা মনে হয় না। মধুসূদনের দৈব-নির্ভরতা তাঁহার কবি-জীবনের একটী দ্রষ্টব্য বিষয়। "মেঘনাদবধ" কাব্যের সর্ব্বত্র কবির এই দৈব-নির্ভরতা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত। স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব বলিয়াছেন,—

—"মায়ার প্রসাদে
বধিবে লক্ষ্মণশূর মেঘনাদ শূরে।"

মায়াদেবী মেঘনাদ বধের জন্য দিব্যাস্ত্র সকল প্রেরণ করিবার সময় বাসবকে বলিলেন,—

"ওই সব অস্ত্রবলে, বলি,
মেঘনাদ মৃত্যু, সত্য কহিনু তোমারে।
কিন্তু হেন বীর নাহি এ তিন ভুবনে,
দেব কি দানব, ন্যায় যুদ্ধে যে বধিবে,
রাবণিরে। প্রের তুমি অস্ত্র রামানুজে,
আপনি যাইব আমি কালি লঙ্কাপুরে,
রক্ষিব লক্ষ্মণে, দেব, রাক্ষস-সংগ্রামে।"

লক্ষ্মণ মহামায়াকে পূজা করিয়া বর প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন,—

"সুপ্রসন্ন আজি,
হে সতী সুমিত্রা-সুত, দেব দেবী যত
তোর প্রতি! দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে
বাসব; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা
সাধিতে এ কার্য্য তোর শিবের আদেশে।
ধরি দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে,
যা চলি নগর মাঝে, যথায় রাবণি,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে।
সহসা, শার্দ্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে,

নাশ্ তারে। মোর বরে পশিবি দুজনে
অদৃশ্য; নিকষে যথা অসি, আবরিব
মায়াজালে আমি দোঁহে। নির্ভয় হৃদয়ে
যা চলি, রে যশস্বি!"

প্রমীলার মত বীর-রমণীও স্বামীর জন্য দৈবের সাহায্য চাহিয়াছেন।

"প্রমীলা তোমার দাসী, নগেন্দ্র-নন্দিনি,
সাধে তোমা, কৃপা-দৃষ্টি কর লঙ্কা-পানে,
কৃপাময়ি! রক্ষঃ-শ্রেষ্ঠে রাখ এ বিগ্রহে!
অভেদ্য কবচ-রূপে আবর শূরেরে!
* * *
দেখো, মা, কুঠার যেন না পশে উহারে!"

লক্ষ্মণও রামকে বলিয়াছিলেন,—

"কি কারণে, রঘুনাথ, সভয় আপনি
এত? দৈববলে বলী যে জন, কাহারে
ডরে সে এ ত্রিভুবনে? দেব-কুলপতি
সহস্রাক্ষ পক্ষ তব; কৈলাস-নিবাসী
বিরূপাক্ষ; শৈলবালা ধর্ম্ম-সহায়িনী!"

বিভীষণও লক্ষ্মণের কথা সমর্থন করিয়াছেন। লক্ষ্মণকে দৈবশক্তি কিরূপে সাহায্য করিয়াছে, কবি তাহা সুন্দর ভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

"প্রবল মায়ার বলে পশিলা নগরে
বীরদ্বয়! সৌমিত্রির পরশে খুলিল
দুয়ার অশনি-নাদে; কিন্তু কার কাণে
পশিল আরাব? হায়! রক্ষোরথী যত
মায়ার ছলনে অন্ধ, কেহ না দেখিলা
দুরন্ত কৃতান্তদূতসম রিপুদ্বয়ে,
কুসুম-রাশিতে অহি পশিল কৌশলে!"

লক্ষ্মণ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে দৈববলের কথা মেঘনাদকে স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন,—

"দেববলে বলী,
তবু অবহেলা, মূঢ়, করিস সতত
দেবকুলে!"

মেঘনাদ দৈবশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া বিভীষণকে বলিলেন,—

"ছাড়হ পথ; আসিব ফিরিয়া
এখনি! দেখিব আজি, কোন্ দেববলে,
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি!"

লক্ষ্মণ বিভীষণকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বলিয়াছিলেন,—

"বিধির বিধানে
বধিনু এ যোধে আমি, অপরাধ নহে
তোমার!"

মেঘনাদ বধের পর রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন,—

"ধন্য জন্মভূমি
অযোধ্যা! এ যশঃ তব ঘোষিবে জগতে
চিরকাল! পূজ কিন্তু বলদাতা দেবে,
প্রিয়তম! নিজ বলে দুর্ব্বল সতত
মানব; সুফল ফলে দেবের প্রসাদে!"

স্বয়ং রাবণ পুত্রশোকে আকুলা বীরবাহুর মাতা চিত্রাঙ্গদাকে বলিয়াছিলেন,—

"হায়, বিধি-বশে, দেবি, সহি এ যাতনা
আমি!"
* * *
* * * "বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে।"

মহাদেব যথার্থই বলিয়াছেন,—"দেব ভিন্ন কার সাধ্য দেবমায়া বুঝে এ জগতে।" মায়ার মায়ায় অভিভূত মানব যেমন দৈবকে ভুলিয়া পুরুষকারের প্রতি আকৃষ্ট হয়, যে কৌশলে দৈবশক্তি মানব-জগতের কল্যাণ সাধন করে, তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতেও সে সেইরূপ ঔদাসীন্য প্রকাশ করে। মধুসূদন মায়াময় জগতে মানবের অক্ষমতা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন, আর সেইজন্য "মেঘনাদ-বধ" কাব্যের সূচনায় বাগ্দেবীকে যে 'কৌশলে' লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ করিয়াছিলেন তাহা কবির অবগতির জন্য বিবৃত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। জড়ভাবাপন্ন আধুনিক সময়ে আমরা কবিগুরুদিগের যে সমালোচনা পাঠ করি তাহাতে ক্ষুদ্র মানবের যুক্তি তর্কের খবর পাই; কাব্যের

অন্তরতম স্থানে সে সমালোচনা পৌঁছিতে পারে না। রাবণ মেঘনাদ নিহত হইবার পর দৈবশক্তির প্রভাব উত্তমরূপ বুঝিয়াছিলেন। সারণকে তিনি রামের নিকট সপ্তদিন ব্যাপী সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইবার সময় সেই জন্য বলিয়াছিলেন,—তাঁহাকে বলিও, "অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি ; দৈববলে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে।"

মধুসূদন "মেঘনাদ-বধ" কাব্যের প্রারম্ভে বাগেদবীর যে ভাবে বন্দনা করিয়াছেন তাহাতে সমুদয় কাব্যখানির মর্ম্মনিহিত দার্শনিক তত্বটি স্পষ্ট ভাবে সূচিত হইয়াছে। এই কাব্যের সমালোচকেরা নূতন ছন্দের সৌন্দর্য্য, কবির কল্পনার বিশালতা, কাব্যে বর্ণিত চরিত্রবিশেষের উৎকর্ষতা বা অপকর্ষতা প্রভৃতি কবি ও কাব্য সংক্রান্ত অনেকগুলি স্থূল বিষয়ের প্রতি যতটা মনোনিবেশ করিয়াছেন তাহার তুলনায়, তাঁহারা কাব্যের অন্তরতম স্থানে যে অনর্ঘ সত্য কবি সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন তাহার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। কবির সমসাময়িক বঙ্গদেশের নৈতিক ও সামাজিক অবস্থার ছায়া কাব্যের কোথায় ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে, পাশ্চাত্য কাব্যের প্রতিবিম্ব কোথায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, স্বাধীনতার দুন্দুভি নিনাদ কিরূপে শব্দমালার ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, এই সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রসাস্বাদে পাঠকের মন এমন প্লুত হইয়া পড়ে যে বঙ্গভাষার এত বড় মহা-কাব্যের ভিতরে যে আধ্যাত্মিক ভাবটী বর্ত্তমান রহিয়াছে তৎপ্রতি তাঁহার মন সহজে আকৃষ্ট হইতে চাহে না। কবি যদি দার্শনিকের ন্যায় কালাকাল বিচার না করিয়া তাঁহার কাব্যে কেবল তত্ত্ব কথা শুনাইতে থাকেন তাহা হইলে তাঁহার সেই কাব্য পাঠ করা অনেকের পক্ষে অসহ্য হইয়া পড়ে। কাব্যের আসরে গুরুগিরি করিতে গিয়া অনেক কবি উৎকৃষ্ট শিল্পকে পণ্ডময় নৈতিক সন্দর্ভে পরিণত করিয়াছেন। মধুসূদন শিল্পের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া "মেঘনাদ-বধ" কাব্যকে আচার্য্যের বেদীর আদর্শে সৃষ্টি করেন নাই। তিনি ইহাকে অনন্ত-রহস্যময়ী প্রকৃতির আদর্শে সৃষ্টি করিয়াছেন। ভাবুক না হইলে প্রকৃতির অন্তরে যেমন প্রবেশ করা যায় না, মধুসূদনের কাব্য-সৌধের পবিত্রতম স্থানেও সেইরূপ প্রবেশ করা অসম্ভব। দেবোপম মানব হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্গবাসী অমরগণ পর্য্যন্ত যে দৈবের অধীন, ইহা মধু-কবি "মেঘনাদ-বধ" কাব্যে বারংবার স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। কবি নিজে সেইজন্য কাব্যারম্ভে বাগেদবীর আরাধনা করিয়া বর মাগিয়াছেন। মধুসূদনের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের বাঙ্গালী কবিরাও তাঁহাদের সুবিখ্যাত কাব্য-গ্রন্থের ভিতর দিয়া দৈবশক্তির লীলা অসংখ্য বার প্রকট করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরামের "চণ্ডীকাব্য" ও ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" শক্তিরূপিণী জগন্মাতার অদ্ভুত লীলা ছাড়া আর কিছু বর্ণন করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

"মেঘনাদ-বধ" কাব্যের সূচনায় আমরা কবির দৈব-নির্ভরতার যে পরিচয় পাই তাহার সহিত বাঙ্গালীর জাতীয়-চরিত্রের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। দরিদ্র ভীরু বাঙ্গালী নয় শত বৎসর বিধর্ম্মীর অধীনে গোলামি করিয়া দৈব-নির্ভরতা শিক্ষা করিয়াছে। সমসাময়িক পারিপার্শ্বিক জগত কবির কাব্যে প্রতিবিম্ব নিক্ষেপ করে, এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে "মেঘনাদ-বধ" কাব্যে কবির দৈব-নির্ভরতা কেন যে এতটা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে তাহার কারণ বুঝিতে বিলম্ব হয় না। মধুসূদনের জীবনকালে বাঙ্গালী সমাজের উন্নতিশীল শিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্যের আদর্শে নিজেদের কর্ম্মজীবন গঠিত করিয়াছিলেন সত্য, ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার না করিয়া তাঁহারা কুসংস্কারকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন ইহাও সত্য। বিধবা বিবাহের প্রচলন, জাতিভেদের উচ্ছেদ ও অন্যান্য শত প্রকারে সমাজ-সংস্কারে তাঁহারা ব্রতী হইয়াছিলেন। স্বদেশ-প্রেম ও স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাঁহারা রাজনীতি-ক্ষেত্রে নির্ভীকতার পরিচয় দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তে সমাজের নির্জীবতা লোপ পাইতেছিল বটে, কিন্তু মন্ত্রদ্রষ্টা কবি মধুসূদন বুঝিয়াছিলেন যে উন্নতিশীল শিক্ষিত স্বদেশ-প্রেমিক বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের মধ্যে দৈব নির্ভরতা বলিয়া জিনিষটীর সম্পূর্ণ অভাব রহিয়াছে। তৎকালে সমাজের মধ্যে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে উৎসাহের চিহ্ন দেখা দেয় নাই তাহা নহে। পাশ্চাত্য ভাবসিক্ত সম্প্রদায় একদিকে যেমন পুরাতন অব্যবহার্য্য রীতি নীতিকে

সমাজের অঙ্গ হইতে কর্ত্তন করিয়া ফেলিয়া দিতেছিলেন, অপর দিকে তেমনি রক্ষণশীল সম্প্রদায় সমাজের মধ্যে কুসংস্কার ও কদাচারকে বদ্ধমূল করিবার জন্ত শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিতেছিলেন। তবে, উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের ধ্বংস-নীতির পশ্চাতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা অবস্থান করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে যে শক্তি সঞ্চার করিতেছিল তাহাকে বাধা দিবার ক্ষমতা রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের ছিল না। মধুসূদনের রামচন্দ্রের ন্যায় বঙ্গদেশের প্রাচীন হিন্দুসমাজ সকল বিষয়ে হীন হইয়া পড়িয়াছিল। শান্তিপূর্ণ ইংরাজ রাজত্বে উৎপীড়নের আশঙ্কা না থাকাতে হিন্দুসমাজও দৈব-নির্ভরতা কতকটা ভুলিয়া গিয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে বৃথা আড়ম্বরকে সর্ব্বত্র প্রশ্রয় দিতেছিল। অথচ, নব্য-বঙ্গকে দাবিয়া রাখিতে না পারিলে সমাজের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে তৎসম্বন্ধে হিন্দুসমাজের কোনওরূপ সন্দেহ ছিল না। প্রমীলার ন্যায় বহু রমণী স্ত্রী স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইয়া রামচন্দ্ররূপ হিন্দুসমাজের মনে ভীতি সঞ্চার করিতেছিলেন। সমসাময়িক বঙ্গীয় সমাজের ইতিহাসের এই সকল জীবন্ত ঘটনার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মধুসূদন "মেঘনাদ-বধ" কাব্যের নায়ক ও পাত্র পাত্রীদের চরিত্রের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বাঙ্গালী রাক্ষসের দল সমাজের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিলেও তাহারা দেবদ্বেষী। বাঙ্গালী হিন্দুসমাজ নির্জীব হইলেও, দৈব নির্ভরতা ভুলিয়া গেলেও, দেব দেবীর মূর্ত্তি পূজার ভিতর দিয়া বিবাহ ও শ্রাদ্ধোপলক্ষে দেবোদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণ করিবার সময় হিন্দুকে দেবতার অস্তিত্ব স্মরণ করাইয়া দেয়। মধুসূদনের রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণ ও বিভীষণ দৈববলের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে তাঁহার মনে লক্ষ্মণের জন্ত যে আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল তাহা তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল। ফল কথা, মধুসূদন "মেঘনাদ-বধ" কাব্যের নায়ক ও পাত্র-পাত্রীদের চরিত্রের চিত্র যেমন সমসাময়িক বঙ্গীয় সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কার্য্যাদি লক্ষ্য করিয়া তাহাদের আদর্শে সৃষ্টি করিয়াছেন, জাতীয়-চরিত্রে একদিকে ধর্ম্মহীনতা ও অপরদিকে দোষা-বহ আত্ম-বিস্মৃতির বিষয় চিন্তা করিয়া তিনি সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া দৈব-নির্ভরতা শিক্ষা দিয়াছেন। "মেঘনাদ-বধ" কাব্যের যদি কোনও উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে তাহা দৈব-নির্ভরতা শিক্ষা দেওয়া। এই উদ্দেশ্য তিনি নিজে কাব্যের সূচনায় বাগ্দেবীর আরাধনা করিয়া পাঠককে অকপট ভাবে বিদিত করিয়াছেন।

সমগ্র "মেঘনাদ-বধ" কাব্যের মধ্যে ইহার সূচনায় গ্রথিত 'কৌশলে' শব্দটী বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা আলোচ্য কাব্যের বীজ-শব্দ। মধুসূদন সূচনায় বাগ্দেবীকে "মেঘনাদ-বধ" কাব্য রচনা সম্বন্ধে প্রধানতঃ দ্বিপ্রকারে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। প্রথম প্রশ্নে কবি জানিতে চাহিতেছেন, "বীরবাহুর মৃত্যুর পর রাবণ কোন্ বীরকে সেনাপতি-পদে বরণ করিয়া রণে পাঠাইলেন"। কাব্যের প্রথম সর্গে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। দ্বিতীয় প্রশ্নে কবি বাগ্দেবীর নিকট জানিতে চাহিয়াছেন, "কি কৌশলে লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ করিয়াছিলেন"। "অস্ত্র লাভো" নামে কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে একাধিক দেব দেবী কি উপায়ে রামচন্দ্র রক্ষা পাইবেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া মহাদেবের নিকট গমন করিলেন। মেঘনাদ আগামী কল্য রামচন্দ্রকে আক্রমণ করিবে, কি করিয়া রামচন্দ্র রক্ষা পাইবেন, ইহা-ই এখন দেবগণের চিন্তার বিষয়। লক্ষ্মণ যে মেঘনাদকে বধ করিবেন, এ কথা সর্ব্বপ্রথম মহাদেব ভবানীকে কহিলেন। "মায়ার প্রসাদে, বধিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে"। ইন্দ্র মহাদেবের উপদেশ মত মহামায়ার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—

"শিবের আদেশে,
মহামায়া, আসিয়াছি তোমার সদনে।
কহ দাসে, কি কৌশলে সৌমিত্রি জিনিবে
দশানন-পুত্রে কালি? তোমার প্রসাদে
(কহিলেন বিরূপাক্ষ) ঘোরতর রণে
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।"

পাঠকের ন্যায় ইন্দ্রও উক্ত 'কৌশল' সম্বন্ধে আপাততঃ সম্পূর্ণ অন্ধকারে রহিয়াছেন। মহামায়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ইন্দ্রকে বলিলেন, "যে সকল অস্ত্রের সাহায্যে ষড়ানন

তারকাসুরকে নিহত করিয়াছিলেন, সেই সকল অস্ত্রবলে মেঘনাদ নিহত হইবে,

"কিন্তু হেন বীর নাহি এ তিন ভুবনে,
দেব কি দানব, ন্যায় যুদ্ধে যে বধিবে
রাবণিরে।"

এখনও উক্ত 'কৌশলে'র সঠিক বিবরণ মায়াদেবীর মুখ দিয়া প্রকাশ পাইল না। তবে, তিনি ইসারায় বলিলেন যে, লক্ষ্মণকর্ত্তৃক ন্যায়-যুদ্ধে মেঘনাদ নিহত হওয়া অসম্ভব। মায়াদেবী আরও বলিলেন, "লক্ষ্মণকে এই সকল অস্ত্র পাঠাইয়া দাও, আর আমি নিজে আগামী কল্য লঙ্কায় গমন করিয়া লক্ষ্মণকে রক্ষা করিব।" ইন্দ্র উক্ত 'কৌশলে'র কথা অবগত না হইয়া চিত্ররথকে যখন লক্ষ্মণের নিকট মহামায়া-প্রদত্ত অস্ত্র পাঠাইলেন তখন তাঁহাকে বলিলেন,—

"সৌমিত্রি কেশরী
মায়ার প্রসাদে কালি বধিবে সমরে
মেঘনাদে। কেমনে, তা' দিবেন কহিয়া
মহাদেবী মায়া তারে।"

চিত্ররথ সেইজন্য স্বর্গ হইতে লঙ্কায় আসিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন,—

"এই যে অস্ত্র দেখিছ, নৃমণি,
দিয়াছেন পাঠাইয়া তোমার অনুজে
দেবরাজ। আবির্ভাবি মায়া মহাদেবী
প্রভাতে, দিবেন কহি', কি কৌশলে কালি
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।"

মহামায়ার মন্ত্রগুপ্তির ফলে দ্বিতীয় সর্গের শেষ পর্য্যন্ত উক্ত 'কৌশলে'র সংবাদ কেহ পাইলেন না, অথচ সকলেই বুঝিলেন যে একটা কিছু 'কৌশল' মহামায়া স্থির করিয়াছেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, যে কৌশলে লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ করিয়াছিলেন তাহার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের প্লট্ ঘনাইয়া উঠিয়াছে। এই অজ্ঞাত 'কৌশল' বাস্তবিক "মেঘনাদ-বধ" কাব্যের ঘটনাবলীর মূল কেন্দ্র। ইহার উৎপত্তি ত্রিকালজ্ঞ শিবের মস্তিষ্কে। মহামায়ার মায়াজালে এই 'কৌশল' আবৃত। মধুসূদনের কল্পনা এই 'কৌশলে'র অনুসন্ধানে স্বর্গ পর্য্যন্ত ছুটিয়া গিয়াছিল। কবির কল্পনার কৃপায় আমরা দ্বিতীয় সর্গে সেইজন্য দেব-সভার চিত্র, কৈলাসের দৃশ্য ও দেব-দেবীগণের কার্য্য মানস-নেত্রের সাহায্যে দেখিতে পাইয়াছি। তৃতীয় সর্গে বীরাঙ্গনা প্রমীলার অভিযান কবি বর্ণন করিলেও রাত্রি প্রভাত হইলে মায়ার কৃপায় মেঘনাদ যে নিহত হইবেন সে কথা রামের শিবিরের কয়েকজনের মনে জাগিয়াছিল। চিন্তাকুল রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণ বলিলেন,—

"লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে
কালি, কহিলেন চিত্ররথ সুর-রথী।
তবে এ ভাবনা, দেব, কর কি কারণে?"

কৈলাস-বাসিনী পার্ব্বতী প্রমীলার অলৌকিক কার্য্য দেখিতেছিলেন। তৃতীয় সর্গের শেষে তাঁহাকে বিজয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"কেমনে লক্ষ্মণ শূর নাশিবে রাক্ষসে?" কাত্যায়নী নিজের অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়া কহিলেন,—

"অবশ্য লক্ষ্মণ শূর নাশিবে সংগ্রামে
মেঘনাদে। পতি-সহ আসিবে প্রমীলা
এ পুরে; শিবের সেবা করিবে রাবণি;
সখী করি' প্রমীলারে তুষিব আমরা।"

তৃতীয় সর্গে-ও তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি যে উক্ত অজ্ঞাত 'কৌশল' সম্বন্ধে কৈলাসে ও রামের শিবিরে আলোচনা চলিতেছে। শুধু তাহাই নহে, উক্ত 'কৌশলে'র ফলে মেঘনাদের মৃত্যু হইলে পরলোকে বীর-দম্পতির সৌভাগ্যের সুন্দর চিত্র কবি এই সর্গের শেষে অঙ্কিত করিয়াছেন।

সেই ঘটনাপূর্ণ রাত্রে স্বর্গ ও লঙ্কায় বোধ হয় কেহই নিদ্রা যায় নাই। পঞ্চম সর্গে ইন্দ্র শচীকে বলিতেছেন,—

"ভাবিতেছি, দেবি,
কেমনে লক্ষ্মণ শূর নাশিবে রাক্ষসে?—
অজেয় জগতে, সতি, বীরেন্দ্র রাবণি!"

শচী কহিলেন,—

"মায়া দেবীশ্বরী
বধের বিধান কহি' দিবেন আপনি;—
তবে এ ভাবনা, নাথ, কহ কি কারণে?"

ইন্দ্র উত্তরে বলিলেন,—

"সত্য, যা' কহিলে,

দেবেন্দ্রাণি ; প্রেরিয়াছি অস্ত্র লঙ্কাপুরে ;
কিন্তু কি কৌশলে মায়া রক্ষিবে লক্ষ্মণে
রক্ষোযুদ্ধে, বিশালাক্ষি, না পারি বুঝিতে।"

এখন পর্য্যন্ত প্রস্তাবিত উক্ত 'কৌশলে'র বিবরণ কাহারও নিকট প্রকাশ পায় নাই। ইন্দ্রের ন্যায় পাঠকও উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন। কবি দেবতা ও মানবের মনের ভাব বুঝিয়া মহামায়াকে তন্দ্রাহীন ইন্দ্রের নিকট সেই অজ্ঞাত 'কৌশল' ব্যক্ত করিবার জন্য রাত্রির শেষভাগে পাঠাইলেন। মায়াদেবী ইন্দ্রের মন হইতে চিন্তাভার দূর করিবার জন্য কহিলেন,—

"যাই, আদিতেয়,

লঙ্কাপুরে ; মনোরথ তোমার পূরিব ;—
রক্ষঃ-কুল-চূড়ামণি চূর্ণিব কৌশলে
আজি। চাহি' দেখ, ওই পোহাইছে নিশি।
অবিলম্বে, পুরন্দর, ভবানন্দময়ী
উষা দেখা দিবে হাসি' উদয়-শিখরে ;
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যা'বে অস্তাচলে!
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লইব লক্ষ্মণে,
অসুরারি। মায়া-জালে বেড়িব রাক্ষসে।
নিরস্ত্র, দুর্ব্বল বলী দৈব-অস্ত্রাঘাতে,
অসহায় (সিংহ যেন আনায়-মাঝারে)
মরিবে ;—বিধির বিধি কে পারে লঙ্ঘিতে ?"

কাব্যের ষষ্ঠ সর্গে এই 'কৌশলে' লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ করিয়াছেন। মধুসূদন ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা কাব্যের সপ্তম সর্গে বিবৃত করিবার জন্য মহামায়ার মুখ দিয়া উক্ত 'কৌশল' ব্যক্ত হইবার পরেই ইন্দ্রকে তাঁহার মারফৎ কহিলেন,—

"মরিবে রাবণি রণে ; কিন্তু এ বারতা
পা'বে যবে রক্ষঃ-পতি, কেমনে রক্ষিবে
তুমি রামানুজে, রামে, ধীর বিভীষণে—
রঘু-মিত্র ? পুত্র-শোকে বিকল, দেবেন্দ্র,
পশিবে সমরে শূর কৃতান্ত-সদৃশ
ভীমবাহু ! কা'র সাধ্য বিমুখিবে তা'রে ?—
ভাবি' দেখ, সুরনাথ, কহিনু যে কথা।"

পঞ্চম সর্গে ইন্দ্র মহামায়ার নিকট উক্ত 'কৌশল' অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণের নিকট স্বপ্ন-দেবীকে প্রেরণ করিলেন। দেবী লক্ষ্মণকে স্বপ্নে কহিলেন, "উঠ, বৎস, রাত্রি প্রভাত হইল। লঙ্কার বনের মাঝে সরোবরের কূলে চণ্ডীর দেউলে মহামায়াকে পূজা করিতে যাও তাঁহার প্রসাদে মেঘনাদকে বধ করিবে।" লক্ষ্মণ স্বপ্ন-দেবীর উপদেশ মত কার্য্য করিলে মহামায়া তাঁহাকে উক্ত 'কৌশলে'র কথা যাহা শুনাইয়াছিলেন তাহা ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। ষষ্ঠ সর্গের প্রারম্ভে লক্ষ্মণ শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া রামচন্দ্র ও বিভীষণকে উক্ত 'কৌশলে'র কথা শুনাইলেন। এই সর্গে মায়াদেবী তাঁহার অঙ্গীকার বর্ণে বর্ণে পালন করিয়াছেন। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদ যখন বুঝিলেন যে লক্ষ্মণ তাঁহাকে যথার্থ-ই আক্রমণ করিতে আসিয়াছেন তখন তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —"সত্য যদি তুমি রামানুজ, কহ, রথি, কি ছলে পশিলা রক্ষোরাজপুরে আজি ?" লক্ষ্মণ উক্ত 'কৌশলে'র কথা না বলিয়া মেঘনাদকে রণে আহ্বান করিলেন। মেঘনাদ বিভীষণকে দ্বারের নিকট দেখিয়া বলিলেন,—"এতক্ষণে জানিনু, কেমনে আসি' লক্ষ্মণ পশিল রক্ষঃপুরে" ! মেঘনাদ মনে করিলেন যে বিভীষণ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া লক্ষ্মণকে গুপ্ত পথ দিয়া নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে আনিয়াছেন। বিভীষণ ব্যতীত অপর কোন-ও রাক্ষস উক্ত 'কৌশলে'র কথা অবগত ছিল না। রাবণের পক্ষে-ও বোধ হয় এই কৌশলের কথা জানিবার কোনও উপায় ছিল না। সপ্তম সর্গে মহাদেব কর্ত্তৃক প্রেরিত বীরভদ্র সেইজন্য রাবণকে মেঘনাদের মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

"ছদ্মবেশে পশি'

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে সৌমিত্রি-কেশরী,
রাজেন্দ্র, অন্যায় যুদ্ধে বধিল কুমতি
বীরেন্দ্রে !

• • • •

পুত্র-হানী শত্রু যে দুর্ম্মতি,
ভীম প্রহরণে তা'রে সংহারি' সংগ্রামে,
তোষ তুমি, মহেষ্বাস, পৌরজনগণে!"

তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি যে দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম সর্গে মধুসূদন উক্ত 'কৌশলে'র ক্রিয়া প্রক্রিয়া ও আনুসঙ্গিক বহু ব্যাপার বৈচিত্র্যময় ঘটনাবলীর ভিতর দিয়া পরিস্ফুট করিয়াছেন। বাস্তবিক, কবি পাঠ্য-কাব্যের কলেবরে নাটকীয় ঘটনাবলীর বিকাশ যে ভাবে দেখাইয়াছেন, তাহার তুলনা সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কাব্যের সূচনায় একটিমাত্র শব্দের প্রতিধ্বনিতে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। "মেঘনাদ-বধ" কাব্যরূপ মহীরুহ যে শিল্প-নৈপুণ্যে একটা মাত্র শব্দ ভেদ করিয়া সর্গের পর সর্গের ভিতর দিয়া শাখা প্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক বাঙ্গালী ভাষার কাব্য-ক্ষেত্রে অক্ষয় বটরূপে বিদ্যমান সেই অত্যাশ্চর্য্য শিল্প-নৈপুণ্যের কীর্ত্তি মধুসূদনকে অমরত্ব প্রদান করিয়াছে। এস্থলে উক্ত 'কৌশলে'র বিষয় আলোচনা করিয়া সমালোচকগণ লক্ষ্মণের চরিত্রের উপর যে দোষারোপ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা দরকার। মধুসূদনের ন্যায় এত বড় প্রতিভাশালী কবির বিচার-শক্তি কি লক্ষ্মণের চরিত্র-চিত্রণে সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছিল? বীরত্বের দিক হইতে লক্ষ্মণ-চরিত্রের সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে রাক্ষসেরা যে কৌশলে মানব-সমাজের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে, তদ্বিষয় ভাবিয়া দেখা উচিত। "মেঘনাদ-বধ" কাব্যের চতুর্থ সর্গে সরমা সীতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—

"কহ, হে দেবি, কি কৌশলে হরিল তোমারে
রক্ষঃপতি?"

ছদ্মবেশধারী রাবণ যে কৌশলে সীতাকে হরণ করিয়াছিলেন তাহা সকলেই জানেন। রাবণের ন্যায় চরিত্রহীন ব্যক্তি সমালোচকের চক্ষে যত বড়ই বীর হউন না কেন, সমাজের বিচারে তিনি বীর নামের অযোগ্য। যে লম্পট শৌর্য্য বীর্য্যের অধিকারী হইয়া পরস্ত্রী-হরণ করে, সে পশু হইতেও অধম। মধুসূদন "মেঘনাদ-বধ" কাব্যের চতুর্থ সর্গে জটায়ুর মুখ দিয়া রাবণ-চরিত্রের সমালোচনা করিয়াছেন।

"চিনি তোরে', কহিলা গম্ভীরে
বীরবর;—'চোর তুই, লঙ্কার রাবণ!
কোন্ কুল-বধূ আজি হরিলি, দুর্ম্মতি?
কার' ঘর আঁধারিলি, নিবাইয়া এবে
প্রেম-দীপ? এই তোর নিত্য কর্ম্ম, জানি।
অস্ত্রী-দল-অপবাদ ঘুচাইব আজি,
বধি' তোরে তীক্ষ্ণ শরে, রক্ষোরাজ! নির্লজ্জ পামর
আছে কি রে তোর সম এ ব্রহ্ম-মণ্ডলে?"

বীরবাহুর শোকে অধীরা চিত্রাঙ্গদা সীতা হরণের কথা অভাসে রাবণকে বলিয়াছেন আর সেই সঙ্গে রাবণের স্বদেশ-প্রেমে ভণ্ডতার বিরুদ্ধে বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিয়াছেন। বাস্তবিক, মধুসূদনের তুলিকার মৃদু স্পর্শনে বীররস-প্রধান কাব্যের নায়ক মেঘনাদ ও প্রধান পাত্র রাবণের যথার্থ চরিত্র স্থানে স্থানে এমন সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে যে তাহাতে বীরত্বের রেখাগুলি ফুটিয়া বাহির হইলেও চরিত্রহীনতার সূক্ষ্ম বর্ণ-বিন্যাস যাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে তাহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে। শিল্প-কলায় ইহা হইতে শ্রেষ্ঠতর চরিত্র-চিত্রণ কল্পনা করা যায় না। রণস্থলে রাবণের বীরত্বের প্রমাণ আমরা সপ্তম সর্গে-ই পাই। কাব্যের নায়ক মেঘনাদের বীরত্বের স্পষ্ট চিত্র কবি অঙ্কিত করেন নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বেই মেঘনাদ লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদের বীরত্ব-ব্যঞ্জক উক্তি ছাড়া আমরা আর কিছু শুনিতে পাই না। পূজার কোষাখানা তুলিয়া বুঝি তিনি লক্ষ্মণের শিরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন! কবির ক্ষিপ্র তুলিকা কতটা বীরত্ব মেঘনাদের এই একটুখানি সাহসের কার্য্যে প্রকাশ করিয়াছে তদ্বিষয় চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই উজ্জ্বল চিত্রের পার্শ্বে আর একখানি বিসদৃশ চিত্র স্থাপন করিয়া মধুসূদন মেঘনাদের বীর-চরিত্রে যে অসঙ্গতি দোষ আছে তাহা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। অতর্কিতভাবে লক্ষ্মণ আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলে মেঘনাদ তাঁহাকে সেই অবস্থায় নিহত করিবার মানসে "ধরিলা সত্বরে দেব-অসি", "কার্ম্মুক ধরি' কর্ষিলা", "সাপটিলা কোপে

কলক।" মেঘনাদ-চরিত্রের সমালোচনায় যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন,—"রামায়ণের মেঘনাদ মায়াবী বীর; মায়া-যুদ্ধেই তাঁহার বীরত্ব; মায়াসীতা ছেদন করিয়া তিনি রামচন্দ্রের উপর বিজয়-লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মধুসূদনের মেঘনাদে মায়া নাই, কপটতা নাই, লক্ষ্মণকে অসি উদ্যত করিতে দেখিয়া, তিনি প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীরের ন্যায় বলিলেন;—"সত্য যদি তুমি রামানুজ ইত্যাদি।" বসু মহাশয়ের এই অভিমত আমরা সমর্থন করিতে পারিলাম না। মধুসূদন মেঘনাদ-চরিত্রের সমালোচনা নায়কের নিজের মুখ দিয়াই আমাদিগকে প্রথম সর্গে শুনাইয়াছেন। বীরবাহুর মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া মেঘনাদ বলিলেন,—

"নিশা-রণে সংহারিনু আমি
রঘুবরে; খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিনু,
বরষি প্রচণ্ড শর, বৈরিদলে; তবে
এ বারতা, এ অদ্ভুত বারতা, জননি,
কোথায় পাইলে তুমি, শীঘ্র কহ দাসে।"

এই নিশা-রণের বিবরণ "মেঘনাদ-বধ" কাব্যে নাই, কিন্তু ইহা যে আর্য্য-সভ্যতার যুগে অন্যায় যুদ্ধ বলিয়া ক্ষত্রিয়-সমাজে নিন্দনীয় ছিল তাহা পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। কবি বীরবাহুর মৃত্যুর পূর্ব্বে ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক একবার রামের নাগপাশে বন্ধন ও দ্বিতীয় বার যুদ্ধে তৎকর্ত্তৃক তাঁহার নিধন ও পরে তাঁহার পুনর্জ্জীবন-লাভের বিবরণ যাহা কৃত্তিবাসী রামায়ণে লিখিত আছে তৎসমুদয়ের বৃত্তান্ত 'নিশা-রণে'র কথার আভাসে উল্লেখ করিয়া মেঘনাদের যথার্থ চরিত্রের একখানি নক্সা আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। উদ্ধৃত শ্লোকে 'নিশা-রণে'র উল্লেখ হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, মধুসূদন জানিতেন যে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার হইতে মেঘনাদ একবার বাহির হইয়া আসিতে পারিলে তিনি মেঘের আড়াল হইতে, আর না হয় অন্য কোনওরূপে, অন্যায় যুদ্ধে লক্ষ্মণকে বধ করিবেন। লক্ষ্মণ মেঘনাদের বাক্যে ভুলিয়া তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলে ভণ্ডামীকে প্রশ্রয় দিয়া নিজের ও সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেন। যে মেঘনাদের পিতা লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীকে হরণ করিয়া আনিয়াছে, যাঁহার শৌর্য্য বীর্য্য শিক্ষা এতদিন ধরিয়া পরস্ত্রী-হরণকারী পিতার সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয় কার্য্যের পোষকতা করিয়া আসিতেছে, যিনি দৈববলে বলী হইয়াও অন্যায় যুদ্ধ ছাড়া ন্যায়-যুদ্ধ করিতে জানেন না, তাঁহার প্রবঞ্চনাপূর্ণ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিলে লক্ষ্মণ আত্মহত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত হইতেন। মধুসূদন লক্ষ্মণের কার্য্যের সমর্থন করিয়া যে উপমাটি তাঁহার মুখ দিয়া আমাদিগকে শুনাইয়াছেন, তাহার সার্থকতা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অবস্থা-বিশেষে নিরস্ত্র শত্রুকে বীরপুরুষগণ নিহত করিতে বাধ্য হইয়া পড়েন। "আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু ছাড়েরে কিরাত তারে?" মধুসূদন এস্থলে মেঘনাদকে ব্যাঘ্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এই তুলনা উদ্দেশ্যহীন নহে। মানুষের শৌর্য্য বীর্য্য ন্যায় যুদ্ধের একটা নিয়ম মানিয়া চলে। নীতিজ্ঞানশূন্য শার্দ্দূল-স্বভাব অসভ্য রাক্ষস পাশববলের অধিকারী হইলেও ন্যায়-যুদ্ধের নিয়ম সে কার্য্য-কালে উপেক্ষা করিয়া থাকে। জগতের ইতিহাসে পাশব-বলের তথাকথিত বীরত্বের কাহিনী সকলেই পাঠ করিয়াছেন। মধুসূদন এই উপমার ভিতর দিয়া আভাসে পাঠককে বলিয়াছেন যে, মেঘনাদ মুখে বীরত্বের বড়াই করিলেও কার্য্যতঃ তিনি কখনও ন্যায়-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পাত্র নহেন। ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্র-স্বভাব মেঘনাদ রক্ত-পিপাসু পশুর মত যে কোনও উপায়ে প্রতিপক্ষের জীবনান্ত করিয়া একাধিকবার তথাকথিত বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন। মধুসূদন তাঁহার বীররস-প্রধান কাব্যের নায়কের চরিত্র বীরত্বের আবরণে আবৃত করিয়া রাখিলেও সে চরিত্রে যে বীরত্বের সহিত ভণ্ডামী প্রবঞ্চনা ও অধর্ম্মের সংমিশ্রণ আছে, তাহা এই উপমাদ্বারা সুন্দর ভাবে ইসারায় ব্যক্ত করিয়াছেন। রাবণ-চরিত্রের ন্যায় মেঘনাদ-চরিত্রের চিত্রেও কবি আশ্চর্য্য সূক্ষ্ম শিল্পের পরিচয় দিয়াছেন। আলোচ্য উপমায় কিরাতের কৌশলের সহিত যে মায়াত্মক কৌশলে মেঘনাদ এক্ষণে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন তাহার তুলনা অতীব সুন্দর। পাশব বলের প্রতিভূ, চরিত্রহীন মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক অন্যায় যুদ্ধপ্রিয় লম্পট বা লাম্পট্যের পরিপোষক

শত্রুর হস্ত হইতে যদি নির্য্যাতিত নারীরত্নকে উদ্ধার করিতে হয় তাহা হইলে যে কোনও দেশের সিভালরি (chivalry) ম্যাকিয়াভেলিয়ান (machiavellian) কৌশল অবলম্বন করা অসঙ্গত বলিয়া মনে করে না। মধুসূদন কিন্তু লক্ষ্মণের চরিত্রে ম্যাকিয়াভেলির প্রবর্ত্তিত কূটনীতির কালিমা আরোপ করেন নাই। ঘটনাচক্রে পড়িয়া দৈবশক্তির উত্তেজনায় মধুসূদনের লক্ষ্মণ যে কার্য্য করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার লজ্জিত হইবার কোনও কারণ নাই। লক্ষ্মণ তাঁহার দ্বিতীয় উক্তিতে মেঘনাদকে বলিয়াছেন,—"দেবা-দেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে!" "মেঘনাদ বধ" কাব্যে দৈবের যে কতটা প্রভাব কবি দেখাইয়াছেন তদ্বিষয় চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। সীতার মাতা বসুন্ধরা কন্যাকে স্বপ্নে কহিয়াছিলেন,—"বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে রক্ষোরাজ।" সরমাও সীতাকে বলিয়াছেন,—"বিধির ইচ্ছা, তেঁই লঙ্কাপতি আনিয়াছে হরি তোমা।" মেঘনাদকে নিহত করিবার যে কৌশল কবি আবিষ্কার করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে সমসাময়িক সমাজের দিক হইতেও একথা বলা যাইতে পারে যে, এতদ্দ্বারা মধুসূদন দুর্ব্বল হিন্দু সমাজকে প্রবল শত্রুর উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিবার যে উপায় দেখাইয়া দিয়াছেন তাহাতে ষড়যন্ত্রকারী বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রেরই নিদর্শন পাওয়া যায়। বাস্তবিক, সমগ্র "মেঘনাদ বধ" কাব্যখানি বিশ্লেষণ করিলে আমরা তিনটী প্রধান বিষয়ের পরিচয় পাই। প্রথম, দৈবশক্তির প্রভাব; দ্বিতীয়, পারিপার্শ্বিক সমাজের প্রভাব; তৃতীয়, কবির আশ্চর্য্য শিল্প-নৈপুণ্য। এই তিনটী বিষয়েরই স্পষ্ট প্রমাণ "মেঘনাদ বধ" কাব্যের সূচনায় বিদ্যমান। এই সূচনা "মেঘনাদ বধ" কাব্যরূপ মন্দিরের সিংহদ্বার। মন্দিরের স্থাপত্য-শিল্পের গৌরব ও সৌন্দর্য্য এই সিংহদ্বারের কারুকার্য্য হইতে স্পষ্ট অনুমান করা যায়। ইহার তুলনা কাব্য-জগতে নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

মাতৃহীন।

[শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত, এম-এ, বি-এল]

তখন রাত্রি আটটা। আমি অতিরিক্ত এক কাপ চা খাইতেছিলাম, আর গিন্নী খুকীকে দোলনায় শোওয়াইয়া ধীরে ধীরে দোল দিতেছিলেন। চায়ে চুমুকের সঙ্গে সঙ্গে দেখিতেছিলাম, গোলাপের পাপড়ীর মত খুকীর চোখের পাতা ধীরে ধীরে বন্ধ হইতে এবং এক-একবার ঈষৎ খুলিয়া যাইতে। এমন সময় গিন্নী কহিলেন—"তোমার বন্ধুর ডায়েরীটা অনেক দিন পড় নাই। আজ একবার পড়লে হয় না?"

এই ডায়েরীটা আমার বন্ধু বিনয়চন্দ্র তাহার মৃত্যুর সময় আমাকে দিয়া গিয়াছিল। আমি দেরাজটা ধীরে ধীরে খুলিয়া সেই ডায়েরীটা বাহির করিলাম। গিন্নী কহিলেন—"যেখানে চুলের কাঁটাটা আছে সেখান থেকে সুরু কর।"

"তথাস্তু" বলিয়া আমি চুলের কাঁটার স্থানটা বাহির করিয়া গিন্নীর আদেশ প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করিলাম। বিনয় লিখিয়াছে—

"ছোট বেলায় যাকে মা বলতুম, যাকে মা বলেই জানতুম তিনি ছিলেন আমার বাপের পিসীমা। তাঁরই কোলে-কাঁখে চড়ে পাড়া বেড়াতুম, তাঁর হাতেই খেতুম পরতুম, তাঁর কাছেই রাত্রে শুতুম, আর তাঁরই শুষ্কহীন স্তন পান করে ঘুমিয়ে পড়তুম। আমার সমবয়সী সকলের মা-ই ছিলেন যৌবনসম্পন্না—ঠিক যৌবনসম্পন্নাও বলতে পারি না, কারণ তখন যৌবন অযৌবনের জ্ঞান ছিল না। তবে তাঁরা যে সকলেই বৌ মানুষ ছিলেন, রাত-দিন ঘোমটা দিয়ে থাকতেন, কেবল আমায় যখন তাঁরা কোলে নিতেন তখন তাঁদের মুখ দেখতে পেতুম আর দু-চারটে

চুপচাপ কথাও শুনতে পেতুম—তাহা আমার খুব স্পষ্টই মনে আছে। কিন্তু আমার মায়ের সে সকল কোন বালাই ছিল না। তিনি অন্দর বাহির দুই মহলেই অবাধে চলা ফেরা করতেন, আর মাথায় কাপড় না দিয়েও সকল বাড়ীর কর্ত্তার সঙ্গে উঁচু গলায় কথা বলতেন, আর পাড়ার যত বৌ মানুষ তাঁরাও তাঁকে দেখে ঘোমটা টেনে খুব সমীহ করে বসতেন। এর কারণটা তখন টের পাইনে, কিন্তু কিছু বড় হয়ে জেনেছিলুম। তিনি শুধু আমাদের বাড়ীর সকলের চেয়ে যে বয়সে বড় ছিলেন তা' নয়। আশে-পাশে কোন গ্রামে অত বড় বুড়োমানুষ আর ছিল না। অত বড় ঝুনো বুড়ো গোঁসাই-ও তাঁর চেয়ে অন্ততঃ দশ বচ্ছরের ছোট ছিলেন।

এত বড় বুড়োমানুষ আমার মা, সেজন্য মনের মধ্যে বিন্দুমাত্রও আপশোষ ছিল না। সত্যিকার ছেলে যেমন মায়ের সঙ্গে রাগ অভিমান করে, আবার মনের আনন্দে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আর মায়ের বুকের মাঝে মুখ গুঁজে অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে মাতৃস্তন্য খেতে সুরু করে, আমিও আমার বুড়া মার সঙ্গে তেমনিই করতুম। একদিনের অভিমানের কথা এখনও মনে আছে। কিসের জন্য যে ঐ বিরাট অভিমান আমার ক্ষুদ্র প্রাণটীকে অধিকার করেছিল তার বিন্দুমাত্রও এখন মনে নাই। আমি জেদ্ ধরেছিলাম কিছুতেই আর সেদিন খাব না। সকলের আদর অভ্যর্থনা বিফল হলে বুড়া মা একবাটি মাখা ভাত হাতে করে এসে কোন কথা না বলেই আমাকে কোলে তুলে নিলেন। রাগের সময় কথা নাই বার্ত্তা নাই চট্ করে কোলে তুলে নিলে আমার রাগের মাত্রা যে দশ বার গুণ বৃদ্ধি না পেত তা নয়—হাত পা ছুঁড়ে চীৎকার দিয়ে যে মাটীতে পড়বার জন্য চেষ্টা না করতুম তা'ও নয়, কিন্তু বুড়া মার কোলে উঠে এদৃশ্য যে কোন দিন দেখিয়েছি তা মনে নেই। সেদিন আমাকে কোলে তুলে বাহির বাড়ী নিয়ে গেলেন। সেখানে উঠানের উপর ছোট্ট একটী আম গাছ ছিল। তারই ডালে আমাকে বসায়ে নীচ হতে এক হাতে আমাকে ধরে আর এক হাতে আমাকে খাওয়াতে লাগলেন। আমি নির্ব্বিবাদে সে বাটির শেষ অন্নটি পর্য্যন্ত গ্রহণ করলাম। বুড়া মা জানতেন ঐ আম গাছের ডালে উঠবার জন্য সকলকে আমি কত অনুরোধ করতাম, আর ঐ ডালটীতে বসতে আমার কত ভাল লাগত।

আমার একজন বিমাতা ছিলেন। তখন তাঁকে মা বলেও জানতুম না, বিমাতা বলেও জানতুম না। বড় হয়ে তাঁকে বিমাতা বলেই জেনেছি আর মা বলেই ডেকেছি. কিন্তু তখন যে তাঁকে মা বলে ডাকি নাই তা মনে আছে। কোন দিন তাঁর কোলেও উঠি নাই, আদর অনাদরও বোধ হয় তিনি করেন নাই। মাতৃস্তন্য যে কত মধুর তা একদিন তিনিই আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সেদিন সন্ধ্যার সময় বুড়া মা মালার থলী হাতে করে জপ করতে বসেছিলেন। মাছ খাই বলে আমি তাঁর সামনে পিঁড়ীতে বসে তাঁর সুদীর্ঘ জপের শেষ হওয়া প্রতীক্ষা করছিলুম। মনে থাকতো না বৈকালে তাঁকে ছুঁলে তাঁর স্নান করতে হয়। তাই সেই ভোলা মনে তাঁর কোলে উঠবার জন্য তাঁকে ছুঁয়ে দিয়ে কত দিন যে তাঁকে স্নান করতে বাধ্য করেছি তার ঠিক নাই। জপ শেষ করে তিনি প্রতি সন্ধ্যায় গল্প বলতেন। অবেলায় স্নান করতে করতে বিরক্ত হয়ে শেষে বলেছিলেন—অবেলায় ছুঁস যদি তবে আর গল্প বোলব না। গল্পের লোভে তাই অবেলায় ছোঁয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেদিনও গল্পের লোভে তাঁর সামনে বসেছিলুম। এমন সময় আমার বিমাতা এসে আমায় কোলে তুলে নিলেন এবং গল্প শোনাবার লোভ দেখিয়ে তাঁর পার্শ্বে লেপের নীচে শোয়াইয়া দিলেন। কিন্তু গল্প বলার পরিবর্ত্তে তিনি ধীরে ধীরে আমাকে তাঁর বুকের কাছে টেনে নিয়ে তাঁর ক্ষীর ভরা স্তন্য আমার মুখের মধ্যে গুঁজে দিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে আমার ভাই কি বোন হয়ে নষ্ট হয়েছিল, তাই ক্ষীরে আমার মুখ ভরে' উঠল। মাতৃস্তন্য যে কত মিষ্ট তা' আমি সেইদিন বুঝলুম, আর মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘুমের কোলে লুটিয়ে পড়লুম। সকালে ঘুম ভাঙ্গলে দেখ্লাম বুড়া মার কাছেই শুয়ে আছি। সেই মুহূর্ত্তের জন্য মাতৃস্তন্যের স্বাদ এখনও যেন আমার মুখে লেগে আছে। সেই দিন হতে বুড়া মার

শুষ্ক স্তন্য পান করবার সময় কিসের যেন একটা অভাব বোধ করতাম। কিসের যেন একটা বেদনা মনের মধ্যে জেগে উঠত। বড় হয়ে মায়ের কোলে ছেলে দেখলেই আমার মনে হ'তো—আহা! আমি যদি ঐ শিশু হতেম আর ঐ শিশুটীর মত মায়ের বুকে মুখ গুঁজে মাতৃস্তন্য পান করতে পারতেম, আমার জীবন তা' হ'লে ধন্য হ'তো। কিন্তু এ যে পূর্ব্বজন্মের অভিশাপ—এ আকাঙ্ক্ষা যে মেটবার নয়—এ বেদনা যে যাবার নয়। পূর্ব্বজন্মে না জানি কার সন্তানকে মাতৃস্তন্য হ'তে বঞ্চিত করেছিলাম, সেই জন্যই বোধ হয় ভগবান আমাকে সে অমৃত হ'তে বঞ্চিত করে' রাখলেন।

বুড়া মা যে আমার মা নন এ জ্ঞান যে আমার কেমন করে হ'লো এখন তাই বোলব। এই নিদারুণ সংবাদ কেমন ক'রে যে বুক পেতে অনুভব করলুন, কেমন ক'রে যে আমার এক সুকোমল স্নেহ-নীড় ভেঙ্গে গেল সে কথা মনে পড়লে এ বয়সেও আমার চোখ জলে ভরে উঠে। সেদিন বৈকালে খেলে এসে বুড়া মাকে আর দেখতে পেলুম না। এঘর-সেঘর ক'রে তাঁকে খুঁজতে লাগলুম, আর সঙ্গে সঙ্গে বুড়া মা বুড়া মা বলে চেঁচাতে লাগলুম। এমন সময় এক বাটি মাখা ভাত নিয়ে পিসীমা এসে বল্লেন—"বুড়া মা গোঁসাইবাড়ী গেছেন, আর একটু পরেই আসবেন।" "বুড়া মা এলে খাব" বলে আমি আবার খেলতে যেতে চাইলুম। পিসীমা লক্ষ্মী সোনা বলে আমাকে কোলে তুলে নিয়ে বল্লেন, "গল্প শুনবি?" এই গল্প শুনতে যে আমার কত ভাল লাগত তা' সকলেরই জানা ছিল। তাই পিসীমা আমার সম্মতির অপেক্ষা না করে বলতে লাগলেন—"এক রাজার ছিল সাত ছেলে আর টুকটুকে একটি মেয়ে।" এই গল্পটা যে কতবার শুনেছিলুম তার ঠিক নাই। তবুও প্রতিবারই যেন গল্পটা নূতনও লাগতো, মিষ্টিও লাগতো। গল্পের সঙ্গে সঙ্গে বাটির ভাত যে মুখে প্রবেশ করছিল সেদিকে আমার খেয়ালই ছিল না। গল্প শেষ হ'বার পূর্ব্বেই বাটির ভাত ফুরিয়ে গেল। গল্প বন্ধ করে পিসীমা বল্লেন—"নে মুখ ধুয়ে নে।" এক মুহূর্ত্তে মনে পড়ে গেল আজ বুড়া মার পরিবর্ত্তে পিসীমার হাতে ভাত খেয়েছি, আর অমনই চেঁচিয়ে উঠলাম—"কেন তুই আমাকে খাওয়ালি?" সঙ্গে সঙ্গে বুড়া মাকে ডাকতে লাগলুম। অতি কষ্টে আমাকে প্রবোধিত করে পিসীমা বললেন—"বুড়া মার সঙ্গে বসে "দলা" খাবি আবার। এখন গল্পের শেষটা শুনবি, না শুনবি না?" আবার সেই গল্পের মায়ায় পড়ে বুড়া মার কথা ভুলে গেলাম। সন্ধ্যার সময় বুড়া মা যখন ফিরে এলেন তখন আমি পিসীমার কোলে চড়ে' পশ্চিম বাড়ী বেড়াতে গেছি। পিসীমার সঙ্গে পশ্চিম বাড়ীর ঠাকুরমার কি যেন একটা কথা হচ্ছিল, এমন সময় বুড়া মার গলার আওয়াজ আমার কানে গেল। তখন আমাকে এক মুহূর্ত্ত আটকিয়ে রাখে কার সাধ্য। পিসীমার কোল হ'তে কখন যে নেমে পড়ে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে দৌড়ে গিয়ে বাড়ীতে এসে বুড়া মার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লুম তা তিনি বোধ হয় টেরও পেলেন না। কোথায় গেল সেই অবেলায় ছুঁয়ে দেওয়ার নিষেধ। সে রাতে আর বুড়া মা স্নান করলেন না, গঙ্গা জল ছুঁয়ে শুদ্ধ হলেন। সেদিন নিশ্চয়ই মাছ খাই নাই, নইলে গঙ্গারও সাধ্য থাকত না তাঁকে পবিত্র করতে আর তাঁর স্নান আটকিয়ে রাখতে। দিন রাত্রির মধ্যে বুড়া মা খেতেন মাত্র একটিবার। সেদিন তখন পর্য্যন্তও তিনি কিছু খান নাই। আমাকে সামনে বসিয়ে তিনি খেতে বসলেন, আর মাঝে মাঝে আমাকে একটি করে দলা মেখে দিতে লাগলেন। তাঁর চোখ যে জলে ভরে উঠছিল আর আঁচল দিয়ে যে তিনি মাঝে মাঝে চোখ মুছছিলেন তা' সেদিন লক্ষ্য করলেও বুঝতে পারি নাই যে বুড়া মা সেদিন কাঁদছিলেন।

খাওয়া শেষ করে আমাকে নিয়ে তিনি শোবার ঘরে এসে বসলেন। আর সবাই এসে তাঁকে ঘিরে বসলো। এমন করে বুড়া মাকে ঘিরে বসা কেবল সেই দিনই দেখেছিলুম। কেবল আমাদের বাড়ীর সবাই নয়, আর দু-তিন বাড়ীর বৌ-ঝিয়েরাও এসে সেখানে বসেছিলেন। তাঁরা সবাই বুড়া মার সঙ্গে ফিস্ ফিস্ ক'রে কি যেন বলাবলি করছিলেন। তাঁদের কথা বুঝবার শক্তি তখন আমার ছিল না। তাই একবার এর মুখ, আর একবার

তার মুখ ক'রে শেষে বুড়া মার মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন একটা শঙ্কা অনুভব করলাম। এই অনাগত বিপদের অস্পষ্ট আশঙ্কার জন্যই বোধ হয় সে রাত্রে বুড়া মাকে খুব ভাল করে জড়িয়ে শুয়ে রইলুম। কিন্তু ও হরি! সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই দেখি আমি বিছানায় একা শুয়ে আছি, বুড়া মাও নাই, পিসীমাও নাই, কেউ নাই।

ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে "বুড়া মা" "বুড়া মা" করে ডাকতে লাগলুম। কিন্তু সে ডাক শুনে বুড়া মাও এলো না, পিসীমাও এলো না। এঘর-ওঘর ঘুরে ফিরে কাউকে না পেয়ে আমি পশ্চিম বাড়ী চলে গেলাম। সে বাড়ীর খুড়ীমা আমাকে দেখতে পেয়েই বললেন, "বুড়ী যদি মা হতো, তবে কি আর এমনি করে ফেলে যেতে পারতো।" কথাটা আমার মর্ম্ম স্পর্শ করতে একবিন্দুও দেরী করল না। হৃদয়ে আমার কেমন যেন শূন্যতা অনুভব করলাম। মুহূর্ত্তের মধ্যে কি যেন হারিয়ে ফেললাম। আমার কিসের স্বপ্ন যেন ভেঙ্গে গেল। কিন্তু তখনও ভাল করে বুঝলাম না খুড়ীমার কথাটার মানে কি। কিন্তু সেখানে আর অপেক্ষা করতে পারলাম না, আমি বাড়ীতে ছুটে গেলাম। পিসীমারা সবাই ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু আসেন নাই কেবল বুড়া মা। আমি বাড়ীময় খুঁজে বেড়াতে লাগলাম, কাউকে বুড়া মার কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস হলো না। পিসীমা বোধ হয় আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেছিলেন, তাই তিনি এসে আমাকে কোলে তুলে নিলেন। আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললাম—"বুড়া মা?"

পিসীমা বললেন—"গোঁসাই বাড়ী গেছে। লক্ষ্মী সোনাকে পিসীমার কাছে রেখে গেছে।"

আমি বললাম—"চল গোঁসাই বাড়ী।"

পিসীমা বললেন—"আমি কি গোঁসাই বাড়ী যাই না যেতে পারি যে তোকে নিয়ে সেখানে যাব? তোর জন্য কত খেলনা, কত বাঁশী নিয়ে আসবে।"

আমি বললাম—"বাঁশী নিয়ে আসবে?"

"দেখবি কেমন সুন্দর বাঁশী।"

"তলোয়ার আনবে না?"

"হাঁ তলোয়ারও আনবে। কিন্তু বুড়া মার জন্য কাঁদতে পাবি না। কাঁদলে কিন্তু বাঁশীও আনবে না তলোয়ারও আনবে না।"

বাঁশী আর তলোয়ারের লোভে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলুম, আর মাঝে মাঝে সড়কে গিয়ে দেখতে লাগলুম বুড়া মা ফিরে আসছেন কি না। আমার খেলার সাথীরা এসে আমাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি কেবল বুড়া মার কথাই ভাবছিলাম, বুড়া মার আগমনই প্রতীক্ষা করছিলাম।

খেলা সাঙ্গ হওয়া মাত্র আমি 'বুড়া মা, বুড়া মা' করতে করতে বাড়ীর দিকে ছুটে চললাম। কিন্তু বুড়া মার পরিবর্ত্তে এলেন আমার পিসীমা। আমাকে কোলে তুলে নিয়ে পিসীমা বল্লেন—"বাঁশী কিনতে দেরী হবে। এ বেলায় ত আসতে পারবে না ও বেলায় আসবে।"

আমি পিসীমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম—"ও বেলায় আসবে?"

পিসীমা বল্লেন—"আসবে।"

আমার যেন কেমন একটা সন্দেহ হলো—কেমন যেন একটা শঙ্কা উপস্থিত হলো।

সেদিন কম পক্ষে তিন চারটে গল্প শুনায়ে পিসীমা আমাকে নাওয়াতে খাওয়াতে পেরেছিলেন। এই গল্প শোনার মাঝে মাঝে পিসীমাকে যে কতবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম—বিকালের আর কত দেরী? এখনও বিকাল হয় নি?—তার ঠিক নাই।

বৈকাল হ'তে না হ'তেই পিসীমাকে বল্লাম—চল দেখে আসি বুড়া মা আসছে কি না। পিসীমা আমাকে কোলে তুলে নিয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালেন। আমি পিসীমার কোলে চড়ে দেখতে লাগলুম বুড়া মাকে দেখা যায় কি না। দূরে কোন মানুষ আসছে দেখলেই বুক আমার আনন্দে ভরে উঠত। "ঐ আসছে," "ঐ আসছে" বলে পিসীমাকে দেখাতুম। কিন্তু একটু পরেই যখন দেখতুম বুড়া মা নয়, তখন দুঃখে অস্থির হয়ে উঠতুম।

চোখে যখন আর দেখা যাচ্ছিল না, তখন পিসীমা বললেন—চল এখন বাড়ী যাই। আমি হতাশ হয়ে

বললাম—"বুড়া মা আসবে না?" পিসীমা বললেন, "অন্ধকার হয়ে গেছে, এখন আর কেমন করে আসবে। কাল আসবে।"

আমার বিশ্বাস হলো না, তাই বললুম—"না আজই আসবে। নিশ্চয়ই আসবে।" আমি কিছুতেই বাড়ী যাব না, ঐ রাস্তাতেই বুড়া মার জন্য অপেক্ষা করব। অনেক সাধ্য সাধনা করেও পিসীমা আমাকে বাড়ী নিয়ে যেতে সমর্থ হলেন না। শেষে তিনি বললেন—"তোর বুড়া মা ওদিককার রাস্তা দিয়ে ত ফিরে আসেন নি?"

আমি বললাম—"তাই এসেছে নিশ্চয়। চল্ শিগ্‌গীর বাড়ী চল্।"

বাড়ীতে ফিরে এসে বুড়া মাকে দেখতে না পেয়ে কাঁদতে লাগলেম, আর কেবল "বুড়া মা", "বুড়া মা" বলে ছট্‌ফট্ করতে লাগলেম। সেদিন কেউ আর আমাকে সান্ত্বনা দিতে পারল না। কাঁদতে কাঁদতেই সেদিন ঘুমিয়ে পড়লুম।

পরের দিন ঘুম ভাঙ্গতেই বিছানার এ-পাশ ও-পাশ খুঁজে দেখলুম বুড়া মা আছে কি নাই। বিছানায় তাঁকে না দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে বাড়ীময় তাঁকে খুঁজতে লাগলুম। তাও পেলুম না। মধ্যবাড়ী, পশ্চিম বাড়ী, দক্ষিণ বাড়ী তন্ন তন্ন করে খুঁজে কোথাও যখন তাঁকে পেলুম না, তখন রাস্তায় গিয়ে বুড়া মা বুড়া মা বলে কাঁদতে লাগলাম, আর এক পা দুই পা করে গোঁসাইবাড়ীর দিকে অগ্রসর হলাম। এমন সময় পশ্চিম বাড়ীর খুড়ীমা কোথা থেকে এসে, "মা-মরা ছেলেকে এমন করে মানুষ আবার ফেলে যায়!" বলে আমাকে কোলে তুলে পাছ দুয়ার দিয়ে তাঁদের অন্দরে ঢুকে বললেন—"এমন করে মা-মরা ছেলেকে ফেলে যে তীর্থে যায় সে তীর্থের নামে ছাই।"

খুড়ীমার কথা ভাল করে বুঝবার শক্তি তখনও আমার হয় নাই। কিন্তু "মা-মরা ছেলে" আর "ফেলে তীর্থে গেছে" এই দুটি কথায় আমি যেন কেমন শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্রন্দন থেমে গেল। খুড়ীমাকে বললাম—"বুড়া মা?"

খুড়ীমা বললেন—"তিনি তীর্থে গেছেন, যদি তোর মা থাকত, তবে কি আর এমন করে কাঁদিয়ে যেতে পারত?"

"কে বললে আমার মা নাই?" ব'লে খুড়ীমার মুখের দিকে তাকালেম। খুড়ীমা বললেন—"তোর মা তোকে এতটুকু রেখে মরে গেছেন।" আমার চোখ ছল ছল হয়ে উঠল দেখে তিনি আকাশের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন—"ঐখানে চলে গেছেন।"

আমি বললাম—"আর আসবে না?"

তিনি বললেন—"না, আর আসবে না।"

"বুড়া মা?"

"বুড়ী তোর মা নয়। তিনি তীর্থে গেছেন। সাত আট দিন পরে ফিরে আসবেন।"

তখন কি যে একটা শূন্য শূন্য ভাব মনের মধ্যে জেগে উঠল তা আর এখন প্রকাশ করতে পারি না। খুড়ীমা আমাকে খেতে আদর করলেন, আমি ধীরে ধীরে তাঁর কোল থেকে নেমে বাড়ীতে ফিরে গেলুম। আমার কি যেন হারিয়ে গেল মনে হ'ল। আমার মা নাই, বুড়া মা আমার মা নন, আমার মা থাকলে আমাকে ফেলে তীর্থে যেতেন না, কেবল এই কথা কয়টি ঘুরে ফিরে মনে আসতে লাগল। তখন থেকে বুড়া মার জন্য আর একদিনও কাঁদি নাই তা আমার মনে আছে। কিন্তু ঐ কান্নার সঙ্গে সঙ্গে আমার মন থেকে যে আনন্দ চলে গেল আর ভাবনার উপর ভাবনা যে আমার ক্ষুদ্র চিত্তটিকে অজ্ঞের অজ্ঞাতে অভিভূত করে ফেলল, তা কেউ বুঝতে পারল না। এর পরেও অনেক দিন হেসেছি কেঁদেছি, কিন্তু এ হাসি-কান্নার মধ্যে পূর্ব্বের উদ্দামতা আর অনুভব করি নাই। সেইদিনই আমার শৈশব শেষ হয়ে গেল, দুঃখময় সংসার-দ্বার সেই দিনই আমার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত দেখতে পেলাম। সেই দিন থেকেই আমি শান্ত শিষ্ট ভদ্র হয়ে উঠলাম। বাড়ীর সবাই তখন থেকে বলতে লাগলেন—"ছেলে আমাদের বিনয়। এক বিন্দু কান্নাকাটি নাই। খাবার-দাবারের জন্য কোন "বায়না" নাই। একা একা কেমন চুপ চাপ ক'রে খেলে।" আমার কান্নাকাটি থামতে দেখে পিসীমারা যে কি খুসী হলেন তা আর কি বোলব। কিন্তু তাঁরা কেউ বুঝতে পারলেন না কি দুঃখে আমার কান্নাকাটি থেমে গেছে।

একদিন সকালে উঠে দেখি বুড়া মা ফিরে এসেছেন। আমাকে উঠতে দেখেই তিনি আমায় কোলে তুলে নিলেন। আমি কিছু বল্‌লাম না, একটা অনুযোগও দিলাম না। বুড়া মা বল্‌লেন—"তোর জন্ত কেমন সুন্দর একটা বাঁশী নিয়ে এসেছি।" একটা 'পোটলা' খুলে বাঁশীটা আমার হাতে দিয়ে বল্‌লেন, "এই দেখ। বাজা দেখি।"

বাঁশী পেয়ে আর এতদিন পরে বুড়া মার কোলে উঠে যে আনন্দ আমার হওয়া উচিত ছিল, তার সিকিটুকুও হলো না। সে বাঁশী আমি একদিন মাত্র সেই ঘরের মধ্যে বাজিয়েছিলাম। আমি যদি পূর্ব্বের মত থাকতুম তা হলে ঐ বাঁশী মুখে করে বাজাতে বাজাতে পাড়ার সকলকে যে দেখিয়ে আসতুম তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। বুড়া মা এলেন বটে, কিন্তু যে বুড়া মা গিয়াছিলেন সে বুড়া মা যে আসেন নাই তা নিশ্চয়! তিনি যে বদলে গিয়াছিলেন তা নয়, আমিই বদলে গিয়াছিলাম। তাই পূর্ব্বের ন্যায় বুড়া মার কোলে চড়তে, তাঁর সঙ্গে ঘুরতে ফিরতে, খেতে পরতে, শুতে আর তাঁর স্তন্য পান করতে আমার আর কোন আগ্রহই দেখা দিল না। তাঁর গল্প শুনতেও তেমন আর ভাল লাগত না। তাই সন্ধ্যা হলেই আমি ঘুমিয়ে পড়তুম—বুড়া মা এলেন কি গেলেন, সে দিকে চেয়েও দেখতাম না।

একটু বড় হয়ে যখন জানলাম খুড়ীমার বাড়ী আমার মামার বাড়ীর কাছে আর আমার মাসীর সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় আছে, তখন থেকে মাঝে মাঝে খুড়ীমার রান্না-ঘরের দরজায় যেয়ে বসতাম। কত দিন যে তাঁকে মার কথা জিজ্ঞেস করতে চেয়েছি, কিন্তু মুখ ফুটে একদিনও তাঁকে কিছু বলতে পারি নাই।

একদিন তিনি বললেন—"তোর মামার বাড়ী যাবি? তোর মাসীর কাছে যাবি? মাসী তোকে দেখতে চেয়েছে।" এ সব কথার আমি কোন উত্তর দিতে পারতাম না। আর একদিন খুড়ীমা বল্‌লেন—"তোর মা যে কি সুন্দর ছিল! মাথায় যে তাঁর কি সুন্দর চুল ছিল! দাঁড়ালে ঠিক হাঁটুর নীচে এসে পড়ত আর বস্‌লে মাটীতে গড়াত।" সেদিন থেকে মায়ের কথা ভাবতে গেলেই আমার চোখের সামনে খুব লম্বা ঘন কাল চুল দিয়ে ঘেরা একখানি স্নিগ্ধ সুন্দর মুখ ভেসে উঠত।

আর একটু বড় হয়ে আমি ভাবতুম, মাকে আমি দেখেছি, মাকে আমার মনে আছে। এই বিশ্বাস আমার মনে স্থায়ীভাবে বাস করছিল। কিন্তু একদিন এ স্বপ্নও বিধাতার নিষ্ঠুর বিধানে ভেঙ্গে গেল। সেদিন আমাদের পাড়ার মেয়েরা আমাদের বাড়ী এসে আমার বিমাতার কাছে বসে গল্প করছিলেন। আমি তাঁদের পাশেই বসে-ছিলাম। কথায় কথায় খুড়ীমা বল্‌লেন—"ওর মায়ের কথা নিশ্চয়ই ওর মনে আছে।" আমার বিমাতা বল্‌লেন—"তা কি থাকতে পারে! তখন ত ও এতটুকু।" খুড়ীমা বল্‌লেন—"তবুও মনে আছে। মা-ত।" বিমাতা বল্‌লেন —"তা কিছুতেই নয়।" তখন খুড়ীমা আমাকে তাঁদের মধ্যে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"তোর মার কথা মনে আছে?"

আমি নিঃসন্দেহ চিত্তে বল্‌লাম—"হাঁ, মনে আছে।"

বিমাতা বল্‌লেন—"বল্ দেখি কি মনে আছে?"

আমি বললাম—"খুব লম্বা ঘন চুল, খুব সুন্দর মুখ, পায়ে চুণ লাগিয়ে যেন খুড়িয়ে খুড়িয়ে হেঁটে যাচ্ছেন।" এই শেষেরটুক অর্থাৎ পায়ে চুণ লাগিয়ে খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটা কখন যে এসে আমার মাতৃমূর্ত্তির সহিত সংযুক্ত হয়েছিল তার বিন্দুবিসর্গও আমার মনে নাই, তখনও মনে ছিল না।

আমার কথা শুনে বিমাতা হেসে বল্‌লেন—"ও হরি! এই ওর মাকে দেখা! ও ত আমার কথাই দিব্যি মনে করে রেখেছে। সেই যেবার আমাদের বাড়ী পুড়ে গেল, ঠিক সেইবারের কথা। বাক্সটা বের করতে যেয়ে আমার পা আগুনের আঁচ লেগে ফুলে উঠেছিল, আর পায়ের তলায় একটা ফোস্কা পড়েছিল। সেই ফুলো পায় চুণ লাগিয়ে আমি যে মাসখানেক খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলেছি, তা ত তোমরা জানই। ও দিব্যি তাই মনে করে রেখেছে।"

বিমাতার কথার সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই মাতৃমূর্ত্তিকে আর প্রকৃত বলে বিশ্বাস হলো না। মন আবার দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়ল, আবার সেই শূন্যতা অনুভব করলাম।

সবাই চলে গেলে অনেকক্ষণ সেইখানে বসে বসে কি যেন ভাবলাম। তারপর আমার মাতৃমূর্ত্তির সহিত আমার বিমাতার মূর্ত্তির তুলনা করতে ইচ্ছা হলো আর তখনই আমার চোখের সামনে যেন তাঁদের দুজনার মূর্ত্তিই ভেসে উঠল। আমি সবিস্ময়ে দেখলাম নাক মুখ চোখ একেবারে এক। এক চুলও প্রভেদ নাই। মাথার চুলও ঠিক একই রকম। ঘোমটা দেবার ভঙ্গী আর শাড়ীও দেখলাম একেবারে মিলে যায়। তখন মনে যে কি একটা অব্যক্ত বেদনা উপস্থিত হলো তা মনে করতে এখনও যেন কেমন একটা অসোয়াস্তি অনুভব করি। সেদিন যে খেলা ধূলা ফেলে সেই ঘরের মধ্যেই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসেছিলাম, তা এখনও মনে আছে।

এর পরে অনেকদিন মাকে মনে করতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, কোন মূর্ত্তিই আর চোখের সামনে ভেসে উঠে নাই, বিমাতার মূর্ত্তিও নয়, শুধু কথাগুলি পাক খেয়ে কানের কাছে ঘুরে মরেছে।

আরও অনেকদিন পরের কথা বলব। তখন আমি বেশ বড় হয়েছি। আমার মা নাই, তাই মা'র কথা কাউকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জা হয়। মামার বাড়ী যেয়েও কাউকে বলতে সাহস করি নাই। কেউ যদি দয়া করে নিজ থেকে কিছু বোলতেন তাতেই যেন বেশ একটু শান্তি আর আনন্দ অনুভব করতাম। একদিন ইতিহাস পড়তে পড়তে সহসা মনে হলো, আমার মায়ের ত একটা নাম ছিল—কিন্তু কি সে নাম? মার নাম জানবার জন্য এত ব্যগ্র হয়ে উঠলাম যে, পড়া আর হলো না। তাড়াতাড়ি বাবার কাছে জিজ্ঞেস করতে চলে গেলাম। কিন্তু ঘরের মধ্যে যেয়ে কেমন ভয় হলো, লজ্জাও হলো, তাই আর জিজ্ঞেস করা হয়ে উঠল না। বাড়ীর আর কাউকে যে জিজ্ঞেস করব সে সাহসও আর হলো না। এর পরে যখনই ইতিহাস খুলে বসেছি—"মার নাম কি?" এই প্রশ্নই সর্ব্বপ্রথম আমার মনের মধ্যে উদয় হয়েছে।

এক বৎসর পরে এণ্ট্রান্স পাশ করে মামার বাড়ী বেড়াতে গেলাম। আমাকে দেখে আমার ঠাকুরমা বল্লেন—"জেন্দি যদি আজ বেঁচে থাকতো—"। তিনি আর বলতে পারলেন না। চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। ঠাকুরমার ক্রন্দনে আমি একটুও বিচলিত হ'লাম না, বরং আমার প্রাণ যেন আনন্দে নেচে উঠল। কারণ এতদিন যে মাতৃ-নামের সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে ঘুরেছি আজ সেই নাম ঠাকুরমার মুখ হতে বের হয়ে আমার কানে যেন অমৃত বর্ষণ করল। মনে মনে কত যত্নের সঙ্গে যে সেই নাম বলতে লাগলাম, কত শ্রদ্ধার সঙ্গে যে সেই নাম আমার মানস-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করলাম, তা' কেবলমাত্র ভগবান জানেন। বাড়ীতে ফিরে বোধ হয় দরজা বন্ধ করে একটা কাগজে লিখলাম স্বর্গীয়া মাতৃদেবী জ্ঞানদা দেবীর শ্রীচরণেষু। জেন্দি যে জ্ঞানদারই অপভ্রংশ তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ রহিল না। সেদিন হতে আমার উপাস্য দেবতার স্থান ঐ মাতৃনাম অধিকার করে বসল।

এফ-এ পাশ করে আর একবার মামার বাড়ী গেলাম। তখন লজ্জা ভয় অনেকটা ভেঙ্গে গিয়েছিল। একদিন আমার আর এক ঠাকুরমা বড়ই আফ্‌শোষ করে বললেন—"আজ যদি হেম বেঁচে থাকত—"। হেম নাম শুনে আমি চমকে উঠলাম। তবে কি আমি এতকাল ভুল করে এসেছি! ঠাকুরমা প্রকৃতিস্থ হয়ে আমাকে একটা আসনে বসিয়ে কতকগুলা আম ছুলে দিতে লাগলেন। আমের দিকে আমার মন ছিল না, আমি শুধু একমনে মায়ের নামের কথাই ভাবছিলাম। আমাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে ঠাকুরমা বল্‌লেন—"নে বাবা, আম কটা মেখে নে।" তাঁর কথা শুনে আমার চমক ভাঙ্গল। আমি আম মাখতে মাখতে ঠাকুরমাকে বল্‌লাম—'তুমি আমার মার নাম জান?" ঠাকুরমা বল্‌লেন—"তা আবার জানি নে? আমরা তাকে জেন্দি, জেন্দি বলে ডাকতুম, কিন্তু তার আসল নাম ছিল হেমকামিনী।"

বারবার আশাহত হয়ে আমার বিশ্বাস যেন লুপ্ত হয়েছিল। তাই এই নূতন নামকে আর তেমন ভাবে মানস-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করতে পারলাম না। তার ফলে সে নাম আমি দুদিনেই ভুলে গেলাম। কিন্তু ভুলে যাওয়ার পূর্ব্বেই আমার এক বন্ধুকে আমি এই নামটি বলেছিলাম। সেই প্রাণাধিক বন্ধুই আমার মায়ের সে নামটি মনে করে রেখেছিলেন।

মায়ের প্রকৃত নাম ভুলে যাওয়ার পর মার কথা প্রতি-দিনই মনে করতাম। কিন্তু প্রতিবারেই সেই জ্ঞানদা নামই মনে আসত। মামার বাড়ী যাওয়া আর হয়ে উঠল না, মার প্রকৃত নামটাও আর মনে আনতে পারলাম না। কেবল একদিন মাত্র বাবা আমাকে আমার মায়ের কথা বলেছিলেন—"তিনি ছিলেন গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা"—এর বেশী তিনি বলেন নাই। তবু সেই কথা কয়টি এখনও আমার মনের মধ্যে জল্ জল্ করছে।

এর মাস ছয়েক পরে আমি সঙ্কল্প করলাম একটা ছাপাখানা খুল্‌বো, তার নাম দেব জ্ঞানদা প্রেস্। তখন মার প্রকৃত নামটা ভুলে গিয়েছিলাম, জ্ঞানদা নামই প্রকৃত বলে বিশ্বাস করছিলাম। এই প্রেসের কথা বন্ধুকে বল্‌লে, বন্ধু বল্‌লেন—"জ্ঞানদা তাঁর ঠিক নাম নয়। তুমি আমায় আর একটা নাম বলেছিলে।" বন্ধুর কথায় আমার লুপ্ত স্মৃতি যেন ফিরে এল। বিশ্বাস হ'ল জ্ঞানদা তাঁর প্রকৃত নাম নয়। কিন্তু সে প্রকৃত নাম যে কি, তা বন্ধুও মনে করতে পারলেন না, আমিও পারলাম না। সুতরাং প্রেস করার অভিপ্রায় আমার মন থেকে চলে গেল। এর এক মাস পরে বন্ধু একদিন বল্‌লেন—"আজ হেমের চিঠি পেয়েছি—সে এখানে আস্‌ছে। তুমি ত তাকে জানই। সে আমার ভগ্নীপতি।"

আমি বল্‌লাম—"হেম!" আর অমনই মনের মধ্যে যেন বিদ্যুত চমকে উঠল। আমি লুপ্ত স্মৃতি ফিরে পেলাম। বন্ধুকে বল্‌লাম—"বন্ধু, ফিরে পেয়েছি। এইবার মনে পড়েছে। আমার মায়ের প্রকৃত নাম সেদিন মনে করতে পারি নাই। কিন্তু আজ মনে হয়েছে। তুমিই তা' মনে করিয়ে দিলে। এর জন্য তোমার কাছে আমি আজীবন কেনা হয়ে রইলুম, বন্ধু!"

বন্ধু বল্‌লেন—"বল দেখি, কি সে নাম। আমি যে মনেই করতে পারছি না।"

আমি বল্‌লাম—"হেমকামিনী দেবী।"

বন্ধু আনন্দে আমাকে জড়িয়ে ধরে বল্‌লেন, "ঠিক, ঠিক, তাই বটে। এবার কিন্তু ভুলো না বন্ধু!"

আমি একটু হেসে বল্‌লাম—"এ জীবনে আর ভুলব না বন্ধু!"

সেইদিন আমার মানস-মন্দিরে আমার মায়ের প্রকৃত নাম প্রতিষ্ঠিত হলো। এর কয়েক মাস পরেই আমি এই অসুখে পড়লুম। আমার আর প্রেস করা হয়ে উঠল না।"

* * *

আর পড়তে পারিলাম না। চোখে যেন কেমন ঝাপসা দেখিতে লাগিলাম। গিন্নী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"পুরুষ জাতটা পাষাণ। নইলে নিজের ছেলেকে তারা এত কষ্ট দিতে পারে। বৌকেই যেন না ভালবাসল। কিন্তু নিজের ছেলে—তাকে না ভালবেসে কেউ আবার পারে! কি নিষ্ঠুর তোমরা! তোমাদের কিছুতে আর আমার বিশ্বাস নেই। দেখ্‌তে, ওর মা না মরে যদি ওর বাপ মরত, তবে ওর মা ওকে কত রকমে সকাল সন্ধ্যায় ওর বাপের কথা শুনাত। বাস্তবিক, কি পাষাণ তোমরা!"

সেদিন স্ত্রীর কথা প্রতিবাদ করার শক্তি আমার চলিয়া গিয়াছিল। বাস্তবিক, আমরা পাষাণের জাতই বটে। তাই ত রবীন্দ্রনাথ পুরুষ জাতিকে বাদ দিয়া স্ত্রীলোকগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহার মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় কহিয়াছেন—

"অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি
জননীরা আয় তোরা সব,
মাতৃহারা মা যদি না পায়
তবে আজ কিসের উৎসব।"

বহুরূপী

[শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

৫

ইহার পর অনেকদিন কাটিয়া গিয়াছে। আমি মাঝে মাঝে হরেন্দ্রের আপিসে যাই। কাজকর্ম্মের তত আগ্রহ বড় একটা নাই। কোন কোন দিন হাতে অন্য কাজকর্ম্ম না থাকিলে, আমি সে সময় উপস্থিত হইলে আমার ভাবনা হরেন্দ্রের নিকট একটা গভীর চিন্তার বিষয় হইয়া পড়ে। আমার সম্বন্ধে কি করা যায়, একটা কিছু করা খুব আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এই চিন্তাই হরেন্দ্রের যে সব চেয়ে বড় এবং প্রধান চিন্তা একথা বারবার বলিতে কিছুমাত্র আলস্য প্রকাশ করে না। একদিন বলিল, "দেখ কিরণবাবু লোকটীর সহিত আলাপ হয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। লোকটীর অত টাকা কিন্তু বাহির হ'তে মোটেই জানবার উপায় নাই। এক কথার মানুষ। সেদিন তিঁনিও তোমার বিষয় আমাকে বলছিলেন। কি করা যায়? একটা কিছু করা নিতান্ত প্রয়োজন। দেখ্‌লাম, লোকটী তোমার বিষয় চিন্তা করেন। আমার যদি ভাই অত টাকা থাকত, তাহ'লে মোটেই ভাবতাম না। একটা যা হোক কারবারে তোমায় লাগিয়ে দিতাম। আমার কারবারটাও যদি পূর্ব্বের মত জোর চলতো তা' হ'লেও কি একটুকুও ভাবতাম, না, কি সামান্য দু' একশ টাকা উপস্থিত আমি তোমার খরচের জন্য দিতে পারতাম না? সে দিকেও সুবিধা দেখ্‌ছি না। ভগবানের মনে যে কি আছে বলতে পারি না; দেখ, একটা কাজ করতে পার না? আমার মনে হয় একটা লিমিটেড কোম্পানী খোলা। কিরণবাবু যদি সাহায্য করেন, তাহ'লে কোন ভাবনা থাকে না, দেশের কাজ করা হয়, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আর কোন চিন্তা করতে হয় না। কি বল?"

আমি উত্তর করিলাম, "মন্দ নয়, কিন্তু পরের টাকা লইয়া লিমিটেড কোম্পানী করার দায়িত্ব অনেক। আর লোকের বিশ্বাস স্থাপন করাও খুব শক্ত ব্যাপার।"

হরেন্দ্র বলিল, "সে জন্য তুমি কিছু ভেব না। সে সব অভিজ্ঞতা আমার যথেষ্ট আছে দেখ্‌চ না, দেশের হাওয়া ফিরে গেছে। এখন কত দেশী কোম্পানী প্রতিদিন খুলচে, সঙ্গে সঙ্গে টাকা উঠে যাচ্ছে। একবার কোন গতিকে কোম্পানী দাঁড় করাতে পারলে, এবং একবার কিছু ডিভিডেণ্ড দিতে পারলে আর পায় কে? তখন টাকা পুঁটি মাছের মত আসবে।"

আমি বলিলাম, "ইহাতে কিরণবাবুর কি প্রয়োজন আছে?"

হরেন্দ্র কহিল, "একটা কোম্পানী খুলতে গোড়ায় তিন চার হাজার টাকার প্রয়োজন। সেই টাকাটা যদি উপস্থিত কিরণবাবুর নিকট থেকে বার করতে পার। তাঁর পক্ষে এই সামান্য টাকা কিছুই নয়। এর পর কোম্পানীর সেয়ার দিয়ে এ টাকা তাঁকে পরিশোধ করে দিতে পারব। যদি সব টাকার সেয়ার নিতে রাজি না হন, তাহ'লে নগদ টাকা ফেরৎ দিব।"

আমি বলিলাম, "এতে আমাদের কি লাভ হবে? কোম্পানী চললে, লাভ হ'লে তবে ত আমরা লাভ পাব?"

হরেন্দ্র অল্প উত্তেজিত হইয়া উত্তর করিল, "দেশের লোকের হ'য়ে আমরা কারবার করব, আর আমরা বুঝি বিধবাদের মত নির্জ্জলা একাদশী করব? আমরা আপিস চালাবার জন্য মাসিক ছয় সাত শো টাকা আপিস-খরচা হিসাবে উপস্থিত পাব, তারপর লাভের অংশ খুব কম হ'লে শতকরা দশ টাকা হিসাবে পাব। আমার কি বল? তোমার জন্যই ভেবে ভেবে এই রাস্তাই ঠিক করেছি; এতে তুমি মাসে মাসে উপস্থিত দুই শত টাকা-সংসার ব্যয় হিসাবে নিতে পারবে।"

আমি বলিলাম, "কিসের কারবার করা যাবে? আমাদের ত বড় কারবার করবার অভিজ্ঞতা নাই। অনেক

গরীব দুঃখী বিধবার টাকাও এর ভিতর এসে পড়বে, হয় ত সেই টাকা ধার দিয়া তাহাদের সংসার নির্ব্বাহ হয়।"

হরেন্দ্র বলিল, "কেরাণীগিরি করে করে তোমার মনের জোর একবারে কমে গিয়েছে দেখ্‌চি। গরীব দুঃখী বিধবাদের টাকা অনেকে ফাঁকি দিয়ে নেয়, যাতে তা আর হ'তে না পারে সেইজন্যই ত লিমিটেড কোম্পানীর সৃষ্টি। এখানে তাদের টাকা মারা যাবার কোন আশঙ্কা নাই,বরং বেশী হারে টাকার সুদ বল আর লাভ বল, পাবে; দুঃখ কষ্ট অনেকটা লাঘব হবে। একাজের ভিতর দিয়া উভয় দিক হ'তে আশীর্ব্বাদ পাওয়া যায়। একদিক থেকে সেয়ার-হোল্ডারদের আশীর্ব্বাদ, অপর দিক হ'তে ভগবানের আশীর্ব্বাদ। এখানে টাকা মারা যাবার কোন সম্ভাবনা নাই। পরের টাকা—সত্য বলতে কি ভাই শশাঙ্ক—আমার গোরক্ত! ব্রহ্মরক্ত! ব'লে মনে হয়। এতটা বয়েস হ'লো নিজেদের এমন সামর্থ্য নাই যে দশজনকে সাহায্য করতে পারি। তবে শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা যদি দেশের কাজে আসতে পারি তবে জন্ম সার্থক মনে করব। আমার ভাই এই সব কথা ভাবতে ভাবতে এমন একটা কর্ম্মশক্তি ভিতর থেকে জেগে উঠে যে এক একদিন সারারাত্রি নিদ্রা হয় না। কল্পনায় যে কত রকম ছবি উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, তা শুনলে তুমি আমাকে পাগল মনে করবে। তুমি বল্লে কিসের ব্যবসা করব? একথা কি জিজ্ঞাসা করার মত একটা কথা? কারবারের অভাব কি? ধর, এখন দেশে রংএর অত্যন্ত অভাব, একটা রংএর কারবার খুল্‌লে দেখ্‌তে হবে না, হু হু করে বিক্রী হবে। দেখ, আমি যখন দেশের কথা ভাবি, তখন আমার প্রাণটা যেন উদাস ও অবসন্ন হয়ে পড়ে। অন্তরের ভিতরটা যে কি করতে থাকে তা যদি কোনদিন বোঝাবার মত অবস্থা দেন, তবে বোঝাতে পারব।" বলিয়া হরেন্দ্র পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া চোখ মুছিল। তাহার কণ্ঠ অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিল।

আমি হরেন্দ্রের ভিতর দেশের জন্য, দেশবাসীর জন্য এতখানি ভালবাসা দেখিয়া নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন উত্তর দিতে পারিলাম না।

হরেন্দ্র ধীরে ধীরে বলিল, "শশাঙ্ক,কি ভাবচ? তোমার মনে হয় যে আমি পরের টাকা মেরে দেবো! তোমার মনে হয় আমাদের দেশে অনেক লিমিটেড কোম্পানী খুব বড় বড় নামজাদা লোকে করেছে, সেগুলির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আজ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং তোমার মনে কি আশঙ্কা হচ্ছে আমি যে তাঁহাদের ভিতর আর একটী সংখ্যা বাড়াব না তাহার প্রমাণ কি? তার প্রমাণ দেবার মত আমি বড় লোক না হ'তে পারি, কিন্তু আমার একমাত্র ভরসা, আমি তোমার বন্ধু! তোমার কাছে আমার কিছু লুকান নাই। আর যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছি, সে বংশের গৌরব কোনদিন আমার দ্বারা নষ্ট হবার পূর্ব্বে যে আমার মৃত্যু হবে, একথা আমি শপথ করে বলতে পারি। না খেতে পেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করাও সম্ভবপর হতে পারে, কিন্তু তথাপি পরের পয়সা আমার কাছে গো-রক্ত! ব্রহ্মরক্ত! জেনো। কেবল তুমি বন্ধু, তোমাকে দাঁড় করাবার নিমিত্তই আমি এত বড় দায়িত্ব মাথা পেতে নিতে অগ্রসর হয়েছি, এছাড়া আমার ভিতর আর কোন উদ্দেশ্য নাই। ভগবান সাক্ষী!" বলিয়া হরেন্দ্র রুমাল দিয়া আর একবার নয়ন মুছিল।

আমি বলিলাম, "হরেন্দ্র, আমি কি তোমাকে চিনি না? আমাকে অত কথা বলছ কেন? এতে যে আমি কতখানি দুঃখ পাচ্ছি, তা কি তুমি জানতে পারচ না? তোমাকে বিশ্বাস করা সম্বন্ধে আমার কোনদিন কোন সংশয় নাই। কিন্তু একটা কথা হচ্ছে, আমি কোনদিন কাহারও নিকট গিয়ে হাত পেতে দাঁড়াই নাই, সুতরাং আমি কিছুতেই কিরণবাবুকে টাকার জন্য বলতে পারব না।"

হরেন্দ্র বলিল, "এ তো তুমি তোমার নিজের জন্য ভিক্ষা করতে যাচ্ছ না? এর মধ্যে সম্পূর্ণ দেশের মঙ্গল কামনা নিহিত রয়েছে, এসব কাজে যদি তিনি টাকা না দেন তাহা হ'লে তাঁর অগাধ টাকা কবে কোন্ কাজে আসবে?"

আমি বলিলাম, "ইচ্ছা হয় তুমি এ বিষয় তাঁকে প্রস্তাব করতে পার। কিন্তু আমাকে মাপ কর। আমি তাঁকে

টাকার কথা বলতে গেলে, আমার আপন হ'তেই মনে হবে আমার নিজের স্বার্থের জন্য বলতে এগিয়ে এসেছি। আর কিরণ যদি একথা কোন দিক থেকে অন্যরকম মনে করে—তবে আমার লজ্জা রাখবার মত স্থান থাকবে না।"

হরেন্দ্র হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। "এখনও তোমার ছেলেমানুষি সম্পূর্ণ আছে দেখ্‌চি। দেশের কাজের জন্য বন্ধুর কাছে টাকার প্রস্তাব করার মধ্যে এ ভাই তোমার অন্যায় সঙ্কোচ! এতে তুমি যেন কিরণবাবুকে তোমার বান্ধবতার নিকট হ'তে নির্ম্মমভাবে তফাৎ করচ। এটা তোমার মত লোকের পক্ষে কোন দিক থেকে শোভা পায় না। কিরণ যে তোমাকে কেবল বন্ধু ভাবেন; তাঁহার ব্যবহার দেখে আমার তার চেয়ে অনেক বেশী বলে মনে হয়, তোমাকে নিজের সহোদর অপেক্ষা ভালবাসেন।"

আমি বলিলাম, "তোমার যুক্তি অমান্য করচি না। কিরণ যে আমাকে কতখানি ভালবাসেন তা আমি জানি; আর আমি যে আমাকে কতখানি ভালবাসি তাও জানি। এই জানি বলিয়া—এবং আমার উপস্থিত কাজকর্ম্ম নাই—এই অভাবটাই অনেক সময় আমাকেই মনের কাছে বাগে পেলে প্রতারিত করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। দুর্ব্বল ব্যক্তির মনে যেমন অকারণ সর্ব্বদা মিথ্যা ভয় আসিয়া তার সমস্ত স্থান জুড়িয়া বসে—সত্য কথা বলিতে কি, যে বন্ধুত্বের দাবী লইয়া এখন কিরণের কাছে অকপটে সকল কথা বলতে পারি, তাহা হয় ত এই টাকার কথা বলতে গিয়ে আর তেমন জোরে বলতে পারব না। যেখান থেকে "না" এই কথা শুনলে বাঁচবার সাধ মোটেই ভাল লাগে না—সেখানে আমি কিছুতেই টাকার কথা তুলতে পারব না। তোমার অনুরোধ রাখতে পারলাম না, সেজন্য আমাকে ক্ষমা কর।"

এবারও হরেন্দ্র পূর্ব্বের মত হো! হো! করিয়া হাসিয়া উঠিল। কেবল ভাবপ্রবণতা নিয়ে কোনদিন কেহ কাজের লোক হ'তে পারে নি। অনেক ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে মানুষকে প্রত্যহই গড়ে' উঠতে হবে। সঙ্কোচ, কুণ্ঠা, লজ্জা এগুলা অন্তঃপুরেই যারা বাস করে, তাদের কাছে শোভা পায়—তাদেরই ভদ্র। এসব নিয়ে কর্ম্মজগতে চলতে কোনদিন কেহ পারে নাই, এবং পরেও সম্ভবপর নয়। এই ভাবপ্রবণতার জন্যই চলতি কারবার অকারণ ত্যাগ করে আসতে পেরেচ। গড়ার ভিতর কঠোরতার, এবং ভাঙ্গার ভিতর কোমলতারই প্রভাব আছে, একথা মানতেই হবে। উৎসাহ কাজকে সর্ব্বদিক হ'তে এগিয়ে আনে এবং অসঙ্কোচ কর্ত্তব্যজ্ঞান তাকে সফল করে। সেখানে ভাবপ্রবণতা অসঙ্কোচেরই সূচনা করে থাকে। একথা কেমন করে অস্বীকার করবে। বন্ধুত্ব ত সেইখানে, যেখানে বিপদের স্তরে স্তরে সব মুছে গিয়ে কেবল বন্ধুকেই বড় করে দেখবার অধিকার হৃদয়ের মধ্যে সম্পদে গৌরবে, সুখে দুঃখে পূর্ণিমার চন্দ্রের মত নিষ্কলঙ্ক সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত করে দেয়। বন্ধুকে যদি পদে পদে ঐ আশঙ্কা থেকে দূরে দূরে রেখে সতর্ক হ'য়ে চলতে হয়—তবে একথা একেবারে স্বীকার করতে হবেই যে হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের বিনিময় ঘটে নাই, তাঁর অবস্থার সহিত, তাঁর যশের সহিত, তাঁর বিদ্যার সহিত, তাঁর সম্মানের সহিত কেবল পরিচয় ঘটেছে। সেখানে কেবল তোষামোদের দ্বারা বন্ধুত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। একটুখানি ইতরবিশেষ হ'লে বান্ধবতা ক্ষুণ্ণ হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। এক্ষেত্রে তাহা হলে নিজেকে সম্পূর্ণ গোপন করে অতি সাবধানে ও সন্তর্পণে বন্ধুত্বকে বাঁচিয়ে চলা হচ্ছে একজনের একচেটিয়া কাজ, আর একজনের কাজ হচ্ছে—অপরকে বলিতে দুর্ব্বলকে বন্ধু বলিবার অধিকার দেওয়াই অনেক বেশী দেওয়া। সব কথাই যদি বলতে না পারলাম, সব বিষয় জানালে যদি রাগ করে—এত বিচার বিবেচনা করে বেশীদিন বন্ধুত্ব বাঁচিয়ে রাখা বড় সোজা কাজ নয়।"

আমি বলিলাম, "হরেন্দ্র, তুমি যে কথা বলছ, তাহার একটীও উপেক্ষা করবার মত নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে বন্ধুত্ব, ভালবাসা—এইসব শব্দগুলিকে অগ্নিপরীক্ষায় ফেললে বোধ হয় কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। মানুষের একশো কুড়ি বছর পরমায়ু, কিন্তু কয়জন মানুষ এই একশো কুড়ি বছর পরমায়ুর দাবি করতে পারে? দাবি করতে পারে না বলে কি সব মানুষ বেঁচে থাকার উপর অভিমান করে মরে যাচ্ছে? এক একজনের এক একটী বিশেষত্ব আছে,

একথা মানত? কেহ হয় ত বিষয় অত্যন্ত ভালবাসে, এক হাত জমির জন্য দশ হাজার টাকা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত নয়, আর একজন হয় ত সেই রকম টাকা ভালবাসে খরচ করতে তার অত্যন্ত কষ্ট হয়। সুতরাং এইসব দিয়ে সকল সময় অনেক বিষয়ের ঠিক বিচার করা যায় না। পরের বেলা আমরা যে যুক্তি প্রমাণ খাড়া করতে পারি নিজের বেলায় সেগুলি যে কিছু নয়, একথা আমরাই অনেক সময় নির্লজ্জের মত বলে থাকি। কিরণকে আমি টাকার কথা কিছুতেই বলতে পারব না!"

হরেন্দ্র অনেকক্ষণ কোন উত্তর দিল না। গম্ভীর হইয়া কি ভাবিতে লাগিল। তারপর বলিল, "তোমার সঙ্গে যদি কিরণবাবুর এর ভিতর সাক্ষাৎ হয় তাহ'লে এইরকম যে একটা লিমিটেড কোম্পানী খোলায় সঙ্কল্প স্থির হয়েছে বলতে অবশ্য ভুল করবে না।"

আমি কহিলাম, "একথা যখন সবাই জানতে পারবে তখন কিরণকে বলতে তো কোন দোষ নাই।"

এই সময় হরেন্দ্রের একটী বন্ধু একজন সাহেবকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরেন্দ্র অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া একগাল হাসিয়া অভ্যর্থনা করিল। বলিল, "মনে করছিলাম বুঝি appointment ফেল করলে।"

বন্ধুটী হাসিয়া উত্তর করিল, "appointment রাখতে না পারলে কাজ করব কেমন করে? যার কথার ঠিক নাই তার মূল্য সিকি পয়সার চেয়েও কম। তারপর সাহেবকে দেখাইয়া বলিল, "এঁর নাম মিষ্টার উড্। যাঁর কথা তোমাকে বলেছিলাম। উডের নাম শুনে হরেন্দ্রের মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে হাত বাড়াইয়া দিয়া সাহেবের সহিত কর মর্দ্দন করিল। সাহেব একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন, এবং একটি সিগারেটের অগ্নি-সংস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। হরেন্দ্রের বন্ধুটী সাহেবের পার্শ্বে বসিয়া দুই তিনবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে তাকাইলেন। সাহেব একটা লাল ফিতায় বাঁধা একতাড়া কাগজ, সঙ্গী বাঙ্গালীটির হাতে দিলেন। এমন সময় আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। হরেন্দ্র আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "যাচ্ছ নাকি?"

আমি উত্তর করিলাম, "আজ আসি।"

হরেন্দ্র বলিল, "দেখা করতে ভুল না।" তারপর সে নিবিষ্টচিত্তে সাহেবের দিকে মনোযোগ প্রদান করিল। বাঙ্গালী বাবুটীর মুখের ভাব দেখিয়া অনুমান করিলাম তিনি যেন আমার উপস্থিতিটা অত্যন্ত অসহ্য মনে করিতেছিলেন। বাঙ্গালী বাবুটির নাম সেদিন জানিতে পারিলাম না, কিন্তু সাহেবের নামটী কানের কাছে ধ্বনিত হইতেছিল—মিষ্টার উড্।

পথে বাহির হইয়া অনেক কথা মনে আসিতে লাগিল। হরেন্দ্র একটী লিমিটেড কোম্পানী খুলিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত এবং সেই কোম্পানী হইলে আমার সুবিধা হইবে এরূপ আশ্বাস দিতেছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তার চেষ্টা ও যত্ন দেশের লোকের ও দেশের কাজের জন্য। হরেন্দ্রের প্রাণটা খুব উদার ও বড় দেখ্‌চি। এতদিন সে ফুলের কুঁড়ির মত গন্ধ বুকে করেই ছিল, বাহির হ'তে সে সৌগন্ধ উপলব্ধি করতে পারা যায় নাই; আজ সে প্রস্ফুটিত হয়েছে তাই তার গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করেছে। যে গুণ আমার নেই, তা অন্যের থাকলে আমরা কোনদিন প্রাণ খুলে তার নিমিত্ত গৌরব অনুভব করতে পারি না!—এটা আমাদের কেমন জাতিগত দোষ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ক্রমশঃ।

আনাতোঁল ফ্রান্স।

[কবিগুণাকর শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ]

আনাতোঁল ফ্রান্স আর ইহজগতে নাই। গত ১২ই অক্টোবর রাত্রিতে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। রোগশয্যায় তাঁহার জীবন-প্রদীপ ক্রমশঃই নির্ব্বাপিত-প্রায় হইতেছিল, কিন্তু তাঁহার অত্যধিক দৈহিক শক্তি কিছুদিনের জন্য মৃত্যুকে পর্য্যন্ত ঠেকাইয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া তাঁহার চিকিৎসকগণ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন, এবং সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিলেন যে ভিক্টর হিউগো (Victor Hugo) মৃত্যু-কালে—তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮৩ বৎসর—ঠিক এইরূপই দৈহিক শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন।

চব্বিশ ঘণ্টা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া থাকিবার পর কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার পূর্ণ জ্ঞানের সঞ্চার হয়—তিনি তখন মাঝে মাঝে তাঁহার মাতার নাম উচ্চারণ করিয়া বলেন, "আমি চলিলাম," এবং মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তাঁহার পত্নীর সহিত বেশ পরিষ্কার ভাবে কথাবার্ত্তা বলেন এবং সর্ব্বশেষে 'স্যামপেন' মিশ্রিত জলপান করিয়া তাঁহার চিকিৎসকগণকে বলেন, "তবে একেই বলে মৃত্যু"—এই বলিয়াই তিনি শান্তিতে মহাপ্রস্থান করেন।

তাঁহার মৃত্যু লইয়া চারিদিকে মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছে, এবং সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেছে যে তাঁহার অভাবে ফরাসী সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল তাহা কোনকালে পূরণ হইবে কি না সন্দেহ। সমস্ত ফরাসী জাতি আজ তাঁহার জন্য গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে এবং সকলেরই স্মরণ-পথে উদিত হইতেছে—তাঁহার সেই সুন্দর ভাষা প্রয়োগ কৌশল—তাঁহার বিশাল ভাব-সম্পদ—মানবজীবন সম্বন্ধে অপূর্ব্ব হাস্য-রসের অবতারণা ইত্যাদি ইত্যাদি—যাহা জগতের সাহিত্য-ইতিহাসে তাঁহাকে চিরদিনের জন্য অমর করিয়া রাখিবে।

তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল জ্যাক্স আনাতোঁল থিবল্ট (Jacques Anatole Thibault) ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রেল পারি নগরীতে তাঁহার জন্ম। এই পারি নগরীর উপর বরাবরই তাঁহার একটা স্বভাবজ প্রীতি ও আকর্ষণ ছিল যাহা তাঁহার সমস্ত লেখার মধ্যেই পরিস্ফুট। তিনি বিদ্যালয়ে একজন প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন না।

স্কুল কলেজ অপেক্ষা সংসার ও মানব চরিত্রই তাঁহার প্রকৃত শিক্ষাকেন্দ্র ছিল, এবং তাঁহার পক্ষে আত্মশিক্ষাই মানব গুরু প্রদত্ত শিক্ষা অপেক্ষা সমধিক কার্য্যকরী হইয়াছিল। ছাত্রাবস্থা হইতেই সাহিত্যের উপর তাঁহার বিশেষ অনুরাগ জন্মিয়াছিল। ১৬ কিংবা ১৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বি-এ ডিগ্রি লইয়া তিনি পারি নগরীতে নানারূপ ঘটনার মধ্য দিয়া কোন রাজকার্য্যের ব্যর্থ অন্বেষণে কিছুদিন অতিবাহিত করেন—পরিশেষে সাহিত্যকেই তিনি জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া গ্রহণ করেন। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম সাহিত্য চেষ্টা—আলফ্রেড্ ডি ভিন্জীর (Alfred De Vingy) জীবনী আলোচনা—এবং ক্রমশঃ কাব্য ও নাটকের মধ্য দিয়া তিনি সর্ব্বশেষে উপন্যাস-ক্ষেত্রে আসিয়া পড়েন এবং এইখানেই যুগান্তর আনয়ন করিয়া গিয়াছেন।

১৮৬৮ খৃঃ হইতে ১৯২২ খৃঃ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ ৫৪ বৎসর তিনি সাহিত্য সেবা করিয়া আসিয়াছেন। হাস্যরস, বিদ্রূপ ও কৃপাপরবশতা এই তিনের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ তাঁহার লেখার মধ্যে সম্যক বর্ত্তমান। তিনি মানবজীবনের সুখ দুঃখকে হাস্যরসের দিক হইতেই প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন এবং দেবগণ গরীবকে লইয়া মাঝে মাঝে যে ক্রূর খেলা খেলেন সে সম্বন্ধেও আভাস দিতে ছাড়েন নাই।

তাঁহার উপন্যাস সকল পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, যেখানে তিনি কোন গলদ দেখিয়াছেন, সেখানেই তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তিও খুব প্রখর

ছিল। একবার তিনি যাহা দেখিতেন ও শুনিতেন, তাহা কখনও ভুলিয়া যাইতেন না এবং চরিত্র অঙ্কন ব্যপদেশে যথাস্থানে প্রয়োগ করিয়া তাঁহার উপন্যাসের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেন। তবে তিনি কখনও নৈতিক নিয়মের সীমা অতিক্রম করেন নাই। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে তাঁহার 'থেস্' (Thais) নামক গ্রন্থ প্রচারিত হয়—ইহা পাঠে ফ্রান্সের জনসাধারণ সকলেই মুগ্ধ হন। ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'লা রোটিসেরি ডি লা রেন্ পিডাক্' (La Rotisserie de la Reine Pedauque) প্রকাশিত হয়। তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ—(১) 'এল' হিস্টরিক্ কন্‌টেম্পোরেণ্ ('L' Historic Contemporaine) ইহা ৪ খণ্ডে বিভক্ত—সমসাময়িক ফরাসী ইতিহাস লইয়া লিখিত। এই পুস্তকখানিই তাঁহার যশের দ্বার মুক্ত করিয়া দেয়। এই গ্রন্থখানিতে তদানীন্তন ফরাসীদের রাজনীতি, সৈনিক বিভাগ, ধর্ম্মবিশ্বাস ইত্যাদি ইত্যাদি লেখক খুব নিপুণতার সহিত চিত্রিত করিয়াছেন।

(২) লালে ডেশ্ পিন্‌গোয়িন্স (L'Ile des Pingouins) ১৯০৮ খৃঃ প্রচারিত হয়। ইংরাজ পাঠকদিগের মধ্যে ইহা একখানি খুব প্রিয় গ্রন্থ—ইহা ফরাসী ইতিহাসের একটা ব্যঙ্গ চিত্র।

(৩) লেশ্ ডিউ ওন্‌ট সোএফ্ (Les Dieux Ont Soif) ১৯১২ খৃঃ প্রচারিত হয়। ইহা একখানি ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস।

তিনি জীবনে কেবলমাত্র সাহিত্য চর্চ্চাই করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার জীবন আদৌ ঘটনাবহুল ছিল না। তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে মোটেই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন নাই। তিনি এক সময়ে পারি সেনেটের লাইব্রেরিয়ান পদে মনোনীত হন, কিন্তু ভাল না লাগায় অতি শীঘ্রই সে কাজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। আর এক সময়ে তিনি বিশেষ কোন দায়িত্বপূর্ণ তালিকা (catalogue) সংকলন কার্য্যে আহুত হন, কিন্তু কোন কারণে মতদ্বৈধ ঘটায় এ কাজেও ইস্তফা দেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ফ্রেঞ্চ একাডেমির সভ্যপদ গ্রহণ করেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁহার বয়স ৭০, তখন তিনি প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় যুদ্ধে যোগদান করিতে মনস্থ করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার শেষ পুস্তক 'লা ভাই, এন্ ফ্লোর' (La vie en fleur) প্রকাশ করেন।

আনাতোঁল ফ্রান্সের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী সাহিত্যের একটী স্মরণীয় যুগ অতীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তিনি বৃদ্ধ বয়সে একজন প্রথম শ্রেণীর লেখক বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন এবং ইংরাজ কবি বায়রণের মত নিজের দেশ অপেক্ষা পরের দেশেই সমধিক সম্মানিত হইয়াছিলেন। যখন প্রতীচ্য ভূখণ্ডের অন্যান্য দেশ তাঁহার প্রতিভার আদর ও তাঁহাকে সম্যক বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিল তখন নব্য ফরাসীগণ তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। ইউরোপীয় মহাসমরের পূর্ব্ববর্ত্তী ফরাসীদিগের মধ্যে মরিস বারেস (Maurice Barres) এবং পরবর্ত্তী ফরাসীদিগের মধ্যে পল্ মোরেণ্ড (Paul Morand) সম্যক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত দুজনেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, আনাতোঁল ফ্রান্সই রহস্য (Irony) ক্ষেত্রে একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক এবং ফরাসী ভাষার উপর তাঁহার অসাধারণ দখল। মহাসমরের পূর্ব্ববর্ত্তী ফরাসীগণ অপেক্ষাকৃত গম্ভীর প্রকৃতি সম্পন্ন হেতু প্রথমটা আনাতোঁল ফ্রান্সের রহস্যপ্রবণ প্রতিভার তেমন আদর করিতে সক্ষম হন নাই। যাহা হউক, নানা বাদবিসংবাদ সত্ত্বেও সমস্ত সাহিত্য জগতই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছে এবং তাঁহাকে অমর করিয়া তুলিয়াছে।

আবার বায়রণের মতই আনাতোঁল তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থেই আপনাকে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। সিল্‌ভিস্টার বোনার্ড (Sylvestre Bonnerd) মুসিয়র বারগারেট (Mousieur Bergeret) এবং জিরমি কয়েগনার্ড (Jerome Coignard) তাঁহার নিজেরই প্রতিকৃতি। তাঁহার পিতার পুস্তকের দোকান হইতেই তাঁহার সাহিত্যানুরাগের সূচনা, এবং সিন্ নদীর নিকটবর্ত্তী স্থানে যে সমস্ত পুস্তকের দোকান ছিল, সেই সেই স্থানে তিনি কৈশোরের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন এবং নানা গ্রন্থের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি সাহিত্য-প্রীতিকে অসামান্যরূপে

উদ্বোধিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি মানব জীবন নাটকের যে কেবল মাত্র একজন উদাসীন দর্শক ছিলেন তাহা নয়—তিনি মানবের সহিত খুব অন্তরঙ্গ ভাবেই মেলা মেশা করিতেন। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন—

"প্রতি রবিবারে আমি জনসাধারণের সহিত যোগদান করি—বিপুল পান্থ প্রবাহের মধ্যে মিশি—পুরুষ, স্ত্রী এবং বালক বালিকারা যাহারা সাধারণ রাস্তায় কোন গায়ককে ঘেরিয়া দাঁড়ায় কিংবা হাটের কোন দোকানের সম্মুখে জটলা করে, তাহাদের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দি—মলিন অপরিষ্কার পোষাক ও তৈলাক্ত দেহের সংস্পর্শে আসি—কাহারো কাহারো ঘামের, চুলের ও নিশ্বাস প্রশ্বাসের তীব্র ঝাঁঝাল গন্ধ পর্য্যন্ত গ্রহণ করি। এই জীবন-নির্ঝরিণীর কূলে দাঁড়াইয়া আমি মৃত্যুকে আদৌ ভাবিতে পারি না।"

উক্ত কথা গুলি হইতে প্রমাণিত হইবে যে, তিনি বাহ্যতঃ একজন নাস্তিকের মত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি একজন সূক্ষ্মদর্শী ও মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধান সম্বন্ধে আস্থাবান ছিলেন। ধর্ম্মের উপরও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তবে সাধারণ লোক তাঁহাকে ঠিক চিনিয়া উঠিতে পারিত না, তাহার কারণ তিনি একজন প্রকৃত ও খুব উচ্চদরের নিপুণ শিল্পী (artist) ছিলেন তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থিব ঘটনা সমূহকে সান্ত স্থান ও কালের সংকীর্ণ গণ্ডী হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া অনন্ত স্থান ও কালের দিক হইতে অখণ্ড ভাবে আলোচনা করিতেন। এই নীতিরই অনুসরণের ফল তাঁহার প্রসিদ্ধ প্রহসন "সুর্ লা পেরি ব্লান্স" (Sur La Pierre Blanche.) কিন্তু অধিকাংশ স্থলে তিনি ভবিষ্যৎ অপেক্ষা অতীতকেই এক অভিনব আলোকে দেখিয়া গিয়াছেন, যাহা তাঁহার Thais (থেস্) ও ক্ষুদ্র গল্পের সমষ্টি Le Procurateur de Judee (লে প্রোক্যুরেটিয়র ডি জুডি) পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়। তাঁহার প্রধান প্রধান গ্রন্থের একটা তালিকা ও ক্রমঃ-প্রকাশকাল নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা—

১৮৬৮ খৃঃ—আলফ্রেড্ ডি ভিন্‌জি (Alfred de Vingy)

১৮৭৯—জোকাসটি এট্ লে চাট্ মাইগার (Jocaste et le chat Maigre—Jocasta and the famished cat)

১৮৮১—লি ক্রাইম ডি সিল্‌ভেস্‌টার বনার্ড (Le Crime de Sylvestre Bonnard)

১৮৮৫—লি লিভার ডি মন আমি (Le Livre de Mon Ami—My friend's book)

১৮৯০—থেস্ (Thais)

১৮৯২—লা রোটিসেরি ডি লা রেণ্ পেডাগ্ (La Rotisseric de la Reine Pedaugue)

১৮৯৪—লে লিস্ রোগ (Le Lys Rouge—The red lily)

১৮৯৭—লে মেনিকিন্ ডি ওজিয়র্ (Le Mannequin d' Osier—The wicker woman)

এল ওর্‌মি ডু মেল (L' Orme du Mail—The elm tree on the Mall)

১৮৯৯—এল' আনিউ ডি আমিথিষ্টি (L' Anneau d' Amethyste—The Amethyst Ring)

১৯০১—এম বার্‌গারেট আ পারে (M Bergeret a' Paris—M Bergeret at Paris)

১৯০৩—হিস্‌টোরে কমিক্ (Histoire Comique—A Mummer's Tale)

১৯০৪—ক্রেন্‌কুইবিলি (Crainquebille)

১৯০৮—লাপে ডেস্ পিন্‌গুইন্‌স্ (L'Ile des Pingouins—Penguin Island)

লা ভাই ডি জেন্ ডি আর্ক (La vie de jeanne d' arc—The life of Joan of Arc)

১৯১২—লে ডিউ ওন্‌ট সোইফ (Les Dieux Ont Soif—The Gods are Atheist)

১৯১৪—লা রিভোল্‌টি ডেণ্ এ্যাংগেশ্ (La Revolte des Anges—The revolt of the Angles)

১৯১৫—সুর লা ভোর গ্লরিউস্ (Sur la Voie Glorieuse—The path of glory)

১৯১৮—লা পেটিট্ পায়রে (Le Petit Pierre—Little Pierre)

১৯২২—লা ভাই এন্ ফ্লোর (La vie en fleur—The Bloom of Life)

উত্তর কাশী।

[শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য]

আজ প্রায় ৩০।৩২ বৎসরের কথা। পূজ্যপাদ শ্রীশ্রী৺ স্বামীজির অনুকম্পায় উত্তরাখণ্ডের কয়েকটী তীর্থদর্শনের সুযোগ ঘটিয়াছিল। তন্মধ্যে অদ্য উত্তর কাশীর বিষয় পাঠকগণের গোচরার্থ নিবেদন করিলাম, ইহাতে যদি কাহারও সন্তোষ লাভ হয় তাহা হইলে নিজকে চরিতার্থ বলিয়া বিবেচনা করিব এবং বারান্তরে গঙ্গা যমুনার উৎপত্তি-স্থলের যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, উপহার দিবার চেষ্টা করিব।

জ্যৈষ্ঠমাস; প্রচণ্ড গ্রীষ্মের উত্তাপে প্রাণ ব্যাকুল, কিছুই ভাল লাগে না, কোথায় যাই কিছুই স্থির হইতেছে না, এমন সময় স্বামীজি একদিন বলিলেন, শামু! চল এবার গ্রীষ্মের সময় উত্তর কাশী যাওয়া যাউক। সন্ন্যাসীদের মন না মরজি। সঙ্কল্প হওয়া মাত্রই আয়োজন আরম্ভ হইল, আয়োজনই বা এমন কি, আমাদের প্রত্যেকের আসন, অর্থাৎ স্বামীজির ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও আমার মৃগচর্ম্ম, এই আসনেই দিনের বেলায় উপবেশন এবং পূজা আহ্নিকের কাজ চলিত এবং রাত্রে উহাই শয্যায় পরিণত হইত। ইহা ব্যতীত আমাদের প্রত্যেকের একখান করিয়া গায়ে দিবার কম্বল ও একটা করিয়া মোটা বনাতের জামা ছিল, তবে আবশ্য-কীয় দ্রব্যের মধ্যে স্বামীজির নস্য ও চায়ের সরঞ্জাম বিশেষ প্রয়োজন। চায়ের সরঞ্জাম বলিতে কেহ যেন ইহা মনে না করেন যে আমরা চাদানী পেয়ালা পিরিচ কেট্‌লি চিনির পাত্র এবং দুগ্ধের পাত্র সঙ্গে লইয়া চলিয়াছিলাম। আমার বড় লোটাটীতেই একটা হ্যাণ্ডেল লাগাইয়া কমণ্ডলুর অনু-রূপ করিয়া লইয়াছিলাম। উহাতেই কেট্‌লির কার্য্যও সম্পন্ন হইত এবং ঐ কমণ্ডলুতেই চা গরম হইত। দুধ মিলিলে ভাল নচেৎ কেবল চিনি বা গুড় দিয়াই কাজ সারিয়া লইতাম। ইহাই আমাদের যাত্রার আয়োজন।

এইরূপে প্রস্তুত হইয়া আমরা রাত্রি ১০টার মেলে রওয়ানা হইবার অভিপ্রায়ে বাটী হইতে ৮টার সময়ই যাত্রা করিলাম। ষ্টেশনে পৌছিয়া দেখি তখনও টিকিট দিবার বিলম্ব আছে। যথাসময়ে টিকিটের ঘণ্টা পড়িলে হরিদ্বার পর্য্যন্ত দুইখানি টিকিট লইয়া গাড়ীতে স্থান অধিকার করিয়া বসিলাম। যাঁহারা সঙ্গে আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া একান্ত মনে গাড়ী ছাড়িবার অপেক্ষা করিতেছি। ফেরিওয়ালারা স্ব স্ব পণ্যদ্রব্য হাঁকিয়া ক্রেতাগণের চিত্তাকর্ষণ করিতেছে, কুলীরা আরোহীদিগের মালপত্র বোঝাই দিতে ব্যস্ত, রেলকর্ম্ম-চারিগণ যাত্রীবিশেষের নিকট কিঞ্চিৎ উপঢৌকন লইয়া গাড়ীতে স্থান করিয়া দিতেছে। সকলেই নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত। এদিকে সময় হইলে গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল, ষ্টেশনমাষ্টার সবুজ আলো দেখাইলেন, গার্ডসাহেব বংশীধ্বনি করিয়া গাড়ী চালাইবার সূচনা দিলেন, আমরাও এতক্ষণে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। গাড়ী দ্রুতগতিতে রওয়ানা হইল এবং হাওড়া ছাড়িয়া হুগলি ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল। অত্যধিক রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া আমরা শয়নের উদ্যোগ করিলাম এবং বেঞ্চের উপর কম্বল পাতিয়া শুইয়া পড়ি-লাম। অসাড়ে রাত্রি অতিবাহিত হইল। প্রাতে, অল্প অন্ধকার থাকিতেই, মোকামায় গাড়ী পৌছিল এবং বাঁকি-পুরে উত্তমরূপ আলো দেখা দিল। এখানে পানিপাঁড়ে ব্রাহ্মণ সকলকে জল দিতেছেন, তাঁহার নিকট কতকগুলি দন্তকাষ্ঠও আছে। যাত্রীগণকে উহা দিবার জন্য ইনি বড়ই ব্যস্ত, প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন "বাবু দাঁতুন চাহি?" উদ্দেশ্য একটী পয়সা। যাহা হউক, দাঁতুন না লইলেও, তাঁহার উদ্দেশ্য সফল করিয়া আমরা মুখ হাত পা ধুইয়া গাড়ীতে আসিয়া বসিলাম। বেলা ১১টা আন্দাজের সময় মোগলসরাই ষ্টেশনে গাড়ী পৌছিল।

এ পর্য্যন্ত আমরা ইষ্ট্ ইণ্ডিয়ান রেল কোম্পানীর

গাড়ীতে আসিয়াছি, এইবার গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া আউদ রোহিলখণ্ড রেলে যাইতে হইবে। কাজেই গাড়ী হইতে নামিলাম ও কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া ভিন্ন গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। লক্ষ্ণৌ পৌছিলে খালাসিরা গাড়ীর সকল আরোহীদিগকে নামাইয়া দিল। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিল যে ঐ গাড়ী আর যাইবে না, আধঘণ্টা পরে আর একখান আরোহী গাড়ী ঐখান হইতে ছাড়িবে তাহাতেই যাইতে হইবে। আমরা ডাকগাড়ীতে আসিয়াছিলাম এবং হরিদ্বার পর্য্যন্ত ডাকগাড়ীতেই যাইবার অভিপ্রায় করিয়াছিলাম কিন্তু শুনিলাম ডাকগাড়ী লক্ষ্ণৌ হইতে ইহার পূর্ব্বেই ছাড়িয়া দিয়াছে। ডাকগাড়ীর জন্ত অপেক্ষা করিতে হইলে ঐখানে একদিন বিলম্ব করিয়া পরদিন বেলা ৩।০টার সময় রওয়ানা হইতে হইবে। আমরা ইহা সুবিধাজনক বিবেচনা করিলাম না, কাজেই আরোহীগাড়ীতেই রওয়ানা হইলাম। গাড়ী ছাড়িলে জনৈক সহযাত্রীর সহিত আলাপে জানিতে পারিলাম যে আমরা যে গাড়ীতে যাইতেছি ঐ গাড়ী পরদিন বেলা আন্দাজ ২॥০ টার সময় হরিদ্বার পৌছিবে। পূর্ব্বদিন একপ্রকার অনাহারেই কাটিয়াছে পরদিনও যদি মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে গন্তব্যস্থানে পৌছিতে না পারি তাহা হইলে কষ্টের সীমা থাকিবে না, এ ক্ষেত্রে কি করা যায় বড়ই সমস্যার বিষয়। ঐ ভদ্র লোকটীই ইহার সমাধান করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন বেরেলী ষ্টেশনে প্রাতঃকালে গাড়ী পৌছিবে তখন নামিয়া আহারাদি করিবেন পরে সন্ধ্যার গাড়ীতে সেখান হইতে রওয়ানা হইলে পরদিন প্রাতঃকালে হরিদ্বার পৌছিতে পারিবেন। তিনি নৈনিতাল যাইতেছিলেন, তিনিও বেরেলীতে নামিয়া ভিন্নগাড়ীতে যাইবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। তাঁহারই পরামর্শমত বেরেলীতে নামিয়া আমরা ষ্টেশন সন্নিহিত সরাইতে গিয়া আশ্রয় লইলাম। উক্ত ভদ্রলোকটী সরাইতে একখানি ঘর লইলেন, আমরাও তাঁহারি পার্শ্বে একখানি ঘর অধিকার করিলাম। গত রাত্রে তাঁহার সহিত একত্র এক গাড়ীতে আসিয়াছি অথচ তিনি যে আমার অধ্যাপক তাহা জানিতে পারি নাই, তজ্জন্য বড়ই লজ্জিত হইলাম এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। ইঁহার নাম লালা সীতারাম। ইনি বারাণসী কলেজে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। এক্ষণে শিক্ষা বিভাগ পরিত্যাগ করিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে কার্য্য করিতেছেন এবং তদুপলক্ষেই তাঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নৈনিতাল যাইতেছেন। ইনি একজন সাহিত্যিক। ইনি কালিদাসের অনেক গ্রন্থ হিন্দী পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন।

আমরা এখানে আসিয়া দেখিলাম সরাইটী অতি সুন্দর। বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের মধ্যে প্রশস্ত কূপ, কূপের জলও সুমিষ্ট। এখানে চাউল ডাইল তরকারী প্রভৃতি আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যই পাওয়া যায়, কোন বিষয়ের অভাব নাই। পুরী তরকারী ও মিঠাইয়ের দোকানও আছে। পাক করিবার ইচ্ছা না থাকিলে উহা দ্বারাও দিন কাটান চলে। আমাদের সেরূপ করিতে হয় নাই, আমরা ভাগ্যক্রমে পাক করিবার জন্য একজন ব্রাহ্মণের সাহায্য পাইলাম, একজন কুলীও ভৃত্যের কাজ করিতে স্বীকৃত হইল, কাজেই কোন বিষয়ের অসুবিধা হইল না। স্নানাহার করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ষ্টেশনে গেলাম। টিকিট কিনিবার আবশ্যক ছিল না, কাজেই পূর্ব্বাহ্নেই প্লাটফরমে গিয়া গাড়ী আসিবামাত্র উহাতে উঠিয়া বসিলাম। গাড়ীতে বসিলাম বটে, কিন্তু পরদিন দশহরা বিধায় যাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অবশেষে গাড়ীতে তিষ্ঠান ভার হইল, কোন প্রকারে লুকসার পর্য্যন্ত গেলাম। এইখানে আবার গাড়ী বদল করিতে হইবে, কিন্তু তাহা যে কিরূপ দুষ্কর, বর্ণনা করা যায় না। এখানে আর শ্রেণী-বিচার রহিল না। প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী, মধ্য শ্রেণী, তৃতীয় শ্রেণী ইহার কোন পার্থক্য রহিল না, যে যেখানে পাইতেছে সে সেইখানে উঠিয়া বসিতেছে। আমরা তৃতীয় শ্রেণীতেই স্থান পাইয়াছিলাম, কিন্তু দশজনের বসিবার স্থলে ১৯ জন লোক সেই কামরায়, কোন্ প্রকারে দাঁড়াইয়া হরিদ্বার পর্য্যন্ত পৌছিলাম।

প্রাতঃকালে ষ্টেশনে গাড়ী আসিবামাত্র যাত্রীগণ নামিয়া পূতসলিলা গঙ্গায় স্নান করিবার অভিপ্রায়ে দ্রুতবেগে ছুটিল। কেহ ব্রহ্মঘাটে স্নান করিবার জন্য হরিদ্বার গেল,

কেহ বা থাকিবার সুবিধা হইবে বিবেচনা করিয়া কনখল অভিমুখে যাত্রা করিল। কনখল হরিদ্বার হইতে ৩ মাইল অন্তর। এখানে হাট বাজার হরিদ্বার অপেক্ষা ভাল, থাকিবার স্থানও উৎকৃষ্ট। এইখানেই দক্ষরাজের বাটী ছিল, তিনি এইখানেই যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সতী এই যজ্ঞ ক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তথায় এখনও দক্ষেশ্বর মহাদেবের মন্দির ও সতীপীঠ বর্ত্তমান আছে। মোক্ষদায়িকা সপ্তপুরীর মধ্যে মায়াপুরী অন্যতম। এই কনখলই সেই মায়াপুরী। আমরা মায়াপুরীতে দক্ষেশ্বর মহাদেব ও সতীপীঠ দর্শন করিতে গিয়াছিলাম, সেখানে বাস করি নাই। আমরা ব্রহ্মঘাটে স্নান করিয়া প্রসিদ্ধ মারওয়াড়ি সূর্য্যমল ঝুনঝুনওয়ালার ধর্ম্মশালায় ত্রিরাত্রি বাস করিয়াছিলাম। তীর্থযাত্রীদের মধ্যে অনেকে কুশাবর্ত্তের ঘাটে শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন ও পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান করেন। আমি স্বয়ং সন্ন্যাসী না হইলেও সন্ন্যাসীর সহযাত্রী বিধায় আমার সে সমস্ত করা হয় নাই।

ডেরাতে শীবরাম নামক স্বামীজির একজন ভৃত্য ছিল। তাহাকে সঙ্গে লইবার অভিপ্রায়ে পত্র দ্বারায় পূর্ব্বেই জানান হইয়াছিল সে যেন ঐ সময় হরিদ্বারে উপস্থিত থাকে। নিদেশ মত সে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল। পার্ব্বত্য পথে একজন কুলী না হইলে চলা দুষ্কর। শীবরাম পথ চলিবার সময় ভারবাহকের কায করিত, আড্ডায় পৌছিয়া পাচকের কায করিত, ইহা ছাড়া লোকটী বিশ্বাসী, কাজেই তাহার দ্বারা সকল প্রকার সুবিধা বিবেচনায় সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল।

হরিদ্বারে তিন দিন অবস্থানের পর আমরা হৃষিকেশ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। মধ্য পথে গৌরী নামক স্থানে একটী ধর্ম্মশালা আছে। আমরা ঐ ধর্ম্মশালার অনতিদূরে একটী বৃহৎ আম্রবৃক্ষতলে পাক করিয়া আহারাদি করিলাম। সন্ধ্যার প্রাক্কালে হৃষিকেশে গিয়া পৌছিলাম। এই স্থানটী অতি মনোরম। এখানে সন্ন্যাসী যাত্রীই অধিক, গৃহস্থ যাত্রী অল্পই এখানে আসিয়া থাকেন। কাজেই হরিদ্বারের ন্যায় এখানে দোকানপাট নাই, থাকিবার জন্য ঘর পাওয়াও দুষ্কর। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য পঞ্জাব দেশস্থ জগধরীর জমীদার বংশীলাল গৃহস্থ যাত্রীগণের নিমিত্ত একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। কলিকাতার মারওয়াড়ীগণ অপর একটী ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়াছেন, ইহা সাধুদিগের জন্য। এখানে সন্ন্যাসীগণের অবারিত দ্বার। আমরা শেষোক্ত ধর্ম্মশালায় গেলে বিনা বাধায় স্থান পাইতাম, কিন্তু প্রথমোক্ত ধর্ম্মশালাটী পথেই পড়ে, দ্বিতীয়টীতে যাইতে হইলে আরও কিছুদূর হাঁটিতে হয়। কাজেই প্রথমটীতে স্থান পাইবার অভিপ্রায়ে স্বামীজি অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তিনিও বিশেষ আপত্তি না করিয়া আমাদিগকে তাঁহারই প্রকোষ্ঠের একপার্শ্বে সেই রাত্রের জন্য স্থান দিলেন।

হৃষিকেশে বহু দেব দেবীর মূর্ত্তি বা মন্দির নাই। ঋষভদেবের একটী মন্দির আছে—শুনিলাম উহা শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ঐ মন্দিরের অনতিদূরে একটী শুষ্ক আম্রবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। উহার তলেই অনেক ঋষির তপস্যার স্থল ছিল। এই স্থানটী ঋষির তপস্যার স্থল বলিয়া হৃষিকেশ অথবা ঋষভদেবের নামানুসারে উহার ঐ নামকরণ হইয়াছে, সুধী পাঠকগণ নির্দ্ধারণ করিবেন।

আমরা পরদিন প্রাতঃকালে এখান হইতে যাত্রা করিয়া বেলা আন্দাজ ৮টার সময় চোরপানি নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। চোরপানি হৃষিকেশ হইতে ৩ মাইল অন্তর। আমরা এইখানে শৌচাদি করিবার অভিপ্রায়ে জলের সন্ধান করিলাম, কিন্তু নিকটে কোথাও জল পাইলাম না। ভগ্নমনোরথ হইয়া আরও কিছুদূর গিয়া হাত মুখ ধুইব মনে করিতেছি এমন সময় শীবরাম নদীগর্ভে প্রস্তররাশির মধ্যে জলের সন্ধান প্রাপ্ত হইলাম। আমার মনে হয় এইখানে জলের এইরূপ লুক্কায়িত অবস্থা হইতেই ইহার চোরপানি অর্থাৎ জল চুরি অথবা জল চোর (লুক্কায়িত জলরাশি) এইরূপ নাম হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় পাঠকগণের গোচরার্থ এখানে একটা কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পার্ব্বত্য প্রদেশে নদীগর্ভ প্রায়ই শুষ্ক, এবং উহার ভিতর দিয়া বা উহা উত্তীর্ণ হইয়াই লোকের যাতায়াতের পথ। প্রবল বৃষ্টির সময় উহা কিছুকালের জন্য অনতিক্রমণীয় হয়, অল্পক্ষণ পরেই পুনরায় শুষ্কভাব ধারণ করে। এই 'চোর-

পানি হইতে দুইটী পথ নির্গত হইয়াছে। বামদিকে ডেরার পথ ও দক্ষিণ দিকে টীহরি যাইবার রাস্তা। আমাদিগকে টীহরি হইয়াই উত্তর কাশী যাইতে হইবে, কাজেই ডেরার পথ পরিত্যাগ করিয়া ডানদিকের রাস্তাই চলিলাম। ভয়েসওয়াড়া নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া আহারাদি সম্পন্ন ও কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর করাত গ্রাম অতিক্রম করিয়া সিউড় নামক গ্রামে গিয়া রাত্রি বাস করি। পরদিন অম্বাপাট গিয়া বিশ্রাম করিলাম। এই গ্রামে যাইতে একটী ভয়ানক নদী পার হইতে হয়। তৎপরেই এক প্রকাণ্ড চড়াই। আমার অনভ্যাস প্রযুক্ত এই চড়াই ভাঙ্গিয়া সেদিন আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। তৎপরদিন টীহরি পৌঁছিবার কল্পনা, কাজেই পথে ব্রাহ্মণবেল, সিউলি প্রভৃতি গ্রামে বিলম্ব না করিয়া কেবলমাত্র জলযোগ ও আহার সমাধা করিয়া রওয়ানা হইলাম। অম্বাপাট পৌঁছিতে যেমন চড়াই ভাঙ্গিতে হইয়াছিল টীহরি পৌঁছিতে সেইরূপ উৎরাই। প্রায় ৫ মাইল উৎরাই ভাঙ্গিয়া সন্ধ্যার পর কোন প্রকারে টীহরির অপর পারে আসিয়া পৌঁছিলাম। আমার আর চলিবার শক্তি ছিল না, কম্বল বিছাইবারও অবসর হইল না, ধরাসনেই শয়ন করিলাম।

আমরা হরিদ্বারের পথে টীহরি গিয়াছিলাম। অনেকে ডেরা হইতেও টীহরি আসিয়া থাকেন। ডেরা হইতে টীহরি যাইতে হইলে রাজপুর পর্য্যন্ত সমতল পথ তৎপরেই চড়াই। ৩ মাইলের পর ঝাড়পানি নামক একটী ক্ষুদ্র আড্ডা আছে। এখানে কয়েকখানি মিঠাইয়ের দোকান ভিন্ন পথিকদিগের থাকিবার কোন সুবিধা নাই। একটী ডাকবাংলা আছে, কিন্তু উহা সাহেবদিগের জন্য, দেশীয় লোকদিগকে মশূরী বা ল্যাণ্ডোরে গিয়া বিশ্রাম করিতে হয়। ল্যাণ্ডোর ইংরাজ সেনানিবাস, সুতরাং ইহাপেক্ষা মশূরীই থাকিবার পক্ষে সুবিধাজনক স্থান। মশূরীতে একটী শিবালয় এবং তৎসংলগ্ন একটী ধর্ম্মশালা আছে। এখানে সাধু সন্ন্যাসীর তো কথাই নাই গৃহস্থ যাত্রীও রাত্রি-যাপন করিতে পারেন। মশূরীর পর ঝালকী। এখানে গ্রামের উপযুক্ত দোকানপাট আছে এবং তাহাতে আহারীয় দ্রব্য সকলই পাওয়া যায়। ঝালকীর পর কানাতাল এবং তৎপরে ধনলোটী, ধনলোটীর পর কৌড়িয়া এবং কৌড়িয়ার পরই টীহরি। এই পথে প্রায় প্রত্যেক স্থানেই ডাক-বাংলা এবং দোকানপাট আছে, রাস্তা ঘাটও পরিষ্কার। ইংরাজ পর্য্যটকগণ এই পথ দিয়াই হিমাচলের বিভিন্ন স্থানে গমন করিয়া থাকেন। কেহ কেহ রাজপুর হইতে ডাণ্ডী বা ঝাম্পান (পার্ব্বত্য পথের উপযুক্ত যান) কেরায়া করিয়া লইয়া থাকেন।

টীহরি গড়ওয়াল রাজ্যের রাজধানী। প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে এখানে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজা ছিলেন। প্রত্যেকের এক একটি পৃথক কেল্লা বা গড় ছিল। এইরূপ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গড়ে বিভক্ত ছিল বলিয়াই ইহার নাম গড়ওয়াল। অবশেষে চাঁদপুরের রাজা অজয় পাল সকলকে পরাস্ত করিয়া একছত্রী নৃপতি হন এবং গড়ওয়াল রাজ্য সংস্থাপন করেন। ইনি শ্রীনগরে নিজ রাজধানী স্থাপন এবং তথায় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করেন। এখনও সেই রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বংশাবলী ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরবর্ত্তী রাজা প্রদ্যুম্ন শাহ গোরখাদিগের সহিত যুদ্ধে বিতাড়িত হন, কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ইনি ঐ যুদ্ধে হত হন। তৎপরে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে নেপাল যুদ্ধ শেষ হইলে প্রদ্যুম্ন শাহের পুত্র সুদর্শন শাহ রাজ্য প্রাপ্ত হন। তদবধি গড়ওয়াল রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত। অলক-নন্দার পশ্চিম উপকূলস্থ ভূমি সকল স্বাধীন গড়ওয়াল বলিয়া অভিহিত হইল ও সুদর্শন শাহের শাসনাধীন রহিল এবং উহার পূর্ব্ব উপকূলস্থ ভূমি বৃটিশ রাজ্যভুক্ত হইল। সুদর্শন শাহ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় বৃটিশ রাজের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহার কিছু দিন পরেই সুদর্শন শাহের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত কোন সন্তান ছিল না, কাজেই তাঁহার রাজ্য বৃটিশ রাজ্যভুক্ত করিবার প্রস্তাব হয়, কিন্তু সুদর্শন শাহ সিপাহী বিদ্রোহকালীন যে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া বৃটিশ রাজ ভবানী শাহ নামক একজন নিকট-আত্মীয়কে রাজ্য দেন, পরে তাঁহাকে এই সনদ দেওয়া হয় যে তিনি পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিতে পারিবেন। ভবানী

শাহ ১৮৭২ খৃঃ এবং তাঁহার পুত্র প্রতাপ শাহ ১৮৮৭ খৃঃ প্রাণত্যাগ করেন। ইহার পর রাজা স্তর কীর্ত্তি শাহ K.C.S.I. ১৮৯২ খৃঃ গদী প্রাপ্ত হন। ইনি মহারাজা জঙ্গ বাহাদুরের পৌত্রীকে বিবাহ করেন। ইঁহার পুত্রের নাম টীকা নরেন্দ্র শাহ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি গড়ওয়াল রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত, বৃটিশ গড়ওয়াল ও স্বাধীন গড়ওয়াল। টীহরি এই স্বাধীন গড়ওয়াল রাজ্যের রাজধানী। ইহা দেখিতে বড়ই সুন্দর। চারিদিকে পর্ব্বত প্রাকারে বেষ্টিত, মধ্যে সমতল ভূমি। এই সমতল ভূমিতেই টীহরি নগরটী সংস্থাপিত। নগরের পশ্চিম সীমাতে ভাগীরথী গঙ্গা ও উত্তর সীমাতে ভিল্লাঙ্গনা বা বীরি গঙ্গা। টীহরি হইতে দুইটী পথ বাহির হইয়াছে, একটী টীহরি নগরের মধ্য দিয়া বদরিকাশ্রমের দিকে গিয়াছে, অপর পথটী গঙ্গার তীরে তীরে উত্তর কাশীর দিকে গিয়াছে। আমাদিগকে উত্তর কাশীতে যাইতে হইবে, সুতরাং গঙ্গাতীরই আমাদের অবলম্বন। অম্বাপাট হইতে আমরা টীহরির অপর পারে পৌঁছিয়া একটী ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম। এই ধর্ম্মশালাটী টীহরি রাজের প্রতিষ্ঠিত। রাত্রিকালে কোন প্রকারে ঐ ধর্ম্মশালায় কাটাইয়া পর দিন প্রাতে পায়ের বেদনা একটু কম হইলে গঙ্গার উপরিস্থ পুল পার হইয়া নগরটী দেখিতে গেলাম। দেখিলাম, নগরটী অতি মনোহর। পথ ঘাট সুপরিষ্কৃত ও প্রশস্ত। এখানে বৃটিশ রাজ্যের অনুরূপ সকলই বিদ্যমান। একটী ইংরাজি বিদ্যালয়, ডাকঘর এবং হাঁসপাতাল আছে। বাড়ী ঘর দুয়ার অধিকাংশই পাকা ইমারত। পথের ধারে ধারে আলো দিবার জন্য lamp post (আলোক-স্তম্ভ) নির্ম্মিত আছে। রাত্রিতে আমরা যখন টীহরি পৌঁছি তখন আলোকমালা দেখিয়া মনে বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। আমরা এখানে কয়েকটী মন্দির ও বৈরাগী সন্ন্যাসীদের আখড়া দেখিয়াছিলাম। ইহার এক মাইল দূরে সিমলাশুতে একটা বাগানবাটী আছে। শীতকালে রাজা এইখানেই বাস করেন। গ্রীষ্মকালে এখান হইতে ৭।৮ মাইল অন্তর পাহাড়ের উপর বর্ত্তমান রাজার পিতা প্রতাপ শাহ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রতাপ নগরে বাস করেন। আমরা যে সময়ে সেখানে গিয়াছিলাম, সে সময়ে তথায় উল্লেখযোগ্য কোন রাজপ্রাসাদ ছিল না। নিকটস্থ পর্ব্বতোপরি একটী নির্ম্মিত হইতেছিল। উহাতেই রাজার বাসভবন হইবে এইরূপ শুনিয়া আসিয়াছিলাম।

পরদিবস টীহরি হইতে রওয়ানা হইয়া ভল্যান নামক স্থানে গিয়া আহারাদি সম্পন্ন করি। ভল্যান টীহরি হইতে ৭ মাইল। বৈকালে আরও ৬ মাইল গিয়া সরোটে রাত্রি যাপন করি। আমরা এখন গঙ্গার তীর অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছি, কাজেই খুব বেশী চড়াই বা উৎরাই ভাঙ্গিতে হইতেছে না। তবে বৃটীশ রাজ্যের পথে যেরূপ সুবিধা আছে এখানে তাহার কিছুই নাই। বৃটীশ রাজ্যে প্রায় প্রত্যেক স্থানেই ডাকবাংলা আছে, নিকটে দোকান আছে তাহাতে পথিকগণের আবশ্যকীয় চাউল ডাইল আটা নুন ঘৃত লঙ্কা সকলই পাওয়া যায়। পথও পথিকগণের চলিবার পক্ষে যতদূর সুগম করা যাইতে পারে তৎপক্ষে ক্রটী নাই। টীহরি রাজ্যে পথ-ঘাটের তো কথাই নাই, গ্রাম্যলোকেরা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবার জন্য কোন প্রকারে ক্ষেত্রের আইলের ন্যায় নাগডাণ্ডী করিয়া লয়, সেই পথ ধরিয়াই চলিতে হয়। পদে পদে পদস্খলনের সম্ভাবনা। মাঝে মাঝে দুই একটী দোকান আছে, কিন্তু দোকানদারকে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি দোকান পাট বন্ধ করিয়া কোথায় চলিয়া যান সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। তবে এ পথে গ্রাম্য লোকের এবং সাধু সন্ন্যাসীদের যাতায়াতই অধিক। ইঁহাদের দ্রব্যাদি খরিদ করিবার বিশেষ আবশ্যক হয় না। পথ চলিবার কালেও ইঁহারা সুখী নাগরিকের ন্যায় কষ্ট অনুভব করেন না, কাজেই এক প্রকারে চলিয়া যাইতেছে।

পরদিন প্রাতে আমরা সরোট পরিত্যাগ করিয়া ৪।৫ মাইল গিয়া ধরাসু নামক স্থানে আহারাদি করিলাম। ধরাসু সমুদ্র সমতল হইতে ৩৩০০ ফিট উচ্চ। এখানে নাথ যোগী বা কনফট যোগীদের আড্ডা। মৎস্যেন্দ্র নাথ ও তৎশিষ্য গোরক্ষ নাথের নামানুসারেই নাথ যোগী নামকরণ হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের যোগীগণ কর্ণে বৃহৎ ছিদ্র করিয়া নানাপ্রকার বলয় পরিধান করেন তজ্জন্য ইঁহাদিগকে কনফট যোগী বলে। যাঁহারা এইরূপ বলয় ধারণ করেন

না তাঁহাদের এই মঠে প্রবেশাধিকার নাই। আমাদের সেখানে যাইবার আবশ্যক হয় নাই, পাকাদি করিবার জন্ত পথিকগণের পক্ষে বৃক্ষতলই যথেষ্ট। স্বামীজি ইহাঁদের মঠ দেখিবার বাসনায় মঠাধিকারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ছিলেন। তাঁহারা স্বামীজিকে প্রবেশ অধিকার দিয়াছিলেন। বৈকালে আমরা আরও ৬।৭ মাইল হাঁটিয়া ডুণ্ডাগ্রামে পৌঁছিলাম। ডুণ্ডা টীহরি হইতে ২৪ মাইল। এখানে একখানি দোকান ও ধর্ম্মশালা আছে। ডুণ্ডাতে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন উত্তর কাশী পৌঁছি। এত দিনে আমাদের অভীপ্সিত স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম। হরিদ্বার হইতে টীহরি প্রায় ৩০ মাইল এবং টীহরি হইতে উত্তর কাশীও ৩০ মাইল। এই ৬০ মাইল পথ চলিতে আমাদের ৭।৮ দিন লাগিয়াছিল।

উত্তর কাশী উত্তরাখণ্ডে অবস্থিত। বোধ হয় এই জন্তই ইহাকে এইরূপ বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ইহা যুক্তপ্রদেশে অবস্থিত কাশীর ন্যায়। এখানে বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা আছেন, কেদারেশ্বর আছেন। মণিকর্ণিকা ও দশাশ্বমেধের ঘাট আছে। এই কাশীও অসি বরুণার বেষ্টিত ও পঞ্চক্রোশব্যাপী। এই নগরীও উত্তরবাহিনী গঙ্গার উপকূলে অবস্থিত। ইহা সর্ব্বাংশেই আমাদের কাশীর ন্যায়, তবে এখানে ভোগের কোন সামগ্রী নাই, বিলাসের দ্রব্য এখানে পাওয়া দুষ্কর। এখানে সাধু সন্ন্যাসীরাই আসিয়া থাকেন। যোগী ঋষিরাই এই কাশী আশ্রয় করিয়া আছেন। যাঁহারা নির্জ্জনে তপস্তা করিতে ইচ্ছুক, সহরের কোলাহল হইতে দূরে থাকিতে বাসনা করেন, তাঁহাদের জন্যই এই স্থান। স্কন্দ পুরাণান্তর্গত কেদারখণ্ডে হিমাচলস্থ তীর্থ সকলের বর্ণন আছে, তন্মধ্যে উত্তর কাশী মাহাত্ম্যে ইহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে :—

স্কন্দ উবাচ।

অস্তি গুহ্যতমং ক্ষেত্রং সারাত্সারতরং পরং।
পরং গোপ্যং পরং তথং তুষারবচ্ছিলোচ্চয়ে॥
সর্ব্বতীর্থময়ং সর্ব্বদেব যুতং সুপুণ্যদম্।
যত্র ভাগীরথী পুণ্যা গঙ্গাচোত্তর বাহিনী॥
সৌম্য কাশীতি বিখ্যাতা গিরৌ বৈ বারণাবতে।
অসীচ বরণা চৈব দ্বে নদ্যৌ পুণ্য গোচরে॥
যত্র ব্রহ্মাচ বিষ্ণুশ্চ মহেশশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
নিত্যং সন্নিহিতা যত্র মুক্তি ক্ষেত্র তথোত্তরে॥
যত্রর্ষিণাঞ্চ স্থানানি আশ্রমাশ্চ তথা শুভাঃ।
যত্র মারকতীং ভাসাং বিভ্রত্যেব সদাশিবঃ॥
নিঃক্ষিপ্তা যত্র পূর্ব্বং হি সংক্ষায় দৈবতাসুরে।
অদ্যাপি দৃশ্যতে তত্র শক্তির্দ্ধাতুময়ী শুভা॥
যমদগ্নি সুতো যত্র তপস্তেপে সুদুষ্করম।
তস্য ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং সাবধানাবধারয়॥
যত্র পুণ্যানি তীর্থানি সর্ব্বকাম প্রদানি হি।
যেষাং সন্দর্শনা দেব ন চ ভূয়োঽভি জায়তে॥
ইয়মুত্তর কাশীতি প্রাণীনাং মুক্তিদায়িনী।
ধন্যা লোকে মহাভাগ কলৌ যেষামিহস্থিতিঃ॥
যত্র সর্ব্বাংশ ভাবেন বসন্তে সর্ব্ব দেবতা।

স্কন্দ কহিলেন, হে নারদ, আমি যাহার বিষয় বর্ণনোদ্যত সেই ক্ষেত্র সম্বন্ধীয় তত্ত্ব শিলোচ্চয়ে তুষারবৎ অতি গোপনীয়। বারণাবত পর্ব্বতে সৌম্য কাশী নামে বিখ্যাত। সারাৎসার, গুহ্যতম, সর্ব্ব তীর্থময় সর্ব্বদেব সমন্বিত বহু পুণ্যপ্রদ একটী তীর্থ আছে। এই তীর্থে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী গঙ্গা উত্তরবাহিনী এবং সাক্ষাৎ পুণ্যরূপা অসী ও বরণা নদীদ্বয় প্রবাহিতা হইতেছেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর সর্ব্বদাই উত্তরস্থ এই মুক্তি ক্ষেত্রের সন্নিহিত থাকেন। ইহাতে মহর্ষিগণের স্থান ও পুণ্যাশ্রম অনেক বিদ্যমান রহিয়াছে। এখানে সদাশিব সর্ব্বদাই মারকত তেজ ধারণ করিয়া আছেন। দেবাসুর সংগ্রামে নিক্ষিপ্ত শক্তির ধাতুময়ী মূর্ত্তি এখনও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। যমদগ্নি তনয় পরশুরাম এই তীর্থেই দুষ্কর তপশ্চরণ করিয়াছিলেন, সেই তীর্থের মাহাত্ম্য মনঃসংযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। হে মহাভাগ! যে সকল পুণ্যতীর্থ সন্দর্শনে মনুষ্যের আর জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয় না, এইরূপ সর্ব্বকামপ্রদ তীর্থ সমূহ এই প্রাণী সকলের মুক্তিদায়িনী উত্তর কাশী বিদ্যমান। এই ক্ষেত্রে সর্ব্বদেবতা পূর্ণরূপে সর্ব্বদাই বাস করিতেছেন। অতএব, কলিকালে যাঁহারা এই ক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহারা ধন্য।

আমরা এই কাশীতে আসিয়া কেদারেশ্বরের মন্দির প্রাঙ্গণস্থ একটী প্রকোষ্ঠে আশ্রয় লইলাম। কয়েকদিন অবস্থানের পর স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া জ্ঞানাঙ্ক অর্থাৎ জ্ঞানবাপীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলাম। ইহা ঠিক গঙ্গারই উপকূলে। নিকটেই একটী প্রস্রবণ। এই প্রস্রবণকেই জ্ঞানবাপী বলে। ইহার চতুর্দ্দিকে নানা জাতীয় বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ। ঐ সকল বৃক্ষে বিহঙ্গমকুল বাস করে। বিহঙ্গমকুলের অস্ফুট ধ্বনিতে প্রাণ মন বিমোহিত হয়। এরূপ স্থানে আসিলে যে নিতান্ত পাষণ্ড তাহার মনও ক্ষণেকের জন্য ঈশ্বর-প্রেমে মুগ্ধ হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নিম্নে গঙ্গা কল কল নাদে পর্ব্বত গাত্রে লাগিয়া প্রবাহিত হইতেছে, উপরে ঝরণার জল ঝর্ ঝর্ শব্দে নির্গত হইতেছে। চারিদিকে ফল ফুল শোভিত উদ্যান—জন মানবের সমাগম নাই। নির্জ্জন নিরাবিল; এখানে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ভিন্ন বিকারের লক্ষণ মাত্র দৃষ্ট হয় না, কাজেই স্বতঃই বিশ্বেশ্বরের প্রতি মন আকৃষ্ট হয়। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, এই উত্তর কাশীতে গিয়া বিল্ব-বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম না। আমি স্বামীজিকে বলিলাম, "স্বামীজি, বিল্বপত্র না হইলে আমি শিবপূজা কিরূপে করিব?" স্বামীজি ডুণ্ডাগ্রামে লোক পাঠাইয়া এক টুকরা বিল্বপত্র ও একটী বেলের চারা আনাইয়া দিলেন। ঐ চারাটী কেদারেশ্বরের মন্দিরের পার্শ্বে রোপন করিয়া উহার উপর আচ্ছাদন দিয়া দেওয়া হইল, পাছে হিমে নষ্ট হইয়া যায়। বহু যত্নে ঐ বৃক্ষটী বড় হইয়া উঠিয়াছে। স্বামীজি বারান্তরে উত্তরাখণ্ড ভ্রমণ করিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন, "বাবু! তোমার বেলগাছটী এখন বড় হইয়াছে এবং এখন উহা আর বরফে নষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই।"

দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর নাতিবৃহৎ মন্দির মধ্যে বিশ্বনাথের লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজমান। মন্দির প্রাঙ্গণে কতকগুলি দেবদারু বৃক্ষ আছে। এই বৃক্ষপত্র দ্বারাই মহাদেবের পূজা হইয়া থাকে, কারণ এখানে বিল্ববৃক্ষের অভাব পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বিশ্বনাথের মন্দিরের সম্মুখে একখানি চালাঘর। এই ঘরের মধ্যে একটী ত্রিশূল প্রোথিত আছে। ইহাই অন্নপূর্ণা। এখানে অন্নপূর্ণার কোন পৃথক মূর্ত্তি নাই। এই ত্রিশূলের উপরই শক্তিপূজা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছি পাঠক তাহাতে দেখিয়াছেন লিখিত আছে, "অদ্যাপি দৃশ্যতে তত্র শক্তির্ধাতুময়ী শুভা" এই ধাতুময়ী শক্তিমূর্ত্তি বা ত্রিশূল চাল ভেদ করিয়া উপরে ফলকত্রয় বাহির হইয়া আছে। মাটীর নীচে কতখানি পোতা আছে কেহ বলিতে পারে না। জনরব কোনকালে ইহা তুলিয়া দেখিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু বহুদূর খনন করিয়াও ইহার তলদেশ পৌঁছিতে পারা যায় নাই, অবশেষে সর্প সকল বাহির হইতে আরম্ভ হওয়ায় আর অগ্রসর না হইয়া পুনরায় পূর্ব্বের মত করিয়া রাখা হইল। ত্রিশূলটীর নিম্নাংশ গোলাকার ঘটের ন্যায়। তদুপরি পলতোলা, বোধ হয় অষ্টকোণ। এই অংশে ইহার গাত্রে কিছু লেখা আছে, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। স্থানীয় লোকেরাও ইহার বিষয়ে বিশেষ কিছু বলিতে পারে না। ইংরাজ ঐতিহাসিকের অনুসন্ধানে যাহা নিরূপিত হইয়াছে, নিম্নে প্রদত্ত হইল।

We have another record of this period in the inscription on the trident at Barahat in Tehri. The base or pedestal of this trident is made of copper in size and shape like a common earthen pot; the shaft is of brass about 12 ft. long, the 2 lower divisions decagonal and the upper one spiral. The forks of the trident are about 6 ft. long, and from each of the lateral branches depends a chain to which formerly bells were attached. The local tradition concerning it is that it was created by some Tibetan Raja to whom this part of the country was formerly subject. A copy of the inscription was forwarded by Mr. Trail to Asiatic Society in Calcutta and was partly decyphered by Dr. W. H. Mill with the following result:—It opens with the invocation স্বস্তি শ্রী, addressed apparently to a prince and the first line contains the words যস্য যাত্রা * * * যচ্ছিন্নোচ্ছিতম্ দীপ্তম্ whose and where is a place which is on a lofty peak

and splendidly magnificient'. The second line of the inscription consists of a somewhat turgid verse which may be translated thus :— His son whose ample condition was exalted by a numerous army devouring the juice of the earth like the sun of summer, then arising sat on the throne, and even with his bow unbent still ruled with sage counsels and that abandonment of all selfish passions. He was originally by name উদার চরিত (the man of generous deed) being skilled in all holy duties, did even thus at once, as the best of the lords of power, reduce the fragments the army opposed to him, through crushing all other adversaries chariots and all." This is the whole of the second line, the third and the last which is in prose begins পুত্রঃ পুত্রস্য "the beloved son of a beloved father" and ends with the words তিলকম্ যাবদঙ্গেশিষাতু তাবত কীর্ত্তি সুকীর্ত্তয়োরক্ষারনর্থ তস্যাস্ত রাজ্ঞ স্থিরম্ "as long as the sacred mark remains in the body so long has the glory of these two illustrious ones (father and son) been concealed but henceforward may the immortality of the king be unshaken" the meaning is not very clear and the word সুকীর্ত্তি for illustrious is unusual if not semi barbarous, in its formation.

ক্রমশঃ।

সাধনা।

[শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু বিদ্যাভূষণ, সাহিত্যরত্ন]

ভোর বেলাতেই মনটা চায় কিছু কাজ কর্ত্তে। কেন চায়? কি জন্য চায়? এতদিন চায়নি আজ চাইচে কেন? এতদিন জোর ক'রে দিতে গিয়েছিলেম, নেয় নি, আজ নেবার জন্য কেন এ আগ্রহ, কেন এ ব্যাকুলতা, কেন এ দারুণ ইচ্ছা? কাজ? কাজ কি জগতে এতদিন ছিল না? মন? সে কি এতদিন ভিতরের ঘরে উপুড় হ'য়ে শু'য়ে পড়েছিল না? ডেকেছিলেম, সেধেছিলেম, কেঁদেছিলেম, কৈ সাড়া দেয় নি ত, উঠে নি ত, আপন কাজ সাধে নি ত?

মন! যদি বলিস, "তুমি আমায় তেমন করে ডাক নি, একাগ্রচিত্তে ডাক নি, দেহ মন দিয়ে ডাক নি, সংসার ছেড়ে ডাক নি।" তা হ'লে আমি ব'লি, ডেকেছিলেম, তবে দেখা পাই নি, কেন পাই নি তুই জানিস্।

আজ কেন কাঁদিস্? আজ কেন সাধিস্? আজ কেন ব্যাকুল হ'য়ে উঠিস্? উঠ—ক্ষতি নেই; কিছুদিন থাকিস্। মনের মন নিয়ে আত্মায় মিশিয়ে দিয়ে, মহা-রমণের প্রণয় মুখে আবদ্ধ হ'য়ে আর কিছুদিন থাক্। থাকবি নে? কেন থাকবি নে? কেন করবি নে? আজ ত আমি সাধি নাই, আজ ত আমি তোর পায়ে ধরি নাই, তবে কেন করবি নে? আজ তোকে করতে হবে, চলতে হবে, সাধতে হবে, আমায় নিয়ে।

পরহিত-ব্রতানুযায়ী, নিজেকে, আর তোর নিত্য নব সুখ-দুঃখ-হারিণী অত্যুচ্চ প্রেম-জ্ঞানের আধারকে নিয়ে, মথিত ভুজঙ্গের মত ফণা বিস্তার ক'রে, আপঙ্ক-নিমজ্জিতোত্থিত করীর মত, কটাহস্থিত উষ্ণ তৈলের মত একবার দপ করে জলে উঠ, চকিৎ ফুৎকারে অনল শিখায় চৌদিক আচ্ছন্ন কর, দেখবি আমিও মাথা নীচু করব, আমিও তোর দাস হ'ব।

তুই লেজে খেলবি, আর আমি মূর্খের মত দেখব? এখন তোর দায়,—আমার নয়।

পরের জন্য, লোকের জন্য, সংসারের জন্য, জগতের

জন্ম, মনাত্মার মহামরণ প্রণয়। এ কাজ তোকে সাধ্তে হবে, আজ যখন নিজে এসেছিস্, আমি ছাড়্ব না। তুই বহুরূপী, তাই ব'লে আমায় ভোলাবি? তুই কালামুখী, গরলমুখী, পোড়ারমুখী বলে, আমি তাই হ'ব? কেন? কিসের জন্ত? তুই আমার কে? কোন্ দিক দিয়ে তুই আমার চেয়ে বড়? তোর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ, প্রভু ভৃত্যের নয়—সমান, সমান; বরং আমার বেশী। জলে, ঢেউয়ে যেমন সম্বন্ধ, নিশি চন্দ্রমায় যেমন সম্বন্ধ, পর্ব্বত গুহায় যেমন সম্বন্ধ, তেমনি। জল না থাক্লে, ঢেউ হবে না, রাত্রি না হ'লে চাঁদ হাস্বে না, পাহাড় না হ'লে গুহা থাকে না, বুঝ্লি? তুই আমার অংশীদার হ'তে পারিস, কিন্তু তুই আমার চেয়ে অনেক ছোট।

জগত ক্ষেত্রে, অনেক সময় তোকে সাহায্য করি। অনেক সময় তোর কথায় সায় দিয়ে যাই, অনেক সময় তোর জয় হয়, তা ব'লে ভাবিস নি তুই আমার উপরে গেছিস্, প্রকৃত আসন থেকে আমায় বিচ্যুত করেছিস! আমি যা' তাই।

তাই বল্ছি, তুই আমার হাতে, তোর হাতে আমি নই। তাই বল্ছি সাধ্তে বাসনা হয়েছে, সেধে যা; কিন্তু যা' বলি শুনিস্।

আর তোর সঙ্গে বিবাদ করব না। আর ত ভাই, তোর অনন্ত কাম, প্রেম-সাগরে মিশিয়ে দিয়ে, অনন্ত কামনা, বাসনায় পরিপূর্ণ ক'রে, তোর ঐ অনন্ত জ্ঞান, ধ্যানে ছাপিয়ে দিয়ে, তোর ঐ অনন্ত অর্ঘ, অর্ঘ্যের ডালায় সাজিয়ে দিয়ে, আর ত একবার দেখি কেমন ক'রে বিবাদ থাকে!

"আস্তে পারিস্—দেখ্বি যে তোর আমার মিলন মহান্, তোর আমার সাধ্ বাসনা সব ঐক্য হয়ে একই উদ্দেশ্যে প্রাণপণ ছুটেছে। তবেই কাজ সাধা হয়ে যাবে, তবেই কাজ কর্ত্তে পার্ব্বি, তবেই তোর জয় হবে।

তখন তোকে সাধ্তে হ'বে না, কাঁদতে হবে না, কাকুতি কর্ত্তে হ'বে না,—কেবল মেশামেশি, মিলামিলি, শিবলিঙ্গ।

নিবেদন।

(ভৈরবী)

[শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল]

জীবনে যা' কিছু ভালবাসি আমি
তোমারি চরণে করিনু দান
তোমারি আলোকে দেখিলে সবারে
দীপ্তিহীন সেও জ্যোতিষ্মান!
এই যে এ আমি কত রূপে সাজে
ঘুরি ফিরি চলি এ ভুবন মাঝে
তোমারে ছাড়িলে হে ভুবননাথ
এ আমার কোথাও আছে কি স্থান?

তুমি আছ তাই মূল্য সবার
তুমি বিনা প্রভু কেবা বল কা'র?
তোমারি জ্যোতিতে আলোকিত ভব
বিশ্ব সর্ব্ব সুখের আগার!
ভেবেছি হে তাই ত্রিভুবননাথ
এ জীবনে সদা র'ব তব সাথ
তোমারি চরণে সঁপি দিব এনে
জীবনে যা' কিছু মূল্যবান॥

সংগ্রহ ও সঙ্কলন।

জল পান।

যাঁহারা সুস্থ শরীরে আছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে তাঁহারা সুস্থ আছেন বলিয়া স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশেষ কিছু করিবার নাই। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে শরীর স্বাস্থ্যপূর্ণ অবস্থায় না রাখিলে বিশেষ বিশেষ কারণে একদিনে কিম্বা বহুদিন ধরিয়া স্বাস্থ্যের নিয়ম অবজ্ঞা করিলে ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত কঠিন রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। সেইজন্ত শরীর স্বাস্থ্যপূর্ণ থাকুক কিম্বা রোগাক্রান্ত থাকুক, সকল সময়েই স্বাস্থ্যের নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। জলঅভাবে আমরা বেশী দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু খাদ্য অভাবে মানুষ অনেক দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে। ইহাতে শরীরে জলের প্রয়োজনটা কত তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। নিউইয়র্ক সহরের কোনও চিকিৎসক সম্প্রতি বলিয়াছেন, প্রত্যহ অন্ততঃ ছয় গ্লাস জল পান করা উচিত। তিনি যে এই কথা কেবল রোগীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু পূর্ণ স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির সম্বন্ধেও এই কথা বলিয়াছেন।

আমরা যে জল পান করি তাহা দ্বারা আমাদের যে তৃষ্ণা নিবারণই হইয়া থাকে তাহা নহে, ঐ জল শরীরস্থ নানাপ্রকার বিষ পরিষ্কার করিয়া দেয়। চিকিৎসকের এই ব্যবস্থা সহজ ও সুলভ ইহার প্রয়োজন আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু যাহাদের স্বাস্থ্য ভাল এবং যাহারা সুস্থ থাকিতে ইচ্ছুক তাহাদিগের প্রত্যহ অনেক পরিমাণ জল সেবন করা উচিত। অনেক পরিমাণ অর্থে, অন্ততঃ ছয় গ্লাস। এতটা জল কেন পান করা উচিত তাহার কতকগুলি কারণ আছে। জল পান করার ফলে আমরা যে খাদ্য খাই তাহা নরম হইয়া যায় ও সেজন্ত উহা সহজে হজম হয় ও রক্তে পরিণত হয়। জল পান করার জন্ত পাকরস এরূপ ভাবে জলের সহিত মিশিয়া যায় যে ঐ জল মিশ্রিত পাকরস ভুক্ত দ্রব্যের সমস্ত অংশের সহিত লাগিয়া যায় ও উহা জীর্ণ করে। জল পানের জন্ত রক্তে অনেক জল থাকে ও সেই জন্ত আমাদিগের ঝিল্লি সকল আর্দ্র থাকে। জল পান করার জন্ত আমাদিগের শরীরের উত্তাপ শরীরের নানাস্থানে ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ঠিক মত রাখে এবং উত্তাপ অধিক হইলে ঘর্ম্ম নিঃসরণ হইয়া শরীর শীতল করে। শরীরে অব্যবহার্য্য অংশ দূর করিতে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় পদার্থ।

আমরা যে খাদ্য সেবন করিয়া থাকি উহা আমাদিগকে উত্তাপ প্রদান করে, এই খাদ্যের জন্তই আমরা শক্তি পাই ও সেই জন্তই আমরা কার্য্য করিতে পারি ও চলিয়া বেড়াইতে পারি, তাহা ছাড়া খাদ্যের অব্যবহার্য্য অংশ আমরা পরিত্যাগ করি। ঠিক যেমন কয়লা পুড়াইলে উত্তাপ হয় ও সেই উত্তাপ দ্বারা কার্য্য করা যাইতে পারে ও তাহার ছাই পড়িয়া থাকে, আমাদিগের খাদ্যেও তাহাই হয়। আমাদিগের শরীরে পরিশ্রমের দরুণ নানাপ্রকার পেশী, কোষ প্রভৃতি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও নষ্ট হয়। এই সকল ক্ষয়প্রাপ্ত ও নষ্ট পদার্থ সকল রক্তের সহিত মিশিয়া থাকে ও গাত্রচর্ম্ম, ফুস্‌ফুস্‌, মূত্রাশয় ও অন্ত্র দিয়া উহা শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়। অনেক পরিমাণ জলপান করার ফলে শরীরের এই সকল যন্ত্র অতি সহজে আপন কার্য্য করিতে পারে ও তজ্জন্ত তাহাদিগের কার্য্যে সাহায্য করে। এই সকল যন্ত্র দ্বারা শরীর হইতে অব্যবহার্য্য পদার্থ নির্গত হইয়া যায় বলিয়া শরীরে বিষ জমিতে পারে না।

শরীরের সকল পেশী ও সকল যন্ত্র, এমন কি দন্তেও জল আছে। ঠিক করিয়া বলিতে গেলে শরীরের তিন ভাগের মধ্যে দুই ভাগ জল এবং সেই জন্ত এই মাত্রা সকল সময়ে সমান রাখার প্রয়োজন। প্রত্যহ আমাদিগের শরীর হইতে দেড় সের জল বাহির হইয়া যায় এবং উহা পূর্ণ করার প্রয়োজন, তাহা না হইলে শরীরের যন্ত্র সকল আপন

কার্য্য নিয়মমত করিতে পারিবে না। আমরা যে খাদ্য সেবন করি, তাহা হইতে আমরা অতি কম পরিমাণ জল পাইয়া থাকি, সেই জন্য যাহা কম পড়ে তাহা পূরণ করার প্রয়োজন হয়। ছয় গ্লাস জল পান করিলে সেই মাত্রা পূর্ণ হইয়া থাকে। অনেক পরিমাণ জল পান করা যেমন প্রয়োজনীয় তেমনিই সহজ ব্যাপার। তথাপি অনেক লোক আছে, যাহারা উপযুক্ত পরিমাণে জল পান করে না। শরীরে যতটা জলের প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা অনেক কম জল সেবন করা এই সকল লোকের অভ্যাস হইয়াছে। ইহারা মাথাধরা, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া থাকে; কিন্তু অল্প জল পান করার জন্যই যে তাহাদের এই সকল কষ্ট হইতেছে, সেই কথা তাহারা কখন স্বপ্নেও ভাবে না।

প্রাতে দুই এক গ্লাস জল আহারের পূর্ব্বে পান করা উচিত, উহা গরম হইলে আরও ভাল হয়; ইহাতে পাকস্থলীর যন্ত্র সবল হইবে ও তজ্জন্য আপন কার্য্য ভাল করিয়া করিবে। বাকী চার গ্লাস জল সমস্ত দিনের মধ্যে পান করিতে হইবে। ইহাতে পাকস্থলী ও অন্ত্র সকল কেবল যে পরিষ্কার হইবে তাহা নহে, কিন্তু ইহাতে যকৃৎ, মূত্রাশয় সবল হইবে ও গাত্রচর্ম্ম আপন কার্য্য নিয়মিতরূপে করিবে। আহারের সময়ে জলপান করার দোষ নাই, তবে মুখের মধ্যে যদি আহার্য্য থাকে, তখন জলপান করিলে ঐ খাদ্য ভাল করিয়া না চিবাইয়াই গলাধঃকরণ হইয়া যায়। জলপান করা স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস বলিয়া গণ্য করা উচিত এবং প্রত্যহ অন্ততঃ ছয় গ্লাস জলপান করা উচিত।

—সঞ্জীবনী।

পদ্মাবতীর প্রতি জয়দেব।

[শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায় এম-এ]

চেয়ে দেখ সখি! ওই উথলে সাগর
পৌর্ণমাসী রজনীর বাহু বন্ধে ধরা,
অর্ঘ্যদাম ধবলিত ফেন পুষ্পে ভরা
মাধব-চরণ-প্রান্তে ঢালে নিরন্তর।

কি হবে সন্ন্যাসে মিছা আপনা বঞ্চিয়া,
এস ফিরে পথ ছাড়ি কুটীর প্রাঙ্গণে,
কি হবে সংসার ত্যজি ঘুরি বনে বনে
এত প্রেম ভালবাসা চরণে দলিয়া!

কোথা মাধবের ক্রোধ যদি বাস ভাল
আমারে একান্তে তুমি—এ' ত তাঁরি দান,
চিনাতে তাঁহারি পথ, তাঁহারি সন্ধান
ধরণীর শ্যাম বক্ষে স্বরগের আলো!

প্রাপ্তি-স্বীকার।

শিশুদের খাদ্য হিসাবে মেলিন্স ফুড প্রসিদ্ধ। সারা ভারতবর্ষে সাধারণে ইহা আদরের সহিত ব্যবহার করেন। মেলিন্স ফুডের কর্ত্তৃপক্ষ শিশু-মঙ্গলকামী ডাক্তার জে, জে, পিলে পি, এচ্ ডি মহোদয় এ বৎসরে একখানি Progress Book প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তকখানিতে শিশুর জন্মদিন হইতে তাহার স্বাস্থ্য-রক্ষা—দেহের ওজন, গঠন ও বৃদ্ধি প্রভৃতি কি ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হয় তাহার ধারাবাহিক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। যাঁহারা বিশেষভাবে শিশুর মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখেন, তাঁহারা এই পুস্তক একখানি সংগ্রহ করিয়া রাখিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ, বাঁধান প্রভৃতি অতুলনীয়। ভারতবর্ষের ষ্টেশন হলে ইহা প্রাপ্তব্য।

প্রতি বৎসরেই মেলিন্স ফুড কোং ভারতবর্ষের পৌরাণিক চিত্র সম্বলিত একখানি করিয়া বর্ষ-পঞ্জী বাহির করেন। এবারেও আমরা একখানি মনোরম চিত্র উপহার পাইয়াছি। ছবিখানি শিশুদের মধ্যে অধিষ্ঠিতা ষষ্ঠী দেবীর। ছবিখানি বাঁধাইয়া রাখিলে গৃহের শোভাবৃদ্ধি হয়, দর্শনে মন পবিত্র ও ভক্তিপ্লুত হয়। অসার কল্পিত নরনারীর চিত্র না দিয়া হিন্দুর ধর্ম্মভাব প্রচারে প্রকারান্তরে সাহায্য করিতেছেন বলিয়া মেলিন্স ফুড কোং হিন্দু সাধারণের ধন্যবাদার্হ। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মেকেঞ্জী লায়েল কোংর নিকট পত্র লিখিলে পাওয়া যাইবে। ছবি ৫০০ খানি বিতরিত হইবে।

কলিকাতা, ৩৩এ রাধাপ্রসাদ লেনে বণিকা প্রেসে শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্ত্তৃক ৩০ বি পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেনে অর্চ্চনা কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

২১শ অগ] { মাঘ, ১৩৩১ । } [১২শ সংখ্যা

সত্য-নারায়ণ ।

[শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়]

অধুনা আমাদের ব্রত পূজাদির মধ্যে দেখা যায়, কতকগুলি একপ্রকার ভয়ে ভক্তিতে পূজা। কাম্য পূজাদি মাত্রেই কিছু না কিছু মানস করিয়া পূজা করা হইয়া থাকে ; কিন্তু তাহার মধ্যে এমন কতকগুলি পূজা আছে, যাহাতে কোনরূপ ত্রুটি হইলে দেবতা রোষপরবশ হইয়া অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস। যেমন,—সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার পূজা ; বসন্তরোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শীতলার পূজা ইত্যাদি। কেবল ইহাই নহে, বাঙ্গালার প্রায় প্রতি গ্রামে এমন এক একটী গ্রাম্য দেবতা আছেন, যেমন পঞ্চানন্দ, দক্ষিণদার, মঙ্গলচণ্ডী, রক্ষাকালী ইত্যাদি, যাঁহার ভয়ে সমস্ত গ্রামবাসী এক প্রকার শশঙ্কিত বলিলেও চলে। আমাদের সত্যনারায়ণ ব্রত কতকটা এই শ্রেণীর ভয়ে ভক্তিতে পূজা।

সত্যনারায়ণ ব্রতের নিত্যত্ব নাই ; কেন না এই ব্রতের যদি কেহ অনুষ্ঠান না করেন,—ক্ষতি নাই ; কিন্তু যদি কেহ এই সত্যনারায়ণের প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, অথবা উঁহার সীরণী মানস করিয়া তাহার অনুষ্ঠান না করেন, কিম্বা এই দেবতার পূজার মধ্যে কোনরূপ ত্রুটি হয়, তাহা হইলে আর নিস্তার নাই। সত্যনারায়ণের ব্রতকথার আখ্যানভাগের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে এই প্রকার ভয় দেখান আছে। সাধু সত্যনারায়ণের সীরণী মানস করিয়া কন্যালাভ করিলেন ; কিন্তু পরে সীরণী দিতে বিস্মৃত হইলেন। ফলে, সত্যনারায়ণ রোষপরবশ হইয়া জামাতা সহিত সাধুকে চোরাপবাদ দিয়া বিদেশে কারাগারে বন্দী করেন ; এবং সঙ্গে সঙ্গে উঁহার গৃহাদিও অগ্নিদাহে ছারখার করিয়া দিলেন। পরে সাধুর কন্যা সত্যনারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন, ফলে সাধু ও তাঁহার জামাতা কারামুক্ত হইয়া তাঁহাদের পূর্ব্ব ধন-সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হন। সাধু যখন তাঁহার ধনসম্পত্তি নৌকায় বোঝাই করিয়া স্বদেশ প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, সেই সময় সত্যনারায়ণ উঁহাকে ছলনা করিবার অভিপ্রায়ে, ভিক্ষুকের বেশে উঁহার নিকট কিছু ধন যাচ্ঞা করিলেন। সাধু তাঁহাকে সাধারণ ভিক্ষুক মনে করিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। ইহাতেও সত্যদেবের কোপ হইল। তিনি সাধুর নৌকার যাবতীয় ধন লতা পাতায় পরিণত করিলেন। তাহার পর এই আখ্যানের শেষ ভাগে কথিত আছে, সাধুর কন্যা যখন সত্যনারায়ণ পূজায় ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময় সাধুর স্বদেশ প্রত্যাগমন সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিল। সাধুকন্যা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া

সত্যনারায়ণের প্রসাদ গ্রহণ না করিয়াই নদীতীরের দিকে ছুটিয়া যান। ইহাতেও সত্যনারায়ণ কুপিত হইয়া সাধুর জামাতাকে নৌকা সমেত জলে ডুবাইয়া দেন। এইরূপ বার বার তিনবার সাধু সত্যনারায়ণের কোপে পড়িয়াছিলেন। সাধুর অপরাধ তাঁহার ইচ্ছাকৃত ছিল না, উহা তাঁহার একপ্রকার বুঝিবার ভ্রমমাত্র ছিল; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সত্যনারায়ণ তাঁহাকে ক্ষমা করেন নাই। এ ত আখ্যানের কথা; পাঁচালীর মধ্যেও কবিগণ যথেষ্ট ভয় দেখাইয়া গিয়াছেন। সত্যনারায়ণ ব্রতের পাঁচালীর মধ্যে আছে,—

"ওঝায় কি করিবে যারে কামড়ায় সাপে।
সত্যপীর রুষিলে রাখিবে কার বাপে॥
অতএব শুন লোক না করিহ হেলা।
পরিহাস না করিও দেবতার খেলা॥"

এরূপ ভয়ে ভক্তির উপর আমাদের গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা প্রতিষ্ঠিত হইবার কারণ কি, স্বতঃই এ প্রশ্ন মনের মধ্যে উদয় হয়। এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না বটে; তবে আমরা দেখিতে পাই, আর্য্যগণ যখন অনার্য্যদিগের সহিত মিলিত হন, তখন তাঁহারা, যে কোনও কারণেই হউক, অনার্য্যদিগের বহু দেবদেবীগণকে নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন। এ বিষয় অনেক দিন পূর্ব্বে প্রবাসী, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় বহুবার আলোচিত হইয়া গিয়াছে। কয়েকজন সাহিত্যরথী এরূপ সিদ্ধান্তেও উপনীত হইয়াছেন যে, আমাদের বর্ত্তমান শিব, চণ্ডী, পঞ্চানন্দ,মনসা প্রভৃতি দেব-দেবী অনার্য্য দেবতা। কথাটার মধ্যে কিছু যে সত্য নাই, এ কথা বলা চলে না। খুব সম্ভবতঃ এই অনার্য্যদের দেব-দেবীগণকে আর্য্যদের দেবতা বলিয়া পরিগণিত করিবার উদ্দেশ্যেই পরবর্ত্তী যুগে স্কন্দ পুরাণখানি রচিত হইয়াছিল। অনার্য্যগণ নানারূপ ভয় দেখাইয়া যাহাতে জনসাধারণে দেব-দেবীগণকে ভক্তি করে তাহার চেষ্টা করিতেন। ভয় দেখাইয়া ভক্তির উদ্রেক করাটা আর্য্যরীতি নয়। এ কারণ স্কন্দ পুরাণের কুত্রাপি ভয়ের কথা উল্লেখ হয় নাই। এমন কি, যে সত্যনারায়ণকে আজও পর্য্যন্ত জনসাধারণে ভয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকে, তাঁহার সম্বন্ধেও পুরাণের কোথাও কোনওরূপ ভয় দেখান হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, অনার্য্যদিগের যে ভয়ে ভক্তি করার আজন্ম সংস্কারটা আর্য্যদিগের মধ্যে একত্র বসবাসাদি হেতু আপনা আপনিই সংক্রামিত হইয়া গিয়াছে। এরূপ সংক্রামিত হইবার আরও একটা প্রধান কারণ,—আর্য্যদিগের তৎকালিক দুর্ব্বলতা। যেখানে আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়ি, সেইখানে আমরা নিরুপায় হইয়া দৈবশক্তির শরণ লই। যেমন,—বসন্ত রোগ কখন কাহাকে আক্রমণ করিবে তাহা অনিশ্চিত, উহা রোধ করিবারও আমাদের সাধ্য নাই,—কাজেই আমরা দৈবশক্তির শরণাপন্ন হইবার জন্য শীতলা দেবীর পূজা করি। যিনি যতটা প্রবল, তুষ্ট হইলে তিনি ততটা শুভ করিতে পারেন, আবার রুষ্ট হইলে তিনি ঠিক ততটাই অশুভও করিতে সক্ষম। যে দেবী তুষ্ট হইলে আমরা বসন্ত রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারি, তিনি কুপিত হইলে, সে রোগ হইতে রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা আমাদের যে অল্প এ বিশ্বাস স্বতঃই আসিয়া পড়ে। চণ্ডী পাঠ করিলে সঙ্কট রোগ হইতে মুক্ত, জয়লাভ ইত্যাদি যেমন শুভফল লাভ হয়, অনিয়ম বা ভ্রমপ্রমাদ পূর্ণ পাঠে তদ্রূপ অনিষ্টও যে হইতে পারে, এরূপ বিশ্বাস হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আমাদের সত্যনারায়ণ ব্রত একটি এই শ্রেণীর পূজা। ইনি ঐশ্বর্য্য-সম্পদদাতা হিসাবে পূজিত, এ কারণ ইনি রুষ্ট হইলে অনিষ্ট সাধন করিবেন, সাধারণতঃ এরূপ আশঙ্কা করা হইয়া থাকে।

এখন দেখা যাউক, কোন্ সময়ে এই সত্যনারায়ণ পূজা প্রচলিত হয়। প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, হিন্দুর সত্যনারায়ণ ও মুসলমানদিগের সত্যপীর একই দেবতা। শঙ্করাচার্য্য রচিত সত্যনারায়ণ ব্রতের পাঁচালীর মধ্যে 'সত্যনারায়ণ' ও 'সত্যপীর' এই উভয় শব্দই একত্র ব্যবহৃত হইয়াছে।

"সত্যপীর বলিয়া শিরেতে দিবে হাত।
ইহাতে করিলে হেলা অশেষ উৎপাত॥
সত্য সত্য নারায়ণ বলি' আর বার।
কর জোড় করিয়া করিবে নমস্কার॥"

যদি সত্যপীর ও সত্যনারায়ণ একই দেবতা না হইত তাহা হইলে শঙ্করাচার্য্য তাঁহার পাঁচালীর মধ্যে বারম্বার এই র' শব্দ ব্যবহার করিতেন না। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, উহা আদৌ মুসলমানের দেবতা অথবা হিন্দুর তা। দুই একজন মুসলমান সাহিত্যিক বলেন, দপরিখ্যাত বোগদাদ নগরে মনসুর হাল্লাজ নামক মহা তপোবলসম্পন্ন জনৈক সাধু পুরুষ ছিলেন। তিনি সাধন পথে এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, শেষে আপনাকে "আনল হক" বা "আমি সত্য" বলিয়া প্রচারিত করেন। এই সাধুই শেষে 'সত্য' আখ্যায় আখ্যাত হইতে হইতে কালে মুসলমানের 'সত্যপীরে' এবং হিন্দুর 'সত্যনারায়ণে' পরিণত হন। আবার কোন কোনও সাহিত্যিক এরূপ প্রতিপন্ন করিবারও প্রয়াস পাইয়াছেন যে, আকবরের "দীন এলাহি" ধর্ম্মই কালে 'সত্যপীর' ধর্ম্মে পরিণত হইয়া দেশময় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা বলেন, বৈষ্ণব মহাজনদের কবিতাদির মধ্যে সত্যনারায়ণের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না; এ কারণ বৈষ্ণব মহাজনদের অভ্যুদয়ের পরে আকবরের সময়ে এই সত্যপীর ধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক। এই দুই মতের কোনটার মধ্যে কিছু সত্য নিহিত আছে কি না জানি না; তবে এ সম্বন্ধে এইমাত্র বলিতে চাই, যদি বোগদাদ নগরের মনসুর হাল্লাজের "আনল হক" শব্দ হইতে অথবা আকবরের "দীন এলাহি" ধর্ম্ম হইতে এই সত্যপীর পূজার প্রবর্ত্তন হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা সমগ্র ভারতের না হইয়া বঙ্গদেশের নিজস্ব হইল কিরূপে? সত্যনারায়ণ পূজা ভারতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান, কিন্তু সত্যপীরের সীরণী বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতের আর কুত্রাপি দেখা যায় না। বোগদাদের মনসুর হাল্লাজ পাঞ্জাব যুক্তপ্রদেশকে অতিক্রম করিয়া একেবারে বাঙ্গালাদেশে সত্যপীর বলিয়া প্রচারিত হইলেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আকবরের 'দীন এলাহি' ধর্ম্ম মাত্র বঙ্গদেশেই সত্যপীর ধর্ম্মে প্রচারিত রহিল, অথচ পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশ তাহার কিছুই জানিল না, ইহাই বা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়? এই মত সমর্থন কল্পে যে বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যেই বা কতটা সারবত্তা আছে বুঝিলাম না। ভগবান নারায়ণের সকল মূর্ত্তিই,—শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের সকল দিকটাই বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচ্য বিষয় নয়। বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণ লীলায় প্রেমের দিকটাই,—ভগবানের প্রেমময় ভাবটাই বিশেষ ভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের অপর দিকগুলি তেমন লক্ষ্য করা হয় নাই বলিলেও চলে। বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। বৈষ্ণব সাহিত্যে বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে, কুরুক্ষেত্রের নয়; কিন্তু তজ্জন্য কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া যায় না। আমাদের সত্য-নারায়ণ—নারায়ণ বটে, কিন্তু উনি ননীচোরা গোপাল বা বৃন্দাবনের রাসবিহারী নহেন, উনি ঐশ্বর্য্য-সম্পদদাতা ভগবান। উনি রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির ন্যায় অবতার হিসাবে মর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিয়া লীলা করেন নাই; সুতরাং বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁহার সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ না থাকায়, এই সাহিত্য যুগে তাঁহার অস্তিত্ব ছিল না, এ কথা বলা চলে না। আমরা দেখিতে পাই, ভারতের সর্ব্বত্র সত্য-নারায়ণ ব্রততে দেশীয় ভাষায় যতগুলি পাঁচালী ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাদের সকলগুলি বিভিন্ন প্রকার হইলেও, উহাদের মূল আখ্যানভাগ স্কন্দ পুরাণের রেবাখণ্ড হইতে গৃহীত। সুতরাং মনে হয়, স্কন্দ পুরাণই বর্ত্তমান সত্য-নারায়ণ ব্রত পূজার আদি ভিত্তি। স্বীকার করি, আমাদের পুরাণগুলির মধ্যে স্কন্দ পুরাণই সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক, কিন্তু উহা যে মুসলমান বিজয়ের পরে রচিত বা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, এ কথা বোধ হয় কেহই বলিবেন না।

সকলেই জানেন, মুসলমান বিজয়ের পর বহু হিন্দু নর-নারী মুসলমানগণের উৎপীড়নে বাধ্য হইয়া, কেহ বা লোভের বশীভূত হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। হিন্দুগণ ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে কি হইবে, তাঁহাদের জন্মগত সংস্কার, তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি ভাব, তাঁহারা সহজে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। কেবল তাহাই নহে, শীতলা, মনসা, রক্ষাকালী, সত্যনারায়ণ প্রভৃতি গ্রাম্য দেব-দেবীগণের প্রতি যে ভয়ে ভক্তির

ভাবটা তাঁহারা আজন্ম পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, ইসলাম ধর্ম্মগ্রহণের পরেও সে ভাবটা একেবারে পরিত্যাগ করাটা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ফলে, মুসলমান হইয়াও তাঁহারা হিন্দুর আচার ব্যবহার, হিন্দুর প্রতি সদ্ভাব, হিন্দুর গ্রাম্য দেবতাগণের প্রতি ভক্তি যথাসম্ভব বজায় রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। আজও পর্য্যন্ত দেখা যায়, বাঙ্গালার অনেক পল্লীতে মুসলমানগণ হিন্দুর শীতলা, মনসা প্রভৃতি গ্রাম্য দেব দেবীর পূজা পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। পুরাবৃত্তের আলোচনার দ্বারা আমরা এখনও দেখিতে পাই, প্রাচীনকালে হিন্দু মুসলমানগণের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহানুভূতির ভাব অত্যন্ত প্রবল ও গভীর ছিল। এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক;—বঙ্গের মুসলমানগণের অধিকাংশ হিন্দুরই ভাই, ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও হিন্দু-রক্ত ধমনীতে প্রবাহিত। এই প্রীতি ও সহানুভূতির ভাব হইতেই হিন্দু মুসলমানগণের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকটা উদারতার ভাব আসিয়াছিল; আর তাহারই ফলে হিন্দুর সত্যনারায়ণ মুসলমানদিগের সত্যপীরে পরিণত হয়। একমাত্র 'খোদা' ব্যতীত আর কাহারও উপাসনা করা ইসলাম ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাঙ্গালায় সত্যপীর, মানিক-পীর, ওলাবিবি, গাজিসাহেব প্রভৃতি মুসলমান দেবদেবীগণ পূজিত ও হিন্দুর দেবদেবীর ন্যায় বাতাসা, পাটালী, সন্দেশ প্রভৃতি সীরণী পাইয়া থাকেন। কেবল বাঙ্গালায় বলি কেন, ভারতের প্রায় প্রত্যেক দেশে কোনও না কোন পীর, পেগম্বর, আউলিয়া বা সহীদ পূজিত ও সীরণী পাইয়া থাকেন। দিল্লীর ন্যায় প্রাচীন মুসলমান রাজধানী সহরে আমি স্বয়ং দেখিয়াছি, জগদ্বিখ্যাত নিজাম উদ্দিন আওলিয়ার ও সারমদ সহীদের সমাধি মন্দিরের উপর বাতাসা, লাড্ডু প্রভৃতি সীরণী নিবেদন করা হইয়া থাকে। ইহা কি হিন্দু মুসলমানের সংমিশ্রণের,—ইহাঁদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা উদারতার—একটা সখ্য ভাবের ফল নয়? অধুনা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যতই বিদ্বেষ ভাব থাকুক না কেন, মুসলমানগণ পীর পেগম্বরগণকে পূজা করা বা তাঁহাদিগকে সীরণী নিবেদন করাটা যে হিন্দুগণের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন,—হিন্দুর সহিত সংমিশ্রণের ফলে এই সীরণী নিবেদন করাটাই যে ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের একটা বিশেষত্ব, এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই উচ্চ উদারতা ও সম্প্রীতির ভাবই এক সময় একেশ্বরবাদী মুসলমান কবিগণকে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনায়, সৈয়দ জাফর ও মির্জ্জা হোসেন আলিকে কালী মাহাত্ম্য রচনায় এবং গাজী দরাফকে গঙ্গা পূজায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। কেবল তাহাই নহে, শত শত হিন্দু নর-নারীকে গাজী সাহেব, ওলাবিবি, মানিকপীর, সত্যপীর প্রভৃতি মুসলমান দেবদেবীগণের নামে উপবাস ও সীরণী দিতে প্রণোদিত করিয়াছে। তখন উভয় জাতির আচার-ব্যবহার পরস্পরের মধ্যে এতই পরিগৃহীত হইয়াছিল যে, আজও পর্য্যন্ত যদি সেই উদারতার ভাবটা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া আসিত, তাহা হইলে এই উভয় জাতি আজ এক মহামিলনের পথে আসিয়া সদর্পে গলাগলি করিয়া দাঁড়াইতে পারিত—ভারতের এ দুর্দ্দিন আর আসিত না।

আমাদের এমন অনেক ব্রত পূজা আছে, পুরনারীগণ যাহার পুরোহিত, ব্রত কথা নারীগণের মুখে মুখেই চলিয়া আসিতেছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমাদের সত্যনারায়ণ এক সময় পুরনারীগণেরই পূজা ছিল;—উহার পৌরহিত্য ও ব্রত-কথা উঁহাদেরই হস্তে ন্যস্ত ছিল। পরে যে সময় মনসার গান, চণ্ডীর গান প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে সম্প্রসার লাভ করে, সেই সময় উহাদের সঙ্গে সত্যনারায়ণের পাঁচালীও সাহিত্যের মধ্যে স্থান পায়। অধুনা বঙ্গদেশে যতগুলি সত্যনারায়ণ পাঁচালী প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে এই কয়জন কবির নামই সমধিক প্রসিদ্ধ;—রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র, ফকির রাম দাস, দ্বিজ রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, দ্বিজ কাশীনাথ, দ্বিজ রাম-ভদ্র, দ্বিজ বিশ্বেশ্বর, লালা জয়নারায়ণ সেন, শঙ্করাচার্য্য, দ্বিজ পণ্ডিত, জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্য, দ্বিজ রঘুনাথ, ফকিরচাঁদ, দ্বিজ রামানন্দ, দ্বিজ রামকৃষ্ণ, দীনহীন দাস, দ্বিজ জয়দেব এবং বিকলভট্ট। এই কবিগণই এক সময় একটা সত্য-নারায়ণী সাহিত্য সৃষ্টির জন্য সাধ্যমত প্রয়াস পাইয়াছিলেন; বিভিন্ন কবি ভিন্ন ভিন্ন পাঁচালী প্রণয়ন করিলেও, সকলেরই

আখ্যানভাগ, সকল কবির সার বক্তব্য স্কন্দ পুরাণের রেবাখণ্ড হইতে পরিগৃহীত। মৌলিক পাঁচালী একান্তই দুর্লভ। কিছু দিন পূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে শ্রীযুক্ত মুন্সী আব্দুল করিম শ্রীকবি বল্লভ রচিত একখানি সত্যনারায়ণের পুঁথি প্রকাশিত করিয়াছেন। এই পুঁথিখানির মধ্যে কিছু মৌলিকত্ব আছে। বঙ্গসাহিত্যের কত পুঁথি যে কালসাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে, কত পুঁথি যে এখনও গৃহকোণে লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করিবার উপায় নাই; সুতরাং এই কবি বল্লভের ন্যায় আরও যে কোনও মৌলিক রচনা বঙ্গসাহিত্যে ছিল না এমন কথা বলা যায় না। মৌলিক রচনাই হউক অথবা স্কন্দ পুরাণ হইতে আখ্যানভাগ গৃহীত হউক, যে সময় সত্যনারায়ণী সাহিত্য রচিত হইয়াছিল, সে সময় যে আমাদের মধ্যে ভয়ে ভক্তির সংস্কারটা অত্যন্ত প্রবল ছিল, হিন্দু মুসলমানগণের মধ্যে যে ধর্ম্ম বিষয়ে বিশেষভাবে সম্প্রীতি ছিল, তাহা এই কবিগণের পাঁচালীর মধ্যেই বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

বহুরূপী

[শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

৬

"কি হলো? কিছু কি যোগাড় করতে পেরেছ? চালের দোকানে ধার বন্ধ করে দিয়েছে, সেদিকে কি খেয়াল আছে?" বলিয়া গিন্নি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। আমি তখন অনন্যমনে বন্ধু-বান্ধবের পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিতেছিলাম। একদিন আমার এত বন্ধু ছিল যে সকলকে এক সঙ্গে নিমন্ত্রণ করে উঠতে পারতাম না। আজ তাদের অনেকেই দেখা করতে গেলে শরীর ভাল নয়, এইমাত্র বাহির হ'তে আসছেন, এখন দেখা হবে না, ভৃত্যের মুখে এই সংবাদ অনেক স্থান হ'তে নিয়ে ফিরে আসতে হয়। একদিন একটী বন্ধুর ব্যবহার স্মরণ হয়ে হাসি পাইতেছিল। সেদিন একটী বড়মানুষ বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'তে, তিনি অগত্যা অনন্যোপায় হয়ে দু-চারটা কথা কহিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সেগুলির সার অংশ হচ্ছে "আমি তোমার সব খবর রাখি। তুমি যে চাকরী ছেড়ে দিয়েছ সে সংবাদ পেয়েছি। তারপর একজন বন্ধুর সঙ্গে লোহার কারবার করেছিলে, তুমি না বল্লেও যথাসময় সব খবর আমার নিকট আসে। ভালোয় ভালোয় যে তার সঙ্গে মিটে গেছে এটা খুব মঙ্গল। তা নূতন কারবার গোড়ায় একটু বুঝে সুঝে চল্লে, কারবারটা বজায় রাখ্তে পার্তে। শুনলাম নাকি, তিন চার হাজার টাকা খরচ করে ফেলেছিলে? দেখ ভাই, আসল কথা হচ্ছে, কি জান লোভ! সকল রিপুকে দমন করা যায়, কিন্তু লোভ সামলাইতে বড় বড় মুনি ঋষিরাই পারে না, তা আমাদের কথা ত কোন তুচ্ছ। আজকাল এই সব কথাগুলি যত অধিক করে ভাবা যায় তত যেন বেশী করে সংসারের স্বরূপ চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।"

আমি তাহার কথা শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলাম।

গিন্নি আমাকে নিবিষ্ট-চিত্তে ভাবতে দেখে পুনরায় বল্লেন, "কাল ছেলের স্কুলের মাহিনা না দিতে পারলে স্কুলে ঢুকতে দেবে না বলে দিয়েছে। ছেলে ত ভেবে সারা। এখন ত আর ছেলে মানুষটী নেই, সব বুঝতে পারে, কেবল ভয়ে তোমাকে কিছু বলতে পারে নে। তার একটা যাহা হোক করতে হবে। কেবল শুয়ে পড়ে ভাবলে, আর অমুক বন্ধু তোমার জন্য ভেবে ভেবে রাত্রিতে ঘুমতে পারছে না, এ সংবাদ নিয়ে বাড়ী এলে, পেট সে কথা কি শুনবে, না স্কুলের মাষ্টার তা বুঝবে? আবার তিন মাসের বাড়ী-

ভাড়া জমে গেছে। 'আজ নয় কাল এসে দাঁড়াবে। এখন উপায় কি? তিন তাড়াতাড়ি কাউকে কোন কথা জিজ্ঞাসা নেই, এই যে এতদিনের চাকরী তা এক কথায় ছেড়ে দিয়ে এলে কেন? বল্লে—দাসত্ব করার চেয়ে পাপ নেই, কিন্তু এই পাপই যে এতদিন এমন করে বিছানায় পড়ে কড়িকাট গোণবার সুযোগ দেয় নাই, সে কথা কি মনে পড়ছে?"

আমি বলিলাম "দেখ, অজয় যে কোনদিন এমন কাজ করতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবা সম্ভবপর বলে মনে করি নাই।"

গিন্নি বলিলেন "তা মনে কর নেই বলেই ত আজ খুব বেশী করে মনে করছ। আমি তখনি বলেছিলাম, যে জাতের মায়ের পেটের ভাইয়ে ভাইয়ে বনিবনা হয় না, সে জাতের বন্ধুর সঙ্গে কারবার কোন দিনই হতে পারে না। নিজের কাজ কেমন গুছিয়ে নিয়ে এখন আর কথাটি পর্য্যন্ত কয় না। এর নাম বন্ধুত্ব!"

আমি কেমন মুহূর্ত্তের জন্য উত্তেজিত হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে বলিয়া উঠিলাম, "শুধু কি ইহাতে নিশ্চিন্ত হয়েছে, অনেকের নিকট গল্প করেছে যে আমি তিন চার হাজার টাকা চুরী করেছি।"

গিন্নি বলিলেন, "খুব ভাল কাজ করেছেন। এতেও কি তোমার বন্ধুদের নাম মুখে আনতে এখন অজ্ঞান হয়ে যাও না। তাঁর ত কোন দোষ নাই। তুমি নিজে চাকরী ছাড়তে গেলে কেন? তিনি ত আর তোমার হাত ধরে টেনে নিয়ে যান নাই?"

আমি বলিলাম, "কালই কি মাহিনা দিতে হবে?"

গিন্নি বলিলেন, "না দিতে পারলে ক্লাসে বসতে দেবে না।"

আমি কোন কথা না বলিয়া কাপড় পরিয়া বাহির হইয়া গেলাম। রাস্তায় আসিয়া ভাবিলাম, এখন কোথায় যাইব? অনির্দ্দিষ্ট পথেই চলিলাম। কেবল মনে হইতেছে বন্ধু শব্দটী কেহ যেন ভুলিয়াও মুখে না আনে।

ঘুরিতে ঘুরিতে হরেন্দ্রের আপিসের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিলাম। হরেন্দ্রের সহিত দেখা করিবার তেমন বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। আর অনর্থক হরেন্দ্রের সময় নষ্ট করিয়া লাভ কি? আজ প্রায় একমাস হইতে চলিল হরেন্দ্রের আপিসে আসি নাই। সুতরাং একবার যাইবার ইচ্ছা হইল দেখা করিয়া যাই; এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় সেই উড সাহেব ও বাঙ্গালী বাবুটীর সহিত হাসিতে হাসিতে হরেন্দ্র গাড়ী হইতে অবতরণ করিল। আমাকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "কেমন আছ? একদিন এসো, অনেক কথা আছে।" আমার কথার উত্তরের প্রত্যাশা পর্য্যন্ত না রাখিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। আমি নির্ব্বাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, হরেন্দ্র দেশের কাজের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যস্ত আছে, না অকারণ আমার মত বেকার লোকের সহিত বৃথা বাক্যব্যয় করিয়া লাভ কি, মনে করিয়া এইরূপ একটা কথা বলিয়া চলিয়া গেল? সেদিন মনের অবস্থা ভাল ছিল না, সেজন্য হরেন্দ্রের ব্যবহারটা আমার অন্তরে যেন একটু অবজ্ঞার আঘাত করেছিল। এমন একটা বেদনা কিছুতে ভুলিতে পারিতেছিলাম না। মনে হইতেছিল মনুষ্যত্ব, ভালবাসা, বন্ধুত্ব সব যেন অবস্থার সম্মান করে চলেছে, সুতরাং আমার দুঃখ করিবার কোন কারণ নাই। যত বেশী করিয়া এই সব কথা মনের ভিতর উঠিতে লাগিল ততই যেন অপমান নিবিড় হইয়া সমস্ত হৃদয় সমাচ্ছন্ন করিয়া আনিতেছিল। কেবলই মনে পড়িতে লাগিল, কেন আজ এই পথে আসিলাম? আসিলাম যদি তবে এখানে দাঁড়াইবার কি প্রয়োজন ছিল? যদি দাঁড়াইলাম, তবে হরেন্দ্রের সহিত দেখা হইল কেন? হরেন্দ্র যদি আমাকে দেখিয়া কোন কথা না বলিয়া চলিয়া যাইত তাহা হইলে হয়ত আমার এতখানি বেদনা পাইবার কারণ থাকিত না। অত্যন্ত পিপাসা পাইয়াছিল, সম্মুখে একটী খাবারের দোকানে কিছু জল খাইতে গেলাম। জলযোগ করিয়া যেমন বাহিরে আসিব এই সময় ফুটপাথের উপর একটী যুবক ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম করিল। বলিল "আপনি যে কোথায় আছেন তার কোন সংবাদ পাই নাই। আপনার আপিসে পত্র দিয়াছিলাম, কোন উত্তর পাইলাম না। একদিন কাশীতে অক্ষয় বাবুর সঙ্গে দেখা,

তিনি বল্‌লেন, আপনি চাকরী ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা করছেন। কিন্তু, ঠিকানা বলতে পারলেন না। আপনি কেমন আছেন? এখন কোথায় আছেন?"

আমি যুবকটীকে চিনিতেই পারিলাম না। তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে অবলোকন করিয়া যুবক বলিল, "আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না বোধ হয়? আমি ললিত। হাতে ধরে আমাকে কাজ শিখিয়েছিলেন। আপনার অনুগ্রহ আমি এ জীবনে কোন দিন ভুলতে পারব না।"

এবার আমার মনে পড়িল। আমি আগ্রহ ভরে তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম, "কি আশ্চর্য্য! ললিত, তোমার এমন পরিবর্ত্তন হয়েছে! দেখে খুব আনন্দিত হলাম। তোমাকে যখন তোমার বাবা সঙ্গে করে আনেন, সে আজ দশ বৎসরের কথা; সবে তুমি পাশ করে কলেজ থেকে বেরিয়েছ, ছেলে মানুষ, গোঁফ দাড়ী কিছুই উঠে নি। অত্যন্ত ছিপ্ ছিপে একহারা চেহারা। যাহা হোক, তোমাকে দেখে সত্যই বড় সুখী হলাম। তোমার বাবা ভাল আছেন?"

এ প্রশ্নে ললিতের নয়নপল্লব অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিল। সে মাটির দিকে চাহিয়া উত্তর করিল "তিনি আজ এক বৎসর ৺কাশীলাভ করেছেন।"

আমি সে বিষয় আর বেশী কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিলাম, "এখন কি করছ?"

"আমি এখন এলাহাবাদে আছি, একটী ভুষী মালের কারবার করচি। আপনার আশীর্ব্বাদে বেশ দুই পয়সা ভগবান দিচ্ছেন। আজ দুই দিন হ'লো কলকাতা এসেছি। একটা নূতন আমেরিকান আপিস খুলেচে, তারই বড় সাহেব ডেকে পাঠিয়েছেন। আমার সঙ্গে তাদের কাজ আরম্ভ হয়েছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম "তুমি এ কাজ শিখলে কেমন করে?"

ললিত উত্তর করিল, "একজন মাড়োয়ারীর বাড়ী দিন কতক তাঁর ছেলেকে পড়িয়েছিলাম, তিনি অনুগ্রহ করে আমাকে এই কাজ শেখান। তিনি যথেষ্ট সাহায্য করেন। কাল সকালে আপনার বাড়ী যাব।" বলিয়া পকেট হইতে একখানি রুমাল বাহির করিল এবং রুমাল খুলিয়া ২০০৲ শত টাকা বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিল, "এ টাকা অনেকদিন পূর্ব্বে আমার পরিশোধ করা উচিত ছিল। কিন্তু প্রবাস হ'তে আপনার ঠিকানা সংগ্রহ করতে না পারায় দিতে পারি নাই, সেজন্য আমাকে ক্ষমা করবেন।"

আমি বলিলাম "তোমার কথা অনেকবার মনে হয়েছে কিন্তু কেবলই মনে হ'য়েছে, তুমি এদেশে নাই, নতুবা আমাকে পত্র দিতে। এ টাকার কথা আমার স্মরণই ছিল না।" ললিত বাসার ঠিকানা লইয়া চলিয়া গেল। আমি অকস্মাৎ এই দুই শত টাকা পাইয়া ভগবানের অপার করুণার কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে তাঁহাকে বার বার প্রণাম করিলাম।

৭

তারপর দুই বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এখন আমি এলাহাবাদে থাকি। মাঝে মাঝে কিরণের নিকট হইতে দুই একখানি করিয়া পত্র পাই। ললিতের কারবারের ভিতর আমাকে সে অংশ দিয়াছে। সেদিন বৈকালে বেড়াইয়া বাসায় ফিরিতেছি। মাঘ মাসের শেষ। বেশ শীত আছে। বাসার নিকট পৌছিতেই ভৃত্য একখানি টেলিগ্রাম হাতে দিল। খুলিয়া দেখি লেখা আছে "একবার সত্বর কলিকাতায় তোমার আসা অত্যন্ত প্রয়োজন। —হরেন্দ্র।"

এই টেলিগ্রামটী খুব নূতন বলিয়া মনে হইল। মধ্যে সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে দেখিয়াছিলাম, হরেন্দ্র Managing এজেণ্ট হইয়া রংএর একটী লিমিটেড কোম্পানী দশ লক্ষ টাকা মূলধনে খুলিয়াছে। সেই উড সাহেব ম্যানেজার হইয়াছেন। আনন্দ প্রকাশ করিয়া হরেন্দ্রকে একখানি পত্র লিখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু মনে করিয়াছিলাম, হরেন্দ্রের যখন এ কারবার চলিয়াছিল, আমার জন্যই, সুতরাং তাহার নিকট হইতে শীঘ্রই পত্র পাইব। কিন্তু ৪।৫ মাস অতীত হইয়া গেল কোন পত্রাদি আসিল না। কেবল কিরণ একদিন একখানি পত্রের

ভিতর লিখিয়াছিল—"তোমার বন্ধু হরেন্দ্রবাবু একটী লিমিটেড কোম্পানী খুলিয়াছেন। আমার নিকট কয়েক দিন সেয়ার বিক্রয় করিবার জন্য আনাগোনা করিয়াছিলেন। কিন্তু একদিনও তোমার নাম তাঁহার মুখে না শুনিয়া আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। আমি কোন সেয়ার আজ পর্য্যন্ত লই নাই। তোমাকে তিনি এ বিষয় অবশ্য লিখিয়া থাকিবেন।" আমি সে পত্রের উত্তর দিতে মনে মনে কিরণের নিকট যে কি পর্য্যন্ত লজ্জিত হইয়াছিলাম, তাহা অন্তর্যামীই জানেন। লিখিয়াছিলাম—"হরেন্দ্র আমার ঠিকানা হয় ত জানেন না।" আজ দুই বৎসর পরে একেবারে হরেন্দ্রের টেলিগ্রামখানি আমাকে যথেষ্ট বিস্ময়ান্বিত করিয়া দিল।

মনে করিলাম, এতদিন সমস্ত জোগাড় যন্ত্র করিতেই কাটিয়া গিয়াছে, সেজন্য হরেন্দ্র আমাকে কোন কথা জানায় নাই। একবারে সব ঠিক করিয়া টেলিগ্রাম করিয়াছে। কিন্তু, সেদিন সেই আপিসের দরজার নিকট হরেন্দ্রের সহিত শেষ দেখাটা আজ তো আমি ভুলতে পারি নাই। যারা খুব কাজের লোক হয়, তারা বোধ হয় এ সব কথা এত করে ভাববার অবকাশ পায় না। এই ব্যবহারের ভিতর যে একটা প্রকাণ্ড অবজ্ঞা ছিল, এ ভাবটাই হয় ত হরেন্দ্র মনেই আনতে পারে নাই! এজন্য তার প্রতি অন্যায় অভিযোগ করা আমার খুবই দোষ হ'য়েছে। আমি তাহাকে কোন পত্র দিই নাই কেন? তার, আমার ঠিকানা না জানাই খুব সম্ভব। আমার ত কর্ত্তব্য ছিল, তাহাকে পত্র লেখা। কিন্তু সে ত আজ টেলিগ্রাম করিতে ইতস্ততঃ করে নাই। আমার যদিও এখন কলিকাতা যাইলে ব্যবসার অত্যন্ত ক্ষতি হইবে এবং ললিত আজ দুই মাস রোগে ভুগিয়া পথ্য করিয়াছে। তাহার উপর এখন কাজের ভার দিলে তার পুনরায় অসুখ হইবার সম্ভাবনা। কি করা যায়? দুই তিন দিনের জন্য একবার কলিকাতা গিয়া হরেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া আসিলে, মনের ভিতর বড়ই অশান্তি অনুভব করিতে হইবে, এবং হরেন্দ্রকে বড় অপমান করা হইবে। একবার হরেন্দ্রের সহিত দেখা হইলে, যেন মনের সকল অন্ধকার কাটিয়া যায়।

এই সময় ললিত নিয়মিত সান্ধ্য ভ্রমণ করিতে করিতে আমাদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। অসময়ে তাহাকে আসিতে দেখিয়া অল্প চিন্তিত হইলাম। তাড়াতাড়ি রাস্তায় আসিয়া বলিলাম, "হটাৎ আজ এতদূর কেন এলে?"

ললিত হাসিতে হাসিতে বলিল, "মাপ্ করা জল, মাপ করা আহার, মাপ করা বেড়ানো আর ভাল লাগে না; তাই আজ গণ্ডীর বাহিরে এসে পড়েছি।"

আমি বলিলাম "কাজটা ভাল হয় নাই, এখনও শরীরে বল পাও নাই, এতদূর আসা খুবই অন্যায় কাজ হয়েছে।"

ললিত যেন একটুখানি অপ্রতিভ হইয়া উত্তর করিল, "আমার কোন কষ্ট হয় নাই, বরং এতদূর আসতে পেরেচি বলে মনের মধ্যে খুব একটা নূতন উৎসাহ অনুভব করচি। একটু একটু করে আবার সব ত অভ্যাস করতেই হবে।"

আমি বলিলাম, "অভ্যাস করতে হবে বলে তাড়াতাড়ি যে করতে হবে এমন কোন কথা নাই।" তারপর বলিলাম, "আমাকে একবার দুই তিন দিনের জন্য কলিকাতা যেতে হবে। এইমাত্র আমার একটী বন্ধুর নিকট হ'তে টেলিগ্রাম পেলাম।" বলিয়া টেলিগ্রামখানি ললিতের হাতে দিলাম। ললিত টেলিগ্রামখানি পড়িল এবং ধীরে ধীরে পুনরায় ভাঁজ করিয়া খামের ভিতর রাখিয়া দিল। বলিল, "টেলিগ্রামে কোন কথা খুলিয়া না বল্লেও যে বিশেষ প্রয়োজন তা বোঝাচ্ছে, যাওয়া আমার মনে হয় দরকার; যখন আপনার একজন বন্ধু। ইতিপূর্ব্বে এঁর নিকট হইতে যে সব পত্র পেয়েছেন, সেগুলির ভিতর কি কোন কিছুর আভাষ ছিল মনে হয়?"

আমি বলিলাম, "আজ দুই বৎসর হরেন্দ্রের নিকট হইতে কোন পত্রাদি আসে নাই, আমিও তাকে কোন পত্র দিই নাই—আজ একেবারে টেলিগ্রাম।"

ললিত কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "চিঠি না লিখে টেলিগ্রাম যখন করেছেন তখন নিশ্চয় কোন বিশেষ প্রয়োজন—একেত্রে যাওয়াই কর্ত্তব্য। এঁর সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয়? আপনি যে এখানে আছেন জানলেন কেমন করে?"

আমি বলিলাম, "অনেক দিনের আলাপ, এক সঙ্গে

আপিসে কর্ম্ম করেছি। তুমি যখন আমাদের আপিসে যাও তখন কি হরেন্দ্রের চাকরী গিয়েছে ?"

ললিত বলিল, "ওহো, মনে পড়েছে। আমি যাবার কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁর চাকরী যায়। কি একটা চুরী ব্যাপার নিয়া, তিনি ত—"

আমি বলিলাম, "ঠিক মনে করেছ। সাহেব তাঁর নামে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে চাকরীতে জবাব দিয়েছিল। সে এখন আর চাকরী করে না। নিজে আপিস খুলেছে, বেশ রোজগার করছে।"

ললিত ক্ষণকাল কি চিন্তা করিল, তারপর কহিল, "আপনার সঙ্গে তাঁর কতদিন দেখা সাক্ষাত নাই ?"

আমি বলিলাম, "এখানে আসার পূর্ব্বে দেখা হ'য়েছিল।"

ললিত জিজ্ঞাসা করিল, "আপিস ছাড়ার পর হয় ত অনেকদিন আর দেখা হয় নাই ?"

আমি বলিলাম, "পনর বৎসর পরে দেখা। তারপর এখানে চলে আসি।"

ললিত বলিল, "আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তবে একটা কথা বলতে সাহস পাই।"

আমি বলিলাম, "তোমার শরীর এখনও অত্যন্ত দুর্ব্বল সেজন্য যেতে নিষেধ করচ ? না হয় একটা টেলিগ্রাম করে জানি দুই দিন পরে গেলে চলতে পারে কি ? এর জন্য তুমি চিন্তিত হয়ো না।"

ললিত বলিল, "না, না, আপনাকে যেতে বারণ করচি না। তবে এই লোকটীর সম্বন্ধে কিছু বলবার ছিল। হয় ত সে কথা আপনি নাও জানতে পারেন।"

অত্যন্ত উদ্গ্রীব ও বিস্ময়ান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার সঙ্গে হরেন্দ্রের কোন দিন পরিচয় হ'য়েছিল নাকি ?"

ললিত বলিল, "তিনি যে প্রায় দুই বৎসর এখানে সবজিবাগে ছিলেন। সাহেবের মত পোষাক পরতেন। হিন্দু পরিবারের সঙ্গে বড় একটা মিশতেন না। পৈরাগে মাথা মুড়িয়ে স্নান করার বিরুদ্ধে অত্যন্ত "কুসংস্কার" বলিয়া লেকচার দিয়েছিলেন। সেইদিন থেকে লোকটার উপর দৃষ্টি পড়ে। পূর্ব্বে মনে করেছিলাম বুঝি ব্রাহ্ম হইয়া থাকিবেন। তারপর জানা গেল লোকটী কোন ধর্ম্মই মানেন না। যখন যেখানে কাজ পড়ে তখন সেইরূপ ভাব প্রকাশ করেন। লোকটী এখন দেখ্‌চি বহুরূপী।"

আমি কহিলাম, "তুমি তাহ'লে আর কাউকে মনে করচ। হরেন্দ্র একজন গোঁড়া হিন্দু, সে দুই ঘণ্টা ধয়ে সন্ধ্যা-আহ্নিক করে থাকে। তুমি যার কথা বলচ তিনি হয় ত অপর কেহ হবেন। তুমি কেমন করে তাকে চিন্‌লে ? তাকে তুমি কখন দেখ নাই।"

ললিত বলিল, "না ভুল করি নাই। এঁর নাম হরেন্দ্রবাবু ছিল। আপনাদের আপিসের কালীবাবু সপরিবারে সেই সময় এখানে বেড়াতে আসেন। তিনি আমাদের বাড়ী প্রায় আসতেন। তিনি একদিন আমাকে সঙ্গে করে হরেন্দ্রবাবুর বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলেন। কালীবাবুই আমাকে হরেন্দ্রবাবু সম্বন্ধে বলেন যে, আমাদের আপিসে কর্ম্ম করতো, গোঁড়া হিঁদু ছিল। এক দোষে চাকরী যায়। লোকটা দেখ্‌চি বহুরূপী সাজতে পারে।"

আমার মনে হইল, "একি স্বপ্ন! হরেন্দ্র কখন কি ব্রাহ্ম হইতে পারে ? না সে হিন্দুর ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে পারে ?"

আমাকে চিন্তান্বিত দেখিয়া ললিত বলিল, "খুব আশ্চর্য্য হচ্ছেন, কেমন ? এখানেই এ ব্যাপারের শেষ নয়। আপনার সম্মুখে বলতে লজ্জা করে—লোকটীর জঘন্য আচরণ স্মরণ করলে অত্যন্ত ঘৃণা হয়।"

আমার মনে হইল, কি কুক্ষণেই হরেন্দ্র আমাকে টেলিগ্রাম করিয়াছিল। ছি! ছি! কিরণ শুনিলে কি মনে করিবে ? ললিতই বা কি ভাবিতেছে!

ললিত বলিল, "লোকটীর এখানেই জেল হ'তো তবে বাঙ্গালীর কলঙ্ক প্রবাসে যত না প্রকাশ পায় ততই মঙ্গল—এজন্য সবাই পড়ে তাকে এখান হ'তে সরাইয়া দেওয়া হয়।"

ব্যাপারটী কি জানিবার মোটেই কোন প্রবৃত্তি হইল না। মনে করিলাম, একবার বলি যে ললিত তোমার দুর্ব্বল শরীর, সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, বাড়ী যাও। কিন্তু আমার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। লজ্জায়

ললিতের নিকট মাথা কাটা যাইতেছিল। হাতের মধ্যে টেলিগ্রামখানি ছিল। মনে হইল অগ্নি দিয়ে লেখা, হাত পুড়িয়া যাইতেছে।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া ললিত অত্যন্ত ধীরে ধীরে অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "আমার মনে হয় লোকটা খুব একটা গুরুতর ব্যাপারে আবার জড়িয়েছে। সেখানে সকলেই হয় ত তার চরিত্র জানে, সুতরাং সেদিকে কোনরূপ সাহায্যের আশা নাই স্থির জেনে দুই বৎসর পরে আপনার ঠিকানা অনুসন্ধান করে, টেলিগ্রাম করেছে। আমার বেশ মনে আছে, এখানে যখন সে ধরা পড়ে, তখন বাড়ীতে বা আত্মীয় স্বজনের নিকট কিছুতেই টেলিগ্রাম করতে রাজি হলো না। হাতে একটীও পয়সা ছিল না। এখানে বাঙ্গালীদের ভিতর চাঁদা তুলে তাকে পাঠান হয়। জানি না তার আত্মীয় স্বজন আছে কি না।"

আমি কোন উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলাম, "অসুখ বিসুখ ত করতে পারে।"

ললিত বলিল, "তা হ'লে এতদূর থেকে আপনাকে ডাকবার পূর্ব্বে তার নিকট-আত্মীয় স্বজনকে জানানই সম্ভব। হয় ত সেই মেয়েটাকে এখনও ছাড়তে পারে নাই। তাকে নিয়েই পুলিস ধরেছে।"

আমি অত্যন্ত অধৈর্য্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন্ মেয়েটার কথা, কি বলচ ?"

ললিত বলিল, "আপনি কি জানেন না, একটা ধোপার মেয়েকে বের করে নিয়ে হরেন্দ্র এখানে এসে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েছিল। তারপর পুলিস অনুসন্ধান করে তাকে ধরে ফেলে।"

আমি দুই হস্তে চক্ষু চাপিয়া ধরিলাম। আমার কর্ণের নিকট কেবলই ধ্বনিত হইতেছিল—যে দুই ঘণ্টা সন্ধ্যা-আহ্নিক করে, সে কি কখন এ কাজ করতে পারে? দেশের সেবার জন্ম, পরের উপকারের জন্ম যার প্রাণ কাঁদে, সে কি কখন এমন পশুর মত কাজ করতে পারে? হরেন্দ্র! হরেন্দ্র! ছিঃ একি কথা শুনি। আমার মনে হইতেছিল আমি যেন শূন্যের উপর দিয়া কোন অজানা দেশে চলিয়াছি।

ললিত আমাকে অত্যন্ত চিন্তান্বিত দেখিয়া "কাল সকালে দেখা করব এখন।" বলিয়া সে চলিয়া গেল। আমি প্রস্তরমূর্ত্তির মত নিশ্চল ও নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, কোন উত্তর দিতে পারিলাম না।

পরদিন সকালে কিরণবাবুর নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, "হরেন্দ্রবাবু লিমিটেড কোম্পানীর টাকা আত্মসাৎ করার অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছেন। বোধ হয় জেল হইবে।" ইহার অধিক কিরণ হরেন্দ্র সম্বন্ধে আর কিছু লেখে নাই। আমার হঠাৎ যেন একটা মোহ কাটিয়া গেল। হরেন্দ্রের বিষয় যেন আর অধিক করিয়া ভাবিবার কিছু নাই। তথাপি আমি কলিকাতা না গিয়া পারিলাম না। অনেক চেষ্টা করিয়াও হরেন্দ্রের জেল রোধ করাইতে পারিলাম না। শেষে সে বলিয়া গেল, "শশাঙ্ক! তোমার জন্যই আমার জেল যাইতে হইল।" আমি নির্ব্বাক হইয়া তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টে বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে তাকাইয়া রহিলাম। ললিতের কথা যেন তখনো কাণের কাছে ধ্বনিত হইতেছিল—লোকটা "বহুরূপী।"

সমাপ্ত।

নিষ্কৃতি।

[শ্রীসুশীলকুমার রায়]

"তুলসী?"

"কি বাবা!"

"শিগ্‌গীর একঘটি জল নিয়ে আয় ত মা, বড় তেষ্টা পেয়েছে।"

তুলসী তাড়াতাড়ি একঘটি জল আর চারখানা বাতাসা নিয়ে এসে সামনে রেখে দিয়ে বল্লে—'তুমি যে একেবারে ঘামে নেয়ে গেছ বাবা। একটু দাঁড়াও আমি পাখাটা খপ্ ক'রে নিয়ে আসি।' একটু হেসে চরণদাস ছিন্ন মলিন

নামাবলী দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে বল্লে—'তোর আর পাখা আনতে হবে না মা, এইখানে ব'স্।'

তুলসী বাপের একতারাটা নিয়ে দেয়ালের গায় একটা পেরেকে টাঙিয়ে দিয়ে ঝুলিটা নিয়ে খুলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল।

চরণদাস ঢক্ ঢক্ ক'রে একঘটি জল খেয়ে বাতাসা চায় খানা সরিয়ে রেখে বল্লে—'মা ঝুলিটা খোল, নারায়ণ আজ যা মাপিয়েছেন তাইতেই আমাদের সন্তুষ্ট হ'তে হবে।'

তুলসী ঝুলির ভেতর থেকে দুমুঠো চাল আর একটা আলু বার ক'রে বল্লে—'আজ বুঝি ঘোষেদের বাড়ী যাওনি ?'

চরণদাস দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে বল্লে—'আজ যত জায়গায় গেছি এমন কিন্তু কোন দিন যাইনি। নাম গান আগেকার মত তেমন কেউ আর শুনতে চায় না। মনে আছে আগে তোকে নিয়ে যখন নাম গাইতে বেরুতুম তখন লোকে এত দিত যে ব'য়ে আনতে পারতুম না! এখন সে সব লোকও নেই, সে দিনও নেই। সকলের বাড়ীই কান্না, সকলের বাড়ীই হাহাকার, নাম আর মুখ দিয়ে বেরোয় না মা, একতারা শুদ্ধ হাতখানা কাঁপতে থাকে।'

তুলসী চাল আর আলু আঁচলে নিয়ে উঠে প'ড়ে বল্লে—'তুমি বাবা কাল থেকে আর বেশী দূর যেয়ো না কিন্তু, নারায়ণ যা দেন তাইতেই আমরা সন্তুষ্ট। তুমি তেল মেখে নেয়ে এস, আমি রান্নাঘরে চল্লুম।'

তুলসী চ'লে গেল। চরণদাস সেই ভাবেই দেয়ালে ঠেস দিয়ে চুপ ক'রে বসে রইল।

২

সে আজ প্রায় আট বছরের কথা। তুলসী তখন পাঁচ বছরের। চরণদাস পাড়ায় পাড়ায় নাম গেয়ে বেড়াত, ঘরে মালতী পৈতে কাটত, উঠোনে নানারকমের শাক বুনে গাছ দিয়ে সংসারের সাহায্য ক'রত। চরণদাসের ভাগ্যে কিন্তু এতটা সুখ বেশী দিন সইল না।

আশ্বিন মাসে যখন বাড়ী বাড়ী একটা আনন্দের সাড়া প'ড়ে গেল, বুড়োরা চরণদাসের মুখে আগমনী শোনবার জন্যে ঘুম ভেঙে গেলেও বিছানাতেই চোক বুঁজে প'ড়ে থাকতে সুরু ক'রলে, তখন হঠাৎ একদিন মালতী তিন দিনের জ্বরে মারা গেল। বৃদ্ধ বয়সে চরণদাসের শোকটা খুব লাগলেও শুধু তুলসীর মুখ চেয়ে সে চোখের জল চোখেই চেপে রাখলে। তার খড়ে-ছাওয়া ঘরখানি ঘিরে যে একটা লক্ষ্মীশ্রী বিরাজ ক'রত সেটা মালতীর সঙ্গে সঙ্গেই খুইয়ে ফেলেছিল, কিন্তু একটা জিনিষ সে বড় জোরে আঁকড়ে ধরেছিল—সে তুলসীকে। সকালে নাম গাইতে যাবার সময় তাকে সে সঙ্গে নিয়ে বেরুত, আবার ফিরে এসে নিজে স্নান ক'রে রেঁধে মেয়েকে খাইয়ে দিয়ে তবে তৃপ্তি পেত। এইভাবে আজ দীর্ঘ আট বছর কেটে আসছে, কিন্তু আর বুঝি কাটতে চায় না!

এখন তুলসী তের বছরের। সে বাড়ীতেই থাকে। চরণদাস যা পায় তাইতেই সুখে দুঃখে দিন চলে, কিন্তু শুধু পেটে খেলেই ত' চলবে না। চালে খড় নেই, পরণে কাপড় নেই। চরণদাস ঘন ঘন নারায়ণকে স্মরণ করে আর চোখের জল চেপে দিন কাটায়।

পাশের গাঁয়ের গুপী বৈরাগীর অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। চরণদাসের অবস্থা দেখে একদিন সে সহানুভূতি দেখিয়ে নানান কথার পর বল্লে—'দেখ, যদি তুলসীকে আমায় দেও তাহ'লে আমি তোমার একটা উপায় করতে পারি।' চরণদাস প্রথমটা গুপীর মুখের দিকে চেয়ে অবাক হ'য়ে গেছল 'যে তার গুপীদা তামাসা ক'রছে না ত' কিন্তু যখন শুনলে যে তামাসা নয় এটা তার প্রাণের কথা, তখন সে রাগে দুঃখে অভিমানে তার সঙ্গে একটা কথাও না ক'য়ে একেবারে বরাবর বাড়ীতে এসে বিছানায় আশ্রয় নিলে। সেই দিন থেকেই চরণদাসের স্বাস্থ্য ভাঙতে লাগল। এক মাসের মধ্যে হঠাৎ সে যেন একেবারে স্থবির হ'য়ে প'ড়ল।

পাড়ার মেয়েরা তুলসীকে ভালবাসত। যার যা বাড়ীতে হ'ত সেই কিছু কিছু তুলসীকে দিয়ে যেত। দিন কাটতে লাগল বটে, কিন্তু এবার চোখের জলের ভেতর দিয়ে।

চরণদাসের একতারার খোলের ভেতর তেলা পোকা বাসা বাঁধলে, করতালি জোড়া ভাঙা পেটারীর নীচে তার শেষ আশ্রয় নিলে।

৩

সেদিন বৃষ্টির বিরাম ছিল না। চরণদাসের ঘরখানির ভেতর এমন একটু শুকনো জায়গা নেই যে, যেখানটীতে তারা একটু মাথা রাখে। চরণদাস দরজার পাশে কাপড় পেতে চুপ ক'রে বসেছিল। তুলসী টোকা মাথায় দিয়ে পাশের বাড়ী থেকে এক বাটী সাবু নিয়ে বাপের সামনে রেখে বল্লে—'এতে নেবুর রস দিয়ে এনেছি বাবা, তোমার মুখের একটু, তার হবে।' চরণদাস আজ তিন দিন এক গণ্ডূষ জল পর্য্যন্ত খায়নি, কিন্তু আজ তার অভিমানের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। হয় ত সে তিল তিল ক'রে নিজকে শেষ ক'রে দিতে পারে, কিন্তু তুলসী—

তুলসীর মুখের দিকে চেয়ে তার শুকনো চোখের কোল বেয়ে টপ্ টপ্ ক'রে চার পাঁচ ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। দুহাতে বাটীটা ধ'রে এক চুমুকে সবটুকু সাবু খেয়ে ফেলে ডাকলে—'তুলসী!"

"বাবা!"

"আমার কাছে আয় মা।"

তুলসী একেবারে বাপের কোল ঘেঁসে গিয়ে বসল।

চরণদাস মেয়ের মুখের দিকে অনেকক্ষণ ধ'রে চেয়ে বল্লে—'তোর মুখখানা অমন শুকনো কেন মা, দিন-ভোর কিছু খাসনি বুঝি?'

তুলসী একটু মৃদু হেসে বল্লে—'না বাবা, বামুনপিসি আমাকে রোজ ডেকে খাওয়ায়।'

'রোজ খাওয়ায়! মিথ্যে বলছিস্ না ত?'

'না বাবা, তোমার কাছে ত কখন মিথ্যে বলি নি।'

বৃদ্ধ একটা সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে বল্লে—'আজ তোকে একটা কথা বলব বলে মনে করচি।'

'কি কথা বাবা?'

'কাল একবার গুপীকে ডাকিয়ে পাঠাব।'

'কেন বাবা?'

'আর এ কষ্ট দেখতে পারি না। আমার জন্যে ভাবি না, কিন্তু তোর দিকে যে আর চাইতে পারি না মা!'

'আমার কষ্টর জন্যে ভেব না বাবা, আমি বেশ আছি। তুমি সেরে ওঠ, আমরা দুজনে নাম গেয়ে বেড়াব, সমস্ত দুঃখু ঘুচে যাবে।'

বৃদ্ধের দুচোক বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। সেই তুলসী, যাকে বুকে ক'রে নিয়ে সে কত আশার স্বপনই না একদিন দেখেছিল!

আঁচল দিয়ে বাপের চোখ মুছিয়ে দিয়ে তুলসী বল্লে—'তোমার চোখে জল দেখলে আমার বুকের ভেতর কেমন করে বাবা! এইবার একটু ঘুমোও দিকিন।'

'হাঁ শুই' বলে চরণদাস খড়ের বালিশ মাথায় দিয়ে সেইখানেই কাত হ'য়ে শুয়ে পড়ল।

সন্ধ্যের অন্ধকার ক্রমেই গাঢ় হ'য়ে আসছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। অল্পক্ষণ হ'ল বৃষ্টি থেমে গেছে। পাতায় পাতায় জল পড়ার একটা অস্পষ্ট টপ্ টপ্ শব্দ মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল।

তুলসীর আজ দুদিন খাওয়া হয় নি। বামুনপিসি তাকে খেতে বলেছিল, সেও জিদে প'ড়ে একগাল ভাত তুলে মুখে দিয়েছিল, কিন্তু গিলতে পারে নি। বাপের অসুখ হওয়ার পর থেকে তার কেবলই মনে হ'ত কি একটা ভয়ানক অমঙ্গল বুঝি তারই জন্যে অপেক্ষা করছে। সে তাই বাপকে একদণ্ড চোখের আড় ক'রতে পারত না।

অন্ধকারের ভেতর চুপ ক'রে ব'সে তুলসীর আজ ভয় ভয় ক'রতে লাগল। সে একটু স'রে বাপের আরো কাছ ঘেঁষে বসল। হঠাৎ দেখলে দূরে ঝোপের আড়ালে একটা আলো জ্বলে ওঠে নিভে গেল। তুলসী একদৃষ্টে সেইদিকে চেয়ে বসে রইল। সে শুনলে দুজন মানুষ দাওয়ার ওপর উঠল। সেই অন্ধকারের ভেতর মনে হ'ল কে যেন তার দিকে হামাগুড়ি দিয়ে আসছে। তুলসীর বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা জোরে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগল। সে দু'হাতে বুক চেপে চুপ ক'রে বসে রইল। হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে পেছন থেকে দুখানা হাত তার গলার দিকে এগিয়ে আসছে। সে আর নিজকে সামলাতে পারলে না, একটা চীৎকার ক'রে বাপের বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ল!

* * *

সোণার রঙে জগৎ ভরিয়ে দিয়ে পূব আকাশে ধীরে ধীরে সূর্য্য উঠছিল।

তুলসীর যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন সে উঠতে গিয়ে উঠতে পারলে না। সারা দেহটা একটা অসহ্য বেদনায় টন্ টন্ ক'রে উঠল, মাথাটা একটা ভারী বোঝা ব'লে বোধ হ'ল। সভয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখলে কিন্তু কিছুই চিনতে পারলে না। দু'হাত দিয়ে চোখ দুটো মুছে আর একবার ভাল ক'রে চাইলে, তারপর দুটো হাতের ওপর জোরে ভর দিয়ে উঠে বসতে গিয়ে দেখলে তার পরণের কাপড়ের অনেকটা জায়গা রক্তে লাল হ'য়ে গেছে।

তুলসীর মাথার ভেতর ঘুরতে লাগল, চোখের সামনে সব যেন মিশিয়ে কাল হ'য়ে গেল। সে আবার সেই-খানেই শুয়ে পড়ল।

ধীরে ধীরে মনে পড়ল তার গত রাতের কথা। সে যখন ভয়ে বাপের বুকের ওপর চীৎকার ক'রে লুটিয়ে প'ড়েছিল তখন সঙ্গে সঙ্গে তিন চারখানা হাত এসে তার গলাটা চেপে ধরেছিল। তারপর—তারপর আর সে কিছুই মনে ক'রতে পারলে না।

ধীরে ধীরে রোদ ফুটে উঠছে। তুলসী কাণ পেতে শুনতে লাগল যদি কারুর গলার আওয়াজ পাওয়া যায় কিন্তু এক ঘণ্টার ভেতর কোন শব্দই তার কর্ণগোচর হ'ল না।

তৃষ্ণায় তার গলার ভেতর শুকিয়ে আসছিল। লক্ষ্য ক'রে দেখলে ঘরের কোণে একটা কলসী ও গেলাস র'য়েছে, আর তার পাশে ডিস চাপা কি ঢাকা। ঢাকা খুলে দেখা, কিম্বা এক ফোঁটা জল খাবার প্রবৃত্তি তার হ'ল না। সমস্ত দেহটা তার ঘৃণায় শিউরে শিউরে উঠতে লাগল।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, দিনের শেষ আলোকটুকু ধীরে ধীরে ঘরের ভেতর থেকে মুছে গেল তবু তুলসী নড়ল না। তার দু'চোক বেয়ে টপ্ টপ্ ক'রে শুধু জল গড়িয়ে পড়ছিল।

রাত তখন প্রায় ন'টা। দরজা খুলে অন্ধকারে দুজন লোক ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললে। তুলসী সেই আলোয় দেখলে ইতর শ্রেণীর দুজন মুসলমান যুবক। তার মনে হ'ল এদের যেন কোথাও দেখেছে। যখন বাপের খুব অসুখ তখন এরাই যেন বাড়ীর আশে পাশে ঘুরে বেড়াত।

একটী যুবক এগিয়ে এসে বল্লে—'এই যে জান! উঠে বসেছ?' আর একজন দরজাটা দিয়ে আলোটা মুখের কাছে ধ'রে বল্লে—'রাগ ক'রনি বিবিজান!'

তুলসী কোন উত্তর করলে না। প্রথম যুবকটি বগল থেকে একটা কাল বোতল বার ক'রে দ্বিতীয় যুবকটীকে কি ইসারা ক'রলে। সে একটি গেলাস বার ক'রে সামনে রেখে দিলে। তারপর দুজনে বসে বোতলের অর্দ্ধেকটা তরল জিনিষ গলাধঃকরণ ক'রে আর একটি গ্লাস পূর্ণ ক'রে তুলসীর কাছে এগিয়ে এল।

তুলসীর মাথার প্রত্যেক শিরায় শিরায় যেন বিদ্যুৎ ছুটে গেল। সে দেহের শেষ শক্তি দিয়ে তাকে জোরে ঠেলে দিলে। যুবকটি এই ধাক্কায় উল্টে প'ড়ে গেল। ঠিক সেই সময় বৃদ্ধ চরণদাস দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে চেঁচিয়ে উঠল—"তুলসী, তুলসী—"

ঘরের ভেতর নরপশু দুটো তখন তুলসীর প্রাণহীন দেহখানা নিয়ে শুধু টানাটানি করছিল।

কবিতা-তত্ত্ব।

[শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী]

কবিতা বাণীদেবীর মুক্তাহার। কবি-হৃদয়ের মূর্ত্তিমতী প্রতিচ্ছবি। শ্রীভগবানের কল্পনাময়ী ধরণী। সমালোচক বলিয়াছেন—"কবিতা ভাবময়ী চিত্রকলা, চিত্রকলা মৌন কবিতা।" ভাবুকতা, কল্পনা ও তন্ময়তাই কবিতার প্রাণ। ইহা অনুভূতিরই বিষয়। যাহার অনুভূতি নাই তাহার নিকট কবিতা শুষ্ক কুন্দমালা; জীর্ণারণ্য জগৎ, রুক্ষ কঠোর মরুভূমি।

কবিতা ভাবের উৎস, রসের নির্ঝরিণী। এ উৎস বিশ্বের পাষাণ ভেদ করিয়া উঠে, এ নির্ঝরিণী হৃদয়ক্ষেত্র সিক্ত করিয়া থাকে। সহৃদয় ভাবুকই এ উৎসের সন্ধান

জানে, সচেতন রসজ্ঞই এ নির্ঝরিণীর রসধারা পান করিয়া তৃপ্ত হয়।

কবিতাই শ্রীভগবদর্চ্চনার সুগন্ধি পুষ্প সম্ভার। যুগ-যুগান্ত ধরিয়া এ পুষ্প সম্ভার দিয়া কত সর্ব্বদর্শী কবি আরাধ্যদেবের পূজা করিয়াছেন। ঋক্‌মন্ত্র সংক্ষিপ্ত কবিতা। সামগীতি-কবিতায় আর্য্য ঋষিগণের ব্রহ্মোপাসনা কি মনোরম হৃদয়াকর্ষক! কবিতাই স্তব-স্তুতির আকারে সংহিতা, পুরাণ, তন্ত্রে বিরাজিতা। বৈষ্ণবের গীতি-কবিতা আধুনিক কালের সাম-সঙ্গীতের নূতন মূর্ত্তি।

কবিতা জাতির জীবনীশক্তি। যে জাতি যখন কবিতার আদর জানিবে না অসার শব্দের সেবা মনে করিয়া তাচ্ছিল্য করিবে; বুঝিতে হইবে, সে জাতি তখন প্রাণহীন মৃত শব সমষ্টি মাত্র। কবি রূপের পূজা, শব্দের সেবা করেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রধান লক্ষ্য রস স্বরূপ আত্মার সন্ধান। ধরার মধ্যে স্বর্গ, মরুভূর মধ্যে মরুদ্যান, ঘন অরণ্যের মধ্যে তপোবন সৃষ্টি করাই কবিতার কার্য্য। অশান্তির মধ্যে শান্তি, শোকের মধ্যে সান্ত্বনা, স্বার্থের মধ্যে প্রেমের প্রতিষ্ঠা করাই কবিতার উদ্দেশ্য। নতুবা কবিতা জড় অক্ষর সমষ্টি মাত্র। স্থূলের মধ্যে সূক্ষ্মতা, মিথ্যার মধ্যে কল্পনা, স্বার্থ-পরতার মধ্যে জনহিত আনয়ন করিতে কবিতাই একমাত্র সক্ষম।

কবিতার মধ্যে আমরা নন্দন-নিকুঞ্জের অপ্সরা সঙ্গীত শুনিতে পাই, তপোবনের নির্ব্বিলাস মূর্ত্তি দেখিতে পাই, অনির্ব্বচনীয় অমৃত রসের সুখ আস্বাদ পাইয়া ধন্য হই। শ্যাম বাঁশরীর রব, নারদ ত্রিতন্ত্রীর ধ্বনি, দেবাদিদেবের ডমুরু নিনাদ, একাধারে কবিতার মধ্যেই ফুটিয়া উঠে। গৃহে বসিয়া গৌরীশৃঙ্গের যে পরিমাণ ইয়ত্তা করি, মহা-সমুদ্রের যে গভীরতার থৈ মাপি, চন্দ্রলোকের যে সংবাদ লই, সে কবিতারই প্রসাদে। কবিতার শক্তি অসীম এবং অপূর্ব্ব। সে শক্তির স্পর্শে পাষাণে ফুল ফুটে, দগ্ধ হৃদয়ে প্রেম ছুটে, শোক দুঃখের মধ্যে আনন্দের সঙ্গীত ফুটিয়া উঠে।

সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি কবিতার বাহ্য ব্যাপার; এ সৌন্দর্য্য ধরার বাহ্য সৌন্দর্য্যের চেয়েও ভাবময়, রসময়, প্রাণময়। এ সৌন্দর্য্যকে ভাস্কর্য্য বলা চলে, চিত্র বলা চলে, কল্পনাও বলা চলে; আবার এক অপূর্ব্ব নূতন সৃষ্টি বলাও চলে। সৌন্দর্য্যে পূর্ণচন্দ্রের রূপ আছে, যূথিকার নম্রতা আছে, লজ্জাবতী লতার লজ্জা আছে, নববধূর মধুময় প্রেম আছে, আবার এ সৌন্দর্য্যে ঘনারণ্যের ভীষণতা আছে, মরু লোকের দাহিকা আছে, প্রগল্‌ভা যুবতীর তীব্র রূপোন্মাদ আছে। এ সৌন্দর্য্য মধুর আবার উৎকট। উন্নত্যে হিমাদ্রি, গভীরতায় মহাজলধি, কারুণ্যে ক্ষুদ্র বন নদী।

হৃদয়ের ভাব ছন্দোবদ্ধ হইয়াই কবিতা আখ্যা প্রাপ্ত হয়, ইহা সাধারণ কথা। কিন্তু সেই ছন্দোবদ্ধ ভাব সমষ্টির মধ্যে, একটী প্রাণের প্রতিষ্ঠা করা চাই, এমন এক অপূর্ব্ব রস ঢালিয়া দেওয়া চাই, যাহাতে সেই ভাব মূর্ত্তিমান ও সচেতন হইয়া উঠিতে পারে। জড় মূর্ত্তির মধ্যে সাধক যখন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন, তখনই মূর্ত্তি চৈতন্যময়ী, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী রূপে সম্মুখে দাঁড়ান। এই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করাই, রস ঢালিয়া দেওয়াই মহাকবির কবিত্ব। আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন—

"কবিত্বং দুর্লভং লোকে শক্তি স্তত্র সুদুর্লভা।"

আদেশে উপদেশে যাহা না হয়, ভয়ে দণ্ডদানে যাহা হইতে দেখা যায় না, এক কবিতার দ্বারাই সেই অসাধ্য সাধন হয়। দর্পিতা রাজকন্যার মস্তক আপনিই লুটিয়া পড়ে, গর্ব্বান্ধ মহাপণ্ডিত কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেন, উদ্যত খড়্গা নিমেষে স্থির হইয়া উঠে। আরাধ্যা দেবী মনশ্চক্ষুর উপর ফুটিয়া উঠেন, শ্রীভগবান শ্যামসুন্দর বেশে সঙ্গে সঙ্গে আসেন, মরণোন্মুখ দীপশিখাও নব তৈল সেকে আবার বাঁচিয়া উঠে।

ভাব-সাগরের মন্থনে এই কবিতা-সুধার উদ্ভব। স্বয়ং বাণীদেবী এই সুধা ভাণ্ড করে লইয়া বিশ্বের আদি কাল হইতে প্রত্যেকের নিকট লইয়া যাইতেছেন। সকাতরে ডাকিতেছেন—"আয় বাছা, অতৃপ্ত অশান্ত বিশ্বের নরনারী; আয়, এই অমৃত কণা পান করিয়া তৃপ্ত শান্ত হও।" অভাগা নরনারী দর্পান্ধতা, অজ্ঞানতা ও মোহে আচ্ছন্ন—সে সুধার আদর করিল না; সে দেবীকে ফিরাইয়া দিল। করুণাময়ী জননী তখন সে সুধাভাণ্ড হইতে তাহার

...দংশ বিশ্বের তাবৎ পদার্থে ছড়াইয়া দিলেন। সর্ব্বদর্শী কবি মধুকরের মত সেই আকীর্ণ সুধাবিন্দু আহরণ করিয়া যে মধুচক্র রচনা করিলেন, তাহাই বিশ্বের নরনারীর ... হইবে—জননী এই আশীর্ব্বাদ করিয়া বৈকুণ্ঠে চলিয়া ...লেন। ইহাই কবিতার নব পৌরাণিক জন্ম-কথা।

কবিতায় জ্ঞানী ভক্ত বালক বৃদ্ধ কিশোর যুবা সবাই ... হয়। পশুপক্ষী সরীসৃপ কবিতা সঙ্গীতে ছুটিয়া আসে। শুনিয়াছি, কবিতা শ্রবণে জড়েরও ক্রিয়াশক্তি দেখা যায়। মন্ত্র, শ্লোক, স্তোত্র, সঙ্গীত—সকলেই কবিতার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। যিনি কবিতার তত্ত্ব সম্যক উপলব্ধি করেন, তিনি বিশ্বের তাবৎ বস্তুতেই কবিতার বিকাশ লক্ষ্য করেন। শিশুর হাস্যে, যুবতীর কটাক্ষে, যুবার ভ্রূভঙ্গীতে, তরু পল্লবের চলনে, লতার দোলনে, তরঙ্গের গতিতে মৌন কবিতার বিকাশ। কমলিনীর কম্পিত দেহ-যষ্টিতে অভিমানের খেলা, শালিধান্যের পরিপক্ক গুচ্ছে বিরহের পাণ্ডুতা তরঙ্গের উচ্ছ্বসিত নৃত্যে আনন্দের আবেগ—এও এক প্রকার কবিতারই অভিব্যক্তি। তবে এ বিকাশ ও অভিব্যক্তি কবি না হ'লে কেহ বুঝেন না। কিন্তু কবি যদি এই বিকাশ, এই অভিব্যক্তিকে ভাষা দিয়া, ভাব দিয়া, রস দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, তবেই সহৃদয় সাধারণের উপলব্ধি হইয়া থাকে।

কবিতা একজাতীয় মানচিত্র। বিচ্ছিন্ন অসীম ভূমণ্ডলকে অবিচ্ছিন্ন সসীম আকারে পরিণত করা হইয়াছে মাত্র। এ মানচিত্রে তরঙ্গবিহ্বলা নদী, অভ্রভেদী পর্ব্বতশ্রেণী, প্রাসাদমালা শোভিত নগর সমূহ একটি সূক্ষ্ম রেখার টানে অঙ্কিত হইয়াছে। গৃহে বসিয়া এই মানচিত্র দেখিলে ভাবজগতের সমস্ত সন্নিবেশ অনায়াসে বুঝা যায়। অতীত বর্ত্তমানের যাবতীয় ইতিবৃত্তই এই মানচিত্রের সাহায্যে সহজে বোধগম্য হয়। অসীম দূরত্ব নিকটে আসে, পরোক্ষ সম্মুখে ফুটিয়া উঠে, স্মৃতি অনুভূতিরূপে দেখা যায়।

কবিতা কবির হৃদয়ের প্রিয়া। এই প্রিয়ার রূপ দেখিয়া জনসঙ্ঘ অনুরক্ত হইলে কবির প্রীতি জন্মে। প্রিয়ার রূপ সকলকে দেখাইয়া কবির তৃপ্তি। এই প্রিয়াকে কখন অল্প আভরণে, কখন বহুমূল্য নানা বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া নিজে খেলা করেন। সকলকেই সঙ্গে খেলিবার অনুমতি করেন। কবিতা রাণী-হৃদয়ে বাস করেন বলিয়া কবির রক্তমাংসময়ী পার্থিব পত্নী কখন কখন ঈর্ষার ভাবও প্রকাশ করেন। হায় অল্পবুদ্ধি নারী, ধরার তুচ্ছ সামগ্রী তুমি—সেই দেবারাধ্যা ভাবরস কল্পনাময়ী চিন্ময়ী দেবীর ঈর্ষা কর! খদ্যোতিকা সূর্য্যালোকের অনুকরণ করার স্পর্দ্ধা করে!

কিশোরীর প্রথম অর্দ্ধব্যক্ত ভালবাসা, শিশুর প্রথম অর্দ্ধস্ফুট বাণী, পুষ্পের বায়ুচালিত নব সৌরভও কবিতার সঙ্গে তুলিত হয় না। এ অনাদি অনন্ত ভালবাসা, এ অতীত বর্ত্তমান স্থায়ী বাণী। এ অম্লান অফুরন্ত সৌরভ। ইহার উপমা নাই। ইহার তত্ত্ব রহস্যময় অথচ সুব্যক্ত, অস্ফুট অথচ স্ফুট, অমূর্ত্ত অথচ মূর্ত্ত, স্বর্গীয় অথচ পার্থিব। মায়ার মত অনির্ব্বচনীয়া, চিত্রশালার মত নানা বর্ণময়ী, ইন্দ্রজাল বিদ্যার মত অজ্ঞেয় রহস্যা।

এ তত্ত্ব পর্ব্বতের গুহায় নহে, ভাবুক সহৃদয়ের হৃদয়-গুহায় নিহিত। অরসিক হৃদয়হীনের নিকট ইহা চিরগুপ্ত। হৃদয় যাহার নাই, সে এ তত্ত্ব বুঝে না বলিয়া কবিতার মর্য্যাদা হানি হয় না। শ্রীভগবানকে মানবেরা না জানিলে, না আরাধনা করিলে শ্রীভগবানের গৌরব যায় না।

"অরসিকেষু রহস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ।"

যাহার হৃদয় নাই, ভাব নাই, সেও যদি কবিতা-দেবীর আরাধনা করে, তবে সেই করুণাময়ী দেবীর প্রসাদে ক্রমে ক্রমে তাহার হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি হইবে, ভাব ধীরে ধীরে জাগিবে। সাধনা কখন নিষ্ফলা নহে। সিদ্ধি একদিন না একদিন দেখা দিবেই। এ জন্মে না হউক, পর জন্মেও সিদ্ধিলাভ ঘটিবে।

অনুশীলন কর, আরাধনা কর, ফল হইবেই। শুধু ভোগের চক্ষুতে দেখিও না, কামের ভাবে লইও না, সকল সময়ে মনে রাখিতে হইবে তিনি দেবী, তিনি আরাধ্যা। শিশুর মত হাস্যময়ী, যুবতীর মত রহস্যময়ী, যেমন তিনি, তেমনই জননীর মত ভক্তির পাত্রী, দেবীর মত আরাধনার সামগ্রী। *

* বঙ্কিম সাহিত্য-সম্মিলনীতে পঠিত।

অনুপমার বর।

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম-এ, বি-এল]

সদানন্দবাবুর বড় মেয়ে শাশুড়ীর বাক্যবাণে ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত হৃদয়ের অসহ্য যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য আত্মহত্যা করিলে তাহার বাপের বাড়ীর সকলেই গভীর শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। অর্থাভাবে সদানন্দবাবু পৈত্রিক ভিটা বন্দক দিয়া প্রমীলার বিবাহ দিয়াছিলেন। সুদের সুদ আসলে পরিণত হইয়া তাঁহার ঋণভার প্রতি তিনমাস অন্তর বর্দ্ধিত করিতেছিল। সদানন্দ বাবুর সংসারে অর্থ কষ্টের অবধি ছিল না। য়ুরোপে যুদ্ধ ঘোষণার পর জারমান আপিস উঠিয়া গেলে তাঁহার সেই যে চাকরী চলিয়া গেল তাহা আর ফিরিয়া আসিল না। অনুপমার অত হাসি আবদার স্ফূর্ত্তি তাহার দিদির মৃত্যুতে কোথায় যে লুকাইয়া পড়িল তাহার সন্ধান কেহ লইল না। একমাত্র শ্যামা ঝি মনের দুঃখ দাবিয়া রাখিয়া সদানন্দ বাবুর শয্যাগত স্ত্রীর সেবা শুশ্রূষার দিকে দিনরাত লক্ষ্য রাখিয়াছিল। কন্যার অপমৃত্যু মাতার অন্তরে যে দাবদাহের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা ক্রমশঃ শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইয়া শেষে তাঁহার দেহতন্ত্রকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। স্বামী, কন্যা ও দাসীর সেবা লইয়া ভাগ্যবতী ছয় মাসের মধ্যেই অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। যাহারা এতদিন সদানন্দ বাবুর ক্ষুদ্র পরিবারের সংবাদ লয় নাই, তাহারা এক্ষণে লোকনিন্দারূপ সম্মার্জ্জনীর তাড়নায় অকস্মাৎ সমবেদনায় কাতর হইয়া সহায় সম্বলহীন পিতা ও কন্যার দুঃখ দারিদ্র্য লাঘব করিবার জন্য তাঁহাদের বাটীতে দেখা দিল। সদানন্দবাবুর আত্মীয়দের মধ্যে তাঁহার অগ্রজের পুত্র গোবিন্দ বাবু অনুপমাকে নিজের বাটীতে লইয়া গেলেন। সদানন্দ বাবু কখনো হোটেলে, কখনো বা ভাইপোর বাটীতে আহার করিতে লাগিলেন।

অনুপমার ত বিবাহ দিতে হইবে। সদানন্দবাবু অর্থোপার্জ্জনের দিকে অবসন্ন মনকে টানিয়া লইলেও শত চেষ্টাতে কোনও ফলোদয় হইল না। য়ুরোপে তখন যুদ্ধ চলিতেছে এখানকার ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ, সুতরাং দালালি কার্য্যে তাঁহার কোনও রকম সুবিধা হইল না। শেষে তিনি ভাইপোর সহিত পরামর্শ করিয়া বাড়ীখানি বিক্রয় করিলেন। উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধের পর দুই হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইল। এই টাকাটা তিনি ভাইপো গোবিন্দের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া তাহাকে বলিলেন, "আমি মেসপটে একটি চাকরী যোগাড় করেছি। চার পাঁচ বৎসরে আমার হাতে যে টাকা জ'মে যাবে তাতে অনুপমার সুপাত্রে বিবাহ দেওয়া চলবে। ইতিমধ্যে তুমি এই দু'হাজার টাকা যদি কোনও কারবারে লাগিয়ে কিছু লাভ করতে পার তা হ'লে আমি দেশে ফিরবার আগেই তার বিয়ে দিও। যদি টাকা খাটাবার সুবিধা না হয় তাহ'লে তাকে লেখাপড়া, সঙ্গীত বিদ্যা ও চিত্রশিল্প শিক্ষা দিতে যে ব্যয় হবে তা ঐ টাকা থেকে করবে।" সদানন্দবাবু পাঁচ বৎসরের চুক্তিতে চাকরী লইয়া মেসপটে চলিয়া গেলে তাঁহার ভাইপো গোবিন্দবাবু গচ্ছিত দুই হাজার টাকা ঘোড়-দৌড়ের ব্যবসায় লাগাইয়া একদিনেই দশ হাজার টাকা রোজগার করিলেন। গোবিন্দবাবুর নিজের বাড়ী ও স্ত্রীর গহনা বন্দক মুক্ত করিতে পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় হইল। লাভের বাকী পাঁচ হাজার টাকায় নিজের বিবাহ-যোগ্যা কন্যার বিবাহ দিয়া তিনি মনে মনে সদানন্দ খুড়ো ও তাঁহার কন্যা অনুপমাকে ধন্যবাদ দিলেন। বাস্তবিক, সদানন্দ বাবুর দুই হাজার টাকা না পাইলে গোবিন্দবাবুর অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িত। তিনি এক্ষণে সব দিক একরকম সামলাইয়া লইয়া সদানন্দবাবুর আসল টাকাটা কোনও রকমে পুনরায় বৃদ্ধি করিয়া অনুপমার বিবাহের বন্দোবস্ত করিবেন স্থির করিলেন।

মানুষ যাহা মনে করে তাহা অনেক সময়ে ঘটিয়া উঠে

। গোবিন্দবাবু সেই দুই হাজার টাকা আবার ঘোড়-দৌড়ের বাজীতে লাগাইয়া তাহার পাই পয়সা হারিয়া গেলেন। তখন আবার পূর্ব্বেকার পন্থা অবলম্বন করিয়া তিনি প্রথমে স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিলেন। লাভ আর হয় ", অথচ লোকসানও নাই। ঘরের টাকা ঘরে ফিরিয়া াসিতে লাগিল বটে, কিন্তু সেই টাকা হইতে সংসারের খরচ চালাইয়া, জামাইয়ের বাটীতে তত্ত্ব তাগাদ করিয়া ক্রমশঃ সে টাকাটাও ব্যয় হইয়া গেল। কল্পনার মোটরে চড়িয়া গোবিন্দবাবু আশার পথে দ্রুত চলিলেন। আবার তাঁহার বাটী বন্ধক পড়িল। গোবিন্দবাবু কিন্তু অনুপমার শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতে কখনো কুণ্ঠিত হন নাই। অনুপমা লেখাপড়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রশিল্প ও সঙ্গীতের চর্চ্চা করিতেছিল। গোবিন্দবাবু তাহার জন্য মাসিক দশ টাকা মাহিনার একজন সঙ্গীতাচার্য্য ও কুড়ি টাকা মাহিনার একজন চিত্রকর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রতি সপ্তাহে তিন দিন করিয়া গোবিন্দবাবুর বাটীতে আসিয়া অনুপমাকে শিক্ষা দিতেন। একবৎসর পরে সদানন্দবাবু মেসপট হইতে গোবিন্দবাবুকে এক হাজার টাকা পাঠাইলেন। গোবিন্দবাবু টাকাটা হাতে পাইয়া প্রফুল্ল হইলেন। সদানন্দবাবুর এই একহাজার টাকা ঘোড়-দৌড়ের বাজীতে লাগাইয়া গোবিন্দবাবু কতবার যে লাভবান হইয়াছিলেন তাহা আমরা জানি না। তবে, তাঁহার বাটী দ্বিতীয় বারের বন্ধক হইতে মুক্ত ও তাঁহার স্ত্রীর গহনা পোদ্দারের দোকান হইতে পুনরায় ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছিল এ সংবাদ আমরা পাইয়াছি। গোবিন্দবাবুর দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহও লাভের টাকা হইতে সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রবাসী খুড়ো মহাশয়ের কন্যার বিবাহের জন্য গোবিন্দবাবু তৃতীয় বৎসরে ঘোড়-দৌড়ের মরশুম আরম্ভ হইলে টাকা রোজগার করিতে সচেষ্ট হইলেন। গোবিন্দবাবুর হাতে কয়েক শত মাত্র নগদ টাকা ছিল। অনুপমার অদৃষ্ট মন্দ, তাই এবারে গোবিন্দবাবুর এক পয়সাও লাভ হইল না। আবার স্ত্রীর গহনা ও তারপর বাটী বন্ধক পড়িল। বন্ধকের সমুদয় টাকা ঘোড়-দৌড়ের ময়দানে কয়েক মাসের মধ্যে উঠিয়া গেল।

এদিকে অনুপমা যৌবনের পথে অগ্রসর হইয়া পড়িতেছে। তাহার বিবাহ না দিলে নয়। সদানন্দবাবুর দেশে ফিরিতে এখনও প্রায় আড়াই বৎসর বিলম্ব। সদানন্দবাবু শেষ পত্রে ভাইপোকে লিখিয়াছিলেন যে তিনি অতঃপর টাকা পাঠাইবেন না। এখন হইতে অনুপমা, গোবিন্দবাবু ও তাঁহার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাগণের বিষনয়নে পড়িল। গোবিন্দবাবুর আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই তাঁহাকে অনুপমার বিবাহের জন্য উত্যক্ত করিতে লাগিলেন। লোকে কাণাঘুষা করিতেছিল যে গোবিন্দ সদানন্দবাবুর টাকায় নিজের দুইটী মেয়ের বিবাহ দিয়াছে। গোবিন্দবাবু এই সকল কারণে অনুপমার শিক্ষার ব্যয় বন্ধ করিলেন। তারপর তাহাকে নিমন্ত্রণ বাটীতে লইয়া যাওয়া বন্ধ হইল। তাহার পর অনুপমা যে কি খায়, কি পরে তৎপ্রতি গোবিন্দবাবুর বাটীর সকলে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলেন। শ্যামা ঝি অন্য বাড়ীতে কাজ করিত, কিন্তু মাঝে মাঝে অনুপমাকে দেখিতে আসিত। গোবিন্দবাবুর বাটীতে তাহাকে এই সময় হইতে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। এদিকে কোন ভদ্রলোক গোবিন্দবাবুর বাড়ীতে তাঁহার বিবাহযোগ্যা শ্যালক কন্যাকে দেখিতে আসিলে তিনি অনুপমাকে দেখিয়া তাহার সহিত নিজের পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করিতেন। প্রস্তাব করিলে কি হয়, গোবিন্দবাবু বলিতেন, "ওর বাপ নিরুদ্দেশ হয়েছে, বিবাহে পয়সা খরচ করবে কে ? আমি খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছি, লেখাপড়া শিখিয়েছি, কেহ যদি অমি বিয়ে করতে চায় করুক।" অনুপমার বিবাহে গোবিন্দবাবু টাকা খরচ করিতে নারাজ শুনিয়া সকলেই পিছাইয়া যায়। বাঙ্গালী সমাজে ছেলেরা ত রূপ গুণ দেখে বিয়ে করে না, টাকা ও মুরুব্বি দেখে বিয়ে করে। গোবিন্দবাবুর কথাবার্ত্তা শুনিয়া নিন্দাপ্রিয় লোকে রটনা করিল যে, তিনি অনুপমাকে খৃষ্টান পাদরীর বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবেন স্থির করেছেন। একদিন পাড়ার লোকেদের সঙ্গে অনুপমার বিবাহের কথা লইয়া গোবিন্দবাবুর ঝগড়া ও শেষে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল। পাড়ার লোকে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "তুমি তোমার খুড়তত বোনের

বিয়ে দিতে না পার, আমরা চাঁদা ক'রে ভাল বর দেখে তার বিয়ে দেব।" ইহার পর গোবিন্দবাবু কয়েক মাসের জন্ম সপরিবারে মধুপুরে হাওয়া বদলাইতে গেলেন। কলিকাতার বাটীতে তাঁহার বৃদ্ধা মাসিমা ও অনুপমা রহিল।

২

প্রায় চার বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন প্রাতে একখানি ট্যাক্সি গোবিন্দবাবুর বাটীর সম্মুখে আসিয়া থামিল। গাড়ীতে খাকি পোষাক পরা একজন বাঙ্গালী ও কয়েকটা চামড়ার ব্যাগ। আগন্তুকের খাকী সার্টের বুকে মেডেল ঝুলিতেছে। তিনি গোবিন্দবাবুর বাটীতে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, "অনু!" ছেলেরা তাঁহার গলার আওয়াজ শুনিয়া বহির্বাটীতে আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল। তাহারা আগন্তুককে দেখিয়া মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। তাঁহাকে কেহ চিনিতে পারিল না। আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোবিন্দ কোথায়?" কোনও উত্তর নাই। "তোরা আমায় চিন্তে পারছিস না? আমি যে তোদের ছোট-দাদা মশাই!" ছেলেরা কোনও উত্তর না দিয়া বাটীর ভিতর দৌড়িয়া প্রবেশ করিল। অবিলম্বে একটি সধবা মেয়ে মাঝের দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। সে আগন্তুকের দিকে ঘৃণার দৃষ্টি হানিয়া বলিল, "সে এখান থেকে তিন বৎসর হ'ল পালিয়ে গেছে।" "কোথায় গেছে?" "আমরা কি তার খোঁজ রাখি? সে আমাদের মুখে চুণ কালী দিয়েছে। ছবি-আঁকার মাষ্টারের সঙ্গে গেছে।" আগন্তুকের মাথায় যেন অকস্মাৎ বজ্রপাত হইল। তিনি রোষে ক্ষোভে অপমানে এমন অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে সেখানে আর ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে পারিলেন না। বাটীর বাহিরে আসিয়া তিনি ট্যাক্সিতে বসিয়া হুকুম দিলেন, "চালাও।" ট্যাক্সি চলিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই গোবিন্দবাবুর বাটীর সদর দরজা সশব্দে ভিতর হইতে বন্ধ হইল। ট্যাক্সিখানি একটা মোড় ঘুরিয়া যাইবার পর সদানন্দবাবু দেখিলেন যে গলির ধারে একটা বাড়ীর রোয়াকে কয়েকজন লোক বসিয়া গল্প করিতেছে। সদানন্দ-বাবুর নজর যেমন তাহাদের দিকে ফিরিল সেই সঙ্গে তাঁহার মনে হইল, এদেরকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ট্যাক্সি থামাইয়া তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা বলতে পারেন, গোবিন্দবাবুর বাড়ীতে যিনি ছবি-আঁকার মাষ্টার ছিলেন তিনি কোথায় থাকেন?" একজন বলিল, "তার সঙ্গে তিন বৎসর আগে গোবিন্দবাবুর খুড়তুত বোনের বিয়ে হয়েছিল। তখন ছেলেটি বেঙ্গল আর্ট কলেজে ড্রয়িং মাষ্টারি করত। কোথায় থাকে জানি না।" সদানন্দবাবুর বুকের উপর থেকে যেন প্রকাণ্ড একখানা পাথর একটু সরিয়া গেল। পাছে আবার কোনও হৃদয়-বিদারক সংবাদ শুনিতে হয় সেই ভয়ে তিনি আবার ট্যাক্সি চালাইতে হুকুম দিলেন।

গাড়ী বড় রাস্তায় পৌঁছিলে সদানন্দবাবুর চমক ভাঙ্গিল। বেঙ্গল আর্ট কলেজ কোথায়? ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "জানি না।" গাড়ী কিছু দূর চলিলে সদানন্দবাবু রাস্তার ডানদিকে একটি পোষ্ট আপিস দেখিয়া সেইখানে গাড়ী হইতে নামিলেন। পোষ্ট মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিলেন যে বেঙ্গল আর্ট কলেজ লোয়ার সারকুলার রোড থেকে সম্প্রতি ভবানীপুরে উঠিয়া গিয়াছে। কলেজের নূতন ঠিকানা পোষ্ট মাষ্টার অবগত নহেন। সদানন্দবাবু লোয়ার সারকুলার রোডে যে বাড়ীতে কলেজ ছিল সেখানে গিয়া দেখিলেন দেয়ালের গায়ে আঁকা রয়েছে—"বেঙ্গল আর্ট কলেজ—নং হাজরা রোডে স্থানান্তরিত হইয়াছে।" তিনি যখন—নং হাজরা রোডে পৌঁছিলেন তখনও কলেজ বসে নাই। কলেজের দারবান বলিল, "ড্রয়িং মাষ্টার ইন্দুবাবু নয় মাস আগে ব্যারাম হইয়া ছুটি লইয়াছিলেন। ছয় মাস আগে তাঁর চাকরি গিয়াছে। তিনি বাঁচিয়া আছেন কি মরিয়া গিয়াছেন জানি না।" সদানন্দবাবুর হৃদয়াকাশে আবার কালো মেঘ দেখা দিল। তিনি একটু চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইন্দুবাবুর বাসা কোথায় ছিল?" "আমি জানি না, হেড মাষ্টার বলতে পারেন।" "হেড মাষ্টার কোথায় থাকেন?" "কড়েয়া—এখনি কলেজে আসবেন।" সদানন্দবাবু অগত্যা ট্যাক্সিতে বসিয়া হেড মাষ্টারের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। হেড মাষ্টার কলেজে আসিলে দারবান সদানন্দবাবুকে তাঁহার নিকট লইয়া গেল।

সদানন্দবাবু কথায় কথায় তাঁহার নিকট শুনিলেন যে, 'ইন্দুভূষণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এস্ সি উপাধিধারী কজন কৃতবিদ্য যুবক। বি-এস্ সি পাশ করিবার পর সে আমেদাবাদ ন্যাশন্যাল আর্ট স্কুলে তৈলচিত্র প্রস্তুত র্য্যে শিক্ষালাভ করিয়া পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার রিয়াছিল। মুরুব্বির অভাবে সে প্রথমটা ভাল চাকরি যোগাড় করিতে পারে নাই। গোবিন্দবাবুর বাটীতে একটি মেয়েকে ছবি-আঁকা শিক্ষা দিবার জন্য মাসিক কুড়ি টাকা মাহিনার মাষ্টারি পায়, তারপর বেঙ্গল আর্ট কলেজে পঞ্চাশ টাকা মাহিনায় ড্রয়িং মাষ্টার নিযুক্ত হয়। ইন্দুভূষণ সদ্বংশজাত কায়স্থ, তবে তাহার আপনার বলিতে কেহ নাই। ছেলেবেলা মামার বাড়ী খাইয়া সে মানুষ হয়। ম্যাট্রিক পাশ করিবার পর তাহার মাতুলের মৃত্যু হওয়াতে মাতুল-পুত্র তাহাকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দেয়। প্রাইভেট টিউশানি করিয়া ও কলেজের জলপানির টাকায় সে বাসা-খরচ চালাইয়া আই-এস্ সি ও বি-এস্ সি পাশ করে। যে মেয়েটির সে মাষ্টার নিযুক্ত হইয়াছিল তারই সঙ্গে ইন্দুভূষণের বিয়ে হয়েছে। মেয়ের বাপ নিরুদ্দেশ হইলে গোবিন্দবাবু তাকে বে-জাতের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার মতলব করিয়াছিলেন। পাড়ার লোকে গোবিন্দবাবুর এই দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাঁর অনুপস্থিতিতে চাঁদা তুলিয়া ইন্দুভূষণের সঙ্গে সেই মেয়েটার বিবাহ দিয়াছিল। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে ইন্দুভূষণের ব্যারাম হয়। আমাদের কলেজ তাহাকে তিন মাস ছুটি দিয়াছিল কিন্তু সে আরোগ্য লাভ না করাতে তার চাকরি গিয়াছে। আপনি —লেনে সন্ধান লউন। আমি গত কয়েক মাস তার কোনও খবর পাই নি। বাড়ীর নম্বর আমি জানি না।"

সদানন্দ বাবু যখন—লেনে পৌঁছিলেন তখন তিনি দূর হইতে দেখিলেন গলির মধ্যে একটা বাড়ীর সামনে বিস্তর লোকের ভিড়। ট্যাক্সি আর অগ্রসর হইতে পারিল না। বাড়ীর বাহিরের দিকে রাস্তার উপরে ঘরগুলিতে সারি সারি দোকান। সদর দরজায় প্রবেশ করিয়াই উপরে উঠিবার সিঁড়ি। সদানন্দবাবু বাড়ীর সামনে আসিয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য সিঁড়ির দিকে দেখিলেন ছোট আদালতের জনকয়েক পিয়ন বুকে চাপরাশ বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সিঁড়ির উপরের ধাপে সিল-সাহেব ও দুইজন বাঙ্গালীবাবু সিঁড়ির পাশে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য একজন বয়স্থা স্ত্রীলোকের সহিত বাদানুবাদ করিতেছে। রাস্তার লোকে উত্তেজিত হইয়া বলিতেছিল, "কি অত্যাচার! বাড়ীওয়ালাদের গায়ে কি মানুষের চামড়া নাই!" "আহা, বৌটী একটি ছোট ছেলে নিয়ে নাচার অবস্থায় প'ড়েছে। তার স্বামী হাঁসপাতালে, আর এই সময়ে কি তিন চার মাসের পাওনা ভাড়ার টাকার ডিক্রি ক'রে তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে মাল ক্রোক করতে আছে?" সদানন্দবাবু রাস্তার লোকেদের কথা শুনিতে শুনিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তিনি সিঁড়ি দিয়া উপরে যখন উঠিতেছেন তখন সেই বয়স্থা স্ত্রীলোকটী ঘরের দরজা আটকাইয়া বলিতেছে, "আমি প্রাণ থাকতে দরজা ছাড়ব না। আমায় মেরে ফেলে তোমরা ঘরে যাও।" সদানন্দবাবু পরিচিত স্বর শুনিয়া লাফাইয়া উঠিলেন। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "শ্যামা, অনু আমার কোথায়?" শ্যামা পাঁচ বৎসর পরে সদানন্দবাবুকে অকস্মাৎ সেখানে দেখিয়া বিস্ময়-মাখান অনিশ্চিত তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিল, "ও মা, এ কি মা!" তার পরেই সে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "বাবা, আপনার অনু এই ঘরে রয়েছে। মা জগদম্বা আপনাকে এখানে এনেছেন।"

আগন্তুকের মূর্ত্তি ও বেশভূষা দেখিয়া বেলিফ ও সেই দুইজন বাঙ্গালীবাবু থতমত খাইয়া গেলেন। সদানন্দবাবু বেলিফকে বলিলেন, "আপনি নীচে যান, আমি ডিক্রির টাকা এখনি দিচ্ছি।" বেলিফ দুই তিন ধাপ নীচে নামিয়া বলিল, "আপনি ১৪০৲ টাকা দিলেই এই গোলযোগ চুকিয়া যায়।" সদানন্দবাবু বুক-পকেট হইতে ১৪ খানি নোট বাহির করিয়া বেলিফকে দিলেন। বেলিফ তাঁহাকে রসিদ দিয়া পিওনদিগের সহিত নামিয়া গেল। যে দুইটা বাঙ্গালীবাবু ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা বেলিফকে বলিলেন, "আপনি কাহার নিকট টাকা লইলেন? মাল ক্রোক করলেন না কেন? ঘরের দখল

পাওয়া যাবে কি ক'রে?" বেলিফ সদর দরজা হইতে বলিল, "আপনি ওখানে আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না। আমি আমার কাজ জানি, আপনাকে শেখাতে হবে না।" সদানন্দবাবু বেলিফকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরা কে?" বেলিফ বলিল, "উনি বাড়ীওয়ালা আর ঐ লোকটা উকিলের দালাল।" সদানন্দবাবুর মাথায় সকাল থেকে রক্ত উঠিতেছিল। এক্ষণে আর তিনি উত্তেজনা সহ্য করিতে পারিলেন না। মার-মুখী হইয়া তিনি ইংরাজিতে তাহাদিগকে দূর হইতে বলিলেন। বেগতিক দেখিয়া তাহারা সরিয়া পড়িল। শ্যামা চীৎকার করিয়া বলিল, "বাবা, বে—দেরকে লাথি মেরে বিদেয় করুন! অনুকে যা নয় তাই ব'লে গালাগালি ক'রেছে।" সদানন্দবাবু সদর দরজার দিকে ফিরিয়া দেখিলেন রাস্তার লোকে সেই পাষাণ হৃদয় বাড়ীওয়ালা ও উকিলের দালালকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি আরম্ভ করিয়াছে। একটা 'মার, মার' শব্দও উঠিয়াছে শুনিয়া সদানন্দবাবু আর বিলম্ব না করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন।

ঘরের মাঝখানে একখানি টেবিলের সামনে চেয়ারে যে শীর্ণ মূর্ত্তিটী বসিয়া টেবিলের উপর মস্তক রক্ষা করিয়া অতি ক্ষীণকণ্ঠে আবোল-তাবোল বকিতেছিল সদানন্দবাবু তাহাকে দেখিয়া বুঝিলেন যে অনুপমা বহির্জগতের অস্তিত্ব ভুলিয়া সংজ্ঞাহীন অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। ধীরে ধীরে টেবিলের নিকটে আসিয়া সদানন্দবাবু শুনিলেন, "বাবা গো, একবার এসে দেখুন আপনার অনুর কি দশা হয়েছে!" সদানন্দবাবু আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। তিনি ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। "এই যে মা, আমি এসেছি।" সেই মূর্ত্তিটী চমকাইয়া উঠিল। চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল বটে কিন্তু তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। সদানন্দবাবু ও শ্যামা অনুপমার মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে ও পাখার বাতাস করিতে করিতে খানিকক্ষণ পরে তাহার সংজ্ঞালাভ হইল। অনুপমা একটু সুস্থ হইলে সদানন্দবাবু তাহাকে বলিলেন, "আমি সব শুনেছি, তোমাদের কোনও দোষ নাই। এখন আমি তোমার বরকে হাঁসপাতাল থেকে নিয়ে আসতে চল্লুম।" সদানন্দবাবু হাঁসপাতালে গিয়া ইন্দুভূষণকে বলিলেন, "আমি সব দেনা শোধ ক'রেছি। আমি যখন এসেছি তখন তোমাদের কোনও চিন্তা নাই।" সেইদিন সন্ধ্যার সময় যখন সেই ঘরের একধারে ইন্দুভূষণ খাটে শুইয়া অনুপমার হাত হইতে কাচের গেলাসটি লইয়া ঔষধ সেবন করিতে যাইতেছে, সদানন্দবাবু তখন ঘরের মাঝখানে টেবিলের উপরে পেয়ালা হইতে এক চামচ কোকো লইয়া অনুপমার খোকাকে খাওয়াইবার জন্য সাধ্য সাধনা করিতেছেন। শ্যামা ঘরের চৌকাট চাপিয়া বসিয়াছিল আর বাড়ীওয়ালার হৃদয়হীন ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া বলিতেছিল যে রাস্তার লোকে তাকে বেশ উত্তম মধ্যম দিয়েছে। খোকা সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "দাত্, মাও ত শায়াকে, নাত্তি মাও ত।" সদানন্দবাবু তাহাকে কোলে করিয়া ঘরের মেঝেয় পা ঠুকিতে লাগিলেন, তবে সে এক চামচ কোকো পান করিল। অনেকদিন পরে অনুপমার বরের মুখে হাসি ফুটিল। ইন্দুভূষণ এখন একটি উৎকৃষ্ট ষ্টুডিওর মালিক। খোকা স্কুলে পড়িতেছে। সদানন্দবাবু সকাল সন্ধ্যা হেদুয়া স্কোয়ারে হাওয়া খান ও মেসপটের ইতিহাস অন্তরঙ্গ বন্ধুদেরকে শুনাইয়া সময় কাটান। শ্যামা ঝি বাটীর সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া অনুপমার কোলের ছেলেকে মানুষ করিতেছে।

পূর্ণতা।

[শ্রীভবতারণ সরকার, বি-এ]

দিবসের সনে হায়
নলিনী শুকায়ে যায়,
গেলে নিশি মধুহাসি ক্ষয় চন্দ্রমার ;
তাই বিধি নিরজনে
বুঝিবা একান্ত মনে
সৃজেছে রমণী মুখ সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার।
স্রষ্টার(ও) সহিতে হয় সৃজনের ক্লেশ,
ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞতার পূর্ণ সমাবেশ।

পুনর্জ্জন্ম।

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত]

কোজাগরী পূর্ণিমার স্নিগ্ধ কিরণে যখন স্থাবর-জঙ্গম শস্য-প্রফুল্ল, তখন দমদমার প্রমোদোদ্যানের সরসী তীরে বসিয়া লছমী সিং আপনাকে বড় ছোট মনে করিতেছিল। এমনি জ্যোৎস্না তো তাহারও প্রাণকে একদিন সুষমামণ্ডিত করিত—তাহারও গৃহ-প্রাঙ্গণ এমনি কৌমুদী-স্নাত হইয়া লাবণ্যময় হইয়া উঠিত। সে নির্জ্জনে বসিলে তাহার পূর্ব্ব জীবনের স্মৃতি তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলকে আলোড়িত করিত। জমিদারের পুত্র, সদ্বংশজাত যুবক—তাহার এক ভাই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, এক ভাই স্কুলের শিক্ষক, আর সে—সে যে কে তাহা সে নির্ণয় করিতে শিহরিয়া উঠিল। বিদ্যা শিক্ষা করে নাই বলিয়া তাহার ততটা আত্ম-গ্লানি হয় নাই। তিতিরের লড়াই দিয়া সে পিতার নিকট ভর্ৎসনা সহ্য করিয়াছিল বলিয়া আজ সে মনের মধ্যে বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা সহ্য করিতেছিল না। সে সহসা একদিন পিতার তাড়নায় গৃহ ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছিল। সে আজ দুই বৎসরের কথা। সেই অবধি সে গৃহের কোনও সংবাদ রাখে নাই, সাহস করিয়া নিজের সংবাদও আত্মীয় স্বজনের গোচর করে নাই। প্রথম সে যখন গৃহত্যাগী হইয়াছিল তাহার মনে আশা ছিল মজুরী করিয়া সে নিজের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিবে, তাহার পর সে গুপ্ত বাস ছাড়িয়া জন্মস্থানে ফিরিবে—পিতার চরণ ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিবে, আবার দশ জনের একজন হইবে।

কিন্তু প্রত্যেক মানুষ যেমনটি চায় জগৎ তো আর তেমনি ভাবে চলে না। লছমী সিংহের কলিকাতার জগৎ ভিন্ন পথে চলিতে লাগিল। তাহার অনুতাপ হইতেছিল সেই কারণে। তাই আজ জ্যোৎস্নার শান্ত স্নিগ্ধ কিরণ রাশি তাহার প্রাণে অগ্নিশিখার মত জ্বালাময় হইয়া উঠিয়াছিল। কেন মজুরী করিয়া ধীরে ধীরে আত্মোন্নতি করিল না—কেন সে অকস্মাৎ ধনকুবের হইবার লালসায় এই জঘন্য জুয়ার আড্ডায় প্রবেশ করিল? কেন? কেন? কেন?

তাহার মনের মধ্যে এ প্রকাণ্ড "কেন"র উত্তর উঠিবার পূর্ব্বেই তাহার বন্ধু শিবপ্রসাদ আসিয়া তাহার পার্শ্বে বসিল। সে বলিল—কি ভাই, চল আজ সারা রাত কাজ চলবে। অনেক বাঙ্গালী মারবাড়ী খেলতে আসবে।

লছমী সিং উত্তর দিল—তাহার অর্থ সে নিজেই বুঝিল না। শিবপ্রসাদ তাহাকে উপহাস করিল। সে নিজের দুর্ব্বলতা স্মরণ করিয়া নিজেই হাসিল। তখন দুই বন্ধুতে অনেক কথা হইল। প্রসঙ্গের প্রধান কথা—অর্থ সংগ্রহের উপায়। কিছু না হাতে থাকিলে অন্য কোথা হইতে অর্থ আসিবে? সেই মূল ধন সংগ্রহের তথ্য লইয়া তাহাদের মধ্যে ভীষণ বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। একটা ভৃত্য ভাঙ্ লইয়া আসিল, উভয়ে খুব সিদ্ধি পান করিল। উভয়ে স্থির করিল, অর্থ চাই—যেন-তেন প্রকারেই চাই—চাই—চাই।

২

মানুষ একবার যখন ধ্বংসের মুখে ছুটিতে আরম্ভ করে, প্রতি পদে তাহার গতির বেগ বাড়িয়া উঠে। পাহাড়ের গায়ে উপলখণ্ড যেমন আত্মহারা হইয়া গড়াইতে থাকে, লছমী তেমনি ছুটিল। কলিকাতার পুলিসের উপদ্রবে এই আড্ডার প্রধান—ধন্ন মহারাজ দমদমার এই বাগানে জুয়ার আড্ডা বসাইয়া ছিল। এখানকার পুলিস ছিল তাহার বৃত্তিভোগী। অনেক বলিষ্ঠ দ্বারবান ছিল তাহাদের শান্তির বিধান করিতে, যাহারা এখানে দ্যূত-ক্রীড়ায় হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া ক্রীড়ার সততার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার দুঃসাহস রাখিত। লছমী সিং, শিবপ্রসাদ প্রভৃতির মত কতকগুলা অপোগণ্ড থাকিত—ধন্ন মহারাজের দাল-রুটীর

শ্রাদ্ধ করিবার জন্ম এবং বাহিরের জুয়াড়ি আসিলে ধন্নুর পক্ষ হইতে তাহাদের সহিত খেলিবার জন্য। এ লাভের সমস্ত টাকা ধন্নু পাইত। তাহারা নিজের অর্থে যদি কোনও দিন খেলিয়া কিছু লাভ করিতে পারিত—সে ধনের অধিকারী হইত তাহারা।

সেই কোজাগরী পূর্ণিমার শুভ মুহূর্ত্তে সিদ্ধির নেশায় বিভোর হইয়া সমস্ত অনুতাপ, সকল আত্মগ্লানি, অতীতের সব স্মৃতি মুছিয়া যখন লছমী স্থির করিল যে অর্থ চাই, তখন শিবপ্রসাদ তাহাকে সুবুদ্ধি দিল যে তাহাদের মত অন্য জুয়াড়ি যে উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করে, তাহারাও সেই সহজ পন্থা অনুসরণ করিবে। জুয়ার নেশায় যখন মানুষ ভরপুর হয়, তখন তাহাদের দ্যূতলব্ধ ধনের হিসাব থাকে না। নিজেদের পার্শ্বে নোটের তাড়া রাখিয়া নেশায় উন্মত্ত হইয়া তাহারা তাসের দিকে চাহিয়া থাকে—কিসে প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করিয়া তাহার ধন নিজস্ব করিবে, সেই লোভে মাতালের মত জ্ঞানহারা হয়। অনেক নিকৃষ্ট ব্যক্তি সেই অবসরে তাহাদের পার্শ্ব হইতে নোট টাকা চুরি করে। ধন্নু মহারাজের পেটোয়া লোক ব্যতীত অপরে সে কার্য্যে ধরা পড়িলে তাহার শাস্তি ও নিগ্রহের অবধি থাকে না। ধন্নুর যাহারা মোসাহেব, অনুগ্রহজীবি, তাহাদের মত লোকের পক্ষে এরূপ দস্যুতা করা বড় সহজ। কিন্তু ধৃত হইলে ধন্নু পাদুকা প্রহারে তাহাদের বহিষ্কার করিয়া দেয়। লছমী ও শিবপ্রসাদ ধন্নুর বিশেষ প্রিয়পাত্র, তাহারা উভয়েই সদ্বংশের কুলাঙ্গার, ধন্নু তাহাদের একটু শ্রদ্ধা করিত। কিন্তু পাপের এমন মোহিনী শক্তি যে, এক শ্রেণীর পাপ অপর শ্রেণীর পাপকে ডাকিয়া আনে। তাই জুয়াড়ী লছমী সিং সিদ্ধান্ত করিল যে জুয়াড়ীর অর্থ অপহরণ করিলে পাপ হয় না। সেই শুভ কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে সে এই পাপের পথে প্রথম যাত্রা করিল। সারা রাত্রি আড্ডায় বসিয়া প্রথমে সে তিন শত টাকা অপহরণ করিল। পরে সেই টাকায় খেলিয়া রাতারাতি সে সহস্র মুদ্রার মালিক হইল।

৩

পাপ সবার সহে না। লছমীর সাত দিন সহিল আর সাত দিন সহিল না। সে অর্থ অপহরণ করিল, সেই অর্থে জুয়ায় অর্থ লাভ করিল শেষে সমস্ত অর্থ আবার হারাইল এই পনের দিন তাহার জীবনে একটা বিষম পরিবর্ত্তন ঘটিল। যেমন টাকার মত সুখ ও দুঃখ তাহার প্রাণের ভিতর দিয়া গড়াইয়া চলিল সে গণ্ডগোলের পরিণাম সহ্য করিবার জন্য কেবল সিদ্ধিতে তাহার মনকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। বোতল ভরা সুরা শক্তির উদ্বোধন তাহাকে করিতে হইল। সে এই কয়েক দিনের মধ্যে মদ্যপায়ী হইয়া উঠিল। হাতে পয়সা আসিলে যখন তাহার স্ফূর্ত্তি হইল,তখন সে আনন্দে মদ্য পান করিতে লাগিল। আবার অর্থ হানি হইলে দুঃখ আসিয়া যখন তাহার মনকে অধিকার করিল তখনও সে সুরাদেবীর সাধনায় প্রাণের জ্বালা নিভাইতে যত্নবান হইত।

কিন্তু এ অবস্থা তাহার অধিক দিন চলিল না। দেওয়ালীর পূর্ব্ব রাত্রে সে প্রায় ৫০০ টাকা চুরি করিল। ধন্নু মহারাজ কয়েক দিন ধরিয়াই তাহার উপর সন্দেহ করিতেছিল, কিন্তু আজ সে তাহাকে হাতে হাতে ধরিল। সে সময় গোলমাল করিলে তাহার আড্ডার অপযশ হইবে এই আশঙ্কায় ধন্নু মহারাজ কোনও কথা বলিল না। সে লছমী সিংহের মুখের দিকে যে দৃষ্টি দিল, তাহার ফলে প্রত্যূষে লছমী সিং টাকাকড়ি ফেলিয়া দমদমা ছাড়িয়া পলাইল।

৪

একটা বিরাট নির্জ্জনতা লছমী সিংকে দগ্ধ করিতেছিল। সেদিন দেওয়ালী। কলিকাতার উত্তরাংশ উৎসবের মোহে আচ্ছন্ন ছিল। বাঙ্গালী পাড়ায় শ্যামাপূজার ধূম ঘোর পটকার নানা শব্দে, আতস বাজীর বিচিত্র রঙ্গীন আলোয়, দীপের রশ্মিতে বিঘোষিত হইতেছিল। বড়বাজারে ঘরে ঘর দীপালীর আলোকমালা, ব্যবসাদারগণের নূতন খাতার শুভ অনুষ্ঠান, মিঠাইওয়ালাদের মিঠাই সজ্জার অভিনব ভঙ্গিমায়, ভারতবর্ষের, কে জানে কোন্ অতীত যুগের, উৎসবের বাৎসরিক পুনরাবৃত্তি হইতেছিল। হতভাগ্য হিন্দু জাতির ক্ষণিক সুখের বার্ত্তা বহন করিয়া কাগজের ফানুস আকাশ-পথে দেবতার চরণে জানাইতে যাইতেছিল

এ লুপ্তগৌরব, জীর্ণ, শীর্ণ হিন্দু জগতের মধ্যে এখনও বিদ্যমান। অসংখ্য নরনারী বালক বালিকা নানাবিধ পোষাকে ভূষিত হইয়া কলিকাতার রাজপথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। লছমী সিংহও হ্যারিসন রোডে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। প্রাণের মধ্যে ভীষণ অবসাদ, অসহ্য জ্বালা, বিরাট নিরাশা। কিন্তু নিরাশা তাহাকে শুদ্ধ করে নাই। হতোদ্যম হইয়া সে নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর হইয়াছিল, তাহার মনে হইতেছিল যে প্রতি মুহূর্ত্তে সে সুসজ্জিত মানুষগুলার গলা টিপিয়া মারিয়া অর্থ সংগ্রহ করে। সেই অর্থে জুয়া খেলিয়া সে আজ লাভবান হয়। এক একবার ভাবিতেছিল যে পুলিসকে খবর দিয়া সে ধন্নুর দলকে ধরাইয়া দেয়। কিন্তু তাহার প্রাণ শিহরিতেছিল যে যদি তাহাতে তাহার চুরির অপরাধে শাস্তি হয়। নিষ্ঠুরতা রক্তলোলুপতা তাহার রক্তের সহিত তাহার শিরায় শিরায় ছুটাছুটি করিতেছিল।

একখানা মোটরে কয়েকটি সুসজ্জিতা বাঙ্গালী মহিলা বসিয়াছিল—বাবু সম্ভুপের দোকানে বেনারসী পিতলের ফুলদান কিনিতেছিলেন। ধন্নু অলস ভাবে তাহাদের দেখিতেছিল এবং লোভ-লোলুপ দৃষ্টিতে তাহাদের বহুমূল্য জহরতাদির প্রতি তাকাইয়াছিল। অকস্মাৎ কে তাহাকে পশ্চাৎ হইতে স্পর্শ করিল। লছমী ফিরিয়া দেখিল শিবপ্রসাদ।

৫

সেই ভীড়ের পথের একদিকে দাঁড়াইয়া দুই বন্ধুতে কথা হইতেছিল। ধন্নু মহারাজ লছমী সিংহের অন্তর্দ্ধানে তাহাকে প্রকাশ্যে অবমানিত করিবার অবসর হারাইয়া তাহার উদ্দেশে শত গালি দিয়া আজ্ঞা দিয়াছে লছমী যেন আর দমদমার জুয়ার আড্ডায় প্রবেশ করিতে না পায়। লছমী ক্রোধে জ্বলিতেছিল। শিবপ্রসাদ তাহার উপস্থিত কর্ম্মের কথা বলিল। বেরিলি হইতে এক ধনাঢ্য যুবক আসিয়া হ্যারিসন রোডের ধর্ম্মশালায় উঠিয়াছিল। লোকটার ভারি "খেলার" সখ। দুপুর হইতে সে খেলিতেছে। হাজার টাকা প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে। ধর্ম্মশালায় তাহার সাথী দুইজন মহিলা আছে—একজন তাহার স্ত্রী, অপরটি ভগ্নী এবং তাহার ছোট ভাই আছে। সে পত্র দিয়া ভ্রাতার নিকট হাজার টাকা চাহিয়াছে।

লছমী সিং বিস্মিত হইয়া এ কাহিনী শুনিল। সে গৃহ হারা লক্ষ্মী-ছাড়া জুয়াড়ী, কিন্তু এ ভদ্র জুয়াড়ী আরও পাপী। বিদেশে দুইটি অসহায়া স্ত্রীলোককে এবং তরুণ ভ্রাতাকে ফেলিয়া সমস্ত অর্থ জুয়া খেলিয়া নষ্ট করিতেছে। লছমী তাহার নিজের সর্ব্বনাশ করিতেছে। সে অকস্মাৎ একবার তাহার যুবতী স্ত্রী গৌরীর কথা স্মরণ করিল। সে স্মৃতিটাকে চাপিয়া সে আগন্তুকের কথা ভাবিল। লোকটা হীন-চরিত্র। তবে সে যখন তাহার ভগ্নী এবং স্ত্রীর কথা ভাবিতেছে না অপরে তাহাদের কথা ভাবিবে কেন? তাহাদের নিকট নিশ্চয় অনেক অলঙ্কার আছে। যাহার নিকট নগদ অন্ততঃ দুই হাজার টাকা আছে তাহার নিকট আরও কত ধন থাকা সম্ভব। শিবপ্রসাদকে হাত করিতে পারিলে নিদেন এই সহস্র মুদ্রা ত হস্তগত হইবেই। চকিতে এই সব কথা ভাবিয়া সে শিবপ্রসাদের নিকট পত্রখানা দেখিতে চাহিল। পত্রে লেখা ছিল—"পত্র-বাহক আমার বিশ্বাসী বন্ধু। আমি কিছু জহরৎ খরিদ করিতেছি। পত্র পাঠ ইহার হস্তে হাজার টাকা দিবে। আমি অধিক রাত্রে বাসায় ফিরিব—হিম্মত সিং।"

৬

অনেক বাদানুবাদের পর শিবপ্রসাদ সম্মত হইল। সে বলিল—"আমি ধর্ম্মশালার সামনে পথে থাকিব—তুমি জহুরী সাজিয়া উপরে যাইও। আমি জমাদার, বুঝি লে?"

উভয়ে খুব হাসিল। পত্র হস্তে লছমী সিং ধর্ম্মশালার উপরে উঠিয়া অনুপ সিংহের সন্ধান করিল। তাহার নিকট প্রথমে নগদ হাজার টাকা লইয়া সে বলিবে মহিলাদ্বয় তাহার সহিত যাইলে দোকানে অনেক জহরৎ দেখাইবে। পত্রে লেখা ছিল যে সে বিশ্বাসী বন্ধু, আর জহরৎ দেখিবার প্রলোভন কয়জন রমণী জয় করিতে পারে? তাহার পর সে একটা খালি বাড়ী জানিত, সেখানে লইয়া গিয়া তাহারা প্রথমে ইহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবে তাহার পর স্ত্রীলোক দুইটা যদি সুন্দরী হয় এবং যুবতী হয় তো সে সব পরের কথা। এখন সে অনুপ সিংকে তল্লাস করিল।

পথের ধারের একটা ঘরের ভিতর হইতে একটি সুন্দর দ্বাদশ বর্ষীয় বালক আসিল। বারান্দার অল্প আলোকে সে তাহাকে দেখিল—যেন কবে কোথায় তাহাকে দেখিয়াছে, বালক একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়াছিল। সে পত্র পাঠ করিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তস্করের দিকে চাহিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। লছমী সিং বড় অধীর হইল। এত বড় সয়তানী করিবার শক্তি তাহার ছিল না, সে তাহা বুঝে নাই। দুর্ব্বলতা স্মরণ করিয়া একটু কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল—"শিবনারায়ণ জমাদার"।

ইত্যবসরে ঘরের ভিতর হইতে দুইটি অবগুণ্ঠিতা তাহাকে দেখিতেছিল—সে তাহা অনুভব করিল। সে সতীত্বের তীক্ষ্ণ চাহনী তাহাকে বড় ব্যাকুল করিল। বালকটি বাহিরে আসিয়া বলিল—"ভিতরে আসুন"।

মন্ত্রমুগ্ধ সর্প যেমন সাপুড়িয়ার অনুসরণ করে, লছমী তেমনি অমূপের অনুসরণ করিল। "হিম্মৎ-সিং" নামটা যেন একটু গোল বাধাইতেছিল—তাহার পর ছেলেটা। ঘরে ঢুকিয়া সে বসিল। বালক বাতিটা জোর করিয়া দিল। অবগুণ্ঠনবতী মহিলা দুইটি স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে দেখিতেছিল। বালকটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে একবার তাহাকে দেখিতেছিল একবার স্ত্রীলোক দুইটির দিকে চাহিতেছিল। একটি স্ত্রীলোক কাঁপিতেছিল। যুবক ব—আপকা নাম?

একজন স্ত্রীলোক অপরটিকে বলিল—হাঁ। লছমী সি

সে আর সহ্য করিতে পারিল না। মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

এবার দুর্ব্বৃত্তের হাত পায়ের কাঁপুনি বন্ধ হইল। সেই ছুটিয়া গিয়া মূর্চ্ছিতা স্ত্রীলোকটিকে ক্রোড়ে তুলিয়া বলিল—গৌরি! গৌরি! চেয়ে দেখ আমি! আমি! আর পালাব না—আর যাব না। ক্ষমা কর, মাপ কর গৌরি! গৌরি! পানি! পানি! শিবপ্রসাদ দৌড়াও। আমার শ্যালককে ডাক—হিম্মত সিংকে ডাক। ভগবান ক্ষমা কর। গৌরী ক্ষমা কর। এ পথের শেষ দেখিয়াছি—আজ আমার পুনর্জ্জন্ম।

গৌরী ধীরে ধীরে চক্ষু চাহিল। অপার আনন্দে, বিবশ লজ্জায় সে উঠিয়া বসিয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিল।*

* আমার এই গল্পটি দৈনিক-"স্বতন্ত্রে"র দেওয়ালীর বিশেষাঙ্কে হিন্দী-ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে।—লেখক।

বরষ-পরে।

[শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু বিদ্যাভূষণ, সাহিত্যরত্ন]

কান্নাকাটির হাট বাজারে, হেরব বলে বরষ-পরে,
ছুটেছি তোর হৃদ্‌মাঝে,
ঘনিয়ে এলো আকাশ ভরা, দুঃখ হাসি পাগল পারা,
প্রদীপ নেভে তাই সাঁঝে।
মনের কোণে গোপন কথা, ছুট্‌ল তখন যেথা সেথা,
উঠ্‌ল বেজে এক সুরে,

কি আছে তোর মাঝখানেতে, দুকূল যার ভুলের পথে,
ব্যাকুল কেন তার তরে।
সেই পথেরই যাত্রী ওরে, দাঁড়াস যখন বরষ-পরে,
খতিয়ে নিতে 'দিন্‌-দেনা',—
ব্যাকুল হিয়া চমক্ মারে, জীবন-সুধা ভরিয়ে নে রে,
দুদিন তরে 'আন্‌-গোনা'।

হৃদয়-লক্ষ্মী।

[শ্রীমতী চারুবালা দেবী]

সূর্য্যের তেজ যতই প্রখর হইতেছিল, মাথার যন্ত্রণাটাও ততই বাড়িয়া উঠিতেছিল। দুই হাতে কপালটা টিপিয়া ধরিয়া চামেলী দক্ষিণ দিকের খোলা জানালা দিয়ে নীল আকাশের কোলে একখানি রজত-শুভ্র খণ্ড-মেঘের দিকে তাকাইয়া শুইয়াছিল।

অসুস্থ শরীরে সময় যেন আর কাটিতে চায় না। চামেলী শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছিল, কি দীর্ঘ এই দিন রাত্রি গুলি! পৃথিবীর প্রসারিত বাহুর বন্ধনে ধরা পড়িয়া গিয়া ইহাদের যেন মুক্তির ইচ্ছাটুকুও চলিয়া গিয়াছে। যাইবার জন্যই যে আসা, সে কথা যেন ইহারা ভুলিতে বসিয়াছে।

একখানি মাসিক পত্র হাতে লইয়া প্রতিমা ঘরে ঢুকিল। চামেলী দেখিয়া ফেলিবার আগেই বইখানা বিছানার এক পাশে রাখিয়া দিয়া তাহার মাথার কাছে সরিয়া আসিয়া বসিল, "কেমন আছিস্ এখন? খুব কষ্ট হচ্ছে মাথায়?"

চামেলী হাসিয়া বলিল, "কষ্ট ত চিরদিনের সঙ্গী, সে কথায় আর কাজ কি। ব'সো, খাওয়া হয়েছে তোমার?"

প্রতিমা বলিল, "খাব এখন একটু পরে, তোকে ওষুদ খাওয়াতে এলাম।"

চামেলী বলিল, "এ কর্ম্মভোগ কেন? জানই ত আমি তেতো ওষুদ খাব না।"

কাচের গেলাসটা ধুইয়া লইয়া ঔষধ ঢালিতে ঢালিতে প্রতিমা বলিল, "ছি ভাই, ছেলে-মানুষী করে কি! ওষুদ খেলে অসুখ সারবে কেন?"

চামেলী বলিল, "ওষুদ খেয়েও যে অসুখ সারবে না— সে কথা তুমিও ত জান।"

প্রতিমা বলিল, "জিদ্ রেখে দিয়ে ওষুদটুকু খাস যদি, তবে তোকে জানকী দেবীর লেখা পড়তে দেব।"

চামেলী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া ব্যগ্র হইয়া বলিল, "বেরিয়েছে নাকি তাঁর লেখা? দেখি—"

গেলাসটা তাহার হাতে দিয়া মাসিক পত্রখানা টানিয়া লইয়া প্রতিমা বলিল, "আগে ওষুদ খা।" চামেলী নীরবে ঔষধ খাইয়া আর কিছু মুখে দিবার আগেই তাহার হাত হইতে বইখানা কাড়িয়া লইল।

সুপারি কুচাইতে কুচাইতে প্রতিমা বলিল, "খুব যা হোক! কুইনাইন মিকশ্চার খাওয়ার পরে সুপুরী হ'ল বুঝি জানকী দেবীর রচনা? এইমাত্র না তেতোর ভয়ে মরে যাচ্ছিলি?"

চামেলী শুইয়া পড়িয়া সুপারি মুখে দিয়া বলিল, "তুমি এখন যাও, আমাকে বিরক্ত কোরো না।"

প্রতিমা হাসিয়া উঠিল। শিশি গেলাস গুলি গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে বলিল, 'তা ত বলবেই, কলির ধর্ম্ম কি না, এখন বলি শোন, জানকী দেবীর লেখা ছাড়া আর কিছু যেন পড়ো না। মাথার যন্ত্রণাটা তা হ'লে—"

প্রতিমার কথা শেষ হইবার আগেই "রত্নাবলী"র পাতা উলটাইতে উলটাইতে চামেলী বলিল, "আর কিছু আমার ভাল লাগলে ত?"

কিছুক্ষণ স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া প্রতিমা নীরবে বাহির হইয়া গেল। হাতের কাজ শেষ করিয়া ঘণ্টা দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বই-খানি মুড়িয়া রাখিয়া চামেলী আকাশের দিকে তাকাইয়া কি ভাবিতেছে। ঠাণ্ডা হাতখানি তাহার কপালের উপরে রাখিয়া প্রতিমা ডাকিল, "মিলি।"

চামেলী তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়া লইয়া বলিল, "জান বৌদি, জানকী দেবী ঠিকই বলেছেন, নতুন নতুন বেদনার ভিতর দিয়ে বাস্তবিকই নবজীবন লাভ করা যায়।"

২

রাত্রিতে চামেলীর জ্বরটা ভয়ানক রকম বাড়িয়া উঠিল। স্বামীর দিকে ফিরিয়া চিন্তিত মুখে প্রতিমা বলিল, "এখান

কার জল বাতাস ওর মোটেই সহ্য হচ্ছে না, কোথাও হাওয়া বদলাতে গেলে হ'ত।"

সন্তোষ বলিল, "পুরীতে আমার একজন বন্ধু আছেন, দেখি—ডাক্তার বাবু যদি বলেন, তা হ'লে সেখানেই যাওয়ার বন্দোবস্ত করি।"

সারারাত্রি ছট্‌ফট্ করিয়া ভোরের দিকে চামেলী ঘুমাইয়া পড়িলে কতকটা নিশ্চিন্ত মনে প্রতিমা বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হাত দিয়া বিনিদ্র চোখ দুটী রগড়াইয়া জানালা গুলি খুলিয়া দিয়া সে ঘরের কাজে চলিয়া গেল।

জাগিয়া উঠিয়া চামেলী দেখিল ঘরে কেহই নাই, শুধু "রত্নাবলী" খানা তাহার হাতের কাছে পড়িয়া আছে। সে সাগ্রহে সেখানা তুলিয়া লইয়া পঠিত অংশটি-ই বার বার পড়িতে লাগিল।

ওগো কল্পলোক-বাসিনী দেবি, তুমি দেখিতে কেমন? তোমার রচনা এত সুন্দর,—কিন্তু কণ্ঠস্বর কেমন? কখনো যদি তুমি চামেলীকে দেখিতে পাও, তাহা হইলে হাসিয়া একটা কথাও বলিবে কি? কিছু যদি না বল, একটি বারের জন্যও স্নেহভরা দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিবে কি?

বইখানি মুড়িয়া রাখিয়া চামেলী অনেক কথাই ভাবিতে লাগিল। সময় যে ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, সে দিকে তাহার একটুও লক্ষ্য ছিল না। ধ্যানের প্রতিমা-টিকে হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সে নীরবে প্রীতির অর্ঘ্যে তাঁহার পূজা করিতে লাগিল।

প্রতিমা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "কি ভাবছিস আকাশের দিকে চেয়ে? মুখ ধুতে হবে না?"

চামেলী বলিল, "জল এনেছ?"

"এনেছি। ওঠ্ দেখি একটু চট করে, আমার আবার উনুনে দুধ আছে।"

উঠিয়া মুখ ধুইয়া চামেলী বলিল, "আচ্ছা বৌদি, জানকী দেবীর ঠিকানা জান তুমি?"

চলিয়া যাইতে যাইতে প্রতিমা বলিল, "না। আমার ত সেই ভাবনায় ঘুম হচ্ছে না!"

চামেলী ডাকিয়া বলিল, "দাদাকে ডেকে দিয়ে যেও বৌদি।"

তাহার পায়ের শব্দ মিলাইয়া যাইবার পূর্ব্বেই সন্তোষ আসিয়া ঘরে ঢুকিল। একটা টুল টানিয়া চামেলীর মাথার কাছে বসিয়া বলিল, "হাতটা দেখি?"

"জ্বর এখন খুব কম" বলিতে বলিতে হাতটা বাড়াইয়া দিয়া চামেলী বলিল, "আচ্ছা দাদা, রত্নাবলীর লেখিকা জানকী দেবীকে তুমি জান?"

"জানি।"

"তুমি কি তাঁকে দেখেছ?"

সন্তোষ বলিল, "না, শুনেছি তিনি সম্পাদকের একজন আত্মীয়া।" চামেলী বলিল, "তাই বুঝি তিনি অন্য মাসিক পত্রে লেখা দেন না?"

"হবে।"

চামেলী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "জানকী দেবীর লেখা একখানা বই আমাকে কিনে দেবে?"

সন্তোষ বলিল, "দেব। কিন্তু দিদি, এত বেশী বই পড়া কি ভাল?"

চামেলী চটিয়া উঠিয়া বলিল, "কোথায় আমি বেশী বই পড়ি? বৌদি দেয় বুঝি? কত ক'রে চাই, কিছুতেই দেয় না। বলে, 'মাথা ঘুরবে'—যেন সাত জন্মে আমার মাথা ঘোরে না, কেবল যখন ওষুধ খাই—"

দরজার সামনে প্রতিমাকে দেখিয়াই চামেলী চুপ হইয়া গেল। প্রতিমা ঘরে ঢুকিয়া সাগুর বাটি নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "লাগানো হচ্ছিল বুঝি আমার নামে? এই জন্যে বুঝি 'দাদা'র ডাক পড়েছিল? তা বেশ, এখন ওঠ দেখি।"

মুখ বিকৃত করিয়া চামেলী বলিল, 'সাগু যে আমার ভাল লাগে না।"

"আমি দিচ্ছি যে, ভাল লাগবে কেন? জানকী দেবী এসে দিতেন যদি!"

"তিনি দিলে নিশ্চয়ই খেতাম, ফেনাইল দিতেন যদি—তাও খেতাম।"

প্রতিমা হাসিয়া স্বামীর দিকে তাকাইয়া বলিল,

"শুনলে তোমার বোনের কথা ?" সন্তোষও হাসিল। ভগিনীর পিঠ চাপড়াইয়া দিয়া বলিল, "আচ্ছা, তুই ভাল হ'য়ে ওঠ. তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।"

৩

অন্ধকার রাত্রিতে গাড়ীখানা হু হু শব্দে অজানা পথের-দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। জানালার কাছে বসিয়া অপরিচিতা পৃথিবীর দিকে চাহিয়া চামেলী কত কি ভাবিতেছিল। প্রতিমা নিকটে সরিয়া আসিয়া বলিল, "আলোয়ানখানা ভাল করে গায়ে ঢাকা দে, যে বাতাস!"

চামেলী বলিল, "দিচ্ছি। দেখেছ বৌদি কি সুন্দর ষ্টেশন!"

"বেশ আলো দিয়েছে ত! কি ষ্টেশন রে এটা?"

চামেলী বাহিরের দিকে একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "খড়গপুর।"

সন্তোষ আসিয়া স্ত্রীকে প্রশ্ন করিল, "মিলি এখন কেমন আছে? টেম্‌পারেচার নিয়েছ ত?"

প্রতিমা বলিল, "নিয়েছিলাম একটু আগে, জ্বর এখন অনেকটা কম। খাতায় লিখে রেখেছি।"

চামেলী ব্যগ্র হইয়া বলিল, "বৌদি, ঐ সঙ্গে খাতায় ষ্টেশনগুলোর নাম লিখে রাখ না।"

"আমার ত আর খেয়ে দেয়ে কাজ নাই" বলিতে বলিতে স্বামীর দিকে ফিরিয়া প্রতিমা বলিল, "কিছু খাবে? ওবেলা ত বেরবার ধুমে ভাল করে খাওয়া হয় নাই।"

"এখন কিছু খাব না, এইমাত্র এক পেয়ালা চা কিনলাম। এই নাও তোমাদের টিকিট, এখুনি মেম আসবে চেক্ করতে।" প্রতিমার হাতে টিকিট দিয়া সন্তোষ নিজের কামরার দিকে চলিয়া গেল।

ট্রেণ ছাড়িয়া দিলে প্রতিমা বলিল, "আর রাত জাগতে হবে না। সতরঞ্চিখানা পেতে দিই, একটু ঘুমিয়ে নাও।"

চামেলী কণ্ঠস্বরে মিনতি ঢালিয়া দিয়া বলিল, "আর খানিকটা সময় আমাকে জেগে থাকতে দাও বৌদি, আমি একবার পৃথিবীর চেহারাখানা দেখি।"

প্রতিমা চমকিয়া উঠিয়া চামেলীর মুখের দিকে চাহিল, চামেলীও ঠিক সেই মুহূর্ত্তে প্রতিমার দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। হাসিয়া বলিল, "কি বৌদি, চমকে উঠলে যে?"

"তোর কথার কায়দায়। মেয়ে দিন দিন কবি হয়ে পড়ছেন।"

কিছুক্ষণ আনমনাভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ চামেলী বলিল, "দেখেছ বৌদি, বাইরের দৃশ্যটা কি চমৎকার!"

প্রতিমা তাহার কথার উত্তর না দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া চামেলী বলিল, "সুন্দর নয়?"

প্রতিমা হাসিয়া বলিল, "কি জানি, তোর 'দৃশ্যে'র বুকে যে আঁধারের পর্দ্দাটানা—আমি ত ভাই কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।"

"ঐ না দেখতে পাওয়ার ভিতরেই একটা সৌন্দর্য্য আছে, তুমি বুঝতে পাচ্ছ না?"

"আমি ভাই বাস্তব জগতের জীব, অত কবিতার হেঁয়ালি বুঝি না।"

ভদ্রক ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়াইলে বেঞ্চ হইতে নামিয়া ষ্টোভ জ্বালিয়া দুধ গরম করিতে করিতে প্রতিমা ডাকিল, "মিলি, নেমে আয়।"

চামেলী তখন ঈষৎ ঝুঁকিয়া ষ্টেশনের নাম পড়িতে চেষ্টা করিতেছিল। ভ্রাতৃজায়ার দিকে ফিরিয়া বলিল, "ভয়ানক অভদ্র ষ্টেশন এটা, একটাও আলো নাই।"

প্রতিমা হাসিয়া বলিল, "কিন্তু এর-ই নাম ভদ্রক।"

৪

পুরীতে আসিয়া নূতন দৃশ্য দেখিবার আনন্দে দিন-কতক ভাল থাকিবার পরেই হঠাৎ একদিন প্রবলবেগে জ্বর আসিয়া চামেলীকে একেবারে শয্যাগত করিয়া ফেলিল।

পশ্চিম-দিক-চক্রবালের সীমান্ত রেখায় অস্তমান সূর্য্যের শেষ রশ্মি সেদিন বিচিত্র বর্ণ-সুষমার সৃষ্টি করিতে-ছিল। বিছানার উপরে পড়িয়া থাকিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া চামেলী আনমনা হইয়া কি যেন ভাবিতেছিল।

অদূরে অশ্রান্ত গর্জ্জনে সমুদ্র নাচিয়া চলিতেছিল। কিছুক্ষণ আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া শ্রান্ত চোখ

দুইটীকে ফিরাইয়া লইয়া চামেলী খোলা জানালার পথে বাহিরের দিকে চাহিল।

উদ্দাম ফেনরাশি তখন সহস্র মিনতি বক্ষে লইয়া বেলাভূমির উপরে আছড়াইয়া পড়িতেছিল, কিন্তু ব্যর্থতার নৈরাশ্যে প্রতিহত হইয়া কাঁদিয়া ফিরিয়া যাওয়া ছাড়া তাহাদের অন্য উপায় ছিল না। খানিকটা চাহিয়া থাকিয়া চামেলী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

প্রতিমা আসিয়া নিকটে দাঁড়াইতেই চামেলী বলিল, "বৌদি, দাদার বন্ধুর সেই হার্ম্মোনিয়ামটা ফেরৎ দেওয়া হয়েছে কি?"

প্রতিমা বলিল, "না, কেন?"

"একটা গান কর না, চুপচাপ পড়ে থাকতে আর ভাল লাগে না।"

প্রতিমা হাসিয়া বলিল, "কিন্তু তোর ঐ সমুদ্র সুরের সঙ্গে ত আমার সুর মিলবে না।"

চামেলী উদাসকণ্ঠে উত্তর দিল, "না মিলুকগে। সমুদ্রের একঘেয়ে সুর শুনে শুনে অরুচি হয়ে গেছে।"

প্রতিমা হার্ম্মোনিয়াম টানিয়া লইয়া বসিল। রীড গুলির উপরে যথেচ্ছ ভাবে আঙুল চালাইতে চালাইতে বলিল, "কোন্‌টা গাইব—বল দেখি?"

চামেলী একটু ভাবিয়া বলিল, "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা—" পরমুহূর্ত্তেই সে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "না বৌদি, সেইটে—'তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর আমার সাধের সাধনা'।"

প্রতিমা একটু বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইল,—তাহার পরে আর কিছু না বলিয়া স্বর-তরঙ্গে কক্ষটীকে ভরিয়া তুলিল।

দূরে—যেখানে আকাশ-সমুদ্রে মিলন হইতেছিল, তাহারই ঠিক উপরে সন্ধ্যা-তারা মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছিল। বসন্তের সান্ধ্য-সমীরণ শীকর-সম্পৃক্ত হইয়া কক্ষটিকে শীতলতর করিয়া তুলিল। চামেলীর সেদিকে লক্ষ্য ছিল না, সে একমনে গান শুনিতেছিল। প্রতিমা কিন্তু মনে মনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল, জানালা বন্ধ করিয়া বসিতে ভুল হইয়াছে বলিয়া সহস্রবার আপনাকে তিরস্কার করিল। তখন কিন্তু উঠিবার উপায় ছিল না, চামেলী যে একমনে গান শুনিতেছে! তাহার অন্তরের এই নিবিড় তৃপ্তিটুকু ভাঙিয়া দিতে প্রতিমার মন সরিল না। (শঙ্কিত দৃষ্টি পীড়িতার মুখের দিকে তুলিয়া ধরিয়া সে মনে বাজাইয়া চলিল।

৫

স্ত্রীকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া সন্তোষ বলিল, "আর বেশী দেরী নেই। ডাক্তার বলেছে এক সপ্তাহের মধ্যেই হার্টফেল করে মারা যেতে পারে।"

প্রতিমা নীরব রহিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে হঠাৎ মুখ তুলিয়া ভাঙা গলায় কহিল, "এখনো চেষ্টা করলে বাঁচানো যায় না? একটুও উপায় নাই কি?"

বিষণ্ণ হইয়া সন্তোষ উত্তর দিল, "তিন বছর ধরে চেষ্টা ত যথেষ্ট-ই করলাম! কি করবে বল, জীবন-মরণ মানুষের হাত নয়।"

প্রতিমার আয়ত চক্ষু দুইটী জলে ভরিয়া উঠিল। আঁচলটা হাতে চাপিয়া ধরিয়া সে বলিল, "আমার একটিও ভাই-বোন নেই, ভেবেছিলাম ওর একটা ভাল দেখে বিয়ে দিয়ে ভাই-বোনের সাধ মেটাব। কিন্তু তেরো বছর বয়স থেকে কি যে কাল রোগেই ওকে ধরল!"

সেল্‌ফের উপর হইতে একখানি নূতন বই টানিয়া লইয়া সন্তোষ বলিল, "আর ওকে বই পড়তে মানা করবার দরকার নেই, এইখানা ওকে দিও। আমি চললাম একবার ডাক্তারের বাড়ী।"

স্বামী চলিয়া গেলে অশ্রু চাপিয়া রাখিবার ব্যর্থ-প্রয়াসে মুখখানি লাল করিয়া কিছুক্ষণ পরে প্রতিমা প্রকৃতিস্থ হইল। তখন সে ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিয়া চামেলীর নিকটে আসিয়া বলিল—

"বল দেখি সোণামণি দিদিটি আমার,
কি এনেছি তব করে দিতে উপহার?"

চামেলী হাসিয়া বলিল, "অমৃত বোস দেখছি তোমার কণ্ঠস্থ। ওখানা কি বই? নিশ্চয়ই জানকী দেবীর লেখা?"

প্রতিমা বলিল, "বইখানির নাম শেফালিকা। কি করে তুই জানলি এটা জানকী দেবীর রচনা?"

"অন্যের কারু বই পড়তে যে আমার ভাল লাগে না। হ্যাঁ বৌদি, শেফালিকা নামটি বেশ কবিত্বপূর্ণ,—নয়? এই লেখিকার রচনার নাম ঠিক করায় সব-তাতেই বেশ চমৎকার আর্ট আছে।"

"আমি সাহিত্য-চর্চ্চাও করি না, আর্টেরও ধার ধারি না।" বলিতে বলিতে বইখানি চামেলীর হাতে দিয়া প্রতিমা ঘরের বাহির হইয়া গেল।

সন্তোষ ফিরিয়া আসিলে সে বলিল, "দেখ, মিলিকে আনন্দ দেবার জন্যে আমি কতকগুলো মিথ্যে কথা বলব, তোমায় কিন্তু সেই সঙ্গে যোগ দিতে হবে।"

বিস্মিত হইয়া সন্তোষ বলিল, "কি রকম?"

প্রতিমা বলিল, "পাশের বাড়ীর একটী মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, তাঁর বোনের একখানি ফটো আমি চেয়ে নিয়েছি, মেয়েটির মুখখানি ভারি সুন্দর। ভাবছি, সেই ছবিখানা মিলিকে দিয়ে বলব—এখানা জানকী দেবীর ফটো। কি করে পেলাম জানতে চাইলে বলব, জানকী দেবীর পরিচিত একটী মেয়ের সঙ্গে আমার ভাব হয়েছে, তার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছি।"

সন্তোষ নির্ব্বাক বিস্ময়ে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। উত্তর দিবার শক্তি বোধ হয় তখন তাহার ছিল না।

৬

এক মাস কাটিয়া গিয়াছে। কলিকাতার সেই নির্জ্জন ঘরখানিতে—যে খাটের উপরে চামেলী শুইয়া থাকিত—সেই খাটের উপরে প্রতিমা চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

ঝি আসিয়া সেই মাসের "রত্নাবলী" খানা তাহার হাতে দিয়া গেল। প্রতিমা চমকিয়া উঠিল। কাগজের মোড়ক না খুলিয়া আলমারীর নিকটে আসিয়া অপঠিত "রত্নাবলী" খানা তুলিয়া রাখিয়া দিয়া স্থির চোখে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

কোথায় তুমি স্নেহের বোনটী আমার! তোমার বড় আদরের রত্নাবলী ত আসিয়া পৌঁছিল, তুমি আজ কত দূরে?

টপ টপ করিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু তাহার চোখ দিয়া ঝরিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আলমারী খুলিয়া "শেফালিকা" বইখানি বাহির করিয়া লইয়া সে সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

মলাট উল্টাইতেই সেই ছবিখানি বাহির হইয়া পড়িল। প্রতিমার মনে পড়িয়া গেল, এই ছবিখানি জানকী দেবীর—জানিতে পারিয়া চামেলীর বিবর্ণ মুখখানা কেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

ছবির নীচে পেনসিল দিয়া অস্পষ্ট অক্ষরে কি যেন লেখা রহিয়াছে। প্রতিমা চামেলীর হাতের লেখা চিনিল। বহুক্ষণ ধরিয়া চেষ্টা করিয়া সে পড়িল,—

"তুমি সন্ধ্যার মেঘ, শান্ত সুদূর
আমার সাধের সাধনা।"

ঘর ছাড়া।

[শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল]

ঘর ছেড়ে তুই বেরিয়ে আয়—
এই আকাশ ভরা উদার আলোয়
মেলে দে তোর সজল হৃদয়।
ক্ষুদ্র এ তোর ভাবনা ব্যথা
রাখ্‌না ফেলে পিছন পানে
এই যে আকাশ ভর্‌লো গানে
সেই গানে তোর মেলা হৃদয়।

আকাশ পানে দেখ্‌লে চেয়ে
দুঃখ ও সুখ কোথায় তারা
এই যে এ তোর জন্ম-মরণ
কোন্‌ অসীমের বুকে হারা।
আনন্দ-গান ঐ যে বাজে
বিশ্বজুড়ে সকাল সাঁঝে
ভাব্‌না ব্যথা পায়ে ঠেলে
সেই সুরে তোর মেলা হৃদয়॥

মুক্ত আত্মার বার্ত্তা।

[শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র]

মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে কি না, জড়দেহ ত্যাগের পর আত্মা কোথায় কি অবস্থায় থাকে এই সমস্যাগুলি সৃষ্টির আদি হইতে মানব কর্ত্তৃক নিরাকরণ করিবার চেষ্টা সবেগে চলিয়া আসিতেছে। মুনি ঋষি, শ্রেষ্ঠ সাধকবর্গ, জ্ঞানমার্গের উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত মনীষি হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কালের 'থিয়সফিষ্ট' পর্য্যন্ত এই গুরুতর সমস্যা-সমাধানে প্রয়াস পাইতেছেন। আমাদের চেয়ে যাঁরা সকল বিষয়ে বড় তাঁদের সিদ্ধান্ত আমরা মাথায় পাতিয়া লইয়াছি। ফলে, আমরা অন্ধের ন্যায় তাঁহাদের নির্দ্দেশমত পূজা-আহ্নিক, শ্রাদ্ধতর্পণ করি, পরকালে বিশ্বাস করি, এবং পরলোকে বিশ্বাস করি বলিয়াই যথাসাধ্য অপাপবিদ্ধ থাকিতে প্রয়াস পাই। যাঁহারা আমেরিকা যান নাই তাঁহারা প্রত্যক্ষদর্শীর মত যেমন আমেরিকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ—পরলোক সম্বন্ধে আমরা তেমন নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। পারি নাই বলিয়াই বয়োবৃদ্ধির সহিত আমাদের মন গুমরিয়া উঠে। তবে কি পরলোক—আত্মার অস্তিত্ব সব কল্পনা মাত্র?

আধুনিক বৈজ্ঞানিক চন্দ্রলোকের সহিত পৃথিবীর সম্বন্ধস্থাপনে ব্যগ্র। সেইরূপ অনেক বৈজ্ঞানিকও পরলোক-চর্চ্চা লইয়া নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে পরলোকের স্থিতি প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। মুক্ত আত্মাকে আবির্ভাব করিয়া নানা প্রশ্নের সমাধান করিতেছেন। এমন কি, শোনা গিয়াছে যে মুক্ত আত্মার ফটোগ্রাফ্ পর্য্যন্ত না কি তোলা হইয়াছে!

এই সব কথা যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে চক্ষু বুঁজিয়া মানিয়া লইতে হইবে পরলোক আছে। যদি নাস্তিকের তর্কজালে নাকাল হইয়া স্বীকার করিতেও হয় পরলোক নাই, তবুও বলিব পরলোকে বিশ্বাস করিয়া আমাদের অ-লাভ নাই। পৃথিবীতে এতটা দাপট চালাইতেছি, আমিত্ব লইয়া অন্ধ হইয়া বসিয়া আছি,—এখন এক নিঃশ্বাসে যদি বুঝিতে হয়, জীবনটা কিছু না, একটা জলবুদ্বুদের মত নিমিষে ইহার উত্থান ও পতন, তাহা হইলে সারা জীবনটা একটা অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে হয়; সমাজে ধর্ম্ম যাহা সামান্য মাত্রাতেও বর্ত্তমান আছে, তাহারও লোপ-সাধন হয়।

দুই বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতবর্ষ নিবাসী একজন জীবাত্মা আলোচনাকারীর নিকট একজন বঙ্গ [illegible] মুক্ত আত্মা অনাহুত হইয়া আসিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরলোকের বিবরণ প্রদান করেন। তিনি তাঁহার আত্মীয় স্বজনবর্গের নাম ও ঠিকানা দিয়াছিলেন। কৌতূহলপরবশ হইয়া উক্ত ভদ্রলোকটী আত্মার প্রদত্ত ঠিকানায় পত্রাদি প্রেরণ করেন এবং উত্তরে জানিতে পারেন, আত্মার প্রদত্ত সমাচারগুলির একটী বর্ণও মিথ্যা নহে। সুতরাং উক্ত মুক্ত আত্মা যিনি অযাচিত ভাবে আসিয়া পরলোকসম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বিশ্বাস করিতে হয়। তাঁহার বর্ণনা নিম্নে দিলাম:—

"যখন আমার আত্মা জড়দেহ ত্যাগ করিল তখন একটা বিরাট শূন্যতার মাঝে আমি আসিয়া পড়িলাম। এই শূন্য স্থানটী নীলাকাশের ন্যায় খণ্ডাকৃতি, সীমাহীন, উজ্জ্বল তারকা এবং জ্যোতির্ম্মণ্ডল মণ্ডিত। আমি প্রায় দুই ঘণ্টা কাল বিস্ময় বিমুগ্ধ ও বিভোর হইয়াছিলাম। নিজের এই অবস্থাটা একটু বুঝিবার মত জ্ঞান হইলে বুঝিলাম, আমি একটা বিরাট বোঝা—জড়দেহের বিরাট বোঝা—বহা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি। আমি তখন রীতিমত প্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম। পৃথ্বীতে আমার স্বজনবর্গের বিলাপ ও ক্রন্দনধ্বনি আমাকে বিচলিত করিতে পারে নাই, কারণ পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছিলাম, আমি জীবন্মুক্ত হইতে চলিয়াছি। এ-পারে আসিয়া অনেক পরি-